কমুনিস ও অন্যান্য

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

অফবিট
৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯
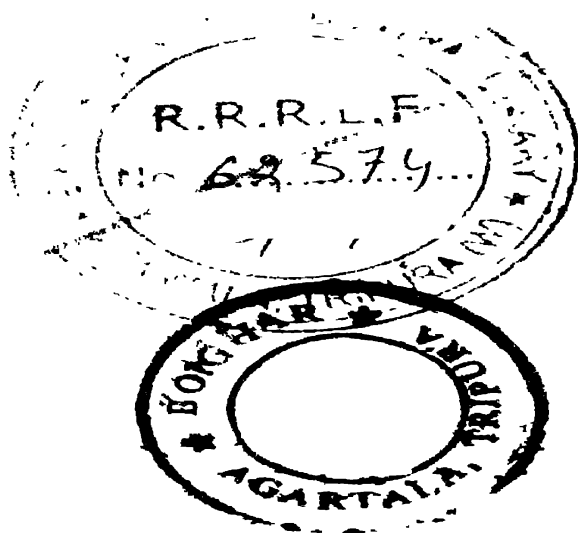
Selected Fiction / Raghab Bandyopadhyay

সম্পাদনা

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অফবিট পাবলিশিং-এর পক্ষে শ্যামল ধর, রাজা সিংহ কর্তৃক
৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত

অক্ষরবিন্যাস

মুদ্রাকর

১৮এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক

ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা: লি.

গংগানগর, কলকাতা ৭০০১৩২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

লেখক

প্রথম প্রকাশ

১৯৫৯

৫০০.০০

গৌতম ভদ্র

বন্ধুবরেষু

নিবেদন

এই বইটিতে আমার লেখক-জীবনের শৈশবকালীন রচনা এবং লেখালিখি বিষয়ক কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর যা-যা লিখেছি সেসবেরও খানিকটা গৃহীত হয়েছে। একজন লেখকের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে সেরকমই একটি রচনাসম্ভার এই বই, ইংরেজিতে যাকে অমনিবাস বলে। 'নিবেদন' অংশটি ভূমিকা নয়। ভূমিকার কোনো প্রয়োজনও দেখি না। গুটিকয় তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই মাত্র। রাজনৈতিক কারণে 'কমুনিস', 'শৈশব' এবং কয়েকটি গল্প আমি ছদ্মনামে লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। *স্পন্দন* পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামটি (শংকর বসু) দেন। দ্বিতীয় কথা, প্রথম দিকের রচনাগুলির পিছনে রাজনীতির প্রত্যাদেশ অনেকটা কাজ করেছে। পেশাদার লেখকের যত্ন, সংশয় ও প্রশ্নের ঘাটতি ছিল। এখানে স্পষ্ট করা দরকার, ব্যবসায়ী-লেখক এবং পেশাদার-লেখকের মধ্যে ভেদ আছে। ভারতীয় ভাষায় প্রতিভাবান যেসব প্রাচীন লেখক কাজ করেছেন, জেনে বা না-জেনে তাঁরাও পেশাদারই ছিলেন। এই অর্থে যে, তাঁদেরও নিরলস চর্চায় মগ্ন থাকতে হয়েছে। তাঁরা প্রণম্য আরও এইজন্য যে, বিশ্বাস করতেন, ভাষায় খোদিত শিল্পকর্মটি যৌথের কাজ, লেখক মাধ্যমের বেশি কিছু নয়। আমি সেই মহৎ লেখককুলের নগণ্য বংশধরদের একজন, যে দীন অথচ দূর তীর্থদর্শনের উচ্চাশা ত্যাগ করতে পারেনি।

সূচি

অ কা ল বো ধ ন

ভাতের উপাখ্যান

য়ন্য নাহি মিলে এই পাপ জষ্ঠী মাসে
বেঙছির ফল খেএগ্র থাকি উপবাসে।

নানান বর্ণের চাল। সেদ্ধ আর আলা দুই-ই আছে। কাঞ্চা সোনার বরণ। আবার ধুলোবালি মরাহাজা পাতার মতো কেমন ধূসর চাট্টি। মেটে হাঁড়িতে চালগুলো ঢেলে দিয়ে, কেদার ঝুল ঠোঁটে গর্বের আধাহাসি জাগিয়ে বুঁচির দিকে তাকাল। মানে, ফোটাও না কেন। এক্ষুনি কোলেরটার হাসির মতো কথা বলবে চাল। টগবগ টগবগ শব্দে। এককোণে বুড়ি মা-টা কাতরাচ্ছে। পেটের আগুন সর্ব শরীলে ছড়িয়ে গেছে। ডেলা পাকিয়ে পড়ে আছে এখন। ওই আগুনে যদি চাল ক'টা ফোটানো যেত—তাহলে আর চিন্তে ছিল না। ছিনিয়ে আনার খাটনি পুষিয়ে যেত। এখন ফোটানোটাই সমস্যা।

পেটের কাঁচা ভুখ নিয়ে লেণ্ডিপেণ্ডি বাচ্চাগুলো মৌলালির ফুটপাতের কানায় মুখ গুঁজে, হলদে চোখের জমিতে নিকষ কালো মণিগুলো ভাসিয়ে রেখেছে। ভাত হলে চাট্টি খাবে। হাউস মিটিয়ে। খানিক আগে এক পশ্‌লা বইয়ে দিয়েছে আশমান। কেদারের পরিবারটা হাঁড়িপাতিল ন্যাকড়াকানি সমেত ভিজে নেয়ে উঠেছে। এখন ন্যাতার মতো। চালচাট্টি পেয়ে আবার কেমন নড়নচড়ন শুরু হয়েছে। ছানাপোনাগুলোরও বিশ্বেস হচ্ছে—না, পেটে যাবে দু এক দলা। মৌলালির ফুটপাতের ওপর ন্যাকড়াকানি আর চাট্টি খড় বিছিয়ে কেদার সংসার পেতে বসেছে দু-হপ্তা হতে চলল। এর মধ্যে আরো যে কত ফুটো কপাল এল তার আর হিসেব নেই। বুঁচি ন-বছরের দুব্‌লাপাতলা ছেলেটির হাত ধরে এক ঝাঁকানি দিল : অ্যাই! পেটটা তো করিছিস এই এততো বড়ো।

ছেলেটা পেটটা নিয়ে আইঢাই করছিল। প্রকাণ্ড জালার মতো পেট। জয়ঢাক একটা। দেশগাঁয়ে থাকতে বুঁচি কীসব পাতা বাটাবুটি করে প্রলেপ দিত, তাইতে কমত একটু। দেড় হপ্তার ওপর সেসব বন্ধ। পেটটা খালি থাকলে আবার ফোলে বেশি। নারকেল দড়ির মতো ছেলেটার হাত-পা লুললুল করছে। যেন খসে যাবে।

চিলের মতো সাঁ করে ছুটে গেল। পিলেটা পটলের মতো ফুলে ওঠে ছোটার ধকলে। হঠাৎ মৌলালির ট্রাফিক কনস্টেবলটার লেবু লাগানো ঘুটের কাছে পিলেটা নিঃশব্দে ফেটে যেতে পারে। ছেলেটার ওসব হুঁশ নেই। ফুটাফাটা টুকরো টাকরা কাগজ তাক করে ছুটে যাচ্ছে। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এসে ফুটপাতের কোণটায় ঢেলে দিচ্ছে।

দু-খানা ইট আড় করে সাজিয়ে বুঁচি আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। একটু করে জ্বলে আর চুনোচানার চোখগুলো চকচক করে ওঠে। শেষে আগুনটা টিকে গেল। আধলা কালোপোড়া

ইটের ফাঁকে জিভের মতো লকলক করে উঠল আগুনের একটা আলগা শিখা। একেবারে সদ্য যেটা মাটিতে পড়েছে, সেই কোলেরটা তাকিয়ে থাকল মানুষের প্রথম আগুন আবিষ্কারের বিস্ময় নিয়ে। বুঁচির চোখ দুটোয়ও কেমন একটা মুগ্ধ ভাব। যেন আগুনের বন্দনা করছে। অগ্নি, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা। কুণ্ডলী পাকিয়ে বুড়ি পড়েছিল। আধলা ইটের ফাঁকে লাল টকটকে ফিতের মতো আগুনের দিকে তাকিয়ে বুড়ি পিচুটি-পড়া চোখ দুটো সেঁকে নিচ্ছিল।

খানিক ছুটোছুটি করে ছেলেটা কাহিল হয়ে পড়ল। লাইটপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। পিলেটা নড়ে চড়ে উঠছে। যন্ত্রণায় জিভ ঝুলিয়ে দিল ছেলেটা। ওর গালের পাতলা কাটা দাগটায় এখন দুশ্চিন্তার এক গভীর ছাপ। ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল আপনি। আনমনে নাক খুঁটে পোস্টটার গায়ে হাত মুছল।

আধলা ইটের ওপর মেটে হাঁড়িটা কাত হয়ে আছে। হাঁড়িটার গায়ে কালশিটে দাগ। পাতলা ধোঁয়ার রেখা জাগছে। তরিতরকারির ছালবাকল, খোসা আর খুদকুঁড়ো দু-মুঠো চাল ফুটছে ঢিমেতালে। থিতিয়ে থিতিয়ে। উষ্ণ এক থাল ভাতের নিবিড় স্বপ্ন পাজরার হাড়ে গেঁথে একগাদা বালবাচ্চার মা বুঁচি বুকের ওপর ন্যাতাটা টেনে, সারাটি পিঠ আলগা করে খর রোদ্দুরে মেলে রেখেছে। দাঙ্গাবাজ, ফেরেববাজ, লুটেরা শহরটার বুকে, ফুটপাতের কানায়, মরা গাছের ছায়ায়, মৌলালির পাইপ পাড়ার মাজা ভাঙা কাজিয়ার ভেতর দু-মুঠো চাল ফোটে বেআইনি দুঃসাহসে। ভাতের একটা আশ্চর্য গন্ধ ভাসে বাতাসে।

চালটা মেলাই ফুট খায়। ওদিকে আগুনের অবস্থা যাই যাই। ছেলেটাকে আবার ছুটতে হল। কেদার চালচাট্টি জোগাড় করে দিয়ে ফের কোন চুলোয় গেছে। জ্বরোবুড়ি পেটের জ্বালায় আলজিভ বের করে ফেলেছে। কাতরাচ্ছে। নাহ্। মরার আগে আর এক গেরাস মুখে দিয়ে যেতে পারল না। নিভন্ত আগুনে ফুক মেরে মেরে বুঁচি দম বন্ধ হয়ে মরার দাখিল।

দূর থেকে ছেলেটা খানিক দেখল ঠায় দাঁড়িয়ে। তারপর পিলেটা চেপে ছুট্টে গেল কর্পোরেশনের দেয়ালটার দিকে। পেচ্ছাপের ভিজে মাটিতে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে পোস্টার ছিঁড়তে লাগল। ফাতা ফাতা করে। পার্টিপুর্টির বাছবিচার না করে। ওর রাক্ষুসে খিদের আগুনে পুড়ে খাক হবে বলে তেরো-চোদ্দ কিসিমের পার্টির প্রচার অভিযান টুকরো টুকরো হয়ে জমা হল। পেটের পিলের ওপর খানিকটা তুলে নিয়ে বুঁচির সামনে ঢেলে দিয়ে গেল। আর আট দশটা বালবাচ্চার মা বুঁচি শহরের বুকের মাঝখানটায় ফুক মেরে মেরে আগুন জ্বালাতে লাগল। পেটের আগুন নেভাবে বলে। সয়-সন্তানের মুখে দুটো দেবে বলে।

ভাতের আঁশ আঁশ গন্ধটা ফের বাতাসে ছড়িয়ে গেল। ফুটে এসেছে। তবু ছেলেটার কেমন যেন রোখ চেপেছে। আবার পোস্টার ছিঁড়তে চলল। কাগজগুলো ফাতা ফাতা করে ছেঁড়ার মধ্যে কেমন একটা মজা আছে। বুঁচি মানা করল। ছেলেটা কানে নিল না। কুচিকুচি করে একমনে ছিঁড়তে লাগল। হঠাৎ কোত্থেকে মেচেতার ছাপভরা মুখ নিয়ে একটা লোক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শূয়োরের মতো ছুটে এল—শ...শা...লা জানিস কাদের পোস্টার। ছেলেটা জানত না। ওর জানার দরকার হয়নি। ওর দরকার ছিল শুধু আগুন জ্বালা। এসব কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না। গোল্লাগোল্লা চোখে তাকিয়ে থাকল মেচেতার দিকে। লোকটা ততক্ষণে

গিলেটার ওপর এক ঘুসি লাগিয়ে দিয়েছে। ন বছরের ছেলেটা বেদনা হজম করে থুতু ছেটাতে লাগল।

—শালা .. হারামি...

বুঁচি ততক্ষণে হাঁড়িটা ইটের ওপর থেকে নামিয়েছে। ধোঁয়া উঠছে এখনও। অল্প অল্প। আর হাঁড়িটা নামাতেই কোত্থেকে কেদার ছুটে এল। হাঁড়িটা আগলে বসল, কাঁচা একটা খিস্তি করে। বাচ্ছাগুলো হাড়গিলে মানুষটার বুকে আঠালি পোকার মতো লেপটে থাকল। বুঁচি উবু হয়ে বসেছে, হাঁটুতে থুতনি রেখে। উষ্ণ ভাত ঢেলে দিতে লাগল ভাঙা ঝুরঝুরে একটা কলাই করা পাত্তরে। আর কাচ্ছাবাচ্ছাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মুখ পুড়িয়ে ফেলছে। খেতে খেতে কেদার কী যেন বলল কদ্ কদ্ শব্দে। দোকনে টানে।

: পেলি কি করি।

: সেগোর হোমগার্ডটাকে একের ঘুসো দে...

লেণ্ডিপেণ্ডি বাচ্ছাগুলো বাপের সাথে সমানে গলা তুলে হাসতে লাগল। তার সেই গাঁ ছাড়া চাষিবউ নিজের মরদটার দিকে কেমন একটা বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে দেখতে লাগল। আধলা ইটের ফাঁকে আগুনের দিকে যেমন করে তাকিয়েছিল। এবার নিজেও মুখে তুলল। আবার খাওয়ার কদ্ কদ্ শব্দ। পেটে দানা দেওয়ার ওপচানো খুশি থেকে থেকে বালবাচ্ছাগুলোকে চঞ্চল করে তুলছে। আর ওদের বাপ ভাতের উপাখ্যান, হোমগার্ড ঠ্যাঙানোর গল্পোটা হাজারবার ধরে নানানভাবে বলে চলল : হুঁ...হুঁ... সেগোর হোমগার্ড ...এই এক্কের ঘুসিতে...। জ্বরোবুড়িও কাঁপতে কাঁপতে এসে থালাটায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। ন বছরের ছেলেটা কেবল অসহ্য পিলের যন্ত্রণায় দাপাচ্ছিল। চান্দের টিপের মতো আঙুল দিয়ে ভাত খুঁটে নিল দেড় বছরের কোলেরটা। হঠাৎ খাওয়ার কদ্ কদ্ শব্দ ছাপিয়ে একটা বিকট শব্দ। ফটফটে সাদা ভাতগুলো লাল হয়ে গেল। উষ্ণ তাজা রক্তে।

সাত ধান্ধা করে অমন সাধের ভাত পেটপুরে খেতে পেলনা ছেলেটা। বুঁচি ফুটপাতের ওপর মাথা কুটে ফাটিয়ে ফেলল। ভাতের হাঁড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। মরা আগুন থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। ভাত রান্নার চিহ্ন পোড়া ইট দুটো পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো পড়ে আছে।

আর ওদের শোকের চিহ্ন নিয়ে আদিম অন্ধকার থেকে উঠে এল চার চাকার একটা কালোগাড়ি। গোটা পরিবারটাকে ভ্যানের খোলের ভেতর ঠেসে নিয়ে চলল। ভাত রান্নার এই আশ্চর্য কাহিনী শোনার জন্য। ভাতের দুঃসাহসী স্বপ্ন আর ভাঙা কলাইয়ের থালার কানায় কানায় লেপটে থাকা রক্তের জবাবদিহির জন্যে। কারণ বহুকাল যাবৎ এ শহরে রক্তপাত নিষিদ্ধ।

কিংবদন্তির শহর

জন্মেই মাকে খেয়েছিল। নিবারণকে গভ্ভে ধারণ করে হতভাগ্য জননী তাকে শরীলের কোষ নিংড়ে দিল : রস, কষ, মেদ, মজ্জা। দিয়ে থুয়ে নিঃসাড়ে মরে গেল। মিত্যুকালে নিবারণ মা-র চিমসে বুকে দু-দুটো দাঁত বিঁধিয়ে দিয়েছিল। আবাগী মার বুকে পুরুলিয়ার ঠা ঠা রোদ। মাটিতে পানি নেই। বুকে দুধ নেই। বুক যেন মাটি। আশ্চয্যি, ছেলেটা বেঁচে গেল! সেরেফ্ খারকোল পাতা বাটা আর কচুর লতি সেদ্ধ খেয়েই ছেলেটা বর্ষার ফনফনানো কচুর মতই গতরে বেড়ে উঠল। গলাজল বিলে পাট পচান দিত নিবারণ। জউক লাগত মোটা চামে। হাঁসুয়ার টানে সাফ করত জউকের খুন খাওয়া বেলুনের মত পেট। বাপের বুকশূল ছিল। ডাক এল, আর মানুষটা ধড়ফড়িয়ে চলে গেল। নিবারণ বেঁচে বত্তে থাকল চোদ্দ পুরুষের পরমায়ু নিয়ে।

দুর্ভিক্ষ গেল, স্বাধীনতা গেল, যুদ্ধ গেল : সব্বোনাশের মাথায় পা দিয়ে নিবারণ শহরে এল। শহরের কাছে তার অনেক প্রত্যাশা! কলিকাতা শহর! হাটুয়া, ব্যাপারী আর ন্যাড়াপাড়ার মঙ্গল খুড়োর কাছে ওড়া-ওড়া অনেক খবর শুনেছে। মঙ্গল খুড়ো গলার শিরা দাঁত কপাটি লাগিয়ে খিচে টানে আর ছাড়ে। একসাথে শিরাগুলো জেগে উঠলে তবে কথা সরে : বুজলি রে নিবারণ, কলিকাতায় পয়সা উড়ে বেড়ায়...মানুষের প্রাণের মূল্য আছে সেখানে, অনেক মূল্য।

দশ ক্রোশ পথ হাঁটার ক্লান্তি, শূন্য পেটের জ্বালা উগ্র নেশায় ঝিম পাড়িয়ে রাখল মানুষটা: কেবল মঙ্গল খুড়োর কথা স্মরণ করতে করতে বেমালুম চলে এল।

২

নয়া মানুষের যা হয়। প্রথমে ধাঁধা। আখমাড়াইয়ের কলের মাফিক দিন নেই রাত নেই, মানুষ যুঝছে। কত কাজ! রাত্তিরে বিজলিবাতিতে দিন বানিয়ে বড়ো বড়ো বিল্ডিং হচ্ছে। ধাঁধার ঘোরেই সাত ঘাটে ঠোক্কর খেল। মানুষের মেদ, মজ্জা, তরল রক্ত এই শহরে ন্যায্য দামে বিক্রি হয়। মানুষ ফ্যালনা নয়। হাড় অব্দি বিকিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে নিবারণ এসব টের পেয়ে গেল। সাত ঘাটের জল খেয়ে স্যায়না হয়ে উঠল। একেবারে জবরদস্ত। কাজকাম জোটাতে বিস্তর ভোগান্তি হয়েছে। তার আগে একবার সে রক্ত বেচেছিল। আর মনে মনে ভেবেছে—সত্যি পয়সার পাখনা আছে বটে। কঠিন শহর। আর মানুষগুলো আশমানের কইতরের মতো মুক্ত। যেমন খুশি, যেমন মর্জি, বাঁচো। বড়োলোক অব্দি খনা গলায় শ্যামসুন্দরের পালার মতো পিরিতের গান গায় পোঁচিমাতাল হলে। ফেলনাট হয়ে। আর গরিবদুখি তেমন ঠেকলে মাথার চুলগাছ অব্দি বেচতে পারে।

নসিবের ফেরে এবার কলের কামটা জুটে গেলে, নিবারণের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বিন্দা দারোয়ানের খুপরির বাইরে মেঝেতে রাতটা গড়িয়ে নিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে। কামানের

নলের মতো চিমনি। সারি সারি। খাড়া উঠে গেছে। শান্ত উদার আকাশটাকে ফেড়ে ফেলার কুটিল শলা পরামর্শ করে। বলক বলক ধোঁয়াও ওগরায়। চিমনির তলায় স্যাঁৎসেতে টিনের শেড। ঢালু। শেডের তলায় মানুষজনের জান লেড়িকুত্তার জিভের মতো ঘামে। টস টস করে, লোনা পানি গড়ায়।

—আসলি কেন?

—উপায়!

—মানুষ মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে!

—গরিবগরবার অত দেখলে চলে না, অসুখবিসুখ সব জায়গাতেই আছে।

—অসুখ বিসুখ নয়রে শালা।

—তবে?

—ছারপোকার মতো মানুষের জান নোখের ডগে, একটু টিপলেই ব্যস।

রবার কারখানার ঘন্টি বেজে উঠল। শিবুদা কালো ছোপ ধরা মাড়ি ভেটকে, গোলগোল চোখ দুটো চোয়ালের দিকে টেনে কথা বলছিল। ঘন্টি হতেই কথা কেটে দিল। ঘন্টিটা একনাগাড়ে খানিক বাজে টং টং শব্দে। সাথে সাথে ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ তুলে গেটটা বোয়াল মাছের মুখের মতো ফাঁক হয়ে যায়। তার দিয়ে পেঁচিযে পেঁচিয়ে এনামেলের গেলাস বেঁধে রেখেছে। টিফিন হলেই গেলাস নিয়ে ছুট লাগায় সব। শিবুদা গেঞ্জির দুটো ফুটো গিট দিয়ে বেঁধে, আঙুলের ডগায় গেলাসের তারটা পেঁচিয়ে ছুটল। নিবারণ চেল্লাতে লাগল: দশ পয়সার মুড়ি এনো গো...।

শিবুদার বাত্তি ধরে গেছে। ষাটের ঘরে বয়স। পেট শুকনো দিয়ে দিয়ে আরও বুড়িয়েছে। দশ পয়সার চা আর তিনটে বিড়ি মাত্তর তার খরচা। আবার রুটিন বেঁধে নিয়েছে, হপ্তায় একদিন নির্জলা। চা মুড়ি নিয়ে এসে শিবুদা ঠোঙাটা নিবারণের দিকে আগিয়ে ধরল। একমুঠো মুখে দিয়ে এক ঢোক চা গিলেই ফের শুরু করল!

—তবে শোন্ বলি...এই যে এত্তো মানুষকে খুন করল, সেসব রক্ত কোথায় গেল? ...অ্যাঁ...কেউ বলতে পারবে না...।

শেষের দিকটা শিবুদা টেনে টেনে বলে। তারপর গাঁটপাকানো থ্যাবড়া আঙুল বেচালভাবে নাড়ে। হঠাৎ কথা কেটে দেয়।

৩

ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দে কোঁৎ পেড়ে পেড়ে হাসতে লাগল শিবুদা। নিবারণ বিশ্বেস যায় না। ডর লাগে তবু। শহরটা কেমন যেন ঝিম মারা। গলি-ঘুঁজিতে চোরের মতো আনধার হাঁটে। শিবুদার হাসিটা ভয়ানক।

—শিবুদা। অ শিবুদা!

ফ্যাচফ্যাচে হাসিতে নাকে জল এসে গেছিল। লম্বাঝুল শার্টের কানায় নাক পুঁছে জিজ্ঞেস করল : হাবড়ার বিরিজ দেখেছিস?

—হুঁ।

—বল্ দেখি কেমন করে বানাল?

—লোহা, নাটবল্টু...।

—তোর মুণ্ডু!

—তবে?

—কচি ছেলের রক্ত লেগেছিল।

—ধ্যুৎ!

—না হলে বিরিজ কি অমনি হল

—তোমার যেমন কথা...।

—হক কথা। তখন বাণিজ্যের জন্য সাহেবরা লালচে মরছে। দালালদের নগদ ট্যাকা দিল। তারা কালো কালো বাগ্‌দির ছেলে এনে দিল।

নিবারণের তিন কুলে কেউ নেই। মার বুকে বাণ মেরে জোঁকের মতো সব দুধ শুষে নিয়েছিল শত্তুর। সেই বুকে কচি দাঁত বিঁধিয়ে যে বেঁচে থাকল, মরণকালে বাপ তাকে বলেছিল : নিবারণ আমার বংশ যেন থাকে। সব বিরিক্ষই ফল রেখে যেতে চায়। তবে না মানুষ বেঁচে আছে। না হলে বিরিক্ষ মল্লে থাকেটা কি। নিবারণ বাপের কথা স্মরণ রেখেছিল। বংশরক্ষা আর বংশবৃদ্ধির জন্য সে এই শহরে এসেছিল। এই শহরের কাছে তার অনেক প্রত্যাশা।

ঘ্যাসপাড়া বস্তিতে শিবুদা ঘর দেখেছিল। কাকভোরে উঠে চ্যান করেই ছোটে। এসে দুটো গেলে। শিবুদা ফিরতি পথে দু-একদিন এসে নানান কথা বলে।

—নিবারণ!

—হুঁ।

—সাহেবরা কী করত জানিস?

—কী?

—মানুষ বেচত। জলজ্যান্তো মানুষ।

—দূর।

—দূর দূর দেশে চালান দিত।

—তুমি পাগল হলে শিবুদা।

—আরে সে জন্যেই তো জব চার্নকি শহরের পত্তন...।

—তুমি থামবে?

—পালা! পালা!

নিবারণ ভয় পাওয়ার পাত্তর নয়। তাছাড়া এই সত্তর সালে সে স্বচক্ষে দেখেছে সাহেবসুবোর মূর্তি ঘর্ঘর শব্দে ক্রেন দিয়ে হ্যাঁচড়ে টেনে তুলতে। ক্লাইভের মূর্তি সরিয়ে ক্ষুদিরামের শ্বেত পাথরের মূর্তি বসাল। তবু শিবুদার হাড় জ্বালানো কথায় বুকটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

মজুরের তেলকালি বারোমেসে তকলিফ আর চিমনির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বিষণ্ণ আকাশ। শহরের মাথার ওপর আকাশ। আকাশে ধোঁয়ার জাল। সেই জাল ছিঁড়েকুটে ষোলো কলার চাঁদ ওঠে

আকাশে। তরল রুপোর মতো জোছ্না শহরের মলিনতা ঢেকে একটা স্নিগ্ধ ভেজা ভাব আনে। সাত নম্বর বস্তির ছুতোরের মেয়ে কালপেঁচি দুর্গাকে পট করে বিয়ে করে ফেলল নিবারণ। ছুতোরের একমাত্র সম্পত্তি পায়াভাঙা খাটিয়াটা দিল। ছেদির মা দুঃখের ধান্ধা করে একটা মাদুর দিল। সাতবাড়ি বাসন মেজে ফেলুর মা একটা আয়না দিয়েছিল। হতকুচ্ছিৎ দুর্গা সেই আয়নায় মুখ দেখে গোল করে সিঁদুরের টিপ পরে কপালে।

—দুর্গা!

—কি?

—না, কিছু না।

—আহ্, গেল যা মরণ!

—তোর খুব কষ্ট হয় না রে?

—নাহ্।

—পেট ভরে খেতে পাস না।

—মেলা বোকো না তো!

নিবারণ আর মুখ খোলে না। দুর্গা কাটা ঠোঁট ছড়িয়ে মিটিমিটি হাসে। রুটিখানা ভাঁজ করে মাঝে এক ছিটে গুড় দিয়ে রাখে। টিফিনে গিলতে হবে তো।

৪

শহরটার পশ্চিম কোণে, পচা খালের গা ঘেঁষে হাড়কল। বদ গন্ধ ওঠে হাড়ের গুঁড়ো থেকে। হাড় কত কামে আসে! মানুষের হাড় বলে কথা! শিবুদাকে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল নিবারণ : হ্যাঁগো ওখানে হাড় বেচাকেনা হয় নাকি? শিবুদা শহরটার নাড়িনক্ষত্র জানে, তবু উদাসীনভাবে ঘাড় নেড়েছিল : কে জানে!

শিবুদার ভিমরতি ধরেছে। দিনে দিনে মানুষটা লোহা কাটা করাতের মতো হয়ে যাচ্ছে। চোখের জমি পিঙ্গলবর্ণ। কেবল ফিসফিস করছে : শুনেছিস?

—কী!

—আজ আবার সাতজন।

—সাতজন?

—হ্যাঁ।

—স্বচক্ষে দেখলে?

নিবারণ শিবুদার শুকনো খটখটে চোখের দিকে তাকাল। চোখ দুটো বিষম স্থির। পরপর সাতজনকে দেখতে দেখতে চোখ দুটোর যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। পিঙ্গলবর্ণ চোখের ডিম ফাটিয়ে অসম্ভব আশ্চর্য কালো মণি দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবে।

—সাতজনারই বয়েস বড্ড কম রে। চোখগুলো ভাসাভাসা। স্বপন দেখছিল যেন...।

শিবুদা হাপরের মতো টেনে দম নিল। কারখানার বিষণ্ণ শেডের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে একটু একটু করে দম ছাড়ল।

—এতো রক্ত কোথায় যায়?

—কী জানি!

—নিবারণ!

—কী?

—তুই পালা। পোড়া শহরটা ছেড়ে পালা।

শিবুদা নিবারণের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করতে লাগল :

পালা, পালা।

কোলকাতা শহরের বুকে ছেনাল রাত্তির হাজার ছলা কলা করে। নিবারণ দুর্গার হাতটা হাতের থাবার মধ্যে নিয়ে হাঁটছিল। দাঁতে দাঁত চেপে। দুর্গার এখন ভরা মাস। সে গজগচ্ছ ঢঙে চলে। আর কোম্পানির আমলের শহর সারি সারি দাঁতের মতো চিমনি বের করে হাসতে লাগল। ক্রমশ ফর্সা হচ্ছিল। নিবারণ দেখল ক্ষুদিরামের মূর্তির তলা দিয়ে কয়েকটি তরুণকে হ্যান্ডকাপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লাশগুলো হয়তো গঙ্গার জোয়ারে ফেলে দেবে।

—নাহ্।

—কি?

—যাব না, চল ফিরে যাই।

—ফিরবে?

—হুঁ।

—সেই ভালো। মনটা কেমনধারা পোড়াচ্ছিল। বাপভাই ছেড়ে আমি থাকতে পারি নে। ঘ্যাসপাড়ার মানুষজনও বড়ো ভালো।

ভোর থাকতেই ফিরল। দুর্গা নিশ্চিন্তে চুলা ধরিয়ে, বাসি কাজ সারতে বসল। আর নিবারণ রোজকার মতো চ্যান করে পেসন্ন বদনে কারখানায় গেল। শিবুদা ওকে দেখে মিচকে হাসি হাসল।

—গেলি না।

—নাহ্।

—কী করবি।

—লড়ব।

—লড়বি?

—[illegible]

—লড় তাহলে।

—হ্যাঁ লড়ব।

হঠাৎ সমস্ত শহরটা দু-টুকরো করে একসাথে অগলবগলের কারখানার ভেঁপু বেজে উঠল। গোঁ গোঁ একটা শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে অস্তরের মতো শহরটার বুক কোপাতে লাগল।

খাসতা কাগজ

মাথার ছ্যাঁদলাধরা ভ্যাপসা ঘা, খাঁচার শিকে ঘসে টিয়াপাখিটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। হরবোলার ধূর্ত লম্বা ধাঁচের মুখখানা বিরক্তিতে বেঁকে যায় : শালা খালি গিলতে চায়। চন্দনের ফোঁটা-কাটা কপালে আঁকিবুকি খেলল। খাঁচার গায়ে ঝাপড় মারতে থাকে। খানিক আগেও সে সত্যি কথা বলার ঢঙে চেঁচিয়েছে : ভগবানের দুনিয়ায় অন্যায় করে কেউ পার পায় না। হরবোলা ধম্মের পাখি, ঠিক ল্যায় বলে দেবে। তা সে রাজাবাদশাই হোক আর ফকির হোক। অমন যে মহারাজা নন্দকুমার তার বিচার পর্যন্ত এই আদালতে হয়েছে। হ্যাঁ ব্যাটা ল্যায়ের পুত্তুর, বল দেখি এ বাবুর মোকদ্দমায় হার হবে না জিত। চিল্লাতে চিল্লাতে সোওয়া হাত জিভ ঝুলে নেমেছিল।

—এই নাও বাবা পয়সা!

—বলুন?

—আমার ছেলেটাকে মেরে ফেললে গো।

আদালত ভেঙে গেছে। খানিক আগেই একরাশ ওয়ারেন্টের কাগজ নিয়ে কোর্ট সেপাই ডান দিক পানে চলে গেল। লক আপের নীচে। শনের মতো ভুরু নেড়ে, তেলেভাজার একফালি দোকান থেকে বটকেষ্ট হরবোলাকে ডাকল : কি ওস্তাদ! পাখিটাকে দানাপানি দ্যাও। রোজগার হয়ে গেল আর যত্নআত্তিও শেষ।

—আর ভালো লাগে না।

—কী?

—লোক ঠকানো কারবার।

—কেন!

—আগে কোর্টে আসত কারা?

—কারা আবার!

—ছিঁচকে চোর ঠগ চিটিংবাজ।

—আচ্ছা তাই হল।

—তাদের ঠকাতে মজাই লাগে, এই ছেলেগুলো তো কাউকে ঠকায়নি।

—কিন্তু তোমার মহারাজা নন্দকুমার?

—ও একটা কথার কথা। অভ্যেস হয়ে গেছে বলি।

—ধান্ধা ছেড়ে দেবে?

—দেখি। একটা পেট চলে যাবে।

ফ্যাকাসে গুলে মাছের মতো আঙুলে মস্ত বড়ো কৌটোটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ল্যাংড়া ভিখিরি কর্কশভাবে চেঁচিয়ে উঠল : বটু দুটো আলুর চপ দে। উইয়ে কাটা কাঠের পাল্লাটা একহাতে ধরল। ঝর ঝর করে কাঠের গুঁড়ো পড়ল। বটু গরম হাতাটা তুলে নিল : ভাগ শালা। কবে ব্যাটা ব্যারিস্টার ছিল ছেঁড়া কোট গায়ে চাপিয়ে এসে... বটু একটা...পয়সা ফ্যাল। এই বাজারে তো বেশ কামাচ্ছিস। বটু তোমার বাপ। শ্ শা লা।

থানার জিপটা কোর্টের তিমি মাছের মতো বিকট হাঁ করা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দশাসই সার্জেন্ট নেমে এল। বটুর পাশের দোকানে পানগুমটির আয়নায় চুলটা বাগে আনতে কোমর ভেঙে দাঁড়াল : সিগারেট। হাওয়াই সার্টটা বুকের মাংসের টানে খানিক ওপরে উঠল। কোমরে গোঁজা রিভলবার আর সামান্য ভুঁড়ি নজরে এল। হাতকড়া লাগানো ছেলেটা বেশ শক্ত হয়েই জিপে বসে আছে। ড্যাবড্যাবা চোখ দুটো ঘুরিয়ে দোকানপাট যেন জন্মের মতো দেখে নিচ্ছে। গাড়িটা ছাড়তেই হরবোলা বটুর দিকে চাইল : ছেলেটার মা আর দাদা হন্যে হয়ে আজ ঘুরে গেছে। শালা এত বেলায় চুপিচুপি পি সি করিয়ে নিয়ে গেল। —আস্তে। আহ্।

হরবোলা চ্যাটাই, খড়ি, পুথি পুঁটলিতে পুরল। খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে নিল : চলি রে। ততক্ষণে বটুও ঝাঁপ বন্ধ করতে শুরু করেছে। ল্যাংড়া ভিখিরিটা কেবল চিৎকার করছে: ধম্মের জয় সর্বত্র। আসুন দেখান, কাগজ দেখেই বলে দেবো। নাহলে এমনিই দশটা পয়সা দিন স্যার।

২

পেচ্ছাপখানার পাশে লম্বা আটচালা। কালো কুর্তা সাঁ সাঁ করে সরে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথা দেয়ালে ঠেকে। হিজিবিজি ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে চামড়ার কভার দেওয়া নোটবুকে একশ টাকা বায়নার প্রেমনাথ উকিল কী যেন লিখছিল। কালো ভোমরার মতো মোটা ভুরু নেড়ে উকিলের আড্ডার আর একজন মদ আর মেয়েমানুষের গপ্পো করছিল। প্রেমনাথ উকিল কালো কোটের ভেতর থেকে বাঁধানো দাঁত দু-পাটি বের করে খট্ করে লাগিয়ে নিল : শোন তাহলে, আজ্‌কের কথা নয়। ব্রিটিশ পিরিয়ডের কথা। স্বদেশী সে ছোকরার সাজা হয়ে যাওয়ার কথা। বাঘা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দালি আমাকে বললে, সাহেব বাঙালি মেয়ে আর ধেনো মাল পেলেই জিব দিয়ে লালা গড়াবে...।

—দিলেন জোগাড় করে!

—আর সেকথা থাক।

ততক্ষণে টাইম হয়ে গেছে। হরবোলা বাবার কর্কশ গলা আরও চড়েছে : মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হল। স্বর্গ মর্ত্য নেই, অন্যায় করলে হাতে নাতে ফল। ল্যাংড়া অ্যাডভোকেট ভিখিরি ওত পেতে বসে আছে। পিচুটি-ভরা চোখে চড়কি নাচে : কাগজে একবার চোখ বুলিয়েই বলে দেব কেস টিকবে কিনা। এই কোর্টে বিশ বছর প্র্যাকটিস করেছি। আচ্ছা না হয় এমনিই...।

দাদুশার্টের ঝুল হাঁটু অব্দি নেমেছে। আধময়লা ন্যাতার মতো কাপড়ে ঢাকা লিকলিকে পা। পায়ের মরা গুলি বেয়ে চ্যাটানো পাতা অব্দি কিলবিল শিরা। শেকড়বাকরের মতো ছড়ানো লম্বা লম্বা আঙুল। বহুকালের ছ্যাদলা জমা নোখ আর লোম। ন্যাতার মতো কাপড় ভেদ করে সব নজরে আসে। ওপর দিকে কিচ্ছু ঠাহর করার উপায় নেই। মাজার হাড্ডি থেকে ওপরটা গিলে খেয়েছে। উর্ধ্বাঙ্গ খেয়েখুয়ে সাফ করে দিয়েছে। লোকটা শব্দ করে সিঁড়ি ভাঙে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। মুখের ভাপ লেগে কাগজের টিপির আধ খাওয়া কোনা ওড়ে পত্ পত্ করে : হঠ্ যাও, হঠ্ যাও।

'শালার মগজ নেই'—প্যাংলা ধাঁচের একজন ফিনফিনে নাক নেড়ে বিরক্তিতে মোটা ঠোঁট ঝুলিয়ে দেয়। ছিনতাই কেসের আসরাফ হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠল : মগজে কাগজ ঠাসা। খাস্তা কাগজ। আবগারি কেসের এক আসামি গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। কোর্ট সেপাইর মোটা থ্যাবড়া নাক ধমক লাগাল : এ রসুল হাকিম আতা হ্যায়। আবগারি কেসের রসুল গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল : আউর ইধার গলা কাটা আতা হ্যায়।

মেটে রঙা দেয়াল ঘেঁষে চওড়া পুরোনো কাঠের সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে উঠেছে। আধো অন্ধকার। দোতলায় তিন-চারটে খোপ। হাকিম বসে। খোপের সামনে চেরা জিভের মতো লাল পর্দা দু-খানা লক লক করে। পর্দাটার দিকে হাজায় খাওয়া আঙুল মেলে ধরে সৌদামিনী: হ্যাঁ বাবা এইখেনে বিচার হয়? মস্ত বড়ো টিউমার সমেত গালটা কাত করে মানুষটা বলল: হ্যাঁ। সিঁড়ির শেষে কাঠের পাটাতনে হাজিরার বত্রিশ ভাঁজ মানুষ। হাজিরার লোকজন, পুলিশের কনুইর খোঁচা, বন্দুকের কুঁদো, সি আর পির বুটজুতো আর কোর্ট সেপাইর হাঁপের টানের মতো ডাক : হাকিম আতা হ্যায় সব চুপ হো যাও।

—হ্যাঁরে মানকে, নিতেকে তো আনলে না?

—নিতেকে আনবে না।

—ম্যাজিস্টার বিচার করবেনি!

—দেখলে না কাগজ নিয়ে উঠল একরাশ।

মানকের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। সৌদামিনীর ফুলতোলা পাড় মাথা থেকে খসে গেল। কাঁচাপাকা চুলের মাঝখানে এক খাবলা সিঁদুর। মানকের মুখের দিকে চেয়ে সৌদামিনী কিছু ঠাহর করতে না পেরে মুখটা হাঁ করে রইল। সুতোর মতো একটা লালার রেখা ঠোঁটদুটো জুড়েই ফট্ করে ফেটে গেল।

—গলাকাটা আতা হ্যায়!

আবগারির কেস খাওয়া রসুল গলার শিরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হাসতে লাগল। পানের পিক দেয়ালে ছিটিয়ে মুহুরির দল এক এক লাফে তিন তিনটে সিঁড়ি টপকে উঠছিল। পেছন পেছন একরাশ কাগজ উঠে আসছে। ঢাউস কাগজ। কে যে বয়ে আনছে দেখার জো নেই। খ্যাংড়াকাটি পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। বড়ো বড়ো নোখ এঁকে বেঁকে মাটি খাবলে ধরছে। সৌদামিনী মানকের জামার খুঁট ধরে টানল : মানুষ নাকি!

একদৃষ্টে কাগজের টিপি আর দড়ি পাকানো পা দুটো দেখতে দেখতে সৌদামিনীর মাছের পটকার মতো চোখ ফেটে যাচ্ছিল। ভিড়ের ভেতর থেকে চিকন গলায় কে যেন বলল : শালা দম আটকে মরবে!

একটা বোঁটকা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে, কাগজের টিপি নিয়ে সেপাই হাকিমের ঘরে লাল টকটকে পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় চালের কেসের ন-বছরের ডালিমকে লিকলিকে চ্যাটানো পায়ের পাতা দিয়ে লাথি মারল : হ্ঠ্ কুত্তির বাচ্ছা। মেয়েটা ফোঁস করে ঘাড় বেঁকাল। আবার হাঁক শোনা গেল থ্যাবড়া নাকের : হাকিম আতা...।

সৌদামিনীর নিকেলের চশমাটা পড়ে গেল। চশমা ছাড়া সে অন্ধ। খুনের আসামি ওসমানের কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে এক উকিল ফ্যাসফেসে কাটাকাটা গলায় বিড়বিড় করছিল : বেল যখন হয়েছে কেস চুকিয়ে দেবে। হাকিম পুলিশকে মালটাল খাওয়ানোর জন্য দু-তিনশো ছাড়। খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

—মাণিক!

—কী হল?

—আমার চশমা?

—ওফ্।

সিঁড়ির থ্যাবড়া মাথায় থুতনি রাখতেই সৌদামিনীর চোখ ফেটে জল গড়াতে লাগল। হরবোলা সৌদামিনীর মুখটা খুঁটিয়ে দেখছিল।

—এই আর একজন।

—এর কথাই বলছিলুম। সেই যে সেদিন পি সি নিয়ে গেল না।

—আহা!

—এতক্ষণে বোধহয় গুলি করে দিয়েছে।

—নকশাল?

—হুঁ।

হরবোলার লম্বা নাকটা ঠোঁট ছুঁয়েছে। এক গেলাস চায়ের আদ্দেক খেয়ে বটুর দিকে গেলাসটা আগিয়ে দিল—উঁ, নে। বিড়িটা ধরাল হাওয়া বাঁচিয়ে। ধোঁয়া ছাড়তে লাগল রয়ে সয়ে—এ ধান্ধা মাইরি ছেড়ে দেব। বটুর গলাটাও ধরে আসে : দিনরাত্তির এই দেখতে দেখতে আর ভালো লাগে না। শালা মেজাজ এমন চড়ে যায় কী বলব।

অ্যাডভোকেট ল্যাংড়া ভিখিরি সামনের হনুমানজির মন্দিরের গায়ের বটগাছটায় হেলান দিয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল : হাকিম শালা ভেরুয়া অ্যায়সা...। পুলিশের কথায় মোতে।

বটু হরবোলার খাঁচাটা হাতে নিয়ে পাখিটার পচন-ধরা ঘা দেখতে দেখতে বিড়বিড় করল : অ্যাডভোকেট আজ মাল টেনেছে।

৩

পুরোনো মান্ধাতার আমলের কাঠের পাল্লা হাঁ হয়ে আছে। পাল্লার দু-পাশে স্তম্ভের মাথায় ইংরেজ আমলের রাক্ষুসে সিংহ দুটো। কাক চিল শকুনে মরা হাড় আর নোংরা রক্তকানি এনে ফেলেছে সিংহের পায়ের কাছে। ধুমসো ভ্যানগাড়িগুলো কোর্টের পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায় পাল্লা ঠেলে। পাল্লা দুটো থ্যাবড়া ঠোঁটের মতো নড়ে ওঠে। ঢেকুর তোলার মতো একটা শব্দ হয়। আর হঠাৎ স্লোগানে স্লোগানে আদ্যিকালের বাড়ি থেকে চুন বালি খসে। আনাচে কানাচে চামচিকের পাখার শব্দ হয়।

গাড়িটা ঢুকতেই তালকানার মতো সৌদামিনী ছুটতে লাগল। বুকের পাঁজরা ঠেলে একটা ব্যথা উথলে ওঠে— নিতে রে, বাবা নিতে।

কোর্টের বাঁ হাতি লম্বা একটা ফালি চলে গেছে। পেচ্ছাপের কূট গন্ধ আর পুলিশের খিস্তিতে ঠাসা। লক আপ। গালে হাত দিয়ে ওইখানে সৌদামিনী নিতেকে খুঁজবে।

—বড়ো ছেলেটা আর আসে না।

—ভাইয়ের দরদ আর কতদিন।

—কে জানে তাকেও হাপিস করেছে নাকি।

—হতে পারে।

—সেই পি সি নিয়ে যাওয়ার পর তুইও তো আর দেখিসনি।

—নাহ্।

—এরা চেয়েছিল স্বর্গ টেনে আনতে।

—না। স্বর্গ বানাতে।

—ছেলেগুলো বেশ না'

—রাম বোকা।

হরবোলা এবার চটটা পরিপাটি করে বিছিয়ে নিল। খড়ি, পুথি সাজিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। বটু চায়ের গেলাসে চামচে নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করলে : মেয়েমানুষটা পাগলা হয়ে যাবে।

কাঠের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে সৌদামিনীর হাঁটুর খিল ভেঙে আসে। রক্তের মতো লাল পর্দা সরিয়ে হাকিমের ঘরে ঢুকতে গেল সৌদামিনী।—'যেখান থেকে হোক ছেলেকে এনে দিতে হবে' আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে পর্দাটা সরাতে গিয়ে মাথায় জড়িয়ে গেল। রক্তের মত পর্দাটা চোখের মণিতে লাল ছোপ ছিটিয়ে দিলে, সৌদামিনী আঁতকে উঠল—উঃ। মোটা থ্যাবড়া নাক কোর্ট সেপাই ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দিচ্ছিল : হঠ্ যাও। সৌদামিনীর চোখ ঠিকরে আসতে লাগল : আমার ছেলে নিতেকে কোথায় রেখেছিস? টাকমাথা ইনস্‌পেকটার হাকিমের কানে ফিসফিস করতে লাগল। হাকিমের চুলের টেরিটা কেবল নজরে আসে। পেনসিল আর কাগজের খসখস শব্দ।

সেই লোকটা আবার কাগজের ঢিপি নিয়ে উঠছিল। কিছুতেই লোকটার মুখ দেখার জো নেই। ফোঁস ফোঁস করে নামতে লাগল। চ্যাপটা পেছন দেখা গেল। বকের মতো সরু ঘাড়। ঘাড়ের পাশে মোটা নীল শিরা।

৪

সিঁড়ির ফাঁক ফোকরে অন্ধকার। দিনদুপুরে বাতি জ্বলে। তবু অন্ধকার যায় না। আধো অন্ধকারে হাঁটু চেপে মানুষজন বসে আছে। বিড়ির ধোঁয়া পাক খায়। পর্দাটা কাঁধ দিয়ে সরিয়ে ঢাউস কাগজ নিয়ে লোকটা হাকিমের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঢিপিটা কাঁপছে। মানুষটার মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে ঢিপিটা। রক্তে চোবানো নাড়ির মতো একটা লাল ফিতে দিয়ে বাণ্ডিলটা বাঁধা। লোকটা কুঁতে কুঁতে হাঁটছিল।

—নিতে কোথায়?

—কোন শালা?

—নিতের ওয়ারেন্ট কাগজ দ্যাখা।

—হঠ্, দেবো এক ধাক্কা।

—খুন করেছিস তাকে না?

—আচ্ছা ঠ্যালা।

—খুন করে বিচার!

—ভাগ শালি।

—রক্তে চোবানো নাড়ি কোথায় পেলি?

—চোখের মাথা খেয়েছিস।

—নিতের নাড়ি কেটে এনেছিস, খুন করেছিস তাকে না!

সৌদামিনীর মাছের পটকার মতো চোখ দুটোর দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে রইল হাজিরার লোকজন। গলার টিউমার নেড়ে সেই আধবয়েসি লোকটা বলল : ওর ছেলেকে বোধ হয়... কথাটার বাকি আধখানা গাঁক করে গিলে ফেলল। ভারী একটা গলা শোনা গেল: এরকম গুলি তো আকছারই হচ্ছে।

কাগজের পাহাড় নিয়ে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সৌদামিনী ঢাউস কাগজের মধ্যে ঝাঁপ দিল। দু-হাতে ফালা ফালা করে কাগজ ফাঁড়তে লাগল : কেসের নিকুচি, হাকিমের নিকুচি। কাঁচা পাকা একরাশ চুল কাঁধ বেয়ে বুকের দুপাশে ছড়িয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে। ছত্রাকার কাগজের মধ্যে লোকটার বুরবাক মুখ জেগে রইল : ভুরু, দাড়ি, গোঁফ, চুল কিচ্ছু নেই। মাকুন্দে। জিভটা নাকে ঠেকিয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ মাকুন্দে মুখ নেড়ে খ্যাক খ্যাক করে চ্যাঁচাতে লাগল। সরকারি কাগাজ কা উপার হামলা কর দিয়া—। দুদ্দার পুলিশ ফৌজ হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে লাগল। সৌদামিনীকে পিছমোড়া করে বাঁধা হল।

৫

তারপর থেকে কাগজের ঢিপিটা একপাশে হেলে থাকে। ঢাউস ক্ষয়াক্ষয়া কাগজের একপাশ থেকে খোঁচার মতো একটা কাঁধ উঁচিয়ে আছে। পা টেনে টেনে চলে লোকটা। আর বিড়বিড় করে : সব শালাকে খাঁচায় পুরবো। ওসমানের খুনের কেস মিটে গেছে। এখন একটা রেপ কেস ঝুলছে। ওসমান পিরীত করে ফাঁকা কাঁধটায় হাত রাখে : ওস্তাদ ঠ্যাঙের দুঃখু ভুলে লাও সিগারেট খাও।

হরবোলাকে বটু সাদা ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল : তাহলে নিতের মাকে পাগলি বানিয়ে চালান দিল।

—শালার ঠ্যাঙটা জন্মের মতো গেছে।

'শোন তাহলে'—বটু টোক গিলে রাজরাজড়ার এক গল্প ফেঁদে বসে।

ডেরা

কচি তালশাঁসের মতো মেয়েটার হৃৎপিণ্ডে কে যেন আমূল একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিল।

হিক্কার পর হিক্কা তুলে শরীরটা কাহিল হয়ে গেছে। এখন আর সাড় নেই। তিন বছরের মেয়েটার যে ঘরের টান এত পূর্ণিমা ভাবতেও পারেনি। শ্যালকুত্তারও একটা আচ্ছাদন দরকার। আর পূর্ণিমার মাথার ওপর এখন ভাদ্রের আকাশ। অথচ কী আহ্লাদেই না বাসা বেঁধেছিল। মেয়েটার কাঠির মতো আঙুল লক্ষ্মীর সরাখানাকে শক্ত ধরে রেখেছে। ভাঙা চৌকিটা টেনে বের করতেই মেয়েটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। তারপর একে একে যখন ছেঁড়া মাদুর ন্যাকড়ার পুঁটলি...আর অজিতের ডিউটির জুতো বের করে শিকলি তুলে দিল...পূর্ণিমার মেয়েটার হৃৎপিণ্ড ফালা ফালা করে তীক্ষ্ণ কান্নার খুন ফিন্‌কি দিয়ে ছুটল।

পূর্ণিমার অঢেল চুল অন্ধকারে মিশে গেছে। রুক্ষ চুলে গিঁট দিয়ে দিয়ে পূর্ণিমা দুঃখের হিসেব গেঁথেছিল। এখন সব জট পাকিয়ে একশা। অজিত এলে আর বলতে পারবে না: তুমি ছিলে না এই দ্যাকো...। এখন মানুষটা তো ফিরুক। টুটাফাটা পট্টি লাগানো জুতো জোড়ার দিকে চাইতেই পূর্ণিমার বুকের ভেতর পুলিশ ভ্যানের হারামি শব্দটা হামলাতে থাকে। অথচ এই সেদিন...ভোররাত্তিরে...অজিত জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে আঁট করে ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে, চোয়াল চেপে বলছিল : চারদিক দেখছ তো...আমার কিছু হলে সংসারটাকে তোমায় দেখতে হবে। পূর্ণিমার সেই সংসার এখন দুটো মেটে হাঁড়ির পাতিল, মেয়েটার ঝিনুক, কানা ভাঙা কাঁসার একখানা থাল, ফর্দাফাই মাদুর আর কোজাগরী লক্ষ্মীর পট নিয়ে আগুনের চাটুর মতো আকাশটার তলায় ভাজা ভাজা হচ্ছে।

মেয়েটা কীসের এক বেয়াড়া টানে সরাটা আগলে রেখেছে। টানাহ্যাঁচড়ায় চটলা উঠে গেছে। এই সরাখানা নিয়ে কত কাণ্ডই না হয়েছে। মানুষটা ঠাকুরদেবতা মানে না। আর পূর্ণিমার বুক কবুতরের পেটের মতো কাঁপত : ওকথা বোলো না! সব্বোনাশ! পূর্ণিমার চোখের ডিম ফাল দিয়ে উঠত কপালে। আর অজিতের ভরাট মুখখানায় কেমন একটা সোহাগের হাসি ছুট লাগাত তরতরিয়ে। পূর্ণিমাকে ভয় পাইয়ে অজিত কেমন মজা পেত। চাউলপট্টি রোডের খোলার চালার নীচে বসে মানুষটা থেকে থেকেই সব্বোনাশের পা আঁকত: বুটের লাথ দিয়ে আগে তোমার সরাখানা ভাঙবে। পূর্ণিমা ফোঁস করে উঠেছিল: ইস্‌ বল্লেই হল... ঘরে আঁশবটি নেই! দেখুক না ঘরে পা দিয়ে!

চাউলপট্টি রোডের শিরদাঁড়ার ওপর ম্যাচ ফ্যাক্টরি। পাতলা কাঠ-ছালের আনকোরা গন্ধ আর ম্যাচ ফ্যাক্টরির বারুদের ঝাঁজ ঠেলে ওরা খালপারের বস্তির জটলার ভেতর পরম ভরসায় ঢুকে পড়েছিল। প্রথম মাসের মাইনে হাতে পড়তেই অজিতের আর তর সয়নি। খালপারের বস্তিতে চামড়ার পট্টি আর রুটি-কারখানার চিমনির ফাঁসের ভেতর ডেরা বাঁধল ফুলকো গরম

রুটির মতো স্বপ্ন নিয়ে। লোনা-ধরা দেয়াল থেকে টিকটিকির ল্যাজের ঘষায় চুনবালি খসে পড়লে অজিত রহস্যি করে বলত : ফুলশয্যে কিনা তাই পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলে খালপারের ডেরায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঝরলে, গেলাস ফ্যাক্টরির ওয়ার্কার পূর্ণিমাকে বুকে ধরে রাখত : দেখি শালার বৃষ্টি কেমন ছোঁয়।

অযত্ন অচ্ছেদায় পূর্ণিমার পেঁজা তুলোর মতো চুলের রাশের ভেতর লিকির আস্তানা গজিয়েছে। ঘিলু অব্দি খুবলে খায়। অথচ পূর্ণিমার হুঁশ বলতে নেই। কী হবে ছাই চুল দিয়ে। যার জন্যে সব সেই মানুষটাই যখন নেই। বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়। নিজের শরীরটা, পেটটা, সব এখন বোঝার মতো লাগে। মেয়েটাকে নিয়ে সে এখন কোন চুলোয় যাবে। ছ্যাদলা পরা উঠোনের ভাঙা ইটের খাঁজে কলসিটা আছড়ে ভেঙেছিল। পানির একটা শীতল ছোঁয়ায় গোড়ালিটা এখনও ঠান্ডা। বাসা পালটালে নাকি কলসি নিতে নেই। পূর্ণিমা বাসা পালটায়নি। এক নির্মম দমকা বাতাসে মাথার ওপর থেকে আচ্ছাদনটুকু সরে গেছে। গেল তিন মাস ধরে যুঝে, নানান ফন্দিফিকির করেও রুখতে পারল না। ঠোঙা বানিয়ে, ফুরনে রবারের সুতো ছাড়িয়ে, কিছুতেই ডেরাটা বজায় রাখা গেল না। মানুষটা ফিরলে কী দিয়ে যে বুঝ দেবে। আবার মনে হয় মানুষটার হাত পা নিয়ে ফেরাটাই আসল কথা। বুঝ কীসের।

মেয়েটাকে শানের ওপর আলগোছে শুইয়ে ছড়ানো সংসারটা পুঁটলিতে বেঁধে ফেলল পূর্ণিমা। অজিতের ডিউটির জুতোজোড়া দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নিল। কপাল চাপড়ানোর টাইমও নেই। ডেরা একটা জোগাড় করতেই হবে। কোনোমতে জলঝড় থেকে মাথাটা বাঁচানো। না হলে মাসে একবার বিড়ি, চা আর গুড় জুটবে কোত্থেকে? আর কেউ যদি চোখের দেখাটাও না দেখে সেই বা যুঝবে কেমন করে? পূর্ণিমা কি ঢিলে দিতে পারে— যেমনি করে হোক দুদিক সামলে চলতে হবে। এমনি হাজার কথার জোরে পুঁটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটার জিরজিরে শরীর বুকের সাথে মিশে গেছে।

মাথার ওপর আগুনের ভাঁটার মতো ভাদ্রের আকাশটা নিয়ে, মাথা গোঁজার একটা ডেরার খোঁজে পূর্ণিমা। একরোখা ঘাড়টা কাত করে পাখির ডানার মতো ঝাপট মেরে চলল।

মানদা দরজার পাল্লা টেনে শিকলি তুলে দিচ্ছিল। এমন সময় এক হাতে পোঁটলা আর দুবলা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পূর্ণিমা এল। মানদার আর তিনকুলে কেউ নেই। একটা মানুষ গতর খাটিয়ে খায়। ভাগে-যোগে যদি মানদার সাথে থাকা যায়। ততক্ষণে মানদা শিকলি খুলে পূর্ণিমাকে সাপটে টেনে নিয়েছে ঘরের ভেতর : আর বলতে হবে না লো। এমন ভারী সময় কি একা কাটানো যায়? আর আমি কি তোর পর নাকি? নাকি তার নিজের পেটটা বড়ো হয়েছিল বলে লড়তে গেছিল? আমার সুকুমার বেঁচে বত্তে থাকলে তোর মতো একটা বউ আসত না ঘরে?... এই তো সেদিন সব বলছিল... দে... দে... মেয়েটার মুখখানা একেবারে আমসি...।

মানদার বুক থেকে স্নেহ ভালোবাসা দুধের মতো উথলে উঠছিল : যদ্দিন না ফেরে এই লড়াই তোকে চালিয়ে যেতে হবে... একলাটি কি পারা যায়...।

মানদার তিন হাত বাই তিন হাত ঘরখানায় পূর্ণিমা ফের সংসার পেতে বসল। কোজাগরী

লক্ষ্মীর সরা দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। আর রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে সুখ-দুঃখের দশটা কথা বলে, দুটো জীবনের অচ্ছেদ্দা আর ভরসার কথা বলতে বলতে একসময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

সক্কাল সক্কাল নেয়ে নেয় পূর্ণিমা। লাইনের কল। মানুষগুলো সাতসন্ধ্যায় ছোটে। তর সয় না কারো। জলদি জলদি চ্যান করে, তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে পূর্ণিমা ধোঁয়ায় ভাসে। চালডালে চাট্টি ফোটাতে ফোটাতে কত কথা মনে আসে। যে রাতে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেল, সেই রাত্তিরটাই বেশি করে মনে পড়ে। পূর্ণিমার শিয়রের বালিশটা ছিঁড়ে ফর্দাফাই করল। ওর ভেতর নাকি অস্তর আছে। শেষে একটা মানুষকে দশজন মিলে হাতকড়া পরিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে ভল্লুকের পেটের মতো ভ্যানে টেনে তুলল। সেই থেকে রাত্তিরটা পূর্ণিমা ভুলতে পারে না। দপ্ দপ্ করে মানুষটার শক্ত চোয়াল ভেসে ওঠে। রাত হলে বোলতার হুল ফোটাতে এখনো সারাটা পাড়ার বুকে পুলিশ ভ্যান দাপিয়ে বেড়ায়। আর পূর্ণিমার চোখের ডিম লাফায়, কে জানে কার ঘরে সব্বোনাশ হাত পা বিছিয়ে এল। মানদা বলে : দিনের বেলা তবু একরকম...কেবল পেটের চিন্তা...আর রাতের বেলা পুলিশের দাপট...দিনের বেলা পেট সামাল—রাতের বেলা জান সামাল...।

আজ মোলাকাতের তারিখ। মানুষটার দেখা পাবে এক পলকের জন্য। সারা মাসে ওই একটি বার। পরনের কাপড়খানা খার-কাচা করেছে। এখনো ভালো করে শুকোয়নি। মানুষটার যাতে দুশ্চিন্তা না হয় সেজন্য একটু সাফসুতরো হয়ে যায়। গোল করে পূর্ণিমা কপালে টিপ দিল। আবাগি মেয়েটা হঠাৎ ঘুম ভেঙে খ্যানখেনে গলায় কেঁদে উঠল। পাশের খোপ থেকে নিতের মার গলা শোনা যাচ্ছে। দজ্জাল মেয়েটাকে শাসন করছে নিতের মা : দ্যাখ, দেখে শেখ। ভাতারের জন্য বউটা থানাপুলিশ সাতঘাটের জল খেয়ে মচ্ছে...।

—অমন ভাতার হলে মাথায় করে রাখতুম!

বুঁচি সমানে জবাব দিচ্ছিল। ওর বর মদ টেনে এসে নিদ্দুম ঠেঙাত। বুঁচি কাটারি ছুড়ে মেরেছিল সহ্যি করতে না পেরে। নিতের মার আসলে গলায় বেজে আছে বলে বিদেয় করার ফিকির খোঁজে। বুঁচিই এই সেদিন মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বলেছিল : বুঝলে দিদি, ঘর বাঁধলেই কি হল, ঘরের মানুষ বেচাল হলে অমন ঘর থাকা না থাকা সমান। পূর্ণিমার বুকটা খাঁ-খাঁ করে উঠেছিল। পূর্ণিমা হেঁটে গেলে মানুষটা ব্যথা পেত। এই বুঝি পূর্ণিমার ফোস্কা পড়ল। বুঁচির গলা শুনে কেমন একটা গর্ব হল। সত্যি মানুষটা তার হেঁজিপেঁজি নয়। মহল্লার এক নম্বর পুরুষ। কে যেন বলে কথাটা—রাধুদা। কালই তো এসেছিল। খোঁচা দাড়ি আর লাগামছাড়া হাসি।

—এবার একটু চিনি পাওয়া গেছে, অকলেশ্বর মুলুক গেল, ওর কার্ডে...।

—খুব খুশি হবে!

—আর বোলো সবাই হাতের মুঠো চিবিয়ে খায়নি।

মোলাকাতের আগের দিন রাধুদা বরাবর আসে। দু-বান্ডিল বিড়ি, আর অন্তরের একটা টান নিয়ে। একথায় সেকথায় সময়টা তখন হু হু করে কেটে যায়। কার ছেলেটাকে জেলের ভেতর খুন করেছে... কোথায় নাকি মানুষজন হাড়গোড় জুড়ে এককাট্টার (রাধুদা বলে—

একাই) অস্তর বানাচ্ছে...। পূর্ণিমার শরীরটা তখন শক্ত হয়ে ওঠে। কেমন করে গুটি গুটি ও খালপারের ঘরে গিয়ে ওঠে। ডিউটি থেকে ফিরে, খেতে বসে হঠাৎ অজিত অমনি বলত: বুঝলে তোমাদের সেই কর্ণফুলি গাঁয়ে... এক বিরাট জলুস হয়েছে... জোতদারদের গোলা থেকে তামাম চাল টেনে...। পূর্ণিমা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত। হঠাৎ খুশিতে পেত। চালদখলের খুশি। অজিতকে খুশি করার খুশি। আর ছোটবেলার চ্যানের ঘাট নিয়ে কর্ণফুলি গাঁ হঠাৎ যেন গেলাস ফ্যাক্টরির চিমনির ধোঁয়ায় আব্‌ছা আব্‌ছা জেগে উঠত।

বিড়ির বান্ডিল আঁচলে বেঁধে পূর্ণিমা মেয়েটাকে কাঁখে নিয়ে উঠোনে নামল। ওই দু-এক বান্ডিল বিড়ি ছাড়া কুটোগাছাও নিতে পারেনি। অজিত হেসে বলেছিল—কমুন করে আছি তো... অত ভাবতে হবে না। ফিরে এসে পূর্ণিমা রাধুদার দিকে চোখ দুটো গোল্লা গোল্লা করে তাকিয়েছিল : কমুন কি? রাধুদাও জানত না। তারপর আপনা-আপনি পূর্ণিমা টের পেয়ে গেছে। এই যেমন মানদার সাথে পূর্ণিমা সুখদুঃখ ভাগ-বাঁটরা করে আছে, তেমনি।

ভাটপাড়া পুল অব্দি আসতে পূর্ণিমার বাটাজোড়া মুখ চুবসে যায়। মানুষটা যখন ঘরে নেই ছিরি দিয়ে কী করবে! বছর পুরতে চলল মানুষটা জেলে পচছে। অজিত এলে পূর্ণিমা তাকে কোথায় বসাবে? চাউলপট্টি রোডের ঘুপচিতে অ্যাদ্দিনে নতুন লোক এসে গেছে। রোদের কামড় এড়াতে পূর্ণিমা মেয়েটার মাথায় আঁচল চাপা দিল।

ভাটপাড়া পুল পেরিয়ে রাস্তাটা বাঁ হাতি ঢালু হয়ে নেমেছে। প্রেসিডেন্সি জেলের গা বেয়ে। পাঁচিলটা কি এক স্পর্ধায় ফাল দিয়ে আকাশটাকে ছুঁতে চাইছে। রোজই একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। তার কাঁটার বেড়া, সেপাই কোয়ার্টার, আর বেয়নেটের লম্বা ছায়া মাড়িয়ে কচি মেয়েটা এখন পূর্ণিমার হাত ধরে হাঁটছে। জেলগেটের সামনে সরু রাস্তায় মানুষের একটা ভাঙা ভিড়। কেউ কেউ তার কাঁটার বেড়ায় শীর্ণ আঙুল চেপে থুতনিতে হাত বোলাচ্ছে। খসখসে শুকনো মুখে মরা ঘাসে এক বিধবা হাঁটু ভেঙে বসে আছে : সুবলা আমার চানাচুর ভালোবাসে। কথাটা শুনে কে যেন মরিয়া হয়ে মৃদু হাসল।

পূর্ণিমা দুচোখের পাতা চিরে পাঁচিলটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। ভ্যান নিয়ে, জিপ নিয়ে হাওয়াই শার্টের ভেতর রিভলভার লুকিয়ে আসা যাওয়ার শেষ নেই। পূর্ণিমা আর বসে থাকতে পারে না। কখন যে সিলিপ্ ডাকবে তার তো কোনো মা বাপ নেই।

: আমার ছেলেটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে!

: আচ্ছা ওরা কি রক্ত টেনে নেয়?

: বৃটিশ পিরিয়ডেও এমন দেখিনি!

কথাগুলো সব কানে বাজছে। অথচ পূর্ণিমা একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। সিপাইসান্ত্রি লোকজন দেখতে দেখতে মেয়েটার চোখে ঢল নামছে। চিৎকার, রাইফেল, বেয়নেট, কালোগাড়ির শব্দ আর খিস্তির মধ্যেও মেয়েটার চোখে ঘুমের ঢল। আর পূর্ণিমা মনে মনে কথা সাজাচ্ছিল। বলবে— ভেবো না আমি ভালোই আছি। ঘরখানা ছেড়ে দিলুম। তুমি নেই শুধু শুধু ভাড়া গুনে মরব কেন। মানদা মাসির কাছে আছি। তুমি এলে পরে ফের ঘর নেব...। এত সব ভাবনার মধ্যে মোলাকাতের নামডাকা শুরু হয়ে

গেছে। ঢ্যাঙা এক সিপাই চোখ পিট পিট করে নাম ডাকছিল। অজিত কয়ালের নামটা ডাকতেই পূর্ণিমা ঘুমন্ত মেয়েটাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল। সাথে সাথে মেয়েটার ঘুম চটে গেল। পূর্ণিমা খাঁচার দিকে ছুটছিল। ডানদিক পানে বালির রাস্তার ওপর সি আর পি-র বন্দুকের হিম ঠান্ডা নল—কচি মেয়েটা সেদিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

খাঁচার ওপাশ থেকে একমুখ দাড়ি আর ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে অজিত এগিয়ে আসছে। গায়ের রঙ স্যাতা হয়ে গেছে। খোসপ্যাঁচড়া চুলকানিতে ভ্যাপসা অজিতের একটা হাত তারের জালটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল। আর ঠিক তখনই কানের পর্দা ফাটিয়ে সিটি বেজে উঠল গাঁ গাঁ করে। খাঁচার ভেতর মানুষটার মাথা থেকে রক্ত ফিনকি দিল। সিপাইরা ডান্ডা নিয়ে ছুটছে। পাঁচ হাতিয়া। অজিতের জামাটা ঝান্ডার মতো লাল...। পূর্ণিমা ভিরমি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছিল। মোলাকাতি জনতা সামলে নিল। সেপাইসান্ত্রির চোখের মণিতে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ উঠছে : পাগলি! পাগলি! জেলার আশমান তাক করে তিনবার ফায়ার করল। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল : পালাতে চেষ্টা করছিল। আর একজন খেঁকিয়ে উঠল : ঠান্ডা মাথায় খুন করছে!

যারা মোলাকাত করতে এসেছিল খেদিয়ে খেদিয়ে তাদের গেটের বাইরে নিয়ে এসেছে। একটা বাচ্চার হাত ভেঙে গেছে, তার কান্না চিৎকারে মিশে গেল। পূর্ণিমার মেয়েটা এতক্ষণ দম ধরে ছিল। হঠাৎ কাঁদতে লাগল। ধাক্কা খেতে খেতে মানুষগুলো সব এক জায়গায় শক্ত হয়ে ডেলা পাকিয়ে গেছে। এক বিধবা ছুঁচের মতো গলায় গেটটা চেপে কি যেন চিৎকার করে বলল। গেট পেরিয়ে হঠাৎ বিশু নামের ছেলেটার মা ছুটতে গেল। গোলগাল, ভরাভরা একজন জাপটে ধরল : উতলা হবেন না। কথাটা শুনেই পূর্ণিমা দপ্ করে জ্বলে উঠল : উতলা হবে না মানে! উতলা হবে না মানে কি!

রাত গড়িয়ে ফিরল।

চাউলপট্টি রোড অব্দি আসতে পূর্ণিমাকে অনেকবার জিরেন নিতে হয়েছে। নিতের মা চোবসানো প্যাঁকাটির মতো আঙুলে গেলাসটা আগিয়ে দিল—চিনির জলটুকুন খেয়ে নে মা। তারপর শুনছি। মানদার দাওয়ায় নিতের মা, মানদা, নিতের দজ্জাল বোন, রাধুদা সব পূর্ণিমাকে ঘিরে বসেছে। মানদা মেয়েটাকে কোলে টেনে নিল—ওদের মরণ হয় না! আর রাধুদা পূর্ণিমার শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে : মহল্লার সব মানুষের ডেরায় গিয়ে যা দেখেছ বলবে, শালারা কাগজে কাগজে মিথ্যে কথা লেখে... মানুষ জানুক...। আর মেয়েটাকে মানদার কোলে অঘোরে ঘুমুতে দেখে পূর্ণিমা ভাবে—ডেরা তুলে দিয়ে ভালোই করেছে...তার এখন কত কাজ...।

মানদার উনুনে আঁচ পড়েছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশে। এতগুলো মানুষের কথা জট পাকিয়ে, বস্তির মাথার ওপর দিয়ে, ধোঁয়ার মতোই আকাশের দিকে ছুটছে। কথাগুলো আর বোঝার জো নেই। নানান কথা জড়িয়ে পেঁচিয়ে, তালগোল পাকিয়ে, এখন একটা শক্ত ডেলার মতো।

জননী

হাতের ফানা ভেঙে থুতনিটা রেখেছে সে। চোখ দুটো ফটফটা সাদা। মিলের শাড়িটা মাটিতে লোটাচ্ছে। হুঁশ নেই। সে বেঞ্চের ওপর কোমল পা-দুটো তুলে বসেছিল। কপালের সিঁদুর ঘামে ভিজে এখন ঘন রক্তের ফোঁটার মতো। সামান্য চাপা নাকের ডগা বেয়ে ফোঁটাটা সূক্ষ্ম রেখার মতো নামছে।

—আপনি একা এসেছেন?

—হ্যাঁ, কেন?

—এদের কাছে একজন মহিলার একা আসাটা...!

—ও।

মাঝবয়েসি ভদ্রলোকের পুঁটিমাছের মতো চোখ দুটো ভীষণ ম্লান হয়ে গেল, ফ্যাসফেসে গলায় কথাটা বলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। আঁচলের খুঁট দিয়ে সিঁদুরগোলা মুছতে মুছতে মহিলা হয়তো একটু হেসেছিলেন। হাসিটা কারো নজরে আসেনি। কেবল ঠোঁটের বাঁদিক ঘেঁষে আবছা একটা গর্তের মতো দাগ জেগেই মিলিয়ে গেল।

বেঞ্চিটায় আরো অনেক স্ত্রী পুরুষ, বালবাচ্চা বসে। বেঞ্চে জায়গা না পেয়ে লম্বা টানা বারান্দার এদিক ওদিক ছিটিয়ে বসেছে কেউ কেউ। সম্ভ্রমের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে কেউ: আপনার কে? মহিলা মৃদু হেসে সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছিলেন। মাঝে মধ্যে এর ওর খোঁজ নিচ্ছিলেন। আহা! দেখবেন ঠিক বেঁচে আসবে।

—হ্যাঁ ভগবান আছে।

আবার একসময় হাতের ওপর ভর দিয়ে থুতনি রেখে কী যেন ভাবেন, চোখ দুটো সাদা দু-টুকরো পাথরের মতো হয়ে যায় তখন। আর সবাই তড়িঘড়ি স্লিপ পাঠিয়ে আনচান করছে। কিন্তু তাঁর যেন সবই জানা, একচুলও নড়লেন না, সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতার বিষণ্ণ বিধুর চোখ-মুখের সামনে মহিলার মুখ অত্যন্ত দৃঢ় ঠেকছিল। যদিও তাঁর বয়স বেশি নয়, যদিও তাঁর সারা মুখে এক আশ্চর্য হিমশীতল ভাব।

—আপনার নামটা?

তিনি গালের সেই অদ্ভুত গর্তটা জাগিয়ে হাসলেন।

—কেন?

—সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম লিখতে হয়।

—ঠিক আছে।

—বলুন...কী বললেন?

—বিজুর মা!

—আপনার নাম বলুন।

—ওই।

লোকটা যেন ঝাঁকানি খেল একটা। তারপরই চোখ তুলে চাইল। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল চোখ। সিধে হেঁটে চলে গেল। মেঝেতে চটির ঘষটানিতে ঘ্যাসঘেসে একটা শব্দ ওঠে। চটিটা সম্ভবত কাঁচা চামড়ার। বাতাসে একটা কূট গন্ধ ছড়িয়ে লোকটা চলে গেলে শাড়ির পাড়টা গোড়ালি অবধি টেনে দিলেন।

—আপনার ছেলের বোধ হয় খুব নাম ছিল?

—খুব!

মুখটা নাকের কালো তিল সমেত হঠাৎ ভার ভার হয়ে উঠল।

ম্যাড়মেড়ে সাদা ইউনিফর্ম সেঁটে সিপাইসান্ত্রির দল প্রত্যেক সিঁড়িতে যক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সজাগ পাহারা, ছুক ছুক চোখ। সিঁড়ি ডিঙোলেই তল্লাশি দিতে হবে। তিনি কিন্তু তল্লাশি নিতে দেননি। একজন সেপাই এগিয়ে এলে ম্লানভাবে হেসেছিলেন। প্রতিদানে ছোকরা সিপাইও হেসেছিল। তখনই তিনি গল্পটা বললেন। বহু পুরোনো গল্প।

'গল্পটা বলেছিলেন আমার ঠাকুমা। আমাদের এই সোনার দেশে কোত্থেকে এক আপদ এসে জুটল। আসলে তাকে বলা উচিত ত্রিপদ। বলতও লোকে তাই। বেজায় ঢ্যাঙা তিনটে পা ছিল তার। মানুষের তো দুটো পা থাকে...মানে সে ছিল সাক্ষাৎ শয়তান। মানুষ তাকে হত্যা করতে গেল। আপদের একটা চোখ পিত্তির ডেলার মতো গলে গেল। তখন ও ছলচাতুরি করে মিটমিট হেসে ভালোবাসার কথা বোঝালো তাদের। সবাইকে কি আর ভালোবাসা যায়? তুমিই বল! থাকগে, তা হল কী, এই আপদের আসলে নাম ছিল কুবের, সে ছলচাতুরি করে মানুষের সর্বস্ব কেড়ে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হল। তখন গিনি আর সোনার কাল। ঘড়ায় করে গিনি আর সোনা মাটির নিচে গর্ত করে পুঁতে রাখত। গরিবগরবা বাপ মা তার কাছে সন্তান বেচে দিত। কুবের তাদের উলঙ্গ করে ধূপ-ধুনো দিয়ে মাটির নীচে কবর দিত। দম আটকে জিভ ঝুলিয়ে শিশুরা মরত। মরে যক্ষ হত। আসলে তারা তো আমারই ছেলে মেয়ে...।' শেষ কথাটা বেহালার টানের মতো। সাদা চোখের জমিতে সেপাইসান্ত্রির বেকুফ মুখগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ছোকরা সিপাই উশখুশ করছিল।

—যান মা যান, অফ্‌সরকে বলবেন না।

কতকালের পুরোনো কিস্‌সা। এই পোড়া দেশের হাড্ডিসার মানুষজন কি আর এই বৃত্তান্ত জানে না। আসলে সেই নারীর মুখে কথাগুলো কেমন দিব্য জলজ্যান্ত হয়ে উঠছিল। ফচকে ছোঁড়াদের সাধ্য নেই ঠোঁট ওলটানোর। কে জানে সে হয়ত দু-পাতা আংরেজি কেতাব ঝাড়া বিদ্যেবুদ্ধির শিকড় উপড়ে ফেলবে : তোরা আমার পেটে হয়েছিস, আমি তোদের পেটে হইনি। বুঝলি?

সেপাইসান্ত্রির নাল-বাঁধানো বুটের খট খট শব্দ উঠছে থেকে থেকে। সঙিনের ডগা চিক চিক করছে সজাগ পাহারায়। হেডঅফিসটা প্রেতপুরীর মতো। কুবেরের ঐশ্বর্য আছে যেন আপিসটার চোরা কুঠ্‌রিতে। হেইই...হুঁশিয়ার। মুখের খসখসা চামে হাত বুলিয়ে, নানান ধান্ধায়

অল্পতে বুড়িয়ে যাওয়া একটা মানুষ বিড়বিড় করল : ছেলে করবে দেশোদ্ধার, বাপশালা পুলিশের লাথজুতো খাক্।

মহিলার শান্ত এবং যে কোনো নারীর মতোই অতিশয় সাধারণ চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল : সে তো কোনো অন্যায় করেনি! ছেলেরা অন্যায় করলে আগে ভাগে মার বুকে অমঙ্গল ডাকে।

ভদ্রলোকের মুখ থেকে বত্রিশ ভাঁজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে মরাচাম জেগে উঠল। নিরীহ স্যাঁৎসেতে চোখ দুটো তুলে মহিলার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে থাকল।

চারপাশে ঝকঝকে সঙিন লিকলিক করছিল। একজন গর্ভবতী রমণী তার গোবেচারা স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল : বেয়নেটের ডগায় নাকি শঙ্খচূড় সাপের বিষ লাগানো থাকে?

বুটের শব্দটা আবার জাগল। খটখট একটানা শব্দে জবাবটা হারিয়ে গেল। ফোকতাই খেয়ে ঢোস্‌কা চেহারার একজন ধুরন্ধর চোখের তারা নাচিয়ে ছ-ঘরার পিস্তল খুলছিল আর বন্ধ করছিল। যেন দেয়ালা করছে। টোটাগুলো বের করে হাতের থাবায় রাখল একজন অফিসার!

—রাম, দুই...।

টোটাগুলো গিন্‌তি করছিল। আর আড়িয়ামেরে সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতাকে দেখছে। চিম্‌সে মুখো এক সার্জেনের শ্বেতিধরা ঠোঁট চুলবুল করে উঠল, খানকির ছেলেকে এখনও জিন্দা রেখেছিস!

বেঞ্চে বসা মানুষজনের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখে মুখে ভয়ের কালো একটা ছোপ। মহিলার যেন ভয়ডর নেই। যেন কত মৃত সন্তানের সৎকার করে চোখের মতোই তার বুকটা পাথর হয়ে গেছে। কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না সে। কার কোলের শিশু কেঁদে উঠল।

মহিলা শান্ত কোমলভাবে বললেন : বাছাকে দুধ দিন। কথাটা ভয়ংকর শোনাল। দু-একজনের বুকে তাকত এল, ঠোঁটের কোণে হাসি জাগল একটু। এক ভদ্রলোক সহ্য করতে পারল না। ফস্ করে বলে ফেলল : এর মধ্যে দুধ!

আবার গালে সেই টোল, হাসি।

—আপনি মার দুধ খাবার সময় আশপাশ দেখে খেতেন নাকি? ভদ্রলোকের মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। গলা ফাটিয়ে একটা হাসির ছররা ছুটিয়ে দিল কেউ কেউ। তড়িঘড়ি সিপাইসান্ত্রির দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। দাবনা চাপড়ে একজন অফিসার তড়পাতে লাগল : অ্যাঁ, একেবারে প্রাণের বন্যা বইছে! দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে।

হাসিটা দমকা বাতাসে উড়িয়ে মানুষগুলো চুপ মেরে গেল। কিন্তু চোখের কোন চিকচিক করছে তখনও। বড়োকর্তার আর্দালি চটি ঘষটে ঘষটে আবার মহিলার সামনে এসে দাঁড়াল। একফালি কাগজ বের করে আমতা আমতা করতে লাগল : আপনি কার সাথে দেখা করতে চান?

—আপনাদের কর্তার সাথে।

—কোন্ কর্তা?

—অনেক কর্তা নাকি!

—হ্যাঁ। বড়ো কর্তা...মেজো কর্তা...সেজো...।

—বড়োকর্তার সাথে। তার ওপরে কেউ নেই তো?

—শোনেননি বাবারও বাবা আছে।

—আমি একেবারে খাস আদিবাবার সাথে দেখা করতে চাই।

—তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়!

আর্দালি হাত নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। এবার সকলে টের পেল লোকটার ছিট আছে। আসা যাওয়ার পথে থেকে থেকেই আঙুল নাড়ছিল— শালা লাইফের কোনো দাম আছে, ধুস!

অল্পে বাত্তিধরা মানুষটা গালে পর পর বত্রিশ ভাঁজ ফেলে ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। দোতলার কোণের ঘরটা থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে— নাহ, বলব না, না...না...।

—ছেলে কলেজে পড়ত।

—ও।

—কোনো অপরাধ করেনি!

—জানি।

—জানেন?

—হ্যাঁ!

মানুষটা ফ্যাল ফ্যাল করে মহিলার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। চাপা নাক। ছোটো হাঁ-মুখ। আর শ্যামলা বরণ। বয়েস অনুমান অসাধ্য। ধীরে ধীরে সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতা তার চারদিকে ঘন হয়ে গেল। এর ওর কথার জবাব দিচ্ছিলেন। অসীম ধৈর্য এবং মধুর ভঙ্গি। ক্রমে ক্রমে সবাই তাকে আপন করে নিল।

মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই। বিষুব অঞ্চলের নির্মম গ্রীষ্মকালীন সূর্য তাদের মাথার ওপর। রুগ্‌ণ একটা মেয়েমানুষ অসহায়ভাবে জিভ বের করে ঠোঁট চাটতে চেষ্টা করছিল। দুবার মাথাটা ঝাঁকিয়েই কাত হয়ে পড়ল, সাথে সাথে তিনি মেয়েমানুষটার মাথা কোলে তুলে নিলেন, একটু দুধ! রুমাল জবজবে করে ভিজিয়ে আনল একজন। রুমাল নিংড়ে নিপুণ হাতে তিনি রুগ্ন মেয়েমানুষটার চোখে দু-ফোঁটা জল দিলেন। ঢোলা, ছেঁড়া শার্ট গায়ে বুড়ো মানুষটা এতক্ষণ ঝিমোচ্ছিল। ভাঁড়ে করে সেই একটু দুধ নিয়ে এল।

—আপনি যাবেন কী করে?

—ওটুকু হেঁটেই যাবোখন।

আলাপ জমতেই মানুষটা সব বলেছিল। হাঁড়ি চড়ছে না। এমনিতেই পেট শুকিয়ে থাকতে হত অর্ধেকদিন। তার ওপর রোজগেরে ছেলেটাকে আটকে রেখেছে। সরকারের সাথে নাকি লড়তে গেছিল। বলুন দিকি। কেমন ধারা কথা? বলে এমনিতেই শালা মরে আছি, পা শুকিয়ে যাচ্ছে, দু-পা হাঁটলেই দম ধরে যায়। দিনভর যন্তর নিয়ে যুঝে পেটে দানা পড়ে নাকো। তার

ওপর পুলিশের ঝামেলি। বলে ছেলে নাকি লড়তে গেছিল...তা আমি বলি খেতে না পেলে মানুষ কী করবে? চিরকাল তো আর সমান যায় না!

মেয়েমানুষটার জ্ঞান ফেরাতে ফের দু-ফোঁটা জল নিংড়ে চোখে দিতে হল। তাঁকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাল। যেন এইভাবে বহু মুমূর্ষু প্রাণীকে ক্রমান্বয়ে বাঁচানোর চেষ্টায় তিনি পরিশ্রান্ত। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করল : আপনি খেয়ে এসেছেন তো? এ কথার উত্তরে মিহি গলায় একটি মেয়ে বলল, কী করে উনি খাবেন!

—কেন?

সন্তান অভুক্ত থাকলে মা কী করে খেতে পারে!

জনতা কথা বলছে খুব চাপা স্বরে। আর ভুবন ভোলানো হাসি দিয়ে তিনি মূর্ছিতাকে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছেন। মুখের কাছে দুধের ভাঁড়টা ধরেছেন। মিহি গলার মেয়েটা বত্রিশভাঁজ মানুষটাকে বলল : দেখেছেন, দেখেছেন ওনার চোখ দুটো! কী স্নেহময়, না। তারা সবাই একসাথে মহিলার দিকে তাকাল।

—ওরা আপনার কটা ছেলেকে পুরেছে?

—আমার সংসারটাকেই।

—কটা ছেলে আপনার?

—সাতটি।

—সাতজনকেই?

—হ্যাঁ।

—আপনার স্বামী?

—নিরুদ্দেশ।

—অদ্ভুত প্রশান্তির সাথে তিনি কথাটা বললেন। মৃত্তিকার মতো এই সহনশীলতা যেন তাঁর সহজাত।

তিনতলার চিলেকোঠার মতো জায়গাটায় আগুনের হলকা ছুটে আসে। আকাশটা আগুন ঢালছে। মাথার তলায় ইট দিয়ে এক বৃদ্ধা শুয়ে পড়ল। সেপাইসান্ত্রি অবিরাম টহল দিচ্ছে। অফিসার আর কর্তাব্যক্তিরা ঠোঁট জিভ রসে জবজবে করে পান চিবোচ্ছে। মানুষের রক্তের মতো ক্ষীণ তরল ধারা মুখের কষ বেয়ে নামে। তারা পকেট থেকে ধবধবে সাদা রুমাল বের করে পানের পিক মুছছিল।

সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতা ক্রমশ আরো ধৈর্য হারাচ্ছে। যেন বাঁধ ভাঙছে। ধীরে ধীরে বোধাবোধ লোপ পাচ্ছিল। দুজন সেপাই আর সার্জেন, ধোলাই ঘর থেকে এক তরুণকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তরুণের পাজামার ডান পা লালরঙে ছোপানো। ভীষণ দুর্বল একটা মানুষ বেঞ্চের *শেষ দিকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ ফ্যাকাশে আঙুল নেড়ে সে 'অন্যায়' শব্দটা উচ্চারণ করল। সার্জেন্ট আর সেপাই সাথে সাথে এক ঝটকা মেরে ঘাড়টা ফিরিয়েই খিঁচিয়ে উঠল:* কোন্ শালা রে! খানিক চোখ ঘুরিয়ে খোঁজে, কিন্তু ঠাহর করতে না পেরে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। কুত্তা যেমন করে সাতদিনের বাসি হাড় কামড়ায়। জনতা কাণ্ড দেখে হাসল।

মহিলাকে আগুনের কুণ্ডের মতো ভেবে জনতা তার চতুর্দিকে ঘন হয়ে বসেছিল। যেন খুব শীতার্ত রাতে এক আদিম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার শরীরে ওম দিচ্ছে। হঠাৎ ডাক এল তাঁর। ডাক ঠিক নয়, সেই আর্দালি বিড়বিড় করতে করতে এল কাঁচা চামড়ার গন্ধ নিয়ে—চলুন। বাতাসটা ফের কূট গন্ধে ভরে গেল। সকলের দিকে মধুর ভাবে চেয়ে সটান পা ফেলে আর্দালির পেছন পেছন চললেন।

অসহ্য উত্তাপ আর দুশ্চিন্তায় জনতা ভেঙে পড়ছিল। কে একজন হাতের ফানা কামড়াতে লাগল রাগে। এক সেপাইয়ের বুটের কাছে ইট মাথায় দিয়ে শুয়েছিল যে বৃদ্ধা তার পা চেপটে গেল। বুড়ি যন্ত্রণায় ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। কে যেন ধমকে উঠল : এ দেশে আর কি চান! মিহি গলার সেই মেয়েটার মুখে বিদ্যুৎ খেলল : জানেন আমাদের পাড়ার এক বুড়িকে জিপের পিছনে দড়ি বেঁধে টেনেছে!

বড়োকর্তার হিমঘর থেকে মহিলার গলা ভেসে এল : না ছেলেরা কোনো অন্যায় করেনি, সন্তান কোনো অন্যায় করলে আগে মার বুকে কু ডাকে। শব্দটা ধোলাই ঘর, সিঁড়ি আর থামের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। জনতার ভেতর থেকে একজন ঘোষণা করল: চুপ করুন! মা কথা বলছেন।

—মা!

—হ্যাঁ, মা।

...কখন অপরাহ্নের সূর্য হেলে পড়েছে। জনতা উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় গুম মেরে বসে আছে। অনেকেই সাক্ষাতের অনুমতি পায়নি। যাদের হয়ে গেছে তারাও নড়ছে না। কারণ মা এখনও ফেরেনি। সিপাইয়ের ডিউটি বদলে গেল : ডি সি আর কারো সাথে দেখা করবেন না। কেউ জবাব দিল না। অফিসার চলে যেতে বত্রিশভাঁজ ভদ্রলোক আপন মনে বিড়বিড় করলেন। মা এখনও ফিরছে না কেন? কী হতে পারে?

সেই ম্লান মেয়েটি নীল আতঙ্কে বলল : মাকে ওরা ধর্ষণ পর্যন্ত করতে পারে। কথাটা শুনে চোখের সাদা কোণ ফাটিয়ে ধোলাই ঘরের দিকে চাইল একজন : সহ্যের সীমা আছে!

—এখানে কী করবেন, হাত পা বাঁধা?

—তাই বলে...।

বেঞ্চি ছেড়ে তিতিবিরক্ত জনতা উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখে কথা জোগাচ্ছে না। বত্রিশভাঁজ ভদ্রলোক বললেন —ডি সি-র ঘরে যাব চলুন। কথাটায় কেমন আস্থা ছিল, ঝটপট সবাই ঘরটার দিকে মুখ ফেরাল। দু-একজন মেউ মেউ করছিল। সেই মেয়েটার রুক্ষ খসখসা মুখ শক্ত হয়ে উঠল : তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী? জনতা শামুকের মতো পায়ে পায়ে বড়োকর্তার ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। নিঃশব্দে। সেপাইসান্ত্রি, অফিসার, রাইফেল, পিস্তল কার্তুজ নিয়ে নির্বোধের মতো টহল দিচ্ছে। তড়পাচ্ছে। এর শেষটা কোথায় তারা কেউ আঁচ করতে পারল না।

ভুখ হরতালের একহপ্তা

আজ নিয়ে হপ্তা পুরো হল। দাঁতে দানা কাটছে না কেউ। পাঁচ ড্রাম ভাত পচে গেঁজে উঠেছে। বিশ শালিয়া ফারুক তাই চাড্ডি নিয়ে ফুটিয়ে চোলাই বানাল তিন দিনের দিন। সুদর্শন জমাদার তিন দিন পরেই দাওয়াই দিতে ফারুক আর জনা তিনেক সেপাই নিয়ে ওয়ার্ড থেকে সব চাঁইগুলোকে টেনে বের করে সেলে পুরে দিয়েছিল। তবু হপ্তাভর এই চলছে।

বড়ো জমাদারের খাকি ঢাউস হাফ প্যান্টের ভেতর দিয়ে ডোরাকাটা আন্ডারপ্যান্ট হাঁটু অবধি ঝুলে নেমেছে। গোচসুদ্ধু ধুমসো পা জলদি চালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল আর একটু হলে। গুমটির কাছ থেকে সেপাইরা চিল্লিয়ে ডাকছে : জমাদার সাহাব! ও জমাদার সাহাব! সুদর্শন জমাদার জানে গুমটিতে না গেলে ওরা মা মাসি তুলে খিস্তি দেবে। কিন্তু ফুরসত নেই। গুমটির তলায় সব গুজগুজ ফিসফিস করছে। লিভারের গোলমালে বড়ো জমাদারের মুখে কালো ছোপ পড়েছে। ফুটো, ফুটো। কোদাল দাঁত নিচের ঠোঁট ঢেকে থুতনিতে এসে ঠেকেছে।

অড়োহর ক্ষেতির আলে বসে বাপ বলেছিল : বেটা গাধার মতো মেহনত করবি, শুয়োরের মতো গিলবি, আর ভঁইসের মতো নিদ দিবি। সুদর্শন জমাদার কথা ফেলেনি। এখন সে একটুতেই ভঁইসের মতো হাঁসফাঁস করে। ডানহাতি লম্বা ফালির মতো টিনের দরজাটায় একটানা লাথ মারতে মারতে ঘেমে উঠল। গেট-সেপাই চাবির গোছার ঝম্ ঝম্ শব্দ তুলে ছুটে এল।

—শুয়ার কা বাচ্ছা শুনতা নেহি।

—দেখিয়ে জমাদার সাহাব!

—চোপ শালে!

খাকি টুপিটা হাতের থাবায় নিয়ে মেঝেতে ডান্ডা ঠুকতে ঠুকতে চলল। কুতকুতে চোখ দুটো এক ঝটকায় জেলগেটের লোহার গরাদের ওপাশে লোকজনের অস্থির ভিড়টা দেখে নিল।

হাঁটু মুড়ে থেবড়ে সব বসে আছে। শিশুদের মাথায় আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। হাত পা নেড়ে বিড়বিড় করছে। এখান থেকে একটাও কথা মালুম হয় না। কেমন একটা গুঞ্জন। শোকের চিহ্নের মতো কালো ছাতাগুলো মেলে রেখেছে। রুগ্ন এক যুবতী খালি এদিক-ওদিক ছুটছে। কী যেন বলে, গুম ধরে আবার গুঞ্জন ওঠে। দু-এক জনের মুখে বিরক্তির আঁচড় ফুটছে। দড়াপাকানো একটা মানুষ একসাথে দশটা আঙুল মটকে খিঁচিয়ে উঠল : উচ্ছন্নে যাক! শা-শা-লা। গরাদ মুঠো করে চেপে কে একজন প্রিয় জনের মুখ খুঁজছিল। গেট-সেপাই ডান্ডা দিয়ে গরাদে বাড়ি কষাল : শুয়ার কি বাচ্ছা!

বড়ো জমাদার গোদা পা নিয়ে নড়তে পারছে না দিনকে দিন যেন আরও পানি জমছে। ঠায় দাঁড়িয়ে বাইরের ভিড়টা খানিক দেখল। চোখ ফেরাতে পারে না। অত্তোগুলো মানুষ মিলে মিশে লেপ্‌টে কেমন রক্ত মাংসের একটা ঢেউ। হাত তুলে কেউ কেউ চিৎকার করছে। শাপমন্যি দিচ্ছে। বুকে ছ্যাঁকা দেয়। আর দাঁড়াল না তুরন্ত পা টেনে চলল জেলারের ঘরের দিকে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে মানুষটা। ধরাস ধরাস করে বুকের ভেতর কিল খায়। ফুলো পা টেনে অদ্দুর যেতে পারল না। মোলাকাতি বেঞ্চে ধপাস করে গতর ছেড়ে দিল। টুপিটা খুলে হাওয়া খেতে লাগল। খাকি উর্দি ফাঁক করে বুনো ঘাসের চাপড়ার মতো লোমশ বুকে হাওয়া করল (গরমি, বেজায় গরমি!)। ডান পায়ের গোদটা যেন দিনকে দিন আরো ঢোস্‌কা হয়ে উঠছে। ক-দিন যাবৎ বুট গলালেই চিগিড় দিয়ে ওঠে বেদনা। যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে। তারপর কী বেরোবে কে জানে, পানি না খুন?

—হেই... ই... ই... হঠ্।

ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দে বড়ো গেটটা খুলে দিল। কপালে হাতের পাঞ্জা ঠেকিয়ে দু-পাশে দুজন সেপাই সেলাম ঠুকছে। সাথে সাথে দু-পায়ের বুটে ঠোক্কর লাগিয়ে খট করে একটা শব্দ তুলল। আই জি-র ইজ্জত। জনতাকে হঠাতে সেপাইর দল মাথার ওপর এক চক্কর লাঠি ঘুরিয়ে নিল। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন সাদা আরশোলার মতো ভ্রূজোড়া কপালে তুলে মুখের একপাশ বেঁকিয়ে হাসল : আই জি আবার হ্যাট চাপিয়েছে মাথায়, এদিকে তো বামনবীর!

—টুপির জন্য চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গেছে।

— দেখতে পাচ্ছে!

—কানা!

ছাতাগুলো পট্ পট্ করে বুজিয়ে ফেলল। দু-একটা ছাতা এখনও মেলে রেখেছে পেছন দিকে হেলিয়ে। দিনভর একটু একটু করে রোদে চামড়া পুড়িয়ে মানুষগুলোর চেহারা কথাবার্তা সব কাঠ কাঠ হয়ে উঠেছে।

পেট ঠেসে সেলাম গিলতে গিলতে সব কর্তাব্যক্তিরা জেলারের ঘরের দিকে চলল। ততক্ষণে গোদা পায়ে ভর দিয়ে বড়ো জমাদার উঠে দাঁড়িয়েছে। জরুরি তলব। এসপার ওসপার হয়ে যাবে আজ। আজব ফ্যাসাদ। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুদর্শন জমাদার অজান্তে হাঁক দিয়ে উঠল— হেই...ই...ই...হঠ্। শেষে কোঁৎ পাড়ার মতো শব্দটা তলপেটের নিচে ঠেলে দিতে গিয়ে পানি ঢোস্‌কা গোদ ফেটে যাওয়ার দাখিল। কোনমতে সামাল দিল।

জেলারের চেয়ারে আই জি বসেছে। আই জি-র গায়ের রঙ ধবল রুগির মতো সাদা। আর একটুখানি নাক। ফুটকির মতো দুটো গর্ত।

—কী? কেউ খাচ্ছে না?

আই জি নাকে কথা বলে।

সুদর্শন জমাদার : নেহি।

আই জি : পাইপ?

জেলার : ঠেলে দিচ্ছে।

আই জি : ক-দিন হল যেন?

জেলার : সাতদিন।

আই জি-র নাকি গলা আর শোনা গেল না। হাল খারাপ ঠাহরে চুপসে গেছে। বিজগুলি নাকটা তিরতির করে কাঁপছে। শোলার টুপিটা খুলে ফেলল। কাঁচা পাকা দু-এক গাছা চুল সমেত মরার খুলির মতো মাথাটা বেরিয়ে এল। সুদর্শন জমাদার প্যাট প্যাট করে মাথাটার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে, দিমাগের কাম করতে করতে এই হাল। টেবিলের ওপর আই জি দু কনুই ভেঙে মাথাটা ধরে আছে। চক্‌চক্ করছে খোপরি। রূপোর টাকার মতো। প্রকাণ্ড মুখটা ভ্যাট্‌কে জেলার একটা হাই তুলল। নিচের পাটির দাঁতে কট্ করে একটা শব্দে বেঁকে গেল। সুদর্শন জমাদার আই জির খোপরিটা নজর করছিল আর ভাবছিল : জরুর একটা রাস্তা বাতলে দেবে!

—খুলে বলুন সব!

সোলার হ্যাটটা তড়াং করে মাথায় চড়েছে। নাকি সুর পাতলা সর্দির মতো গোঁফের ফাঁকে গড়ান দিয়ে নামল। বেড়ালের মতো রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ।

জেলারের ঠান্ডা শেতল ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো চামড়া ফেঁড়ে জেগে আছে। ছোট ঝকঝকে ঘরটায় চোখদুটো পিটপিট করে জ্বলছে। জেলার মাকুন্দো মুখ নেড়ে সুদর্শন জমাদারকে সমঝে রেখেছিল আগে ভাগে : তুম রিপোর্ট করেগা। বড়ো জমাদার গেট সেপাই হারাধনকে পটিয়ে বাংলায় লিখিয়ে নিয়েছিল। ফালি কাগজে। হারাধনও ছাড়ার পাত্তর নয়। এই মওকায় আগলা হপ্তায় হসপিটাল ডিউটি বাগিয়ে নিয়েছে। রুটি-মাখন চালান যাবে চিমসে পেটে। আর ঢোলা প্যান্টুলের পকেটে ওষুধ ঝাড়া দু-দশ রুপেয়া। জেলার বড়ো জমাদারকে চোখ মারল। সুদর্শন জমাদার তরাক্ করে পকেট থেকে কাগজের ফালিগুলো টেবিলের ওপর রাখল : এই যে স্যার!

আই জি : হ্যাঁ পড়ুন দেখি, বেশ...।

আই জি-র নাকি গলা পিষে, গোটা জেল কাঁপিয়ে আওয়াজটা হঠাৎ জাগল। দড়িয়া হাজত, সাতখাতা আর চোরাকুঠরির মতো অন্ধকার সেল থেকে ভুখা মানুষের গলা ডেলা পাকিয়ে ছুটে আসছে। টিনের গেটটা কাঁপছে। ঝন্ ঝন্ ঝন্।

—খুনি সরকার হো বরবাদ!

—হো বরবাদ! হো বরবাদ!

আই জি-র বিলাই গোঁফ খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা থেকে হ্যাটটা নামাতে গিয়ে একটু টেনেই ছেড়ে দিল। শরীলটা আলগা হয়ে গেল। আর হ্যাটটা নাকের ঠেকনা পেয়ে আটকে রইল। বড়ো জমাদার আই জি-র স্যাতা ঠোঁট দুটো নড়তে দেখল। ঠোঁট দুটো আপনি আপনি খুলছে আর জুড়ছে। ফলে একটা শব্দ ওঠে : ফট্ ফট্ ফট্। বড়ো জমাদার গোদা পা ঠুকে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল : হেই...ই...ই.:.হঠ্। বাইরে থেকে সাড়া দিল সেপাই, চাবি সেপাই আর তল্লাশির দুজন— হেই...ই...ই। বড়ো জমাদার উঁকি মেরে গেটের বাইরে গিঁট পাকানো

ভিড়টা দেখতে চেষ্টা করছিল। সব উঠে দাঁড়িয়েছে। সাদা রুমাল নাড়ছিল তারা। ভরা ভরা মুখ এক মহিলা চিৎকার করল : ওরা স্লোগান দিচ্ছে!

—আমাদের ছেলেরা!

—তাহলে ওরা জিন্দা আছে?

—এক হপ্তায় ওদের কী হবে, মায়ের দুধ খায়নি!

দড়িয়া হাজত থেকে হাড়গোড় ভাঙা বন্দিদের চিৎকারটা তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। শব্দটা কানের পর্দা ফাটিয়ে বুকের ভেতর পিটতে থাকে। সুদর্শন জমাদারের পানিখাওয়া ঢোস্‌কা পা টনটন করে। ওপরের পাতলা চামড়াটা যেন ফোসকার মতো ফেটে যাবে। আই জি রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ জিভ দিয়ে মুখের ভেতর টেনে দাঁত দিয়ে কাটছিল। সুদর্শন জমাদার ভড়কে গিয়ে জেলারের মেয়েমানুষের মতো মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গোদা পা অসাড়। টেনে তোলার ক্ষমতা নেই।

—নাড়া লাগানা হো গিয়া।

ঠোঁটের ডগা থেকে ঘাম মুছে সুদর্শন জমাদার হাই তুলল।

আর কোনো শব্দ নেই।

আর্দালি বেচু ঠান্ডা জল দিয়ে গেল।

আই জি চুক চুক শব্দে টাইম নিয়ে জল খেতে লাগল।

জেলার : কই দেখি!

আই জি : হ্যাঁ, পড়া হোক।

সুদর্শন জমাদার : লিজিয়ে।

আই জি টুপিটা মাথায় চাপিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের করে পুঁচকে নাকটা মুছল। সুদর্শন জমাদার ভাবছিল আই জি-র খোপরি নিয়ে। ঠিক একটা রাস্তা বাতলে দেবে। দিমাগওয়ালা লোক। আর জেলার গড়-গড় করে ধারাপাতের মতো পড়তে লাগল।

সুদর্শন জমাদারের রিপোর্ট

সেদিনটা ছিল এতোয়ার। রোববার। বকুলতলার পেছনদিকের বড়ো চৌকার লাগোয়া ফাইল থেকেই নাড়া উঠল। তার আগের দিনই মেদিনীপুর আর বহরমপুর জেল থেকে চালান এসেছে রাজনীতি কেসওয়ালা একগাদা। ব্রিটিশ জমানা থেকেই এমনিধারা কেসওয়ালা সব সাতখাতায় থাকে। তো এবার ওপর থেকে হুকুম ছিল কেউ নাড়া লাগাতে পারবে না (জেলার এখানটায় একটু থামল। আই জি চোখ বুজিয়ে শুনছিল। থামতেই ধড়ফড় করে উঠল : কী হল? জেলার ফালি কাগজে চোখ রেখেই বলল : আপনার কথা মতো আমরা বইপত্তর পড়া স্লোগান দেওয়া মিটিং করা সব নিষিদ্ধ করে দিই। ছিপিয়ে চলত তাও একটু আধটু)। একদিন গেল দুদিন গেল নাড়া আর বন্ধ হয় না। শেষে পেটানো শুরু হল। সেলে বন্ধ করতে লাগলুম। কিছুতেই সামাল দেওয়া যায় না। একদিন দেখি সেপাইরাও তাল দিচ্ছে। বাপ আমাকে বচপনে শিখিয়েছিল—বেটা গাধার মতো মেহনত করবি, শুয়োরের মতো গিলবি, আর ভঁইসের

মতো নিদ দিবি। কাম কাজ খাওয়া শোওয়া ছাড়া দিমাগ ঘামাই না। আর এ শালার সেপাইরা দেখি সব বাতচিত করে—কীসের লড়াই, তো কী হবে...সাত সতেরো। আমার কেমন সন্দ হল। ফের একরোজ সেল ঘুরতে গিয়ে দেখি সেপাই এক সেল থেকে আর এক সেলে চা পৌঁছে দিচ্ছে। তখন সাঁঝের টাইম। তো আমি জেলার সাবকে রিপোর্ট করলাম (জেলার হেসে ঘাড় নেড়ে নিল বার দুই)। তারপর আসলি বাত জানা গেল। জোর পুছতাছ করতে জানতে পারলুম ওই নাড়া লাগানোর জন্য এসব হচ্ছে। সাচ্চা বাত। এমন সব কথা বলে, একেবারে মানুষের ভেতরের কথা। বুকে ছ্যাঁকা লাগে। দু-চারজন সেপাইকে মানা করলুম বাতচিত করিস না। তো আমার ওপর তেড়িয়া হয়ে এল। এখন যদি সেপাইদের মগজে এসব ঢোকে তো সর্বনাশের ডানা গজাবে। তখন সেলে ঢুকিয়ে যারা আওয়াজ পয়লা তোলে এরকম দু-চারজনকে পিটিয়ে শুয়ার বানানো হল। ব্যাস। আর যায় কোথায়। নাড়া তো রোজানা চলছেই; তার ওপর ভুখ হরতাল। ওদিকে আবার বাপ মা ছেলে বউ কাচ্ছাবাচ্ছা গেট আগলে বসেছে। তুরন্ত কোনো ব্যবস্থা না হলে আমরা ডিউটি করতে পারব না...।

শেষের দিকে কি একটা আর্জি ছিল। জেলার আর সেটা পড়ল না।

আই জি-র চোখ দুটো তখনও বুজে আছে। সুদর্শন জমাদার আই জি-র কাছিমের খোলের মতো মাথাটার দিকে চেয়ে ভাবছে : দিমাগওয়ালা আদমি। এমন দাওয়াই দেবে সব সিধে হয়ে যাবে। ভাবতেই, একটা লম্বা হাই উঠল।

আর্দালি বেচু কপাটটা ফাঁক করে ভেতরে চুপি দিল। কাতলা মাছের মুখের মতো কপাটটা ফুট কাটছে। প্যাংলা হাতটা বাড়িয়ে জেলারের হাতে এক ফালি কাগজ দিল : বাইরের লোকজন ছিল। কাগজের ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা : ভুখ হরতালের হক দাবি মানতে হবে। আই জি-র বিজগুলি নাকটা বারবার কুঁচকে যাচ্ছিল চিঠিটা পড়তে পড়তে। জেলার কাগজখানা না পড়েই আই জির হাতে দিয়েছিল। এখন খুঁটিয়ে আই জি-র মুখটা দেখছে। যেন অক্ষরগুলো গেলার পর আই জি-র মুখে তার ছাপ পড়বে। আই জি দু-বার গলা খাকরি দিল। কাগজটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রাখল। মুখ খুলল একটু পরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে : ওরা নড়বে না বলছে।

—লেকিন সাব...।

জেলার আধখানা হাত তুলে বড়ো জমাদারকে রুখে দিল।

সুদর্শন জমাদার ড্যাবড়া চোখে আই জি-র দিকে তাকিয়ে আছে। আসলে দেখছে খোপরিটা।

দেয়ালের গায়ে টিকটিকির ঢাউস পেটটা ধুক ধুক করছে।

—'হ্যাঁ শুনুন। ওরা চেঁচিয়ে স্লোগান দিচ্ছে এই তো। জমাদার বলছে সেপাইদের দিমাগ বিগরে দিচ্ছে। ঠিক আছে। কিন্তু ওদের স্লোগান যদি কেউ না শোনে...। কেউ মানে সেপাইরা।'

আই জি কথাটা ঝুলিয়ে দিল। চোখ দুটো পিটপিট করছে। জেলার আর জমাদারের মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

জেলার : মানে আপনি বলছেন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বোমার আওয়াজ থেকে বাঁচতে সবাই কানে তুলো গুঁজে দেবে।

সুদর্শন জমাদার : কা তাজ্জব বাত!

আই জি : না তুলো দিতে হবে না, কানে আঙুল দিলেই চলবে।

সুদর্শন জমাদার : ডান্ডা কী করবে!

আই জি : কোমরে ঝুলিয়ে নেবে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জেলার বেল টিপে আর্দালি বেচুকে ডেকে চা আনতে বলল। আর সুদর্শন জমাদার আই জির পাকা বেলের মতো মাথাটার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। যেন খালি চোখে খোপরি ফাটিয়ে মগজের তেলতেলে পদার্থটা দেখতে পাচ্ছে!

পরদিন সকালে জেলগেটের ভেতরে ডান পাশে, ডি ও-র টেবিলের ওপর দিকে নাটা বেচু টুল লাগিয়ে নোটিসটা মেরে দিল। আর নোটিস পড়তে পড়তে সেপাইদের মুখ বিলকুল বুরবাকের মতো হয়ে যায়। ফের বানান করে পড়ে :

অন্দর ডিউটি করার টাইমে সব সেপাইকে দু-কানে আঙুল গুঁজে রাখতে হবে। নিয়ম না মানলে সাথে সাথে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

স্বাক্ষর

আই জি।

অকালবোধন

নবমী তিথি। কাঞ্চন, জবা, মল্লিকা, মালতী, আর রক্তের ফোঁটার মতো গাঢ় লাল অশোক ফুলের ডালিতে দু-ফোঁটা নোনা ঘাম ঝরে পড়ল। কপাল বেয়ে এঁকেবেঁকে এসে টস করে ফুলের ডালিতে ঝরে পড়ল সেই ঘাম। দুবার, পরপর। অকালে দেবীর আরাধনায় মগ্ন রামচন্দ্রের কপালে কুঞ্চন। সৃষ্টির মাতা সুপ্রসন্ন হলেন না তথাপি। মঙ্গলের আকণ্ঠ আকাঙক্ষায় অকালবোধন বুঝি ব্যর্থ হল। আবাহনে দেবীর মন টলল না। তখন বিভীষণ বললেন, অষ্টোত্তর শত নীলপদ্মে পুষ্পের ডালি সাজতে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ছেঁচে পাহাড় সমুদ্র আর সমতলভূমি চষে রামচন্দ্র নীলপদ্ম ছিঁড়ে আনলেন। জলদগম্ভীর স্বরে সৃষ্টির মাতার স্তুতি গাইতে লাগলেন। মাতা প্রসন্ন না হলে বন্দিনী প্রিয়ার মুক্তি অসম্ভব। কাশফুলের বনে মৃদু বাতাসের দোলা, চাতুরি করে দেবী লুকিয়ে ফেললেন একটি পদ্ম। তপস্যা বিফলে গেল বুঝি, ইহজীবনে বোধ হয় আর চার চোখের মিলন অসম্ভব, মানুষের পবিত্র শ্রম বুঝি কোনো নিষ্ঠুর মুনির শাপে ভস্ম হল। গাণ্ডীবে টঙ্কার জাগালেন বীর, আসমুদ্রহিমাচল সেই শব্দ বুকে নিয়ে সৃষ্টির যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে লাগল। আর শোনা গেল বীরের কণ্ঠস্বর :

কমল লোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
একচক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে॥

রাতভর ইঁদুরপচা ভ্যাপসা গরমি, আর ভোর রাতে হৃৎপিণ্ডে বরফ জমানো বাতাস চাবুকের মতো সপ্ সপ্ শব্দে পাঁচিল টপকে এসে সেলের ভেতর ধামসে পড়ে।

তখন ভোর হয়। ভোর হয় মঙ্গলের আধকানা চোখের টাটানিতে। জেলগেটে ডিউটি বদলের পুলিশি বুটের মচ্ মচ্ শব্দে। রাতভর গরমি কুত্তার মতো খোঁচ পেটে হাঁপায়। আর ভোর রাত্তিরে গরাদ দিয়ে এসে ঠান্ডা বাতাস হামলায়। তখন মঙ্গলের হাত-পা কুঁকড়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে আসে। অথচ চুলকানির ভয়ে কম্বলটা টেনে নিতে পারে না। কম্বলের খসখসা রোঁয়ার কথা ভেবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কানা চোখটার কথা ভাবে। সারারাত মশা থাবড়ে আর হাজার কিসিমের ভাবনায় জাগান দিয়েছে। এখন আধকানা চোখটা জ্বালা যন্ত্রণায় মঙ্গলকে খুবলে খাচ্ছে। জাগ ধরে উঠেছে। জল কাটছে। মঙ্গল জানে চোখ জোড়া খোয়াতে হবে। একটার সাথে আর একটাও ধরেছে। এখন মেটলির টুকরোর মতো লাগে পাঁচিলটা। এখন আর ও সাফসুফ দেখতে পায় না। রাত কাটে গরমিতে, ঠান্ডিতে, চোখের টাটানিতে। আর মজবুত স্বপ্নের গাঢ় রঙে।

সেদিনও তাই। ঘুম এসেছিল এক্কেবারে শেষকালে। বেহুঁশ ঘুম। আসলে তো ঘুম নয়, বেহুঁশ হয়েছিল মরার মতো। তখন থেকেই গরাদের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বরফের ছুরির মতো ছালচামড়া ছাড়িয়ে শিরদাঁড়ায় গিয়ে বিঁধছে।

পয়লা বাইশ সেলের হুড়কো টেনে জমাদার রাবণের গলা গাঁ গাঁ করে ডেকে উঠল সাইরেনের মতো :

এ পয়লা বাইশ গিন্‌তি...ই...ই... গি...ন...তি...গি...ই...।

চাবির গোছা নিয়ে জমাদার জেলখানার একছিটে স্বস্তি অসাড় বেবশ ঘুমের গলা বুটের তলায় পিষে হাঁক দিয়ে ওঠে। সার সার মানুষ খোপ থেকে ছুটে আসে চোখের পিচুটি নিয়ে। উবু হয়ে বসেই অর্শের যন্ত্রণায় মহিমদা দাঁতে দাঁত ঘষে। আর জমাদার লাঠির লোহা বাঁধানো ডগায় গিনতি করে : রাম দো... তিন...এ শালা সিধা হো যা... ফিরসে...রাম...দো...তিন...। চোরুয়া ফিরোজ তো উবু হয়ে বসে একদিন হেগেই ফেলেছিল। আর সেই হালতে ডান্ডা চলল।

নামতার মতো সেপাই জমাদারের গিনতি এগোয়। আর ডান্ডা ঠোকার একটা শব্দ। শব্দের প্রতিধ্বনি।

বাইশ... বাইশ... হাঁ... চোওবিশ... চোওবিশ। গিনতির সংখ্যাগুলো গেলার জন্যে পাঁচিলটা হাঁ হয়ে আছে। গাঁক করে গিলে ফেলে। আবার উগরে দেয়।

রাত দুটোয় একবার দফা বদলি হয়। সেলের চোরাকুঠরির মতো ছোট্ট দরজাটা ঠেলে নয়া সেপাই হাঁক দেয় : হেইই। ডিউটি সেপাই মা তুলে খিস্তি করে। মঙ্গল তখন গরাদের ফাঁক দিয়ে দুটো ঠ্যাঙ বের করে গরমির হাত থেকে রেহাই পেতে হাঁসফাঁস করে। তখন ঘণ্টা বাজে। দুটোর ঘণ্টা। মানুষটা জাগান দেয় তখনও। এখন শুক্লপক্ষ। মজুরের হাসির মতো ফটফটা জোছনায় জেলখানাটাও নেয়ে ওঠে। গোটা পৃথিবী আড়াল করে পাঁচিলটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইট, চুন, বালি, সিমেন্ট মিলে কংক্রিটের এই পাঁচিলটা যেন জ্যান্ত হয়ে যায়। মঙ্গলের ঝাপসা চোখে, একটা বিরাট মুখ ভেসে ওঠে। যেন গিলতে আসছে। টাওয়ারের ওপর সেপাইর সঙিনের ডগায় জোছনা খেলছিল। লকলক করছিল সঙিনটা। টাওয়ারের ওপর বন্দুকধারী সেপাইটা রোজ ঢোলে। ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ ধরফরিয়ে উঠে বন্দুকটা হাতড়ায়। এসব দেখতে দেখতে রাত কাবার হয়ে আসে। তখন আর চোখ টেনে রাখতে পারে না। আর জাগান দিতে পারে না।

আকাশটা চাঁদোয়ার মতো মাথার ওপর টানানো। মেঘ। আর রঙ। কখনও পেঁজাতুলোর মতো মেঘে ভয়ঙ্কর জন্তুর ছবি জাগে। আবার মানুষের মুখের আদল আসে। আকাশটা ঢাকতে পারেনি। অথচ মঙ্গলের দেখতাই পাঁচিলটা চড়চড়িয়ে তিন হাত ওপরে উঠে গেল। ভুখ হরতালের পর একদফায় এক হাত উঠল। ফের দু-দফা গোপন সতর্কতায় আরো দু-হাত। অশোক গাছটা আর নজরে আসে না। গাছটা কী এক আহ্লাদে পাগলের মতো চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছটার দিকে মঙ্গল ঠায় চেয়ে থাকত। এখন গাছটা মালুম হয় না। কেবল অশোক ফুলের লাল ফুটকিগুলো পরপর মিশে কেমন একটা থ্যাবড়া লাল ছোপ জাগে।

পাছার চুলকানি পুঁজ আর রসে জাগ ধরে উঠেছে। পাশ ফিরতে ফেটে গেল। দপ্‌ দপ্‌ করে টাটাচ্ছে এখন। মিলে স্পিনিং মেশিনের হাতল টানতে, যন্তর নিয়ে লড়তে গিয়ে কেটে

ওয়ার হয়ে গেছে কতবার। দু-দিন না যেতেই মিলিয়ে যেত। পুলিশের খিস্তির মতো চুলকানির চেয়ে তার ভোগান্তি ঢের কম। দুসরা গিনতি এসে গেল। মহারাজ জমাদার। পায়ের শব্দেই আঁচ করল। মঙ্গলের কান দুটো তুখোর হচ্ছে দিন দিন।

—এ...বাহার নিক্‌লো...।

দোসরা গিনতি এসে গেছে। মঙ্গল লাফ দিয়ে উঠল। পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হবে এখন। ফাইলে দাঁড়িয়ে বিজু ফিস ফিস করে গত রাতের স্বপ্নটা আধো আধো বলবে: দেখলুম কত মানুষ...লাখ লাখ...গেটটা উপড়ে ফেলছে, পাঁচিলটা বিদ্যুতের কড়াৎ কড়াৎ শব্দে ভেঙে দু-খান...ভীষণ লড়াই...বিজু রোজই এক স্বপ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কমসেকম দু-বার মহারাজ সেপাই গিনতিতে গলতি করবে। রামচন্দর মেট সব বাতলে দেয়। ফালি কাগজের ছোট্ট খাতা খুলে জমাদার হিসেব করল। পেনসিলটা গোঁফে ঠেকিয়ে। শেষে মুদির মতো ডিউটি সেপাই আর মেটকে সমঝে দিল : তব চাল্লিশ রহা।

পাশের সেলের মহিমই কথাটা বলল। পাঁচিল নাকি আরও এক হাত উঠবে। আই জি বলে গেছে। মোলাকাতের মওকায় সেলের বাইরে গিয়েছিল মহিম। তখনই জানতে পারে।

—হঠাৎ!

—কী সব খবর আছে নাকি!

—ও।

—এবারে আকাশটাও জেলে পুরবে।

কানাপোকা ছোলার নাসতা ডালায় চেপে এল! পেটের জ্বালায় তাই চিবোবে। আবার থু থু করে দেয়ালে ছিটিয়ে দেবে। সুবলা সবটাই মেরে দেয়। ছেলেটার ধাত কড়া। মঙ্গলের নাম গলতি করে একবার রাইটাব ডেকেছিল। সুবলারও মোলকাত। খাঁচার জালে আঙুল ছড়িয়ে বুড়ো বাপকে বলল : জেল তো আমাদের জন্য ইউনিভার্সিটি। মঙ্গলের মোলাকাত হয়নি। বুঁচি আসেনি। কী যে হল বউটার। মরে হেজে গেলেই বা কে খোঁজ করছে। বচ্ছর ঘুরতে চলল।

ডান্ডাবেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে মাস্টার ঘষটে ঘষটে পায়চারি করছিল। সুবলা তখনও পাঁচিলটায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাস্টার জলদি পা টেনে টেনে সামনে এল। চুরুটের পোড়া দাগটা কাঁপিয়ে মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল।

—চোখ কেমন?

—কী জানি।

—আবছা দেখছো?

—হুঁ।

—দেখতে পাচ্ছ তো?

—একটু একটু পাই এখনও।

মঙ্গলের মুখটা দু-হাতের থাবায় শক্ত করে ধরে মাস্টার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মঙ্গলের চোখের মণিতে মাস্টারের গালের শ্বেতির মতো দগদগে পোড়া দাগটা ভাসছে। দাগটা ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে। গরম নিশ্বাস পড়ছে মঙ্গলের কপালে, গালে। মাস্টারের বুকের

ধুক্ ধুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে মঙ্গল। আর মঙ্গলের ভ্যাপসা চোখ দুটোয় অজস্র সূক্ষ্ম শিরা আর আঁশের মতো সাদা ডিম দেখতে দেখতে মাস্টারের চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠে। রাগে শুকনো ঢোঁক গেলে—শিশির মাড়াতে পারলে—। মানুষটা তখনও হাঁফাচ্ছে।

—শিশির!

—হুঁ।

মঙ্গল ফের মাথাটা পাঁচিলে কাত করে দিল। ঠ্যাং দুটো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিল। কানের কাছে বিড়িটা ঘুরিয়ে আগুনের ধান্ধায় চারদিকে চোখ ঘোরায়। আর মাস্টার মাথাটা মেঝের দিকে ঝুঁকিয়ে ডান্ডাবেড়ি ঘষটে সিধে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। স্কুলের ছেলে চোদ্দ বছরের বিজু সাথ দিল। ফিসফিস করে ঘাড় নেড়ে কী সব বলে চলল। বোধহয় গত রাতের স্বপ্নের কথা। শোনা যাচ্ছে না। সেরেফ বিজুর ঘন ঘন হাত নাড়া আর দু-একটা ছেটকানো কথা থেকে মঙ্গল আন্দাজ করল তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। লঙ্কা বাটার ছ্যানছেনে জ্বলুনি আসে কথা শুনলে : পায়ের তলা ডান্ডা দিয়ে ফেঁড়ে ফেলেছিল। হাজার নিংড়ানিতেও কথা বের করতে পারেনি। পা ফুলে ঢোল হল। সেঁকা রুটির মতো। তাতেই তো চোখটা...।

সেলের কোণে সুবলা ছিপিয়ে চা বানাচ্ছে। লাল চা। এখন আধা ঘণ্টা ছাড়। তারপর মহারাজ জমাদার ফের বেঁকা লাটি ঠুকে ছেঁচড়ে আসবে। ছ্যাঁচড়ানির বিচ্ছিরি একটা প্রতিধ্বনি জাগবে পাঁচিলে ঠিকরে। মঙ্গল টিনের মগটা আগিয়ে ধরে জুলুজুলু চোখে সুবলার দিকে তাকিয়ে আছে। সুবলা তেড়িয়াভাবে ঘাড় নাড়ল : চা খাওয়া বারণ না তোমার! শেষে মায়া হল, খানিকটা ঢেলে দিল : মরগে যা আমার কী! ফুরফুর করে ঘুরে ঘুরে চা খাচ্ছে মঙ্গল। আর মাস্টার চোখ বুজিয়ে গান ধরেছে : লাখো লাখো করতাল হরতাল হেঁকেছে...হরতাল...। সেপাই মুখ খারাপ করতে গেলে, সুবলা হুমকি দিল : হুঁশিয়ার!

মঙ্গল আবার পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসেছে। মনটা উথালপাথাল হলেই ও পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসে। মাথার চাঁদিতে গোল করে রোদ পড়েছে। মহিম এসে হাত ধরে টানল : ওঠ। সুবলার সেলের সামনে টেনে নিয়ে গেল। পা মেলে ছড়িয়ে বসেছে সব। আর খসখস করে ঠ্যাং চুলকোয়। এখনও কাগজ আসেনি, তাই সব উড়ু উড়ু। কাগজ আসামাত্তর মৌমাছির মতো চাক ধরে উঠবে সব। কাস্তের ধার নামবে চোখের তারায়।

—আলিপুর জেলে আবার পিটিয়েছে!

—এই দ্যাখ সুবলা, দক্ষিণ রেলে ধর্মঘট!

—সাবাস! সাবাস মজদুর ভাই!

তরতাজা সবজির টাটকা গন্ধ নিয়ে কাগজ আসেনি এখনও। আজ সব আনচান করছে তাই। ওদিকে খাঁচায় পোরার সময় হয়ে এল। দেড় ঠেঙে জমাদার পেতলের চাবির গোছা নাকের কাছে নাড়ছে। একটু বাদেই মেটকে সাথে নিয়ে তল্লাশি চালাবে। মোলাকাতের লেবুটা এই মওকায় ঢোলা পকেটে চালান করে দেবে। সিগারেট হাতানোর ধান্ধা করবে। লন্ডভন্ড করে ফেলে আজব সংসার। সুবলা মঙ্গলের দিকে ঘেঁষে এল। চোখের মণি ঘুরলেও কিছুতেই

মঙ্গলের মুখের দিকে চাইতে পারে না। নটার সিটি ফুঁকে দিল। মহিম সেপাইকে ছিপিয়ে একটা বই নিয়ে চট করে সেলে ঢুকে পড়ল।

—মাস্টারদা বলছিল...।

—কী?

—সবুজ গাছপালার দিকে তোমার তাকানো উচিত।

—আর?

—আর কী!

—শিশির মাড়ানো?

সুবলার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে মাড়িতে জড়িয়ে থাকে। কথা সরে না মুখে। শুধু জ্বলে। গোটা শরীরটা জ্বলে। ওদিকে মঙ্গল ঠোঁট ঝুলিয়ে একটু হেসে, গড় গড় করে বলে চলল: গাছের পাতার সবুজ রঙে এমন একটা জিনিস আছে, যা রোজ দেখলে চোখের পুষ্টি হয়...আর শিশির হল...।

সুবলা চুপ মেরে গেছে। আর কীই-বা বলার আছে। চোখের সামনে একটা মানুষ...। সুবলার চোখ ছল ছল করে ওঠে। আজকাল ওরা মুখের দিকে তাকাতে পারে না। নিঃসাড়ে বিড়ির রেশন দেয়। ছটা বিড়ি রোজকার বরাদ্দ। জমাদার বন্ধ করতে করতে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁচড়ানির শব্দ সমেত।

—পাঁচিল নাকি আরো এক হাত উঠবে?

—কে বলল?

—মহিমদা।

সুবলা মাথা ঝাঁকিয়ে সেলে ঢুকে গেল। এ লাইনের লাস্‌টে মঙ্গলের সেল বন্ধ হবে। আসলে সবাই সেপাই জমাদারকে সমঝে দিয়েছে : লাস্‌ট্ মে মঙ্গল। আধা ঘণ্টা কাবার। সেলের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মঙ্গল। মাস্টারদা সেলে ঢুকেও পায়চারি করে। ডান্ডা- বেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দটা কানে আসছে। পয়লা বাইশ সেল ঠান্ডা। সেপাইর ডান্ডা ঠোকার শব্দ ওঠে থেকে থেকে। আজ মেজাজ বিগড়েছে। নাহলে সুবলটা ঠিক চেঁচাত—

—মহিমদা...আ...।

—কী ই...ই।

—মঙ্গলদাকে গান ধরতে বল।

আজ আর এসব কিছুই নেই। সুবলা হয়তো মাথার খুশকি টানছে। মঙ্গল চিত হয়ে শুয়েছিল। এমন সময় ফাঁকা সেলটায় (সেলের সামনে পাঁচিল ঘেঁষে লম্বা শান বাঁধানো চত্বরটায়) গরজন সিংয়ের খনখনে গলা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। গতবার পাগলির সময় লোকটা দুজনকে সেরেফ ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। পয়লা বাইশ সেলের বাসিন্দারা হাতের ফানা কামড়াচ্ছে। মঙ্গল দুবলা চোখদুটোয় আগুন জ্বেলে সেলের গরাদ ধরে গরজন সিংয়ের মিলিটারি গোঁফ, আর গোঁফের পাশে নিষ্ঠুর রেখাটা দেখছে। মাস্টার অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। ডান্ডা-বেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দ পাগলির ঘন্টির মতো বাজছে। হাতুড়ির বাড়ির

মতো জোরালো শব্দে সিঁদেল চোর ফালতু এক বস্তা সিমেন্ট এনে ফেলল। পয়লা বাইশ সেলটার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। হঠাৎ তাদের ফেটে পড়া আশ্চর্য নয়।

পয়লা বাইশ বেজায় শান্ত। চুলকানির খসখস শব্দটা অব্দি বন্ধ হয়ে গেছে। পাগলের মতো সেলের চার হাত জমিতে পায়চারি করতে করতে মাস্টার গরাদ মুঠো করে ধরেছে এক সময়। আর তখন ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বালির বস্তা আসতে লাগল। ঝটপট সি আর পি স্কোয়াড পাঁচিলে মই লাগাচ্ছে দশ হাতে ভারা বেঁধে, কিলবিল করে আট-দশ জন মিস্তিরি চড়ে বসল। হাতুড়ির ঠক্ ঠক্ শব্দে পাঁচিলের ইট খসাচ্ছে। খানিক বাদেই খ্যাপা অশোক গাছটার মাথা গাঢ় সবুজ রঙ নিয়ে জেগে উঠল। সুবলা কী বুঝেছে কে জানে, হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: মঙ্গলদা।

—কী?

—দ্যাখো, সবুজ...।

—দেখছি।

—তোমার চোখ সেরে যাবে...।

ততক্ষণে খসানো ইট দুটো ফের চাপিয়ে মিস্তিরি কর্ণিক বোলাচ্ছে। পয়লা বাইশ গলার কাছে শ্বাস আটকে পাঁচিলটার স্পর্ধা দেখে। মিস্তিরির ব্রণ-বসা মুখখানা ওদের কাছে কুচ্ছিত্ত হয়ে উঠল। সুবলার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। লক আপ খুলে দিয়েছে। ছেলেটা সেল থেকে বেরোল না। অশোক ফুলের ঢালাই লোহার মতো লাল রঙটা আর দেখা যাচ্ছে না। বাড়তি এক হাত চড়চড়িয়ে উঠল। পাঁচিলটা ওপরের দিকে ক্রমশ বেঁকে গেছে। মাস্টার মহারাজ সেপাইকে হাদাগোবা সেজে জিজ্ঞেস করল : পারলে সূর্যটাকেও তেরপল দিয়ে ঢেকে দিত না?

মহারাজ বেঁকা লাঠি ঠুকে চলে গেল।

পাঁচিল আরো এক হাত উঠল, মিস্তিরির কর্ণিকের বুলানি, ফের আর এক হাত...আরেক হাত...।

জান বাঁচাতে মঙ্গল নাড়ি মুচড়ে গুমরে উঠল। থান ইটটা সিধে চাঁদিতে এসে লেগেছে। প্রথমে ধস নামার শব্দ। তারপর সেপাইর দৌড়ঝাঁপ। আর হুইসিল। পাগলি। সুবলা গোঙানির শব্দ পেয়েই বাইরে ছিটকে এসেছে। মঙ্গল তখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথাটা থেঁতলে গেছে। তবু হুঁশ ছিল। মাথার খুনে কব্জিসুদ্ধু হাত চুবিয়ে মঙ্গল চোখের সামনে আঙুল নাড়ছিল। চোখের ডিম তুবড়ে আসছে। মুখে ছুরির ফিনফিনে ডগায় টানা কাটা কাটা দাগ ফুটছে।

—দেখতে পাচ্ছোনা।

সুবলার গলার সাথে সাথে শরীরটা কেঁপে উঠল।

মহিম আর মাস্টার পাগলের মতো মঙ্গলকে জাপটে ধরেছে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে। পাগলির হুইসেলের মধ্যে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করছে : মঙ্গল। মঙ্গল!! মঙ্গল!!

আর সামনে জমাট পাথরের মতো অন্ধকার দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে, শরীরটা বেঁকিয়ে মঙ্গল গলা চিরে ফেলল : আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

...তারপর জেলখানায় ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে খানা বদল হয়েছে। এখন কপির ডাঁটা সেদ্ধ দিচ্ছে। আর মঙ্গল শীতের রাতে বাতাসের বাড়ি খায়। তবু কান ঢেকে শোয় না। ও বলে : কান তো নয় অন্তর। অনায়াসে ও এখন সেরেফ পায়ের শব্দেই শত্রু-মিত্র টের পায়। মহিম লুকিয়ে ছিপিয়ে কেতাব নিয়ে এলে চিকন শান্ত গলায় বলে: ওই জায়গাটা পড়োনা ওই যে পুলিশ মিলিটারি জেলখানা রাষ্ট্র...

চাঁদের বিয়ে

সাঁওতাল গাঁ এবার নজরে এল। চিম্‌সে পেটের মতো। দড়া পাকিয়ে গেছে। ভুখের টানে শুকোচ্ছে। হররোজ। একটু একটু করে।

একনাগাড়ে পা চালিয়ে শিরায় খিঁচ ধরছে। আর ঘাম। নাকের ডগ বেয়ে ফাটা ঠোঁটে টসটসিয়ে পড়ছে। লোনা সোয়াদ লাগে টাগরায়। ঠ্যাং দুটো মাটিতে গেঁথে যাচ্ছিল। আর ক্লান্তিতে কেমন নেশা নেশা লাগছে। হাতের চেটো দিয়ে জবজবে ঘাম পুঁছে ফেললাম চোখের পাতা থেকে। তিরের ফলার মতো দৃষ্টি দিয়ে গাঁওটাকে বিঁধে ফেলতে চেষ্টা করছি।

—এই সিধে, সামনে একটা নদী পড়বে।

—আপনি ডেরা অবধি যাবেন না?

—নাহ্, কমরেড।

—আচ্ছা।

—খোঁজ নেবেন তো চান্দুয়ার বিয়ে কবে।

—আ চ্ ছা।

পোঁটলাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল। পুরু ঠোঁটটা হাসি চাপতে গিয়ে কেমন বেঁকে গেল। হনহনিয়ে বাঁ তরফের পথ ধরে হাঁটা ধরল। আরো পাঁচ মাইল হেঁটে নমশূদ্রের গাঁয়ে যাবে। একটু আগেই আমার সঙ্গী দুসরা রাস্তায় যাবে ভেবে বুকের ভেতর মোচড় দিচ্ছিল। আর মানুষটা যখন সত্যিই চলে গেলো টেরও পেলুম না।

দু-দশ পা আগে-পিছে ডোবা আর নাবাল জমি। ঝোপ ঝাড় শিয়ালকাঁটা মাড়িয়ে চলেছি। ঢালাই লোহার মতো রোদ গলছে আশমান বেয়ে। মাটি শুষে রস টেনে নিচ্ছে আশমানের মালিক। বুনো ঘাস তামার বর্ণ হয়ে গেছে। চিড় ধরছে মাটিতে। চরচরিয়ে ফেটে ঘা হয়ে যাচ্ছে। রেললাইনের অগল বগলে বাদিয়ারা চাষ দিয়েছে। ওপার থেকে ঝেঁটিয়ে আসা রেফিউজি। পূর্ণিয়ার ক্ষেতি কাম করে খাওয়া পুরোনো বাসিন্দেরা বলে, বাদিয়া। অসুরের তাগত ধরে গতরে। সেই বাদিয়ারা অবধি বলছে : ই বচ্ছর আর মাইনসে বাঁচতে পারব না! কথাটা যেন হলদে ছোপ ধরা খটখটে হাড়ের মতো মাঠ পেরিয়ে হু হু করে ছুটে আসছে। হাত পা গজিয়ে পেছু তাড়া করছে —মাইনসে বাঁচতে পারব না!

মাটি থেকেও আগুনের হলকা ছুটছে। পৃথিবীটা যেন মাথার চাঁদির মতো ফট্ করে ফেটে যাবে। যখন কুত্তার মতো জিভ ঝলিয়ে শ্বাস টানতে হচ্ছিল তখন সেই নদীটা পেলাম। ঢ্যাঙা মতো এক মাঝি থির জলে লগি ঠেলে পার করে দিল।

টোলাগুলো এক এক করে জেগে উঠছে। ঝুপরি থেকে দু-একটা মানুষ ঘাড় ভেঙে বেরিয়ে আসছে। যেন মাটি ফুঁড়ে জাগছে। দু-একটা বালবাচ্ছা ন্যাংটো হয়ে মাটি গিলছে।

নয়া আদমি দেখে লেড়িকুত্তার দল ঝেঁটিয়ে এল। চিল্লিয়ে মাথার উকুন খসিয়ে দিচ্ছে। গরিবগরবার বেসাতি আর শুকনো ছিবড়ে মাঠ। মাঝে মধ্যে আশমানের দিকে বল্লমের খোঁচার মতো উঁচিয়ে আছে দেবদারু। সাঁঝ লাগছে। মাজাভাঙা এক বুড়ি একহাতে গোবরের নাদি, আর এক হাতে খড়কুটো নিয়ে, কোদালের মতো দাঁত নেড়ে খিস্তি করতে করতে ডোবার দিকে চলেছে। মুখে আঁকিবুকি। খিস্তির চোটে মুখের কাটাকুটি মিহি দাগগুলো যন্ত্রণায় ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে। সাঁঝের লাল ক্ষীণ একটা আভা বুড়ির বঁড়শির মতো বেঁকা নাকের ডগে পড়ে চিকচিক করছে।

—চন্দ্রশেখর কা ডেরা মালুম?

—কে কার ছে?

—চন্দর শেখর?

—চানদুয়া?

—হ্যাঁ।

—হামার বেটা ছে।

হাজায় খাওয়া পাঁচ পাঁচটা আঙুল হাড্ডিসার বুকের টান ধরা চামড়ায় ঝট করে বিছিয়ে দিল। এর মানে সে মা। কেমন একটা গর্ব এল। ভাঙা মাজা সিধে করে হাঁটতে কোঁত পেড়ে উঠল। গজগজ করে চলেছে আপন মনে। আর ভাঙা মাজা ছেঁচড়ে চার হাত পায়ে হাঁটতে লাগল। গুঁড়ি মেরে। মাঝে মধ্যে আমায় পুছতাছ করছে। কোথাকার মানুষ? বেটার দোস্ত নাকি? আবার ছেলের কথা বলে। মায়েরা এইরকম, ছেলের কথা বলতে শুরু করলে আর জিরেন নেই।

...সাঁঝ গেলে বাতি, আর বয়েস গেলে সাদি। এখন দিব্য মদ্দ হয়ে উঠেছে। বিয়ে সাদি না করলে চলে? তা কে ড্যাকরাটাকে বোঝায়। কোথায় জোয়ান বউটা এসে ডেরায় চিত্তির দেবে...কপাল।

আমার আলজিব অবধি শুকিয়ে খরখর করছে। এক ফোঁটা পানি দিয়ে বুকটা শেতল করতে হবে আগে। ডেরার কাছে এসে বুড়ি গাল ভেঙে হাসল। ডেরার চালায় স্যাতা শন। নুয়ে পড়ে মাটিতে আঁচড় দিচ্ছে। বাতা থেকে পাকা বাঁশের খুঁটি বেঁধে ঠেক্না দিয়েছিল কোনকালে। ঝড়বাদলার ঝাপটদাপট হজম করে ঘুণ খেদিয়ে কোনো রকমে টিকে ছিল। গেল সনে জমিনের ঝঞ্ঝাটে সেই যে পুলিশ এসে লাথ মেরে শুইয়ে দিয়ে গেছে, আর দাঁড়া করায়নি। বুড়ি হাতের পাঞ্জা নেড়ে এসব গল্প বলে আর ছেলের মনের গতিক বাতলায়। খানিকটা নাড়া বিছিয়ে বসতে দিয়েছে। উত্তর দেশের মানুষজন অতিথির যত্নআত্তিতে কক্ষনো গলতি করে না। ততক্ষণে এক লোটা পানি ঢকঢকিয়ে গিলেছি। আমার সঙ্গী কমরেডটি বলেছিল : চানদুয়া পাক্কা আদমি। গাঁওটা ওর কথা মানে আর তেমনি জঙ্গি। বুড়ি আবার বিড়বিড় করে জানাল—ড্যাকরাটার ঘরে টান নেই। হা কপাল, বউটা আসলে দেখতুম।

সাঁঝ লাগতে ফিরল। কোমরে ন্যাতার মতো একফালি কাপড় জড়ানো। হাঁসুয়ার ডগায় বুনোঘাসের গোড়া লেপটে আছে। বুকখানায় মাংস দাঁড়াতে পারেনি কোথাও। চিতিয়ে আছে।

ঝড়ঝাপটা ধকল রুখে মজবুত। এতো ঘষটানি আর টানাহ্যাঁচড়ায় লোমগাছাও গজাবার ফুরসত পায়নি। মুখে বিচিত্র কিছু নেই ; চাপা মোটা নাক, পিটপিটে চোখে হাঁসুয়ার সান। হাসিটা জব্বর, ধবধবে সাদা।

—রাজু ভেজা?

—হাঁ।

ফ্যানমারা খুদভাত আর গুগলিভাজা। আহা দিব্য! পেটের টানে সাপটে খেলাম। উদ্‌গার উঠল। টান টান হয়ে পড়লাম দুজনে। ও আমায় পুছতাছ করতে লাগল। মুলুক কোথায়? অগলবগলের গাঁ কেমন তৈয়ার নিচ্ছে?

চুঠার ধোঁয়ায় অমাবস্যার আনধার গাঢ় হচ্ছে। চানদুয়া রসিয়ে কথা বলে। একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে বেবাক জিনিস। ততক্ষণে আমি ওকে চানদুয়া বলেই ডাকতে শুরু করেছি।

...বাপ ঠাকুরদা জঙ্গল সাফ করে কুপিয়ে জমি বানাল। দখল বর্তায়নি তবু...। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে চোখের সাদা ডিম উলটে দিয়েছে এক সময়। লড়ে জান কয়লা করে দিয়েছে তবু বাঁচতে পারেনি। গেল সনের কথা, রাক্ষুসি কুশী জমিন কাটতে লাগল...পানি সরে যেতে ফের মাটি কুপিয়ে বান্‌ধ দিলাম...লেকিন?

হাল সব এক কিসিম। আমার দেশের মানুষই যেন মুখ খুলেছে। আমি পুব দেশের মানুষ। আর এটা উত্তর। বিলকুল এক হাল। বাদিয়ার কথাটা মনে পড়ে যায়—মাইনসে বাঁচতে পারব না। মুখ ফস্‌কে বেড়িয়ে গেল কথাটা।

—তাজ্জব বাত!

—কাহে?

—তো কোন জীয়েগা?

—কওন?

—জানোয়ার?

—নেহি।

—তব!

—ইনকিলাবি জনতা।

ওর বুকের ওপর আমার হাতটা রয়েছে, পাঞ্জাসুদ্ধু। চানদুয়া গেল সনের জমিন বাঁটিয়ারার কথা বলছিল। এই গাঁওটা নাকি সেই থেকে তৈয়ার আছে। এমনিতে বোঝার জো নেই। কিন্তু হাঁক দিলেই নাকি বল্লার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটবে। জোতদার মহাজন রামদয়াল তিনটে পাইক ফেলে পালিয়েছিল। গেল সনে। একটার ঠোঁটের কষ ফেঁড়ে দিয়েছিল গাঁওয়ালে। ভালার খোঁচায়। গেল সনে পুলিশ নিয়ে আগ লাগাতে এসেছিল দোকলার দল।

চানদুয়া গান ধরেছে। গলা কাঁপিয়ে গাইছে। মোরগ ডাকার একটু আগে নিদ লাগল। গানের শেষ লাইন দুটো ঘুমের ঘোরেও কানে বাজতে লাগল :

আব তু হো যায়েগা ঠান্ডা
ও তে রাঙ্গা ঝান্ডা।

শেষে দুজনেই বেহুঁশভাবে নিদে ঢলে পড়লাম। গানের কলিটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দাওয়ার ওপর ঝুঁকে নামা শনে হাত দিলাম। মনের ভেতর কেমন একটা বিশ্বাস গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে : মানুষটা জিন্দেগিতে ডেরা বাঁধবে না। যদ্দিন বুড়ি আছে, ব্যাস।

কুসুমের মতো ভোরের রোদ পিঠ ছুঁয়ে দিচ্ছে। আলগোছে। গাঙের মাটি দিয়ে কাচা নীল ফতুয়া পড়েছে চানদুয়া। আনধার কাটার আগেই রওনা দিয়েছি। চানদুয়ার পোঁটলার ভেতর থেকে মুরগিটা ডেকে উঠল। চানদুয়া মুরগিটার ঘেয়ো মাথায় থাবড়াতে লাগল। ওদের জাতে নাকি এত জলদি কেউ মরে না। ওর এক দাদু আছে ছিয়ানব্বই বছর বয়স। এখনও বীজ বোনার আগে জমিন বানায়, জলকাদার কাজ সারে। পুরোনো কথা কিস্‌সা বলে। আসলে গেল সনে জমিনের জন্যে লড়তে গিয়ে চোট লেগেছিল চানদুয়ার শ্বশুরের। সেই কাল হল। বচ্ছর ফিরতে পেল না। আজ সারহাদ। শ্রাদ্ধ।

জলোজমি আর ক্ষেতের আল ধরে দুজনে চলেছি। চানদুয়ার মেজাজ রাতের থেকেও সাফ। ফুরফুরে। শ্বশুরের গল্প করছে। আমার কেমন মজা লাগছিল—না বিইয়ে যশোদার মা। ওদের এই রীতি, ছেলেমেয়ে দুজনের মনে রঙ ধরলেই ব্যাস। গাঁওয়ালে জানতে পারলে ক্ষতি নেই। তবে চানদুয়ার মাকে নিয়ে ওর বাপ বিপদে পড়েছিল। টেনে তো নিয়ে এল। আর যায় কোথায়! মেয়ের বাপ জ্ঞাতি কটুম সব ভালা নিয়ে ছুটল। তিন রাত্রির জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে ছিল। মাচান বেঁধে গাছে থাকত।

—তুমারা কেয়া বাত?

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগল চানদুয়া।

—নেহি।

মাথার ওপর রোষ ঢালছে আকাশটা। আগুনের তির ছুটছে। থুতু শুকিয়ে ঠোঁটের লাগামে জমেছে। একটা শিমুলের হালকা ছায়ায় বসে পড়লাম। পোঁটলা খুলে চানদুয়া রুটি বের করল একটা। আধাআধি তাই খেয়ে, পানি গিললাম দুজনে। আবার হাঁটা ধরলাম।

হঠাৎ জমিন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। ঢিপিটার ওপর চড়তেই নজরে এল একদল সাঁওতাল মেয়ে মাথায় করে বাসি ফুলের ডালা আরও কীসব ন্যাকড়াকানি খরা নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরছে। ওরা গান গাইছিল সুর করে কান্নার মতো। আর রুপোলি চুল থোপনা করে বাঁধা এক বুড়ি বুক চাপড়ে কাঁদছে।

—আম্মা!

চানদুয়ার গলা ভিজে গেছে। গোবড় ল্যাপা খড়ি দিয়ে চিত্তির বিচিত্তির ডেরাগুলো জেগে উঠল। টোলার বুক ফেঁড়ে ভালোর মতো পথটা সিধে চলে গেছে।

উঠোনে পা দিতেই একটা খাটিয়া পড়ল। যুবতী মেয়েরা চানদুয়া আর আমার পা ধুইয়ে দিচ্ছে। যত্ন করে কাদা আর মরা ঘাস তুলে ফেলছে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসছে। আর বয়স্কদের মুখে কেমন একটা উদাস ভাব। পা ধুইয়ে দিলে চানদুয়া ছোট মেয়েটার হাতে পয়সা দিল। সে এখনও যুবতী হয়নি। কিন্তু চোখের তারায় লাজ নেমেছে।

সারারাত ধরে সারহাদ চলল। চানদুয়ার বড়ো শালা একবার মোরগ একবার হাঁস দু-হাতের

থাবায় নিয়ে বসছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়া ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল জীবটার মাথায়। তারপর বলি হয়ে যায়। জমিনে খুনের রঙ ধরছে। ওরা বলে, মানুষ যখন জন্মায় তখনও রক্ত ঝরে। তাই সারহাদেও এই ব্যবস্থা। এমন একটা মানুষ আছে যার খুন নেই? এমন একটা কাম আছে যাতে খুন ঝরে না?

না, নেই।

উষ্ নামল বেজায়। রাত গাঢ় হচ্ছে, উষ্ বাড়ছে। চানদুয়া হাড়িয়া টেনে চোখ রাঙিয়েছে। আমিও এক পাত্তর টেনেছি। ঝাঁজ আছে বটে! গলা পুড়িয়ে দিল। কাজ কাম সেরে ও পাশে এসে বসেছে। আমার মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে, মরদটা বোধহয় বিয়েসাদির রাস্তা মাড়াবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে এককাট্টা করছে, সাদি করলে কি সময় পাবে! কালই রাজুর সাথে ভেট হবে। কী জবাব দেব? আগুনের কুণ্ডে একটা জবাই করা জানোয়ার ঝলসানো হচ্ছে।

—সাদি করনা ঠিক নেহি।

কথাটা আমি নেশার ঝোঁকে বললাম।

—কাহে?

—লড়না মুসিব্বত হো যাতা...।

—গলদ বাত।

চানদুয়া পুরানা জামানার গল্প জুড়তে বসল। ওদের গোত্রের আদি পুরুষ বলেছে—বিয়ে সাদি না করলে তপস্যায় সাফল্য আসে না। মেয়ে আর মরদ এই দুই নিয়েই দুনিয়া। জংলা কেটে আবাদ করে ডেরা তুলেছে দুজনে। বালবাচ্ছার জন্ম দিয়েছে। জন্তু আর তুফানের সাথে লড়েছে। কাকে বাদ দেবে তুমি?

যে মেয়েটা পা ধুইয়ে দিয়েছিল, সে সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। চানদুয়া মেয়েটার সাথে ডেরার ভেতর ঢুকল।

সে রাতে আর ঘুম হল না। চানদুয়া বলল কদিন ঘুরে আসতে। সারহাদ মিটলে ওর গাঁয়ে এসে থাকতে হবে। এর মধ্যে অগলবগলের গাঁগুলোকে ও সানিয়ে নেবে। এক মাহিনা লাগবে। মরদরা সব নাকি দাঁতে দাঁত দিয়ে আছে।

উষ্ মাথায় নিয়ে আমি চলেছি। এক মাহিনা বাদ ফের আসতে হবে। গাঁওটা লড়ার জন্য হেঁদিয়ে মরছে। চানদুয়ার কথা আমার মনে হল। কই নিজের বিয়ে সাদির কথা তো কিছুই বলল না। সাঁওতাল টোলার বাঁকটা ঘোরার মুখে মিহি গলায় কে যেন ডাকতে লাগল—এ...এ...এ...। এই সেই মেয়ে যে চানদুয়াকে ডেরায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। মিটি মিটি হাসছে। চোখের গাঢ় মণিতে কথা ফোটাতে চাইল। ওর হিন্দি আসে না। ওর হাত থেকে পোঁটলাটা নিলাম। একটু দাঁড়িয়ে দুজনেই হাসলাম। তারপর হাঁটা ধরলাম। মেয়েটাকেও জিজ্ঞেস করা হল না। পুছতাছ করলে হয়তো মুখটা লাল হয়ে যেত খুনে।

কপিলের মুলুকযাত্রা

ভারতিয়ার কপিল। বউখেকো কপিল। তিনকুলে তার আপনজন বলতে আছে আটার দলার মতো এক নানি। তাও মুলুক থেকে সমাচার এসেছে গেল হপ্তায়, সে বুড়ি নাকি শুয়ে-মুতে লেবড়ে-থেবড়ে আছে। বুড়ি বিদেয় হলে কপিলের অতীতটুকু টিকটিকির লেজের মতো নিসাড়ে খসে যাবে। তখন আপনি আর কোপনি সম্বল। তখন কপিল শুধু ভারতিয়া কোম্পানির বিশ সালের গোঁয়ার ওয়ার্কার। যার সম্বল বলতে বুক পকেটের ফটোক, ঝাঁকড়ামাথা হাড্ডিসার বট গাছটার তামার বর্ণ কচি পাতা ছোঁওয়া টানা আটচালা বস্তিটি। বস্তির একখানা খোপ। খাটিয়া। আর খটমল।

আসল বিতান্ত ফটোকের। নিউ অ্যালেনবেরির লাগাতার পেটশুখা হরতালের রুক্ষু মেজাজের ভেতর, উবু হয়ে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে কপিল ফটোখানা বের করে মোলায়েম চোখ বুলোয়। নাড়া লাগিয়ে গলা ভেঙে কেলে মন্টু ফ্যাস ফ্যাস করে বলে : কপিল, ও কীসের ফটো?

: ফটোক হ্যায় ফটোক।

: আরে বাপ কার ফটো দেখিনা!

: রাম লছমন কা।

বুক পকেটে থাকে ফটোটা। পাতলা প্ল্যাস্টিকের খামের গায়ে ঘাম-বসা নুনদাগ ফটোটাতেও লেগেছে। ভারতিয়ার বয়লারম্যান কপিল যখন লোহার ঢাউস পেটটার ভেতর বেলচায় করে কয়লা ছোড়ে আর গতর বেয়ে ফিনকি দিয়ে ঘাম ছোটে, ফটোটা তখনও বুকের কাছে থাকে। কপিলের মাস মাইনের মেহনতের পয়সা আর টুকিটাকি দশটা জরুরি কাগজের সাথে ফটোটা ওর কাছে দশ বচ্ছর যাবত আছে। দশ বচ্ছর! চাট্টিখানি কথা নয়, এখন তো চুলের গোড়ায় চাঁদের রূপোলি ধাতু গলে গলে লেগেছে। আর তখন ছিল মিশকালো চুল। পুলিশের হুলিয়া নিয়ে মানুষটা কপিলের ডেরায় উঠেছিল। আনজান আদমি দেখে বউ-র সরম লেগেছিল। আর কপিলের চাউনিতে সে সরম বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। আর তারপর ভাজি রোটি দাল সবই বানিয়েছে। মানুষটাও কমতি নয়, দুচার রোজেই বউ-র দাদা বনে গেল সাচমুচ। ডেরার ভেতর একটা পাতিল কিনে রেখেছিল কপিল। সেই পাতিলেই লোকটা হাগা মোতা সারত, ডিউটি যাবার আগে কপিল পাতিলটা নিয়ে চান করতে ছুটত। অথচ মানুষটার নাম ধাম জানতো না। সনৎদা সাথে করে এনে বলেছিল : কপিল ভাইয়া, এই সাথিকে ক-দিন রাখতে হবে। হাওড়ার ওই জুটমিল ওয়ার্কারদের স্ট্রাইকের পর যে গুলিগালা চলল না...। পুলিশ খুঁজছে। কপিল আর পুছতাছ করেনি। জরুরতও হয়নি। মানুষটা ওয়ার্কারের ভালাইর জন্যে লড়ছে, ব্যাস। সনৎদাকে কপিল কী বলেছিল এখন আর মনে নেই। মনে আছে লড়াকু

মানুষটা তারপর মাহিনাভর খাটিয়াটা দখল করে ছিল। আর যাওয়ার আগের দিন কপিলকে একটা ফটোক দিয়েছিল। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে কপিলের পিঠে আলতো চাপর মেরে বলেছিল: ইয়ে লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় স্তালিন।

তারপর কোথায় যে মানুষটা হারিয়ে গেল। কপিল ভারতিয়ার ধুঁয়ো-ধুলো তেল-কালিমাখা রাস্তার ধারের ঝাঁপতোলা চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে কাকদ্বীপের শাঁখের শব্দ শুনেছিল। লড়াইর সম্বাদ কাকের মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফিটার মিস্তিরি পঞ্চাকে ডেকে এনে কপিল দু-ভাঁড় চায়ের কথা বলে মুচকি মুচকি হাসত। পঞ্চার দড়কচা মুখের দিকে চেয়ে হাসত। পঞ্চা ওর রকম-সকম দেখে বিগড়ে যেত : আরে শালা হাসছিস কেন? অ্যালেনবেরির সুদর্শনের মুখখানাও বেঁকে তুবড়ে একসা হোত : কা রে? বোল কা বোলেগা? আর কপিল মুখ টিপে টিপে হাসত। শেষকালে ওরা রেগে হুট করে উঠে দাঁড়ালে জামার খুঁট ধরে জবরদস্তি টেনে বসাত : দেখা কেয়া?

: কা?

: ফটোক।

: তো?

: ইয়ে দেখ্ ইয়ে হ্যায় লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় এসতালিন।

দু-তিন দফা এমনি হতেই ব্যাপারটা ধর্মঘটের মতো চাউর হয়ে গেল। আর সেই থেকে কপিলের নামটা চাউর হয়ে গেল। ভারতিয়ার কপিল। মুচকি হাসি আর কপিল। বিহারের খরায় পোড়া চোখ দুটোয় তবু লোহার বাবরির মতো ফুল ফোটে : লেনিন কেয়া কিয়া? এসতালিন কওন থা? সনৎদা লেবার কোর্টের ফাইল ঘাটতে ঘাটতে আনমনে বলত : লেনিন ছিলেন ভারতবর্ষের ...থুড়ি...রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা... বীর... শিক্ষক।

: এসতালিন?

: স্তালিন ছিলেন লেনিনের...সহকর্মী কমিউনিস্ট...লেনিনের ডান হাত।

: ডাহিনা বাজু?

: হ্যাঁ।

: তব তো উলোগ রামলছমন থা।

রোদে জ্বলা বিহারের চোখ ফটোর মানুষ দুটোর মুখ খুঁটিয়ে দেখে। আঁতিপাঁতি করে কী যেন খোঁজে। আচমকা বলে ওঠে : এসতালিনকা অ্যায়সা! দেখনেমে হামারা মুলুক মে ভি এক ক্ষেত মজদুর হ্যায়।

লেবার কোর্টের কাগজ পত্তরের ভেতর থেকে মাছির মতো চোখ দুটো উঠিয়ে আনে সনৎ : কেয়া পাগল কা মাফিক...।

: নেহি সাচমুচ।

সনৎ-এর মুখে বাঁকা চোরা হাসির একটা রেখা কিলবিল করে উঠতেই কপিল চুপ মেরে যায়। বুক পকেট থেকে ফটোটা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে : আচ্ছা ও সাথি অওর

নেহি আয়গা? সনৎ এর ঠোঁটে চিবুকে, চোখের খাঁজে 'জানি না'র উদাসীন রেখা কুটিকুটি করে দেগে বসে। আর কপিল বিড়বিড় করে : ও ভি বহুত আচ্ছা আদমি থা।

ভারতিয়ার গেট ডাহিনা ফেলে, বাঁয়া তরফ চা দুকান। অলিম্পিয়া ফ্যাক্টরির চা দুকান। ধোঁয়ার জাল। কানের পর্দা ফাটা সিটি। আর পুর্ণিয়া জিলার হাবিবের রুগ্ন বউ-র নাকফুল দেখতে দেখতে কত দফা মিছিলে হেঁটেছে কপিল। পেট ছিবড়ে করে শুকনো হাড়ে এককাট্টা লাগাতার স্ট্রাইকের সময় হাবিবের বউ-র নাকফুল বেচতে দেখেছে। আটাগোলা খেয়ে সুদর্শনের ট্যাপাটোপা বউ-টা মল। আর তার বুকের দুধ টেনে আড়াই বছরের লাপসালুপসো ছেলেটা। তারপর খাদ্য আন্দোলন। আর হাবিবের উরুতে চোট। কপিল অনেক দেখল। অনেক শুনল। আনকোরার দলকে কপিল এখন রাশিয়ার বাকু অঞ্চলের লড়াইর গল্প শোনায়। আর বলে : জানতা এসতালিন কোন থা? লেনিন? —নেহি, তো শুন...।

হঠাৎ একদিন বন্দেল গেটের লেবেল ক্রসিং ছাড়িয়ে সাঁড়াশির মতো আড়াআড়ি রাস্তা ধরে ডিউটি-ফেরতা কপিলের মাথার ওপর ধোঁয়া-ধুলোভর্তি আকাশটা ফালা ফালা হয়ে গেল কুচো মেঘে। পঞ্চা আর সুদর্শন ভারতিয়ার সামনে কাঁচা নর্দমার ওপর বাঁশের মাচান বাঁধা বেঞ্চে চুপ মেরে বসেছিল। সনৎদা ওদের বেওকুফ মুখের দিকে চেয়ে বলল : পার্টি ভাগ হয়ে গেছে।

তারপর দেখতে দেখতে যে যার হেডটেল করে এক এক দিকে চলে গেল। পঞ্চা আর কপিল কোথাও নাম লেখাল না। দড়ি টানাটানি চলেছে ওদের নিয়ে। অলিম্পিয়া কোম্পানির ঘ্যাস কয়লার ঢিবির কাছে সনৎ কপিলের ডাহিনা বাজু চেপে ধরল : কি রে কপিল, কী করবি?

মুলুক যাব।

কেন? নানির কাছে?

নেহি।

তব?

ফটোক ফাঁড়নে নেহি সকে গা।

ফটো ছিঁড়তে কে বলেছে?

তুমলোগ এসতালিনকো মানতা হ্যায়?

নননা। খোদ রাশিয়াই মানছে না।

হাম ভি রাশিয়া কো মানতা নেহি।

কপিলকে বাগে আনা গেল না। কাঠ গোঁয়ার কপিল। ভারতিয়ার কপিল। বউখেকো কপিল। সনৎ কপিলকে বাগানোর আশাও ছেড়ে দিল : বিহারের হনুমানজি, রাম লছমন সিনায় থাকে ওর।

বিহারের হনুমানজি মুলুক যাওয়ার তোড়জোড় করছে। অথচ মুলুকে ওর জ্ঞাতি কুটুম বলতে ছিল জবুথুবু এক নানি। সেও চোখ বুজিয়েছে। সুদর্শন আর পঞ্চার সাথে ভেট করল কপিল। মুখে সেই টেপা হাসি।

: নানির তবিয়ত খারাপ?
: নেহি। ও তো মর গিয়া।
: তবে যাচ্ছিস কোন চুলোয়?
: মুলুক।
: মুলুকে আছেটা কে?
: হ্যায় কোই।

কপিল মুচকি মুচকি হাসে। সুদর্শনের শুঁয়োপোকার মতো ভুরু কুঁচকে প্রকাণ্ড নাকটা ছুঁয়ে দিচ্ছিল আর একটু হলে। আর কপিল মজাক করছে। হাসছে। পঞ্চা তেড়িয়া হয়ে উঠল : কে বলবি তো? কপিল ফের হাসতে থাকে। হঠাৎ বুক পকেট থেকে ছবিখানা বের করে পট গায়কের মতো সুর করে বলে : ইয়ে হ্যায় লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় এসতালিন...হাম এসতালিন কো ঢুন্‌নে যা রহা...। বাঁশের মাচানে মচমচ শব্দ তুলে কপিল ওদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল : হামারা মুলুক মে এসতালিনকা অ্যায়সা এক আদমি হ্যা...য়...। বিলকুল এসতালিন ক্যা অ্যায়সা...বড়া বড়া মোচ...।

কপিল মুলুক গেছে দশ-বারো সাল হল। গাঁওয়ালে দেশোয়ালে কারো হাত দিয়ে একটা খত পাঠায়নি। দশ বারো সাল মানুষটার পাত্তা নেই। ভারতিয়ার গেটের সিধে নর্দমার ওপর বাঁশের মাচানে বসে সুদর্শন আর পঞ্চা মাঝে মধ্যেই বলাবলি করে : কবে ফিরবে বল তো?

—কেন? তুই কি ভাবছিস!

অলিম্পিয়া কোম্পানির সিটি আর মজুরের হাসির হররার মধ্যে ওদের দুজনের ভেতর কেউ কপিলের ভালাই কামনা করে। আর একজন বলে : দেখিস ও ঠিক ফিরবে।

জনম

টিপ টিপ বৃষ্টি। প্যাচপ্যাচে কাদা। থ্যাবড়া থ্যাবড়া পায়ের চেটোয় ছপ ছপ শব্দ তুলে রাখহরি চলল। লম্পর কালচে শিখাটা নেপলার মার নাকের ডগা ছুঁই ছুঁই করছে। বকফুলের মতো নাক। দাওয়ার ঘুণধরা খুঁটি এক হাতে জাপটে নেপলার মা একটু ঝুঁকল—জলদি জলদি এসো। ভাগ্যিস রাখহরি ছিল। অবিশ্যি একটা না একটা মদ্দ থাকতই। বত্রিশটা পরিবার। আর দায় ধকল কার নেই! তাই মরদগুলোর নিশ্চিন্দি। নিশ্চিন্ত মনে তারা কলের ভেঁপু শুনে ছোটে। জানে বেঘোরে মরবে না।

খেঁদি কাটা ছাগলের মতো দাপাচ্ছিল। ঠোঁট চেপে দাঁতে দাঁত রেখে বেদনা সামলাতে গিয়ে গোঙাতে লাগল। জন্ম দিতে বড়ো কষ্ট! দশমাস দশদিনের যাতনা। বেদনা। ব্যথা চাগতে লাগল। ছেঁড়া মাদুরে পোড়া কাঠ পা দুটো ঘষটাতে লাগল খেদি। মানুষটা কাছেপিঠে নেই। জল গড়ান দিয়ে নামল চোখ থেকে। টস, টস, টস। মানুষটা শিয়রে নেই বলে যে কাঁদল তা নয়। এমনকি বেদনার জন্যও নয়। খেঁদি ভবিষ্যত ভেবে কাঁদে। বেদনার ভবিষ্যত।

মিহি গলায় দাই কী যেন বলল বিড় বিড় করে। শেষের কথাটা খেঁদির কানে গেল—তোর বাপও আমার হাতে হয়েছে। আগের দিনে রোজ নাহলেও তিনটে বাচ্ছা জন্ম নিত। আজগাল মানুষের বাচ্ছাও হয় না। কই গো নেপলার মা, গরম জল হল?

—এই যে মাসি।

ছোট্ট এক চিলতে খুপরি। কাঁচা মাটিতে মাদুর বিছিয়ে খেদির বিছানা। শিয়রে জলের কলসি, ন্যাকড়াকানি। কবাট ভেজিয়ে দিয়েছে নেপলার মা। বাইরে রাখহরি আর জনা দুই মরদ চিন্তিত মুখে বিড়ি ফুঁকছে দাওয়ায় বসে।

—বুড়োদাকে খবর দেয়া দরকার।

—বুড়োদার ফিরতি রাত হবে, সিককলে লক-আউট না।

—ছেলে হইছে?

—হুঁ।

খেঁদির এই তিনটি হল। তার আগে তো পেটে থাকতেই মরল কতগুলো। তার কি আর হিসেব আছে। জন্মে মরল দুটো। এখন সন্তানের গায়ে হাত রেখে খেঁদি ঘুমোচ্ছে। কিন্তু স্বস্তি কোথায়। খেঁদির মুখে স্বস্তির চিহ্নমাত্তর নেই। ভাবে : বেঁচে বত্তে থাকলে আজ তারা কেমন ডাগর ডোগর হতো। খেঁদির দুঃখের দিন আর থাকত না। মরণের সময় একটু বার্লি পর্যন্ত জোটেনি। খেঁদি কেঁদে ভাসিয়েছিল। অভাগার সন্তান। জন্মে বাঁচেনা। সোয়ামি বলেছিল : কাঁদিস কেন?

—মানুষ না, তুমি মানুষ না।

—আজগের জানলি?

—শরীলে মায়া নেইকো!

—বৃক্ষ বাঁচলে ফল ধরবে।

প্রথমটা ছিল কন্যা। এক মাথা চুল, টানা টানা চোখ। থোরের মত হাত, পা। শাউড়ি তখনও বেঁচে। বিয়ের মাসেই মেয়েটা পেটে এসেছিল। সেই চোদ্দ বছর বয়সে। সেই গুলি আর লড়াইর মধ্যে। আজাদির জন্য দেশটা আঁকপাঁক করছিল। বাঙ্গাল মাস্টার বলেছিল : এই কন্যা বাঁচলে বিদ্রোহী হইব, দ্যাখোস না এখনই ক্যামন হাত পাও ছোঁড়ে। মেয়ের গাল টিপে বুড়ো হেসেছিল। চোদ্দ বছর বয়সে খেঁদি মেয়ের জ্বালা তেমন বুঝে উঠতে পারেনি। শরীরের ধকল সামলাতেই কাহিল। জোয়ান মদ্দ মানুষটা ঝিম মেরে গেছিল। দুঃখের শুখা সংসারে কচি মেয়েটার কলকল হাসি একটা বিরাট সান্ত্বনা ছিল। শাউড়ি গাওনা গাইত। এক কথা হাজার দফা বলত—এলিই বা কেন মা...। পরেরটাও মেয়ে, কন্যা সন্তান। আরেকটু বেশি কালো। তদ্দিনে শাউড়ি ওষুধ পথ্য বিনে টেঁসে গেছে। সেবারও মানুষটা ঘরে নেই। কাজ নেই, ঠুঁটো হয়ে বুড়ো তখন ঘরে বসে। বেদনা যখন উঠল, তখন মানুষটা নেই। দুঃখের ধান্ধায় কোথায় গেছিল। কলকাতা শহরটা হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছিল। মিলিটিরি বুটের তলায় শহরটা ধুঁকছিল। বুড়ো ফিসফিস করেছিল : তে-লে-ঙ্গা-না। গলির মুখে বুড়োর জন্য অপেক্ষা করছিল খেদি। হঠাৎ বেদনা উঠল। মেয়েটা হবার আগেই তার ডর লেগেছিল। তরাস। দানা নেই, একটাও যে দানা নেই। আটচল্লিশে মেয়েটা জন্মাল। বেড়াল ছানার মতো অবিকল। আটমাসে হয়েছিল বলে চোখ ফোটেনি। মৃত্যুর আগে মেয়েটার চোখ ফোটেনি।

রাতের দিকে বৃষ্টি জোরসে এল। প্রসূতির গায়ে ক্ষুদে মানুষটার গায়ে পাছে বৃষ্টি লাগে, রাখহরি, মদনা আর উৎকলবাসী লিঙ্গরাজ খেটেখুটে একটা তেরপল টাঙিয়ে দিল।

—ঠান্ডা লাগলে আর রক্ষে নেই।

—সন্তুদের ঘরে অনেক চট আছে, সবজি আনে তো থলেয় করে।

—খান কয়েক নিয়ে আয়না বউ।

—চাট্টি খড় আনব দিদি?

—খড় কী হবে?

—ওমা!

সব যেন মেতে উঠল। কাশীবাবুর লম্বাটে বস্তির চালা, বত্রিশ ঘর মানুষ। স্যাঁতসেতে বৃষ্টিতে আঁধার রাতে বত্রিশটা পরিবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সিঁদুরের কৌটো ঘেঁটে, শতচ্ছিন্ন সার্টের পকেট হাতড়ে দু-দশ পয়সা জমা হল। বুড়োদার কারখানা লক-আউট। তাই বলে তো আর চোখের ওপর মরতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া বত্রিশ ঘরের বস্তিটার যেন রোখ চেপে গেছে। মৃত্যুর সাথে যেন তারা পাঞ্জা কষবে।

—রাতভোর দোরগোড়ায় বসে থাকব।

—কী হবে দিদি?

—আসুক না দেকি যোম।

নুন চা গিলে তৃপ্তিতে চুকচুক করতে করতে কথাটা বলল নেপলার মা। দিনভর উপোস মেরে, তারপর প্রসব করে খেদি এখন মরার দাখিল। বয়েসও হয়েছে, চারের ঘরে এখন। রক্ত ঝরে ঝরে ফ্যাকাশে মুখ। আর বিয়োনোর ক্ষ্যামতা নেই। দুধ পাউরুটি নিয়ে এল দশ বছরের নেপলা। ছেলেটা ভিজে জবজবে। কাঁপছে। ঠোটের কোনে তবু হাসির ভাঁজ। উজ্জ্বল চোখ দুটো চিকচিক করছে কীসের খুশিতে। কীসের খুশি।

হাঁদাল ব্যথা আছে খেঁদির। বিয়োনোর পর বেদনা জাগে। ফ্যাকাশে মুখখানা বেদনায় নীল হয়ে গেছে। ভোর রাত্তিরের দিকে বুড়ো ফিরল। দোরগোড়ায় ন্যাকড়াকানি জড়িয়ে নেপলার মা শরীর কাত করেছিল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল— কে?

—আমি গো!

—সঙ্গে সব কারা?

—কমরেড। সব কমরেড।

—তা কমরেডরা শোবে নাকি?

—হুঁ।

—ঘরে যে আতুর গো!

রাত ফুরিয়েই এসেছিল। বাদ বাকি রাত তারা গপ্‌পে মেরে দেবে। নানা রঙের গল্প। প্রসূতি এবং শিশু কিছুই জানে না। প্রসবের কষ্টে, হাঁদাল ব্যথার কষ্টে অবশ হয়ে প্রসূতি ঘুমোচ্ছে। আর ছেলেটা ঘুমোচ্ছে জন্মানোর শান্তিতে। বুড়োর দলবল পোস্টার সেঁটে এসে, শিশু আর তার জননীকে ঘিরে আনন্দ করছে। আনন্দ।

—মাইরি বলছি বুড়োদা!

—কী?

—ছেলে তোমার সাংঘাতিক হবে।

—মানে?

—খুব জঙ্গি হবে।

—বাঁচলে!

—এটা সত্তর সাল, বাঁচবে না মানে?

—তা কালও কি লেবার দপ্তরে যাওয়া হবে?

—দুত্তোর!

—তবে?

—মালিকের বাড়ি ঘেরাও করাই ঠিক।

অভাবের হাঁ-করা সংসারে থেকেও ছেলেটা সাত তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিতে শিখল। সিককলে লক-আউট। কিন্তু পেট মানবে কেন? বত্রিশ ঘরের বস্তিতে দিন চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হঠাৎ মানুষটা একদিন ঝোড়ো কাকের মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। খেঁদি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল।

—কী হল গো?

—ঘরে থাকা চলবে না আর।

—বলো কি!

—মাথার আচ্ছাদনটুকুও গেল।

বচ্ছর না ভরতে দিন কাল পালটে যেতে লাগল। তোলা কাজ নিয়েছে খেঁদি। দামাল ছেলেটা বত্রিশ ঘরের বস্তিতে দাপিয়ে বেড়োয়। খেঁদির মন ছেলের জন্য আকুল। সঙ্গে করে আনবে সে উপায় নেই।

—তোর ছেলে বাবা বড্ড কট কট করে চেয়ে থাকে। যেন গিলে ফেলবে।

—আর যা কান্না। ওদিকে কালোকুষ্টি, যেন জঙ্গল থেকে এল।

উকিল গিন্নি নাক কোঁচকান। নাকটা তখন বড়ির মতো হয়ে যায়। ওই একরত্তি ছেলে বস্তির প্রাণ। একদণ্ড নেপলার মা কাছ ছাড়া করে না। এরই মধ্যে পা গজিয়েছে। হেঁচড়ে গড়িয়ে গলির মুখে চলে আসে। খেঁদির বুক পোড়ায়, দিনকাল যা পড়েছে—বাচ্ছা বলে রেহাই পাবে না। এই তো সেদিন জিপ থেকে নামিয়ে জোয়ান ছেলেটাকে গুলি করল। আবার পুলিশের লোকই লাশটা জিপে তুলে দিল। পরের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে খেঁদির মনে সোয়াস্তি নেই। কাজে ভুলচুক হয়। মানুষটার নামে আবার হুলিয়া। বিপদ যেন হাত পা ছড়িয়ে আসছে। সিককলের লক-আউট নিয়ে ঝামেলা, সেই থেকে ফেরার। সার্জেন্ট এসেছিল। হুলো বেড়ালের মতো মুখ, পিটপিটে চোখ। দাওয়ায় উঠে কপাটে লাথি কষাল—এই, বুড়ো কোথায়। লাথির দাপটে কব্‌জা খুলে গেল। খেদি ঝামটা দিয়ে উঠল : আ গেল-যা! সরকারি কাম করি নাকি আমি যে বলতে যাবো? খুঁজে নেওগে।

গহীন রাত্তিরে আর একদফা এল। গলির মুখে শুয়ে থাকা খেঁকি কুত্তার ল্যাজ মাড়িয়ে, খেঁকি কুত্তার ডাকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়োর টুটাফাটা জোড়াতালি সংসারে। ঘুপচির মধ্যে তখন মৃতবৎসা নারী একমাত্র সন্তান বুকে চেপে গভীর ঘুমে মগ্ন। জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে সি আর পি-র বন্দুকের নল। কপাট ভেঙে, অফিসারের টর্চ : শালা কেউটের বাচ্ছা!

—খবদ্দার, খবদ্দার বলছি।

—অ্যাঁ!

—দুখান করে ফেলব।

আঁশবঁটিটা খেঁদির হাতে কাঁপছে। রুগ্ন হাতের শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। চিৎকারটা বঁটির চেয়ে মারাত্মক। বত্রিশ ঘর ঘুম ভেঙে পাড়া মাথায় করল। সি আর পি পুলিশের বেড়া ডিঙিয়ে অনায়াসে তারা চলে এল। একে একে তারা আসছিল বোবা কালা সেজে।

—এ মাৎ যাও।

—গোলি কর দেগা।

নেপলার মা আগে। পিছনে মেয়ে-মদ্দোর সারি। ছোট্ট একটা মিছিলের মতো এসে বত্রিশ ঘর ছেলেটাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। বেগতিক দেখে অফিসার ফৌজ নিয়ে কেটে পড়ল। ছেলেটা গিয়ে উঠল নেপলার মার কোলে। আঁচল সরিয়ে আঁচড়ে ছেলেটা নেপলার মার বুক খুঁজল।

—দস্যি ছেলে!

নেপলার মা ছেলেটার মুখ বুকে চেপে ধরল। আর সে নিশ্চিন্তে দুধ খেতে লাগল। চুক চুক শব্দ হচ্ছিল। রাখহরি সরলভাবে হাসল—নাহ্, বেটা অমর হবে।

খেঁদি থামে হেলান দিয়ে দূরের আকাশটার দিকে চেয়ে ছেলেটার মুখ নিয়ে কীসব ভেবে চলল।

যান্ত্রিক

ইস্পাতের পাত। লাইনগুলো সাত রাজ্যি টহল দিয়ে এখানে এসে কেমন জট পাকিয়ে গেছে। কালা ভইসের মতো ঠমকে ঠমকে ইঞ্জিন আগুপিছু হটে। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে ধোঁয়া ওঠে।

সেই ধোঁয়ার জালের মধ্যে টিনের চালা, লাইনের কাঠ বিছিয়ে বেঞ্চ। দূর থেকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চালাটা ঠাহর হয় না। ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ওদিকে মন টানে না।

—আর সহ্ন যায় না।

—ঠিক কথা।

—এই এক মানুষ জ্বালিয়ে মারল।

—রামশরণ!

—তয় আর কই কি?

—এইটা একটা চিন্তার কথা।

নীল প্যান্টে আর নীল কুর্তায় মানুষগুলো ধোঁয়ায় মিশে আছে। ধোঁয়ায় তারা বসত করে। তাদের খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। একজন খুক্ খুক্ করে কাশল।

—রক্ত ওঠে?

—না।

—তবু লক্ষণটা ভালো না।

—জানি। এখন আসল কথা বল।

—একটা লোককে সামলানো যাবে না!

—শাবল দিয়ে দেবো নাকি?

—নাহ্ থাউক।

গুজগুজ ফুসফুস অনেকক্ষণ চলল। মাঝে মাঝে কমলা মাসির গুড়ের চা। আস্তে আস্তে আন্ধার হলে যখন সিগন্যালের আলোটা মাত্র জেগে থাকল, তখন তারা একে একে উঠল।

রামশরণের সার্ভিস রেকর্ডে আজ অব্দি একটা কালির আঁচড় পড়েনি। পঁচিশ বছরের সার্ভিস। পুরোনো জামানার লোক। ঝড় বাদলা বৃষ্টি কিছুতেই কিছু না। রামশরণ ব্রিটিশ জামানার লোক। নিমকের কদর জানে সে।

—তুমি একা চালাবে?

—হ্যাঁ।

—মরো!

কোলকাতায় কত কাণ্ড ঘটেছে! কিন্তু কস্মিনকালও রামশরণকে কেউ নাগা করতে দেখেনি। সে বলে : মানুষের শরীল হল ইঞ্জিন। তা ইঞ্জিন যদি ফেলে রাখো কলকব্জা বেকল হবে না?

হিক্কার মতো একটা শব্দ তুলে সবজি গাড়িটা অকস্মাৎ থেমে গেল। ঠিক কেবিনটার নাগাল পেয়েই। ড্রাইভার রামশরণ ভ্যাকুম খুলে দিয়ে প্রেমসে বিড়ি ধরাল। লাইনম্যান বিজু ম্যাড়মেড়ে লাল নিশানটা অভ্যাস মাফিক নাড়ছিল। বিজু পানের ছোপ ধরা দাঁতের পাঁজা বের করে হাসল। রামশরণের জিভ আর বাগ মানল না: কি রে উচ্ছব না কি?

—জানো না?

—কী?

—আজ আর টেরেন নেই।

রামশরণ খেঁকিয়ে উঠল : হাতির পাঁচ পা দেখেছিস না? ছাপড়া জেলার দেহাতি হিন্দি ছেড়ে সে এখন বাংলা বুলি শিখছে।

নাইট ডিউটির এই এক জ্বালা। একে তো কয়লাকুচো আর ধোঁয়ায় অমনিতেই চোখ লাল লাল হয়, জ্বলন ধরে। নাইট ডিউটিতে সেই চোখ পুড়ে অঙ্গার হবে। হরিপাল ছাওয়ালপানের জন্য বারো আনার পাবদা মাছ নিয়েছিল। ইঞ্জিনের গরমিতে সেই মাছ ভাপে সেদ্ধ।

—আজসে শুরু?

—হ্।

—কাম মে আয়গা?

হরিপালের ব্রণ-বসা শুকনো মুখখানা প্রশ্নের ধরন দেখে কদাকার হল বিরক্তিতে। কিন্তু যতক্ষণ ইঞ্জিনে আছো সমঝে চলতে হবে। রিস্‌কের চাকরি। বয়লারে কয়লা ফেলতে ফেলতে সে আগুনের ভাটা আর রামশরণের মুখটা পরপর দেখল। বেলচার হাতলটা মাজার কাছে ঠেকিয়ে সে খটখটে লাল দুটো চোখ মেলে ধরল রামশরণের দিকে : তোমার কি দরকার অত খোঁজে। রামশরণ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

—কী রে মারবি নাকি?

—অ্যাঁ।

—গিলে ফেলবি মনে হচ্ছে।

হরি বিকটভাবে আলজিভ বের করে হাসতে লাগল। কাচের টিউবে সিসের বলটা জলের মধ্যে লাফাতে লাগল। ওই বল হল ইঞ্জিনের পরান। জল কমে গেলে কিংবা প্রচণ্ড উত্তাপে যদি কোনোক্রমে সিসে গলে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। ইঞ্জিনটা তখন ভীষণ শব্দে ভেঙে যাবে। রামশরণ গোঙাতে লাগল। হরির হুঁশ ফিরল। সে পানি ঠিক করল। সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি টিকিস টিকিস করে চলল। রামশরণ হাতের তেলকালি মাখা জুট দিয়ে মুখটা মুছল। হরি দেখেও দেখল না। মানুষটা অমন গলতি আকছার করছে। হরি ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশ থেকে রুমালে বাঁধা মাছের পুঁটলিটা নামিয়ে নাকের সামনে ধরল: না, গেছে।

—এ হরি।

—কি?

—বাত কেয়া থা?

হরি জবাব না দিয়ে বয়লারে কয়লা ফেলে মাজা ভেঙে। তারপর কর্কশভাবে বলল : বাত আর কী। চাল নিয়ে এক বুড়ির সাথে কী ঝামেলা ওয়াচম্যানদের। বুড়িটার হয়ে বলতে গেছিল সেকেণ্ড ফায়ারম্যান সদানন্দ। সদানন্দকে ওয়াচম্যানরা দল বেঁধে ঠেঙিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এখন তখন অবস্থা। এই তো বিত্তান্ত।

—ব্রিটিশকা টাইমমে...।

—থামো তো।

হরির অচ্ছেদ্দা ধরে গেছে। এখন ট্রেনটা ইন করলে বাঁচে। না হলে কী থেকে কী হয় বলা মুশকিল। কালই তো শাবল দিয়ে দিচ্ছিল শেষ করে নেহাত...। গাড়িটা যখন প্ল্যাটফর্মে ইন করে তখন একটা ঘটাং ঘটাং শব্দ ওঠে। ট্রেনটা ইন করল। সবজির ট্রেন। হরি রড ধরে ঝুলে পড়ল। তার কপাল ঢাকা নীল রুমালটা কোনো অজানা দেশের পতাকার মতো উড়ছিল।

—এ পাল!

—বলো।

—ইতনা রিস্‌ক্ লেনা ঠিক নেহি। মালুম হ্যায় আভি ইলেকট্রিক হো গিয়া।

—জিন্দেগি কা মতলব হি রিস্‌ক্।

সবজির গাড়ি ধোঁয়া উগরে থামল। ভেন্ডাররা হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল। রামশরণের তর সইল না। সে চটপট নেমে টিশন চষে ফেলল।

—কুলি লোগ ভি বিগড় গিয়া।

—তুমি তো আর বিগড়ে যাওনি।

—উ বাত নেহি। সাহেব ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, সেকেন্ড ট্রেনে কাজ করতে হবে।

—মরো।

এক ডিউটি ক্লার্ক ছাড়া শেডে জনমনুষ্য নেই। ক্লিনার পঞ্চা শেডের পাঁচিলে বসে মশকরা মারছিল। পঞ্চাকে দেখে হরি সন্দিগ্ধ হল। তবে কি মানুষটা গেল। লিকলিকে পঞ্চা পিক কেটে থুতু ফেলল। রামশরণের মুখ চুলবুল করে উঠল : লাস্ট টাইমমে তুম ভি। পঞ্চার পোকায় খাওয়া নীল দাঁতটা বেরিয়ে এল। হরি ডিউটি ঘরের পাশে চাপাকলে হাত মুখ ধুয়ে ফেলল। পকেট থেকে এককুচো সাবান বের করে মুখ ঘষল। সাফসুফ হল। রামশরণ সাততাপ্পি দেওয়া জুতোজোড়া খুলে, পায়ের আঙুলের ফাঁকে স্যাঁৎসেঁতে হাজা চুলকোচ্ছিল বসে বসে। লোকটার জন্য হরির দুঃখ হয় : সার্ভিস রেকর্ড অক্ষয় অমর করতে গিয়ে লোকটা নিজে না মরে।

—সেকেন্ড ট্রেনে কাম করবে তাহলে?

—জরুর।

—জাহান্নামে যাও। আমার কী?

সাফসুতরা হয়ে সাইড ব্যাগটা কাঁধে ফেলে পচা মাছের দুঃখে শরীরের ক্লান্তিতে সে লাইন ধরে এগোল। যে লাইন দিয়ে স্যাক্সবি আর ফিলিপ্‌সের লেবাররা কাজে যায়, ঘরে ফেরে।

হাজা চুলকোতে চুলকোতে রামশরণ দেখল হরি চলে যাচ্ছে। রামশরণের গতরে দরদ জাগছিল। চোখ টাটাচ্ছে। রাত জাগার ক্লান্তি আর ইঞ্জিনের ধকলে। ভুখও লেগেছে জব্বর। রামশরণ কমলা মাসির ঘুপচির সামনের ব্যাটারির বাক্সের ওপর বসে পড়ল।

—চারটে কচুরি।

—চা খাবা না!

—হ্যাঁ।

—ডিউটি শ্যাষ।

—নাহ্। আবার ছুটতে হবে।

—ক্যানে!

—ডবল ডিউটি।

—আইজ আবার কীসের ডবল ডিউটি।

মাসিও খোঁজ রেখেছে। গলার ঝাঁজে মালুম হল, তার সমর্থন আছে। মাসির চোখ দুটো বিস্ময়ে মানুষটাকে দেখছিল। কেমনতরো মানুষ। তড়াক করে পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে রামশরণ উঠল। মাসি ততক্ষণে হাত চেপে ধরেছে। রামশরণ ভীতভাবে চারদিক দেখল।

—কাজটা ভালো করতাছো না।

—কওন কাম?

—বুড়া হইছো, ওস্তাদ বইলা ডাকে। তাই। নাইলে কামটা তুমি ভালো করো নাই।

রামশরণ আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল : ছাড়ো-ছাড়ো।

রামশরণ হন হন করে শেডে চলে এল। ইস্পাতের পাত। রেল লাইনগুলো যেন মৃত্যুর অপেক্ষায়। কারা যেন রেল লাইন উপড়ে ফেলবে। ইঞ্জিনগুলো অবসন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। ধোঁয়া নেই। কেবল ওই যা সেকেন্ড ট্রেনের সাতান্ন আপ ইঞ্জিনটা থেকে থেকে গরল ঢালছে। শেডের আবহাওয়ায় উত্তাপ নেই। রামশরণ ফাঁকা নিরালা লোকোশেডে ভীষণ অসহায় বোধ করছিল। পঞ্চা একটা রেইঞ্জ নিয়ে ইঞ্জিনে উঠল। পঞ্চার মতলবটা কি! রামশরণ ভাবল কী ভাবে সে এই ফচকে বদমেজাজি ছেলেটার সাথে ক্যানিং তক যাবে। এমন সময় আবার মেসেজ এল। জলদি ট্রেন নিয়ে যেতে হবে। টাইম কভার হতে চলল। ফেল করলেই চার্জশিট। এতদিনের সার্ভিস রেকর্ড। রামশরণ হাঁক দিল : এই পঞ্চা!

পঞ্চা যেন খুব চমকে উঠল ডাকটা শুনে। সে ইঞ্জিনের চাকার ভেতর থেকে ইঁদুরছানার মতো বেরিয়ে এল। আর অযথা হাঁপাতে লাগল।

—সব ঠিক হ্যায়।

—হু।

পঞ্চার কোটরে বসা ম্লান চোখ দুটো চিকচিক করছিল। রামশরণ ধীরে ধীরে ইঞ্জিনে উঠল। আটটা সাতান্ন আপ। আর লেট করলে চলে না। ভ্যাকুম টানল। চোখ পিট পিট করে সে পানি দেখল। পিস্টন চেক করল। তারপর সিটি বাজিয়ে দিল...। ইঞ্জিন বিগড়ে বসল। আগেই রামশরণের মনে কু ডেকেছিল সে পাত্তা দেয়নি। চোখ দুটো ধক্ ধক্ করতে লাগল।

—এ পঞ্চা!

—আমি কী জানি।

—হাড় ভেঙে দেবে।

—আমি জানি না ওস্তাদ।

—আমার রেকর্ড খারাপ করলি... তোর নকরি খেয়ে দেবো।

—ওস্তাদ!

ক্রমশ ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে লাগল পঞ্চা। রামশরণ ধীরে ধীরে জন্তুর মতো থাবা বিছিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল...বে-ই-মান। লিকলিকে পঞ্চা সরতে লাগল। বয়লারের আগুনের হলকায় তাদের মুখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পঞ্চা চিৎকার করল : ওস্তাদ ইমান কাকে বলে?

কথাটা বিদ্যুতের মতো সাংঘাতিক শক্তিতে রামশরণকে ছিটকে ফেলল ওয়াটার কলামের সামনে। কথাটা শোনার সাথে সাথেই সে ছিটকে এল। সওয়া হাত জিভ বের করে গ্রীষ্মকালীন কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগল।

আশ্চর্য! রামশরণ নালিশ ঠুকল না। সেদিন সেকেন্ড ট্রেন থেকে সমস্ত ট্রেন বন্ধ ছিল। ওয়াচম্যানরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। আর সেকেন্ড ট্রেন সম্পর্কে ড্রাইভার রামশরণ রিপোর্ট দেয় : যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ইঞ্জিন অচল।

আকালকন্যা কুসুম

বংশ পরিচয়।

জাতে মালো। মাছ মেরে খায়। মাছুয়া। মাছুয়া বলাইর সম্বল : একটা খ্যাপলা জাল, আড়কাঠি, আর সাত ফলার কোঁচ। আর হাওলাত দুশো টাকা তেরো আনা। টানাজাল, জালকাঠি এসব কেনা ক্ষ্যামতায় কুলোয়নি কুসুমের আজা বলাইর। তার জন্যে আছে আড়তদার মহাজন ছিনাথবাবু। জেলেডিঙি নেই। তার জন্যেও ছিনাথবাবু। মাগের পাছায় কাপড় নেই। তার জন্যেও ছিনাথবাবু। নদীনালায় বুকে হেঁটে যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনবে সেটুকু শুধু তেনার পায়ে ঢেলে দিতে হত। তার থেকে সুদ কাটান যাবে, নৌকো জাল বাবদ যাবে আরো কিছু, পাইকিরি বলে ওজনের মা বাপ থাকবে না। হ্যাঁচকা ওজন হলে কী হবে, একটু নুন তেল আর দু-সের চাল আর কোমরের খুঁটে লাল ডবল পয়সা দু-চারটে নিয়ে কুসুমের আজা বলাই ঘরকে যেত। সে ঘরটাও এক বার ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। আজার তখন দেড়কুড়ি চলছে। তালপাতা পাড়তে গাছে উঠেছিল। সেই কাল হল। তালপাতার ছাউনি দিল ঠিকই। কিন্তু লড়বড়ে হাত আর বুকের একটা ব্যথা নিয়ে তে রাত্তির কাটাতে পারল না। সেই নিয়ে সমুদ্রে গেল। ফি-সন যেমন যেত। মরশুমের ভাসান। সম্বৎসরের খোরাকি আসত যা থেকে। কুসুমের আইমা তেল সিন্দুর দিয়ে পানির বন্দনা করেছিল, তবু আজা ফেরেনি।

আইমার ছিল মাজা মাজা রঙ। আড়তদার ছিনাথবাবু সেই রঙ চাটত এসে রোজ। আর মেটে হাঁড়িতে দুইপর বেলা আধখানা প্যাঁজ, এক আধ সের চাল আর গোটা তিনেক আলু সেদ্ধ হত; আর আইমার কালা রঙ ধলা হতে লাগল। শেষে সাদা হয়ে গেল। শ্বেতবানি হল। মালোপাড়া বলত : পাঁচ ভাতারির ব্যামো, রাঁঢ়িগিরি করলে নির্যস এই হবে। এ রোগে ট্যাঁকে না। কালো ডবকা একটা মেয়ে রেখে আইমা শ্বেতবানিতে সাদা হয়ে মরল। মেয়ের নাম বাসন্তীবালা। মালোপাড়ার জোয়ান মদ্দ ধীরেনের সাথে বাসন্তীবালার বে হল। বছর তিনেক সুখে-দুঃখে কাটতে না কাটতে ধীরেন ছিনাথবাবুর সুদের খ্যাপলা জাল গলায় জড়িয়ে খাবি খেতে লাগল। পাট-জোয়ান বউটাকেই সুদ বলে ধরে দিল। রোজ রাতে দিয়ে আসত নিয়ে আসত। শালবনে যে বাঘ থাকে! বাসন্তীবালাকে একা ছাড়তে ধীরেনের ডর লাগত। ধীরেন যে বাসন্তীবালা বলতে মূর্চ্ছা যেত। কুসুম তখন তিন বছরের টুকি। ধীরেনের ঔরসে বাসন্তীবালার গর্ভে কুসুমের জন্ম। কুসুম যখন চার বছরের তখন বাসন্তীবালার পেটে আর একটা এল। ধীরেন ফণা তুলেছিল : মহাজনের টোকা আমি পালব কাই? ছিনাথ আড়তদার বাসন্তীর পেট খসাতে হাতুড়ে বদ্যির কাছে নিয়ে গেছিল।' টিনের পাত দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বদ্যি বাচ্ছাটাকে শেষ করে বাসন্তীকেও প্রায় শেষ করেছিল। সেই যে রক্তস্রাব শুরু হল মরার আগে আর

তা থামেনি। এই বাসন্তীর কন্যা কুসুম। ধীরেনের কন্যা কুসুম। কুসুম মানে পুষ্প। ফুল। মরার আগে বাসন্তীবালার হয়তো ফুল ভালো লেগেছিল। তাই নাম রাখল কুসুম। তার আগে কুসুমের কোনো নাম ছিল না। টুকি বললে সাড়া দিত। খলখল করে উঠত। টুকি মানে মেয়ে।

কুসুম যখন পেটে এল সেবার দারুণ আকাল। পাড়াপড়শি মেয়েটাকে ডাকত আকালি বলে। সেই থেকে নাম হল : আকাল কন্যা কুসুম।

কুসুমের হাউস

রাঁড়ির ঝি রাঁড়ি হবে। তিন পুরুষ রাঁড়ি হলে তো জাত ব্যবসাই হয়ে গেল। মালো পাড়ায় এমন দু-দশ ঘর আছে। বড়ো রাস্তা বন্ধ হলে তবেই ওই গলি মাড়ায়। কুসুমের গায়ে বাঁকা চোখ লাগতে শুরু করেছে। ফরেস্টার থেকে মোক্তার বাবুর ক্যাবলা ছোঁড়াটার চোখে অব্দি রস এসে যায়।

অথচ কুসুম ছুঁড়ির বয়েস আর কত। তেরো পোরেনি এখনও। এরই মধ্যে বুকে মাজায় ভারী হয়েছে। বাপ-বেটির পেটেরটা কুসুমই জোগাড়যন্তর করে। ধীরেন গোসাপের মতো পড়ে থাকে কুঁজো ঘরে। শামুক, গুগলি, শুশনি শাক, ব্যাঙের ছাতা, জোগাড়যন্তর করে মেয়েটা দিনাদিনি একবার কিছু না কিছু ফোটায় ঠিক। ব্যাঙের ছাতা তোয়াজ করে রাঁধতে পারলে তো শোল মাছকে বলে ওদিক থাক। সোয়াদ যা খোলে একেবারে অমরেতো। হ্যাঁ একনাগাড়ে যদি ওই জাবনাই পেটে চাপান দিতে থাকো তবে ফুস্কুরি উঠবে নির্যস। মুক্তোর মতো টলটল করবে পুঁজ রস নিয়ে। সেই ঘা সহজে আর ছাড়তে চায়না যতোই শেকরবাকড় ঝাড়ফুঁক করাও না। ব্যাঙের মুত থাকে যে। কুসুমের নাগাল পায়নি এখনও। বাপসোহাগী কুসুম।

ফরেস্টারের কোয়ার্টার ডিঙিয়ে বুনোঘাস আর শাল গাছের সারির ভেতর দিয়ে বুকে অন্ধকার সাপটে নিয়ে, শুশনি শাক নিয়ে, কুসুম ফিরতো। তেরো বছরের টুকি। ভিটকপালি আগুনখাকি মা কুসুমকে খালাস দিয়ে চার বছরের ভেতর নিজেও খালাস নিয়েছিল। শেষের দিককার দিন ক-টা বাসন্তী দিনরাত্তির গাল পাড়ত : সৌতুনের ঝি সৌতিন! রাঁড়ির ঝি রাঁড়ি! আঁতুড় ঘরে মুখে মালসার আগুন ঠেসে দিলাম না কাই?

আর তেরো বছর বয়সে কুসুম মা দিদিমার নাড়িনক্ষত্র জেনেছিল। বাপ ছাড়া কোনো মরদের কাছ ঘেঁষত না। আর মনে মনে দিনরাত্তির ভাবত : আপদ যাবে কবে! অ্যাঁই! বাপ তো কী হয়েছে। মাথায় লিয়ে লাচবে নাকি। হুঁ, বনের বাঘ খেদাত। মল্লে কুসুম হালকা হয়। ওদিকে আবার গোসাপটার সামনে সাঁঝের মুখে চা'ট্টি তুলে না দিলে মন কেমন করত। শত হোক বাপ। জম্মো দিয়েছে।

সেই কুসুমের মনে হাউস জাগল। ঘর বাঁধার হাউস। একটা শখ বটে! লেশা বটে! কিন্তুক ইটা না থাকলে মানুষির থাকেটা কী?

জাত বেজাত পাড়াপড়শি শত্তুর মিত্তির সব ওই এককথা ভেবেছিল। মালোপাড়ার নিয়ম ইটা। ই হবেই। বয়সির ধম্মো। কুসুমের চোখ দেখোনি কাই?

হয়তো তাই। বয়েসকালে পোড়া চোখে ছটফটানি বাড়ে। ল্যাটা মাছের মতো মনটা চিগির দিয়ে ওঠে। আবুঝ বেবুঝ মন।

আর সে রাতে শালবনের মাথায় পিচকিরি দিয়ে লাল রঙ ছুঁড়ে মেরেছিল কে যেন।

ফিসফিস করে মরদটা কুসুমের নরম কানের লতি চিবিয়ে খাচ্ছিল : কাল দুফোর বেলা আইসিব। আনেক কথা আছে। তুই যে ফিতা চাইতিলু সি ফিতাটা লিয়ে আস্‌সি। দেরি করবিনি! পট করে আইস্‌বু।

কুসুমের বাপের কথা মনে পড়েছিল। ধীরেনের কথা। বাপের নাকি কঠিন ভালোবাসা ছিল। কঠিন ভালোবাসা। কুসুমের বোধভাষ্যি কম। ভালোবাসা, পিরিত, রঙ—এসব আবার কী! শরীলের টানটা কুসুম তেরো বছরেই বোঝে। কিন্তু মা আর আইমার কথা ভাবলেই ভালোবাসাটা কেমন ঘোলা জলের মতো লাগে। চোরা বানের মতো মনে হয়। কুসুম বোঝে না।

ভাবে : আছে হয়তো! কুসুম জানে না। যে জন্যে বাপ শালবনের ভেতর দিয়ে ঘুটঘুট্টি রাতে ছিনাথবাবুর কোলে দিয়ে আসত মাকে। যদি বাঘে খায়। আবার সাথে করে নে আসত। এরই নাম ভালোবাসা। কুসুম কি কাখোয় ভালোবাসে? হুঁ হুঁ বাসে। নিজের পেটটা টাটালে বাপের পেটটার কথা মনে হয়। কুসুম নির্যস বাপকে ভালোবাসে। নিজের পেট ছাড়া মানুষ আর যার পেটের কথা ভাবে তাকে সে নির্যস ভালোবাসে।

ফিতের কথা বলেছিল মরদটা। বড়ো বোয়া। ছাতি তো লয় যেন নিড়েন দেওয়া ক্ষেত। লোম কী রে বাপ? বলে কিনা—ফিতাটা লিয়ে আসসি। ফিতা বেঁধে যেন সগ্‌গে যাবে কুসুম। মরণ!

তিনদিনের শুখা পেটে হাত দিয়ে বড়ো বোয়ার সাধের মেয়েমানুষটা ফোঁস করে উঠেছিল: ভাত দিতে পারবি? ভাত!

বড়ো বোয়ার হাসির বহর কী! যেন দুধ ওগরাচ্ছিল : পাছার কাপড় লিবিনি কাই!

কুসুমের কালো মাথার ওপর লাল ফুলের চাঙর আর সামনে মরদটার বুকের ছাতি।

হক হাসি পেল এবার : ন ন্ না, ন্যাংটো হয়ে খিল দে থাকব হুঁ...কিন্তুক ভাত চাই...জীবনভর তুকে খাওয়াতে হবে...শেষে বলবি...

: ধুস!

বড়ো বোয়া পাকা রাস্তা থেকে কাউখালি নিশ্চিন্দিপুর রুটে রিকশা টানে। নিজেই কিনেছিল গাড়িটা। জমিন বেচা টাকায়। বড়ো বোয়া মানুষ ভালো। কুসুম নজর করেছিল মহল্লার আর কোনো মেয়ের দিকে ওর চোখ নেই। বাপ যেদিন চোখ বুজল সেদিন সাঁঝেই কুসুম রিকশাওয়ালার ঝাঁপে ধাক্কা মারল : কবাট খুলিসনি কাই?

মালোপাড়া রঙতামাসার কথা বলল। বড়ো বোয়ার ইয়ার দোস্ত মজা মেরে গেল : রাতটুকুনও তর সইলনি! আর কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার শালবনের মাথার ওপর থেকে লাল রঙের ছোপটুকু মুছে ফেলল। অন্ধকারে কুসুমের ভয় লেগেছিল, খিদে পেয়েছিল। গোটা পেটটা গুলিয়ে উঠেছিল অসহ্য এক খিদেয়। রিকশা নিয়ে বড়ো বোয়া মুড়ি চিঁড়ে পাউরুটি ছাইপাঁশ যা হোক আনতে বেরিয়ে গেল। একা থাকতে কুসুমের ভয় করল না। সকালবেলা বাপ

মরেছে। বাপের কথা ভেবেও ভয় লাগল না। এখন কুসুমের একটাই হাউস। পেট ভরে খাবে।

কুসুমের কন্যালাভ

গতরে বাতাস লাগিয়ে কুসুম ঘোবে না। আর সাঁঝ না লাগতে সাবান লাগিয়ে গা-হাত-পা ধুয়ে-পাখলে মোক্তার বাড়ির বউ বিটির মতো সিঁদুরের টিপ পরে পটের বিবিও সাজে না। হাটের নষ্ট মেয়েমানুষের মতো বায়োস্কোপের গানও গায় না। মালোপাড়ার কোন্ মাগি সোয়ামির ওপর বসে খায়? কুসুম আমন আউশের টাইম উলিঙ্চা করে (বীজ ধান শুকিয়ে নেয় ঢেলে)। পাকা রাস্তায় ঘুঁটে দিয়ে তো কুঠ ধরিয়ে দিয়েছে। দু-চার পয়সা যা হয় বড়ো বোয়া ঠেকলে ঝোকলে বের করে দেয়।

আর সাঁঝ গড়িয়ে রাত...রাত কেটে ভোর... ভোর থেকেই দুপোর...কত দিনই তো গেল। বড়ো বোয়ার জন্যে কুসুমের এখন দরদ হয়। নিজের মুখেরটা রেখে দেয় বড়ো বোয়ার জন্যে। পেটটাই কি বড়ো নাকি। কুসুম কি ভালোবাসতে শিখে গেল—অ্যাঁই!

বড়ো বোয়ার মাথায় কিন্তু এখন দ্যাখ না দ্যাখ আগুন চড়ে। খরখর করে জিভ। তেমন তেতেপুড়ে গেলে চড়চাপড় তো আছেই। কুসুম গায়ে মাখে না। মাগের গায়ে মরদ হাত দেবে না তো হাত দেবে কি ভিন পাড়ার মুদি? আর কথায় বলে দুধ দেয় গোরু তার লাথি সহ্যি হয়। কিন্তু দুধেই এখন টান লেগেছে। সেই টান গিয়ে পৌছেছে কুসুমের ঢালা চুলে। আর যায় কোথায়!

: খবদ্দার, চুলে হাত দিবি তো...।

: ই, তেজ! তেজ!...দ্যাখ, দ্যাখ।

চুলের সঙ্গে রক্তের ফোঁটা উঠে এল। প্রথমবার কুসুম ভালোমুখে মানা করেছিল। মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলেছিল। ভাতারের রাগ হলে, শরীলে জ্বলন লাগলে মাগকে ধরে পিটবে এ আর বেশি কি। তাই বলে চুলে হাত! বড়ো বোয়া কি রামায়ণ শোনেনি? মনে নেই রাবণের উপাখ্যান? অমন যে সোনার লঙ্কা তাই ছারেখারে গেল সীতার চুলে হাত দিয়েছিল বলে।

কাক কালো একগোছা চুল হাতে নিয়ে কুসুম পাকা রাস্তার পাশে বসে থাকল ঠায়। বড়ো বোয়া রিকশা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ও শত্তুর আজ দূর করে দেবে। একে তো খদ্দের নেই। বলে মানুষের পেটে নেই ভাত, তার রিকশা। দু-চার ঘর বাবু যা ছিল তাও নোকরি চাকরি নিয়ে হিল্লি দিল্লি কলকাতা চলে গেছে। মালোপাড়ার সাতবাসী পোড়া হাঁড়ি লাঠি মেরে কে যেন ফাটিয়ে দিয়েছে। পেটের আগুনে মালোপাড়াও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঠিকা কাম নিয়ে কে কোথায় ছিটকে গেছে। মালোপাড়ায় এখন আর কোঁদল ক্যাঁচালির সাড়া নেই। আকালের টাইমে নাকি এমনিই হয়। আকাল আসছে, আকাল। পেটে দানা নেই মানুষের, রিকশায় চাপার হাউস নেই কারো!

আকালকন্যা কুসুম একগোছা চুলের ভেতর সর্ষে দানার মতো রক্তের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে আকালের কথা ভাবছিল। আকাল মানে : গরিবগরবার পাইকিরি মৃত্যু। মার থানে

যেমন বলি হয়। তেমনি দশ-বিশ বছর বাদ বাদ আকালে গরিবগরবা জবাই করে। কারা করে? ছিন্নাথবাবু? দারোগাবাবু? মোক্তারবাবু?

আবার কুসুমের আমসি চোখ গিয়ে পড়ে চুলের ভেতর। গোবরের নাদায় মাছি ভনভনিয়ে উড়ছে। কুসুমের বুকে এসে বসছে। হঠাৎ পেটের ভেতর একটা ডেলা মতো নড়ে উঠল। কুসুমের সন্তান। আকালে সন্তান এসেছে কুসুমের পেটে।

আচ্ছা বড়ো বোয়া কী চায়? কুসুম গোলায় যাক? বাপের মতো বড়ো বোয়াও কি কুসুমকে গোলায় দিয়ে আসবে? হাতে সড়কি নেবে শালবনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়? তখন কি আবার শালবনের মাথায় কেউ রঙ ঢেলে দেবে? লাল রঙ?

আঁতুড় ঘরে মুখে মালসার আগুন ঠেসে দিলাম না কাই?

কুসুমও ভাবে : কাই? কাই? কাই? আব ভাবে, পেটেরটা যদি মেয়ে হয় তো তাই দেবে। নাহলে গলায় পা তুলে দেবে। কাউখালি খাজরিতে আর টুকি হবে না। টুকি থাকবে না।

রক্তের দানাসুদ্ধ চুলের গোছা গোবরে ঠেসে, কুসুম পাকা রাস্তায় থপাস করে মারল: পাঁচ আঙুলের দাগ নিয়ে রাস্তার বুকে ঘুঁটে ফুটে উঠল। আর হঠাৎ কুসুম বেবাক ভুলে গেল।

মিলিটারি ভক্ষণ

হাওলাতে হাওলাতে বড়ো বোয়ার লোম সুদ্ধু বিকিয়ে গেছে। ঝরঝরে, জঙ ধরা রিকশা বেচে আর ক-টা পয়সা পাবে? সব শোধবোধ দিয়ে হাতে থাকল তিরিশটা টাকা। বড়ো বোয়া রিকশা বেচে তিনদিনের দিন নিরুদ্দেশ হল। চাটাইয়ের তলায় দশ টাকার একটা আস্তো লোট রেখে গেছিল কুসুমের জন্যে। দরদ! ভালোবাসা!

ভেবেছিল মার কথামতো মালসার আগুন ঠেসে দেবে মুখে। এক ফোঁটা ছানাটার গলায় পা তুলে দেবে। তারপর গোড়ালির একটা মোচড়। কোমরে একটা ঝাঁকি। আর দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটা বিষ ব্যথা পিষে ফেলবে জাঁতাকলে। ঠ্যাং দুটো নাড়িয়ে এক রত্তি মেয়েটা যখন ডুকরে উঠল, কুসুমের মমতা জাগল। অদ্ভুত মমতা। মালোপাড়ার কুঁজো বুড়ি ফুল কাটতে এসে বলে গেল : টুকি হয়েছে কুসুম। টুকি! কুসুম জানত না নিজের মনটা এমন তুলতুলে। কাদাকাদা। মেয়েটার মুখে মাইয়ের বোঁটা ধরে দিয়ে কুসুমের মন গলে যেতে লাগল...ফোঁটা... ফোঁটা করে। আর হঠাৎ নাইকুণ্ডু সমেত তলপেট যেন ফেটে যেতে চায়। পাঁজরার তলায় পাতলা চামে ঢাকা যে একটা খোল আছে মানুষের। পেট। পেট। পেট।

কবে যেন ব্যাঙের ছাতা খেয়েছিল, কুসুমের এখন ঘা হয়েছে। পচা ঘা। গোটা কাউখালি গরম লোহার শিকের মতো রোদে পেট বিঁধিয়ে পড়ে আছে। ব্যাঙের ছাতা না গজাতেই মানুষের হাত কুচ করে ছিঁড়ে নেয়। শুশনি শাক উধাও। শামুক-গুগলির বংশ মরে গেছে। কাউখালি রিলিফের খিচুড়ির জন্যে চোয়াল ফাঁক করে রেখেছিল। রিলিফের বদলে এল মিলিটেরি। ফরেস্ট আপিসের সামনে। স্টেশনের সরকারি গুদামের টিনের নীচে। মরেহেজে রুখাশুখা দু-দশ ঘর যারা টিকে আছে তারা নাকি এবার মিলিটেরি ধরে খাবে। জোর গুজব।

কুসুমের ঘেন্না ধরে গেছে। মানুষ জাতটার ওপর। বড়ো বোয়ার কসুর নেই। খাওয়ানোর ক্ষ্যামতা নেই, ছেড়ে গেছে। হাতে ধরে তো আর গোলায় দিয়ে আসতে পারে না। ভেবেছে, গেলে একলা যাক। নাহ্, ভালোবাসত বটে মানুষটা! কঠিন ভালোবাসা!

ন্যাতার শেষ ফালিটা অব্দি ফেঁসে ফেঁসে সুতো হয়ে গেল। ঘরে খিল দিয়ে কুসুম ন্যাংটো হয়ে থাকে দিনভর। কিন্তু পেট তো শুনবে না। আর যে ছানাটা কুসুমের বুক খাবলে পড়ে থাকে তার মুখেও তো তুলে দিতে হবে দানা। কথায় বলে : দানা, না খেলে হয় কানা।

তবে কি রাঁঢ়ি হবে? গোলায় যাবে নাকি? নাহ্, দরকার হলে মেয়ের গলায় পা তুলে দেবে তবু গোলায় যাবে না। মাটিতে আছড়ে ফেলে পেটটা ফাটিয়ে ফেলবে ব্যাঙের মতো। কিন্তু না, গোলায় যাবে না কুসুম। তার থেকে কুসুম জন্তু হবে। মানুষ থেকে কি ছাই লাভ হচ্ছে। যে বাঘের ভয়ে বাপ সড়কি নিয়ে যেত শালবনে, কুসুম সেই বাঘ হবে। এক হপ্তা পেট বেঁধে কুসুম নিশুতি রাতে চুল ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফিরল খানিকটা ভাত আর রুটি নিয়ে। আশপাশের দশটা গাঁয়ে গেরস্থরা ডাইনের ভয়ে রাতে জল করা বন্ধ করে দিল : নেবে তো চাট্টি ভাত! দু-চারজন সদর হাসপাতালে ভিরমির চিকিচ্ছে করাতে গেল।

রাঁঢ়ির ঝি কুসুম রাঁঢ়িগিরি ঠেকাতে ডাইন হয়েছে। ছ-মাসের মেয়েটার নখ হয়েছে এক আঙুল। আর মিলিটেরি খাওয়ার খবরটা কাউখালি থেকে জেলেডিঙি করে চাপান অব্দি চলে গেছে।

ক মু নি স

হাঁসের পালক ও পর্বতের কথা

ফের একটা শত্তুর।

এক্কেবারে গলির মুখে। ভেজান্যাতা মাটিতে পামসু সমেত একটা পা আলতো করে ছুঁইয়ে রেখেছে। হাতের পাঁচটা তাঁবেদার আঙুলই হিসহিস করছে কাজ হাসিল করার জন্যে। যার এক টুসকিতেই যন্তর নিয়ে মালিপাড়া থেকে গাঁজার কলকের কালো টিকে কপালে লাগিয়ে, বিশু খানার ভেতর থেকে কানকো ভাসিয়ে দেবে : শালা...। জান জিম্মা পড়ে গেছে। গায়ের লোমছেঁড়া একটা অনুভূতি বরফের মতো পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে যাওয়ার কথা। সাফ সাফ মৃত্যু দেখে ধাতুর মতো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো ব্যাঙের মতো গর্ত ছেড়ে রাস্তায় লাফ দিয়ে পড়ার কথা। গোরার ধাত-ধাতু আলাদা। দু-চার কদমের ছোটোমোটো লাফে রাস্তার গর্ত, জলকাদা টপকে তার দিকে এগিয়ে চলল। গুলের দাগধরা দাঁত আর পাইরিয়ার টকটকে লাল ফোলাফোলা মাড়ির ভেতর শত্তুরের সাদা পাতলা হাসিটা মিলিয়ে যেতে লাগল। শত্তুরের চেহারা এবার স্পষ্ট হচ্ছে : মদের পিপের মতো বেঁটেখাটো চ্যাপ্টা শরীর। ভুঁড়ির ওপর কুয়োর মতো অন্ধকার নাইকুণ্ডু ঢাকা লোম। উদোম উদলা গা, কোমরের নীচে চেকচেক লুঙ্গির গেরো। কুতকুতে চোখে পিছল খাওয়া নজর।

সেই নজর সার্চলাইটের মতো ঘুরে ঘুরে এসে গোরার মুখে গোল হয়ে পড়েছিল। গোল হয়ে ছাঁকনির মতো গোরাকে ঘিরে লাফাতে লাগল শত্তুরের দৃষ্টি। হিউজ রোড থেকে তেইশ নম্বর বস্তি অব্দি আসতে গোরা এই নিয়ে তিন তিনবার শত্তুরের মুখোমুখি হল। পয়লা শত্তুর এক বামপন্থী। গোরা তার সরলসোজা মুখখানা সরে যেতে দেখেছে গ্যাস কোম্পানির ঘেয়ো পাঁচিলের আবডালে। তারপর দশবিশ কদম পকেটে কব্জি ঢুকিয়ে হেঁটে এগোতে নারাণের খাড়া চুল দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। কানের ভেতর গরম তরল সিসে ঢেলে দিয়েছে নারাণ: সুকুকে তোলতাই করে নিয়ে গেছে।

: কে বল্টুরা?

: হ্যাঁ।

: বুড়োদের খবর দিয়েছিস?

: নাহ্ আমি তো দেখিনি, একটু খোঁজ নিতে হবে, শোনাকথা...

: তুই খোঁজটা নিয়ে সুকুর বাড়িতে চলে আয় এক দেড় ঘণ্টার ভেতর...ফালতু খবর হলে সবসুদ্ধু গিয়ে শেষে...।

: ঠিক আছে।

তারপর হিউজ রোডের মোড়ে আরেকটা। গোরার নামধাম মুখস্থ থাকলেও চেহারা দেখেনি। তাই গোরা যখন খোচরটার পাশ দিয়ে শান্ত নিরীহ পা ফেলে চলে গেল, খোচরটা তখনও

পান চিবোচ্ছে। আর এখন এই তিন নম্বর। তিন নম্বরের মাঝের আঙুলে একটা স্টিলের আংটি। আংটিতে মানুষের কাটামুণ্ডু।

একটু ফুরসত ছিল। দু-পা সরে গিয়ে খোকার নজরে নজর মিলিয়ে পা টিপে এগোতে পারত। নাহলে সেরেফ উল্টো রাস্তা ধরে হাওয়া হয়ে যাওয়া। গোরার এখন সবকিছু জলদি জলদি। খুকুর সাথে দেখা করাটাও। তারপর একবার সুকুর ওখানে খোঁজ নেওয়া। এ বি-র জন্যে টাইমে হাজিরা। হাতের কাজ চুকিয়ে ফেলাই ভালো। ধর তক্তা মার পেরেক। ব্যাস। খোকার কুতকুতে চোখের পাতা একবার পড়ার আগেই গোরার মগজ মেশিনের মতো ঝটাঝট হিসেব কষে ফেলেছিল : একেবারে সামনে গিয়ে গা ছেড়ে দাঁড়াও, ওতেই ভড়কে যাবে। এর চেয়ে ভালো দাওয়াই আর নেই।

গোরা হাসতে লাগল। একটু কাত হয়ে দু-তিন হাতের ফারাকে দাঁড়িয়ে শব্দ করে হাসি। আর শত্তুর সিঁটিয়ে যেতে লাগল : ভালো তো? আর গোরার হাসি। হাসির দমকে হাতের আঙুল গুটিয়ে মুঠো, মুঠো ভেঙে এলোমেলো শিথিল আঙুল আপসে আপ তার বুক আর গলার সামনে নড়তে লাগল। গুদোম পাতলা করে দেওয়ার সেই পুরোনো খাড় নেংটি ইঁদুরের মতো সুরসুর ঢুকে গেল শত্তুরের নাকের লম্বা চুল বেয়ে।

: একটু চা আনাই!

: নাহ্। থাক।

একেবারে ছকের মতো মিলে গেল। তেইশ নম্বর বস্তির নালার ওপর চেরা বাঁশের মাচানে শব্দ ফাটিয়ে গোরা ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যিসত্যি হেসে ফেলল। শত্তুর! এটা আবার একটা শত্তুর। খোকার চোখজোড়া তখন তেলাপোকার মতো সুরসুর করছে। আর এই চোখ একদিন দেখেছে চালের বস্তার ধুলোওড়া ফাঁকা গুদোম। গুদোমের অসাড় ম্যাড়ম্যাড়ে দেয়াল।

খবরটাও ছিল জব্বর : সাত নম্বর বস্তির ভেতর খোকা গুদোম বানিয়েছে। চালের গুদোম। চোলাইর ব্যাওসার সাথে এই লতুন ব্যাওসা চালু করেছে। দিনদুকুরে লাশ হাপিস, নেতাদের সাথে পিরিত খাতির, হোমরাচোমরার সাথে ওঠাবসা করে খোকার তখন পোয়া বারো। সাত নম্বর বস্তির পেঁচিকে জবরদস্তি নিয়ে গিয়ে একরাত আটকে রেখেছিল। কালুদাদের মতিঝিল বস্তির এক নম্বর ক্যাডার টুকাইদাকে পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছিল। এখন আবার সেই কালুদাদের সাথেই মাখোমাখো চলছে। আর ওদের লাইন তখন কাঁটা দিয়ে কাঁটা সাফ করা। সব জেনেবুঝেও নারাণদা জোঁকের মতো কামড়ে ধরেছিল। সব তখন এক ঝান্ডা এক পার্টির তলায়। হলে কী হবে, গোরাদের এলেম তো নারাণদার হাতেই। এক পার্টিতে থেকেও নারণদার একটা দল ছিল সোনা, বুড়ো, গোরা, মন্টু এদের নিয়ে। বস্তির লোক খবর পেয়েই পিলপিলিয়ে এসে গেছিল। একবারে ঝেঁটিয়ে এসেছিল সব। দেড়ঘণ্টার ভেতর গুদোম ফাঁকা। ন্যায্য দামে সব চাল বেচে গোরা ক্যাশবাক্সোটা বসিয়ে দিয়েছিল খোকার ভুঁড়ির ওপর। পুলিশ বাহানা করতে এলে গোরাই আগে বেড়েছিল : সিজ করে তো উদ্ধার করেছেন, এখন বাগড়া লাগালে লাইনটা দেখছেন তো, ব্যাস কেটে পড়ুন।

খবর পেয়ে গোরার বাবা ছুটে এসেছিল হোমিওপ্যাথির বাক্সো ফেলে। রিটায়ার করার

চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই বাক্‌সোটা আগলে ধরেছিল লোকটা। ধোঁয়া লাগা চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে চামড়া চেরা চোখে ক্ষুদে ক্ষুদে শিশি হাতড়াতেন : সিনা থারটি...এই যে...। তারপর কাগজের পুরিয়ায় নখের দাগ আঁকা ভাঁজ। সামনের দাঁত ক-টা কট্ কট্ শব্দে খুলে ফেলে হিসেব করতেন মাঝে মাঝে : বি এ পাশ করানো বাবার ডিউটি এখন ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় ঘুরলে আমার কী। একটা ডিসপেনসারি খুলে বসব আমার ওতেই চলে যাবে, কিন্তু নিজের পেটেরটা জোগাড় করে নিতে হবে, সোজা কথা। লাল ঝান্ডায় তো আর পেট ভরবে না। দু-হাতে ছোট সংসারটা আড়াল করে, ব্রজেনবাবুর মুখের আধখানা ঢেকে সরযুবালার সাদা ঠোঁট দুটো তখন নড়চড় করে উঠত : ওই আবার শুরু হল। সরযুবালার থ্যাবড়া সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে মানুষটা আবার কট্ কট্ শব্দ তুলে দাঁত দুটো বসিয়ে নিত : দাঁড়াও মাইনেটা আদ্দেক হোক... বুঝবে তখন। গোরার বাবার পেনশনের টাইম হয়ে গেছিল।

সেই মানুষ রাগে আমপিত্তি কফের নাড়ি বের করে ফেলেছিল : ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চাবকানো দরকার। নেহেরু বলেছিল না দেশ স্বাধীন হলে...। ভিড়ের ভেতর থেকে টুকাইদা তেতে উঠল : হুঁ স্বাধীন! দেখছেন না দেশের হাল। ধোঁয়া রঙের চশমার কাচ সরে গেল। মিটমিট করতে লাগল ব্রজেনবাবুর পিটপিটে চোখ : এই স্বাধীনতার জন্যে সাত সাতটা বছর জেল খেটেছি, এক বছর ইনটার্ন থেকেছি, আর দেখি কিনা যে আই বি অফিসার টেররিস্টদের অত্যাচার করেছে সে ব্যাটা এখন ডেপুটি কমিশনার হয়ে বসে গেছে!

সাতদিন না যেতে নারাণদাকে পার্টি চার্জশিট ধরিয়ে দিয়েছিল। ফ্রন্টের ইমেজ নাকি ওই ঘটনায় ননীর পুতুলের মতো গলে গেছে। শেষমেশ পুলিশের সাথে একটু রগড় লাগিয়েছিল বস্তির লোকজন। তারপর হুটপাট, দুদ্দাড় লাঠি ঝেড়েছিল পুলিশ। নারাণদাকে ও সি থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল' সিককলের ওয়ার্কাররা জিপ ঘিরে ফেলে। নারাণদা তখন চার চারটে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। ও সি-র তড়পানি তাই আপসে থেমে যায়। আর পুলিশের রঙঢঙ দেখে সাত নম্বর তেইশ নম্বরের পুরোনো বাসিন্দরা পুরোনো প্রবাদ আওড়েছিল : যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। গদির গুণ। আর খোকা সেই খাড় পুষে রেখেছে আজ অব্দি। এখন ভড়্‌কে গিয়ে ছেড়ে দিল। কে জানে আবার থানায় ফোন করে নাকি? তাহলে তো নগদ টাকাও পেয়ে যাবে। বেমক্কা। টাকা আর খাড় মেটাতে জানের রিস্‌ক কি নেবে? কব্জিটা ফালতু ফালতু পকেটের ভেতর নেড়েচেড়ে খোকাকে জুড়িয়ে ভিজিয়ে দিয়ে গোরা তেইশ নম্বর বস্তির নালাটা একলাফে পার হল। আসলে ওর পকেটের ভেতর ছিল শুধু পাঁচটা শক্ত আঙুল। একটা মুঠো। ওয়ানসটারটা ছিল সোনার কাছে।

ঢেবির মাথার ঘাপ্যাঁচড়া আর নীল ওষুধ নিয়ে মাটিতে ঝাড়ু লাগাচ্ছিল এক গোছা চুল।

মেয়েটার রিকেটের মরাদড়া হাত দুটো এলিয়ে গেছে মাটিতে। ঠান্ডি মাটি। ইজেরের গিঁটের ওপর ভাসছিল ঢেবির পেট। লাউখোলার মতো পেটটা যেন একতারা বাজাচ্ছে। বিজয় মিস্তিরির মেয়েটার পেটটা দেখতে দেখতে আছাড়ি-পাছাড়ি কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে গোরা তেইশ নম্বর বস্তির অ্যানিমিয়া মার্কা রোদের শেষ ফালিটুকু টপকে চলে গেল। চ্যাপ্টা রাস্তাটা শিককাবাবের মতো সরু আর চোখা হয়ে তেইশ নম্বর বস্তির লাইনবাঁধা ঘুপচিগুলো মাংসের

টুকরোর মতো গেঁথে রেখেছে। পাঁচিলে পিঠ সেঁটে আড়াআড়ি পা ফেলে কাঁচা নর্দমার গা ঘেঁষা লুকোনো-ছিপোনো রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে গোরা খোকার কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিল। খোকার মতো শত্তুরকে গুনতির ভেতর ধরে না। ভয়-ভাবনা, মাথার চুল ছেঁড়া চিন্তা, জোঁকের পেটের মতো কপালের দুপাশের রগের দপদপানি—সব সুকুর জন্যে। বল্টু কি সত্যিই ওকে নেপালার ডগায় তুলে নিয়ে গেল। তারপর কুপিয়ে কিমা বানিয়ে ফেলল। কোপ, কোপ, কোপ। একটা যেন গোরার ঘাড় থেঁতলে দিল। নাহ্ সুকুকে ফাঁসানো অত সস্তা নয়, ওর পেছনেও একজোড়া চোখ আছে। গুজব, একেবারে গুজব।

নর্দমার ধারের রাস্তাটাই বেছে নিল। রাস্তাই বটে! দুটো পা জোড়া করলেই নর্দমায় ঢুকবে। সাবধানী পা সেই রাস্তায় লম্বা হয়ে পড়তে লাগল। ময়লা কলের শিরে চড়া অচ্ছুৎ রোদ তখনও কাঁচা নর্দমাটার ধারে পড়ে হেঁচকি তুলছিল। একেবারে ঢেবির মতো। মাথায় ঘা নেই। ঘায়ের নীল ওষুধ নেই। এই যা ফারাক।

ধবধবা একটা বেড়াল ন্যাকড়ার দলার মতো গড়িয়ে গেল। লাথ্ মারতে গিয়ে পা টেনে নিল গোরা। নরম আরামের মতো বেড়ালটার গায়ে ছুঁইয়ে দিল শুধু। ফ্যাকাসে আঙুলের নখ ডেবে গেল হালকা রোঁয়ার ভেতর। সাদা সাদা রোঁয়া। হঠাৎ মনে হল, বল্টু না? নাহ্ এটাকে কী যেন বলে, রজ্জুতে সর্পভ্রম। নাকি সর্পতে রজ্জুভ্রম? আসলে বেড়ালটার চোখ জোড়া জ্বলছিল পাঁচিলের ফাঁকে। জোনাক পোকার মতো। দপ্ দপ্ করে। রোদে ঝিকিয়ে ওঠা ছুরির ফলার মতো। বল্টুর কথা ধক্ করে মনে পড়াতেই হয়তো ছুরিটাও ছুটে এসেছে সাঁ সাঁ করে। বেড়ালটার চোখে। বল্টু হলে ছুরির মুখে বোল ফুটত : কি, ভয় করছে? মনে আছে পঞ্চুর লাশ ফেলেছিল তোমাদের বাবু? এইখানে, ঠিক এইখানে। ব্যাস, তারপর একটা শব্দ, তারপর দু-ঠ্যাঙ শূন্যে তুলে একটা লাফ।

নাহ্। ওসব কিছু নয়। সেরেফ্ একটা ধবধবে সাদা বেড়াল। খেলোয়াড়ি মেজাজে সরে গেল। মনে মনে বিড়বিড়িয়ে উঠল গোরা : ধুস্! পাঁচিল ঘেঁষে কার্নিক খাওয়া ঘুড়ির মতো কাত হয়ে গোঁত্তা খেয়ে এগোতে লাগল। বেলেঘাটার ধোঁয়াকালির আকাশ থেকে, আর ঠিক তখনই নেমে এলে উপোসী সন্ধে। বিল্লির পায়ের নখ লুকোনো নরম চামড়ার থলের ভেতর থেকে।

আর একবার চকচক করে উঠল বল্টুর ফর্সা মুখ। নর্দমার জলে বল্টুর কালো চোখ। জোড়াভুরু। শ্রেণিশত্রু। বাবু হলে তাই বলত। আর ঝিলিক দিয়ে উঠত বিপ্লবী হিংসা। পবিত্র গম্ভীরভাবে। বল্টুর ফর্সা মুখখানা হঠাৎ যদি গোরার নাগাল পায় সত্যি সত্যি লকলকে ছুরির ফলা বিঁধিয়ে বল্টুর কি আহ্লাদের খিঁচুনি আসবে? হাত-পায়ের খিল ভেঙে যাবে পার্টির স্লোগান আউড়ে? নাকি দলের শত্রু শেষ করে গোড়ালি তুলে পায়ের ডগে ভর দিয়ে জন্তুর মতো পাঁচিলের ফোকর গলে যাবে হামা দিয়ে? নিঃসাড়ে। নিজের জান বাঁচাতে তেইশ বছরের গোরা সতেরো বছরের ছেলেটার বুকে কিছুতেই হাঁটু তুলে দিতে পারবে না। ইংরেজি বই খুলে বসে ওই ছেলেটাই তো গোরার এঁটো চায়ে চুমুক মেরে বলত : রচনাটা পারছি না গোরাদা। লিখে দাও না। সাথে সাথে ফুলো ঠোঁটে তেরচা এক ফালিহাসি জেগে উঠত।

গোবরপট্টির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সুকুর জন্যে একটা আনচান ভাব। চনমনে মন। এ তল্লাটের পয়লা নম্বর খাটালের লাল ইটের ফাঁক, গোবর নাদির ভেতর দিয়ে চলল। টিউকলের ভাঙা শানে উপুড় হয়ে পড়েছে বেঁকা তোবড়া কোমর। কামড়াকামড়ি, খিস্তি, আর মেয়ে-পুরুষের হো হো হাসির গলা ফাটা আওয়াজের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে গোরা সুকুদের ঘরে চোখ দুটো ছুঁড়ে দিল : আছে?

: না তো, সেই সকাল সকাল বেরিয়েছে।

সুকুদের ঘরের মেঝে চটে ফেটে কাঁচা মাটি হাসছে ভেজা স্যাঁৎসেঁতে একটা গন্ধ নিয়ে। সুকুর ভউজির কোলে বাঁদরছানার মতো বেলমুণ্ডা বাচ্ছাটার মুখে সর্দির সর। তাতে বাসটে রুটির সাদা-কালো ছোপ। হয়তো রুটিটা বেশি পুড়ে গেছিল। সেই পোড়া রুটির কালো দাগ শিশুর মুখে। সুকুর ভউজির বোকা-বোকা মুখে সরল শঙ্কা : দেখা হয়নি আপনার সাথে।

লড়বড়ে পাঁচিলটা নর্দমার ধার ঘেঁষে সুকুদের ঘরের দেয়াল হয়ে গেছে। তারপর চলে গেছে মালগাড়ির লাইন অব্দি। আধো-অন্ধকার সেই স্যাঁৎসেঁতে মাটি থেকে ঠান্ডা ভাপ উঠছিল। আবছা আবছা সুকুর ভাঙা গাল আর বল্টুর জোড়াভুরু অসম্ভব কালো চোখের মণি নিয়ে জেগে উঠল। গু-গোবর ঘুঁটে-সাঁটা পাঁচিলের গায়ে মালগাড়ির বুম্ বুম্ শব্দ শুনতে শুনতে সুকুর পাতলা শরীরটা যেন নেতিয়ে পড়ল। জখমি নিয়ে। এবং বিশাল এই দেশের রুগ্ণ বুকে সত্যি সত্যি কোনো পর্বত ভেঙে পড়ল না। তবু এ বি নিবারণ আর বাবুর ভাঁটার মতো চোখ জ্বলে উঠবে : এই মৃত্যু এক পর্বতের সমান। ফুরফুরিয়া হাঁসের পালক নয়। রোগে-ভোগে মৃত্যু নয়, ভেদবমি বা আত্মহত্যা নয়। শহিদের ইজ্জত। তারপর চোয়ালের হাড় গুঁড়োনো ভীষণ কঠিন প্রতিজ্ঞা : খুন কা বদলা...।

সত্যি সত্যি সুকুকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে কিনা কে জানে। তাহলে তো শেষ। নিশ্চিহ্ন। বাবুর বন্ধুকে যখন পেছন থেকে সি পি এম রড মারল, আর ওদের চটপটে পঞ্চুকে ভোঁতা একটা কাটারি দিয়ে থেঁৎলে ঘাড়ের মজ্জা ছড়িয়ে দিল বাবু, তখন থেকেই রাস্তা বড় পিছলা হয়ে আছে। আর যত শত্রু বাড়ছে রক্তের উষ্ণতাও বাড়ছে তত। চকচক করে উঠছে মুখচোখ। জিভে শান পড়ছে। হাতের চেটোয় মোরগছানার নরম পেটের মতো জীবন তিরতিরিয়ে উঠছে। একটা লাফের জন্যে। লাফ মেরে পড়তে চায় ঘেয়ো-পচা রাস্তার ওপর।

সুকুর দাদা মদনার বউটা ওড়নি চাপিয়ে এক কোণে কাত হয়ে আছে। বাচ্ছাটা মরার পর থেকেই যাওয়ার দাখিল। আবার নাকি আসছে একটা। সুকুর মা লম্পর কালচে শিষে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। বুড়ির গাল দুটো দেবে গেছে। মহাদেব সোনার ধান্ধায় বেরিয়েছে ঝোলা নিয়ে। ঝোলার ভেতর চশমার ডাঁটি, কাচ, তামার টুকরো, তার, হ্যানত্যান। রোজগারপাতি যাই হোক ফিরবে এক পাঁইট চড়া চোলাই গিলে বড়োজোর হাতে থাকবে আধাসের আটার একটা ঠোঙা। মদনা দু-চার পয়সা দিলে ভউজি ডাল আনবে। আটার লেচি সেই ডালে ফুটে রান্না। ওরা বলে পিটুলি। মহাদেব সোনার রাত দেড়বাজে অব্দি গানা গাইবে, চেঁচাবে, হাউ হাউ করে কাঁদবে। নাহলে মারদাঙ্গা লাগাবে। একবার রাগ সামলাতে না পেরে সুকু বাপকে ধরে পিটেছিল। সুকুকে নিয়ে পয়লা পয়লা বুড়িমা আর ভউজি বুক চাপড়াত। মরদ বলতে ছেলে বলতে তো

ওই একটাই। তার আবার এ কি নেশা! পার্টির নেশা! এখন আল্লার নামে ছেড়ে দিয়েছে। সুকুও দিনভর পার্টি করে এসে রাতবিরেতে আর ভাঙা কলাইয়ের বাটিটা নিয়ে বসে না : দে মায়ি, বহুত নিদ্ লাগা।

: আর আসেনি একবারও?

: নাহ্, বেটা।

বুড়ির বাংলা আসে জলের মতো। মাঝেমধ্যে ঘরোয়ালি কথায় বেখেয়ালে হিন্দি বলে। ঘর বলতে নাকি একটা পয়সা নেই। সুকুরও নজর নেই কোনোদিকে। দিনরাত পার্টি আর পার্টি। ওতে কি পেট ভরবে? এসব বড়া আদমির পোষায়। যার ট্যাঁকে আছে। এদিকে ঘরে যে একটা দানা নেই তা কানেও নেয় না। গোরার পকেটে চারমিনারের গুঁড়ো ছাড়া কিচ্ছু নেই। থাকলে বিজয়দার মেয়েটাকেই ফুলুরি কিনে দিত। ঢেবির হেঁচকির শব্দটা যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে।

তবু ফ্যাকাসে আঙুলে নিকোটিনের হলদে ছোপ-লাগা ডগাগুলো সার্টের ঝুল-পকেটে বেফয়দা হাতড়াতে লাগল। হাতে উঠে এল : সেদ্ধ কাগজের একটা ডেলা, ছেঁড়া ছেঁড়া আঁশ। আবছা-ঝাপসা কতগুলো নাম তারিখ ডেট। আর দাঁড়াল না গোরা। কালো টেপ লাগানো হাওয়াই চপ্পল আঙুলের গর্তে নিয়ে হনহনিয়ে চলল। পেছনে সুকুর মার দোক্তা পাতার মতো মুখখানা হাঁ হয়ে থাকল : তাজ্জব!

খটকা লাগল : আজ সোমবার তো! আজকাল দিন-তারিখ বড্ডো গুলিয়ে যায় গোরার। তার ওপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখে রাখা বারণ। তাহলে একসাথে অনেকে ফেঁসে যাবে। কাগজপত্তর পার্টিদলিল তো থাকবেই না সাথে। এখন মুখস্থ করে রাখতে হয় সব। মনে মনে তাই আওড়াচ্ছিল : সোমবার রাত ন-টায় এ বি আসবে। বসার ঠেকের বন্দোবস্ত করবে সুকু। চারজনের মিট করার কথা, শীল লেনের মোড়ে।

এ বি আসবে ঠিক ন-টায়।

পয়দল আসবে না বাসটা পেছন কাত করে ঘোরার টাইমে ঝুপ করে নেমে পড়বে কে জানে। নাকি পাইপের মতো গলি দিয়ে সুর সুর করে বেরিয়ে আসবে? কোনো ঠিকঠিকানা নেই। রোগা ডিগডিগে হাতের কব্জিতে স্টিলের চেনে বাঁধা ঠাকুরদার আমলের ঘড়ির ডায়ালে ছোট কাঁটাটা নটার বুকে খচ্ করে বিঁধলে আর বড়ো কাঁটাটা বারোটার ঘাড়ে হাল্‌কিচালে সওয়ার হলেই এ বি আসবে। কর্কশ খাড়া নাক আর কোঁকড়া চুলো মাথাটা জেগে উঠবে। মাটি চিরে। তখন ন-টা বাজবে। পাক্কা ন-টা।

আসবে মোড়ের মাথায়। জায়গাটা খারাপ। হুট না হুট হামলা হয়। তামাম বেলেঘাটার নানান গলি-ঘুঁজি ঘেঁটে চার চারটে রাস্তা মিশেছে মোড়টায়। দূর থেকে সেই মোড় দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা। আশ্চর্য ফাঁকা। পেছনে বিহারি মজুরের ফাগুয়ার মর্দানা নাচের মতো বাঁকা শীল লেন। আর বাঁদিকে চাবুকের লম্বা একটা কালশিটে দাগের মতো সরু গলি। ডায়না-বাঁয়া নাকে আসছে রবারের বদগন্ধ। তেল-কালি-ধুঁয়োর ছোপ। আবছা দু-একটা মানুষের ছায়া সরে যাচ্ছে। বীরু, সুকু এসে গেছে নিশ্চয়ই। নাহলে এই খতরনাক্ জায়গায় কারো পা ফেলার

কথা নয়। ল্যাম্পপোস্টের তলায় কে যেন গা ছেড়ে বসে পড়ল। সিগারেটের গোল আগুনের ফুলকি জ্বলছে। নিবছে। অথৈ সমুদ্রে ভাসা জাহাজীর সংকেতের মতো।

এক এক করে চারজনই জড়ো হয়েছে। আসার সময় এ গলি ও গলি দিয়ে ঘুরপথ মাড়িয়ে এসেছে। মেন রাস্তা ধরে চলা আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফে বাতিল। নর্দমা, গলি, পাঁচিল আর রেললাইন আসা যাওয়া চলা ফেরার লাইন। এসেও চট করে জানান দেয়নি। যে যার সরে ছিটকে ছিল। গোরা চাপা কলে আঁজলা ভরে জল খেয়েছিল। তারপর সার্টের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে ঠারেঠুরে গোটা চত্বরটা চোখ বুলিয়ে ছেঁকে নিল। দুশমনের তো আর কমতি নেই। ঝট করে ঘাড়টা ফিরিয়ে ব্রিজের পেছনে লোহার বিমগুলো দেখে নিল। ছায়ার মতো কী যেন একটা সর সর করে হড়কে গেল। সাথে সাথে পায়ের চেটো থেকে সিনা অব্দি শিরা-উপশিরা টেনেটুনে শক্ত করে নিল। দু-পা পেছনে হঠে মোকাবিলার জন্য তৈয়ার থাকল। তারপর ফালতু আওয়াজ বুঝে আশ্বস্ত হল। গুটি গুটি এসে ওরা রকটা জুড়ে বসল। বুকের খাঁচা ফাঁকা করে শ্বাস ছাড়ল। আর এ-কথায় সে-কথায় টগবগিয়ে ফুটতে লাগল।

: বক্তিমেবাজির দিন কাবার।

গলার স্বরে একটা স্ফূর্তির ভাব আর গালে যেন একটা আঙুল দেবে বসল। টোল পড়ল। হাসলেই ওর গালে টোল পড়বে। নিভাঁজ শান্ত পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি টোলটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মুখে একটা বিজয়ীর ভাব জেগে উঠল। সাচমুচ মানুষ যদি বক্তিমের বুকনিতে না ভোলে তাহলে ওদের ঠেকায় কে। এমন একটা নিশ্চিন্তি নিয়েই কথাটা বলেছে। তক্কাতক্কি, গ্যাজর-গ্যাজর ঢের হয়েছে। মুখের কষ বেয়ে গেঁজে উঠেছে ফেনা। আর ফয়দা হয়েছে ফক্কা। যে যার বাঁচার ধান্ধা করেছে। ধান্ধা করতে করতেই চোখের ডিম দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে নিশ্চল, নিস্পন্দ। বাঁচাটা আর হয়নি। সবজে কচি গোঁফ মিহি ঘাসের মতো কাঁপিয়ে আর একজন বলল : সে সব জামানা চলে গেছে।

: হ্যাঁ। এখন জান কা সওয়াল।

: জান কথাটা বড় অদ্ভুত!

: সত্যি!

: থই পাওয়া যায় না।

: আচ্ছা তুই ভেবেছিস যে...।

খচ্ করে কোথায় যেন আটকে গেল। মুখ ওগরাতে পারে না। ঘন কালো চোখের মণি আঁতিপাঁতি করে কী যেন খোঁজে। ছেলেটা যুৎসই কথাটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ নাগাল পাচ্ছে না।

: কী রে বলবি তো?

: নাহ্।

: কী না?

: কিছু না, এমনি।

টিলেঢালা, আলসে রাস্তা। পাড়ার রাস্তা। সন্ধের ঝোঁকে ফাঁকা ফাঁকা দু-একটা মানুষ গড়িয়ে

গড়িয়ে হাঁটে। আর দু-তিন খেপে সিককল, গ্যাস কোম্পানি, আর রবার ফ্যাকটরির মজুররা দল বেঁধে রুটির জন্যে ছোটে, কিংবা বেদম কাহিল হয়ে ডেরার দিকে ফেরে। ফিরতি পথে মোড়ের দোকান থেকে দু-পাঁচ পয়সার বার্লিক কিনে নেয় কেউ কেউ। জ্বর ঠোসায় হাত বোলাতে বোলাতে। মোড়ের গোল রকটার গা ঘেঁষে সবাইকে যেতে হয়। ওরা আগে সকাল সন্ধেয় ওখানে বসত। চুম্বকের মতো জায়গাটা এখনও টানে। তবু ওরা আগের মতো আর হুটহাট চলে আসে না। অত টাইম নেই, আর ফালতু ঝুঁকি নিতেও রাজি নয়। এখন জানের সওয়াল। নেহাত আজ না এসে উপায় নেই তাই। তাও গোরা পই পই করে বারণ করেছিল: মরার সাধ হয়েছে? সোনা উত্তরে হেসেছিল, সেই অদ্ভুত হাসি : এ বি আর কোনো ঠেক চেনে না।

: তাই বলে!

: ও কিছু হবে না।

এই আধা ঘণ্টার মধ্যেই পানের দোকানের বটু তিন-তিনবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে : আমার কেমন ভালো ঠেকছে না। পাতলা হয়ে যাও সব। ওরা বটুকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে গলা ফাটিয়ে হেসেছে। আর বটু মুখে ছুঁচ সুতো লাগিয়ে বসে আছে। রাগলে ওর মুখে কথা ফোটে না। আজ আর বটু ফোকোটে সিগারেট সাধল না।

চৌরাস্তার মুখটায় লক্ষ্মীকান্তপুর আর ক্যানিং লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আলো ঠিকরে লাগে। ওপাশে কর্ড লাইন। মাঝে তেরচা এই চৌরাস্তার মোড়। আর ল্যাপটালেপটি বস্তি। মোড়টায় বাস রাস্তা আর অমনি একটা রাস্তা আড়াআড়ি মিশেছে। মোড়ের গ্যাস বাত্তিটা নেই। ডিব্‌রি বাত্তির জামানা কোন কালে চলে গেছে। এখন টিউবলাইট। টিউবলাইটের পোস্টটার তলায় সিমেন্ট দিয়ে গোল করে বাঁধানো একটা রকের মতো। ওখানে দাঁড়িয়ে আগে স্ট্রিটকর্নার হত। ভ্যাদামাছের মতো প্রণবেশ 'দেশে সেপটিপিন তৈরি হচ্ছে সুতরাং শিল্পে আমরা পিছিয়ে নেই' কথাটা বলার শেষে নাকি গলায় চেঁচাতো : বঁদে মাতারাম। আর ফ্যাসফেসে গলায় টিপ্পনী কাটার চেষ্টা করত বেঁটে মাস্টার : তাহলে সেফটিপিন পশ্চাদ্দেশে ফুটিয়েই দেশ এগিয়ে যাবে কি বলেন? কেউ কিছু বলত না, বয়ে গেছে বলতে। ইলেকশনের আগে অমন একটু কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট হয়। এখন সব ইঁদুরের গর্তে ঢুকেছে। এমনকি তপসের ভেড়ি ভেসে যখন দামাল বর্ষায় গরিবগরবার দুঃখ কষ্ট গেঁজে বন্যা হল তখন অব্দি এক ফোঁটা রিলিফ ছোঁয়াতে পারেনি। যা দরকার গোরারাই করেছে।

টিউবলাইটের ফিকে আলোটা ওদের মুখে গোল হয়ে পড়েছে। লাইটপোস্টটার চারধার ঘিরে ওরা গা ছেড়ে বসেছে। আলোটা ম্লান। কেমন একটা মায়ামায়া ভাব। মায়ার জাল। ওদের শরীরের জায়গা বিশেষ স্পষ্ট জাগে। বাকিটা আবছা। ফিকে আলোয় ঠাহর হয় না। সোনার ভাসা ভাসা চোখে স্বপ্নের জালি পড়েছে। গুনগুন করে এককলি গান গায়।

বাতাস হামলে পড়ছে গোরার কটা চুলে। কপালের লম্বা কাটা দাগটা চকচক করছে ফিকে আলোয়। পাতলা চাম, তামার বর্ণ। দাগটা একনজরে তামার ফলার মতো লাগছে। গোরা ঠ্যাঙ দুটো মুড়ে বসেছে। খ্যাপা বাতাসের হুজ্জোত চলছে। সার্টের বোতাম হাট করে খোলা। ঘাসের

চাপড়ার মতো লোমশ বুক থেকে ঘাম শুষে নিচ্ছে দমকা বাতাস। হাপরের মতো বুকটা উঠছে, নামছে। একটা পাবলিক বাস পাশ করল। গড়িমসি করে। দু-চোখে আলোর ফিন্‌কি ছুটিয়ে। ওদের পেছনে চুনসুরকির দোকানের থানইটগুলো ভেসে উঠল। আর দেয়ালে গুলির গর্তটা। কদিন আগে ঝলক ঝলক বর্ষে গেছে। সরতে-সরতে গোরা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাক করেছিল ঠিকই। বুড়ো একটা হাঁক পেড়েছিল। ফাঁকা আওয়াজ। তাতেই চমকে ওঠে। নন্টে বলত : ক্যাপসুল। একটা গিললেই রফা। নন্টে হতভাগাটার কথা আজকাল হুটহাট মনে পড়ে যায়। টনটন করে বুকটা, চোখ পোড়ায়। গলায় যেন আগুনের ডেলা আটকে যায়। গোরার তখন হুঁশ থাকে না। উদাস লাগে। আঙুলের ফাঁকে তখন সুরসুরি পিঁপড়ের মতো মৃত্যু হাঁটে।

আমার শ্রেণিঘৃণা নেই।

কী করে বুঝলে?

দেখছিস না কেমন সুস্থির হয়ে আছি!

এর নাম সুস্থির থাকা।

নন্টের কথা ভাব।

নন্টে!

হ্যাঁ, নন্টে। অমন ভুরু কোঁচকানোর কী আছে!

নন্টের সাহসটা খাপছাড়া হয়ে গেছিল।

দ্যাখ। একটা জিনিস মনে রাখিস—আদর্শ-ফাদর্শের চেয়ে মানুষটাই বড় কথা।

তুমি জানো, তুমি কী বলছ।

তার মানে? নন্টে হঠকাবী ছিল।

গোরাদা!

কী?

তুমি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছ না।

না পারছি না। এর পরেও ঠান্ডা থাকলে সেটা আর মানুষের মাথা থাকবে না।

তবে?

মড়ার মাথার খুলি হয়ে যাবে।

বাঁয়া তরফ কর্ডলাইন। টিকিস টিকিস করে একটা মালগাড়ি গেল। ওভার ব্রিজের বিমগুলো কোঁকাচ্ছে। কেমন একটা মোচড়ানির শব্দ। আর ব্রিজের ফাঁক দিয়ে ইস্পাতের ফলার মতো লাইন আধো অন্ধকারের খোলস ভেঙে হিংসায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। মন্টু জিভে বলগা লাগিয়েছে। হঠাৎ চুপ মেরে গেল। মন্টুর হাতটা থুতনির দু-গাছা দাড়ি ছুঁয়ে খেলতে লাগল। ও ভাবে : কথা না বাড়ানোই ভালো। দগদগা কাঁচা ঘা. এখনও টান ধরেনি, শুকোনো তো দূরের কথা। কোনো দিন শুকোবে কি না তাই বা কে জানে। কোথাও একটা শব্দ হল। চাপা, গুমোট। বীরু আর মন্টু কান খাড়া করল। প্যাংলা বীরু পোস্টে হেলান দিয়ে ভাবগতিক বুঝতে চেষ্টা করল। সোনা গায়ে মাখল না। ওর গ্রাহ্যি কম। আসলে ও গন্ধ শুঁকে সমঝে

নেয়। বীরুর ডাগরা চোখ গভীর মনোযোগে বুজে আসছে। খানিক হদিশ নিয়ে ফের ঢিলে হয়ে বসল : কিছু না।

: বাস?

: হু।

সোনার মুখ চিড়বিড় করে উঠল : শেষকালে রাখালের গোরুর পালের মতো না হয়।

: মানে। রাখাল তো মিথ্যেমিথ্যি লোক জড়ো করত।

: এত উচপিচ করলেও তাই হবে।

বীরুর পাতলা গোঁফের রেখা বিরক্তিতে একপাশে ছিটকে গেল। ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল ও। দু-হাত দিয়ে চাপড়ে প্যান্টের পেছন থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলল। শহরটা ধুলো ময়লায় ভরে যাচ্ছে ক্রমশ। বুকের খাঁচা ভরে বাতাসও টানা যায় না। বীরু চটি ঘষটে উড়ের দোকানের দিকে চলল সিগারেট কিনতে। দোকানের সামনে শ্যাওলা-ধরা চাতালের মতো পান খয়েরের ছোপধরা ক্ষয়াক্ষয়া পাথরটায় অশোকস্তম্ভ মার্কা দশটা পয়সা ঝপাং করে ফেলে দিল। অশোকস্তম্ভের চাকার তলায় পিষে কলিঙ্গ রাজ্যের রক্তমাংস পচে গলে অ্যাদ্দিনে উড়ের দোকানের পাথরটার মতো শক্ত ঘেন্নায় জমে গেছে।

উড়ের দোকানের চিপেগলির মতো খুপরির দেয়ালে ভেজাকাপড়ে শরীরের খাঁজ জাগিয়ে মেয়ের ছবিওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার দুলছে। সিগারেট বের করতে করতে বটু বলল : বীরুদা!

কী?

সরে এসো।

কী?

কাল এসেছিল, এই টাইমে।

তারপর?

পুছতাছ করছিল।

আ চ্ ছা!

বেশিক্ষণ থেকোনি।

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুজে বীরুর চনমনে চোখ আশপাশ দেখে নিল। পানগুমটির আগুনমুখো রশিটা লোভ দেখিয়ে দুলছে। বীরু রশিটার দিকে একপলক তাকিয়ে হাঁটা ধরল। এখান থেকে ধরালে ঝটপট ফুরিয়ে যাবে। রাস্তাটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। থেকে থেকে দু-একটা রিকসার টুং টাং শব্দ জাগে কেবল। বীরু গা ছেড়ে হাঁটছিল। টিউবলাইটের তলায়, মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের গোল করে বাঁধানো শানের কাছে এসে বাকি তিনজনের ভেতর ঠেল্যেঠুলে বসে গেল : মন্টু দেশলাইটা দে।

মন্টু কাত হয়ে পকেট থেকে দেশলাইটা বের করল : নে।

সোনা মস্ত একটা হাই তুলল। চোখ দুটো বুজে আসছিল আপ্সে। চোখের পাতা টেনে মেলে রাখল। বীরুর গলাটা হঠাৎ চড়ে ওঠে : জানো তো পঞ্চাননতলার ওদিকে ঝামেলা হয়েছে, আমাদের সুকুকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে। সোনা অসোয়াস্তিতে ঘাড়টা কাত করে দিল

: হুঁ। বীরুর কথার খুঁট ধরল মন্টু : তাই কেলোদা আমাকে ডেকে বলল— আর ভাই আমরা হলুম নিরিমিষ মধ্যবিত্ত। এইসব সাত পাঁচ ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল। আসলে ভেবেছে পঞ্চানন তলার অ্যাকশন যদি এখানে হয়। চামড়া বাঁচানোর ধান্ধা।

হাত ঘুরিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল ওরা। মন্টু লাস্টে নিল। টুস্‌কি দিয়ে ছাই ঝাড়ল মন্টু। বীরু ছোঁ মেরে সিগারেটের টুকরোটা হাতিয়ে নিল : সুকুর কিছু হলে বল্টুর লাশ...

সোনা : তোর ফটফটানি থামা তো।

মন্টু : পাড়াটা অ্যাদ্দিন তবু ঠান্ডা ছিল, এবার...

গোরা : শ্রেণিসংগ্রাম...বল্টুটা আমার ছাত্র ছিল, শান্ত নিরীহ একটা ছেলে।

বীরু : এখন দেখগে যাও, পায়ে হান্টিং সু, পকেটে ছ-ঘরার মাল।

মন্টু : কলেরা, বসন্ত, মড়কের মতো এই সংঘর্ষটা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

গোরা : ওরা তো আমার বাড়ি অব্দি ধাওয়া করেছিল, বইপত্তর টেনে নিয়ে গেছে, বাবাকে ভয় দেখিয়েছে।

সোনা : তা যদি বলো, খালপাড়ে ওদের লাইব্রেরিতে আগুন লাগানোটাও ঠিক হয়নি।

বীরু : আলবাৎ হয়েছে।

গোরা : না মোটেই ঠিক হয়নি, এটাকে নীতিগত লড়াই বলে না।

বীরু চুলবুল করে উঠল : সংশোধনবাদ এখন প্রধান শত্রু, ওদের সঙ্গে তর্ক হবে বন্দুকের ডগায়।

সোনা : থাম। দ্যাখো গোরাদা আমরা তো ওদের সাথে লড়তে চাইছি না। কিন্তু সুকুকে যদি সত্যি তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে?

বীরু : তাহলে আবার কী, গোলপার্কের মতো অ্যাকশন স্কোয়াড যাবে ব্যাস।

মন্টু হঠাৎ সিধে হয়ে বসল। চোখে মুখে আগুনের ফুলকি। বাঁ হাত দিয়ে নাকের ডগা আর চিবুক থেকে ঘাম সাপটে নিল : সত্যি গোলপার্কের কথা মনে আছে! লাল ঝান্ডার মা-মাসি তুলে খিস্তি বেরিয়ে গেছিল। হিম্মত দেখে তো সব তাজ্জব। নিজেরাই বলাবলি করছে 'হ্যাঁ, সোনা মার দুধ খেয়েছে বটে'। কংগ্রেসি মস্তানরা তিন হপ্তা পাড়ায় ঢুকতে পারেনি। শেষে ক্ষমাটমা চাইল তবে না। বীরুর মুখে যেন তুবড়ি ছুটছে। হুস্ করে তেরপল ঢাকা একটা লরি বেরিয়ে গেল।

কেলোদার সাথে সোনার আগে খুব ভাবভালোবাসা ছিল। আর আজকের সম্পর্ক তো নয়। সেই যখন সোনা রেললাইনের কাঠের পাটাতনে পা ফেলে ফেলে হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যেত, তখন থেকে কেলোদার সাথে খাতির। সেই সুবাদে সকাল বিকেল দু-বেলা চায়ের সময় সোনা লোনাধরা রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকত। শ্যামলা ছিপছিপে মিনু সোনার গায়ে গায়ে হেঁটে একদিন হিউজ রোডে মতিয়ার বউয়ের কাছে এল। সোনা মতিয়ার সাথে পুকুরপাড়ে বসে বাতচিত চালাচ্ছিল। ওরা দুজন অফুরান কথায় দমকা বাতাসের মতো বস্তির চিমসে গলির ভেতর মিলিয়ে যায়। গোরার তক্ষুণি মনে হয়েছিল—বাহ্ বেশ লাগছে তো! পেছু ডাকেনি। ওদের আবছা ছায়া দুটো চোখের সামনে মিলিয়ে যায়। তারপর একদিন

খিদিরপুরের মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে পয়লা মালটা চার্জ করার খানিক আগে সোনা বলেছিল : জানো মিনু গ্রামে যেতে চায়!

হুস্ করে একটা লরি বেরিয়ে গেল।

শালা স্মাগলিং-এর মাল।

তেরপল ঢাকা বলে?

মোটেই না।

তবে?

ড্রাইভারটাকে আমি চিনি। ম্যাকনামারা কলকাতায় আসার সময়ে ধরা পড়েছিলুম না।

তো কী?

তখনই ড্রাইভারটার সাথে আলাপ হয়েছিল। ওরা ভেজাল ওষুধের কারবার করে।

তাই অমন বুক ফুলিয়ে গেল?

পকেটে মন্ত্রীসভাটা বেমালুম পুরে রেখেছে।

সোনা জিভ বার করে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল। তারপর মুখের দু-পাশ থেকে ঠোঁটটা ধরে টানতে লাগল। এটা শীতকাল। গরমির শেষ হাল। সোনার আসলে আদত হয়ে গেছে। যখন তখন ঠোঁটে জিভ বোলায়। মুখ ভেটকে। সোনার জিভটা চক্কর মারল : আগে বলতে কী হচ্ছিল?

: কেন?

ন্যাকাচৈতন্য!

আটকাতিস?

নিশ্চয়।

লাভ?

ইস্কুলে পেটো মারার চেয়ে ঢের লাভ।

হাতের মুঠো নেড়ে সোনা কথাটা বলল। মন্টুর ধারণা বুর্জোয়া শিক্ষাফিক্ষার পাট তুলে দেওয়াই উচিত। কিন্তু যুক্তিতে এঁটে উঠতে পারে না বলে চুপ মেরে থাকে। সোনার কথাটা ওর বুকে ছ্যাঁক করে লাগে। মুখের ভাব পালটে যায় সাথে সাথে। গোরা চাপা গলায় ধমকে উঠল : সোনা! ধমক ঠিক নয়, তবু কেমন একটা গার্জেনগিরি আছে কথাটায়। আসলে ওরাই মেনে নিয়েছে। গোরা কমরেড বলতে অজ্ঞান। ও দু-ঘা লাগিয়ে দিলেও আপত্তি নেই। সোনা তো বলে—গোরাদা ভুল করতে পারে না। মন্টু অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না? গুরুবাদ! ধমক খেয়ে সোনা চুপ মেরে গেল। আর গোরার মুখটা সাধুসন্তের মতো হয়ে উঠল : তুই না কমুনিস। বাকিটা আর বলতে হয় না। গোরার চোখের মণিতেই সোনা কথাগুলো ভাসতে দেখে—আমাদের ধৈর্য রাখা উচিত। আর ধৈর্য শব্দটা যেন সেই ছোটবেলার আদর্শলিপির যুক্তাক্ষরের মতো যা আয়ত্ত করতে মার হাতে পাখার ডাঁট ভাঙত। সোনা কেঁদে ভাসাত। মন্টু গোরার দিকে তেরচাভাবে তাকাল। চোখের ইশারায় গোরা ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলে। আর সাথে সাথে হাসি পেয়ে যায়।

বুড়োকে শোধরাতে গিয়ে এখন এই অবস্থা। শোধরানোটা শেষে ভ্যাঙানোর অভ্যেসে দাঁড়ায়। তারপর কখন অভ্যেসটা পাকাপাকি গেড়ে বসেছে বুঝতে পারেনি। তোড়ে কথা বললেই হুস করে শব্দটা বেরিয়ে যায়। সামাল দিতে পারে না।

বুড়োর পেটে বোমা মারলেও একটা অক্ষর খসত না। নারাণদার পাল্লায় পড়েছিল নেহাত, নাহলে জিন্দেগিভর আনপড় থেকে যেত। বুড়োর ওপর নারাণদার নজর ছিল আগে থাকতেই। জোলুস থেকে শুরু করে জুট মিলের ধর্মঘটের সময় দালালদের খিলাপে লড়া অব্দি সবেতেই বুড়োর জোসই আলাদা। আর জোসেলা আদমি নারাণদা বুকে করে রাখতে চায়। তবু শুধু নজরই ছিল, এর বেশি কিছু নয়। দশ হাতে খাবলে কাজ করে নারাণদা। গ্যাস কোম্পানি থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর হরিমটর চিবিয়ে খেত। হাঁড়ি চড়ত না বাড়িতে। দু-একবার রসিকতা করে ঘরের হাল বাতলাত। তা ছাড়া হুঁশ ছিল না। মিনতিবউদি সেলাইফোঁড়াই আর টুকটাক কাজ করে ঠেকনা দিত। সারাদিনে চাট্টি মাড়ভাত, না হয় দশবিশখানা রুটি বানিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ বাচ্ছা তিনটে নিয়ে বসত। আবার ঠিক সেই সময়ে বাঁধা অতিথি ছিল বুড়ো। মিনতিবউদি হেসে বলত : এই টাইমে খেলে দিনভর পেট ভরা থাকে। বুড়ো হাসত গলা ফাটিয়ে, বস্তি মাথায় করে : দিনের আর বাকিটা আছে কী!

পায়রার খোপের মতো সারি সারি ঘর টের পেত, মিনতির ঘরে অতিথি এসেছে। বাঁধা অতিথি। পিচঢালা টিনের ফোকরের পাশ দিয়ে কেউ হয়তো লম্বা গলা আগিয়ে জিজ্ঞেস করে, চোখে চরকি নাচিয়ে : কে লা মিনতি?

৬৭ সালের পর নারাণদা ওই খুপরিতে বসে বলেছিল : এটা মজুরের পার্টি নয়। দুনিয়ার ধান্ধাবাজের আড্ডা। খানিকটা আঁচ করেছিল সবাই। নারণদার কথায় খোলসা হচ্ছিল। বেরিয়ে এসেই ছায়ার মতো যে সাথ দিয়েছে বিপদে আপদে তার কথাই মনে হয়েছিল নারাণদার। আর সে হল বুড়ো। নারাণদা আগে আগে বুড়োকে একগাদা ইশ্‌তেহার দিয়ে বিলি করে দিতে বলত। কিংবা সিককলের গেটে যেতে বলে চলতি বাসের হাতল ধরে ঝুলে পড়ত। রাস্তার মাঝখান থেকে হঠাৎ হাঁক পাড়ত : বুড়ো ফেলুর মাকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাস। আর ৬৭-র পর লালবাড়ির নড়বড়ে দাঁতের মতো ঘুপচিঘরে রাতভর বাত্তি জ্বলতে লাগল। বর্ণপরিচয় নিয়ে লড়ে গেল জবরদস্ত দুটো মানুষ। মোমবাতি গলে পড়তে লাগল ছেঁড়া মাদুরে, নতুন লড়াই চালু হল। আর শান খেয়ে দিনকে দিন বুড়োর ধার খুলতে লাগল। চাবুক হয়ে উঠল। তবু এত কাণ্ডের পরও বুড়ো 'কমিউনিস্ট' শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না। জিভে টাগরায় আটার দলার মতো শব্দটা জড়িয়ে পেঁচিয়ে কী করে যেন 'কমুনিস' হয়ে যায়। আর বুড়োর মুখে কথাটা শোনা মাত্তর ওরা ঠিক বুকের বাঁ পাশে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি টের পায়। চোখ দুটো থির হয়ে আসে। তখন ওরা গভীরভাবে কী যেন ভাবে। অথচ থই পায় না। পায়ের সাদা চামড়ায় ফরফর করে গজাল বা পেরেকের মতো কাঁটা। রক্তের ফুটকি ফোটে। দেখতে দেখতে ফুটকিগুলো ফুলের কুঁড়ির মতো হয়ে যায়। তারপর পাতা মেলে। তারপর ঘ্রাণ, গন্ধ।

: বীরু!

: বল।

: ক-টা বাজে দেখেছিস?

: নাহ্।

মন্টু আঙুল দুটো ঠোঁটে চেপে মোক্ষম টান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল। মুখে হয়তো সুকো ঢুকেছিল! থু থু করে ছিটিয়ে দিল। পেছনের কর্ডলাইন ধরে আবার একটা ডিজেল গাড়ি কুঁত্তে কুঁত্তে চলে গেল। এক ঝলক আলোর বন্যায় চারটে তরতাজা মুখ ফিকে আকাশিরঙা আবছা আলো কাটিয়ে সাফ জেগে উঠল একবার। মন্টুর খাঁদা নাক তামার মতো চিকচিকিয়ে উঠল।

: কটায় আসার কথা?

: ন-টা নাগাদ।

মন্টু আর বীরু বকবক করে চলেছে। চিড়বিড় চিড়বিড় করে মুখ ফুটছে। সোনা নির্বিকার। ঠোঁট সেলাই করে বসে আছে। দু-হাতের থাবা বিছিয়ে দিয়েছে। কব্জি ভেঙে আড় হয়ে বসেছে। গোরা সিগারেটের জন্য আক্ষেপ করছিল। গায়ে মাখল না কেউ। মন্টু আড়িয়া মেরে গোরার দিকে চেয়েছিল। ভাবছে উতলা হয়েছে মানুষটা। একটু থিতোতে পারছে না। উতলা না হয়ে উপায় কী, এ বি-র আসার কথা কাঁটায় কাঁটায় নটায়। এখন ক-টা বাজল কে জানে। এ বি-র তো আর হুঁশ বলতে নেই। তালকানার মতো চলে। ঝুলো পাজামায় রাস্তার ধুলো ল্যাপটেঘষটে একশা। যেন দুশমন বলতে নেই। একবার ফেঁসে গেলে তখন আর রক্ষে থাকবে না। মজুরবস্তিতে মুখ গুঁজে থেকে মজবুত সংগঠন গড়ার স্বপ্ন, দুজ কা চাঁদের মতো আশমানের বুকেই লটকে থাকবে চিরকাল। আর হাত ইশারা করবে। এখানে, এই যে এখানে আমি।

: বিজয়দা এখন হকারি করছে না?

: জানি না ঠিক।

: নোকরিচাকরি তো খতম।

: ক্লোজার আর লকআউটের প্রকাণ্ড তালাটা ভাঙা।

: বিজয়দার মেয়েটাকে দেখলাম রাস্তায় গড়াচ্ছে।

: কদ্দিন যাওনা?

: তা ছ-সাত মাস হতে চলল।

উদরের মতো শেতলাতলা বস্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর বিজয়দার চ্যাপ্টা গড়ন মুখ। রঙকলে কাজ থাকতে চায়ের কেত্লি চাপানোই থাকত উনুনে। গোরার জুলুমই বেশি ছিল। কোথাও গোরার খোঁজ না পেলে, বিজয়দার ঘরে টুঁ মারত ওরা। খাটের ওপর খালি গায়ে, বিজয়দার কালোকুষ্ঠি রিকেটের রুগি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে আদর করতে দেখা যেত। লাস্ট টাইমে তো বিজয়দাকে থানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা হাত ভেঙে ছেড়ে দিল। কাজ খোয়াতে হল। এখন হকারি করছে। হারবার পাত্তর নয়। গোরা হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠল : কাল যাব একবার। সোনা ঝিম মেরেছিল হঠাৎ কথাটা লুফে নিল : আমি যাব সাথে। নরমভাবে গোরা সোনার দিকে তাকাল। সোনা ঘাড় নাড়ল। তার মানে : একা গিয়ে শেষে

ঝামেলা পাকাও। জানটা আর তোমার একার নয় যে যা খুশি করবে। গোরা ওর ঠোঁটের বেঁকা রেখাটার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। হঠাৎ দশ ব্যাটারির একটা আলো পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। গোরার বুকে ধক্ করে কি যেন আটকে গেল। হাত-পায়ের চেটো সর্‌সর্ করে ওঠে। আর অ্যাম্বুলেন্সটা হুস করে বেরিয়ে গেল।

'বেনো জল ঢুকছে'—মন্টুর হাতটা থুতনির নাগাল খুঁজছিল।

'তপসের লাস্ট মিটিংটার কথা মনে আছে তোর। সেই জেলেডিঙি বেয়ে সব পাহারাদারের ঠেকে গিয়ে উঠলুম। চারদিকে শুধু ভেড়ি। ভেড়ির অগভীর পাতলা কাচের মতো জল। মাঝে দ্বীপের মতো একবিন্দু জমিন। আকাশে গোটা চাঁদ। সেই নৌকোয় করে চীন পার্টির মিটিঙের মতো। দিনটা কেমন গেঁথে আছে। সেদিনই কথাটা পেড়ে রেখেছিলাম। এমনিতে ফারাক থাকলেও এ বি-র মনে ধরেছিল কথাটা : লোকাল কমিটির মেম্বারদের যে করে হোক ওয়ার্কার বেল্টে ঠেক করে নিতে হবে। রকে বসে কতগুলো পেটিবুর্জোয়া ছেলের সঙ্গে গরম গরম বাত ঝেড়ে চলবে না। এখানে বাপ যদি খুঁটি না গাড়তে পার, ও যতই তোমার ছাত্রযুব হ্যানত্যান থাক সব দু-দিনে ফোট হয়ে যাবে। সবে লাইন ধরছিল। আর এ লাইন একবার মগজে ঢুকলে তারপর সামলাতে কিস্‌সু লাগত না। কিন্তু মওকা পাওয়া গেল না। যে রেটে পুলিশ হামলে পড়েছে...'

গোরার চোখের তারায় নাম না জানা কী একটা পাখি মৃত্যুযন্ত্রণায় ডানা ঝাপটাতে লাগল। আশপাশ অগলবগলে ঘুরপাক খাচ্ছে গোরার চোখ। গলার স্বরেও অস্থিরভাব চাপা থাকে না : কটা বাজে রে মন্টু?

ঘড়ি কোথায়?

আন্দাজ?

তা দশটা তো হবেই!

সে কীরে!

ভেবো না। ও ঠিক আসবে।

নাহ। এ বি-র টাইমের খেলাপ হয় না।

হয়তো খোচর লেগেছ পেছনে।

অশোক বসু নামটা ওরা বেমালুম ভুলে গেছে। এমনকি অশকা নামটাও মনে রাখেনি। এখন সংক্ষেপে এ বি। খোচররাও জেনে গেছে। এই তো সেদিন চালপট্টি থেকে ঘেরাও করে এক ছুতোর মিস্তিরিকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল : এ বি-কে চিনিস না? ফের একটা টেক নেম দিতে হবে।

কপালের লম্বা গভীর কাটা দাগটায় হাত বোলাচ্ছিল গোরা। জায়গাটা মাঝে মধ্যে চিড়বিড় করে। ছোটোবেলায় একবার সাঁকো পার হতে গিয়ে উলটে পড়েছিল। বাঁশের খোঁচা লেগে কেটে যায়। একনাগাড়ে ছ-মাস ভুগেছিল চিকিচ্ছেয় ফল না হতে টোটকা ধরে। কেঁচোর তেল। খোচরের নাম শুনলেই গোরার কেঁচোর তেলের কথাটা মনে পড়ে যায় আর জায়গাটা চিড়বিড় করে ওঠে। দেখতে দেখতে মাথা গরম হয়ে যায়। কান দিয়ে আগুনের হলকা

ছোটে। তালতলার লর্ড পাড়ার মাজাভাঙা রাস্তাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেরেফ কয়েকটা ছ্যাঁদা করে দিয়েছিল। আর মুখ থুবড়ে পড়েছিল নন্‌টে। খালি হাতে তিনটে খোচরও নন্‌টের সাথে এঁটে উঠতে পারত না। সেই এস্টার্ট হল।

তিনজনের একটা দল ওভারব্রিজের তলা দিয়ে গুটি গুটি আসছে। জায়গাটা অন্ধকার। মুখগুলো মালুম হয় না। সোনা উসখুস করছে : আজ আবার যন্তরটা সাথে নেই। কেউ রা কাটল না। সব টান টান হয়ে গেল। গোরা ঝটকা মেরে পেছন দেখে নিল। নাহ্‌ ঠিক আছে। মন্টু আপনা থেকে উঠে চারপাশে পাগলা চক্কর মারছে। গোরা ততক্ষণে ওদের হাতে টেনসিলের টিনটা দেখতে পেয়েছে।

: বোস।

: দাঁড়াও না।

মন্টুর অস্থিরতা বরাবরই বেশি। বড্ড বেশি সতর্ক। কলেজ ইলেকশনের টাইমেও অমনি আনচান করত। মন্টু আর একটু নিশ্চিন্ত হতে চায়। ঘাপ্‌টি মেরে তিনজনের আবছা দলটা লক্ষ করে এগিয়ে চলল। সোনার মুখে বিরক্তির আঁচড়।—দূর, ডরপুক কোথাকার! আর মন্টু পানবিড়ির দোকানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সার্টের ঝুলের ভেতর হাত পুরে রিভলভারে হাত ঠেকানোর ভান করল। গলার স্বর বদলে নিল চট্‌ করে : কে?

: আমি।

: বুড়ো?

: হুঁ

মন্টু আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বুড়োর দল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গোয়ালা পাড়ার বুড়ো। বুড়োর গ্রূপ। তুলি আর টেনসি্‌ল নিয়ে ওয়ালিং করতে বেরিয়েছে। ওরা আর এদিকে এল না। বুড়োই ঘুরপথ দিয়ে নিয়ে চলল। ফোর্থক্লাস স্টাফ কোয়ার্টারের ভেতর দিয়ে। এটাই নিয়ম। নাহলে আনকোরার দল চারজনকে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখে যদি কিছু ঠাহর করে। কেউ তেমন টেস্টেড নয়। এসব ইংরাজি এখন বুড়োও শিখে ফেলেছে। স্প্রিং ফ্যাক্টরির বুড়ো। ওর বউ তো হাঁ হয়ে যায় মাঝে মাঝে—এসব ইংরাজি মিংরাজি শিখলে কেমন করে! বুড়ো হাসে—হুঁ লিখতে দিলেই বিদ্যে বেরিয়ে যাবে। এ হল শুনে শুনে শেখা। হ্যাঁ, তবে মানেটা জানি। টেস্টেড মানে সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

চুনের বালতিটা নামিয়ে বসন্তের দাগভর্তিমুখ ছেলেটা দম নিল। ফের চলতে শুরু করল। সিককলের নিবারণের হাতে তুলি। ছাঁটাই ওয়ার্কার নিবারণের পট্টি ছেঁড়া খাকি হাফপ্যান্টটা কাতলা মাছের মতো ফুট কাটছে। আর বুড়োর হাতে মাওয়ের টেনসিলটা পত পত করে নড়ছে।

: আজ রেল কোয়ার্টার ভরিয়ে ফেলব।

: বড্ড জলদি বেরিয়েছিস!

: নাহ্‌ ভোর রাত্তিরের দিকে শুয়োরের বাচ্ছারা মুছতে আসে। ইয়া লম্বা এক মই আর মস্ত চুনের বালতি নিয়ে।

: ভালো রগড় হয়েছে!

: হ্যাঁ।

বুড়োর গ্রুপ আবছা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল। মন্টু ডাস্টবিনের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে ওদের ফুটকির মতো মিলিয়ে যেতে দেখল। পাবলিক বাস বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাস্তাটা মরা ছাগলের চামড়ার মতো টানটান করা লাগছে। মন্টু ফিরে এসে ল্যাম্পপোস্টের তলায় বসে পড়ল। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে হাতের চেটোয় রেখে গিন্‌তি করছে। সোনা অবাক ঠোঁট চাটছে। গোরা কপালের কাটা দাগটায় হাত বুলোচ্ছিল।

: মোট ষাট পয়সা আছে!

সোনা মুখ না ফিরিয়ে বলল : যথেষ্ট ।

তুই তো একাই গিলবি দুটো পাউরুটি।

আধখানা দিস।

হ্যাঁ তারপর খোচর কলার চেপে ধরলে ছাড়ানোর ক্ষমতা থাকবে না।

না খেয়েও সাতদিন যুঝতে পারব।

বকিস না!

বাবা ষাট পয়সায় খাওয়ার কেস হয়ে যাবে।

এ নিয়ে আর গজলা হল না। কমসম হলে মন্টুই জোগাড়যন্তর করে। ভাত রুটি আর শেলটারের ভাবনা কীভাবে যেন ওর ওপর বর্তেছে। গোরার এসব দিকে নজর বলতে নেই। সেরেফ্ চা গিলেই কাটিয়ে দেয়। ট্যারা সুবলা তো বলে গোরা নাকি মাঝে মধ্যেই শুখা দেয়। সাঁঝের টাইমেই ওর সাথে ট্যারা সুবলার ভেট হত। হিউজ রোডের কাঁচা নর্দমার গা ঘেঁষা পিচের টিন দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা চত্বর। মাঝখানে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের গোবদা গুঁড়ি। আর ব্যাটারির বাক্‌সো। পিচের টিনের লাগোয়া রবার ফ্যাক্টরি, আব ছিটেবেড়ার ঝাঁপ খোলা খুড়োর চায়ের দোকান। ওভারটাইমের আগে একটু ফাঁক মেলে। ঠিক তখনই গোরা গিয়ে হাজির হত। গিঁট দেওয়া গেঞ্জিটা তখন রবারের কালো গুঁড়ো আর মেশিনের তেলে মাখামাখি। হাতখানা ভাঁজ করে তুলে ধরত সুবলা। লালসেলাম। গোরার হাতটাও মুঠো পাকিয়ে ওপরে উঠত। এই নিয়ে একদিন ফাটাফাটি হয়ে গেছিল। ব্রজেনবাবুর শুকতলার মতো চিমসে মুখে সিরিঞ্জ দিয়ে গরম রক্ত ঢুকিয়ে দিয়েছিল কথাটা। আর কালো রবারের বলটা পাম্প করে প্রেসার মাপা সিসের বলটা রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছিল : নমস্কার বললে কি আদর্শ পচে যায়। পুরোনো পায়াভাঙা খাটটা গোরার বাবার বাতের ব্যথা নিয়ে হাড় মড়মড়ি শব্দ করেছিল। আর গোরা হেসেছিল। নির্মল, সরল হাসি। অথচ বর্শার ফলার মতো উদ্ধত : এটা মামুলি কথা নয়, বুঝলে।

গোরাকে কোনো কথা বলার ফুরসত না দিয়েই সুবলা জিজ্ঞেস করত : খেয়েছেন কিছু? ওকে মুখ খোলার চান্স দিত না। তাহলেই একেবারে গড়গড়িয়ে মেল চলবে। রবার কারখানার ইউসুফ আর নাটা আলি গোরার হালচাল জানে। তাই জবরদস্তি টিফিনের রুটি থেকে এক আধখানা খাইয়ে দেয়।

: হিউজ রোডে পরপর ঝান্ডা উঠবে।

সোনা পরম বিশ্বাসে কথাটা বলল।

আজই তো স্প্রিং ফ্যাক্টরির চিমনির মাথায় বেঁধে দিয়েছে। পতপত করে উড়ছে। একটা পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে তলায়। গোরা বাধা দিল না। অন্য সময় হলে এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড হত। আজ মেজাজটা সাফ নেই। কমজোরি টিউবলাইটটা অন্ধকারের সাথে পাল্লা দিতে পারছে না। আবছা আধমরা অন্ধকার পাইপের মতো গলিগালা আর কাঁচা নর্দমা থেকে কাতরাতে কাতরাতে আওয়াজটা উঠে আসছে। বীরু আনচান করে উঠল : আর বসা ঠিক না।

: উহুঁ।

: এই টাইমে রাউন্ড দিতে আসে।

: আমরা চলে গেলে এ বি বিপদে পড়বে।

: আর আসবে না।

: ওর কথার নড়চড় হয় না।

বীরু কি একটা কথা বলতে গিয়ে গিলে ফেলল। অসোয়াস্তি বেড়েই চলেছে। এ বি-র চরিত্র নিয়ে দু-একটা কথা হয়। খানিক ছেদ। মন্টু খসখস করে পিঠ চুলকোয়। মুখ ভ্যাটকায়। আর রাত বাড়ে। মোড়টা আরো ফাঁকা হচ্ছে। আলো মরে আসছে। ওভারটাইম সেরে দুটো দশটার সিফটের মজুররাও সব একে একে ফিরে গেছে। এখন থেকে থেকে জ্বালাজুড়ুনি ঠান্ডা বাতাস বইছে। বসন্তের বাতাস। গোরার সার্টের কোনা উড়ছে ফটফট শব্দে। সোনা চোখ ছোট করে আমেজ নিচ্ছিল। বাতাসের আমেজ। মন্টু পায়ের ডিম টিপছিল আস্তে আস্তে। ম্যাকনামারার সুবাদে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে মাঝে মাঝে এখন ডিম দুটো টাটায়।

চোখের সামনে মেডিকেল কলেজের পেছনদিকের রাস্তাটা ভেসে ওঠে। স্লোগানের অদ্ভুত ছন্দ আর গতি এখনও ছুটন্ত মিছিলের মতো হু-হু করে মনে আসে : ম্যাক্ ম্যাক্ ম্যাক্নামারা—গো, গো, গো ব্যাক। কাঁধের সাইড ব্যাগটায় নন্‌টে গোটা পাঁচেক জালকাঠির বড় মাল নিয়ে মিছিল থেকে একটু তফাতে হাঁটছিল। মিছিলটার সামনে পেছনে গাঢ় কালো রঙ। আট-দশটা ভ্যান চলেছে। ম্যাকনামারা হেলিকপ্টারে শহরটা চক্কর দিচ্ছিল। কলকাতা শহর। মিছিলটা ইউনিভার্সিটির গা ঘেঁষা চিকন গলির মুখ পেতেই আর সামাল দিতে পারল না। ভ্যান ত্রয়ীর নামটা মিছিলের সিনা থেকে গাঁক গাঁক করে ডাক ছাড়ল। হেলিকপ্টার থেকে ম্যাকনামারা আজব শহরটাকে সমঝে নিচ্ছিল। আর নন্‌টে অতিকষ্ট করে বয়ে আনা মালগুলোর সদ্‌গতি করার জন্য দাঁতে দাঁত চেপেছিল। সামনের ভ্যানটা ওকে তাতাচ্ছিল। ইউনিভার্সিটির লাগোয়া বেঁকি গলিটার মুখ পেতেই কে একজন কনস্টেবলের ঢাল কেড়ে নিল। আর একজন লাঠি। কালো ছিপছিপে একটা মেয়ে পুলিশের সবুজ টুপি ছিনিয়ে আশমান তাক করে ছুঁড়ল। তার পরই টিয়ার গ্যাসের সেল পড়তে লাগল। আর পেটো। আর ভ্যান ত্রয়ীর নামটা কলকাতা শহরের বুক ছ্যাঁদা করে আশমান পানে ছুটল। হেলিকপ্টার তখনও পাগলা চক্কর দিচ্ছে, মন্টু দাঁড়িয়ে পড়েছিল, একটা মনিহারি দোকানের শেডের তলায়। সাদা পোশাকের দু-তিনটে পুলিশ

এসে ওকে হেঁচড়ে টেনে ভ্যানে তোলে। বেরিয়ে আসার পর থেকে মাঝে মাঝেই বেদনাটা চিগির দিয়ে ওঠে।

এই তো সেদিন খোচরের র‍্যালা খেয়ে গোবরা গোরস্থানের পাঁচিল ডিঙোতে গিয়ে হঠাৎ খিঁচ ধরল পায়ে। আর একটু হলেই গেছিল। নেহাত সুকুটা পাঁচিলের ওপরে ছিল তাই। হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল। শেষে টাল সামলাতে না পেরে হাইড্রেনের ভেতর দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। পচা পাঁকের গন্ধ তবু নাকে লাগতে পারেনি। পুলিশের খিস্তির চোটে।

মন্টু ডিম দুটো দলাইমলাই করতে করতে বাতাসের জোলোভাবে খুশ হয়ে উঠল। 'বুঝলে— গোবাকে উদ্দেশ করে কথাটা টেনে দিল। গোরা অন্যমনস্ক চিন্তিত চোখ মন্টুর দিকে ফেরাল। মন্টুর গালে টোল পড়ল। ভরা মুখ। আগে শরীরটাও ভরাট ছিল। এখন রোদ-জল-ঝড়ে আর পেট শুকিয়ে শরীরে টান লেগেছে। কিন্তু মুখটা এখনও ফুলোফুলো। জন্ডিসের রুগির মতো।

: জেলে থাকতে একটা জব্বর গান শুনেছিলুম। মুখস্থ হয়ে গেছিল।

: বলে ফ্যাল!

তাচ্ছিল্যের সাথে বীরু ঠোঁট বেঁকাল।

মন্টু গলাখাঁকরি দিয়ে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করল। দু-একটা ভাঙা শব্দ। হিন্দিবাংলার মিশেল।

কয়েদি মাঙন ভায়া হরা গুণ গায়ে কয়েদি মাঙন
কয়েদি বোলে বিমার বিমার ডাগডর বোলে বিমার নেহি
কম্পাউন্ডারকো দিয়া চুয়ান্নি ভরতি সে ইনকার নেহি...

খানিক নীরবতা। বীরুর বিরক্তির ব্রণজাগা মুখটা নির্বিকার। মন্টু আনচান করছে। গোরার দরাজ গলায় মজাক।

: তুই আর কবিতা লিখিস না? বুনোঘাস, নদীরেখা আর কী যেন...

: ধুস্।

মন্টু উদাস হওয়ার ভান করল।

আর ঠিক তখনই কানের পর্দা সুরসুর করে উঠল। গোরা আর বীরু তখনও ছড়াটা নিয়ে মজাক করছে। মন্টু আধ হাত সরে গেল। কানের পর্দা কাঁপিয়ে ক্রমশ শিরশিরে একটা ভাব ছোটো ছোটো ঢেউর মতো গোটা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শব্দটা যেন ওদের চাব্‌কে সিধে করে দিচ্ছে। ঢিলেঢালা ভাব কেটে যাচ্ছিল।

: আজকের মিটিংটা বড্ড জরুরি ছিল।

সোনা বলল আফশোসের সুরে।

আর কথাটা শোনা মাত্তর গোরা সিধে হয়ে গেল। মেজাজটাও তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। এ বি-র সাথে আজকের মিটিংটায় একটা হেস্তনেস্ত হত। এভাবে ঝুলে থাকলে তো আর চলে না। মাটি কামড়ে একটা কিছু করা দরকার। শুরুর দিকটায় এসব ঝামেলা ছিল না। গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিত। রাত জেগে পোস্টার সাঁটত। আর দশ বিশ জন মিলে মাঠে-ঘাটে গজলা হত। দু-তিনটে বছরে সব কেমন জট পাকিয়ে গেছে। এখন দেওয়ালে পোস্টার সাঁটার

সময় পিঠে একটা ক্যাপসুল ঢুকে যেতে পারে আচমকা আর পোস্টারের সাদা কাগজে লাল ছোপ লাগতে পারে।

রাত ধুমসো হয়ে এলে সারাটা তল্লাট আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গতর-খাটিয়ে আধপেটা লোকজনের বাস। চুপড়ির মতো বস্তি। ধোঁয়া। সার সার চিমনি বেয়ে আকাশটাকে প্যাঁচাচ্ছে। রাস্তার কল থেকে ছরছর শব্দ উঠছে। খানিক আগেও একটা খেঁকি কুত্তা কলটার কাছে ল্যাজ নাড়ছিল। এখন মাতালের নাকি সুর কানে বাজছে—জিন্ দে...গি...ই...ই। রাতভোর গোটা চত্বর জুড়ে বেচাল মাতাল, খেঁকি কুত্তা আর খোচরের রাজত্বি চলে। আর গোরার দল রাত জেগে দেয়ালগুলোয় আগুনের টুকরোর মতো এক-একটা শব্দ লটকে দেয়। সোনা খস-খস করে ঘাড়টা চুলকে নিল : দুত্তোর!

: কী হল?

: ভাল লাগে ছাই এমনি বসে থাকতে!

: কী করবি?

: তুমি তো জানো এসব ঘোড়ার ডিম পোষায় না আমার। আর তক্কাতক্কি আমার আসেই না। মার্কসের অত নম্বর ভলুম, লেনিনের...তার চেয়ে বাবা আমাকে বল গার্ড দিতে, পুলিশের ঘেরাও ভাঙতে, আগুনের ফুলকি ছোটাতে—সোনা এক পায়ে রাজি।

সোনা আগুন জ্বেলেই রাস্তা বানাতে চায়। ও যুদ্ধু বোঝে। যুদ্ধ। কোনো ফাঁকফোকর নেই। ফাঁকি দিলেই জানটা মরা ব্যাঙের মতো চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে থাকবে। তাই ঝামেলার গন্ধ পেলেই একবেণীর ফিতেটা বাতাসে পতপত করে উড়িয়ে লম্বা টানা চাপা গলি ধরে মিনু ছুটে আসে: সোনাদা কোথায়? সেবার ওর প্রশ্নের জবাবে তাকাতেই গোরার চোখে ধরা পড়েছিল বৃষ্টির ফোঁটার মতো জল।

বীরু পাতলা চুল কপাল থেকে সরিয়ে হিসহিস শব্দে বলল : আমার মন বলছে...।

: কী?

: কী বলছে?

ওরা তিনজন ঝুঁকে পড়ল।

বীরু তোতলাচ্ছে : এ বি ধরা পড়েছে।

: ফালতু বকিস না বীরু!

গোরার বিদঘুটে মেজাজ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। তবু মনটা বাগ মানে না। কাঁটা বিঁধে থাকে কোথায়। এক এক করে ধরা তো আর কম পড়ছে না। আর এ বি-র চালচলন বড্ড আলগা। যেন দুনিয়াতে ওর শত্তুর নেই। পাজামা-পাঞ্জাবি লটরপটর করে যখন চলে কোনোদিকে হুঁশ থাকে না। এর সাথে ঢলাঢলি। ওর সাথে গলাগলি। বাছবিচার নেই।

: কাল অব্দি রেইড হয়েছে।

: কোথায়?

: বি সি-তে।

: বালুরচরে?

: হুঁ।

ওরা তিনজন মাথা ঠুকছে পরস্পর। ঘন হয়ে বসেছে। গোরার মুখে কথা নেই। এমন বেকায়দায় ও জিন্দেগিতে পড়েনি। যত দিন যাচ্ছে, সব কেমন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুলিশ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সামাল দিতে জান কয়লা। গোরা তো গান্ধীর চেলা নয় যে বলবে : পড়ে পড়ে মার খা...কিন্তু... সামনে ঝুলে পড়ে কিম্ভূতকিমাকার একটা

এরকম সময়ে গোরার নারণদার কথা মনে হয়। সবে ওয়ার্কারদের ভেতর ঢুকছিল। বাতচিত হচ্ছে। দু-একটা ঠেকও বানিয়েছে। দু-চারজন থাকার মতো। এমন সময় এই হুজ্জোত। তর সইছে না আর। অস্তরপাতি লোকজন ফেলে যে যার ময়দানে যেতে চায়। লড়বে। মওকা বুঝে খোচর লেলিয়ে দিয়েছে সরকার। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গোরা চেঁচিয়ে উঠল : শালা একটু হাঁপ ধরার টাইম দিচ্ছে না।

: দেখো আজকের মিটিংটা...।

গোরা সাথে সাথে ঘাড় নাড়ল...হ্যাঁ, আজকেই লাইন নিয়ে এসপার-ওসপার যা হোক হয়ে যেত। হাত গুটিয়ে ঠুঁটো হয়ে তো আর বসে থাকা যায় না। রাস্তা ঠিক না করতে পারলে যাবি কোন চুলোয়! এদিকে খোচরের র‍্যালায় টেকাই মুশকিল, সাচমুচ দু-দশটা ফেলে দিলে যদি কাজ হত, পেছপা হতাম না। কিন্তু এতে কিছু হবার নয়। এ লাইনেই গলতি আছে। যদি একটু টাইম পেতাম?

: কিন্তু এ বি কি এসব মেনে নেবে?

: দেখা যাক। ছেলে তো সমঝদার।

এ বি-র কথা উঠতেই সোনা ঘাড় ফিরিয়ে আবার রাস্তাটা দেখল। বীরুর কথাটা মনে হল। বীরুর দিকে পোড়া কয়লার টুকরোর মতো চোখ দুটো মেলে রাখে কয়েক মুহূর্ত। বীরু অসোয়াস্তিতে আনচান করে : কী? সোনা চোখ ফিরিয়ে নিল। গোরাও কিছু ঠাহর করতে পারছে না। ফের সোনা বীরুর দিকে চাইল স্টান। পোড়া কয়লার টুকরো চোখ দুটোয় বাতাস ধামসে পড়ায় আগুন ঠিকরোচ্ছে। বীরু চেঁচিয়ে উঠল : কী ব্যাপার! সোনার দাঁত দু-পাটি খট করে শব্দ তুলে জোড়া লাগল : এ বি-র কিছু হলে, তোকে জিন্দা রাখব না। অপয়া কথা বের করে দেব!

: সংস্কার।

: মোটেই না।

: তাহলে কী?

: ও বলল কেন? বাড়িতে একবার পুলিশ কড়া নেড়েছিল তাতেই বেহালার মামাবাড়িতে হাওয়া। ওদিকে কথার বেলায়...

মন্টু সোনার মুখটা এক হাতে ফিরিয়ে ধরল। মুচকি হাসি লেগে আছে মন্টুর ঠোঁটে, কালো চোখের তারায় : তোর এখনও কুসংস্কার যায়নি। সোনা আর ঘাঁটাল না। গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

: কী করবে?

: হ্যাঁ, কী করবে? কতক্ষণ আর বসে থাকবে?

গোরা এসবের জবাব না দিয়ে বীরুর কাছে আবার সিগারেট চাইল। বীরু বেখেয়ালে সিগারেটটা দিয়ে দিল। হুস হুস করে টানতে লাগল। সোনা সেই থেকে থামে হেলান দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজটা ধরতে চেষ্টা করছে। টিউবলাইটের আবছা আলোটা আর ঠাহর হয়না। অন্ধকার জমে আসছে। রাস্তাটা বিলকুল ফাঁকা। জনমনিষ্যি বলতে নেই। বীরু ফিসফিস করে ওঠে : কেটে পড়া যাক।

: দাঁড়া।

নিবারণকে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। পট্টিছেঁড়া হাফপ্যান্টটা দেখেই মালুম হল। হাঁটুর মালাইচাকি অব্দি প্যান্টটা ঝুলে নেমেছে। পা দুটো যেন মার্চ করতে করতে এগোচ্ছে। প্যাঁকাটে লিকলিকে পা। আজ হয়তো পেটে দানা পড়েনি। টালমাটাল পা দুটো দেখে গোরা ভাবছিল। বউটাকে তো পাঠিয়েছে বাপের বাড়ি। বিয়োবে। আসলে চোখের সামনে মরবে এটা নিবারণ দেখতে চায় না। বুকটাও বেঁকে তুবড়ে গেছে। তেড়িয়া চেহারা। সিক্কলের কাজটা যেতে ও শান খেয়েছে আরো। এখন দিনরাত যখনই হোক, কাজ পেলে রাক্ষসের মতো গেলে। তবে হ্যাঁ, ওসব পোস্টার লেখাফেকা ধাতে আসে না। এবার নিবারণের শরীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখের আঁচিল অব্দি। পা দুটোই অবিশ্যি চোখ টানে। পাকা হলদেটে হাড়। তেল খাওয়া লাঠির মতো। পায়ের লোম অব্দি নজরে আসছে।

হয়ে গেল।

না।

তবে?

বুড়োরা এখনও করছে, আমার শরীরটা ঠিক নেই।

কী হল?

কেমন গা গোলাচ্ছিল।

কথা বলতে বলতে নিবারণ থেবড়ে বসল। নিবারণের বিশাল মুখখান ছিবড়ে শরীরের সাথে খাপ খায় না। যেন আলগার ওপর লাগানো। হাতের শিরাগুলো বিদ্রোহে তেড়িয়াভাবে জেগে উঠেছে। ওদের মাথার ওপর আকাশটা চিকচিক করছে জরির কাজের মতো। আর ঘন ঘন হিমবাতাস দিচ্ছে। গোরা দরদের সাথে জিজ্ঞেস করল : ইউনিয়ন বলবে!

: ভেড়ুয়ার দল। কী আর বলবে?

বাতচিত মার খায় একটু। নিবারণ আগের কথার জের টেনে চলল : কাশীবাবুর কারখানা তো শালা আমার চোখের সামনে বড়ো হল। একেবারে শুরুর দিকে তো ছিলুম মোটে আমরা তিনজন। ঢালাইয়ের কাজ হত। আর একটা লেদ ছিল। কাশীবাবু চীনে পাড়ায় এক মাগীর সাথে থাকত তখন। ঘর থেকে আর একটা কানাকড়িও ঢালেনি। শুয়োরের মতো খেটে তবে তিনটে শেড হল। আর এখন শালা আমাকেই লাথ মারল। বুঝলে গোরাদা কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেব। দেখো ঠিক লাগাব, শালা কারো মানা শুনব না। সাথে সাথে গোরা যেন এক

নারদনিক মজুরকে দেখতে পেল যে তার শক্ত মজবুত হাতে ভেঙে ফেলছে একটা মেশিন, মুখের আঁচড়ে, হাতের পেশিতে লাফাচ্ছে রাগের গর্ গর্ শব্দ।

গোরা নিবারণের গলার ওঠা-নামা নিপুণভাবে লক্ষ করছিল। আর নিবারণ কথা বলতে বলতে আক্রোশের জ্বালায় গরর গরর করছে। নিবারণের মতিগতি গোরা ভালোই জানে। কাজটা যাওয়ার পর থেকে ও ক্ষেপেছে বেশি। আগে আগে গোরা কিংবা মন্টুর সাথে একটু আধটু কথা কাটাকাটি করত। এখন ও হররোজ গরম হয়ে উঠছে। ওর বউটা প্রথমবার একটা মরা বাচ্চা বিয়োয়। সেবার নিবারণ মুষড়ে পড়েছিল বড্ড। পরেরটাকে দুধবার্লি দিতে পারেনি সেও গেল। দুবারের ধকলে বউটা কুঁজো হয়ে গেছিল। মাজা ভেঙে শুকিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে। এবার তো আর কথাই নেই। নিবারণ বউটাকে এবার মরতে পাঠিয়েছে। ওর বাপের সাধ্যি নেই যে তিনদিনে একবেলা চাট্টি দেয়। নিবারণ এখন ঝাড়া হাত-পা।

খেয়েছিস?

কখন?

সারাদিনে একবারও গিলেছিস?

হ্যাঁ। আজ দুপুরে বুড়ো খাইয়েছে।

তুই না কমুনিস!

হক বলছি, খাইয়েছে।

আচ্ছা।

নিবারণের এই এক মজ্জাগত ব্যাধি। শুকিয়ে মরবে, তবু মুখ ফুটে কাউকে একটা কথা বলবে না। গোরা ওকে হাজার দফা বলেছে সিককলের টিফিনঘন্টির সময় গেটে যেতে, ওয়ার্কারদের মতিগতি সমঝে ছাঁটাইর খিলাপে জবরদস্ত লড়াই তোলার ফিকির খোঁজা দরকার। কথাগুলো নিবারণকে ছুঁতে পারে না। হাই তোলে, চোয়াল কাঁপিয়ে। বেশি খোঁচালে বিগড়ে যায় : ও শালা গোলামের জাত সব। শিবুকে যে গেলবার পিটিয়ে মারল, মনে রেখেছে থোরি সে-কথা। ঠিক শালা গিলছে, বাচ্ছা বানাচ্ছে, আর ঘাড় ভেঙে সিককলে ঢুকে খুনে পানির বান ডাকাচ্ছে।

নিবারণ কোঁত দিয়ে দিয়ে শ্বাস ছাড়ে। আসলে শ্বাস ছাড়ে না, নাকে একটা শব্দ করে। জোর দিয়ে কথা বলার আগেই শব্দটা ওঠে...খু...খু...খু। তোবড়া নাকটা খু খু শব্দে ঝুলে পড়ে: শালা এমনিতেও মরছি...(নিবারণের কপালে ঘাম ফুটছে। বিনবিন করে। ঝড়ঝাপটা ধকল সওয়া মুখখানা শক্ত হয়ে ওঠে। অত তুকতুক করে কী হবে। আশ মিটিয়ে লড়ে যাব, যা থাকে কপালে।

: কপাল?

: ওই হল।

হনহনিয়ে চলে গেল। ওভারব্রিজের তলা দিয়ে নিবারণের ঢ্যাঙা শরীরটা ছায়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। মন্টু সেদিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস করে উঠল : মরিয়া হয়ে উঠেছে। মন্টুর কথাটা বয়ে গেল। কেউ রা কাড়ছে না। মাথাটা ভার ভার। এ বি-র কথা ভেবে বাস রাস্তার

ছুঁচোলো কোণটার দিকে তাকাল। সোনার চোখে জ্বলুনি। দু-রাত কেউ চোখের পাতা জোড়েনি। আর টেনে রাখতে পারছে না। মন্টু বেমক্কা গোরাকে জিজ্ঞেস করল : গেল হপ্তায় শেতলাতলায় গেছিলে?

কেন?

খুকু জিজ্ঞেস করছিল।

হুঁ।

একবার দেখা করতে কী হয় তোমার!

কেন?

মাসিমা তো মুখে জলটুকু দিচ্ছে না।

মা ওইরকম।

তুমিই বা কীরকম?

এত যে বকছিস—তুই গেছিলি একবার বাড়িতে?

বাহ্!

কেন?

ধরা দিই আর কি গিয়ে!

ওহ্। আর আমাকে পাঠিয়ে পাহারা বসাবি এই তো। তারপর সব সুদ্ধু।

সোনা ঘুম তাড়াতে উঠে চক্কর মারতে লাগল। বীরুর মুখে রা নেই। গলাকাটা বিদ্যেসাগরের স্ট্যাচুর মতো পড়ে আছে। এমনিতেই ছেলেটা দুর্বল। এত ধকল সহ্যি হচ্ছে না, বীরুর মাথাটা গোরার কাঁধে হেলে পড়েছে। গোরা আনমনে বীরুর চুলে আঙুলে চালাচ্ছিল :

> আমার কোনো অসুবিধে হয় না, তোদের সাথে আছি তো। আজকাল কী হয়েছে জানিস, সারাদিনে একবার বেশ একটু টাইম নিয়ে তোদের সাথে গুছিয়ে বসতে না পারলে কেমন ঝিম এসে যায়। পুলিশের ঝামেলা বাড়ার সাথে সাথে টানটা বাড়ছে দেখছি। সবাই মিলে যখন থাকি তখন কিচ্ছু মনে থাকে না। তখন মনে হয় সত্যি সত্যি দুনিয়াটা ভাঙা-গড়া কিচ্ছু না। একা হলেই নানান কথা মনে আসে। কমজোরি লাগে।

এখন ওরা চারজন। মন্টু, বীরু, সোনা আর গোরা। আর পিচের মতো অন্ধকার। অন্ধকারে চারমূর্তির হাত-পা ঠোঁট নড়ছে। তবু যেন চারজনই খোয়া গেছে। খেয়াল নেই কতক্ষণ বসে আছে। চুম্বকের মতো এই মোড়টা যেন টেনে রেখেছে ওদের। নাকি একটা মাকড়সার মুখ থেকে অন্ধকারের লাল দিয়ে বোনা এই জালে চারজনই আটকে গেছে। ভাবছে ইচ্ছে করলেই উঠে যেতে পারে। উঠি উঠি করেও বসে আছে। উঠলেই হল। ভাবছে এই তো হাত নাড়ছি, পা দোলাচ্ছি। উঠতে আর কতক্ষণ? অথচ ওরা আটকে পড়েছে। হয়তো কারো বুকের ভেতর ছম্ ছম্ শব্দে ঘুঙুর বাজছে ভয়ের মুদ্রা করে নাচের ঢঙে। চেপে ধরেছে ভয়ের টুঁটি। সাহস দেখানো, কিংবা আর সবাই ভীতু খেলো ভাববে বলে যে দম বন্ধ করে আছে তা নয়। আসলে মনের ভেতর বাতচিত চলছে। ধুস, এলেই বা! সোনার ওয়ানসটারটা আছে না। সাঁ

করে ছুটে যাব হাসপাতালের মাঠে...হাইড্র্যান্ট খুলে দুটো পেটো হাতে নিয়ে দাঁড়ালে...। ব্যাস। তাছাড়া এ বি-রই তো রিস্‌ক বেশি। কী হল, আসছে না কেন?

কথাবার্তা যেটুকু চলছে তা আপসে। কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য গতিবিধি নেই। কথার পিঠে কথা। আসলে চারজনই ডুবে ছিল শঙ্কার সামনে দীর্ঘ একটা 'আ' বসাতে। কীসের যেন আশঙ্কা। তেইশ নম্বর বস্তির সেই সাদা বেড়ালের মতো গোরার নাক কী একটা গন্ধ শুঁকতে ওত্ পেতে আছে। নাহলে চারজন জড়ো হয়েছে সাড়ে আটটা নাগাদ। দু-ঘণ্টা কেটে সাফ হয়ে গেল। এখনও কত মিনিট সেকেন্ড পাশ করে যাচ্ছে ওদের গায়ের লোমের ওপর দিয়ে। সুরসুর করে। অথচ এতক্ষণে একবারও মনে হল না আসলে ওরা পাঁচজন। আর সেই পাঁচ নম্বর মানুষটারই পাত্তা নেই, শেলটারের ব্যবস্থা করার কথা যার, যে হিউজ রোডে সি পি এমের বল্টুর হাতে পড়েছিল। সত্যি সত্যি বল্টুরা ওকে তোলতাই করে নিয়ে গেছে কিনা তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। নিয়ে গিয়ে থাকলে এতক্ষণে পচাখালের পাঁকে পুঁতে দিয়েছে। একবারও এসব মনে ফাট ধরে উঠল না। লাইনের গাড়ি, ফাঁকা বাতাস, আর টিউবলাইটের স্বপ্ন-স্বপ্ন নীলা আলোর তলায় ওরা মূর্তির মতো স্থির।

হঠাৎ সোনা অধৈর্যে গরম হয়ে উঠল।

: নাহ্!

: কী?

: এবার ওঠো।

: এ বি...

: ইস্...স্।

টাগরায় জিভ ঠেকিয়ে মন্টু শব্দ করল। সোনার হাতটা অভ্যেসমাফিক পকেটে চলে গেল। যন্তর নিয়ে চলা অভ্যেস। ফেলে এসেছে খেয়াল নেই। ফাল দিয়ে উঠল। দু-হাত কচলাচ্ছে।

আর শব্দ উঠছে। অস্পষ্ট চাপা একটা শব্দ। প্রথমে থেমে থেমে। তারপর ঝাঁক বেঁধে একটানা। ভোঁ ও...ও...ভোঁ...ও...ও। শিরশির করে বোলতার ডাকের মতো শব্দ। বোলতা একবার পিছু নিলে নাকি সাত হাত জলের নীচে গিয়েও হুল ফোটায়। বিষ ঢালে। শব্দটা ক্রমে ক্রমে চড়ছে। ঝাঁক ঝাঁক বোলতা যেন মোড়টা তাক করে ছুটছে। মন্টু তখনও কান পেতে রেখেছে। আন্দাজ নিচ্ছে। গোরা আর সোনা চোখ মেলাল। বীরু উঠে পড়েছে। কিন্তু নড়তে পারছে না। সোনা এরই মধ্যে হাত ঘুরিয়ে সিগারেটের চুসকিটা নিল। খানিক শুকা গিলে ও লাস্ট টানটা মারল। টুসকি দিয়ে শেষটা ফেলে দিল। ফুটপাতে লেগে আলোর ঝিরঝিরে ফুল ফুটল। বোলতার ডাকের মতো শব্দটা তখন আক্রোশে মাটি খুবলে খাচ্চে। হুল ফোটাতে ফোটাতে এগোচ্ছে। তারপরই ব্রেক-কষার একটা ঘ্যাঁচ শব্দ। আর ধুলোর ঝড়।

: খোচর!

: চাক্কা!

টিউবলাইটের থামটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গোল করে বাঁধানো শান ফাঁকা পড়ে আছে।

ধুলোর ঝড়টা পাক খাচ্ছে তখনও। ছেঁড়া একটা শালপাতা উড়ছে। একনিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল চত্বরটা। হালকা আকাশি আলোটা কাঁপছে কেবল। সোনা ঢিল ছুঁড়েছিল ল্যাটা হাতে। টিউবটা তাক করে। পোস্ট কাঁপিয়ে ঢিলটা ভ্যানের গণ্ডারের মতো থ্যাবড়া নাকে লাগল। আধো অন্ধকারে ফের একটা ঢিল ছুটে এল। সোনা ল্যাটা হাতের কব্জি খিঁচে ছুঁড়েছিল। ঝন ঝন করে একটা শব্দ ওঠে। পাতলা কাঁচের টুকরো অন্ধকারের ঝুল নিয়ে থামটার হরতরফে ছিটকে গেল। অন্ধকারে ছুটন্ত পায়ের চেটোর একটা ছরছরানি দুড়দাড় শব্দ হল। রকটা কট কট করে চেয়ে আছে। চারপাশে জিলিপির প্যাঁচের মতো গলি হাঁ হয়ে আছে গিলবে বলে। ওরা সবাই একে একে প্যাঁচের ভেতর ঢুকে গেল।

অন্ধকার জাগ ধরে উঠেছে। ধুতি সার্ট পরা জনা ছয়েক যণ্ডামার্কা লোক ঝটপট নামল। ভঈসা ঘি খাওয়া, ডন মারা গতর। তবু গতরের ওপর ভরসা রাখতে পারে না। কুচকুচে কালো রিভলভারগুলো সাপের ফনার মতো উঁচিয়ে এগোচ্ছে : ভাগো মৎ। মৃগী রুগির মতো অফিসারের মুখ বিকারের ঘোরে বেঁকে তুবড়ে একশা। মিশকালো কোদাল দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়ছে। ফ্যাসফ্যাসে গলা চড়ছে : হ্যান্ডস আপ।

ওরা চারজন ছিটকে গেল। পানবিড়ির দোকানের ঝাঁপ হুস্ করে নেমে এসেছে। ফাঁকা রাস্তাটার সিনা ঠেসে ধরেছে পুলিশের বুট। খোচরের পিছু পিছু সি আর পি বন্দুক নিয়ে তিনটে গলির মুখ আটকে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা। তারপরই দুড়দাড় শব্দ। হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি। গোটা চৌরাস্তার মোড়টা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় কাতর, উঁকিঝুঁকি মেরে খোচররা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। ভ্যানের হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছে। থিক থিক করছে অন্ধকার। ভ্যানের ইঞ্জিনটা চালু থাকায় কেমন একটা শব্দ হচ্ছে। বুকচাপা শব্দ।

জিলিপির প্যাঁচের মতো গলির ভেতর থেকে একটা শব্দ পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে : খোচর! খোচর!

ক্লাসফোর স্টাফ কোয়ার্টারের ভেতর থেকে বুড়ো দলবল নিয়ে ঘাপটি মেরে বেরিয়ে এল। ওদের আধো আধো ছায়া জেগে আছে। ছায়া ঠাহর করে খোচর আর সার্জেন্টের রিভলভার আগুন উগরে দিল। মাওয়ের টেনসিলটা পত পত করে কেঁপে ওঠে। সাথে সাথে বুড়ো হাঁক দিয়ে উঠে হাতের মালটা ছুঁড়ে দিল। বাতাসে লাল সাদার তেজি গন্ধ।

সুতোর মতো গলিগলা আর রেল কোয়ার্টারের ভিতর থেকে বুড়োর সঙ্গী-সাথীরা লাইনে উঠেছে। খোচররা পিছনে হাঁটতে লাগল পায়ে পায়ে। পঞ্চাশ-ষাট গজের ফারাকে দু-দল— খোচর, পুলিশ, সি আর পি আর লাইনের খোয়া হাতে গোরার দল। গোরা লড়াই এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু খোচরের জাত ফাঁস লটকে দিয়েছে। চারদিক ঘিরছে। পেটো থাকলে রাস্তা বানিয়ে নিত এক টুস্‌কিতে। গোরা গজরাচ্ছে : শালারা খুঁচিয়ে ঘা করছে। সোনা যন্তরের ঘাটতি বেমালুম ভুলে মেরেছে। বুড়োর দলও ঝাড়া হাত পা। ওদিকে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে এদিক ওদিক টোটা ছুটছে। লাইনের পেছনটা ঘেরাওর মধ্যে আনতে পারেনি। একবার গলি ধরলে সিধে হিউজ রোডে গিয়ে ওঠা যায়। হাতে একটু টাইম চাই শুধু। নাহলে পিঠ ছ্যাঁদা করে ফেঁড়ে ফেলবে। সোনার ল্যাটা হাতে ভেলকি খেলছে। সি আর পি আর খোচরের দল

এলোপাথাড়ি গুলি করছে। তাক করার মওকাই দিচ্ছে না সোনাকে। মিনিট পাঁচেক ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই ওরা কেটে পড়তে পারে। পুলিশ বাগে পাচ্ছে না কিছুতেই। পাঁচ হাত সামনে এসে গুলি বেঁকে যাচ্ছে। মাটিতে আছড়ে পড়ছে ফটাশ ফটাশ শব্দে। গর্ত করে। দু-কদম এগোবার জন্য বন্দুক নিয়ে ঝুঁকে পড়ছে; জুত করতে পারছে না। আর লাইনের পাথর ছুটছে তীরের ফলার মতো। সাঁই সাঁই ডাক ছেড়ে।

গোরাদের ছোট্ট নিরস্ত্র ফৌজটা হিমসিম খাচ্ছে। দরদরিয়ে ঘামছে। হাত টাটাচ্ছে। বাতাস অব্দি গরমিতে ভেপসে উঠছে। বসন্তের বাতাস খ্যাপলা জালের মতো মৃত্যুর ফাঁদ ওদের ওপর লটকে দিচ্ছে ক্রমশ। গোরা দাঁতে দাঁত চাপতে গিয়ে ঠোঁট কেটে ফেলল : দু-দিকে ছিটকে যা।

উল্টোদিক থেকে খোচররাও লাইনে চড়ছে। লাইনটাকে ওরা সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরছিল। ততক্ষণে পাঁচ ছ-জন বুড়োশিবতলা দিয়ে কেটে পড়েছে। সেরেফ সোনার ল্যাটা হাত চলছে। গোরা লাইনের ধারে ঝোপের ভেতর মন্টুকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। খোচরের নজরে আসেনি ওরা ঘাপটি মেরে আছে। সোনাকে ঘিরছে। মন্টু চ্যাঁচাতে যাচ্ছিল গোরা মুখ ঠেসে ধরল।

ওরা হাঁফাচ্ছিল। ধুক ধুক করছিল। কালো তেলতেলে বসন্তের দাগ ভর্তি খোচরের মুখটা থরথর করে কাঁপছে। ফ্যাসফেসে গলার আওয়াজটা অব্দি কেঁপে উঠছে : কা আভি তক জিন্দা হ্যায়। সোনার দুটো হাত পেঁচিয়ে ধরেছে খোচররা! আবার কাঁপছে। সোনা অগলবগল দেখছিল। হাতজোড়া বোধহয় একটু নেমে এসেছিল। সাথে সাথে রিভলভারের ঠান্ডা নল কপালের রগে ঠেকল। সোনা হাত তুলল ওপরে। ও ধান্ধায় আছে। বসন্তের গর্ত গর্ত দাগ ভর্তি মুখে খিস্তির ফেনা ছোটাচ্ছে খোচরটা। তারপরই সোনাকে হাঁটাতে শুরু করল। যেতে যেতে সোনা চোখ ফিরিয়ে কী যেন একবার দেখে নিতে চাইল। ঝোপের ভেতর থেকে সোনার চোখ দুটোকে গোরার ডাগর মনে হল। বিশাল দুটো চোখ। হঠাৎ কী করে যেন সোনার চোখ দুটো বিশাল হয়ে উঠল।

: মন্টু!

: উপায় নেই!

: শ্ শা লা।

গোরা সোনার ঝাঁকড়া চুলওলা মাথাটা যতক্ষণ না মিলিয়ে যাচ্ছে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল। হয়তো কালাগাড়ি তক পৌঁছোবার আগেই এক ঝটকা মেরে সোনা গলি পাকড়াবে। জোর করে ভাবতে চেষ্টা করে : সোনাকে নিয়ে যেতে পারবে না, কিছুতেই না।

আর চৌরাস্তার মোড়ে আসতেই রাইফেলের কুঁদো হুট করে সোনার মাথার ওপর ঠিকরে পড়ল। সাথে সাথে পিচের রাস্তায় ঠোঁট ঘষতে লাগল। শরীরটা আলগা হয়ে গেল। রাস্তায় ক্ষীণ একটা লাল রেখা, মেয়েদের ফিতের মতো খুলে গেল।

: শালা যন্তর কোথায়? অস্তর?

: জানি না।

: যন্তর জানো না খানকির ছেলে।

: নাহ্।

: পাইপ?

: জানি না।

বুটের লাথে সোনার ঠোঁট থেঁতলে গেল।

: শেলটার?

: না।

অফিসারেব ফাঁপা ফুলো গতর আক্রোশে রি রি করে কাঁপছে। দশ-বারোটা খোচর বুটের লাথ আর বন্দুকের বাঁট দিয়ে সোনার দু-চোখে গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে দিল। ও আর মাথা তুলতে পারছে না। ঝাঁকড়া চুলো মাথাটা ভার ভার, শরীরে সাড় নেই। ঠোঁটের সাড়ও মরে আসছিল—ন্ ন্ না ন্ ন না। ধীরে ধীবে খোচরের চেহারাগুলো বিরাট লম্বা লম্বা হয়ে উঠল। মুখগুলো হাঁড়ির মতো। তারপর আপসে চোখ বুজে আসছিল। আর ঠিক তখনই সোনা চোয়ালের নীচে ঠান্ডা একটা ছোঁয়া পেল। নলটা চোয়ালের নীচে নরম তুলতুলে জায়গায় ঠেকিয়ে ওরা ফায়ার করল। চোখের তারায় যন্ত্রণার সূক্ষ্ম একটা রেখা জাগিয়ে সোনা শেষবার ঠোঁট নাড়ল : ন ন্ না। তখন আর চোখ নেই। পাথর হয়ে গেছে। রক্তের নদীনালা এঁকে বেঁকে আসছে ঘাড়েব কাছ থেকে। পশমের মতো মোলায়েম চুলের ডগা বেয়ে। অফিসারের ঝুলোনো ঠোঁট কিলবিল করে উঠল : কুইক, একদম টাইম কিল কোরো না।

খুনের পর ওরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি সব সারতে লাগল! ঝটপট। সোনার নিস্পন্দ শরীরটা চ্যাংদোলা করে ভ্যানের উদরে ঠেসে দিল। নাটা সি আর পির দল তিড়িং তিড়িং করে ভ্যানে চড়তে লাগল। দরজা টানার শব্দ হল একটা। ধোঁয়া উগরে দিল একরাশ। ইঞ্জিনের শব্দটা রাতের নিটোল শান্তি ভেঙে মাটিতে বোলতাব হুল ফোটাতে ফোটাতে সামনের বস্তিটা লক্ষ করে ছুটল।

মোড়ের লাইটপোস্টের তলায় অন্ধকার টুঁটি চেপে ধরেছে। বারুদের গন্ধ তখনও নাকের ডগা জ্বালাচ্ছে। আর ভ্যানেব ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। ধোঁয়ার ঘন আস্তরণ ভেঙে গেছে। পেঁজা তুলোর মতো ছড়াচ্ছে। শেষে সুতোর নালের মতো হয়ে এল। আর তখনই গোরা, মন্টু আর বুড়ো পোস্টটাব তলায় এসে দাঁড়াল। ওদের শরীর মালুম হয় না অন্ধকারে। মন্টুর কাঁধে সাইডব্যাগ। পোস্টের নিচে সন্তর্পণে ও ব্যাগটা রাখল। তখনই পায়ের কাছে রক্তটা চটচট করে উঠল। অন্ধকারে লাল রঙটাও ঠাহর হয় না। ওরা তিনজন এখন নুয়ে পড়েছে। রক্তের দাগ ঘিরে। ফলে ওরা সেই গর্তটা দেখতে পেল। আর গুলির দাগ চিনতে আজকাল ওদের একটুও তক্‌লিফ হয় না। তক্‌লিফ হয় বুকটা নিয়ে। বুকের একটা অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে।

তিন ·জোড়া পা যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। রক্তের গোল দাগটার কাছে নীল মলাটের ছোট্ট নোটবইখানা পড়ে আছে। মিনু দিয়েছিল। শ্যামলা মেয়েটা কি এবার বানের উথালপাথাল ঢেউ তুলবে বুকে। মন্টুর গলাটা ফ্যাসফ্যাস করছে : খোচরটা নিজেই আনন্দবাজারে রিপোর্ট দিতে যাবে।

বুড়ো পোস্টের তলা থেকে সাইডব্যাগটা তুলে নিল ধীরে সুস্থে : আমি সোনাদের বাড়িতে যাব না বলে রাখছি। কিছুতেই না।

নোটবইটা প্যান্টের পকেটে পুরে ফেলল গোরা। আচ্ছন্নের মতো মোড়টা ডাইনে ফেলে ওরা হাঁটতে লাগল। থিকথিকে অন্ধকার ওদের গিলছে একটু একটু করে। শেষ রাত্তিরের ঠাসবুনট অন্ধকার একটু পরেই পাতলা হবে। আর দুধের সরের মতো সকাল সোনার সিনার খুন নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে আসবে।

: কাল বেলিয়াহাট্টা বন্ধ!

বুড়োর ডান হাতটা কব্জিসুদ্ধ সাইডব্যাগের ভেতর ঢুকে গেল। মোচার মতো দড়ির মালগুলো ছুঁয়ে ওর বুকটা গরম হয়ে উঠল। ভোর রাত্তিরের আফিমের নেশার মতো ঘুমজড়ানো সারা তল্লাট জুড়ে নিষ্ঠুর স্তব্ধতা। কামানের নলের মতো গ্যাস কোম্পানির চিমনি হাঁ হয়ে আছে। বস্তির মুখগুলো ফাঁক হয়ে বেহুঁশভাবে পড়ে আছে। আর স্তব্ধতা। নিষ্ঠুর স্তব্ধতা। বুড়োর হাতটা নিসপিস করছে। খুনির মতো এই বেকুফ স্তব্ধতা যেন তাদের চিবিয়ে খাবে। বুড়ো মালটা হাতের থাবায় নিয়ে ভাবছিল : এক্ষুনি একটা বিস্ফোরণ, আর আগুনের ঝিরঝিরে ফুল ফুটতে পারে। গোরা ভাবগতিক দেখে ওর হাতটা চেপে ধরল : পাগলামি করিস না। কাল বেলিয়াহাট্টা বন্‌ধ, মাল নষ্ট করিস না।

বুড়োর থ্যাবড়া হাত, হাতের কব্জি, সাইডব্যাগের ভেতর থেকে বরফ-খাওয়া শক্ত চ্যাপ্টা মাছের মতো উঠে এল।

আর 'কাল বেলিয়াহাট্টা বন্‌ধ' কথাটা ধুলোর আস্তর লাগানো শীল লেনের পিচের রাস্তা ধরে একগুঁয়ে জন্তুর মতো সাঁ সাঁ করে ছুটতে লাগল। মন্টুর বেঁকা নাকটা কাঁপছিল। ছোট্ট গোল মাথাটা ঘাড়ের রগ টেনে একপাশে কাত হয়ে আছে। কারো মুখে শব্দ নেই। রাত ফুরোতে আর ঘণ্টা তিনেক বাকি। কোথায় যেতে হবে সবাই জানে। লোকনাথ গার্ডেন লেনের ভাড়া নেওয়া ঘুপচির টিপতালায় একটা পাতলা চাবি বসিয়ে গোরার হাতটা মোচড় লাগাবে। তারপর রঙ, কাগজ, দেশব্রতী, চটি চটি বই এসব ঠেলে তিনটে শরীর একটু এলিয়ে যাবে ভাঙা চৌকিটার বুকফাটা আর্তনাদে। চায়ের ভাঁড়ে সিগারেটের ছাই খসে পড়বে। মন্টু হয়তো কাগজের ওপর তুলি দিয়ে 'কমরেড সোনা' অব্দি লিখে বারকয়েক কাটাকুটি করবে। তারপর ঝট্ করে লাফিয়ে উঠবে। তখন সকাল হবে। সাইডব্যাগটা একটা যোগ্য কাঁধ পাবে ঝুলে পড়ার। আর ব্যাগের ভেতর ভীষণ একটা প্রতিজ্ঞা আহ্লাদে শক্ত হয়ে থাকবে বুড়ো কিংবা সুকুর আঙুলের ছোঁওয়া লাগার উৎকণ্ঠ উল্লাসে।

'কাল' এই ভবিষ্যতই যেন মন্টুর নাকের পাটা ফুলিয়ে স্তব্ধ করে রেখেছে। বুড়োর হাত টেনে নিয়েছে ইঞ্জিনের পিস্টনের মতো। ঠিক এমন একটা অবস্থায়, যখন ওদের কাছে আবার এক পর্বত-পতনের শব্দ ভেসে আসছে, তখন এক জবরদস্ত প্রতিজ্ঞার পতাকা ওড়ানোর দরকার ছিল। দরকার রেড টেরর। তবু সেই প্রতিজ্ঞার খোলে যে উত্তেজনা চালান গেল তাতে গোরার কোনো হাত নেই। কাল ওদের সামনে পুরোনো আক্রমণকারীকে এনে দেওয়া চাই। অথচ গোরা জানে সেটা বড়ো কথা নয়। গোরা চায় কাল তামাম বেলিয়াহাট্টা শোকে বুক

চাপড়াক। বুঝুক তাদের বীর যোদ্ধাকে, যুদ্ধের তাৎপর্যকে। জিজ্ঞেস করুক। ঘিরে ধরুক। আর ওদের জিজ্ঞাসার ফলায় সমস্ত শরীর বিদ্ধ হোক।

গোবরপট্টির কাছে এসে গোরা পকেট থেকে চাবিটা বের করল : তোরা যা, আমি একটু পরে আসছি। মন্টু আর বুড়োর চোখে অদ্ভুত উদ্বেগ : কেন?

: সোনাদের বাড়ি যাব।

ওরা দুজন কোনো নিপুণ ভাস্করের ছেনিতে খোদাই মূর্তির মতো, পাথরের মতো, শিরদাঁড়া মেলে স্থির থাকল একমুহূর্ত।

পচাখাল আর হাড়্ডিকলের বেলিয়াহাট্টায় চিমনির বদ রক্তবমি আর কূট গন্ধ জাগ ধরে আন্ধার। তরতাজা একটা জানের শোকে বেলিয়াহাট্টায় রাত্তির। সত্তরের বেলেঘাটা। বারুদের গন্ধ বুকে নিয়ে চোখের ডিমে নখ বিঁধিয়ে পড়ে আছে।

ব্রিজটা পেরিয়ে ফিসফাস দু-চারটে কথা হয়েছিল। তারপর ওরা হুস্ করে মিলিয়ে গেছে। শেতলাতলার লাল শানের পাশ দিয়ে এক ঝাপটায় গোরা আবার বাস রাস্তা ধরেছে। এখন একা। বিলকুল একা। আর একা থাকলেই যে রাক্ষুসে শূন্যতা গোরাকে গাঁক করে গেলে তার ঢাউস পেটটা এখন যন্তরনায় ঠাসা। গভীর যন্ত্রণা। জ্বালা যন্তরনা বুকের হাড় জিরজিরে খাঁচা ঠেলে তুবড়ে কেমন একটা শক্তির জন্ম দিচ্ছে। বুকের ভেতর আশ্চর্য একটা শক্তি পয়দা হচ্ছে। আর দু-হাতে ফাতা ফাতা করে অন্ধকার ছিঁড়ে গোরা হাঁটছে। হাঁটছে না ছুটছে বোঝার জো নেই। থেকে থেকেই একটা শব্দ জাগছে—হন্ হন্ হন্। আর আগুনের হলকার মতো শ্বাস। যেন কাঁচা আগুন গিলেছে। অঙ্গার, ঠোঁট নড়ে না, জিভ নড়ে না। অথচ একটা দামাল ছেলের নাম টাগরায় নাচে। গোরা বিড়বিড় করছিল : সোনা...সো...না...।

সোনা নেই। নেই। একথা গোরার চেয়ে বেশি আর কে জানে! কয়েক ঘণ্টা আগে অব্দি যে ছেলেটা ভালাইর জন্য, মানুষের ভালাইর জন্য তার জলজ্যান্ত শরীরটা দান খয়রাত করে, লাইনের খোয়া হাতে আকাশ ফাটিয়ে হেসেছে, তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে থেঁতলে শেষ করেছে। আর এখন ঘুঁটে-সাঁটা পচপচা পুকুর-দেয়ালের লাগোয়া পিচের টিনের গোল চাকতি ঘেরা ছাউনির বগল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে গোরা কথাটা হজম করতে পারছে না। মানুষের পাকস্থলীর এমন হজমির তাকতই নেই।

গাবের মতো আঠালো বেওকুফ বেহুঁশ ঘুম একতাল মানুষের মাংস থাবড়ে চাপড়ে ঝিম পাড়িয়ে রেখেছে। আর অন্ধকারের খোলস ভেঙে বোবা রাস্তার বুকে বোল ফুটিয়ে গোরা চলেছে। শোকসংবাদ নিয়ে। বুড়ো তো আগ থাকতেই বলে রেখেছিল: কেটে ফেললেও যেতে পারব না। আমার জ্যান্ত মুখ আর জিন্দেগিতে সোনার মাকে দেখাব না।

গোরাও জবরদস্তি করেনি। সত্যিই তো সোনার মাকে ও কী দিয়ে বুঝ দেবে? আর গোরা? সেই বা কী বলবে শোকতাপ অভাবে জিন্দা মরে থাকা মানুষটাকে? হ্যাঁ যদি গোটা দেশটা ফেটে পড়ত, লাখে লাখ লড়ত মরত, ধকল সামলে ফের অস্তর হাতে ছুটত—তাহলে কথা ছিল না। তাহলে বদলার গনগনে আগুন ছুটত। আঁগ।

আশপাশ অগলবগলের দেয়াল যেন চোখ উপড়ে নেবে। এমন একটা টান। আর চোখ দুটো পুড়ে পুড়ে খাক হয়। দেয়ালের বুক ফেঁড়ে অক্ষরগুলো জাগান দেয়। একটু একটু করে চোখ ঝলসে পুড়ে ছাই হয়। লাল আর কালো রঙের পুরু অক্ষরগুলো দিনকে দিন আগুন

হয়ে উঠছে। 'অশ্রুকে শক্তিতে...প-রি-ণ-ত' আর পড়তে ভালো লাগে না। গড়গড় গড়গড় করে সব মনে পড়ে যায়। আচ্ছা এসব কি তারা জনতার উদ্দেশে লিখেছিল? নাকি জানত ভাঙা বুকের পাঁজরা জুড়তে হবে? জানত নন্টের পর আর একজন...তারপর...। অথচ গোরার বুকে কথাটা গেড়ে বসতে পারে না। এমনি একটা কথা গোরা রামায়ণেও পড়েছে। সেই যখন সুগ্রীবের সাথে রামের সাক্ষাৎ হল—সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা...বৈদেহীর পরিত্যক্ত চিহ্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—শ্রীরাম বৈদেহীর চিহ্ন দর্শনে শোকাকুল। শ্রীরামকে উজ্জীবিত করার নিমিত্ত সুগ্রীব বলল : শোককে শক্তিতে...। শুধুই উদ্দীপ্ত করার জন্য। নাহলে, সত্যি সত্যি কি আর শোক থেকে শক্তির রূপান্তরণে শোকটা উড়ে যায়। হয়তো রামায়ণ কিংবা দেয়ালের কথায়ও তা বোঝানো হয়নি। তবু, তবু গোরার শোকের কথাটাই মনে হল। দাঁত চাপা, এক দমবন্ধ শোক। এই শোক নিয়ে সে এখন কোথায় যাবে? নন্টে দপদপিয়ে চলে গেল, তারপর সোনা। গোরার বুক জুড়ে মৃত্যুর থির জ্বালা এখন যেন জীবনভর লেপ্‌টে থাকবে। নন্টে আর সোনা জবরদস্তি গোরার শরীরটা দখল করেছে। আর কেবল সামনের দিকে ঠেলছে : চলো গোরাদা, এগিয়ে চলো!

এখন ভোর রাত্তিরের ধূসর অন্ধকারের বুক চিরে গোরা সোনার মার কাছে যাচ্ছে। কী যে বলবে গিয়ে আর বলার পর সোনার মার কী হতে পারে এসব কিছুই ও ভাবতে পারছে না। ও শুধু জানে পোড়া শরীরটা কোনোমতে ছেঁচড়ে টেনে সোনার মার সামনে আছড়ে ফেলতে হবে। তারপর গোরার কিছুই করার নেই। তারপর সব শেষ। তারপর গোরা যেন নিজেই শেষ হয়ে যাবে। সোনার মা যদি হঠাৎ বিকারের ঘোরে গোরার মাথার চুল টেনে উপড়ে ফেলে আপত্তি নেই। আসলে গোরা যেন এরকম একটা কিছুই মনে প্রাণে চাইছিল। একটা প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন। ঠিক যেমন গেল বছর মেথরপট্টির গোখরোর ছোবল খাওয়া চুনো ছেলেটার হয়েছিল। বিষের ঢল নেমেছিল ছেলেটার শরীল বেয়ে। শুকনো কাঠ ঠোঁট জোড়া নীল মেরে গেছিল। ঢুলুনি আসছিল। আর ঝাঁকড়া চুলো রোজা বিড়বিড় করে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে জলবিছুটি দিয়ে চাবকাচ্ছিল চুনো ছেলেটাকে। জাগিয়ে রাখতে। ঢুলুনি তাড়াতে। বিষের ঢুলুনি। ছেলেটার শরীর দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠছিল তবু দু-চোখের পাতা জুড়ে ঢুলুনি আসছিল। আশ্চর্য ঢুলুনি!

সোনাদের জং ধরা, সর্ষের দানার মতো ফুটোফাটা টিনের চাল, ম্যাড়মেড়ে চটলাওঠা দেয়াল, আর উঠোনের ছ্যাদলা। সব মিলে একটা জিয়ন্ত ছবি ভাসছিল গোরার চোখে। আর ও গোঁত্তা খেয়ে সোনাদের পাঁচিলের গায়ে মাথাকোটা বটচারার দিকে সটান বেঁকে চলল। মন্টু, বুড়ো, বীরু সব এক এক দিকে ছিটকে গেছে। সারা বেলিয়াহাট্টায় খবরটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ভোর না হতেই খবরটা ছড়িয়ে যাবে।

'পুলিশের সহিত সংঘর্ষে সোনা নামক যুবক নিহত.......যুবকের নিকট রেডবুক.......।' আর রিভলভার। আর আপত্তিকর কাগজপত্র। আসলে যেন সব আগ থাকতেই কম্পোজ করা থাকে। শুধু যুবকের নামটা পালটায়। আর গোটা বাংলাদেশের আবাগি মা, হতভাগা, বেকার, দামাল ছেলেটার নাম খোঁজে ছাপার লাইনে। খবরের কাগজে। কাগজের খবরে। গোরা জানে

ভোরবেলার কাগজের এই নির্ভীকনিরপেক্ষনিরীহ লাইনটায় চোখ বুলিয়ে বেলেঘাটার চায়ের ঘুপচিতে সব রি রি রাগে গজরাবে—শালারা খুন করছে। খুন। আর হিউজ রোড ধরে হু হু করে বাতাসের বেগে খবরটা ছুটতে ছুটতে রবার ফ্যাক্টরির নাটা আলির থ্যাবড়া মুখে মাখামাখি হয়ে গোঁয়ার রাগের জন্ম দেবে : শুয়ার কা বাচ্ছা...হারামি লোগ সোনাকো মার ডালা...। তপসের ভেড়িভাসা দুঃখের বন্যায় লোকনাথ গার্ডেন লেন থেকে দলা পাকানো যে বুড়িকে কাঁধে করে সোনা বড় রাস্তার ওপর ক্যাম্পের তেরপলের নীচে এনে বসিয়ে জারার কামড় তাড়াতে এক ভাঁড় আদা চা মুখের কাছে ধরেছিল, সে নির্ঘাত কাতর হবে। পেটে না ধরলে কি আর ছেলে হয় না? বুড়ির পুত্রশোক জাগবে। উথলে পাথলে। এমন একটা সম্বাদ ষাট বছরের ধকলের পর তার হাঁ মুখ ফাঁক করে টিকটিকির ল্যাজের মতো আলজিভ উপড়ে আনবে : কোন্ সোনা লা... সেই যে গলাজলে দাঁইড়ে সব উদ্‌ধার কল্লো...ডাগরডোগর চোখ...সেই কালোপানা ছিপছিপে ছেলেটা। আহা হা হা। বুড়ির খটখটে ফাঁকা মাড়ি আর তোবড়া চোয়াল ভেঙে সমস্ত জীবনের দুঃখ নিয়ে তারপর দীর্ঘশ্বাস পড়বে। আর একবার। আর একবার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে নামবে।

হঠাৎ গোরাকে ভেতর থেকে মোচড় দিল সদ্য পয়দা হওয়া সেই শক্তিটা। কে যেন কানের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করছে : ডেঁটে দাঁড়াতে হবে। ডেঁটে তুমি না কমুনিস! ডরপুক কোথাকার।

কথাটা কে যেন বলত—তুমি না কমুনিস! ওহো বুড়ো বলে। আকছার বলে। আর সোনা বলত : ডরপুক। পান থেকে চুন খসলেই ও কথাটা বলত। আর এখন এইসব কথার টুকরোটাকরা মিলেমিশে একশা। এক একটা কথার মারাত্মক তাকত আছে। মানুষ ভুলতে পারে না। কিছুতেই না। যেমন গোরা পারছে না। কথাগুলোর হাত পা গজায়। দিব্যি জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে যায়। একটা মানুষ। রক্তমাংসের একটা মানুষ।

ভোর না হতে বসতে হবে। বসে বাতচিত সারতে হবে। তপসের কেলে সুকুদের বাড়িতে মিটিং। যে যার ঠিক বিপদের বড়া টপকে হাজির হবে। গোরার ওপর আবার একখানা ইশতেহার লেখার দায়িত্ব বর্তাবে। নন্টের বেলায় যেমন হয়েছিল। তালতলার নন্টে। কী যেন ছিল হেডিংটা...আহা...হ্যাঁ মনে পড়েছে—শহিদের আত্মত্যাগ বৃথা নয়। নন্টে আর সোনার ধাতে আশ্চর্য মিল। একেবারে এক ধাত। সোনাকে হাজারো ঝুঁকিতেও টালমাটাল হতে দেখেনি গোরা। ঝুঁকি নিতে ওস্তাদ। গোবরার ঘেরাও ভেঙে পালানোর সময় গোরা দেখেছে সোনার ধীরস্থির ভাব। পাঁচিল টপকেই সব যখন দুদ্দার ছুটতে ব্যস্ত, সোনা গোবদা গোবেচারার মতো হেঁটে হেঁটে খোচরের নজরের সমানে দিয়ে পাশ করল। কী যেন বলেছিল গোরা। মনে আসে না ঠিক। আসলে একটু ধমকে ছিল: বাহাদুরি না? জবাবে ছেলেটা হেসেছিল। সাদা একটা ঝলক খেলিয়ে—দু...উ...র। এখনও যেন হাসছে —দু...উ..র। এই তো, এই মাত্তর কয়েক ঘন্টা আগে। বুকে একটা পোড়ানি জাগল। দফায় দফায় বুকটা পোড়ায়। আর সাথে সাথে মিনুর কথা মনে হল। একবেণী ছড়ানো পাতলা পিঠটা যেন আবডাল থেকে ছুটে আসবে : গোরাদা! সোনাদা কোথায়?' কোথায়? আর শেষকালে 'কোথায়' শব্দটা চোখের

মণিতে টলটল করবে : গোরাদা। তপসের বাসগুমটির কাছে এ বি শেয়ালদা থেকে এসে চলতির ওপর নামবে। চোখের কোনে চরকি নাচিয়ে গোটা চত্বরটা মেপে নেবে। ঝট করে। তখন ওর চোখে হাই পাওয়ারের চশমাটা থাকবে না। চশমাটা মার্কামারা। রাস্তাঘাটে পরে না। সুকুদের নড়বড়ে চৌকিটায় মচর্ মচর্ শব্দ তুলে বসতে গিয়ে চশমাটা চোখে লাগাবে। এ বি-র কথা মনে হতেই কোত্থেকে সোনার ডাগর চোখদুটো ছুটে এল। টাইম-মতো যদি কাল এ বি আসত...। গোরা এ বি-র ওপর খাপ্পা হয়ে উঠল। অথচ ও যে এমন অহেতুক রাগের অসারতা বুঝতে পারছে না এমন নয়। সব বুঝেও কেমন একটা জ্বালা চিড়বিড় চিড়বিড় করে, হাতের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করে।

মালিপাড়ার নিমগাছের মরা হাজা ডালটা ছুঁয়ে, গোরা ভঙ্গসের পেটের মতো প্রকাণ্ড মেঘটা দেখতে পেল। আর ঝড় উঠল। দেখতে দেখতে দুনিয়ার তাবৎ ধুলো উড়িয়ে ঝেঁটিয়ে, পাঁচুকুমোরের জং ধরা টিন কাঁপিয়ে আকাশ কালো করে। ঝড় উঠল। ঝড় উঠল গোরার দুবলা পাতলা বুকে বদলার হাঁড় কাঁপা বাসনায়। 'বদলা' শব্দটা যেন গোরার মাথার ভেতর টগবগিয়ে ফুটতে লাগল। বেলিয়াহাট্টার গাঢ় আন্ধার ফেনিয়ে ঝড়ের সাইরেনের মতো শব্দ সারাটা তল্লাট জুড়ে গরর গরর করছে। আর চোখের ডিমে রাশ রাশ ধুলোর চোখা আক্রমণ হাতের থাবায় কাটাতে কাটাতে গোরার এ বি-র কথা মনে পড়তে লাগল। থেকে থেকেই। আর হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল। গরম ভাপের মতো শ্বাস পড়ছে এখন। এ বি-র হাই পাওয়ারের চশমার কাচের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো জাগছে। গোরা জানে কাল সকালে এ বি কী বলবে। নাকের ডগে বিনবিনে ঘাম জমবে। ঢোক গিলতে পারবে না অনেকক্ষণ। তারপর দাঁত চাপা বদলার সাধ চোখ দুটো আরো খানিক ঠেলে বের করে দেবে, বাঁ গালের পাশ দিয়ে তেতে পুড়ে তামাটে ছোপধরা জায়গাটা কাঁপবে : কমরেড, হত্যার বদলা চাই—অ্যাকশন। ব্যাখ্যা করবে। থেকে থেকে একটা আঙুল খোঁচা মারার ঢঙে নাড়বে। আর অ্যাকশনের কথাটা আচমকা মনে হতেই গোরার চোখের সামনে রথের চাকা তুলতে গলদঘর্ম কর্ণের অসীম সাহসী মুখটা ভাসতে থাকে। আর রক্ষাকবচ।

এ যেন কর্ণের রক্ষাকবচ। অ্যাকশন। সোনা থাকলে কী বলত। নির্ঘাত ক্ষেপে যেত। মুখে কথা ফুটত না প্রথমটায়। তারপর সুস্থির হত ধীরে ধীরে : সারা তল্লাটের মানুষ এককাট্টা হলে...। আর এ বি মুচকি মুচকি হাসত : তোদের ভোট পার্টি করা উচিত ছিল।

গোরা আর ভাবতে পারে না। গোরার আর কিছুই মনে হয়নি। নিমগাছের মাথায় আটকে থাকা ভারী মেঘটার দিকে চেয়ে গোরা আর কিছুই ভাবতে পারল না।

গাঢ় রাত্তির কেটে সাফ হচ্ছিল। ফর্সা হচ্ছিল একটু একটু করে। পাঁজরা ঠেলে সেই বেগটা আবার জাগছে। উথলে উথলে। গোরা টেনে চলতে লাগল। পুতলিকলের ভেঁপু বাজার আগেই এই শোক সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। তারপর? তারপর যেন ও সত্যি সত্যিই খালাস পাবে। আপসে গোরার ঠোঁটের খাঁজে আফোট হাসির ছোট্ট একটা ঢেউ জাগল। আর গোরা পাগলের মতো বিড়বিড় করল : খালাস!

কাছেপিঠে নারাণদা থাকলে গোরা ভরসা পেত। যুঝতে জানে বটে মানুষটা। দশাসই

মানুষটাকে দেখলেই বুকে কেমন একটা বল আসত। বিশ্বাস হত। ওই একটা মানুষই তো এখানে রক্তবীজের ঝাড়ের জন্ম দিল। গোরাই বলো, আর মন্টু সোনা যার নামই করো না কেন ওই মানুষটার হাতেই তালিম পেয়েছে সব। একেবারে শুরুর দিককার বলে গোরা আর বুড়ো সাথে সাথে থেকেছে। ছায়ার মতো। মানুষটার ছায়া। বিরিক্ষের ছায়া। আরো কত কী মনে আসে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়তে জানে নারাণদা। এখন তো বিহারের কোনো রুক্ষু হাড্‌ডিসার গাঁয়ে আগুন বানাচ্ছে। মাটি কামড়ে, দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে। আর তিন তিনটে বালবাচ্চা নিয়ে পেটে দড়া বেঁধে মিনতি বউদি আর এক কিসিমের লড়াই চালাচ্ছে। মিনতি বউদির কানের লতিতে কাঁটা গজায় বিহারের মতিহারি থানার জঙ্গের খবর শোনার উৎকণ্ঠায়, আশায় : হ্যাঁ গো ঠাকুরপো, কুশীতে নাকি বন্যা হয়েছে এবার। মিনতি বউদির চোখের পাতায় স্নিগ্ধ ছায়া। আর খানিক গম্ভীর থেকে গোরা মুখ খোলে—হ্যাঁ বন্যা আসছে...উদ্দাম বন্যা...। একবার নারাণদা থাকতে গোরা বড্ড অবাক হয়েছিল। সেদিন মাকে কাটাকাটা কথা বলে গোরা চলে এসেছিল।

সেদিনই বাবা রিটায়ার করে। এ জি বেঙ্গলের হিসেবের গোবদা খাতায় জীবনের চল্লিশটা বছর মাছির মতো অক্ষরে সেঁটে দিয়ে মানুষটা হাত কচলাচ্ছিল। কোলের ছেলেটার ঘাড়ের বাঁ দিকের রগ ফুলে উঠেছে। গ্ল্যান্ড টি বি। এক গণ্ডার মুখে দানা দেওয়ার রাস্তা বন্ধ হল বিলকুল। ইউনিভার্সিটির ছাপের টাটকা দগদগে দাগটা গোরার পাছায় তখনও লেগে আছে। ঠিক যেমন শুয়োরপট্টি থেকে জবাই করা শুয়োরের উরুর ওপর একটা ট্যাড়া চিহ্ন এঁকে দেয়। হঠাৎ যে কী নিয়ে লাগল গোরার মনে আসে না। খিটিমিটি চলছিলই : আর কেউ তো পার্টি করে না, পার্টি করলে নাকি চাকরি করা যায় না। এসব সুর সেদিন ভোল পালটে ফেলল হঠাৎ : তবে পার্টিই কর, আমার ঘাড়ে বসে খাস লজ্জা হয় না, এটা কোন আদর্শ। বড় যে শোষণের কথা মুখ নেড়ে বলিস—এটা শোষণ নয়? কথা বাড়ায়নি আর। চলে এসেছিল। কানের ভেতর, মগজের ভেতর একটা কথার তাকত ছিল শুধু। নারাণদার কথা: একটা পেট আবার সমস্যা? পাগলা কোথাকার!

বাড়িতে আর খাবে না। নারাণদার বাড়িতেই রাতে খাবে। ঘর থেকে বেরোনোর সময় মিনতি বউদি দফায় দফায় বলেছিল : মেজোটার যে আর ওষুধ না হলে চলছে না। এক নাগাড়ে ছ-দিন চলছে। কমতির দেখা নেই। গা দিয়ে আগুন ছুটছে, ভুল বকছে, ওষুধ না পড়লে...।

দিনভর গোরা নারাণদার সাথে ছিল। ফেরার সময়ে মতিঝিল বস্তির পেছনে ইউনাইটেড মিলের হাসান ভাইয়ার সাথে মোলাকাত। ব্যাস ব্রিজের সিঁড়িতেই বসে গেল। হাসান ভাইয়া একটু খৈনি ডলে ফুঁক মেরে নারাণদার হাতে দিল। ঠোঁট ফাঁক করে মাড়ির গোড়ায় ঠেসে, পিক কেটে থুতু ফেলল নারাণদা : আসলমে মালিক লোগ ভেরুয়া হ্যায়। আর হাসান ভাইয়ার মজবুত হাতে আদুরি থাপ্পর নেমে এল নারাণদার পিঠে। জুটমিলের সেই তাগড়া জোয়ান মজুর আর পাগলা মানুষটা দিলখোলা হাসিতে মেদিনী কাঁপিয়ে দিল। যেন পৃথিবীটা দু-হাতে সাপটে হাসছিল।

নারাণদা এমনিতেই বকে কম। নেহাত মুড না থাকলে কথা বলে না। কেবল যখন নাড়া খায় তখন বোল ফোটে। বুকের ভেতর খঞ্জনা পাখি গেয়ে ওঠে। একটা মানুষের বুকে যে এত আশাভরসা থাকতে পারে, নারাণদাকে না দেখলে বোঝার জো নেই। মজবুত বিশ্বাস। বড় ছেলেটা গোরার সামনে চোখ উল্টেছে। এবং বিনেচিকিচ্ছেয়। সেদিন বুকের একটা টনটনে ব্যথা নিয়ে গোরা, মন্টু, বুড়ো কেউ মানুষটার কাছ ঘেঁষতে পারেনি। একটা নরম ভেজা কথা বলার আস্পর্দ্ধা হয়নি ওদের। আর সেই মানুষ যখন হাসানজির সাথে থাকে একেবারে ভেন্ন। গোরার মাঝে মাঝে জ্বালা হত। কেমন একটা বিটকেল জ্বালা : তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

: কে বলল!

: নাহ্। এমনি।

: তবে শোন, আমার মা বলত—মরে নারী ওড়ে ছাই, তয় নারীর কলঙ্ক নাই।

হাসান ভাইয়ার ওপরের পাটির সামনের দাঁতে সোনার ফুটকির মতো কী একটা চিকচিক করে ওঠে। আর সেদিকে তাকিয়ে বুকের খাঁচার ভেতর হাসির রেশ পুষে, ছ-বছর লাগাতার প্রেমের পরে যে মেয়েটাকে বাদলার দিনে ঘরে তুলেছিল, পাশের ঘরের বউদির কথামতো যার মাথায় সিঁদুর ঘষে দিয়েছিল—নারাণদার তার উপোসি পেটটার কথা মনে থাকে না, রুগ্ণ ছেলেটার কথা মনে থাকে না। আর এই মনে না থাকার যাতনা যে কী গভীর তা গোরা হাড়ে হাড়ে জানে। কঠিন মানুষ। সে আর এক জাতের লড়াই। অঘোষিত যুদ্ধ। নারাণদার মুখেই শুনেছে : সাউথ বেলেঘাটা তখন পার্টির সবচেয়ে দুবলা জায়গা। পার্টির ভাগবাঁটরাও হয়নি, সিঙ্গেল পার্টি। জ্যোতিবাবু সবে ব্যারিস্টারি পাশ দিয়ে বিলেত থেকে ফিরেছে। ভোলাদা সেই জামানার লোক। বলতে গেলে হাতে করে গড়েছিল আমাদের। চালচুলো নেই, কোত্থেকে যে ভাসতে ভাসতে এসেছিল কে জানে। মুখে রক্ত তুলে রবার ফ্যাক্টরিগুলোয় খুঁটি গাড়ল ফাস্‌ট, শুখা দিয়ে ধকলে ধকলে সারাটা বুক ঝাঁঝরা করে যক্ষ্মা হল শেষে। কৌটো ঝাঁকিয়ে, লাল সালু বিছিয়ে গান গেয়েও বাঁচানো যায়নি। দধীচির দেশ, বুঝলি গোরা এমন যে কত আছে! কত্‌তো!

আজকের লড়াইটা ভেন্ন। রকতারক্‌তি। ননটে আর সোনা চোখের সামনে মাটিতে হাত পা বিছিয়ে দিল। হাতের থাবায় জান নিয়ে আগুনে ঝাঁপ। কোনটা যে বড় গোরা বুঝে উঠতে পারে না। গ্যাসপোস্টের তলায় বৃত্তের মতো তাজা উষ্ণ রক্ত দেখার পর থেকে গোরা আর সামাল দিতে পারছে না। বুড়ো তক্ষুনি পেটোচার্জ করে কুরুক্ষেত্তর বানাতে চাইছিল। হয়তো যুদ্ধটা হত না ঠিকই। আর হলেও তা হত একটা কাঁচা ঘায়ের জ্বালা ওগরানো। তবু তো উগরে দিয়ে বুকটা হাল্কা হত।

এখন থেকে থেকেই রেল লাইনের বগল ঘেষা বিছুটির ঝোঁপ চোখের মণিতে জাগান দেয়। কেন যে মন্টুর ডানা টেনে ছিপিয়ে পড়তে গেল। যাওয়ার কথা গোরারই। সেই তো ওদের রাস্তা বাতলেছিল। গোরার থেকে সোনা কমসে কম পাঁচ বছরের ছোট। আর গোরাদার ওপর কী যে বিশ্বাস ছিল ছেলেটার। গোরাও তো হাত ধরে ধরে ওকে কম শেখায়নি। গোটা সমাজটার খোল ভেঙে অন্ধিসন্ধি চিনিয়েছিল : এই দ্যাখ, দ্যাখ...মুখে রক্ত তুলে মানুষ

বাঁচে...কেন...কেন? আর সোনা নামের ডাগর ছেলেটার চোখে আরো জানার রাক্ষুসে খিদে জাগে। তাতায়। ছেলেটা পাগলের মতো হাত লাগাল। পোস্টার লিখতে শিখল। শুরুর দিকে ভালো টান জাগত না। লেবড়ে থেবড়ে যেত। ধীরে ধীরে একটানে লিখতে শিখল। মন্টুই ধৈর্য ধরে শিখিয়েছে। ধরে ধরে। মামুলি কাজের কথার পোস্টার সোনা খুব কমই লিখেছে। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে ও মানুষের মন ধরে হ্যাঁচকা টান দিতে চাইত। কথাগুলো বিঁধিয়ে দিতে চাইত। পোস্টার তো নয়, কবিতা। পোস্টার লিখতে বসলেই ও কবিতা করে ফেলত। এমন সব কথা লিখত বিলকুল কবিতা হয়ে যেত। চেনার জো থাকত না। আর পোস্টার দিয়ে ছেলেটা যে দুরন্ত অভিযান শুরু করেছিল কপালের রগের ছোট্ট একটা ছ্যাঁদায় তার বিশ্রাম। অনন্ত বিশ্রাম।

পুতলিকল বাঁ হাতি ফেলে, কাঁচা নর্দমার শান ডিঙিয়ে তেইশ নম্বর বস্তির (এখানে এই এক ব্যাপার। বস্তির ক্ষ্যামাঘেন্না নেই। দুখানা মাত্তর খোপ চিটে বেড়া, টিনের চাল; আবার মাঝে এক চিলতে উঠোন নিয়ে বারো-তেরোখানা খোপওয়ালা ঘেরা ঘিঞ্জি বস্তি। ফলে আর কল্পনায় কুলোয়নি। তখন নম্বর চালু হয়েছে) পাখির ঠোঁটের মতো হাঁ মুখটা পেতেই জলোবাতাস সাঁ সাঁ করে ডেকে উঠল। মালিপাড়ার পোড়াকপালের ওপর চক্কর খাওয়া মেঘটা ঝড় হয়ে এদিকটায় এখনও আছড়ে পড়েনি। কিন্তু আশ্চর্য একটা গুমোটভাব পুতলিকলের আশপাশ ঘিরেছে। এক পা, এক পা করে গুটি গুটি। আর ভঁইসের মতো মেঘটার এতক্ষণে শিং গজিয়েছে। এখন আর মতো টতো নয়। বিলকুল একটা ভঁইস। সিং বেঁকিয়ে আকাশের সিনা তাক করে ছুটছে। ফেঁড়ে ফেলবে বলে। আকাশের সিনা। অ্যাদ্দিনে আকাশটারও যাওয়ার সময় হয়েছে। আর কত। কতকাল! বুকপোড়া দুঃখের বাষ্প মেঘ হয়ে জমতে জমতে আকাশটা এখন যাওয়ার দাখিল।

পুতলিকলের সাদা গুঁড়ো উড়িয়ে বাতাস ঝাপটা মারছে। পুতলিকলের আশমান ছোঁওয়া চিমনি সাপের মতো পাক দিয়ে দিয়ে ধোয়া ওগরাচ্ছে। আর সারাটা তল্লাট জুড়ে ছানি পড়ছে।

সোনাদের দরজার পাল্লাটা ধাক্কাতে ধাক্কাতে গোরা দরদরিয়ে ঘামছিল। ভোর রাত্তিরের ঠান্ডা আমেজেও গরমি যাচ্ছে না। ভেতরের আগুন। আগুনের গরমি। রাতের স্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে দরজা ধাক্কানির শব্দটা জাগতে লাগল। তর সইছে না গোরার। শরীরটায় বশ নেই। অসাড়। আর দরজা খুলতে তত দেরি হচ্ছিল। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। গ্যাসপোস্টের নজদিক থেকে গুলিটা যেন তেইশ লম্বর বস্তির আবাগি বাড়িটার বুক ফুটো করে চলে গেছে। দরজাধাক্কানি নেশার মতো ফাল দিয়ে দিয়ে চড়ছে। শেষকালে খুক খুক কাশির সাথে সাথে শ্লেষ্মার টান জড়ানো গলার সাড়া পাওয়া গেল।

: যাই...ই...ই।

খুট করে একটা শব্দ হল। দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। সোনার মার সরার মতো চ্যাপ্টামুখ পাল্লার ফাঁক দিয়ে অনিদ্রায় জ্বালা ধরা চোখ সমেত উঁকি মারল। জলের মতো নিরাকার মুখ। উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নেই। ভোর রাত্তিরে গোরাকে দেখে একটুও অবাক হল না। আশ্চর্যের কী

আছে। এসব এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। রাতবিরেতে জানলার পাল্লায় টোকা পড়ে : মা। ওমা! আর নিঃশব্দে উঠে দরজা খুলে দিতে হয়। হয়তো আঁচলটা মাটিতেই ঘষটাতে থাকে। তুলে নেওয়ার ফুরসত হয় না। রাত দুপুর নেই ওদের। ছেলেগুলোর দিন আর রাত্তির বলে ভেন্ন কিছু নেই। যখন তখন দুম করে এসে হাজির হয়। যেন মাটি ফুঁড়ে জাগে। কখনও চাট্টি মুখে দেয়, চটপট চান করে ফেলে। বইপত্তর ঘাঁটে : আমার সেই চটি বইটা গেল কোথায়? কখনও এসেই কাতর : মাসিমা যা আছে চাট্টি দিন। ওহ্ দিনভর পেটে দানা নেই।

আবার কখনও কখনও দাঁতে কুটোগাছাও কাটে না। এক দণ্ড দাঁড়ায় কি দাঁড়ায় না। ধুমকেতুর মতো একটা কথা বলেই উধাও হয়ে যায়। উধা...উ। আর দরজায় বুটের লাথ পড়তে থাকে। সঙিনের ফলা বৃত্তের মতো বাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেলে। হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্চোর খিস্তিখেউড় চলে। আর সোনার সত্তর বছরের বেধবা পিসি গলার বত্রিশ শিরা জোঁকের মতো ফোলায় : খেঁকিকুত্তার দল এয়েছে রে যমের চক্ষু নেই রে...এ গুলোর মরণ হয় না কেন রে...।

আশপাশ অগলবগল দশদিক পানে হুঁশিয়ারি ছুটত। হুঁশিয়ার বাজ পড়েছে। হুশিয়ার। শ্যেন দৃষ্টি। দামাল ছেলেরা সটকে যেত। ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে থাকত। বিপদটা যেমন হামাগুড়ি মেরে আসে, যাওয়ার সময় অত ঢাকাঢুকি থাকত না। যাওয়ার সময় উড়িষ্যার ঠাকুরের পাছায় নাল বাঁধানো বুটের লাথ পড়ত : শুয়োরের বাচ্ছা খবর দিতে পারিস না...কখন সব আসে যায়...শালা দেব একদিন দোকান ভেঙে...। তারপর ভয়েডরে আর দাঁড়াত না। জানের ভয় কার না আছে। পুলিশ বলে কি আর জান নেই। খোচর বলে কি আর ভয় নেই। সাত-তাড়াতাড়ি হামলা সেরে ধোঁয়া বমি করে ফিরে যেত। যাওয়ার পথে ধাপা থেকে চাল বেচার পার্টি জবরদস্তি তুলে নিত। আর যেদিকটার দেয়ালে লেখা জোখা কম সেই পামর বাজারের চওড়া রাস্তা ধরে ফিরত। নাহলে আকাশ থেকে হঠাৎ পুষ্পবৃষ্টির মতো দশভরির গোটাকতক মাল পড়তে পারে। আর তাহলে তো আবার মাতৃগভ্ভে ফিরে যেতে হবে।

আর বিপদটা কেটে গেলে ধীরেসুস্থে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বেরিয়ে আসত। অ্যামনধারা তাড়া খাওয়া আর বেকুফ বানিয়ে কেটে পড়ার ঘটনা নিয়ে হপ্তাভর রসিয়ে গল্প করত। তখন কেমন একটা রোমাঞ্চ ছিল। হাতের লোম খাড়া হয়ে উঠত। শিরশির শিরশির করত। দুদ্দাড় ছুট। পা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটত। একবার তাড়া খেয়ে মন্টুর পা কেটে সাদা মাংস বেরিয়ে এসেছিল। জান হাত নিয়ে ছুটছিল সব। পেছনে ঝাঁক ঝাঁক গুলি সাঁ সাঁ করে ছুটছে। গোয়ালাপাড়ার বুড়োর ঘরে হুস করে ঢুকে গেল সব। বুড়োর বউ বেগনি খোলের শাড়িটার পার ছিঁড়ে আঁট করে বেঁধে দিল। শাড়িটা বুড়োর বউর বড্ডো আদরের আর আস্তো। খানিক বাদেই রক্ত পড়া বন্ধ হল। বুড়োর ঘরের খাবলা ওঠা মেঝের গর্তের ভেতর বসে রসিয়ে গপ্পো শুরু হল। আর স্বপ্ন। স্বপন। মন্টু একমুখ ধোঁয়া নিয়ে গোল্লা পাকাতে পাকাতে আবৃত্তি করছিল : বিপ্ লব্ সফল হওয়ার পর ময়দানে এক বি...শা...আল সমাবেশ হবে। গোটা দেশ উজাড় করে মানুষ আসবে। মানুষের দঙ্গল। জাঙ্গাল। আর রক্তের ফোঁটার মতো পতাকা অহংকারে গর্বে আনন্দে পত্ পত্ করে উড়বে। উফ সেদিন! আর সোনা গান গেয়ে

উঠেছিল। যখন তখন যে গান ওর ঠোঁটে মৌমাছির মতো গুন গুন করে ওঠে : *মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি।*

ক্রমে সেই রস জারিয়ে, হাভাতে মানুষের হাড়্ডি থেকে জ্বালা নিংড়ে এখন একটু থির হতে পারছে না। এখন তারকাঁটা দিয়ে এক একটা পাড়ার গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ফাঁস লটকে দেয়। এখন গ্যাসপোস্টের তলায় জোয়ান রক্তের উষ্ণবান। এখন শোক। রাগ। আর জ্বালা।

সোনার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে গোরা অসাড়ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দরজার এক পাল্লার ফাঁক দিয়ে সোনার মার রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখের একটা পাশ জেগে আছে। গোরার মুখে কথা ফোটে না। এমন একটা ঝোড়ো রাতের শেষে সময় যেন আর কাটতে চায় না। সোনার পিসির বাত ধরেছে। রস জাগছে। নড়তে চড়তে পারে না। তবু মানুষের হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করে। মানুষ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার অসহ্য টিপ্ টিপ্ শব্দটা এখন গোরার কানে বাজছে। সোনার মা গোরার দিকে অবাক তাকিয়ে হাসল। হাসির সাথে এক ফোঁটা বিস্ময় : কী ব্যাপার রে? এমন সময় এলি যে? সে হারামজাদা কোথায়?

সোনার মার মুখটা এখন সাফ দেখা যাচ্ছে। সারামুখে একছিটে মাংস নেই। চোয়াল ভেঙে গর্ত জাগছে। খানা, খন্দ, ডোবার মতো। পুতলিকলের পিচ রাস্তার মতো। অথচ এককালে মুখখানা টইটম্বুর ছিল। আর এখন চোখের কোল জুড়ে চন্দন বাটার মতো ছিটছিট দাগ। বয়েসের ছোপ। অভাবের চিহ্ন্। সোনার মা গোরার বোবা মুখখানার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়ছিল। মনের আনাচকানাচে নানা সন্দেহ ফণা তোলে। ফোঁস করে ওঠে। দরজার আর একটা পাল্লা হ্যাঁচকা টানে খুলতে খুলতে সোনার মা শুখা ঢোঁক গিলল : কাল একবার এয়েছিল, বললুম চাট্টি মুখে দিয়ে যা...অ্যাদ্দিন বাদে এলি চাট্টি মুখে না দিলে মনটা বশ থাকে না। আমার কথা তো ঢের শুনেছিস...এত্তো বড় একটা থালা পেতেছিলুম ছেলের নামে, তা সব আশা তো মিটিয়েছিস এখন চাট্টি গিলে উদ্ধার কর (দম ধরল খানিক)। সংসারের হাল তো তুই সবই জানিস। কী আর লুকোব, ঘরে দানা বলতে ছিল না...শিবুর দোকান থেকে চাট্টি চাল আর আলু আনলাম ধারে। ভাবলুম দুটো ফুটিয়ে দি, আনেবানে থাকে, খায় না খায় দেখছে কে। আর দিনদিন যা চেহারা একখানা হচ্ছে। মাথায় এক ফোঁটা তেল অব্দি পড়ে না। যাকগে তা ভাত গেরাস যদি মুখে তুলতে পারে কোত্থেকে একটা ছেলে এসে কী ফুসফুস করল। ব্যাস। রইল পড়ে ভাতের থালা যেমনকার তেমন, পাঁচিল টপকে চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সেই থেকে বুকে ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে। রাতে একটুকরো রুটি কাটতে পারিনি দাঁতে। বলিস দিকি একটু বুঝিয়ে। আমার কথা তো আর কানে নেয় না। এমন কল্লে বাঁচবে ক-দিন। নাই যদি বাঁচল তবে কী ছাই লড়বে।

দড়িদড়া বেঁধে কে যেন গোরার জিভ টানটান করে বেঁধে রেখেছে। আর বুকের ভেতর একগাদা কথা ছাড়া পাওয়ার জন্যে হাত পা ছুঁড়ছে। বুকের ভেতর কথাগুলো টগবগিয়ে ফুটছে। আর সোনার মা কী যেন আঁচ করে ক্রমশ সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা আবাগি মার হৃদয় ফালা ফালা করে : কী হয়েছে গোরা? তুই এমন করছিস কেন? এই গোরা? সোনা কোথায়? কথা বল গোরা? কথা বলছিস না কেন। এই গোরা...

আর বুকের ভেতর পয়দা হওয়া সেই আশ্চর্য তাকতটা হঠাৎ গোরার পাঁজরার হাঁড় গুঁড়িয়ে কী যেন উগরে দিল : সোনা... নেই...

পুবাকাশ কালো করে ভঁইসের মতো যে মেঘটা শিং নাড়ছিল, এতক্ষণে তা সোনাদের পচনধরা দরজার পাল্লায় বড়ো বড়ো ফোঁটার আকারে আছড়ে পড়ল। ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দে পাল্লাটা আছড়াতে লাগল। ঘষটে, ঘষটে। বেহুঁশভাবে গোরার ঠোঁট নড়ছিল। আর সোনার মার পলক। শরীরটা যেন বাতাসের এক ঝাপটায় শ্যাওলাধরা উঠোনে আছড়ে পড়ল। আর বুকফাটা আর্তনাদ। গোঙাতে লাগল। সোনাকে গভ্ভে ধারণ করে দশমাস জীবনের রস দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলে, জন্ম দিতে গিয়ে সোনার মা যে ঠোঁটচাপা যন্ত্রণায় বেঁকে দুমড়ে গেছিল, ঘাড়ের শিরা ধনুকের ছিলার মতো অসহ্য যাতনায় টানটান হয়েছিল, মুখের কষ বেয়ে গাঁজলা উঠেছিল—আবার যেন সেই যন্ত্রণা শতগুণ হয়ে ফিরে আসছে।

এক গেরাস ভাত তোলেনি রে...

তারপর সারা তেইশ নম্বর বস্তির বুক ফেঁড়ে, ফাল দিয়ে উঠল কান্নার একটা রোল। কারা যেন কলজে ডলে তীক্ষ্ণ স্নেহে সোনার নাম ধরে ডাকতে লাগল। আর বৃষ্টি নামল। শুরুতে ঝিরঝির করে। তারপর ডাগর ফোঁটায়। গোটা দক্ষিণ বেলেঘাটার মাথার ওপরের ধোঁয়ার জাল ফাঁসিয়ে। বৃষ্টি নামল সারা বেলেঘাটা ঢেকে। ছুরির ফলার মতো।

কাঁচা ঘুম ভেঙে ধড়ফড়িয়ে গোটা তেইশ নম্বর বস্তিটা এক লুলা আতঙ্ক নিয়ে সোনাদের উঠোনে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। থেকে থেকে শোক দুঃখ রাগে তাদের শরীরগুলো কাঁপছিল। কার চিবুক যেন দীর্ঘশ্বাসের সাথে বুকের ওপর নেমে এল। হাড়-জাগা বুক। গোরার বোধাবোধ নেই। রাক্ষুসে শূন্যতা নিয়ে চোখ দুটো মানুষের দঙ্গলের মধ্যে কী যেন খোঁজে।

ঝাপটা ঝাপটা বৃষ্টির মধ্যে পুতলিকলের মর্নিং সিফটের ভেঁপু বাজল। কানের পর্দা ফাটা ভেঁপু। ভেঁপুর ডাকে আচমকা গোরার হুঁশ ফিরল। আর বেলিয়াহাট্টা বন্ধ। মাথাটা হালকা হচ্ছিল, একটু একটু করে। এতগুলো মানুষের শোক দুঃখ রাগ জ্বালার ওম খেয়ে খেয়ে গোরা এখন কাঠ কাঠ। হাত কামড়ানোর সময় নয় এখন। এখন কত কাজ। ঢাউস কাজ।

জানান না দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে গেল। সোনার মার বিলাপে আর ভাষা নেই। কথা গলে গলে এখন শুধু গোঙানি। বুক ডলে পিষে এখন শুধু গোঙানির অস্পষ্ট শব্দটা জাগান দেয়। গোরা পিচের রাস্তায় নামার আগে সোনার পিসিকে রোয়াকে বসে থাকতে দেখল। বুড়ি একফোঁটা জল ফেলেনি। গলার বত্রিশ শিরা ফুলিয়ে হুঁশিয়ারি দেয়নি। আর কাকে হুঁশিয়ারি দেবে! নির্জীবভাবে রোয়াকে দলা পাকিয়ে পড়েছিল। যাওয়ার মুখে গোরার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল : কোথায় রেখে এলিরে...তাকে কোথায় রেখে এলি রে...

পিসির গলায় আগেকার ঝাঁজ নেই। একটু থিতিয়েছে। এখন ধীরস্থির। গোরা আবছা অন্ধকারে পিসির ভ্যাপসা চোখ দুটোর কোনে আগুনের ফুলকি কাটতে দেখল। দপ্ দপ্ করে। দেখতে দেখতেই হাঁটা ধরল। আর কথার ধার দিয়ে গেল না। ওর এখন কথা ভালো লাগছে না। কীসের আবার কথা! কথা ধুয়ে ধুয়ে কি আর জল খাবে। এখন কথা মানে কাজ। বেঁচে থাকার অর্থই কাজ। আর কাজের অর্থ তোলপাড়। উথাল-পাথাল। বেলিয়াহাট্টা বন্ধ।

পুতলিকল পেছনে ফেলে হিউজ রোডের চওড়া পিচঢালা রাস্তা। বাঁয়া তরফ মেথরপট্টি। নাবাল জমি। দুপাশে ডোমপাড়া শুয়োরপট্টি আর মজুরবস্তি সার সার চলে গেছে। তপসের গেটের পর নিরালা। ঝক্কি কম ছিল ওদিকটায়। বেঙ্গল পুলিশের এলাকা। আগে আগে বানতলা হাট, ভেড়ি আর আল ভেঙে, জংলা বনবাদাড় পেরিয়ে, কাদামাটি লেবড়ে রামজি কিসকুর ডেরায় গিয়ে উঠত। উঁচু টিলার মতো জমিন। ছনের চাল আর তালপাতার ঝুপড়ি। সোনা তো পয়লাদফা গিয়েই আহ্লাদে আটখানা। রামজির সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল। তিনটে মানুষের বাস। বুড়িমা, বউ আর রামজি। বাপ-ঠাকুরদা কোনোকালে হয়তো সাঁওতাল পরগনায় ছিল। তারপর ভাঁটার টানে ছিটকে চলে এসেছে। সেও মান্ধাতার আমলের কথা। তখন বিরিজও হয়নি, ইংরেজও যায়নি। তখন এখানে বাঁশবন ছিল। দিনদুপুরে চিতেবাঘ ডাকত। কব্জি খিঁচে হেঁসোর টানে জলজঙ্গল আর গোখরো সাপ নিকেশ করে জমিন বানাল। রামজির আম্মা বলে : কপালের লিখন! জমিনে দখল বর্তায়নি। সরকারি কাগজের লিখন কে খণ্ডাবে। চ্যাপ্টা গড়ন মুখ, থ্যাবড়া গোঁয়ার নাক, আর পুরু ঠোঁট আচমকা মনে পড়ে যায়। আচমকা গোরার বর্শার ফলার মতো বাঁশপাতা আর বৃষ্টির কথা মনে হয়। টিপ টিপ বৃষ্টি। বাবলা গাছের কাঁটায় মেঘ গেঁথে ছিল। আর চুঁইয়ে চুঁইয়ে বৃষ্টি রামজির ডেরার গায়ে নরম কাদামাটি খুঁড়ে মাদি শুয়োরটা গর্তের ভেতর শরীর ঢুকিয়ে বসেছিল। ছেলেটার শরীর গোরার কাঁধের ওপর। হাঁক দিতেই রামজি এসে হাজির। খানিক ধমকাল : শেলটার পেলেনি তো আগে আনতে কী হচ্ছিল? ছেলেটার সারা মুখ ঝলসে গেছিল। বাঁচার আশা ছিল না। তার ওপর পুলিশের হুজ্জোত। সে যাত্রা কোনোমতে ছেলেটা বাঁচে। হাঁটুর মালাইচাকি সরে যাওয়ায় একটু টেনে চলত এই যা। ছেলেটাকে শেলটার দিতে গিয়েই রামজি ফেঁসে গেল। একটা কথা ফাঁস করেনি তবু। শেষে জেলে চালান দিয়েছে। গোরা ওর ডেরায় হর মাহিনায় যা পারে দশ পনেরো টাকা পৌঁছে দেয়। এই আর একটা মানুষ 'পাক্কা রঙ্কা আদমি'—নাটা আলি বলে। আট চল্লিশে গর্জেছিল। আর এই সত্তরে। মাঝখানে শীতকাঁটা গজিয়েছিল। কালিকাপুর ছাড়িয়ে আরো ভেতরে গোরা ডামুকদিহার চাচাকে দেখেছে। কাকদ্বীপে অহল্যার পাষাণে প্রাণ জেগেছিল যখন, চাচার বাঁ চোখটা তখন পিত্তির মতো গলে গেছিল। আর তবু এটা গান্ধীর দেশ! গোরার মনে পড়ে একেবারে নাদান থাকতে আকুল হয়ে কতবার ও 'দেশ' শব্দটার মানে খুঁজেছিল। 'ভারতবর্ষের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত', ভূগোলের মাস্টারমশাইয়ের নস্যি ঠাসা মোটা থ্যাবড়া নাকটা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে। মন্টু তো ইস্কুল কলেজের শিক্ষার ঠাট বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারে না। গোরার এখন কত কথা মনে পড়ে। সোনার কথা, রামজি কিসকুর কথা। রামজি আর সোনা দুজনেই জন্মেছে এই দেশে যার উত্তরে সুউচ্চ হিমালয়। যদিও রামজি এখন দমদম সেন্ট্রাল জেলের সাড়ে তিন হাত সেলে দিন গুজরান করছে। আর সোনা বুকের রক্ত ঢেলেছে দক্ষিণ বেলেঘাটার কাঁচা নর্দমার ঘেরাওর ভেতর। যেখানে সে জন্মেছিল।

এখন বেলেঘাটা লোকাল কমিটির সাথে তপসে বানতলা হয়ে মগরাহাট অব্দি গাঁয়ের চেন পুলিশের নখের ডগায়। এখন আর তাই ওসব বেঙ্গল পুলিশফুলিশ নেই। এখন ওখানেও কলকাতার পুলিশ ঢোকে। কাঁটাতোলা বুট নরম মাটির বুকে দেবে বসে।

মালোপাড়ার কাদায় কাদায় লদলদে ঢালু রাস্তাটার মুখেই মান্ধাতার আমলের অশ্বত্থ গাছটার ঝুরি নেমেছে। অশ্বত্থ তলায় কাঁচাখেকো দেবতা মা শেতলার থান। শেতলার থানের পাশ দিয়ে প্যাচপ্যাচে কাদা মাড়িয়ে গোরা সুকুদের ঝুপড়িতে ঢুকল। পেছনে ভেড়ির পর ভেড়ি। ফন্টের আমলে কত দাঙ্গা হল। বড়লোকে গরিবে, গরিবে গরিবে। গোরা এক পলক দিগন্ত ছোঁওয়া টলটল পানি দেখল। ভোরের আলো পানির বুকে ঠিকরে পড়েছে। আর বাস রাস্তার ধারে চীনেপট্টি থেকে দু-তিনজন চামড়ার ব্যবসায়ী চীনা ডিমের কুসুমের মতো সূর্যটাকে জাগতে দেখছে। ওরা রোজ এসে সূর্য ওঠা দেখে। স্বাস্থ্যের জন্য বোধ হয়। গোরা নজরই করল না। ভেড়ির জলে লাল আভা ফেলে সূর্যটা উঠছে। আলো ফুটছে। ঝিন ঝিন করে। ধীরে ধীরে ডোবা আর ভেড়ি, আর মাঝে মধ্যে আলের বুক চিরে জাগা নারকেলগাছের মোলায়েম গোড়া স্পষ্ট মালুম হল। ভেড়ির কোল ঘেঁষে নাবাল জমির বুকে সুকুদের ঘর। ঘর না ঘুপচি। বর্ষায় দ্বীপের মতো ভাসে। দাওয়ায় রাশ রাশ ইঁট দিয়ে তার ওপর তক্তপোশখানা চাপিয়েছে। উঠোনে পা দিতেই গোরার নজরে এল ছ-সাত জোড়া হাওয়াই চপ্পল। মন্টুর ধ্যাড়ধেড়ে সাইকেলটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনকি বেখেয়ালে বাইরে স্কোয়াডও রাখেনি। ঘিরে ফেললে আর উপায় নেই। টেরও পাবে না।

গোরার পায়ের শব্দে মন্টু সাঁড়াশির মতো হাঁটু দুটোর চিপুনি থেকে মাথাটা টেনে তুলল। একঝলক দেখেই ফের হাঁটুতে গুঁজে দিল। এ বি বিড়ির আগুন উস্‌কে নিতে চোয়াল ভেঙে টানছিল। ছোট তক্তপোশখানা জুড়ে সব গুটলি পাকিয়ে বসে আছে। বেশ বোঝা যায় এর আগে খানিক কথাবার্তা হয়েছে। গত রাত্তিরের ঘটনা রিপোর্ট করেছে মন্টু কিংবা বীরু। এখন তার রেশ চলছে। হয়তো বলতে গিয়ে ওদের চোখের সামনে আবার সব দিব্য-জলজ্যান্ত হয়ে ওঠায় এখন কথা সরছে না মুখে। আর এ বি হয়তো খুঁটিনাটি সব শুনে টাইমের খেলাপ করার জন্য মনে মনে জ্বলছে। গোরা পা তুলে বসল। আর বসতে গিয়েই নজর করল বাঁদিকে কোনা ভাঙা জায়গাটা ফাঁকা। সোনা ওখানটায় বসত। দেয়ালে পিঠ দিয়ে। একটু গা ছেড়ে। মিটিং টিটিং নিয়ে ও মাথা ঘামাত না খুব একটা। চোখ দুটো ভাসিয়ে দেওয়ালে গা ছেড়ে দিত।

কারো মুখে রা নেই। বিড়ির আগুনটা উজ্জ্বল লাল একটা বিন্দুর মতো ফুটে উঠল। এ বি-র নাকের ডগে লাল আভা জাগল। আর টিকোলো নাকটা আশ্চর্য রুক্ষ ধারাল মনে হল। চশমার পাতলা কাচের ভেতর থেকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো ঠিকরে আসছে। যেন ফট করে একটা শব্দ হবে আর চোখের ডিম ফেটে রক্ত ফিন্‌কি দেবে : ওসব ধর্মঘটফট করে কিস্‌সু হবে না।

ছোট্ট ঘুপচির দাওয়া। দাওয়ার চালা। ধোঁয়া নিয়ে হাঁসফাঁস করছিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছয়লাপ। এ বি ঝুঁকে পড়ে মেঝেতে ঘষে ঘষে বিড়িটা নিভিয়ে ফেলল। কালো একটা দাগ ফুটল। হিজিবিজি। সারা শরীরের জ্বলন নিয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় মন্টু (মন্টুর গলায় দরদের গান ভালো ফোটে। এমনভাবে গলাটা যে হঠাৎ কী করে ফেঁসে গেল?) জিজ্ঞেস করল : কী...কী...কী...করতে চাও?

প্রশ্নটা ঝুলিয়ে দিয়ে মন্টু সটান চেয়ে আছে এ বি-র দিকে। খানিক চুপচাপ। এ বি ফের একটা বিড়ি ধরাল। মিটিঙে বসলেই এ বি ঘনঘন বিড়ি খায়। আজ যেন মাত্রাটা ফাল দিয়ে চড়ছে। পার্টির ওপরতলার নেতৃত্বের সাথে এ বি-র সরাসরি যোগাযোগ। গোটা সাউথ বেলিয়াহাট্টার দায়িত্ব এল সি এস এ বি-র ওপর। ফলে এ বি-র মুখ থেকেই পার্টির নির্দেশ আসবে। আর এমন একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে ওরা সবাই উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে আছে একটা পাকা কথার জন্যে। যে কথা ওদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে মদত দেবে, সোনার হত্যার বদলা নিতে হিম্মত জোগাবে, আর দক্ষিণ বেলেঘাটার হাড় হাভাতে মানুষজনের কলজের ভেতর ঢোকার দুর্গম রাস্তা বাতলাবে।

বীরু দু-হাতে মুখটা ডলে নিল। কেমন একটা শব্দ হল। রাতভোর জাগান দিয়ে চোখ জোড়া জ্বলছে বোধহয়। নিবারণ আড়চোখে গোরাকে দেখছিল। কাচকলের নিবারণের পরনে সেই পট্টিছেঁড়া হাফপ্যান্ট। এই কদিন হল ও কোরে (কোর কমিটি) এসেছে। সোনা থাকতেই। সোনাই বলেছিল : নিবারণদাকে কোরে নেওয়া উচিত। একে ওয়ার্কার, তার ওপর টাইম দিচ্ছে।

এ বি হুস্ হুস্ করে টেনে বিড়িটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিল। দেশলাই কাঠি দিয়ে তক্তপোশের ওপর আঁচড় কাটতে লাগল : কমরেড...। সোনাই প্রথম নয়। তার আগে আমরা নন্টেকে হারিয়েছি। শাসকশ্রেণি তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে সর্বত্রই আমাদের ওপর হামলে পড়েছে কারণ ওরা জানে এটা বিপ্লবী পার্টি...

ধীরে ধীরে গলায় আবেগ খেলতে লাগল। কখন আনমনে চশমাটা খুলে ফেলেছে। চোখের ভারী পাতা বুঁজে আসছিল। কিন্তু পাতা জোড়া সামান্য ফাঁক রেখে স্থির হয়ে গেল। এ বি-র জলদগম্ভীর গলা ভেড়ির শান্ত জলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চার-পাঁচ জোড়া কান অধীর অপেক্ষায় খাড়া হয়ে আছে। আর অনেক দূর থেকে একটা ভরাট গলা কেঁপে কেঁপে উঠছে— অ্যাকশন.. খতম...বদলা...।

এতক্ষণ গোরা মুখ খোলেনি। এ বি-র কথায় শরীরের আড় ভেঙে গেল। ছিলা টেনে আবদ্ধ তিরটাকে কে যেন ছাড় দিল। এমনি এক আশঙ্কায় সুকুদের ডেরায় আসার আগ অব্দি কেটেছে। কথাটা শোনা মাত্তর গোরার ঝিম ভাবটা ফালা ফালা হয়ে গেল। শক্ত ডেলা পাকিয়ে উঠল। ওদিকে এ বি তখনও বলে চলেছে : এতদিনের সুবিধেবাদী লাইনকে চুর চুর করে পার্টি আত্মত্যাগের মহান লাইন তুলে ধরেছে...কমরেড সোনা আমাদের রাস্তা দেখাচ্ছে।

: নাহ্।

: মানে?

: এ স্বেচ্ছামৃত্যু।

: মরার ভয় এত্তো!

: তাহলে মরার রেস হচ্ছে?

: বিপ্লবী সাহস আর ত্যাগ...

: হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু সবই বাঁচার জন্য। এমনকি মরাটাও।

এ বি-র পাঁচ-পাঁচটা আঙুল কোঁকড়া চুলো মাথায় অস্থিরভাবে খেলছিল। ঠোঁটের খাঁজে অবজ্ঞার তেলা হাসি নিয়ে ফের বিড়ি ধরানোর তাগিদ অনুভব করল। আর খানিক বাদেই চোখের তারায় স্বপ্নের তরল নেশা জাগল : অ্যাকশন হল পার্টি-লাইন, না মানলে পার্টি ছাড়তে হবে। ক্ষতির হিসেব করলে চলবে না, সিনা টান করে সামনে হাঁটতে হবে। আর প্রতিক্রিয়ার আঘাতের ভয়ডরে যদি দাঁতকপাটি লাগে তাহলে রাস্তা দেখতে হবে। দুসরা রাস্তা।

অনেক শলাপরামর্শ আর তক্কাতক্কি হল। মেজাজ চড়ে ওঠে। আবার খাদে নামে। একেবারে খাদে। দুঃখের গভীরে। নিবারণ আর সুকু শুরু থেকেই হাত কামড়াচ্ছিল বদলার জন্যে। লাস্টে বীরুও। সেরেফ মন্টু আর বুড়ো বেলিয়াহাট্টা বন্ধ করার শুয়োরের গোঁ নিয়ে পড়ে থাকল। শেষকালে সাব্যস্ত হল ধর্মঘটের ডাক যেমনি দেওয়া হয়েছে থাকুক। অ্যাকশনের চেষ্টা- চরিত্তিরও চলবে। সুকু টুক করে উঠে গেছে। এক ঝটকায় বাইরেটায় নজর বুলিয়ে আসবে। তারপর যে যার সরে পড়বে। পয়লা যাবে এ বি—খ্যাপা কুত্তার মতো ওকে খুঁজছে। পেলে ছিঁড়ে খাবে! তারপর গোরা। তারপর গুটিগুটি আর সবাই যাবে।

ফার্স্ট পতাকা উড়ল মোড়ের ল্যাম্পপোস্টটার মাথায়। বুড়ো কালো কাপড়ের লম্বা ফালি মুখে নিয়ে সর্‌সর করে উঠে গেল। থমথমে মেঘের নীচে খোঁচার মতো ল্যাম্পপোস্টটার মাথা থেকে ঝুলে নামল কালো পতাকাটা। তলায় গোরা, মন্টু আর বিজয়দা দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো নেমে আসতেই ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। বাসরাস্তার দু-ধারের দোকানপাট বন্ধ করতে করতে এগিয়ে চলল। কোথাও কোথাও একটু কথা কাটাকাটি হয়। তখন বুড়ো সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আর বুড়োর হিম্মত এ তল্লাটের কানাটেংরা অব্দি জানে। হুস্‌ করে দোকানের ঝাঁপ নেমে আসে। ঝামেলা পাকাল পুতলিকলের গেটে। ততক্ষণে বেলা চড়েছে। শুয়োরপট্টি থেকে দু-চাকার ছ্যাকড়া গাড়িতে করে শুয়োরের মাংস নিয়ে ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দ করে নিউ মার্কেটের দিকে চলে গেল। সিফট চালু হচ্ছে। সারাটা তল্লাট কালো বোরখার ভেতর থমথমে মুখটা লুকিয়ে ফেলেছে। গোরা পুতলিকলের গেটের একটা পাল্লা ধরে বাদুড় ঝোলার মতো ঝুলতে লাগল। গেট মিটিং। ওরা অনেকদিন হল এ রাস্তা মাড়ায় না। শুরুর দিকটায় যেমন মিছিল, স্কোয়াড, স্ট্রিটকর্নার লেগেই থাকত। এখন এক ওই পোস্টার আর ওয়ালিং ছাড়া সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না।

গোরা আওয়াজ তুলল। স্লোগানে স্লোগানে আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠল। জোস আসতে লাগল। তারপর মুখ খুলল। বুক ফাটা যন্ত্রণার বোল ফুটল : দুশমন কো ইয়াদ নেহি হ্যায় কি ইয়ে বেলিয়াহাট্টা হ্যায়...নিমাই সরকার কা বেলিয়াহাট্টা...

হঠাৎ মাল পড়ল। গোরার মাথায় রডের বাড়ি। আর চিৎকার। পুতলিকলের সিকিউরিটি ফোর্সের ফাঁকা গুলি। বুড়ো শিবতলার কংগ্রেসি মস্তানরা লক্কর নিয়ে ছুটছে : মার শালা খানকির ছেলেদের। আর পুলিশ। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্তর।

ওয়ার্কারের দঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ওরা মেথরপট্টির ভেতর ঢুকে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে মালের শব্দে। ছড়ে কেটে গেছে হাত পা। অথচ ওরা কিছুই আঁচ

করতে পারছে না। আর শোকের নিকষ কালো চিহ্ন গোটা তল্লাট জুড়ে আশমানের নীচে তখনও থির হয়ে আছে।

গলিগালা নর্দমা ঘেঁষে, বেড়া পাঁচিল টপকে, সব শুয়োরপট্টির লাগোয়া তেরচা পার্কটায় বসে একটু থিতোল। আর এইটুকু আসতে কানাঘুষোয় শুনতে পেল, খানিক আগে নাকি সিককলের কাছে একটা পুলিশ খুন হয়েছে। শুয়োরপট্টির পার্কটায় এসে ওরা হাত পা ছড়িয়ে দিল। ধকলে ধকলে শরীরে আর বশ নেই। সাড় নেই। বিপদের তেজি গন্ধটা নাকে এসে লাগছে। আর কী, কী হতে পারে! গোরা মন্টুর দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসল। অর্থাৎ : সর্বনাশের হাত পা গজাচ্ছে। এখন দেখা যাক কদ্দুর কী হয়।

: সুকুদের কাজ।

আলি তেড়িয়া হয়ে উঠল : ঠিক কিয়া।

ভেতরে ভেতরে আলি হজম করতে পারছিল না। পুতলিকলের সামনে মাল পড়তে একটা স্প্লিন্টার ছিটকে লেগেছে ওর গোড়ালিতে। খাবলা দিয়ে মাংস উঠে গেছে। গোরার প্ল্যান ছিল আর পাঁচ-সাতজন নিয়ে সাঁঝের দিকে স্কোয়াড বের করবে। ঝড়ের ঝাপটার মতো। আর এখন দিগ্‌বিদিক ঠিক করতে পারছে না ওরা। বিজয়দা খুব একটা এক্সপোজড নয়। হালচাল বোঝার জন্য ওরা শলাপরামর্শ করে বিজয়দাকে পাঠাল। আর বিজয়দা হিউজ রোডের মোড়টায় পড়তে না পড়তে ছোট্ট ক্ষীণজীবী চড়ুইর বুকের মতো পার্কটা রেইড করল দু- গাড়ি পুলিশ। বিপদ নিয়ে যাদের ঘরসংসার কাকের মুখে সংবাদ পেয়ে তারা উড়াল দিল। ডোবা আর পুকুর। আর পচা খাল। আর রেলওয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মেঘটা আর জল খসায়নি। যেন টলটলে চোখের মতো মেঘ। মেঘের নীচে বেলিয়াহাট্টা। বেলিয়াহাট্টায় চাপ গুমোট। শ্বাসকষ্ট। বাতাসের নাম গন্ধ নেই। কালো কাপড়ের ফালিগুলো জিভের মতো ঝুলছে। অথচ নড়াচড়া নেই। থির নিস্পন্দ। কোথায় যেন সবকিছু পাষাণ হয়ে গেছে। পুতলিকলের চিমনি থেকে তবু আঁশ আঁশ ধোঁয়া ওঠে। বয়লারের আগুন টিঁকিয়ে রাখতে। আর এখানে সেখানে মানুষের গজল্লা। ফিসফাস কথা : দ্যাখ কী হয় গোরারা ছাড়ার পাত্তর নয়। এ তো সবে শুরু।

অর্থাৎ, এরপর যেন আকাশ দু-খান করে বাজ নামবে। আর থমথমে নির্বাক বেলিয়াহাট্টা হঠাৎ নিষ্ঠুরভাবে ফেটে যাবে। কালো কাপড়ের ফেট্টিজড়ানো বেলিয়াহাট্টায় প্রাণ জাগবে। অস্থির এক প্রাণ।

বিজয়দা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই ওরা তিনজন উঠে পড়ে। রেইড করার আগেই ওরা গা ঢাকা দিয়েছিল। ন্যাশনাল রবারের পিছনের রাস্তা ধরে সিধে পঞ্চাননতলা। দম ফেলতেও জিরেন নেয়নি। পঞ্চাননতলা থেকে খালপাড়। খালপাড়ের ঠেকটা খোচর জানে না। ওরা খোয়া-জাগা এবড়োখেবড়ো রাস্তার ধারে কাঠের গুঁড়ির ওপরই বসে গেল। জলদি প্ল্যান করে নিতে হবে। একসাথে তিনজনের ঘোরাঘুরিটা বেকুফি। সবসুদ্ধ ধরা পড়ে মরবে। এখন যে যার এক এক দিকে ছিটকে যাওয়া ভালো। পরে মওকা বুঝে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে।

কাঠের গুঁড়িটার পেছনে খাল। পচাখাল। সারা কলকাতার ক্লেদ গ্লানি বয়ে ওটা পচাখাল। আর পচাখালের ডান হাতি কিলখানা। হাড়্‌ডিকল। গরু জবাই হয়। লাইনের ধারে নাড়ি-ভুঁড়ি ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে রোদে টান করে মেলে রেখেছে। বদগন্ধ ছাড়ছে।

এমনিতেই গোরার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। তার ওপর বদগন্ধ। বুকের ভেতর ছোটার রেশটুকু এখনও হাঁসফাঁস করছে। বেশি ছুটলেই বুকের কাছে একটা বেদনা আসে। আসলে শরীরটাই কমজোরি হয়ে আসছে। ঘেমে জবজবে হয়েছে তিনজনই। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। চট করে কথা সরতে চায় না। গোরা এলিয়ে পড়ছিল : পারলুমনা... বেল্লেঘাটা জানতেও পারল না সোনার কথা...। বুড়োর হাত পা নিসপিস করছে : এই টাইমে ঢিলে দিলে মরতে হবে।

: শুধু মরা আর মরা... তোদের মুখে কি আর কথা নেই?

: যা সত্যি বলছি।

: কোনটা সত্যি?

: মরাটা।

: মর তাহলে।

খোঁজ নিয়ে নিয়ে বিজয়দা ঠিক আসছে। বিজয়দার পোড়াকাঠ শরীরটার দিকে চেয়ে গোরার কেমন একটা কষ্ট জাগল। কোলের রিকেটের রুগি মেয়েটার কথা মনে হল! সোনারপুরের হাঁদাগোবা মেয়ে, ছিরি বউদির কথা মনে হল। বিজয়দা না থাকলে সব ভেসে যাবে। কোঁন চুলোয় যে যাবে। সবাই তো আর মিনতি বউদি নয়। গোরা ভাবছিল বিজয়দাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করাটা ঠিক না। কোথায় যেন অনিশ্চয়তার এক ঘুণ পোকা বাসা বেঁধেছে। গোরা টের পাচ্ছে। স্পষ্ট মালুম হয়। অথচ কিছু করার নেই। কোথায় যেন গোরা ভীষণ অক্ষম। বিজয়দা দরদরিয়ে ঘামছে : গোরা তোর মাকে তুলে নিয়ে গেছে।

: মাকে!

: হ্যাঁ।

: বলছ কী!

: হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। তবে নিজের চোখে দেখিনি। পাড়ায় তো আর ঢুকতে পারিনি। আটচল্লিশ নম্বরের (বস্তির) গোপলা ঢুকতে দিল না। তক্ষুনি নাকি আমার বাড়িতে ঢুকেছে। পাড়ায় আর ঢুকতে হচ্ছে না। খোচরে খোচরে ছেয়ে গেছে।

কাঠের ধুমসো গুঁড়িটায় গা এলিয়ে দিল বিজয়দা। পচাখালের হাড়পচা গন্ধটা বমির বেগ আনছে। দমকা বাতাসে থেকে থেকেই গন্ধটা জাগছিল। কথাগুলো রুদ্ধশ্বাসে বলে ফেলে বিজয়দা কাহিল। কেমন একটা আলস্যি আসছে। হাত-পা খেলানো যায় না। মন্টু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুছতাছ করছিল। যেন রাস্তা খুঁজছে। রাস্তা কোথায়। হুবহু নন্টের হাল। তালতলার নন্টে। মাথার ওপর কিমত জারি হয়েছিল। আর ছেলেটা খোচরের র‍্যালা খেয়ে একটা ব্লাইন্ড লেনে ঢুকে পড়ে। তখন শুধু ঢোকার কথাই মনে ছিল। আবার যে বেরোতে হবে সেকথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিল, ততক্ষণে একমুখো গলিটার মুখে ওরা ছিপি এঁটে দিয়েছে।

: আলি!

হাঁ।

তুই ডেরায় চলে যা। বেগতিক বুঝলে বি সি-তে চলে আসিস।

নেহি।

এখন কথা কাটাকাটির সময় নয়।

নেহি।

কথা বাড়াস না।

না। ও হবে না।

যা।

না।

আলি!

মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে। মেজাজ চড়ছিল। ফাল দিয়ে দিয়ে। বিজয়দার মুখে খবরটা শোনার পর থেকেই কান্নার একটা বেগ বুকের ভেতর আঁকপাঁক করছিল। তাই বলে তো আর গলা ফাটিয়ে কাঁদা যায় না। জ্বলন বাড়তে লাগল। হঠাৎ গলাটা মিহিন হয়ে এল : তুই তো সমঝদার আলি, কেন বুঝছিস না সবাই যদি এলাকা ছেড়ে দি তাহলে সংগঠনের হালত কী হবে। তোকে তো বড়ো একটা চেনে না। থেকে যা।

আলির থ্যাবড়া গুটলি পাকানো নাকটা ঠোঁটের ওপর ঝুলে নেমেছে। বাংলা ভালো বলতে না পারলেও, বিলকুল বোঝে। আর বোঝে বলেই চুপ মেরে গেল। মন্টু কী একটা কথার আধখানা পেটে আধখানা মুখে নিয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল। আলির পিটপিটে চোখ জোড়া আরো ছোট হয়ে এল। ওর চোখে সহজে জল আসে না। বুক ফাটলেও না।

থিতিয়ে থিতিয়ে হেঁটে চলে গেল। কত অনিচ্ছায় যে ও ফিরল তা তিনজনের ছোট্ট দলটাই কেবল জানে। সেরেফ তিনজন। তিনটে মানুষ। গোরা, বুড়ো আর মন্টু। বিজয়দা আলিকে তেমন চেনে না। আলি দু-পা এগোতেই বিজয়দা গোরার দিকে ঝুঁকে পড়ল : আর পাড়ায় ঢুকিস না। ঢুকলেই মরবি। সারা তল্লাট ছেঁকে তুলছে। বি সি-তে চলে যা, মিনু আসবে সন্ধের ঝোঁকে। ওর মুখেই সব শুনতে পাবি।

: আর তুমি?

: দুটো দিন এক দোস্তের বাড়ি কাটিয়ে দেখি তারপর...

এখন মানুষ বলতে ওরা তিনজন। তিনজনের ছোট্ট একটা দল। বিজয়দাও চলে গেছে খানিক আগে। এখন পাড়ার খবরাখবর দেয়া নেয়া বিজয়দাকেই করতে হবে। এক কথায় কুরিয়ার। ওরা বিজয়দাকে আবছা হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখল। গোরা বেমালুম ফাঁকা একটা দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখেছে।

একসময় ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। মন্টুই তাড়া দিল : নাও, আর বসে থেকে লাভ নেই। কাঠের গুঁড়িটা পেছনে ফেলে, পচাখালের পাশ দিয়ে টানটান হয়ে হাঁটতে লাগল। মন্টুর একটা হাত গোরার পিঠ ছুঁয়ে আলগা হয়ে আছে। ওরা ঠিক করল লাইনে চড়বে। বুড়ো খেঁকিয়ে উঠল : একবারে শিক্ষে হয়নি।

গোরা আর মন্টু গায়ে মাখল না। কথাটা ভেসেই গেল। লাইন দিয়েই সরট্‌কাট। ওদের যে খুব একটা তাড়া আছে এমন নয়, হাঁটছেও গা ছেড়ে তবু এই সরট্‌কাট পথটার কেমন একটা টান আছে। গোরার মুখ দিয়ে ফস্ করে নিজের অজান্তেই কী একটা কথা বেরিয়ে এল : ওরা কি আমায় না পেয়ে মাকেই গুলি করবে? বুড়ো?

: দুর তাই হয় নাকি!

মন্টু বুড়োর কথাটাকে চর্‌চর্ করে কাটতে লাগল : কেন? কেন হয় না? ওদের কাছে মনুষ্যত্ব আশা করো? ভালোমানুষি? আশ্চর্য!

গোরা আর মুখ খুলল না। ওরা তিনজনই এখন জলদি হাঁটছে। মন্টুর কথাটা আসলে উস্‌কে দিয়েছে ওদের। আর গোরা ভাবছিল—ওরা যদি সত্যিই মাকে না ছাড়ে। গোরা নিজের ভাবনায় অবাক হয়। এর মধ্যে আবার সত্যি মিথ্যে কোত্থেকে আসে। হঠাৎ মার রুগ্‌ণ মুখটা ভেসে ওঠে। লাস্‌ট যেদিন গেছিল, মার থালে বসে দু-গেরাস ভাত খেয়েছিল গোরা। খুকুটা কথা বলতে পারছিল না : ইস্ কী চেহারা করেছিস। গোরা দেখেছিল খুকুর চোখের পাতা কাঁপতে। আজকাল সবাই যেন কেমন মায়া মায়া ভেজা ভেজা চোখে গোরার দিকে তাকায়। হয়তো পুলিশের গুলিতে মরবে জানে, তাই।

: আমরা কি পাড়ায় আর ঢুকব না?

মন্টুর গলাটা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেল। আর পচাখালের ওপর, রেলওয়ে ওভারব্রিজটা পেতেই ওরা তিনজন লোহার বিমগুলো ধরে থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে চোখ ঘুরিয়ে সারি সারি চিমনির ধোঁয়া আর পুতলিকলের দু-নম্বর স্ক্রিন মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। কে জানে কেন হঠাৎ ওরা সারাটা বেলিয়াহাট্টা চোখের মণিতে গেঁথে নিতে চাইল।

বালুরচর

কোন জম্‌মে কী ছিল কে আর তা দেখতে গেছে। জোড়ামন্দিরের পাগলা বিশুর মুখে হরটাইম পুরোনো জামানার কিস্‌সা। বলে, বালি ছিল। সেরেফ্ বালি। ধু ধু বালি। জনমনিষ্যির চেন্নমাত্তর ছিল না। সূর্যের আলো পড়লে মণিমাণিক্যের মতো চিকচিক করত বালির সমুদ্দুর। জেল্লা দিত। দস্যু রত্নাকর তো এখানেই বালির পিণ্ডির ভেতর আত্মপীড়নমূলক দমবন্ধ তপস্যায় জানকীর খোঁজ পেয়েছিল। সীতা অন্বেষণ। আর সীতা তো মাটিরই কন্যা...

বেলেঘাটায় চিমনির ক্ষ্যামাঘেন্না নেই। রঙকল, হাড়্‌ডিকল, সিককল, আরো কত। সুকুর বাপের হাড়ে তো দুব্বো গজিয়েছিল ওই রঙকলেই জান পাত করে। রঙকলের রঙ্গ কত! কোম্পানি আগ লাগাল কোম্পানিই আগ নেভাল। আর সুকুর বাপটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোম্পানির ছলাকলা ছেনালির হিসেব নেই। বেলেঘাটায় তো আর খাটিয়ে মানুষের কমতি নেই। বাপের আগুনপোড়া শরীরের চেন্নর মতো ভুরুর বাঁ পাশের তামাটে জরুল খেলিয়ে সুকু বলে : এবার চামড়া ছাড়িয়ে নুন ঠেসে দেব মাখন খাওয়া গতরে। কথাটা বলে আর খট্ করে একটা শব্দ হয়। দাঁতে চোয়ালে।

বয়লারের আগুন। মানুষের কলজে পোড়া আগুন। বেলেঘাটার মাথার ওপর ধোঁয়ার মধ্যে সাপের জিভের মত লকলক করছিল। এখন, সবে সন্ধে। ওরা তিনজন রণপায়ে হাঁটছিল। বালুবচরের দিকে। এখন বালিফালির বালাই নেই। তবু বালির চর, বালুরচর। বালুরচর মানে বুকের পাটা। দেয়ালময় টেনসিলের ছাপ। বালুরচর মানে এক দঙ্গল জোয়ান ছেলে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন, পার্টির ঘাঁটি। খোচরের হৃৎকম্প। বেলেঘাটার জান। বেলিয়াহাট্টা কা জান!

ওই শেষ। বালুর চরেই বেলেঘাটার শেষ। অভাবি বেলেঘাটার শেষ সীমানা। ওরা সেই সীমানায় পৌঁছে বুক ভরে শোয়াস নিল। এরপর খাল আর ভেড়ি। ভেড়ি আর খাল আর ভেড়ি আর খাল। আরো খানিক ভেতরে ঢুকলে, মাছের আঁশটে গন্ধ পেরিয়ে, পোকায় কাটা পাকা ধানের গান।

ওরা নিকষনিষ্ঠুর কালোপানির বুকে ছায়া ফেলে হাঁটছিল। ঘন কালোপানির গভীরে ঝাঁজি আর শ্যাওলাদাম। মুরারীর একহারা শরীরটা শ্যাওলাদামে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছিল। বালুচরের মুরারী। গহীন রাত্তিরে ওরা মুরারীকে লেকের জলে ঠেলে পরপর দানা গেঁথে দিয়েছিল। এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে। লেকের জল নিষ্ঠুরভাবে রক্তের দাগ লুকিয়ে ফেলেছিল ষড়যন্ত্রের কালিতে। শুধু লেকের ধারের কুলিকামিন আর রেলওয়ে গ্যাঙম্যানের ঝুপড়িতে ধাক্কা মারছিল 'ইনকিলাব' শব্দটা। ভোর রাত্তিরে 'ইনকিলাব' শব্দটার তাগদে তাদের বেবশ নিদ টুটে যায়। ওরা টের পেল, একটা মানুষ কথাটা ছুঁড়ে মারল খুনির বুকে। আর তারও পরে মানুষগুলো কথাটার মানে খুঁজেছিল। ইনকিলাবের মানে। যে কথাটা বলে মুরারী রাইফেলের দানা হজম করে। সেই কথা। তার মানে।

আর এ বি বলেছিল : অ্যাকশন থেকে, স্ট্রাগল থেকেই জনতা শিক্ষালাভ করে। গ্যাঙম্যান হানিফকে নজির খাড়া করেছিল। মুরারীর শরীলে দানা গেঁথে দেওয়ার আগে ও যুঝেছিল। তারপর লেকের ঠান্ডা পানি। আর ইনকিলাব। হানিফ এ বি-কে জিগ্যেস করেছিল—ইনকিলাব কা মতলব? তাইতেই সব প্রূফ হয়ে গেল। অ্যাকশন মানেই প্রচার। সংগঠন। মন্টু কথাটা মানতে পারেনি। ও ফোঁস করে উঠেছিল: কমরেড মুরারী আমাদের চোখের মণি, ও বেঁচে থাকলে পার্টিকে ঢের মজবুত করতে পারত।

: হ্যা নিশ্চয়ই।

: তাহলে সব বেঁচে থাকার পাল্লা দি...নন্দদুলাল না?

: মনেই হল। কমরেড মুরারী ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে পারতেন। জনতার ভেতর ঢুকে লড়াইর জমি বানাতে পারতেন...

: শহিদ কমরেডের সমালোচনা শুনতে চাই না।

আর কথা জোগায়নি। কী একটা কাজের বাহানায় উঠে গেছিল মন্টু। আর ওয়ানসটার পাইপগানটা ঢোলা প্যান্টের পকেটে পুরে এ বি উঠে দাঁড়িয়েছিল। এ বি-র মাথার ওপর তখন দশ হাজার টাকার ইনাম। আর তাই ছোট্ট পাইপগানটা উরু ছুঁয়ে থাকে। রক্তের ভেতর লোহার ঠান্ডা সোয়াদ। কাঠের হাতল লাগিয়ে বিলকুল চেম্বারের মতো বানিয়ে নিয়েছে। এ বি বলে ওয়ান সটার। আসলে পাইপগান।

লেকের পাশে দু-দশ হাতের ফারাকে ঢ্যাড়ঢ্যাড়ে স্প্রিং ফ্যাক্টরি, আর স্যাঁৎসেঁতে ভিজে মাঠ ডলে পিষে বালুরচর। সারাটা বালুরচর জুড়ে যেন সতীর দেহের টুকরোর মতো মুরারী ছড়িয়ে আছে। ইনকিলাবের কাঁপা স্বরটা সমস্ত এলাকা জুড়ে আত্মগোপন করে আছে। কখন যে বার্স্ট করে! ওপর থেকে কিচ্ছু বোঝার জো নেই। বালুরচর যে কে সেই। তার ডাহিনা তরফ তাবৎ কলকাত্তা ঝেঁটিয়ে সাফ করা ডাঁশ ডাঁশ ময়লা। ময়লার পাহাড়। মরা কুত্তার জল ঢোস্‌কা ফুলো পেট, ন্যাকড়াকানি জড়ানো আধা ঘন্টার শিশু। আর দুর্গন্ধ। দুগ্‌গন্ধ।

বালুরচরের মাঝমাঠের ঢ্যাঙা বকফুল গাছে একরত্তি কুঁড়ি ছুঁয়ে শেষ রোদ্দুরের ফালি জিরেন নিচ্ছে। রেললাইনের খোয়া আর গুটলি পাকানো তারে ঠোক্কর খেতে খেতে ওরা বি সি-তে এসে ঠেকেছে। সারাটা রাস্তা টেনে টেনে শ্বাস নিয়ে এখন বেজায় কাহিল। মন্টুর চোখ দুটো জবাফুলের মতো টকটকে লাল।

কারো যে পাত্তাই নেই!

বউদির দোকানে চ।

বউদির লুলা স্বামীটাকে তুলে নিয়ে গেছিল না ক-দিন আগে?

তো কী হয়েছে!

দোকানের ওপর নজর আছে ঠিক।

চ তো।

গোরা হাতের পাঞ্জায় গোটা মুখটা সাপটে নিতে নিতে বিড়বিড় করল : একটু গলাটাও ভেজানো দরকার একেবারে টেনে ধরেছে।

মাথা হেঁট করে ওরা ঢুকল। বউদির দোকানের ঝাঁপটা পুরো তোলা যায় না। আগে দোকান গরম করে, জমিয়ে, হরবখত্ কেউ না কেউ থাকত। প্রথম দিকটায় হয়তো আসত একটা সমবেদনা মেশা চায়ের তেষ্টায়। আহা বউটার কি কষ্ট। স্বামীটা রেলে কাটা পড়ে পা দুটো খুইয়ে বসে আছে। এখন আর পা নেই। অসাড় মাংসের পিণ্ড বেগুনের মতো ঝোলে।

পড়ন্ত দুপুরে আজ বিলকুল ফাঁকা। একেবারে শান্নাটা। অদ্ভুত নিরালা। গোরাকে দেখে বউদির নীলকণ্ঠ ফুলের মতো সামান্য বেঁকা, চিকন নাকের ডগায় কেমন একটা মলিন ভাব পিছলে গেল। পাতলা ঠোঁটে হাসি ধরল।

নেই?

নাহ্।

মহা মুশকিল!

আজ কারো পাত্তাই নেই।

বিন্ডিঙে আছে?

জানি না ঠিক, মনে হচ্ছে নেই।

ততক্ষণে ডাঁটিভাঙা, কালো কালো ছিট জাগা, সস্তার কাপ উল্টে পাল্টে ধোয়াপাখলানো শুরু হয়ে গেছে। হাতের শাঁখা আর নোয়ায় একটা রিনরিনে শব্দ জাগছে। চায়ের কথা আর মুখ ফুটে বলতে লাগে না। বউদি জানে ছেলেগুলোর তেষ্টা লেগেছে। তেষ্টা লাগলেই এই 'বউদি কাফে'। রসিকতা করে কথাটা ওদের ভেতর কে যেন বলেছিল। ব্যাস, সেই থেকে চালু হয়ে গেছে। আসে সব ঝড়ের ঝাপটায়। দু-দণ্ড বসে। গলাটা সাফ করে নেয় উষ্ণ উষ্ণ চায়ে। আবার হুস করে মিলিয়ে যায়। কবুতরের মতো।

পয়সার কথা ভাবতে হয় না। ভাবনা হয় ছেলেগুলোকে নিয়ে, দিলখোলা হাসি নিয়ে। দোকানে জাঁকিয়ে বসে ঝড় বইয়ে দিয়েছে আগে আগে। কথার তুবড়ি। কত কথা। চীন, রাশিয়া, শোধনবাদ, বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুত্তা। অনেক কথাই বোঝেনি বউদিকাফের বউদি। বেলা নামের সরল বউটা। বেলা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবত উফ্ গোটা দুনিয়াটাই চষে ফেলেছে। তবু বেলা বুঝত। ওরা আগাপাছতলা পাল্টাতে চায়। মন্ত্রিটন্ত্রি বদল নয়। একেবারে শেকড়সুদ্ধু টান। একেবারে উল্টে দিতে চায়। আর স্বপ্নকথা শুনতে শুনতে কবে যেন বউদির বুকের ভেতরও একটা তোলপাড় হয়ে গেছে। তরতাজা ছেলেগুলোর জ্বলজ্বলে চোখ আর ঘাম জবজবে মুখে যে একটা বিশ্বাস আছে। শক্ত, ডাঁটো একটা বিশ্বাস।

হবেই। হ্যাঁ...হ...ব...বে...ই। সত্তর সালেই কী হবে তা আর মুখ ফুটে বলতে লাগে না। মানুষ তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। যে পাঁচ আঙুল দিয়ে গেরাস তোলে, পেটে যার দানা লাগে, আর সেই দানা যাকে জান খয়রাত করে জোটাতে হয়, তার হাড় অব্দি জানে। জানে, কী নেই। কী চাই। পেটের ভাত, পাছার কাপড়। আর...আর...মুক্তি। মু..উ...উ...ক...তি।

: নেপু ঠাকুরপোর গতিক সুবিধের নয়।

চামচে নাড়ার ঘটঘট শব্দ হল। গোরার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বউদি কথাটা বলল। হাঁটুর ওপর তেরচাভাবে থুতনিটা রেখেছে।

: যদি হসপিটালে ম্যানেজ করা যেত!

: পাগল হয়েছ!

গোরার মুখের আদলই বদলে গেল। আশ্চর্য বদলি। ঝট করে মুখের চেহারা পাল্টে যায়। দপ্ করে আগুন জ্বলে মাথায়। দাঁতে দাঁত চেপে কে যেন ফিসফিস করে উঠল : শ্ শালা। আজকাল আকছার এমনি হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ শরীরে কেমন একটা খিঁচ লাগে। আর সম্বাদের তো কমতি নেই। এক একটা সম্বাদ দানার মতো। রাইফেলের দানা। গেঁথে গেঁথে যায়।

: দাদাকে তো ছেড়ে দিয়েছে না?

: হ্যাঁ।

সে রাত্তির যেন কালরাত্তির। এ বি, নেপু আর জনা পাঁচ-ছয় মিলে রাতভর ওয়ালিং পোস্টারিং করে ভোরের ঝোঁকে লুলা মানুষটার নাম ধরে ডাকতে লাগল: রবিদা! ও রবিদা! কি গো উঠবে নাকি? মানুষটার জ্বর জ্বর ভাব সেদিন। বেলাই ওঠে। ভোর রাত্তির হল কালরাত্তির। রাতভর জাগার ক্লান্তিতে তখন যদি একবার ঢলে পড়ে আর রক্ষে নেই। এই সময় দুশমন আসে। আর তাই নিদ হল শত্তুর। শত্তুর তাড়াতে গলায় তখন এক ঢোঁক গরম পানি দরকার। টেনসিলের পাতলা টিন, রঙের কৌটো, আর তুলি বউদির দোকানেই থাকে। চা-টুকু গলায় যদি ঢালতে পারে, ইনফরমারের তো ঘাটতি নেই, দেখতে দেখতে ঘিরে ফেলল। ভাগ্যিস পেছনের জলাবাদাটা বাগে আনতে পারেনি। ওরা ওদিক দিয়েই সাফ হয়ে গেল। আর সরকারি তনখাওয়ালা অফিসার লুলা মানুষটার বগলে টেনসিল গুঁজে দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। এত কাণ্ডের পরেও বেলার মনটা ছেলেগুলোর জন্য টনটন করে। কান্না আসে। ভোর রাত্তিরে দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে, বিপদের গন্ধ পেলে খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আঁকপাঁক করে। সারাটা শরীরমন আনচান আনচান করে। দুপুররাতে ঘুম আসে না।

দোকানটার ওপর কড়া নজর। ঢপ্ দিয়ে চা নিয়ে বসে এটা সেটা পুছতাছ করে আনজান লোক। একটাকে আচমকা ঘিরে ফেলেছিল নেপুরা। বেলার চোখের সামনে। নেহাত তখনও মুরারী শহিদ হয়নি, নাহলে কুচ হয়ে যেত। দোকানটার চারপাশে এখনও ছুকছুক চোখ। যে কোনো মুহূর্তে হামলে পড়ে ফাতা ফাতা করতে পারে। দুটো মানুষের জীবন ফেঁড়ে ফেলতে পারে। আর এ বি-দের কাউকে পেলে তো খাবলে খাবে। তবু ওরা আসে। ঠিক আসে। সারাদিন একদফা না একদফা আসবেই। না এসে উপায় নেই। ঘরছাড়া, পুলিশের তাড়া খাওয়া, খর জীবনে টলটলে স্নেহের এই এক ফোঁটা পানির জন্য কি আকুল তৃষ্ণা!

বুড়ো এতক্ষণ কুলুপ এঁটে ছিল মুখে। হালচাল ঠাহর করছিল। দিন-কে দিন বুড়ো কেমন শিকারী বিড়ালের মতো হয়ে উঠছে। গন্ধে গন্ধে বিপদ আপদ টের পায়। চায়ের তলানিটুকু গিলে ও ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল : চলো, নেপুর শেলটারে যাওয়া যাক। বুড়োর কথাটা লাগসই। ওদের মনে ধরল। মন্টু পয়সা চুকিয়ে ফের ঘাড় ভেঙে বেরিয়ে এল। আর অজান্তেই কীসের একটা টানে ওরা বেলা বউদির সাথে চোখ মেলাল। চোখে চোখ। অর্থাৎ বেঁচে বত্তে থাকলে ফের দেখা হবে। চল্লাম।

ওরা বেলা বউদির জলধরা চোখের মণি থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগল। আবছা হতে হতে বিলকুল মিলিয়ে গেল। বকফুল গাছের হাল্কা বিষণ্ণ ছায়া ওদের শরীরে। বকফুল গাছের বেঁকা তোবড়া গুড়িতে ইনকিলাবের ঘ্রাণ। গন্ধ। গায়ে কাঁটা দেয়। গায়ের লোম রোঁয়া রোঁয়া হয়ে ওঠে। মুরারীকে গাছের গুঁড়ির সাথে বেঁধেছিল। আর একটা মানুষের গলায় ইনকিলাবের আহ্বান সাইরেনের মতো বেজে উঠেছিল। বালুরচরের ঘেরাঘুপচি ডেরা আর কালশিটে আশমান আর লেকের পানিতে ইনকিলাবের ডাক।

আর দু পা এগোলেই নেপুর শেলটার। কাঁচা মাটির ঝুপড়ি। দু হপ্তার ওপর ছেলেটা এখানে পড়ে আছে হাসপাতালে দেওয়ার জো নেই। বিষিয়ে উঠেছে পোড়া ঘা। ছেলেটা নির্ঘাত মরবে। সকলের চোখের সামনে। অথচ কিছু করার নেই।

এক রুক্ষু ঝামেলায় ফেঁসে গিয়ে এই হাল। নেপু সেদিন মালটা টেস্ট করতেই লেকের ধারে গেছিল। হঠাৎ কী করে যেন পকেটের ভেতরই ব্লাস্ট করে। কৌটোমাল বলে কথা। খাঁখাঁ বালুরচরে লাল সাদার একটা অদ্ভুত তেজি গন্ধ ছড়িয়ে মালটা ফেটেছিল। মালটা ফেটেছিল নেপুর দাবনার মাংস খুবলে।

ইদানীং অ্যামনধারা ঘটনা হরবখত্ হচ্ছে। আর কখন যে একটা লড়াই লাগে তার তো কোন হিসেবনিকেশ নেই। পুলিশ, সি আর পি, সি পি এম—কার সাথে নয়! লাগলেই হল। তাইতেই কথাটা উঠেছিল : একটা আন্ডারগ্রাউন্ড নার্সিং হোম বা হসপিটাল গোছের কিছু। এ বি-ই বলেছিল কথাটা। অবিশ্যি কাজেকম্মে যে কবে হবে ভগাই জানে। মন্টু তো সেদিন তেড়িয়া হয়ে উঠল : কবে থেকে তো শুনছি হবে হবে। আর কি সব গোড়ে গেলে হবে? কথাটা মুখ থেকে খসতে না খসতেই এ বি-র ঘাড়ের রগ অসম্ভব মোটা হয়ে ফুলে উঠেছিল। বাঁ চোখের ওপর কাটা ভুরু হ্যাঁচকা টানে নীচে ঝুলিয়ে দিল।

তারপর আর কোনো কথা হয়নি. তারপর নীরব গাম্ভীর্য। ছেদ। আর ঠোঁটের খাঁজে বেঁকা হাসির ফালি।

দিন কে দিন সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে। হু হু ঝড়ের বেগে দিনগুলো বুড়ি শীতের মতো খড়ি ওড়াচ্ছে। এ বি-র এখন আসল নাম মনে থাকে না। এখন আর অশোক নয় এ বি। অশোক নামের কাঁচা আবেগটা পোড় খেয়ে, ওপরতলার নেতাদের সাথে ওঠাবসা করে, নীচের তলার দাদা হয়ে এখন অদ্ভুত হাফ নেতা এ বি। পোড়া আঙার। তেড়া হাসি। বেদম রিস্ক্। ওর ওপর কথা চলে না। কেমন একটা মিলিটারি মেজাজ। নেতৃত্বের মোহ? নাকি নেশা? নাকি নেতৃত্ব দিতে গেলে তর্জনী তোলা লাস্ট ওয়ার্ড আর ম্যান্ডেট দেওয়া একটা বেয়াড়া মেজাজ না থাকলে চলে না?

কাঁচা মাটির লোনা দেয়াল ধরে এগোতে এগোতে গোরার মাথায় প্রশ্নটা করাতের মতো চরচর করে কী যেন কাটে। নারাণদার ভেতর এসব কিচ্ছু ছিল না! নারাণদা কি এখন বিহারের গাঁয়ে পার্টির নেতা। এখন মতিহারি থানায় আছে। কেমন অদ্ভুত নাম। মতিহারি থানার নামটুকু ছাড়া গোরা আর কিছু জানে না। গোরা জানে না শীতের রাতে জারার কামড় তাড়াতে দেহাতি মানুষগুলো কতটা খড় পোড়ায়। গোরা জানে না, শিকারি মানুষের মতো আগুনের কুণ্ডের

চারধারে রুক্ষ পোড়াকাঠ মানুষের সাথে বসে নারাণদা কোন রাস্তা বাতলায়। হপ্তায় মানুষটার একদফা দানা জোটে কিনা। গোরা কেবল জানে, নারাণদা নেতা। আপ্‌সে নেতা। বন্ধুর মতো, পিতার মতো। বুকের আঁকপাঁক একটা যন্ত্রণা নিয়ে মানুষটার কাছে ডুকরে ডুকরে কাঁদা যায়। দিল সাফ করে কথা বলা যায়। নারাণদা বলে : কমিউনিস্ট হওয়া অত সস্তা নয়...আমার মা বলত, মরে নারী ওড়ে ছাই তয় নারীর কলঙ্ক নাই...আমাদের হল সেই হাল। জিন্দেগিভর যে মজুরের লড়াইকে ইমানদারির সাথে সাথ দিতে পারে সে বেটা কমিউনিস্ট।

কথাটা গোরার আকছার মনে আসে। বিপদে বিপাকে, সুখে দুঃখে আর কথাটা মনে হলেই সিনায় তাকত আসে। নারাণদা বড্ড কাছের। কাছের মানুষ। আর তাই নারাণদা নেতা। ধোঁয়ার জাল দিয়ে ঘেরা কোনো বানানো বিস্ময় নয়।

দেওয়ালটা খানিকদুর গিয়েই হঠাৎ একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। উঁচু নিচু গর্ত, আর নিবারণের হাভাতি খোঁচ পেটের মতো খোঁদল পেরিয়ে নেপুর শেলটার। ভেতরে চট বিছিয়ে ছেলেটা পড়ে থাকে। নেপুকে খাইয়ে দিচ্ছিল শান্তা। এ বি-র বোন। টিফিন কৌটোয় করে শান্তা হররোজ ওর খানা নিয়ে আসে। নেপু বলে—রাজার হালে আছি। আর শান্তার চিবুকের কালো তিলে দুর্বোধ্য এক দুঃখ শোক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : তুমি কী গো!

নেপু হাসে। হাসে আর গোগ্রাসে গেলে। শান্তার হাতে হলুদ ছোপ। বহুদিন পরে ঘরে বানানো ঝাল ঝাল তরকারি দিয়ে নেপু আশ মিটিয়ে খাচ্ছিল। শান্তা নামের আঁটোসাঁটো মেয়েটার বাদামি চোখের মণি থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

হলুদ রঙের তেলতেলে মলম নেপুর কব্জি অব্দি মাখামাখি। ডান হাতেই জখ্‌মি বেশি। তিন তিনটে আঙুল ধুঁদুলের মতো ঝুলছিল। টিফিন বাটিতেই কুলকুচো করল নেপু। সাদা খোলের চওড়া পাড় শাড়ি পরা মেয়েটা আঁচলের খুঁট দিয়ে নেপুর মুখ মুছিয়ে দিল। গোরা ততক্ষণে চটের ওপরই এলিয়ে পড়েছে। শরীরে আর বইছে না। মানুষের শরীর তো। কাঁহাতক আর পারা যায়। গোরার বুকের ভেতর এখন বরফ চাপা মাছের মতো মার স্যাতা মুখটা মাথা কুটছে। মার কথা মনে হতেই কোথায় যেন ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে। কী যেন পোড়ে। আর শরীরটা জ্বলে।

: উঃ উঃ লাগছে...

শান্তা নেপুর হাতে মলম ঘষে দিচ্ছিল, মাথাটা ঝুঁকিয়ে। ওর চুলের গোছা থেকে তেলের একটা গন্ধ ছোট্ট ঘুপচিটায় ছড়িয়ে পড়েছে। নেপু চেঁচিয়ে উঠতেই শান্তা যেন তরাস খেল। এক টানে মাথাটা তুলল। ভেতরের একটা টান। মেয়েটার ঠান্ডা চোখে গভীর মমতা। নেপুর ব্যথার সবটুকু বুকে নিয়ে মেয়েটার চোখে বেদনা। মনের মানুষটার আসন্ন বিচ্ছেদ ভেবে বেদনা। নেপুর মৃত্যু যন্ত্রণায় শান্তার উজ্জ্বল চোখে ধূসর জালি।

গোরা জানে ওরা একটা দিনও ঘর করতে পারেনি। রেড বুক থেকে উদ্ধৃতি পড়েছিল এ বি নিজে। নারী সংক্রান্ত অধ্যায় থেকে। নারীর ওপর পুরুষের শোষণ, বাড়তি একটা শোষণ-পীড়ন। সেই সামাজিক পীড়নটাকে নস্যাৎ করেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, জীবনের একটা দারুণ জরুরতকে মনে রেখে। শান্তা যেন সেদিন উপছে পড়ছিল। একটা টগবগ খুশি। আর পার্টি

কমরেডরা পরপর চা গিলে ফোয়ারা ছোটাল কথার। কে যেন বলেছিল : শান্তার কিন্তু সিঁদুর পরা উচিত, না হলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ব্যাস, বিয়ে শেষ। তারপর সেদিনই নেপু পার্টির কী একটা কাজে মালদা চলে গেছিল। শান্তা তবু টের পায়নি। কিচ্ছু টের পায়নি। বাড়ি ফেরার টাইমে কানের পাশ দিয়ে লতানো একথোকা চুল ওর গাল ছুঁয়ে হঠাৎ মুখটাকে অদ্ভুত আনমনা করে দিয়েছিল। কেমন যেন উদাস। আউলবাউল।

নেপুর মাথার কাছে একটা জলচৌকি। রাসের মেলা থেকে শান্তা এনেছিল, দিন কতক আগে। ওষুধ আর খানকতক বই রয়েছে। একা থাকলেই বই নিয়ে লড়ে যায়। আজকাল অবিশ্যি এসব পাঠই উঠে যাচ্ছে। বইপড়া দিগ্‌গজ কমিউনিস্ট তো অনেক দেখা গেছে! তত্ত্বের কচকচির জামানা আর নেই। এখন কাজ। অ্যাকশন। এ বি বলে—প্রয়োগ। নেহাত নেপুর অবস্থা কাহিল তাই। ওর অবিশ্যি একটু বাতিকও ছিল। ঘরের কোণে পোস্টারের সরঞ্জাম। লাঠির মাথায় প্যাঁচানো ঝান্ডা। আর মাটির ভাঁড়ে খুনের মতো রঙ। দেয়ালে রঙের আঁচড়। দলা মোচড়া কাগজ।

নেপুর মুখটাও কাগজের মতো ফ্যাকাসে। আর ফুলো ফুলো।

: ঠুঁটো হয়ে পড়ে আছি, এর চেয়ে মরা ভালো!

: বাজে কথা না বলে ওষুধটা খাও। রাতের খাবার ভাই নিয়ে আসবে। শান্তা রুক্ষু চুলের গোছা দারুণ জলদি পেছনে ঠেলে দিল।

মাত্তর একবার নেপুর চোখে চোখ রেখেই মেয়েটা হাঁটা ধরল। হাজার গলিঘুঁজি ঘুরে সারা দিনে একদফা আসে। ও কাছে থাকলে যে মানুষটার বিপদ। নির্ঘাত ফেঁসে যাবে। আর একবার ফেঁসে গেলে যে কী হবে শান্তা ভাবতে পারে না। শান্তা চলে গেছে। অথচ আলপনার মতো ভিজে ন্যাকরার গোলাকার দাগটা এখনও ফুটে আছে। মেয়েটার হাতের চিহ্ন। চিহ্নত্‌। আর সেদিকে চোখ মেলে, হঠাৎ নেপু উষ্ণ হয়ে উঠল : অন্ধ্রে সাড়ে তিনশো গ্রামে গরিবরাজ কায়েম হয়েছে...

নেপুর চোখে একটা পিঙ্গলা ভাব আছে। ভিয়েতনামের কথায়, এ দেশের উপজাতির বীরত্বে সেই চোখ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ফুলো ফুলো সারাটা মুখ জুড়ে এক দুর্মর বাসনা ঘামের মতো ফুটছে। নেপুর মুখটা ক্রমশ ফুলছে। আর ফিকে হলুদ রঙ জাগছে সারাটা মুখ জুড়ে।

: বিল্ডিঙে গেলে এ বি-কে পাওয়া যাবে?

: যেতে পারে।

: চলি তাহলে।

নেপুর স্ফটিক চোখের তারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। পাথর। আর কথাটা বলে বুড়োও কেমন ছটফট করতে লাগল। এরপর নেপু বিলকুল একা। কারো মুখে আর কথা জোগাচ্ছে না। একফালি বাতাস পোস্টারের কাগজটাকে ঘরময় দৌড় করাল। কেমন একটা খস খস শব্দ। অদ্ভুত একটা অসোয়াস্তি। ফের নেপুর মুখেই বোল ফুটল : এসো আবার। আর বুড়ো একবার ঘাড়টাও কাত করতে পারল না।

বেলেঘাটা সি আই টি বিল্ডিং। সংক্ষেপে বিল্ডিং। নেপুদের চটপট কথায় বিল্ডিং। শর্টকাট করে নিয়েছে। নাহলে এত লম্বা একটা কথা বলার টাইম কোথায়। সেই টাইমে নির্বাক দেয়ালগুলোর বুকে বোল ফোটানো যায়। তরতরিয়ে স্প্রিঙ কোম্পানির চোঙের মাথায় ঝান্ডা বেঁধে দেওয়া যায়। টানটান করে। মজদুর কা ঝান্ডা। দু হাতের থাবায় দুটো হেভি মাল নিয়ে ভ্যান রুখে দেওয়া যায়। দালাল হালাল করা যায়।

বিকেল উতরে গেছে ঢের আগে। সারা গায়ে ওয়ালিঙের ভুষোকালি লেপটেসাপটে বেলিয়াহাট্টায় এখন গাঢ় সন্ধে। গোরা একটা সিগারেট ধরাল চলতির ওপর। বুকের খাঁচা ঠেসে ধোঁয়া নিয়ে বাসস্টপের দিকে জলদি চলল। মন্টু আর বুড়ো বিল্ডিঙের ফাঁকা ঘরটায় জাঁকিয়ে বসেছে এতক্ষণে। ঢিলে হয়ে গতরটাকে একটু জিরেন দিচ্ছে। ঘরটা এখন ওদের দখলে। রাতজাগা মিটিং আর বেআইনি কাগজপত্তর রাখার ঠেক। খানিক বাদেই এ বি ফিরবে। নানান কথা গোরার মাথার ভেতর ঝিঁঝির ডাক ছাড়ছে। ফয়সালা। গোরা আজ একটা ফয়সালা করবেই। এসপার-ওসপার যাহোক। আজ রাতেই। কথাটা আঁকড়ে ধরার জন্যেই যেন চোয়াল ভেঙে ধোঁয়া টানল। আর বুকের ভেতর ধোঁয়া নিতে নিতে হাতের আঙুলগুলো আপ্‌সে নেতিয়ে আসে। কোমরে তাকত থাকে না। কোথায় যেন একটা দারুণ ঘাটতি থেকে গেছে। কোথায় যেন একটা খাঁ খাঁ জ্বলাপোড়া খরা মাঠ। কোথায় যেন দারিদ্রের বিশাল পেট। গোরা টের পাচ্ছিল সুকু, নিবারণ সব কেমন তেতে উঠেছে। ভীষণ উত্তপ্ত। উত্যক্ত। সামাল দেওয়ার টাইম নেই আর। তা ছাড়া ও বলবেই বা কী—ইস্কুলে পেটো মারা ঠিক না...কিংবা ব্যক্তিহত্যা সন্ত্রাসবাদ...বিদ্যেসাগর লোকটা খারাপ ছিল না যাই বলিস...। এতে কী হয়! প্রচণ্ড বন্যায় খরকুটো। এতে কিছু হয় না। কিচ্ছু না। সোনা, সোনার নামটাই এখন যথেষ্ট। কমরেড সোনা। আমার কমরেড...। হয়তো কান্নার একটা কাঁপা কাঁপা ঢেউ তারপর দাঁতে ফেলে পিষবে। এসব না হয় ভুল, কিন্তু তারপর? এখনও যে গোরার ঘাড়ের কাছে সোনার উষ্ণ নিঃশ্বাস: গোরাদা! তুমি না কমুনিস! আর এমন একটা কথা মনে হলেই গোরার সারাটা শরীর অসহ্য জ্বালায় অস্থির হয়। কেন? কেন ও সব জানল না? রাজনৈতিক পরিভাষার খোলস খান খান করে ভেঙে কেন ও সত্যটা আবিষ্কার করতে পারল না।

বাসগুমটির নজদিক আসতেই আবার হুট করে মার কথাটা মনে পড়ে যায়। মার মুখটা যেন বাতাসে ভাসতে লাগল। আর গোরার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল খুন। বাসগুমটির কাছে দাঁড়িয়ে ও বহুদূর অব্দি দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল। চোখ দুটো স্থির। গোরা মিনুর জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। কে জানে মেয়েটা কি সংবাদ আনে।

'অপেক্ষা', শব্দটা যেন ভারী পাষাণ। বুকের ওপর চেপে বসে। বুক ভরে বাতাস টানা যায় না। হঠাৎ যেন সময়টা জ্বরোরুগির মতো ভারভার হয়ে ওঠে! বাসের ফুটবোর্ডের কাছ থেকে একটা ছাড়া বেণী কিছুতেই দোলে না। আর আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা গোরার চোখ দুটো অব্দি গিলে ফেলল। এখন স্থির চোখের তারায় বিল্ডিংটা দুর্গের মতো জাগছে। বিল্ডিঙের চারপাশে পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে আঁকাবাঁকা আঁচড়ে বেলিয়াহাট্টার হিম্মত। পাঁচিলের পেছনে খাল। খাল না পরিখা? আর মুখের কথাটা সরতে না সরতে সারাটা তল্লাট জুড়ে কারফিউ।

কারফিউর ভেতর শিশুর কান্না। কারফিউর ভেতর বেলিয়াহাট্টার নাঙ্গাভুখা মজদুর। মজদুরের খালি হাত। থ্রি নট থ্রি দানার মালায় শহিদ। আর গোঙা মানুষ। পুলিশ ভ্যানের খচরা শব্দ। জঙ্গ। কারফিউ আর গুলি। কারফিউ আর পেটো বৃষ্টি। বৃষ্টির মতো পেটো।

রাতবিরেতে পচাখালের বুকের বদগন্ধ খাবলে পেটো পড়ে। এখন সন্ধে। রাতের আশঙ্কা নিয়ে সন্ধে আসে। রাতের বেলিয়াহাট্টায় রি রি রাগ আর বুকের যন্ত্রণা। শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যার পর রাত আসে এক আশ্চর্য বাঁধা নিয়মে।

বাস থেকে নেমেই এক ঝটকা মেরে মিনু বেণীটা পিঠের ওপর ফেলল। ওর লাল পাড় শাড়িটা গোড়ালি ছাড়িয়ে লুটোচ্ছে। মিনু তরতরিয়ে হাঁটছে। চাপা নাকের তলায় অসহ্য উত্তেজনা আর ক্লান্তির ঘাম। আর সেদিকে চোখ পড়তেই দপ করে কী একটা কথা মনে পড়ে যায়। ভালোবাসার কথা। মিনুর ভালোবাসা। আর গোরা দেখল মেয়েটা দারুণ ঘামছে। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম নয় যেন অশ্রুর বন্যা বইছে।

গোরা খানিকটা এগোতেই মিনুর নাগাল পেল। আর অজান্তেই ওর হাতটা চেপে ধরল। এমনভাবে, যেন কোনোদিন ছাড়বে না। যেন, একটা মজবুত সাহারা। যেন, কোনো ভয়ডর নেই। যেন দাঁত দিয়ে বিপদআপদ ফেঁড়ে ওরা এগিয়ে যাবে। যেন হাতের চাপে, শক্ত একটা চাপে, গোরা অনেক কথা বলতে চাইল : এখনও মরিনি। বেঁচে আছি মিনু। আর বেঁচে থাকার মানেটা তোর চেয়ে বেশি কে বোঝে! কিছুই বেফয়দা যাবে না! কিচ্ছু না! তুই কাঁদতে পারবি না মিনু, কিছুতেই না।

আর মিনু একটু ফোঁপাল না! একটুও না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কোনো ভয়ঙ্কর বেগ দমন করল না : হলুদ বেটে শেষ করতে পারব না জীবনটা। আমার কাজ চাই। কাজ দিন গোরাদা। চব্বিশ ঘন্টা।

মিনু!

বলুন।

তুই ঠিক সুস্থ নয় এখন।

দিব্যি চান করেছি, খেয়েছি, ধীরে সুস্থে এতটা রাস্তা এসেছি, আর আপনি বলছেন...

তবু ক-টা দিন যেতে দে।

নাহ্। তা হয় না।

শোন পাগলামি করিস না।

জোর করে দেখছি পাগল বানাবেন। সোনাদা আপনাকে কিছু বলেনি? ঘর ছাড়ার কথাটা আজ নতুন নয়।

গোরা লক্ষ করল মিনুর চাপা নাকের নীচেই কেমন একটা দাগ। একটা রেখা। একেবারে কেটে বসে গেছে। অস্পষ্ট অথচ দৃঢ়। অতিশয় সূক্ষ্ম একটা রেখা। ভীষণ সূক্ষ্ম একটা অনুভূতি।

অনুভূতির যন্ত্রণা।

আপডাউনের স্টেটবাসগুলোর যন্তরপাতির ঘটঘট ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দের ভেতর দিয়ে ওরা

চলেছে। মিনু যেন রণপা-য়ে হাঁটছে। ঝড়ঝাপটার খসখস শব্দ নিয়ে আঁচলটা উড়ছে। আঁচলটা উড়ছিল পতাকার মতো। মিনু নামের মেয়েটার চিবুক ছোঁওয়া কাঠিন্য। আঁচলের খুঁটে ঝড়ের ঝাপটা। আর নিরালা রাস্তা। রুক্ষ চুলের ভেতর পাগলের মতো গোরার আঙুলগুলো কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আর কোনো কথা নেই। পায়ে পায়ে ওরা বিল্ডিঙের দিকে এগিয়ে চলল, মিনুর হাতটা তখনও গোরার মুঠোর ভেতর। হঠাৎ মিনুর গলা চিরে চিকন একটা আওয়াজ উঠল : তখন আপনি ছিলেন? ওকে যখন...

: হুঁ।

বেলেঘাটার মাথার ওপর এখন নির্মেঘ আকাশ। স্বচ্ছ চোখের মতো। আকাশে তারা। তারার মিছিল। মিছিল নয়, যেন আলপনা। শান্তা নামের মেয়েটার হাতের গুণ। আর এমন একটা আকাশের নীচে খামোকা ওদের দম আটকে আসতে লাগল। গোরার কপালের রগ যেন ছিঁড়ে যাবে। বুকের পাঁজরা ভেঙেচুরে কত কথা ছিটকে আসতে চায়। অথচ ওদের মুখে শব্দ নেই। কথা নেই।

কখন যে বিল্ডিঙের সিঁড়ি ধরেছে, দোতলার বাঁ-হাতি দেওয়ালে 'বিপ্লব জনতার উৎসব' লেখাটায় আনমনে চোখ বুলিয়েছে, তিনতলার চটলাওঠা, ধুলোর গন্ধভরা ঘরটার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে, কিছুই খেয়াল নেই। মিনু বসেছে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। বিলকুল সোনার মতো। তবে চোখ দুটো ভাসিয়ে দেয়নি। চোখের কোন চিরে তাকিয়ে আছে। কিছুই গলে যেতে দেবে না। যেন কোনো ফাঁক রাখতে চায় না। মিনুর দিকে ঝট করে তাকিয়েই বুড়োর কাঁচা ঘা দপদপিয়ে উঠল। পোড়ানি জাগল। দু-হাতের থাবায় ও শব্দ করে মুখটা ডলে নিল। বুড়ো ক্ষেপলেই অমনি করে। মুদ্রাদোষ।

টুটাফাটা শতরঞ্চি! আর চটের টুকরা টাকরা। আর মাটির ভাঁড়। একগাদা লিফলেট এক কোণে পড়ে আছে। আর ধুলোর গন্ধ। ওরা সমানে বিড়ি খাচ্ছিল। ধোঁয়ার ঘন একটা সর পড়েছে। এ বি-র খাবলা খাবলা দাড়ি আর কাকের বাসার মতো ঝাঁকড়াচুলো মাথাটা কেমন আবছা আবছা লাগছে। মিনুর মুখটা অব্দি আবছা। হঠাৎ মিনু মুখ খুলতেই বাতাসের দাপটে ধোঁয়া উড়িয়ে তাড়িয়ে কথাটা জমাট বাঁধল : একটা শেলটার ঠিক করে দিন শুধু। মন্টুর ক্ষুদে চোখ কথাটা শুনে দপ্ দপ্ করছে। এ বি চোখ বুঁজে ছিল। অভ্যেস মাফিক বিড়িটা শানে ঘষতে ঘষতে ভীষণ ঠান্ডা গলায় কী যেন বলল : কেন এখানে থাকা যাবে না। এই আমাদের মতো?

কেমন একটা রহস্যের হাসি জাগল। অথচ এ-বি-র পুরু ঠোঁট একচুল নড়েনি। সাদা ঝলক খেলিয়ে একটাও দাঁত বেরিয়ে আসেনি। তবু হাসি, খাবলা দাড়ি আর গোঁফের ভেতর হাসির একটা চিকন রেখা এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেল। এ বি-র ঠোঁটে নিকোটিনের হলুদ ছোপ। পাজামা ফাঁক হয়ে রগজাগা লম্বাটে পায়ের চেটো দুলছে। মিনু জড়িয়ে জড়িয়ে বিড়বিড় করল : কিন্তু আমি যে মেয়ে।

: কমরেড নির্মলা?

: কী জানি!

এ বি-র খাড়া নাকের ডগ জেগে আছে। নির্মলার নামটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। রহস্যের বাঁকাচোরা হাসি আর নেই। এখন কঠিন। অদ্ভুত শক্ত একটা ভাব। অন্ধ্রপ্রদেশের নির্মলা। নির্মলা মেয়ে। নির্মলাকে নিয়ে ওরা গান বেঁধেছে। বীরত্বের গাঁথা। তবু মিনুর বুকে একটা 'কিন্তু' খচ খচ করে। সোনার মুখে মিনু সব শুনেছে। একেবারে শুরুর দিককার কথা মনে পড়ে যায়। আর বিল্ডিঙের তেতলার ঘরে বসেও মিনু হঠাৎ কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়।

আগুনের হল্‌কা ছুটছিল সেদিন। ওরা একফোঁটা শীতল ছায়ার জন্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছিল...

জানো ওরা তোমাকে ধর্ষণ-ও করতে পারে?

মিনুর ছোট হাতখানা সোনার ঠোঁটের ওপর কী যেন আটকাতে আকুল হল : চুপ করো, চুপ!

: ভয় পাচ্ছো!

: নাহ্ ভয় কীসের।

: জানো, ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য কত মেয়ের ইজ্জত নিয়েছে...কিন্তু তারা কি অসতী হয়ে গেছে? পরাধীন দেশের মেয়েরা স্বাধীনতার জন্যে লড়লে তবেই সতী হয়। নাহলে সারাটা দেশ যদি লম্পটের কব্জায় থাকে কী করে আর সতী হবে বলো!

: তুমি চুপ করো।

: কেন? আমি জানি, সব জানি।

তারপর ঠা ঠা রোদ মাথার ওপর নিয়ে ওরা কতটা পথ হেঁটেছিল হুঁশ নেই। ওদের দুজনের ছায়া পিচের পথে ক্রমশ লম্বা হচ্ছিল। আরো লম্বা।

চোখের তারায় প্রশ্ন ঝুলিয়ে এ বি মিনুর দিকে সটান চেয়ে আছে। হাসিটা অবহেলা অচ্ছেদ্দার দাড়ির ভেতর আবার একটু একটু করে ফুটে উঠছে। একটু একটু করে এ বি-র মুখে কেমন একটা ভাঙচোরের গোঁয়ার প্রতিজ্ঞা আর অন্ধবিশ্বাস জাগছে। ধোঁযার পর্দা ফাঁসিয়ে এ বি-র মুখ দেখা যাচ্ছে। আর একঝলক সেদিকে তাকিয়ে নানান কথা গোরার মনে উঁকিঝুঁকি মারে। মিনুর একরত্তি নাক, মুখের অসহায় কোমল ভাব এসব দেখে গোরা ভাবল : ও এখনও বড্ড কাঁচা। ওর সাথে কি কমরেড নির্মলার তুলনা চলে? কমরেড নির্মলা গিরিজন মেয়েদের নিয়ে জোট বেঁধেছিল। আর মিনু? হ্যাঁ, না হয় পঞ্চাদ্রির মতো সোনাকেও ওরা হত্যা করেছে! তাতেই কি মিনু নির্মলা হয়ে উঠতে পারে?। মেয়েটা এখনও পোড় খাওয়া খাঁ খাঁ জীবন দেখেনি। ভুখ দেখেনি। সেরেফ্ কিতাবের আদর্শ। আর শোনা কথা। আর যন্ত্রণার তাকত।

শীতের রাত। জারার রাত। একেবারে দাঁত বিঁধিয়ে দিয়েছে। বাইরে চাকার শব্দ। আর তেতলার আস্তানার কান খাড়া হয়ে ওঠে। হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপটা খেলে গেল, ঘরময় লিফলেট উড়িয়ে। মন্টু গভীর, জমাট, বোবা ভাবটা ফালা ফালা করে দিল : কমরেড মিনুর জন্যে শেলটারের ব্যবস্থা করাটাই ঠিক। আনেবানে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

: হুঁ।

এ বি শোয়াস নেওয়ার আগেই বুড়ো মিনুকে জিজ্ঞেস করল : গোরাদার মা...মাসিমাকে ছেড়েছে?

: নাহ্। গোরাদাকে না পেলে ছাড়বে না বলেছে।

: কোথায় যেন একটা দারুন গলতি হচ্ছে...দারুণ।

এ বি আর সামাল দিতে পারে না, পেটের নাড়ী মুচড়ে কথা ফোটে : গলতি?

: আমাদের কথায় কাজে...

: নাকি পেটিবুর্জোয়া ভয়ভীতি দ্বিধাদ্বন্দ্ব?

ঘরের ভেতর ওরা মানুষ মাত্র পাঁচটা। অথচ নিঃশ্বাসে বাতাস গরম। শোয়াস নেওয়ার জো নেই। বুড়ো, এ বি-র কথা শেষ হওয়ার পর একটা শুখা ঢোক গিলল। মন্টু মেঝেতে চোখ গেঁথে রেখেছে। এ বি গলাটা যদ্দুর সম্ভব নরম করে নিল : বই পড়া বিদ্যে আর তত্ত্বের কচকচির জামানা নেই। সশস্ত্র সংগ্রামের যুগ এটা...

নিজের কথাটাকে খাড়া করার জন্যে এ বি কোত্থেকে কোত্থেকে কোটেশন আওড়াচ্ছিল। ততক্ষণে গোরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। কত কথা, কত প্রশ্ন বুকের ভেতর ডেরা বানিয়েছে। এখন হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাড়াহুড়োয় কথা জড়িয়ে যায়, বুকটা গরম হয়ে ওঠে।

: দেশের নব্বইভাগ লোককে এক সারিতে না আনতে পারলে বিপ্লব করা যায় না।

: সি পি এমের যুক্তি!

: নাহ্। আমি শুধু সংগঠনের কথা বলছি না। বলছি কী সেই স্লোগান— যা তুললে কলের মজুর ক্ষেতের কিষাণ সবাই গলা মেলাবে?

: নিবারণ ওয়ার্কার নয়?

: হ্যাঁ ওয়ার্কার। তবে ছাঁটাই ওয়ার্কার। হতাশাগ্রস্থ।

: আমি আর একটাও কথা বলতে চাই না। অন্য কেউ এভাবে পার্টির নিন্দা করলে..

: জানি কী হত। তবে আমি চাই একটা ফয়সালা।

মিনুর ছোট্ট কপালের ওপর রুক্ষু থোকা থোকা চুল। বেঁকা বেঁকা চুল। চোখের গহরা কালো রঙ যা দেখা যাচ্ছে না। চুলের গোছা ওর ফাটা চোখের ওপর বাতাস পেয়ে নড়ছে। চুলের ফাঁকফোকর দিয়ে মেয়েটা ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন একটা বিস্ময়, একটা ভয় মিনুকে গিলছে। একটু একটু করে। ও তো আর অতশত বোঝে না। এ বি-র কথার চোখা ধার ওকে টানছে। গাঁটাল লিকলিকে আঙুলের ওঠানামায় কি এক রহস্য আছে। গভীর রহস্য। কোথায় যে এর শেষ মিনু জানে না। ও কেবল জানে ডুবতে পারলে রক্ষে। ডুবে যেতে পারলে আর কিছু মনে থাকবে না, ও জানে সোনার হত্যাকারী এখনও জিন্দা আছে। আর যতদ্দিন ওরা জিন্দা থাকবে ততদিন...। ততদিন চোয়ালের হাড় ঠেলে মেয়েটা কী যেন করবে। এ বি-র মতো। ঝড় ঝাপটার মতো। বন্যার মতো। আগুনের হলকার মতো।

খানিক আগেই একচোট তর্ক হয়েছে। তার রেশ এখনও কাটেনি। কেমন একটা গরম ভাপ ছোট্ট ঘরটায় ধামসে বেড়াচ্ছে। গোরা হঠাৎ হিমঠান্ডা এক ধৈর্য নিয়ে বিড়বিড় করল : সারাটা দেশের মানুষকে ধীরে সুস্থে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এ বি-র লম্বা ঘাড় কথাটা শোনামাত্তর

ধনুকে ছিলা পরিয়ে টানার মতো বেঁকতে লাগল যেন এখুনি একটা ফনফনা তির ছুটবে। সাঁ সাঁ শব্দে। আর সারাটা দেশ গজরাতে থাকবে। গরজে গরজে উঠবে। একসময় মুখের ধার কমতে লাল। মোটা ঠোঁট তুবড়ে আঁকাবাঁকা হাসির একটা রেখা পাতলা দাড়ির ভেতর হারিয়ে গেল। গোরার কথার জবাব দিল না এ বি। কেবল হাসিটা লেগে থাকল ঠোঁটের খাঁজে। এক আশ্চর্য স্পর্ধা আর কঠিন বিশ্বাস নিয়ে। মন্টুর গনগনা লাল ফুলকির মতো চোখ দুটো থির থাকতে পারছে না : আচ্ছা কমরেড এ বি আপনার কি মনে হয় আমরা বিপ্লব চাই না...কত রিক্সের ভেতর আমরা একসাথে থেকেছি, ঘেরাও ভেঙে রাস্তা বানিয়েছি, মিছিলে জঙ্গের নাড়া লাগিয়েছি...

এ বি-র ধূসর চোখ দুটোয় সাড় নেই : তাই কি?

: কথাবার্তার ধরণটা পাল্টানো দরকার। আমরা কি আপনার শত্তুর? পার্টির শত্তুর?

: আমাদের কমরেডরা জান বিছিয়ে রাস্তা বানাচ্ছে, সশস্ত্র বিপ্লবের লকলকে আগুনের ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটছি, এখন কথাবার্তা কাজকর্মে যে কেউ পার্টির বিরোধিতা করবে সেই শত্তুর। প্রতিবিপ্লবী।

ঝট করে গোরার ঝাঁকড়া চুলো মাথায় একটা দমকা বাতাস আটকে গেল : আমরা প্রতিবিপ্লবী (ওর যেন শোয়াস নেওয়ার তাকতটুকুও নেই)!...লাগাম ছাড়িয়ে যাচ্ছিস...আরে সি পি এম-কেও তুই প্রতিবিপ্লবী বলতে পারিস না।

: তোর কাছে রাজনীতি শিখতে হবে!

বুড়োর এতক্ষণ সাড়া শব্দ ছিল না। কেমন যেন ঝিম মেরে বসেছিল। পোড়া একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে মেঝেতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বিড়বিড় করল : এটা আলোচনার পদ্ধতি নয়।

মিনুও বুক ভরে নিশ্বাস নিল :হ্যাঁ গোরাদা তোমরা যদি এমনি পাগলের মতো কথা বল। তাহলে...

মিনু আর কথাটা শেষ করতে পারল না। কীসের এক গাঢ় বেদনা সাঁড়াশি দিয়ে মেয়েটার গলা চেপে ধরল। মিনুর চোখে টল টল জল। জলের ফোঁটা। আর গোরা হঠাৎ মাথা গরম করে ফেলার জন্য কেমন মুষড়ে পড়ল। মোমবাতির হালকা আলোয় ঘরের ভেতর মানুষগুলোর মুখ আবছা। কুয়াশা কুয়াশা। এদের মুখের ভাঁজগুলো আর মালুম হয় না।

মিনুর কান্নার মতো গলায় কথার অজস্র ফুল ফুটতে লাগল : তোমরা মানুষগুলোকে রাস্তা দেখাবে...বোবা মানুষগুলোর মুখে বোল ফোটাবে...এককাট্টা লড়াইর স্বপ্ন, মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন। পাগল হয়ে তারা বিষের ঝাড় উপড়ে ফেলবে। তছনছ করে দেবে জল্লাদের দেশ। ঝান্ডা গেড়ে বলবে : এদেশ আমার, এখানে খুনির জন্যে এক ইঞ্চি জায়গা নেই...তোমরাই যদি খেয়োখেয়ি কর...

মিনুর মুখটা লাল হয়ে উঠল। কথাটা লজ্জাভাঙার লজ্জায় আর কতটা উত্তেজনায় কে জানে। তবে কথাগুলো বলার সময় ওর বুকে ঢেঁকির পাড় দিচ্ছিল। তবু, তবু কথাগুলো যে ওকে বলতেই হবে। না বলে ওর রেহাই নেই। আর বুক খালি করে সব উগরে দিয়ে

মেয়েটার চোখ কী এক প্রত্যাশায় গোরার মুখে বিঁধে থাকে। অদ্ভুত একটা দোটানায় পড়ে গোরা হাঁস ফাঁস করছিল : কিন্তু... খেয়োখেয়ি নয়...তুই বুঝতে পারছিস না মিনু!

: নাহ্ দরকার নেই।

: তুই কেবল আবেগের ওপর খুঁটি গাড়ছিস।

: আর তোমরা?

: কী? আমরা কী?

: তোমরা শহিদ কমরেডের মৃতদেহ সামনে রেখে ভাবতে বসেছ কোন দিকে যাবে। তোমরা মানুষ!

গোরার মুখে আর কথা জোগায় না। কী হবে ছাই কথা দিয়ে। মিনু অব্দি ভাবছে গোরা ভয়ডরে বেসামাল। আরশোলার মতো তাই শুঁড় নাড়ছে। দফায় দফায় কলজেয় ছ্যাঁকা লাগে। এক একবার মনে হয় পাগলের মতো ফাতা ফাতা করে সব ছিঁড়েখুঁড়ে দেখায়—দ্যাখ দ্যাখ আমি ভয় পাইনি, একসাথে দু-তিনটে অ্যাকশন করে ফ্যালে। মোমবাতির মরা আলো, ধুলোর একটা ঝাঁঝাল গন্ধ, আর হালকা বাতাসে লিফলেট ওড়ার খস খস শব্দের ভেতর দিয়ে গোরা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল। বড্ড একা লাগে। এ বি-র লম্বা ধাঁচের মুখখানা মিনুর জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো চোখ, আর মন্টুর কপালের কাটা দাগটা ছাড়িয়ে কোথায় যেন ও চলেছে। বেহুঁশভাবে। গোরার মাথাটা কণ্ঠার হাড়ের ওপর নেমে আসছে। আর অসহ্য এক বেদনায় ঠোঁট কাঁপছে : মিনু...মিনু...মিনু তুই ভুল বুঝছিস বোন...

এ বি-র মুখটা সবে ফাঁক হয়েছে, কী একটা মারাত্মক কথা বলতে যাচ্ছিল আর ঠিক তখন নিবারণ আর সুকু কাঁধের এক ধাককায় দরজাটা খুলে ফেলল। সাথে সাথে এক খাবলা বাতাস ঘরের ভেতর ধুলোর ঝড় তুলল। বাইরে ঝোড়ো বাতাসের মারাত্মক দাপানি। একটানা সোঁ সোঁ শব্দের ভেতর এ বি-র গম্ভীর গলা : কাল দুপুরে সবাই থাকবে তখনই কমরেড গোরা যা বলার বলবেন, সেখান থেকে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাতে যদি আমাদের ফারাক হতে হয়, তাই হব।

সুকুর পাজামায় রক্তের ছিট। মুখের ভাব সাধুসন্তের মতো। চোখের জমি ফটফটে সাদা। আর তৃপ্তি। টইটুম্বুর তৃপ্তি। নিবারণ যেন আরো কাঠ কাঠ হয়ে উঠেছে। সুকু পাজামা ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ গান ধরল। আপন মনে :

জন্মিলে মরিতে হবে রে...এ...জানে তো সবাই...

সুকু পাজামা ছেড়ে লুঙিতে গেরো দিল। আর নিবারণ ততক্ষণে গড়গড়িয়ে বলে চলেছে প্রতিশোধের এক উত্তেজক কাহিনি। তলপেটে ছুরি ঢোকার আগে কনস্টেবলটার মুখ বাঁচার আকুল বাসনায় কেমন বেঁকে তুবড়ে গেছিল। নিবারণ, সুকু আর এ বি-র কথাবার্তায়, আঙুল নাড়া ব্যাখ্যায় মিনু থেকে থেকে চাঙা হয়ে উঠেছিল। থেকে থেকেই ওর মুখে একটা ঝিলিক খেলছিল। নাকের পাটা ফুলছিল। মেয়েটার বুকের ভেতর তোলপাড়।

কথাটা বলেই সুকুর গোলগাল মুখখানায় প্রশান্ত হাসি জাগল। ওর মুখে এক গভীর শান্তি। যেন এরপর মন্ত্রেও জ্বালা যন্ত্রণার অবসান। মিনুর গলায় দরদ : পেটে কিছু গেছে?

: নাহ্।

: আগে খেয়ে এসো।

মিনু এখন জননীর মতো।

আর ওরা বেপরোয়া হাসল : তাহলে জন্মের খাওয়া খেতে হবে, বেলেঘাটার মাটি খুঁড়ে খোঁজ চালাচ্ছে।

গোরার যেন জিভ খসে গেছে। মুখে একটা বাক্যি নেই। এই ছেলেগুলোকে ছেড়ে ও কোথায় যাবে! কোন চুলোয়? মন্টু এক নাগাড়ে আঙুল মটকে চলেছে। আর নিবারণ বুড়োকে খোঁচাচ্ছে, কি এভাবে আর কদ্দিন চলবে?

কথাটা ছ্যাঁকা দিল। মাথার ভেতর কাঁচা আগুন। ঠোঁটের আগায় কী একটা কথা এসে যায়। মাথাটা মেঝেতে ঝুঁকিয়ে গোরা সামলে নিল : সোনার বদলা এভাবে নেওয়া যায় না। আর সোনা তো বদলার জন্যে লড়েনি, ও লড়েছিল সাচ্চা আজাদির জন্যে। তোরা আসলে সহ্য করতে পারছিলি না তাই।

: কেন, হজম করব কেন? আমরা কি লুলা নাকি।

সুকুর বেজায় শান্ত মুখটায় হঠাৎ ছুরির ধার খেলতে লাগল : অ্যাতদিন তোমায় কিছু বলিনি, আর সহ্যি করব না। লড়াই আর জঙ্গের ভেতর আমরা বাস করছি। তুমি ঘুণ ধরাতে চাইছ।

মিনু কী একটা কথা বলে সব ঠান্ডা করতে চাইছিল। সমঝোতা। আর ওদের জিভে এখন অদ্ভুত শান। জানটা মাটিতে আছড়ে ফেলে, স্নেহভালোবাসা—এসব মোহটোহ ছুঁড়ে ফেলে, প্রতিশোধের নগদ হিসেব চুকিয়ে, সব নিষ্ঠুর তপস্বী।

আধলা ইটের ওপর মোমবাতির টুকরো। আধপোড়া, গলা। মোমবাত্তি। গলে গলে কেমন ডেলা পাকিয়ে উঠেছে। থেকে থেকে পলতে পোড়ার একটা শব্দ হচ্ছে। ফট্, ফট্ ফট্। আর পানির মতো টলটল মোম গলছিল। একটু আগের সেই গরমিটা এখন আর নেই। এখন তেমন তাত নেই। এ বি পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে মেঝেতে বিছিয়ে ধরল। মেদিনীপুর জেলার হিজিবিজি খোপকাটা মানচিত্রের একটা জায়গায় মোমের আবছা আলো ঠিকরে দপ্ দপ্ করে উঠল। যেন আগুন লেগেছে। নিবারণই মোমটা উঠিয়ে ধরেছিল। নিবারণের অন্তরের মতো খাড়া নাকটাই এখন জ্বলছে। মানচিত্রে ওরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ বি-র সরু আঙুল ম্যাপের চিকন রেখা ছুঁয়ে গড়গড়িয়ে চলেছে! আর রূপোর জলের মতো গলা মোম পড়ে ম্যাপটার বুকে ছিট ছিট দাগ ফুটছে মুক্তোর মতো।

'এই ...হল খড়গপুর স্টেশন...বাসরুট...আর মেদিনীপুর টাউন...এদিকটায় জঙ্গল...সেই বিহারের ভেতর দিয়ে এক্কেবারে শ্রীকাকুলাম অব্দি চলে গেছে...সুতরাং...।'

সুতরাং সুকুর সাল্লা মুখে বিপ্লব ফেটে পড়বে। সুতরাং নিবারণের আলগা হাতের আঙুল গুটিয়ে শক্ত সমত্থ মুঠো। সুতরাং এ বি-র কটা দাড়ির পাতলা উদাস জঙ্গলে রহস্যের হাসি। লাল ঘাঁটির বাসনা। ইচ্ছে। তাড়া। কীসের যেন একটা তাড়া ওদের পুড়িয়ে পুড়িয়ে শিককাবাব বানাচ্ছে।

এ বি-র কথার মাঝখানে মোমবাতির পলতেয় ফের শব্দটা হল। ফর ফর করে পেটফাটা একটা আরশোলা ওড়ার চেষ্টা করে ম্যাপটার ওপর ছিটকে পড়ল। আর শব্দটা হল। মাছের পটকা ফাটার মতো একটা বিদিকিচ্ছিরি শব্দ। এ বি-র চোখ দুটো কেমন ধূসর দেখাচ্ছে। মুখটা দিনকেদিন ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে। মোমবাতির ঝিম আলোয় এ বি-র মুখখানা রক্তশূন্য লাগছে। যেন শরীরটা নিংড়ে সব রক্ত বের করে নিয়েছে। এখন ছিবড়ে সার। ভিজে কাগজের ডেলার মতো চোখ দুটোয় এক অসহ্য ব্যাকুলতা—বিপ্লবের কাজ দ্রুততর...। কথাটা আর শেষ করতে পারে না।

অন্ধকার হাঁ করে গোটা তল্লাট গিলে বসে আছে। বেলিয়াহাট্টায় আজ একটাও তারা নেই। গোরা রেলিঙে আলগোছে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। ওদের কথার টুটাফাটা অংশ ছিটকে কানে আসে। অথচ অন্ধকারের সমুদ্দুর ঠেলে ওর ক্লান্ত চোখ দুটো ডুবুরির মতো কীসের যেন খোঁজ চালাচ্ছে। বেশ সাফসুফ বোঝা যাচ্ছে এবার সত্যিই আলাগ হতে হবে। রাতের পর রাত একসাথে জেগে, পুলিশের গুলির মুখে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যুঝে, ওয়ালিঙের ভুষোকালি গা-ময় লেপ্টে, মুখের চুসকি সিগারেট খেয়ে, ইনকিলাবের নাড়া লাগিয়ে, অ্যাদ্দিন যে সম্পর্ক শেকড়বাকর ছড়িয়ে সবকটাকে বেঁধেছিল—কাল দুপুরেই সেসব উপড়ে ফেলতে হবে। অথচ সুকু, নিবারণ, এ বি—এদের ছেড়ে গোরা কী করে বাঁচবে? কী করে জিভ নাড়বে? পা চালাবে? মগজ খাটাবে? ও যে অনেক কাল হল একা বাঁচা ভুলে গেছে। আর এই গলতির গলি বেয়ে ওরাই বা কোথায় গিয়ে উঠবে?

ভাবতে ভাবতে গোরা কোথায় যেন তলিয়ে যায়। আর সোনার মুখটা আচমকা চোখের সামনে টুনি বাল্‌ব-এর মতো, বিপদ সংকেতের মতো জ্বলতে থাকে, নিভতে থাকে। কিন্তু ও কী করে এগোবে। উফ্ সোনা তুই যদি বেঁচে থাকতিস। যদি বুঝতিস। মাথার দু-পাশে রগগুলো ফুলছিল। ফুলে ফুলে গুটলি পাকিয়ে যায়। আর যন্তরনা ঘন হয়। গাঢ় একটা যন্ত্রণা। কে জানে কেন, দিন কে দিন কপালের দু-দিকটাই ফুলে উঠছে। মাথার শিরগুলোয় অসহ্য একটা টান। হ্যাঁচকা টান। কে যেন নিষ্ঠুরভাবে সারাটা মাথা ধরে টানতে থাকে—সে কি সোনা?

সাপে যেমন ব্যাঙ ধরে। ঠান্ডা চোখে ওত পেতে থাকে, তারপর হঠাৎ মাথাটা খপ করে গিলে ফ্যালে। একটু শব্দ হয় কি হয় না। ব্যাস খতম। ভয়ঙ্কর রাত ধূর্ত শিকারির মতো পা টিপে টিপে এসে আচমকা বেলেঘাটার গলার নলী চেপে ধরল। গিলে ফেলল বেবাক। সরল সোজা বেলিয়াহাট্টা।

বিল্ডিঙের নিরালা ফাঁকা ঘরটায় একটা মানুষ দাপাচ্ছে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল এ বি। মিনুকে রাখার মতো একটা শেলটারের কথা ভাবতে ভাবতে। এ বি-র এলোমেলো চুল আর ঝাপড়া দাঁড়িতে অরণ্যের গন্ধ। কেমন একটা বুনোভাব। গালের দু-পাশে দেবে যাওয়া গহরাগর্তে অল্পে বুড়োনো একটা ছাপ লেগে আছে। সুকুর সাথে গোরার চুলচেরা তর্ক অনর্থক জ্বালা টেনে আনল। তর্কে আর ফয়দা নেই। যুক্তির চেয়ে ঢের ঢের বড়ো জ্যান্ত একটা মানুষ। মানুষের হিম্মত। ভারতবর্ষের ম্যাড়মেড়ে রাজনীতির গদিবাজি আর বক্তিমের বম্মির পাল্টা ওরা

নিঃস্বার্থ হিম্মত ছুঁড়ে মেরেছে। সুকু আর নিবারণ কথায় কথায় সেই হিম্মতের কথা বলে। কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা বিরশা ভগবান—এই হল এদেশের ইতিহাস। স্বাধীনতার ইতিহাস। যে স্বাধীনতার জন্য ওরা দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে। সাচ্চা আজাদি। সুকুর গলার শিরা কাঁপে যার আহ্বানে :

বরস বরস পর বিদেশি দুশমন সম্পদ লুট কর যাতা হ্যায়
মা কা আঁশু বানালে সাথী...নয়া জামানা লানা হ্যায়
আজাদি ছিনকর লানা হ্যায়...লানা হ্যায়...লানা হ্যায়...

গায় আর উষ্ণ হয়ে ওঠে। বিল্ডিঙের চারপাশে অন্ধকার তখন ষড়যন্ত্রের মতো ঘাপটি মেরে জমছে। মানুষজনের সাড়া নেই। বাসের ঘর্ঘর ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দ নেই। কাকপক্ষীর সাড়া নেই। অদ্ভুত শানাট্টা। খাঁ খাঁ ফাঁকা। কোথায় যেন একটা আশ্চর্য শেষ। একটা হু হু বাতাস। বুকের টান : মিনু পাগলামি করিস না বোন, এভাবে হয় না...আগে তুই বোঝ...তুই জান...

মিনুর চোখ দুটো দূরে কোথাও গেঁথে গেছে। অনেক হাতের নাগাল ছাড়িয়ে বহুদূর কোথাও। মুখময় উচ্ছুগ্গের ছাপ। মেয়েটার মুখে আশ্চর্য আনন্দ।

সুকু আর নিবারণ পেটের জ্বালায় ঝক্কি নিয়ে বাইরে গেল। বুড়ো আর মন্টু বেহুঁশ নিদে ঢলে পড়েছে। আর গোরা অতিশয় দরদে মিনুকে কী একটা কথা বোঝাতে গিয়ে ঠোক্কর খাচ্ছে। কঠিন এক পাষাণে মাথাটা থেঁতলে মিনুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। আর হঠাৎ গোরা দেখতে পেল মিনুর চাপা ঠোঁটে শোক দুঃখের উজান ঠেলা হাসি। গভীর রহস্যের হাসি : তা হয় না গোরাদা, আমার সামনে এখন একটাই রাস্তা।

এ বি পাখির ডানার মতো হাতটা ঝাপটে হঠাৎ খুশ হয়ে উঠল : ঠিক আছে, চল। অর্থাৎ শেলটার একটা ঠিক করে ফেলেছে। মিনু তো এক পায়ে তৈয়ার। একবার শুধু গোরার দিকে তাকাল। সাফসুফ হাসল : চলি। আর একটা বিচ্ছিরি শব্দে দরজাটা আছড়ে পড়ল।

মন্টু আর বুড়ো দুজনেই বড় ঘুমকাতুরে। বুড়োর তো একেবারে সাধা। যেখানে সেখানে কাত হতে পারলেই হল। আর কথা নেই। আলো বলতে একখানা থান ইটের ওপর পোড়া মোমবাতি। বহুকাল আগেই ফতুর হয়ে গেছে। তবু ছাড়ান ছুড়ান নেই। ডেলা পাকিয়ে গেছে, তাতেই পলতেটা কোনোরকমে গুঁজে দিয়েছে। গোরা ফুঁক মেরে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। আলো সহ্যি হচ্ছে না। সাথে সাথে লিফলেটের স্তূপের ভেতর ইঁদুরের দৌড়ঝাঁপ শুরু হল। খস্ খস্ শব্দ জাগছে একটা। তা ছাড়া শান্নাটা। নিঝুম। আর কোনো শব্দ নেই। কেবল একটা মানুষের শ্বাস। রাতের থই নেই। বোধহয় আড়াইটে। রাত্তির কেটে গেল পোঁচিমাতালের ন্যাকা প্রেমের গানে। পচা হিন্দি সিনেমার একটা বিরহের গান গেয়ে উঠল রাস্তার এক মাতাল।

নিবারণ আর সুকু হালকা শিস দিতে দিতে ফিরছে। ওরা শিস দিয়ে গান গাইছিল। সুকুর হাওয়াই সার্টের কোণা পত্ পত্ করে উড়ছে। উদরটাকে ঠান্ডা করে এল। মিয়াবাগান বস্তির সস্তার শিককাবাব আর রুটিতে। সুকু রেলিং ধরে ঝুঁকে গান গাইছিল। গুনগুনিয়ে। আর একটু হলেই দুজনে জালে পড়েছিল। খ্যাপলা জাল। হাসতে হাসতে, রসিয়ে রসিয়ে নিবারণ কথাটা

বলল : একটু ঢিলে হলেই গেছিলাম...শালা...যেন চোখ দিয়ে গিলছিল। বলে আর মজাক করে হাসে। যেন কত রস আছে কথাটায়। নিবারণের হাসির বহরে এ বি-র চোখের তারা ফাল দিচ্ছিল : বেরিয়েছিলি কেন? হঠাৎ যেন অন্তরের শেকড় ছেঁড়া একটা টান এ বি-র গলায় ফুটে উঠল। অসহ্য একটা জ্বালায় চিড়বিড় চিড়বিড় করছে : কালই তোরা এলাকা ছেড়ে চলে যাবি। সরে থাক ক-দিন, তারপর একেবারে মেদিনীপুরের কন্ট্যাক্টে চলে যাবি।

সুকুর ছোট্ট গোল মাথাটা শিশুর মতো দুলছিল : ন ন্ না...এত জলদি নয়...এদিককার কাজ...

: তোকে ভাবতে হবে না।

: ন ন্ না।

: ফালতু ধরা পড়বি।

: অত সস্তা নয়।

: ন ন্ না, তোকে যেতে হবে।

এ বি-র চোখ দুটো পিত্তির মতো গলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর সুকুর মুখখানা ভরাট শান্ত : কমিউনিস্টের আসল পরীক্ষা কী?

এ বি যেন নিজের হাতে বানানো সুকুকে চিনতে পারছে না, জিভটা বেকুফের মতো ঝুলে পড়ল : কী! কী!

: বধ্যভূমি। কারাগার। একঝাঁক বুলেট।

এ বি-র জিভটা অসাড়, ঝুলছে।

আর সুকু জিভের আগায় শব্দগুলো নাচাচ্ছিল : বধ্যভূমি। কারাগার। একঝাঁক বুলেট।

সুকুকে আর চেনার জো নেই। ওর গায়ে এখন শহিদ-শহিদ গন্ধ। ঠোঁটের ওপর আলগোছে গানটা ফুটছে : জন্মিলে মরিতে হবে রে...

অজস্র কেন-র ফুল ফুটিয়ে ছড়া গাঁথার সাধ

ভাদ্দরের শেষ।

পচে গলে মরে হেজে গরমি ভ্যাপসে উঠেছে। সেই ভ্যাপসা গরম ফাঁসিয়ে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ একটা বাতাস হু হু করে ছুটে এল। লেকের শেতল পানির বুক থেকে ঝাঁজির গন্ধ নিয়ে। এ বি-র হাতের লোম কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। শিরশির শিরশির করে। মিনুকে হাতের কাছে একটা শেলটারে রাতটুকুর জন্য রেখে এসেছিল। কোনোমতে রাতটা কাটলে, পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সবে রেখে এসেছে। দু-ঘন্টা না কাটতেই শান্তা গিয়ে হাজির। মিনুর শেলটারটার পাশের বাড়িতেই হামলে পড়েছে। তেরো-চোদ্দো বছরের একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে। ডি বি (ওরা আর দেশব্রতী বলে না) আর কাগজপত্তর পেয়েছে। খবরটা দেওয়ার সময় শান্তার চোখে মুখে এ বি বিরক্তির হিজিবিজি রেখা দেখেছিল : তোরা কি রে দাদা, কথা নেই, বারতা নেই হুট্ করে মেয়েটাকে দিয়ে চলে এলি!

শান্তার গলায় কেমন ঝাঁঝ। জবাব না দিয়ে এ বি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল। আর রাস্তায় নেমে শান্তা মাথাটা কাত করে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ফিসফিস করে বলল : যদি অ্যারেস্ট হয়ে যেত...তা ছাড়া, কালুর দাদা বেজায় ঘাবড়ে গেছে। দেশব্রতী, ইশ্‌তেহার, মাওয়ের চটি বই সব এখন পোড়াচ্ছে বসে বসে। আমাকে ডাকতে গিয়ে দেখি চোখ দুটো ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মাতালের মতো। আর ভয়ে হাত পা খিঁচোচ্ছে—অশোককে বলে একে সরিয়ে দাও শিগ্‌গিরিই...

চলতির ওপর এ বি ঝটপট ভেবে নিল। ফের দুসরা একটা শেলটারে মেয়েটার রাত কাটানোর বন্দোবস্ত করে তবে ফিরেছে। ফেরার পথেই চিঠিখানা পেল। ছোট্ট একটুকরো কাগজ। চার ভাঁজ করা দাগ। আর নোনা ঘামের কেমন একটা হলুদ ছোপ। ভোলাই দিল চিঠিটা। মোড়ের চায়ের দোকানটা এখন পুরো ফাঁকা। ভাটার মতো উনুনটা নিভে এসেছে। লাল একটা ম্লান আভা জাগছে। কয়লাগুলো পড়ে পুড়ে ফটফটা সাদা। ছাই।

এ বি প্রিয় কমরেড,

একটা জরুরি কাজে কলকাতায় আসতে হল। এসেই সব শুনলাম। তোদের সাথে কথা বলার জন্যে বুকটা আঁকপাঁক করছে। তা ছাড়া সিরিয়াস কথাও আছে। কাল দুপুরে যাব। থাকিস।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

নারায়ণদা

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই দলা পাকিয়ে উনুনের পেটের ভেতর ছুঁড়ে দিল। গোল হয়ে

কাগজটা পুড়তে লাগল। আর এ বি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। ইউ জি লাইফের ট্রেনিং, ডকুমেন্ট রাখা চলবে না। কখন ফেঁসে যায় তার তো আর ঠিক নেই। প্রথমে কালো একটা ছোপ ছড়িয়ে গেল, তারপর দপ্ করে জ্বলে উঠল। ব্যাস শেষ।

মিনুকে ওর শেলটারে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে কেমন একটা গন্ধ পেয়ে ছিল। এ বি-র খাড়া কাটারির মতো নাকে গন্ধটা হঠাৎ লাগল। ঘেরান্। পুলিশের ঘেরান্। হয়তো কোথাও দাঁতে দাঁত পেষার মতো, চাকার ঘষটানির একটা শব্দ শুনেছিল। বা, চারধারে জিভ উপড়ে ফেলার মতো লুলা হাবা আতঙ্ক। কিংবা পুলিশ ভ্যানের সাত পোঁচ কালির মতো গহরা রাত্তির। একেবারে খাঁ খাঁ করছিল কারফিউর গন্ধ। কারফিউর ভেতর শাল্লাটা রাস্তা ধরে মিনু এ বি-র সাথে গা ঢাকা দিয়ে দুসরা একটা শেলটারে গিয়ে উঠেছে। টলটলে চোখ জোড়া তেলকালির ছোপ নিয়ে খটখটে শুকনো। এ বি বলেছিল—সাবধানে রাতটা কাটিয়ো। মিনুর চোখের পাতা নড়েনি। মেয়েটার সবই অদ্ভুত। সেই একবেণীর মিনু এখন কত টানটান। শক্ত। কে যেন ভেতর থেকে টেনে ধরেছে। ওর কি চোখের জল ফেলার উপায় আছে। চোখের জলে ডুবে শান্ত হবে এমনধারা জ্বালাই নয়!

এ বি-র মনটা গলতে থাকে, মোমবাতির ফোঁটার মতো।

বিল্ডিঙের ঘরটায় এসে একেবারে বোবা মেরে গেল। মন্টু আর বুড়ো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নিবারণ খালি এপাশ-ওপাশ করছে। সুকুর ঠোঁটে ফুলঝুরির মতো গানটা আর নেই। এমনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। আর এ বি জানলার ধারটায় ঠায় বসে আছে। চোখ দুটো ফাটিয়ে। একটা সুতোর নাল অব্দি গলতে দেবে না। মাথার ওপর গুলির ঝক্কি নিয়ে বিল্ডিঙের ঘরখানা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শ্বাস নেওয়ার একটা ফাঁকা লম্বা টানা শব্দ। আর আরশোলার পাখনার ফরর ফরর আওয়াজ।

রাস্তার লাইটের হালকা তরল আলো এসে পড়েছে এ বি-র লম্বা ধাঁচের মুখে, চিবুকে। ফাঁক ফাঁক দাড়ির ভেতর আলোর জাল। একটু ফারাক থেকে গোরা এ বি-কে দেখছিল। এ বি-র অন্তরটা অব্দি দেখার জন্য ওর চোখ জোড়া বিষম জ্বলছে। চর্‌চর্ করে টাটিয়ে ওঠে চোখের ডিম। কেমন যেন আলাদা মনে হয়। একেবারে ভেন্ন মানুষ। জানলার ধারে এ বি-র হাঁটু মোড়া ছায়া, ঝাঁকড়া মাথাটা, গোরা যেন কোনোদিন দেখেনি। সেই ডাঁটো ভাব কোথায়। কেবল এলোমেলো কটা দাড়িতে, দাড়ির ফাঁকে কেমন একটা মরণটান। বেপরোয়া গোঁয়ারতুমি। তবু সেই ম্লান নীল আলোয় এ বি-কে বড্ডো শান্ত লাগছে। এত শান্ত যে কেমন কষ্ট লাগে। এ বি-কে ঘিরে গোরার জ্বালাটাও থিতোতে থাকে। কত কথা মনে ফাল দিয়ে ওঠে : ও বুঝতে পারছে না তাই...না...হলে...। আর এ বি-র ছায়াটা কণ্ঠার বেঁকা হাড় দুখানা নিয়ে দেয়ালটায় কেমন দুমড়ে থাকল।

: সিগারেট খাবি?

ঝাঁকড়া মাথাটা আলগার ওপর আস্তে দুলে উঠল : দে।

: একটাই, ধরাচ্ছি।

সাবধানে আলো বাঁচিয়ে গোরা সিগারেট ধরাল। বাইরে আলো ঠিকরে গেলে আর রক্ষে

নেই। কোথায় ওত পেতে আছে কে জানে। সাপের ল্যাজের মতো। একবার পা ঠেকলেই হল। দু-চার টান দিয়ে গোরা সিগারেটটা এগিয়ে দিল : নে।

বুকে শ্বাস আটকে নিবারণ গোঁ গোঁ করে উঠল ঘুমের ঘোরে। সুকু জেগেই ছিল। ওর কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল : অ্যাই কী হল! গলায় জিভে একগাদা লালা নিয়ে নিবারণ কী যেন বলতে ঠোঁট ফাঁক করল...সুকু...শালা...মেরে ফ্যাল...অ্যা। আর টানতে পারল না। জিভটা ভার ভার হয়ে উঠল। মাথাটা হাতের ভাঁজে গুঁজে ফের ঘুমিয়ে পড়ল। গোরার পোড়া চোখে ঘুম নেই। সুকুরও। অমনি পড়ে আছে। ঘুম আসছে না। আজকাল আর কিছুতেই চট্ করে ঘুম আসে না। নিবারণের গলার আওয়াজে এ বি কেমন ঘাবড়ে গেছে। নিবারণ যেন ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। কীসের ভয়? নিবারণের তো ভয়ডরের বালাই নেই। গোরা কিছুতেই হদিশ পায় না। হঠাৎ কেন ও এমনি ধড়ফড় করে উঠল? নিবারণ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছিল? সাংঘাতিক কোনো স্বপ্ন? নাকি মনের ভেতর লড়াই-এর মহাকাব্যের যেসব অধ্যায় ছুট্ গেছে তার নাগাল খুঁজতে গিয়ে অমনি তলিয়ে যাচ্ছিল। জাগন্ত অবস্থায় যে সংশয়টাকে চাবকে ঝিম পাড়িয়ে রাখে, ঘুমন্ত পেয়ে তাই চড়াও হয়েছে।

এ বি-র ডেলা চোখে কি একটা জিজ্ঞাসা ঝুলে নেমেছে। জানলার রড ধরে চোখ দুটো রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়েছে। খুট করে একটা শব্দ হলে তা বুকের হাড় গুঁড়িয়ে এ বি-কে সিধে করে দেয়। একেবারে টানটান। বুড়োর ঘুম চটে যাচ্ছে থেকে থেকে। মশার হুল, ভ্যানের চাকার শব্দ আর হু হু আগুনের মতো জীবনটার পোড়ানিতে ঘুম আসে না। এ বি নাকের ডগা লাল করে সিগারেটটায় লাস্ট টান দিল : শান্তা আজকাল কেমন চুপ্ মেরে গেছে!

বাদুড়ের মতো অন্ধকার ঝুলছে। এ বি-র লম্বা টানা শ্বাস কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এ কথার কী জবাব হয়? আর থোড়াই জবাবের জন্য কথাটা বলেছে। হঠাৎ হয়তো বোনটার মুখ মনে পড়ে গেছে কিংবা নেপুর ভবিতব্য। শান্তার থমথমে মুখে নেপুর ভবিষ্যৎ। মাঝে মাঝে এমনি হয়, হঠাৎ হঠাৎ কারো কথা মনে পড়ে যায়। তখন বাতাসের আগে ছুটে গিয়ে স্নেহ-ভালোবাসার সেই মানুষটার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে ফিরে আসার একটা ঝোঁক চাপে। সর্বনেশে এই ঝোঁকের ফলে দু-একজনকে ওরা গেঁথে তুলে নিয়েছে। শুধু তো আর পুলিশ মিলিটারি নয়, মাকড়সার জালের মতো ওদের এজেন্ট ছড়িয়ে আছে। নাহলে কেউ ভাবতে পেরেছিল যে ক্যাপিটাল রবারের সঈদ ইন্‌ফরমার! বিমলা আসলে কংগ্রেসি! গোরা ভাবছিল তেমনি হয়তো হঠাৎ বোনটার কথা মনে পড়ে গেছে তাই। এ বি-র ডেলা ডেলা চোখের দিকে চেয়ে দুম করে জিজ্ঞেস করল : নেপুর জন্য?

: শান্তা এমন চাপা যে নেপুর জন্যে হলে আমি বুঝতে পারতুম না।

: তবে?

: ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছে না, মুরারীকে মারার পর থেকেই...বিল্ডিঙের মেয়েদের নিয়ে সেদিন একটা মিছিল করতে চেষ্টা করেছিল আমি বারণ করলুম একচোট তর্ক হয়ে গেল...সেদিনই টের পেলাম। মিছিলটা অবশ্য বেরোয়নি। আর...

ভোরের দিককার ঠান্ডা বাতাসে ঘরটা এখন হিম হয়ে আছে। অন্ধকার ফিকে হচ্ছিল।

ফোঁটা ফোঁটা করে জমাট অন্ধকার গলে যাচ্ছে। নিবারণ সারা রাত কাত্‌রে এখন মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। সাড় বলতে নেই। নিবারণের পোড়াকাঠ মুখখানা এখন কোমল। ঘুমন্ত মানুষের মুখ কেমন শিশুর মতো হয়ে যায়। সরল, অসহায়। যেন কিছু জানে না। যেন বড়ো দুর্বল। একা। নিবারণের অসাড় চোয়ালের ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে গোরার এমনি ধারা অনেক কথা মনে হল। আসলে গোরা টের পাচ্ছিল সবকিছুর ভেতরেই ও কী যেন খুঁজে চলেছে। সোনাকে পুলিশ গুলি করার পর থেকে গুচ্ছের ঘটনার ভেতর দিয়ে ওদের সকলের সাথে গোরার কেমন একটা ফারাক হয়ে গেছে। ও যেন ওদের ভেতরে থেকেও আলাদা। ভেন্ন। যেন একটা খুঁটিয়ে দেখার স্বভাব জাগছে। যেমন মিনুকে দেখে মনে হচ্ছিল : ও বোধহয় সোনার জন্যই নিজেকে উচ্ছুগ্‌গ করে বসে আছে। ভালোবাসার কাছে উৎসর্গ। বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীত প্রাণেরও অভাব নেই। কিন্তু মিনু যেন ঠিক তা নয়, মিনু ঠিক সোনা নয়। ফলে জ্বালায় ও অনেক কিছুই চটপট গিলে ফেলছে। এখন ও কাঁচা আগুন গিলে হজম করতে পারে। অথচ, এই লাজুক বেণী ঝোলানো মেয়েটাকে গোরা তো আর আজ থেকে চেনে না। সেই মিনু, সেই কালো চোখের তারা। এখন দেদার সাহস নিয়ে আনজান অচেনা মানুষের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে। অথচ সেবার সুকান্তর জন্মদিনে ও কিছুতেই 'বোধন' কবিতাটা আবৃত্তি করতে রাজি হল না। কী সুন্দরই না আবৃত্তি করত ও। আচ্ছা এখন কি ওর গলায় তেমনি আবেগ ফোটে? এখন হয়তো আনজান মানুষের ঘরে পরম আত্মীয়ের মতো শুয়েও ঘুম আসছে না মিনুর। ফালাফালা বুকটা নিয়ে কাটা ছাগলের মতো দাপাচ্ছে। এ কি বিপ্লবের জন্য যন্ত্রণা? নাকি নিজের একান্ত এক বুকফাটা আর্তনাদ। কিন্তু সেই মানুষটা যার জন্য ওর বুকে তুষের আগুন সে তো বিপ্লবেরই শরিক। তার জন্য টান থাকলে সে টান তো বিপ্লবেরই দিকে। তবু কোথায় যেন এক জটিল আবর্ত। কোথায় যেন সব জট পাকিয়ে একশা।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে এ বি মেঝেতে ফুক মেরে শুয়ে পড়ল। একখানা হাত আড় করে তার ওপর মাথাটা রেখেছে। আর একখানা সুকুর পিঠে। আঙুল বেয়ে স্নেহের ঢল নেমেছে : মিনতি বউদি এসেছিল। বিজয়দাও।

সুকু তড়াক করে উঠে বসল : কখন?

এ বি-র প্রশান্ত গলা : বিকেলের দিকে, আমার সাথে দেখা হয়নি, ভোলার দোকানে একটা চিঠি রেখে গেছে। নারাণদার চিঠি।

মিনতি বউদি এসেছিল। তার মানে হিউজ রোডের খবর। নাটা আলির কথা। পুলিশি অত্যাচারের রিপোর্ট। নতুন কাকে টেনে নিয়ে গেল, এইসব। যে খবরগুলোর জন্য ওদের গলায় শ্বাস আটকে আছে। সুকুর বেধবা মা। হঠাৎ ওর মার কথা মনে ফাল দিয়ে উঠল। মা। জন্মে থেকে এক রাতের জন্যেও ছেলেটা মার কাছ ছাড়া শোয়নি। কুড়ি বছরের জোয়ান ছেলে সুকু।

: নারাণদা এসেছে।

গোরা আর স্থির থাকতে পারল না : কবে!

: কালকেই বোধহয়।

রাতের থ্যাবড়া কালো ছায়ার ভেতর পাশাপাশি থেকেও গোরা আজ এ বি-কে চিনতে পারছে না। সেই ক্ষার ক্ষার ভাবটা একেবারে নেই। কেমন যেন মিইয়ে গেছে। মনমরা, মনমরা। অদ্ভুত ঠান্ডা, শাস্তার কথাটা বলার সময়েই টের পেয়েছিল। হয়তো এ বি-র মনের ভেতরও একটা ঘূর্ণি ঝড় ডাক ছাড়ছে। জিজ্ঞাসার ছুরিটা একের পর এক অ্যাকশন করে চলেছে। ভেতর ভেতর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

নারাণদার আসার খবরটা দিতে গিয়েই এ বি-র চোখে সংশয়ের এক দানা বালি ঢুকল। আপ্‌সে কেমন চুপ মেরে গেল। নারাণদাকে নিয়ে মুশকিলের শেষ নেই। আজ অব্দি তেমন কোনো রিপোর্ট পায়নি ঠিকই। কিন্তু মানুষটার যে ধাতই আলাদা। সব কিছু একেবারে ভেঙে বুঝতে চায়। ভেতর অব্দি।

দেওয়ালে আর একনাগাড়ে বেশিক্ষণ ঠেস দিয়ে বসতে পারল না। কোমর ধরে গেছে গোরার। রাত ফুরিয়ে এখন ঝিম নামছে। চোখের পাতা আর টেনে রাখতে পারছে না। শব্দ করে হাই তুলে কাত হল।

এদিকে অন্ধকার গলছে। ভোরের হিম বিল্ডিঙের পেছন দিককার জোলো মাঠে চোখের জলের মতো ফুটে উঠছে। টলটল করছে।

পচা খালের বদগন্ধ আর বেলিয়াহাট্টার দু নম্বর পুতলিকলের ভেঁপুর জান বাঁচানো ডাকে সকাল হয়। কারা যেন চীনেমাটি ঘেঁটে ছেনে ছাঁচে ফেলে পুতুল বানায়। খোয়াবের পুতুল। মানুষের স্বপ্ন। আর ভেঁপুর ডাকে, জান বাঁচানোর ডাকে বেলেঘাটায় সকাল আসে। ভেঁপুর ডাকটাকে আলি তাই বলত—জান সাম্‌হালকা আওয়াজ! অথচ পুতলিকলে কোন্ জম্‌মে পুতুল হত কে জানে। এখন বিলেত আমেরিকায় ডিনার সেট চালান যায়। বেলেঘাটার বৃদ্ধ মজুর হাড়ে বাত্তি ধরিয়ে ওদের টেবিলে পাত্তর তুলে দেয়। খানার পেলেট। আর নাতি-নাতনির কাছে, চ্যাংড়া মজুরের কাছে গল্প শোনায়। পুরানা কিস্‌সা। খৈনি খাওয়া কালো মাড়ি আর চুনে খাওয়া সামনের দাঁতের শেকড়ের মতো গোড়ায় যে কিস্‌সার ছ্যাদলা পড়ে আছে: আগে থোরি এসব হত...চীনেমাটির পুতুল হত। ...চীন দেশ থেকে আসত সে মাটি...ময়দার থেকেও নরম তুলতুল তুলতুল করছে।

মাথার ওপর চিড়বিড়ে রোদ নিয়ে, দু নম্বর পুতলিকলের লাগোয়া রাস্তাটার খোঁদলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, গোরার কথাগুলো হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। পুতলিকলটার যেন হৃৎপিণ্ড আছে। কেমন নাড়ী ধরে টানে। বেলেঘাটার সব বিত্তান্ত যেন কলটার শুঁড়ের মতো চিমনির ভেতর জমা আছে। পিঙলা ধোঁয়া পেঁচিয়ে ছেড়ে পুতলিকল যেন দিনরাত্তির সেই কাহিনির জাল বুনে চলে। যে কাহিনির পরতে পরতে মানুষগুলো জিয়স্ত হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার টুকিটাকি সাধ-আহ্লাদ আর এককাট্টা লড়াইয়ের গীত নিয়ে। সে জীবন তার ছেঁড়া কাঁথায় ফুল তুলে গোরাকে ডাক পাঠায়। ওম নেওয়ার জন্য, হাতের খিল ভাঙার জন্য।

চায়ের গ্লাসে একটা চুমুক লাগিয়েই কাগজ টেনে নিল গোরা। বুড়োও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সকাল বেলার এই কাগজ এখন খুনের লিস্টি। আর সেই লিস্টিতে চোখ বোলাতেই

মোটা কালো হরফের লাইনটা আগুনে পোড়া টকটকা লাল শিকের মতো গোরার চোখে বিঁধে গেল। পুলিশের সহিত সংঘর্ষে...ওরফে বাবু নিহত।

হঠাৎ কাগজটা উধাও হয়ে যায়। চোয়াল চাপা বেঁটে সি আর পি আর বন্দুকের নল হরফগুলোর বুক ফেঁড়ে জেগে ওঠে। 'সংঘর্ষ' কথাটার ভেতর কী দারুণ ঘর্ষণ। যেন আগুনের ফুলকি ছোটে।

আজকাল কাগজ খুললেই একদিকে থাকে মৃত কনস্টেবলের বউ আর তার গরিব ঘরের একটা ছবি। পুলিশ পাহারায় শোকমিছিল। আর সংঘর্ষের হাজার রকম সত্যি-মিথ্যে কিস্‌সা। যুবকের মৃত দেহের টুকরো। সোনা বলত, ধোঁকা দেওয়ার জন্য নাকিকান্না জুড়েছে। যেন একশো কুড়ি টাকা তনখার সেপাইদের জন্য ওদের কত দরদ...আসলে আমাদের খুন করবি আর তাই সাফাই গাইছিস এই তো...। জানো গোরাদা সেদিন মা বলছিল : পুলিশের বউটার ছবি দেখেছিস সোনা, একেবারে কচিরে আহা! কী বলব বলো...শালা না পারছি গিলতে না পারছি ওগরাতে। বাবু বলত অন্য কথা : শত্তুরের শেষ রাখতে নেই। বাবুর মোটা গোঁফ কথাটার সাথে সাথে সুরসুর করে উঠত। ছ্যাঁচা শরীর ভরামুখ বাবু। পকেটে থাকত ছোটো একখানা ইতালিয়ান যন্তর আর হাতের যা টিপ মুখের সিগারেট উড়িয়ে দিত। অশোকনগরে ইউ জি (বাবু কখনও আন্ডারগ্রাউন্ড বলত না) থাকতে চলন্ত সাপের মাথার খুলি ফুটো করত। সেই বাবুও গেল। লড়েই গেছে। বাবুর ভোলেভালে মুখখানা কাগজের ভেতর ফুটে উঠল। সেই প্রেসিডেন্সি কলেজের লনে বসে ওর ঢালা হাসি। আর ময়দানের মিটিঙে পাজামা গুটিয়ে 'গযুর' ছেলেদের তাড়া করা। খেয়োখেয়িটা তখন কলেরা বসন্তের মতো ছড়াচ্ছিল। এখন তো শেষ হাল। কে শুরু করেছে তাই নিয়ে এক এক পার্টি এক এক কথা বলছে। নারাণদা একবার জোর করে টেনে এনেছিল বাবুকে। সুর কোম্পানির মাঠটায়। ক্ষারজলের একটা গন্ধ উঠছিল থেকে থেকে। আর কাপড় আছড়ানোর মেহনতি ছন্দ। —ওরা মারবে আর ভেরুয়ার মতো দেখব। ধৈর্য রাখতে নারাণদার ভুরুতে টান পড়ে : এটা সেরেফ দাঙ্গা...হিন্দু মুসলমান রায়টের চেয়েও জঘন্য এক দাঙ্গা।

বাবু উত্তেজিত : বাহ্! বেশ বললে! আমার কমরেডকে...। নারাণদা কথাটা টেনে নিল সাঁ করে : ওদের খিলাপে, দাঙ্গার খিলাপে প্রচারে নামতে হবে...।

বাবু প্যান্টের ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলল : ওসব আমার আসে না, তোমরা করোগে...

বাবু চলে গেছিল। একেবারে শুরুর দিককার কথা। পার্টি হব হব হচ্ছে, সেই সময়ে। এ তল্লাট আর মাড়ায়নি। ওর জুটি সহদেবকে সি পি এম খুন করেছিল...। বিপ্লবের সাথে সিপিএম কাটা ওর জীবনে তাই পাকাপাকি গেড়ে বসেছে। তা ছাড়া মাথাটাই বিগড়ে গেছে। অ্যাকশন, ইতালিয়ান যন্তর আর রাত-জাগা জীবনের ব্রাহস্পর্শে যেন কেমন হয়ে গেছিল। পাথরের মতো। আবার মুরারীর বুক ছ্যাঁদা করা দানার শব্দে দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ভাসিয়েছিল। কে বুঝবে এই পাথরকে।

পুতলিকলের গা ঘেঁষে পাস করার সময় গোরা যেন সেই ডাক বুকের ভেতর টের পায়। কনুই দিয়ে বুড়োকে ঠ্যালা দিল : দেখেছিস!

: কী?

: কারখানা যেমনি তেমনি চলছে...বাসি রুটি বেঁধে তেমনি সব ডিউটিতে যাচ্ছে। বুড়ো এক ঝটকায় দ্যাখে, তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল : তার মানে, সব ছেড়ে ছুড়ে আসবে বলতে চাও?

: নাহ্ তা বলছি না, বলছি যে ঢাকঢোল পেটানোতেও কাজ হল না। বিপ্লব করার তাড়া নেই...দ্যাখ সেই বউর পাছার কাপড় আর বালবাচ্ছার পেট নিয়েই মেতে আছে।

: ওরা বলবে সংশোধনবাদের গাড্ডায় ডুবে আছে!

: আসলে কী...

হঠাৎ গোরা কোথায় যেন ডুবে যায়। বালুরচরের বকফুল গাছটার জিরজিরে ছায়া ঘন হয়ে ওর মুখে পড়েছে। সাদা দাঁতের সারি ঝিলিক তুলল : তোর হরিয়া ভাই-র কথা মনে আছে। আরে সেই অ্যালেনবেরির চোখা মজদুর (বুড়ো সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল)...হরিয়া একটা মজার গল্প বলেছিল : এক গাঁয়ে ছিল এক অন্ধা আর এক খোঁড়া। দুজনে খুব দোস্তি। খেতে না পেয়ে দুজনেই শুকোচ্ছে। শেষে এসে উঠল আর এক গাঁয়ে। শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। যেতে যেতে খোঁড়া চুনের পাতিল, লম্বা রশি আর একটা নরুন দেখল রাস্তায়। অন্ধাকে বলল : নিয়ে নে, কাজে লাগবে। আসলে হয়েছে কী সেই গাঁয়ে একটা ঘর ছিল ফাঁকা, সেখানে থাকত এর রাক্কোস। দু-চার ঘর লোক ছিল মরার মতো...রাক্কোসটা রোজ তাদের খুন টেনে নিত শুঁড় দিয়ে, তারপর ভিন গাঁয়ে খুন চুষতে যেত। মরাহাবড়া লোকগুলো মানা করল, কিন্তু তাদের গোঁ। সেই ঘরটাতে থেকে গেল। রাতে রাক্কোসটা ফিরে দরজা ধাক্কাতে লাগল : কে রে? ওরা জবাব দিল : খোক্কস। রাক্কোস বলল : দেখি তোর চুল। ওরা লম্বা দড়িটা ছুঁড়ে দিল। তারপর বলল : নখ দেখা। তখন নরুন ফুটিয়ে দিল চোখে। ব্যাস। রাক্কোসটা ভয় পেয়েছে দেখে মানুষের বুকে তাকত এল, ব্যাস সবাই মিলে...। হরিয়া বলত খোক্কসের আসলে কিছু নেই সব ফাঁকা, ঝুটা, ভয় পাইয়ে দিয়েছিল রাক্কোসটাকে। ডর কা মারে রাক্কোসের পেটের ভেতর হাত-পা ঢুকে গেছিল। এই হল সাম্রাজ্যবাদ, এতে ফাঁক আছে হয়তো কিন্তু কেমন বানিয়েছিল বল তো। ও গল্পটা বলত আর ঝুলো গোঁফের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুরিয়ে হাসত।

দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার রাতটা কেটে যাওয়ায় এখন দুজনের চোখে মুখেই কেমন একটু সোয়াস্তি ফুরফুর করছে। কাল রাত অব্দি গোরার যে ভারভার মনটা পাষাণ হয়ে চেপেছিল কখন যেন তা গলতে শুরু করেছে। হয়তো নারাণদার আসার কথাতেই। গোরাকে কেমন ছেলেমানুষের মতো ভালো লাগা পেয়ে বসেছে। পায়ে করে ইটের টুকরো লাথিয়ে এগোচ্ছে। কে জানে আর ক-পা যেতে হঠাৎ ওর সোনার কথা মনে হবে। স্প্রিং ফ্যাক্টরির হাতুড়ির দুম্ দুম্ শব্দের ভিতর দিয়ে ওরা বউদির দোকানে ঢুকল। গলা ভেজাতে। বউদির বেঁকা নাকের খাঁজে, ঠোঁটের ফাঁকে পাতলা হাসি।

: আচ্ছা, বিস্কুট দিন।

: ও বাবা! খেয়ে যেন আমায় উদ্ধার কচ্ছে।

: তবে না তো কি?

পুতলিকলের জান সাম্‌হাল কা ভেঁপু আর এক দফা মোচড় দিয়ে উঠল। আর এক দফা এক দঙ্গল মজুর মাথায় ফেট্টির মতো গামছা এঁটে লোহার ছোটো গেটটা তাক করে ছুটল। অন্দর যাওয়ার টাইমে ঘাড় ভেঙে ঢুকতে হয়। ঘেটি ভেঙে। ওটা নাকি গোলামির চিহ্নত্। পুতলিকলের সুদামার দৌলতে জনা তিনেক মজুরকে নিয়ে একবার লাইনের ধারে বসার কেস করেছিল গোরা। ঢালু জমিন। পেছনে মালগাড়ির লাইন। আর খোয়া। আর ঘিস্ ঘিস্ ঘ্যাটাং শব্দ। এ বি ছিল মিটিংটায়। দু-চার কথায় ওই ছোটো গেটটার কথা উঠল। সাথে সাথে এ বি বলেছিল এটা দিয়েই ইজ্জতের লড়াই শুরু করা যায়। সুদামা দেদার হাসির বান ডাকাল— পেটের ভাত আর পাছার কাপড় চুলোয় গেল...। আর হারান মিস্তিরির গপ্‌পো চালু হয়ে গেল সাথে সাথে : তা ধরো এক কুড়ি সাত আট সাল হল এই পুতলিকলে আছি। একবার তো কলই গেল বেকল হয়ে, বিলাতের সাহেব অব্দি ফেল মারল, তখন এই হারান মিস্তিরি। কিন্তু হাল সেই এক, সেই ঘেঁটি ভেঙে কারখানায় ঢোকা। যেই কারখানার পেটটার ভেতর ঢুকলে তখন দুনিয়াভরের কোথাও আর তোমার কেউ নেই। না দাদা, না বহিন। যন্তরের সাথে আবার পিরিত কীসের! কারখানার সাথে দিল্লাগি! এ হল বাবা মালিকের সাথে যোঝার ক্ষেত্তর। কুরুক্ষেত্তর।

হারান মিস্তিরির কথার ফুরান নেই। সমানে জুগিয়ে যায়। শেষকালে সুদামারই বিরক্তি ধরে গেল: চা খেয়ে আসি চলো।

চায়ের তলানি অব্দি গিলে, পুতলিকলের কানের পর্দা ফাটানো ভেঁপু মস্তিষ্কে নিয়ে ওরা বাসগুমটির দিকে এগোল। এলাকা থেকে কেউ না কেউ আসবে। বিজয়দা আসতে পারে। পাড়ার যেন কেমন একটা টান আছে। বেঁধে রাখে। পাড়ার খবরের জন্য বুকটা আঁকপাঁক করে।

বাসস্টপের গা ঘেঁষে নোংরার ভুর। তাবৎ কলকাতার ময়লা, কাদা পাড়ার স্টেটবাসের গুমটি। গুমটির গায়ে তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছের চেরা ছায়া। সেই ছায়ায় সোনার মার মুখখানা আবছা হয়ে এল। সোনার মার লম্বাটে চিবুক দেখতে পেল গোরা। বুড়ো অস্থির হয়ে উঠল। কেটে পড়তে চাইল আমি চল্লাম।

গোরার গলা বেজায় শক্ত : নাহ্।

সোনার মার হাতে একটা পোঁটলা। মুখটা ফুলে ঢোল হয়েছে। হয়তো কেঁদেই ভাসিয়েছে। বেঁকা বকফুল গাছটার হাড়গিলে ছায়া কেঁপে উঠল : গোরা! আর রুক্ষু পোড়া বালুরচরে গোরা সোনার মাকে জাপটে ধরল : মাসিমা!

দোকানে বসাটা বেকুফি। গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যাবে। তা ছাড়া একবার মুখ খুললে কখন যে কী উথলে ওঠে তার তো কোনো ঠিক নেই। তখন সেই কথার তোড়ে, কাঁচা ঘায়ের পোড়ানিতে ওদের হুঁশ থাকবে না। বাঁ দিকে রেফিউজিদের ডেরা ফেলে ওরা হাঁটা ধরল।

: তোরা তো পালিয়ে বেড়াচ্ছিস—ওদিকে বিজয়কে আজ ভোরবেলা টেনে নিয়ে গেছে। এখন ওই বোকাহাবা বউটা রিকেটের মেয়েটাকে নিয়ে কোন চুলোয় যাবে?

: বিজয়দা ধরা পড়েছে?

: হ্যাঁ পাড়ার বটুবাবুর কাছে আমি ছিরিকে নিয়ে গেছিলুম। তা বটুবাবু টাকা পয়সা নেবে না, বলেছে জামিন করিয়ে দেবে।

: বলেছে?

: হ্যাঁ দেবে না মানে! মগের মুলুক নাকি!

: দেখুন।

: হ্যাঁ না দেখে আর যাই কোথায়, খড়কুটে আগুন দিয়ে তোরা তো...এখন দেখতেই হবে—আর শোন ভুলেও পাড়ার রাস্তা মাড়াসনি, কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাহলে ওই সোনার মতো...

তারপর ভেজা গলায় জড়িয়ে গেল কথাটা। গোরা আর বুড়োর পা চালানোর তাকত নেই আর। বালুরচর থেকে ওরা অনেকটা চলে এসেছে, বকফুল গাছের গহেরা সবুজ রঙ তবু যেন এখনও চোখে লেগে আছে কাজলের মতো। কড়া রোদটা আর নেই। কেমন মেঘলা ভাব। সেই ধূসর রুক্ষু পোড়া মাঠে, মেঘলা আকাশের তলায় সোনার নামটা শোনার পর ওরা আর এক পাও এগোতে পারল না। হঠাৎ গেঁথে গেল।

: বোস এইখেনে।

সোনার মা পোঁটলা খুলে সুকুর জামা-প্যান্ট বের করল। আর টিফিন ক্যারিয়ার। বুড়ো হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসেছিল। গোরা পা দুটো ছড়িয়ে দিল আর সোনার মা, জননীর মতো আহ্লাদের সন্তানকে পরাণভরে খাওয়াতে লাগল।

: এইটে তোদের মিনতি বউদি পাঠিয়েছে...বুড়ো নাকি খুব পছন্দ করে ওর হাতের অম্বল...।

খেতে খেতে গোরা বাঁ হাত দিয়ে রুক্ষু চুল ঠেলে দিল : খুকুর সাথে দেখা হয়েছে মাসিমা?

: হ্যাঁ হবে না কেন...

: শরীর কেমন আছে?

: ভালো।

: মাকে ছেড়েছে?

: নাহ্ কাল কোর্ট আছে দেখি কী হয়। হ্যাঁরে গোরা, ওই পুলিশটাকে মারল কেন? সুকু নাকি ছিল, পাড়ার সবাই বলছে।

: জানি না তো।

সোনার মা দুটো নাগাদ চলে গেল। আর বিল্ডিঙের তেতলায় ধুলোর গন্ধ বুকে নিয়ে মন্টু হাঁসফাঁস করতে লাগল। খবরটা শোনার পর থেকে মন্টু বড্ড আকুল হয়ে পড়েছে। সোনার মার সাথে দেখা করার জন্য মারাত্মক একটা টান ভেতর ভেতর উথলে উঠছে। এমনিতে দুপুরটা বেজায় ফাঁকা। পুলিশের জিপের দাঁত চাপা ব্রেকের শব্দ। আর ঠা ঠা রোদ। তা ছাড়া, সারারাত দু-চোখের পাতা জুড়তে পারেনি। এ কথায় সে কথায় গোরা ঘুমে ঢলে পড়ল। নিবারণ সুকু আর মন্টুর ছেঁড়া কাটা কাটা কথা আর কানে আসছে না। এখন ঘুম। মরার মতো ঘুম।

পুলিশ ভ্যানের হেডলাইটের নেশারু ঝাঁজাল আলো আর লেড়িকুত্তার কামড়ের মতো চাকার শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে রাত্তির কাটে। রাত্তির কাটে চোখের ডিম পুড়িয়ে। তারপর খুনের খবর আর ভারভার ক্লান্তি নিয়ে সকাল। সেই সকাল কখন যে গড়িয়ে গড়িয়ে ফের রাতে এসে ঠেকেছে তেতলার ঘরটার হুঁশ ছিল না। কালো পেড়ে শাড়ির খুঁটে গিট দিয়ে অন্ধকার বেঁধে শান্তা এল : নেপু ধরা পড়েছে। ডি বি নিয়ে আসছিল যে ছেলেটা তাকে ফলো করেই শেলটার রেইড করে।

দুটো কি চারটে কথা। বাছা বাছা কথা। তাতেই সব জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। শান্তার রিপোর্টই ওই রকম। ধানাই পানাই নেই। একেবারে দরকারি কথায় ঠাসা। আঁটোসাঁটো শরীরটার মতোই শান্তার কথা। কিন্তু নেপুর ধরা পড়ার ঘটনাটাও যে শান্তা অমনভাবে সারতে পারে কে জানত। কে জানত ওর চাপা থুতনির ওপর কালো ফুটকির মতো তিলটা আসলে পাষাণ।

শান্তার ঠোঁট জোড়া শুকনো পাতার মতো হয়তো একটু কাঁপল : জানতাম এই হবে।

বুড়ো টেনে টেনে পায়চারি করছিল। ফট্ করে একটা আরশোলার পেট ফেটে গেল বুড়োর পায়ের চাপে। আর অন্ধকার। দেশলাই হাতড়ে শান্তাই মোমবাতিটা ধরাল। ফস করে একটা শব্দ হল। শান্তার বাদামি চোখের তারায় সরু ফিতের মতো আলো পড়ে ধবক্ করে উঠল। বাদামি রঙটা যেন পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। মোমবাতির ক্ষীণ তীক্ষ্ণ আলো ঘিরে ওরা ছড়িয়ে বসে আছে। গোরার চুল বেড়ে ঘাড় ঢেকে ফেলেছে। খাবলা করে সেই চুলের ভেতর আঙুল চালাচ্ছিল : শান্তা।

: কী?

: কিছু একটা করা যায় না।

: কী বদলা! কী হবে ওতে, মানুষটারও কোনো লাভ হবে না, লড়াইও এক ধাপ এগোবে না। বড়জোর জ্বালা মিটতে পারে খানিক—তা ছাড়া ও ভেবে কী হবে, পার্টি নাকি বলেছে ধরা পড়লেই তাকে ডেড কমরেড বলে ধরে নিতে হবে...

: তুমি নাকি মুরারীর সময় একটা মিছিল...

: মিছিল করতে বলছেন!

: হ্যাঁ ।

ওরা কথা বলছিল চাপা গলায়। ফিসফিস করে। সামলে। নাহলে সুকু কিংবা নিবারণ কথার খুঁট ধরতে পারে। পাশে, বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। বুড়ো অব্দি শুনতে পাচ্ছে না। আসলে শান্তা সম্পর্কে এ বি-র কথাগুলোই গোরাকে ওর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এমন একটা দিশেহারা ভয়ানক মুহূর্তে যে মানুষটা তারই মতো পথ হাতড়াচ্ছে, গোরা তো তার দোস্তি পেলে বত্তে যায়। সেই দোস্তির বনিয়াদ যে শান্তা ভেতর ভেতর অনেক আগেই বানাচ্ছে গোরা তা স্বপ্নেও ভাবেনি। বালুরচরের রেফিউজি পাড়ার বয়স্ক মেয়েদের নিয়ে শান্তা একটা ইস্কুল মতো চালাচ্ছে। মিনুর সাথে কথা বলেছে কাল রাতে। মিনুকেও নাকি ঘোরানো যাবে। শান্তা সেরেফ্ এইটুকুই বুঝেছে যে কিছুতেই সাধারণ গরিবগরবা খেটে খাওয়া মানুষের সাথ ছাড়লে চলবে না। আর তাই নিয়েই ও লড়ে যাচ্ছে। নেপুও নাকি টের পাচ্ছিল।

: বইপত্তর তো ওল্টাত সব সময়। তাই ঝড়টা থিতোতেই এটা সেটা মনে হচ্ছিল...

হিউজ রোডের জোড়া তাপ্পির ফাটাফুটা সংসার আর বালবাচ্ছার ভুখবিমারি ভুলে যে মানুষটা লড়াইর ময়দান মিটিং মিছিলে মজুত থাকত হরটাইম, তার নাম নারাণদা। গেলাস ফ্যাক্টরির কাঁচা নর্দমার ধারে, নর্দমার ওপরকার ব্যাঁকারির মাচানে, আলি, সুবলা, বিজয়ের হাতের কব্জি টেনে বাতচিতের আগল খুলে দিতে কোম্পানির খিলাপে। মানুষটার চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে থাকত। এখনও তেমনি, বেয়াড়া হাড়টা ছিটকে বেরিয়ে আসছে। হিউজ রোডে শান বাঁধানো অশ্বত্থ। মিঠে ছায়ায় মাথার চাঁদি বাঁচিয়ে একরোখা এককাট্টা লড়াইর রীতিনীতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথার মালা গেঁথে যেত : স্টারটেক্সের মজদুর ছাঁটাই হলে গেলাস ফ্যাক্টরির ওয়ার্কাররা যদি নিদ যায় তো ইউনিটি কি আশমান থেকে নেমে আসবে?

সেই নারাণদা। সেই দিলখোলা হাসি। এমনিতে চেনার জো নেই সেরেফ্ ওই হাসির উজান ছাড়া : কেমন আছিস বল আগে।

চেহারা বিলকুল পাল্টে গেছে। নাকের ডগে লটকে পড়া চুল আর নেই একেবারে মাথা মুড়িয়ে কেটে সাফ করেছে। গোঁফখানাও বিহারের চিহ্নত্ নিয়ে ঝুলে নেমেছে। গালের দু-পাশ থেকে ঝড়তি-পড়তি মাংস খসিয়ে মুখখানা সাপটানো। আর বিহারের পোড়া মাটির তামা রং। কেবল যা ওই চোখ জোড়াই আগের মতো আছে। সেই ধার, সেই জ্বলন।

গোরার মুখের লাগাম ছিঁড়ে ধবধবে হাসি ফিনকি দিয়ে ছুটল : নারাণদা!

সংশয় আর সংকটের ঘেরাও ভাঙার হিম্মত আসে যে হাসি দেখলে, নারাণদার সাপটা গালে ধনুকের ছিলার মতো সেই হাসি। টানটান!

মোমবাতিটা ধিক ধিক জ্বলছে। চরচরিয়ে উঠছে, পুড়ছে। অজান্তে কখন সবাই মানুষটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। পুরোনো কথা কাহিনি ফেঁপে ওঠে। সংগ্রামী বেলেঘাটা আর তার বেদম সাহসী প্রাণগুলোর কথা জোড়া লাগিয়ে ওরা লড়াইর কাব্য গাঁথতে বসে। আলির সমাচার কি রে? ওর বহিনের বিমারি গেছে?—আলির বোনের টি বি হয়েছিল। আলিকে ছাঁটাই করেছিল। হতভাগী মেয়েটা দেড় বছরের ওপর হল চলে গেছে। আর আলির ফের নোকরি হয়েছে। ভালোমন্দে মেশানো এই তো সম্বাদ।

পয়লা বিস্ময়ের ঘোর কেটে, সত্তর সালের শেষ দিককার কুচি কুচি কাটা কাটা দ্বিধা, সংশয় আর ফালা ফালা প্রশ্ন বুকে নিয়েও এক সময় ওরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বেলিয়াহাট্টা থেকে কথায় কথায় নারাণদা কখন যে মতিহারি চলে গেছে হুঁশ নেই। বিহারের ফুলিয়া গাঁর কাদামাটি। জারা তাড়ানো। নাড়া জ্বালানো। খড় পোড়ানো। বীজ বোনার সুরেলা গান। সুদি কারবার। শোষণের করাত। করাতের খাঁজ কাটা দাঁত! বিষদাঁত ওপড়ানোর লড়াই। জঙ্গ। জঙ্গের তৈয়ার :

এ ঝান্ডা তুঝসে কহতা হ্যায়
দিনরাত জুলুম কিঁউ সহতা হ্যায়
জুলুম কি নামনিশান মিটাও
হোঁস মে আও বেদার হো যাও

ও মেহনতকস্ জনতা উঠো...

আটচল্লিশের পার্টি এই গান বেঁধেছিল। কী করে যেন মুখফেরতা সেই গান, গানের জোস, ফুলিয়া গাঁর বেঁটেখাটো চাঁছাছোলা পেটানো মানুষ কানহাইয়াজির বুক তোলপাড় করেছিল। বালবাচ্ছা, বহুবেটি ফেলে লড়াইর আগে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল মানুষটা। ফুলিয়া টগবগিয়ে ফুটছিল। তারপর তো চার সাল ঘানি টেনে ফিরেছে। এখন আধিয়ায় চযে। এবার শীতে উখ দিয়েছিল। কেতারির চাষ। মাটির বুক চিরে মিঠা পানির চাষ। উখ তো নয়, মিঠা পানি। আর ঠান্ডা শেতল খাটো মানুষটার বুকে আঁগ : ঠোস আদমি চুন চুন কর তব পারটি বানানা...। সেই মানুষের বাড়িতে শেলটার নিয়েছিল নারাণদা। ফিরতি পথে কানহাইয়াজির বেটার লেড়কির জন্য লাল পলা কিনে নিয়ে যেতে হবে। তার সাথে খুনসুটির গল্প চলে আসে। পুচকে মেয়েটা নাকি নারাণদার ভীষণ ন্যাওটা। আর কানহাইয়াজি বলে : এবার লড়াই বালবাচ্ছা বহুবেটি সক্কলকে নিয়ে।

হঠাৎ মিনুর কথা উঠল : মিনু কোথায় রে?

শান্তা জবাব দিল : ওকে দূরে একটা শেলটারে রাখা হয়েছে।

মিনুর শ্যামলা মুখের আদল ভেসে উঠতে না উঠতে সোনার কথা এসে যায়। সে রাতে কথার যেন আর শেষ নেই। অফুরান কথা। ওদের রুক্ষু পোড়া জীবনটায় কানহাইয়াজির সবুজ জমিনের মতো এক টুকরো মৃত্তিকার রস যেন সোনা। সোনার মতো অনেকে। অন্ধকারের জমাট পাঁচিলে মাথা ঠুকে সোনার কথা গুনগুন করে ওঠে। সোনার কথা উঠতেই বিল্ডিঙের চৌকোনা ছন্নছাড়া ঘরটা মৌন হয়ে গেল। এ বি-র মাথাটা আবার হাঁটুর ওপর নেমে এল। ইদানীং ওর বুকে একটা ব্যথা হঠাৎ হঠাৎ চিগির দিয়ে ওঠে। ডাগর চোখের পাতা অসহ্য বেদনার চাপে নেমে আসে। নারাণদার চোখ দুটো জ্বলছে : সোনা আমার সাথে যেতে চেয়েছিল...কেন যে নিলুম না...। ফের মিনুর কথা ওঠে। এক হারা, এক রোখা মিনু। গোরার মনে হয় মিনু হয়তো সত্যিই নির্মলা নয় কিন্তু ধরে ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে চোখা অস্তর হয়ে উঠত। গোরার দিকে চেয়ে নারাণদা আপন মনে বিড়বিড় করল : মেয়েটাকে আগলে রাখিস। আর গোরার চোখ টাটায়, সে কি আগলে রাখার মেয়ে? উমার মতো সর্বাঙ্গে ছাই মেখে সে যে এক ভীষণ যজ্ঞে লিপ্ত। হু হু করে কী যেন পুড়তে থাকে গোরার বুকের ভেতর : পারলাম না রে সোনা!

এখন গাঢ় রাত্তির। তরল অন্ধকার উগরে উগরে এখন গহেরা রাত। অন্ধকারের সিনায় পা চেপে বিল্ডিংটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ধুলো আর ইশতেহারের গন্ধ নিয়ে। মোমবাতির ফিকে আলোয় নারাণদার সাপটা মুখের একপাশ তামার রঙ নিয়ে জেগে আছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে থেকে থেকে। বাতাসে সুতোর নালের মতো মোমবাতির শিখাটা থেকে থেকে কাঁপছে। এ বি-র খাড়া নাকের ছায়া মেঝেতে নড়ে চড়ে ওঠে: তুই বলতে চাস আমি ছিরি বউদির কথা ভাবি না। বিজয়দার মেয়েটার জন্য আমার কোনো টান নেই, না?

খানিক আগে কথাটা নারাণদাই তুলেছিল। এ কথায় সে কথায় কুরিয়ার বিজয়দার কথা চলে আসে। নেপুর পোড়া অঙ্গের কথা ওঠে। দায় দায়িত্বের কথা।

যেসব কমরেড ধরা পড়েছেন, শহিদ হয়েছেন তাদের পরিবারকে দেখতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যারা ধরা পড়েছেন তাদের জন্য আইনি বন্দোবস্ত করা...

সাথে সাথে এ বি মেঝে থেকে খাড়া নাকটা তুলে নিল : বুর্জোয়া আইনের খিলাপেই আমাদের সংগ্রাম। ওদের করুণা পাওয়ার জন্য আমার কমরেডরা লড়াই করেননি।

কথাটা নারাণদা চরচর করে কাটতে থাকে ঠান্ডাভাবে : এই গণতান্ত্রিক অধিকার ওদের বাপকেলে সম্পত্তি নয়—আমার দেশের মানুষ শত শত বছর লড়াই করে এই অধিকার অর্জন করেছেন...

এ বি-র ঠোঁট আপসে বেঁকে যায়, তেড়া হাসি নিয়ে : এ সেরেফ আইনের টোপ...সংগ্রামকে আইনের চৌহদ্দির ভেতর আটকে ফেলাই উদ্দেশ্য।

আর তখন গোরা সামাল দিতে পারে না : তোর সংগ্রামে মানুষের অস্তিত্ব নেই...বিজয়দা, ছিরি বউদি কাউকে তুই বুঝিস না, বুঝতে পারিস না...

গোরা এক হাতের পাঞ্জায় মুখটা ডলে নিল।

এ বি-র খাড়া নাক ছুঁয়ে কালশিটে দাগটা যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠল। স্লোগান ফেটে পড়ার এক দুরন্ত উল্লাস। কাটা দাগটা স্লোগান আর টিয়ার গ্যাসের স্মৃতিতে দগদগ করছে। আজকের কথা নয়। ফুড মুভমেন্ট কলকাতা শহরটার শক্ত পিচের রাস্তায় ভুখা পেটটা নিয়ে আছড়ে পড়েছিল :

লাঠি নয় গুলি নয়

খেয়ে পড়ে বাঁচতে চাই।

মিছিলের সামনে প্রকাণ্ড লাল ঝান্ডাটা মাথার ওপর ফেট্টির মতো পত্ পত্ করে উড়ছিল। এ বি-র মাথার ওপর। আর পেটের দানার বদলে জবাব দিয়েছিল সিসের গুলিতে, টিয়ার গ্যাসের সেলে। সেই সময়কার একটা সেলের খোল কদিন আগে অব্দি ছিল। সকেড বানিয়েছিল সোনা। জব্বর মাল। সেই সেল ছুঁড়ছিল বেঁটে বেঁটে গোর্খা পুলিশ। পুলিশ না মিলিটারি? একটা এসে লাগল এ বি-র নাকের তলায়। ফাঁক হয়ে গেছিল জায়গাটা। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো লম্বা মেয়েটা অশোককে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় রুমাল ভিজিয়ে চেপে ধরেছিল। কালশিটে দাগটা মেয়েটার স্মৃতি টেনে আনে। টিয়ারগ্যাস আর গোর্খা মিলিটারি আর ফুড মুভমেন্টের স্মৃতিতে দাগটা এখনও জ্বলজ্বল করছে।

কেমন একটা শব্দ হল। সঁৎ সঁৎ। হঠাৎ মুখগুলো পাথর। নারাণদা কী যেন একটা কথা বলার চেষ্টা করল আর তখনই আবার তোড়টা এল। তোড়ের মুখে নারাণদার আধাখোলসা কথাটা তলিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর একটা তোড়, কান্নার মতো : শান্তা আমার মার পেটের বোন নয়, নেপুকে ওরা...আমার বুকটা একটুও পুড়বে না না...?

এ যেন অশোক নয়, অশ্কা নয়, এ বি নয়। এই মানুষটাকে গোরা যেন কোনোদিন দেখেনি। আগে আগে এসব কথা উঠলে, পার্টির লাইন নিয়ে কথা হলে এ বি-র গলায় কেমন একটা জাদু খেলে উঠত। আজ আর সেসব নেই। ভবঘুরে জানটা একমুখ দাঁড়ির আড়ালে আজ যেন কেমন রহস্যময়। নিরুদ্দেশ এক ব্যথা আর যন্ত্রণায় রহস্যময়।

নারাণদার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে : অবুঝ হোস না অশ্‌কা...অশ্‌কা...শোন।

বুকে দাগা দিয়েছে কথাটা। এমন দাগা যে ও আর থাকতেই পারল না। হুট্ করে একটানে দরজাটা খুলে বেঁকে দাঁড়াল : দেখিস...আমাদের কমরেডরা জেল ভেঙে ইজ্জতে বেরিয়ে আসবে...দেখিস...

এ যেন সবেতে আঙুল তোলা, কর্তৃত্বপ্রিয় এ বি নয়। সাউথ বেলিয়াহাট্টা লোকাল কমিটির জঙ্গিনেতা এল সি এস এ বি নয়! এ যেন এক অভিমানী শিশু। শেষবার 'দেখিস' কথাটা বলার সময় এ বি-র গলা ভিজে উঠল। পেছনে দরজার পাল্লার একঘেয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ রেখে এ বি মিলিয়ে গেল।

এ বি চলে যেতেই নিবারণটা কেমন যেন ছটফট করতে লাগল। কীসের যেন অসোয়াস্তি। দোটানা। নারাণদাকে হট্ করে ডিঙোতে পারছে না। অথচ ডিঙোনোর একটা দুরন্ত বাসনা। সেই বাসনায় ও চনমন করতে লাগল। যেন সারাটা শরীর অসোয়াস্তিতে চিড়বিড় চিড়বিড় করছে : নারাণদা আমি কিন্তু রাত থাকতেই কাটব। গাঁয়ের হালচাল বলুন। একটু শুনে যাই...

সুকুর যেন কোনো তাড়া নেই: তাই হোক।

নারাণদার চোখ জোড়া সুকুর চোয়ার মুখের ওপর থমকে দাঁড়াল : কী কথা?

নেপুর কথা হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতে চালান দিয়ে শান্তার গলা কেঁপে উঠল : কী করে ঢুকলেন।

অন্ধকারের ভিত উপড়ে দু-জোড়া চোখ মানুষটার মুখে আস্তানা গাড়লো। অজস্র জিজ্ঞাসার কুঁড়ি মেলে। ধানবোনা মানুষের কথা শোনার পরম আগ্রহে।

'আমি তো পয়লা গিয়ে উঠেছিলুম কাটিহারে এক মিল-মজদুরের ডেরায়। সুখলাল নাম। সুখের তো আর বালাই নেই। সেও আজকের লোক নয়। আগে সি পি এমে ছিল। তারা আগে সি পি আই। মানে লাল পার্টির লোক বলতে যা বোঝায় বিলকুল তাই...তেল খাওয়া পাকা বাঁশের মতো শরীর। টিনের চালার ডেরা। পাশে ভুট্টার ক্ষেত। মানুষটাকে মানত সবাই। ওরই এক রিস্তেদার, শালা সম্মুন্দি থাকত মতিহারির গাঁয়ে। মিলের টোলায় দিন কতক কাটিয়ে সিধে সেখানে গিয়ে উঠলুম। কানহাইয়াজি। দিনভর কেতারি ছাড়াই। তাও আবার কি আনাড়ি হাত হাঁসুয়ার টানে আঙুলের ডগ উড়ে গেল... কানহাইয়াজির জেনানা শিখিয়ে পড়িয়ে দিল— ওপর দিকে হাঁসুয়া টানতে নেই...।'

ছ-ছটা প্রাণীর শ্বাস নেওয়ার শব্দ উঠছে একটানা। আর মতিহারি থানার ফুলিয়া গাঁ মোমবাতির আবছা আলোর রহস্যে গেরো খুলছে একটু একটু করে। তামার মতো বর্ণ, রোদে জ্বলা মানুষগুলো চোখের পিছিতে খরা নিয়ে ঘরখানার ভেতর যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। সুখ দুঃখের পাঁচালি গাইছে।

নিথর নিকষ রাত হু হু করে গড়িয়ে চলছে। রাত গাঢ় হওয়ার সাথে সাথে শান্ত নিটোল সেই কাহিনী সোয়াদ পাল্টাতে পাল্টাতে এখন কেমন ক্ষার ক্ষার। কাহিনির খাঁজে খাঁজে এখন কাঁটা বিঁধছে। চরচর করে মাথা তুলছে প্রশ্নের চোখা ভালা।

...'পার্টি কমরেডরা গ্রামগঞ্জ কলকারাখানায় মেলাই তকলিফ সইছেন, বিস্তর কষ্ট হজম করেছেন...আমাদের অঞ্চলেই তো এক কমরেড দিনের পর দিন সেরেফ হাড়িয়া খেয়ে

কাটিয়েছে আদিবাসীদের ভেতর। কিন্তু ঠিক মাটি কামড়ে আছে...উপোস দিচ্ছে দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল হেঁটে সাফ করে দিচ্ছে...গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু মজদুর আর কিষাণের সামনে কী প্রোগ্রাম তুলে ধরতে পারছি...এক ওই খতম ছাড়া (এই জায়গায় নিবারণ ফোঁস করে উঠল, এতক্ষণ যেন ও মওকা খুঁজছিল)।

: তাহলে খতমের রাজনীতিতে আপনার আস্থা নেই?

: নাহ্ সন্ত্রাসবাদে কোনো কমিউনিস্টের আস্থা থাকে না।

নিবারণের বিরক্তি গাঁজলা তুলতে লাগল। হঠাৎ ধৈর্যের পাঁচিল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। শান্তা বিড়বিড় করে কী যেন বলতে গেল, ওর মুখের ভাপে মোমবাতিটা নিবু নিবু।

আর নিবারণ শিরাজাগা হাতটায় মুদ্রা করল : তাহলে তো কোনো কথাই হয় না!

নারাণদা শক্ত হাতে হাল ধরে থাকল : না হয়, এরপরেও কথা হয়।

এবার সেই কথা তরতরিয়ে বয়ে চলল। নারদ্‌নিকের কথা। রাশিয়ার সেই আধাসন্ন্যাসী দলের কথা শান্তা আর সুকু উন্মুখ হয়ে শুনতে লাগল। ছ-টা প্রাণী কখন যেন আবার হ্যাঁচকা একটা টানে রাশিয়ার তুষার ঝড়ে হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল।

নারাণদার কথার মাঝখানে শান্তা এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। কখনো বা একটানে চিকন ভুরুটাকে কপালে চড়ায় : এটা মানতে পারলুম না। মানুষটা হেসে একটা বইয়ের নাম করল : খুলে দেখো...আছে। তখনকার মতো মিটল। ফের সুকু চেপে ধরে : আপনি বলতে চান আমরা যা করছি সব ভুল!

নারাণদার মুখে সাফসুতরো হাসি : নাহ কমরেড!

গোরা ফ্যালফ্যাল করে মানুষটার দিকে ঠায় চেয়ে আছে। মানুষটার কথা গিলছে কান খাড়া করে। কতকগুলো কথা তো গোরাও বুঝেছিল কিন্তু বোঝাতে পারল কাকে! হয়তো ওর বোঝার ভেতর ফাঁকফোকর ছিল। তা ছাড়া, এ এক সূক্ষ্ম শিল্প, নিজের বোঝা আর এক জনের কাছে চালান দেওয়া। কথার গ্যাজর গ্যাজর নয়। আবার কথার জটে খেই হারানোও নয়। এ যেন কেমন আঁশ ছাড়ানো। পরতের পর পরত খোলা। যতক্ষণ না শাঁসটুকু পাওয়া যাচ্ছে।

নিবারণ তেমনি তেড়িয়া : তাহলে এখন সবাই বই হাতড়াবে!

কথাটা বলার সাথে সাথে নিবারণ গাঁটাল আঙুলটা শূন্যে আছড়াল। বাতাস কেটে শব্দগুলো হিস্ হিস্ করে উঠল। খানিক ছেদ নেমে এল। সুকু মেঝেতে আঁচড় কেটে চলেছে। অর্থাৎ ভাবছে। গভীরভাবে কী যেন ভাবছে। আর নিবারণের তেড়িয়া ভাবটাকে নারাণদা যেন শান্তভাবে থাবড়াতে লাগল : বিপ্লব হল একটা শ্রেণির উত্থান...

গলার ওঠা নামা নেই। এক ঢঙে বলে যাচ্ছে। মানুষজনের জান আর জীবন দিয়ে যে কথা শুরু হয়েছিল, এখন হামানদিস্তায় পিষে ডলে তার নির্যাস বের করছে। এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে এক গূঢ় তত্ত্বের প্রশ্নে, বিপ্লবের তত্ত্ব।

বধ্যভূমি, কারাগার, একঝাঁক বুলেট

পচাখালের ঠেকনায় রঙকল। রঙকলের কলজে ফেঁড়ে শেডের ওপর চরচরিয়ে উঠে গেছে গহেরা কালো চিমনি। ভরপেট ভুখ আর পাঁজরার খাঁজে তাকত ঝক্কি নিয়ে কবে যেন আলি চিমনির মাথায় খুনখারাপি লাল ঝান্ডাটা আঁট করে বেঁধে দিয়েছিল। মজদুরের ইজ্জত। ইজ্জতের লড়াই।

ভাজা ভাজা রোদ আর আকাশফাটা বাদলায় আলির মেহনতি খুনের মতো ঝান্ডার টকটকা রঙটা আর নেই। এখন বড়ো মলিন। ফ্যাকাসে। ম্যাড়মেড়ে। জোরে বাতাস দিলে, বেলেঘাটার পোড়া ঘায়ে টান লাগলে, ফেঁসে যাওয়া ঝান্ডাটা তবু মুরারীর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি নিয়ে ফর ফর করে ওড়ে। তখন হেঁচকির মতো একটা শব্দ ওঠে। আর বিল্ডিঙের তেতলার ঘর মরা মোমবাতির আলোয় সেই শব্দে শোকের ঘেরান পায়। কেমন যেন মৌন হয়ে যায়। পাষাণের মতো। অহল্যার মতো।

আন্ধাইর রাত কাটে। চাকা চাকা করে। রাতের বুদবুদ ফাটিয়ে বেলেঘাটায় ভোর আসে ইনফর্মারের ছোকছোক চোখ, ষড়যন্ত্রের আদিম অন্ধকার বুকের ভেতর ছিপিয়ে।

দূরে কোথাও আজানের আর্তনাদ : আল্লা...ইলাল্লাহ...মহম্মদই...রসুল...

আলির কথায়, চিমনির আগায় পুতলিকলের মজুরের গামছার ফেট্টির মতো ঝান্ডার স্মৃতিতে, বিবিবাগানের বস্তিটা গোরার চোখে আলির ঝুপড়ির কুঁজ নিয়ে নড়ে ওঠে। আলির কথা মনে হয় : তোবড়া মুখ, থ্যাবড়া নাকের গুটলি। রবারকল আর রঙকল যেন সাঁড়াশির মতো ডান্টি দুটো দিয়ে ভুখা নাঙা বস্তিটার গলা টিপে ধরেছে। সাঁড়াশির তিনকোনা ফোকরের ভেতর বিবিবাগানের খেটে খাওয়া কলিজা ধুক ধুক করে। বিয়ে সাদি-নিকে-সরহাদ আর কাওয়ালির বোলচাল নিয়ে। আর বস্তির নালার মতো গলিটায় বিচখানে শিরাফাটা হাতের লোম ঝলসে চোখা শিকে মাংসের টুকরো গেঁথে আগুনে ঠেসে ধরে বিবিবাগানের মানুষ। জীবনমরণের ছোটোবড়ো ঢেউ তুলে বেঁচে থাকে বেকুফ মানুষ। চড়ুইর মতো দুবলা বুকের খাঁচায় বাতাস পুরে নিয়ে কোনো বুড়ো কারিগর গাল পারে, থু থু করে।

এতক্ষণে আলি ফাল দিয়ে উঠেছে। তড়াক করে। বদনা নিয়ে গোসল করতে গেছে মালগাড়ির লাইনে। আর দু-দুটো বাচ্চাসমেত যে নাজিমা বিবিকে নিকে করে এনেছে গেইলা মাহিনায়, ধুঁদুলের মতো মুখখানা মরা বুকে ঝুলিয়ে সে এখন চুলায় আগ লাগাচ্ছে। এরপর খানিক মাইলো-গেঁহু-যব মেশানো আটার সাথে একগাদা ভুসি মিলিয়েজুলিয়ে এক লোটা পানি উপুড় করে দেবে। তারপর দুলে দুলে মাখতে বসবে। তারপর লেচি। তারপর রোটি। সেই রোটি গামছার খুটে বেঁধে আলি কাজে যাবে। নাজিমা মহম্মদের পানগুমটির দোকান অব্দি একপা একপা করে এসে পাষাণ হয়ে যাবে। গলিটার মুখের দিকে তাকিয়ে আলি তখন মুখ ফিরিয়ে

নাজিমার রুখুসুখু তামা-পয়সার মতো মুখ, বাচ্চা দুটোর সর্দির পাতলা সাদাটে দাগ আর চেরা-চেরা, ফাটা-ফাটা চোখগুলো দেখবে। বাচ্চা দুটোর চোখ যেন চামড়া ফেটে জেগে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে আচমকা আলির গুটলি পাকানো নাকের তলায় হাসি ঝরে পড়ে। পরম বিশ্বাসী। টলটল হাসি। আর আলিকে তখন বিলকুল নাজিমার বাচ্ছার বাপের মতো মনে হয়।

সাউথ বেলেঘাটার খবরাখবর। পাঁচকান ঘুরে, কুরিয়ারের হুঁশিয়ার কানে। আনাচকানাচ থেকে খবর আসে। সমাচার। আর বিল্ডিঙের বুক ফেঁড়ে হু হু করে ছুটে যায় ভেড়ির দিকে। ঠিক যেমনি খিদিরপুর-কলেজ স্ট্রিট-শিয়ালদার মোড়ে পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলার সময় টিয়ার গ্যাসের এক একটা সেল এসে পড়ত পায়ের কাছে। আর ছেঁড়া বস্তার টুকরোয় চেপে ধরে নর্দমার ধারে কিংবা রাস্তার চাপাকলে ঠেসে ধরত। কাঁদানে গ্যাসের সেল। মানুষ কাঁদানো গ্যাস। সারাটা বেলিয়াহাট্টার শোক-দুঃখ আর আগুনের মতো রাগ নিয়ে খবর আসে বিল্ডিঙে। তেতলার কালিঝুল ঝাপসা ঘরে : আলি অ্যারেস্ট...! বিজয়দার সাতসোজা ঢিলেবউ ছিরিবউদি দিয়ে গেল খবরটা। বাঁ কাঁকে রিকেট-রোগা মেয়েটার ন্যাতার মতো শরীর। ছিরিবউদির চোখে এখন বিপদের টানা কাজল। সোনারপুরের লক্ষ্মীর পা আঁকা শান্ত হাত ধানগোলার দাউদাউ আগুন দেখে শক্ত। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বিপদের ফাটলের মতো নালাটা লাফ মেরে পেরিয়ে গেল ছিরিবউদি। আর ন্যাতার মতো মেয়েটা পরম ভরসায় মার কাঁধের বেঁকা হাড়ে মুখ গুঁজে দিয়েছিল।

আলির খবরটা শুনে খাঁ খাঁ করে উঠেছিল গোরার পোড় খাওয়া বুকটা। কী এক অমূল্য সম্পদ হারিয়ে বিবাগী দুঃখ বুকের ভেতর খুঁড়ে খুঁড়ে পাতাল খুঁজেছিল। আকাশপাতাল। সোনার মার মতো শোক জেগেছিল।

যমে নিলে, অসুখে-বিসুখে মল্লে মনটাকে তবু বুঝ দেওয়া যায়... এ যে জলজ্যানতো ছেলে!

সোনার কচি মুখ আর ফালা ফালা হিম্মত মনে পড়ে। পা দুটো টালমাটাল হলে ঘরফেরা মন রুটির মতো ফুলে উঠলে, পিছুটান চোখের সামনে হতাশার ঝাপসা আশমান লটকে দিলে, কে যেন গোরার কানে সোনার কথা বলে। যাত্রাদলের নিরপেক্ষ বিবেক হারমনিয়ামের তিননম্বর রিডটা দাবিয়ে রেখে একহাত পাখনার মতো মেলে কাত হয়ে ছুটে আসে : ওরে ভোলা ম...অ...অ...অন...। হাজার যুক্তি, তক্কো, তত্ত্ব তখন সুতো ছিঁড়ে বলি রাজার মতো শূন্যে ঝুলতে থাকে। সাহসের বয়লার বুকে নিয়ে এ বি নামের যে মানুষটা হাই পাওয়ারের চশমা পরে ঝড় উড়িয়ে বেড়াচ্ছে তার কথা মনে হয়।

নারাণদার ব্যাপার ভিন্ন, সে দুসরা কথা। পর্বতের মতো থিতু হয়ে আছে বেলিয়াহাট্টার বুকে। অনড় অটল। মিনতি বউদির শান্ত মুখ যেন মানুষটার হৃদয়। মানুষটা অমনি। আমরণ অমনি থাকবে। অথচ গোরা যখন শুনল কলেজি ছোকরা বীরু একবার ধরা পড়েই সব উগরে দিয়েছে, গোটা এল সি-র নামটাই ফাঁস করে দিয়েছে, তখন কি ভেতর ভেতর অবিশ্বাসের কাঁটাগাছ মাথাঝাড়া দেয়নি? কমরেডদের গায়ের ওমের ভেতর বসেও কি বরফ-চাপা মাছের মতো চোখে হিম লাগেনি?

আর বুরবাক আতঙ্কে হাত দুটো লুলা হয়ে গেছিল : এর শেষ কি মৃত্যুতে। এ বি-র মনেও কি একই প্রতিক্রিয়া চলছে? শুধু সুরটাই যা আলাদা, বৈষ্ণবমার্কা—মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

মনের অন্দরে কথা ফুটছিল সবাইকে ছিপিয়ে। নিজেকেও। অথচ গোরা গভীরভাবে জানত—এর নাম ডর নয়। ভয়ডর আলাদা চিজ। হাঁটু কাঁপে। অবশ অবশ লাগে। হয় নিজেকে বাঁচাতে ইঁদুরের গর্ত খোঁজে, না হয় খুনখারাপি করে বসে। গোরার ওসব ছিটেফোঁটা নেই। গোরার কেস আরো জটিল (এবার নিজের মনটাকে কাটাছেঁড়া করতে লাগল)। আরো গহেরা।

অ্যাকশন। সংগ্রাম। সশস্ত্র সংগ্রাম। ফুলঝুরির মতো। আতসবাজির মতো। সংগ্রাম ফেটে পড়ছিল গ্রামগঞ্জ এবং আজব কলকাতা শহরে। অ্যাকশনের ফোয়ারা ছুটেছিল ফিনিক দিয়ে। যদিও ভাঁটার মরা চাঁদ জোয়ারের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে এখন। এখন বাতাসে আগুন ওস্কানো গ্যাসের অভাব। এখন বাছাবাছা কমরেডের লাশ হাত-পা বিছিয়ে দিচ্ছে শক্ত মাটিতে। জেলের পাঁচিলটা প্রকৃতিবিজ্ঞানে পড়া কলসগাছের মতো গন্ধ শুঁকে এক একটা জোয়ান ছেলে টেনে নিচ্ছে পেটের ভেতর। মানুষজনের মুখে বোল নেই। ছেলেগুলোর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা দেখে মধ্যবিত্ত বাপটা জীবনে একদা থরথর করে উঠেছিল, অতীতের স্মৃতি ঘেঁটে আশঙ্কার ডঙ্কা বেজেছিল কানের দুবলা পর্দায়। কিন্তু এখন? নিজের অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়া এইসব দামাল প্রাণ যখন বুলেটের আগুনে বুকের সাদা হাড় বের করে চিৎকার করে উঠেছে : বাবা দেখো আমি মরিনি, দ্যাখো দ্যাখো কেমন বেঁচে আছি! তখন? মুনাফার জন্যে ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে দেওয়া হয় যে দেশে, যে দেশের বুকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘুণপোকার মতো হাঁটে এখনও, একান্ত সৎভাবে সারাটা জীবন কাটিয়ে, সেই দেশের প্রতি পবিত্র গোপন ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করেও যে মানুষটা অক্ষম, সে তখন কী করতে পারে? যার পক্ষে আত্মহত্যা অসম্ভব অথচ কান্নার সমুদ্র পোড়া রোদে নিঃশেষিত, সেই পিতার অ্যাজমার টান তখন কীসে সামাল দেবে?

'প্রেম-পূজারি' অ্যাকশনের পোড়া গন্ধ এখনও গোরার নাকে লাগে। ঘুড়ির মতো কার্নিক খেয়ে বীরু পার্কশো হলের কাউন্টারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল : চীনবিরোধী অপপ্রচার পুড়িয়ে ফেলো, ছিঁড়ে ফেলো। কাউন্টার থেকে একগাদা টিকিট টেনে নিয়ে ফাতা ফাতা করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিল ঘূর্ণি ঝড়ের মতো। সেই কুচো কাগজ উড়ে উড়ে দেয়ালে ঝোলানো নায়িকার অর্দ্ধনগ্ন দেহের লজ্জা নিবারণ করে। সাত-আট জনের স্কোয়াডটা দপ্‌দপ্ করছিল ঘেন্নায় আর জোসে। অথচ হলটার দুহাত পেছনে খোচরের সঙ্গে লড়াই যখন চিগির দিয়ে উঠল, এবং গোরা একটা মাত্তর পেটো নিয়ে কোমরে ঝাঁকি মেরে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তখন ও ঘুণাক্ষরে জানত না ওটা ভেজা মাল। ওটা থেকে স্‌প্লিন্‌টার ছুটবে না আগুন নাচিয়ে, খোচরের সিনা ফাটিয়ে জমাট ঘেন্নার ভয়ঙ্কর কোনো গর্জন হবে না। আর হাতের চেটো গরম হয়ে উঠেছিল আশু আগুনের কথা ভেবে, ধোঁয়ার জাল আর বিস্ফোরণের কথা ভেবে। হাতের মুঠোতেই যেন ফেটে পড়ে এক আগ্নেয়গিরি। জান বাঁচিয়ে, হুঁশিয়ারির সাথে খোচররা

গুটি গুটি এগোয়। আর পিছোয়। হঠাৎ দাঁত চেপে মালটা ছুঁড়ে দিল গোরা। দশহাত পিছিয়ে গেল দঙ্গলটা। অথচ, মালটা ধীরে ধীরে আশ্চর্য কোমলভাবে মাটি ছুঁয়ে গড়িয়ে গেল। গোরার হাত দুটো ফাঁকা। আঙুলগুলো খুলে গেছে। সামনে পড়ে আছে অসম্ভব সাহস নিয়ে ভেজা একটা দড়ির মাল। তবু যে গোরা পালাতে পেরেছিল সে শুধু খোচরের দল ঘাবড়ে গেছিল বলে। তারপর ফাঁকা হাতের থাবাটার দিকে তাকিয়ে কতবার ভেজা মালটার কথা মনে হয়েছে। আশু লড়াইর কথা মনে হয়েছে। পোড়া ঘা দপ্‌দপ্ করে টাটিয়ে উঠেছে কতবার। ভেজা একটা দড়ির মালের স্মৃতি নিয়ে।

গুটি গুটি হাঁটা ধরেছে রাত্তির। মোমবাতির কালো পলতের অসহ্য রাতটাও যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে শেষ হয়ে আসছিল, তেতলার ঘরটার সেসব খেয়াল নেই। তেতলার ঘরে আঁধার রাতে বুনোমানুষের কাহিনি হামা দিয়ে এগিয়েছে। কবে পায়ের ওপর ভর দিয়ে টানটান পিঠ মেলে মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল, কবে মুখে বোল ফুটল, এইসব অতীত ইতিহাস। পাথরের ভোঁতা অস্তর হাতে নিয়ে ভয়ঙ্কর জন্তুর সাথে লড়াই। মানুষের সংগ্রাম, সংগ্রামের ইতিহাস। এখন এই সত্তর সালে বেলিয়াহাট্টার বিল্ডিঙের কামরায় বাতাসের পাগলা চক্কর মরাপাতা, খড়কুটো উড়িয়ে আনতে লাগল।

নারাণদার চোয়ালের তেড়িয়া হাড়টাও এখন শান্ত, জিরেন নিচ্ছে : সংগ্রাম চলছে... সেই দাস সমাজ থেকে...স্পার্টাকাস...

খরাপোড়া মতিহারি থানার কানহাইয়াজি, কেতারি সেদ্ধর ভাপ আর আট চল্লিশের জঙ্গ জাগানো গান দিয়ে নারাণদা যে কথাব বীজ বুনেছিল, গোটা মানবজাতির বর্গ দুশমনের খিলাপে লড়াইর হাজার বছরের ইতিহাসের জীয়ন্ত কথায় তা এখন গুরুগম্ভীর। এখন মজুরের জয়গান, বীরত্বের গাথা।

ধুকধুক মোমবাতি বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ নিভে গেল। আর চুনোটজলের মতো ধোঁয়া ধোঁয়া সকাল পিছলে গেল তেতলার কামরায়। মরা মরা আলোর একটা ফালি এসে পড়েছে লিফলেটের বোল্ড টাইপের ওপর : শহিদের আত্মত্যাগ বৃথা নয়। 'বৃথা' শব্দটা বৃথাই মলিন হয়ে গেছে জল-কালি-ধুলোয়। সারাটা ঘর জুড়ে ধুলোট গন্ধ। দমকাদামাল বাতাস খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গন্ধটাকে উস্কে দিচ্ছে। হাপড় টানে শ্বাস নিল কে যেন। বুড়োর জোরদার বিশ্বাস ফিসফিস করে ওঠে: আলবাত, কমুনিস হতে গেলে সব ছিঁড়েখুঁড়ে জানতে হবে। এ তো আর মন্তর তন্তর ফুক-ফাঁক নয়...

নিবারণ মুখিয়েই ছিল, হাড়গিলে হাতটা একটু নড়েচড়ে উঠল : হাড়ে বাত্তি ধরে যাবে তাহলে!

নেপুর দুঃখ শোক পাষাণ চাপা দিয়ে শান্তার ফিনফিনে ঠোঁটে স্পষ্ট হাসি: না...না...না...তা কেন?...নামতে হবে মোদ্দা কথাটা জেনে...কীসের লড়াই... কে সাথ দেবে...কার সাথে লড়াই...এইসব। বাদবাকি সব চলতে চলতে শিখতে হবে।

নেপুকে টেনে নিয়ে গেছে এক রাত্তির পোহায়নি। অথচ শান্তার টলটল চোখে জলের চিহ্ন নেই। অদ্ভুত কোমল। নেপুও তেমনি, বিয়ের দিনই তো ঠোঁটের কোণে হাসি সাপটে

কুমারীর বেণীর মতো মালদা জেলার আলপথে খেতিমজদুরের মেটে হাঁড়ির পাখালভাতে ভাগ বসাতে ছুটেছিল। জেলের ভাত পেটে না গেলে নেপুর পুষ্টি হবে না। এত সব ভাবনাচিন্তার অহল্যা পাষাণের সাত হাত নীচে মৃত্তিকার আসন্ন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নিয়ে, শান্তার মনের কোনো গোপন ফাটলে একবিন্দু জল জমে থাকে। অথচ মেয়েটার মুখ বসুন্ধরার মতো সহনশীল, নির্বিকার। দু-হাঁটু ভাঁজ করে টানটান হয়ে বসেছিল। কোমর বেঁধে নামার তাগত আর বিশ্বাস ওর সিঁথির সুতোর মতো ক্ষীণ রেখায় জোরদার।

বিল্ডিঙের মাথার ওপর এরিয়ালের ছিলার মতো তারে শোকের চিহ্নস্তুতের মতো কালো রঙ লেপটে আছে এখনও। আর ভেড়ির বুক থেকে উঠে আসছে শিকারি বকের মতো বাতাস। বাতাস যেন ওদের সারা শরীরে বিছিয়ে দিচ্ছিল পাঁচ-পাঁচটা আঙুল। আঙুলের গাঁট। ভররাত চুলচেরা হিসেব, গহেরাগহীন তক্কো। আর অজানা জ্ঞানের সোয়াদ জিভের কাঁটাকাঁটা গোটা নিয়ে, চোখ জুড়ে স্বপনের আলপনা এঁকে এখন ভোর হতে চলল। রাতভর জাগানের সুর বেজেছিল। কোথায় যেন বুকের ছাতি ফাটা তেষ্টা নিয়ে ধুকধুক করছিল প্রাণ। জীবন যেন দুহাত ওপরে তুলে ইনকিলাবি স্লোগান দিয়েছিল মানুষের আগুন আবিষ্কারের গল্প কমিউনিস্ট ইস্তাহারের 'দুনিয়াকা মজদুর এক হো' স্লোগানে থেমেছিল এসে।

সিগারেটের আগুন চোয়াল ভেঙে উস্কে নিয়ে নখের আগায় চেপে ধরল সুকু : কলকাতায় থাকলে অত ভুল শোধরানোর টাইম পাব বলে মনে হচ্ছে না। ...ঠিক গেঁথে ফেলবে...

যেভাবে লাগাতার ছিঁড়ে খুঁড়ে সব পরখ করা শুরু হয়েছে, তাতে আর না বুঝে উপায় কী। বিল্ডিঙে আবছা সকাল সুকুর বুঝদারি নিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে এতক্ষণে। তবু বলতে গিয়ে কোথায় যেন খচ্ করে কি একটা বিঁধে যায়। আর গলা সরে না। তাই ঘুরিয়ে কথা বলে সুকু। যেটুকু বুঝেছে তাই আগলে নিয়ে মতিহারি যেতে চায়। কিংবা যেখানে হাঁসুয়ায় ধান কাটার খস্ খস্ শব্দ জাগে। দঙ্গল বেঁধে মজুররা কাজে যায়। সুকু একছুটে তাদের দলে মিশে যেতে চায়। গন্ধে গন্ধে বুঝতে পারছে খতমের হুলিয়া হাতে বেলিয়াহাট্টা তোলপাড় করে পুলিশ সুকুর খোঁজ চালাবে। কলকাতায় থাকলে আজ হোক কাল হোক ঠিক গেঁথে ফেলবে। আর একবার ছেঁকে তুললে, কিংবা দানা গেঁথে দিলে জিন্দেগিতে আর সাচ্চা লাইনে মানুষগুলোকে খাড়া করার ফুরসত পাবে না। এক ভুলের মাশুল হিসেবে ধরে দিতে গোটা একটা জীবন। যে জীবন বহুকাল আগে আধাবুঝ আধাআবেগে মজদুরের স্বার্থে উৎসর্গিত।

আমার সাথে যাবি।

নারণদার আশ্বাসে ছেলেটার গলা শিশুর মতো হয়ে যায় : একবর্ণও যদি আগে বুঝতাম!

ফের মেঝেতে আঁচড়। অথচ থই নেই। সুকুর আলগা মুঠো খুলে আঙুলগুলো শুধু ছড়িয়ে গেল ধুলোমাখা খসখসে মেঝের ফাটলে। শান্তার খরখরে চোখে একটা ফোঁটা চিকচিক করে উঠল, বালির দানার মতো, নির্মল পানির মতো। কোথায় যেন বেদনার খনি। শ্রেণিঘৃণার ধিকধিক আগুন। আগুনের জ্বলন। আর জননীর জলজ স্নেহের মতো তালপাতার পাখার বাতাস, ঘরটার ভেতর ফুরফুর করতে লাগল প্রজাপতির মতো। ভাঙা পাখার ডাণ্টিতে কেমন একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। আর পাখাটা সুকুর গায়ে লাগতেই শান্তা মেঝেতে পরপর তিনবার ঠুকে নিল।

সাতাশ বছরের ছিবড়ে পাকস্থলীতে হাত রেখে নিবারণ তখন কাঠকাঠ। শ্রেণিশত্রু ছিঁড়ে ফেলার জন্য দুপাটি দাঁতই যথেষ্ট। রাতভরের এতো তত্ত্ব, ইতিহাস, নিবারণের কাছে গজলা। ফুটোপয়সা দাম নেই। মাজাভাঙা বউটার কথা মনে হয়েছে ওর। নিজের শরীরের রক্ত, আকাঙক্ষা দিয়ে যে শিশুর জন্ম দিয়েছিল, তার কথা মনে হয়েছে আর আগুনের মতো রাগ কণ্ঠনালী দিয়ে হু হু করে ছুটছে। সুকুর মুখটার দিকে ঘেন্নায় তাকাতে পারছে না ও। এখন শুধু রাতটুকু কাটা নিয়ে কথা। নাহলে নিবারণ এখানে এক মুহূর্ত থাকার পাত্তর নয়। আসলে এই শেষ রাতটাই তরাস বেশি। শেষ রাতে খেঁকিকুত্তার চোয়াল ফাঁক করা ডাকে চোরের মতো নিঃশব্দে খোচরের হামলা।

অথচ, ভুখমারা ভারতবর্ষের বেলেঘাটায়, বেলেঘাটার লোনা দেয়ালে এখনও জ্বলজ্বল করে মাওয়ের টেনসিলের ছাপ : নিপীড়ন হলে প্রতিবাদ হবে। পেটোর গহেরা দাগ বুকে নিয়ে পড়ে আছে ভি আই পি রোড। বেলেঘাটার বুড়ি ছুঁয়ে। বিদেশ থেকে হত্তাকত্তা ওই রাস্তা দিয়ে ফুস করে চলে যায়। নীলা চোখে বেলেঘাটার ওপর নজর বুলিয়ে। দু-হাত ফারাকেই মুরারীর বিশ্বাসী উষ্ণ খুন বয়ে গেছে লেকের পানিতে। বালুচরের ঢ্যাঙা বকফুল গাছটার ছাল ওঠা গুঁড়িতে গুলির কাঁচা দাগ মেলায়নি এখনও। অন্ধকার বেলেঘাটা নাঙা হাড়ে এইসব ছিপিয়ে ঘাপটি মেরে আছে। কখন যে ফাল দিয়ে উঠে দু-হাতে আশমান জাপটে গলার নলি ফেঁড়ে ফ্যালে : ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, দেশ কি জনতা ভুখা হ্যায়! হয়তো তখন 'ভুখ' শব্দটা হাড়্ডিকল আর চামড়াপট্টির বিকট গন্ধ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাকস্থলীর মতো রেললাইন ধরে ঝড়ের মতো ছুটে আসবে।

ভুখ ভুখ ভুখ

হয়তো তখন নয়া ভাবনায় পুরোনো গান সুকুর গলায় জোস এনে দেবে : মাকি আঁসু বানালে সাথী...আজাদি ছিনকর লানা হ্যায়, লানা হ্যায়...

কোমর ধরে ফের সংগ্রামের অঙ্কুর জাগাবে গনগনে সূর্যের আশায়। কাঁসার শূন্য একটা থালার মতো সূর্যটা (বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে সূর্য ওঠা একঘেয়ে, তবু ওরা না ভেবে পারে না) একটু একটু করে এগিয়ে আসবে নাগালের ভেতর। আর বিরাট এই দেশ মাথাঝাড়া দিয়ে উঠবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে। এই তো স্বপ্ন! এই তো গোরা আর সুকু, নিবারণ নারাণদা আর শান্তার জীবন!

বিল্ডিঙের তেতলার ঘরটা বেলিয়াহাট্টার মাথার ওপর বায়ু-নিশানের মতো বেসামাল উথাল আবেগে তিরতিরিয়ে কাঁপছিল : আমাদের একটা স্টাডি সার্কেল খোলা দরকার...

শান্তার এই কাটা কথাটা ভরাট করতে আরও কত কী যে দরকার। মেয়েটা পাগলের মতো আওড়াচ্ছিল। তিলে তিলে তিলোত্তমা সৃষ্টির ছ-জন কারিগর, পোড়া জীবনের শোক-দুঃখ আনন্দ আর জ্বালার পাঁচমিশেলি অভিজ্ঞতা নিজেদের হাড়মাস থেকে টেনে এনে, ছেঁচে, ছেঁনে, ডলে কি এক দুর্লভ বস্তু আবিষ্কারে ডুবে গেছে। থেকে থেকে ওরা মার্কস, লেনিন,

স্তালিনের কথা বলছিল। আর বিশাল এই দেশের কথা। সঠিক একটা রাস্তা চিনতে, খুঁজে বের করতে তেতলার ঘরটা সূক্ষ্ম একটা বিন্দুতে সমস্ত অনুভূতি, ইন্দ্রিয় অর্ঘ্যের মতো সাজিয়ে এখন মগ্ন। চোখগুলো ছুঁচের মতো বিঁধছে। বিষণ্ণ ধুলো, ছেঁড়া কাগজ আর মরা আলোয় ওরা যেন হারানো একটা পেরেক কিংবা আলপিন খুঁজছে মেরামতির জন্য।

লুটোপুটি বাতাস এখন লিফলেটের গাদায়। ঘরময় সাদা কবুতরের মতো উড়তে লাগল দু-চারখানা লিফলেট আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো। শান্তার কুঁচো চুলে খড়কুটো। কেমন একটা ঝড় ঝড় গন্ধ। অথচ ওদের হুঁশ বলতে নেই। ওদের বুকের বাঁদিকে হৃৎপিণ্ডের স্বচ্ছন্দ ওঠানামায় রক্তের সাফাই ধোলাই। আর শান্তি। আশ্চর্য শান্তি ঝরে পড়ছিল সুকুর কথায়। বিপ্লব যেন এক শিশুর জন্ম...

এরপর ছেদ। কথাগুলো ভেঙে গলে যাচ্ছিল। কানের লতি ছুঁয়ে শান্তার অনড় হাত। নারাণদার দেহাতি গোঁফের ফাঁকে আগুনের লাল ফুটকি। স্বপ্নদেখা গোরার চোখ। সুকুর নাকের ডগে ক্লান্তির ঘাম। মুক্তোর মতো ঘাম। নিবারণের বুকের কাঁচা আগুন। আর শিশুর মতো শান্ত মন্টুর ল্যাপা মুখ। বুড়োর টানা হাসি। অদ্ভুত আনন্দে যেন হাততালি দিয়ে নেচে উঠেছিল। রাতভর কঠিন অন্বেষণে ওরা আনন্দ আবিষ্কার করেছিল বিপ্লবের বেঁকাতেড়া জটিল যাত্রায়। আর এখন ধবধবে ভাতের মতো সকালে আনন্দের শান্তি। শান্তি যেন টলটল করছিল পদ্মপাতায় একবিন্দু জলের মতো তেতলার ধূসর ঘরে।

মায়ের বুকের দুধ ফিন্‌কি দিয়ে ছুটিয়ে এখনও ভোর হয়নি। হত্যাকারী খুনি, বেশ্যার দালাল, আর লম্পট মাতালের বেচাল চলাফেরার জন্য ছিঁটেফোঁটা অন্ধকার চামচিকের মতো এখনও ঝুলে আছে। আর ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করছে। পুলিশ, খোচর, সি আর পি-র বেয়নেট আর গোবদা মিলিটারি বুট ঠিক এই টাইমেই অন্ধকারের বোরখায় হামা দিয়ে হাঁটু ঢেকে হাঁটে। বিশাল উরু ঘষটে। গন্ধ শুঁকছিল সামনের বিকট দুটো কুকুর। বেলেঘাটার নোংরার ভুরে পচা মাছের পটকা আর মরা গোরুর পেটে নাক ঢুকিয়ে গন্ধ শুঁকছিল কুকুর দুটো। আর সারাটা বেলিয়াহাট্টার জান, পার্টির মেরুদণ্ডের মতো, জমাট ভুখের অসীম তাকতের মতো বিল্ডিংটা হাঁ করে গেলার জন্যে একদঙ্গল সাদা পোশাকের পুলিশ, খোচর, সোওয়া হাত জিভ বের করে লু ছোটাতে লাগল। কোলে কোম্পানির বিস্কুটের গাড়ি, টেম্পো, ঠেলা আর অ্যাম্বুলেন্সের রেডক্রশের ফুটো দিয়ে রাইফেলের নল বের করে, কারা যেন নাইট গার্ড কিশোরের গলায় বুট তুলে দিল : শালা চেঁচালেই গুলি করব। জলদি বল কোথায় সব...জলদি...জলদি...

কিশোর এই সত্তরে তেরোয় পা দিয়েছে। তেরো বছর বয়সেই পাষাণ রাত্তির খসিয়ে দিতে শিখেছে জাগানের শরশয্যায়। এ বি-র সাথে ছায়ার মতো থাকে ছেলেটা। ছায়া না কায়া? এ বি-র জোয়ান শরীরের ছায়ায় অস্থি-মজ্জায় যে শিশু বসত গেড়েছে সেই কি কিশোর? এই কাঁচা বয়সেই ছেলেটা চোখ থেকে ঘুমের সরস শিরা ছিঁড়ে কবে যেন ধনুকের ছিলা বেঁধেছিল। পাঁজরার হাড় খুলে দুশমনের কলজে ফুটো করে দেবে বলে। তবু লাগাতার তিন রাতের পর হয়তো একটু ঢুলুনি এসেছিল, বুকের ফাঁকে আটকে থাকা নীলবর্ণ স্বপ্ন হয়তো গাংফড়িঙের মতো পাখনার শব্দ করেছিল। আর কচি ছেলেটার ঢুলুনি এসেছিল ধুলোর

গন্ধ উড়িয়ে তেতলার ছোট্ট খুপরিটায়। পোড়া মোমবাতির কালো পলতের ডগায়। লিফলেটের 'শহিদ' শব্দটার ওপর। নিষিদ্ধ পুরোনো ইসতেহারের গন্ধে।

সেঁকোবিষ আর পচাগলা মাংসল হিংসার মতো নিষ্ঠুর শব্দ নিয়ে কোথায় যেন আগুন ফোঁস করে উঠল। সাপের ফণার মতো। শিরশিরে চেরা জিভে। বিষ ছোবলে। কোনো নিষ্ঠুর রমণীর কুচ্ছিত কালো আঁচিল, আঁচিলের একগাদা লোম সর্‌সর্ করতে লাগল : খা, খা বোক্কিলারে খা...। ফঁস.:.স...স...স...

শাপলার মতো নরম শরীরটা দু-হাতে সাপটে নিল বেলিয়াহাট্টা। রক্তের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল শহিদ শহিদ গন্ধ। গরম সিসের গুলির হলকায় ওরা বেলেঘাটায় বধ্যভূমির পোড়ামুখ আঁকতে চাইছিল। একটা মানুষের নাক চোখ। পুড়িয়ে ঝলসে নিয়ে বেলেঘাটার বুকে তার চামড়া টান টান করে মেলে দিতে চাইছিল। বেয়নেটের ডগায় তার মুণ্ডু গেঁথে তলায় লিখে দিতে চাইছিল : যে সকল শুয়ার কা বাচ্ছা, খানকির ছেলে বিপ্লব করিতে যাইবেক তাহাদিগকে এইরূপে...

গম্ভীর বেলেঘাটায় সরল সোজা মানুষের ঘরকন্না। ভালোবাসা আর ঘেন্না সেখানে একবোঁটার যমজ ফুল : পালান! পালান! কমরেডরা পালান! 'কমরেড' শব্দটার ফুসফুসে তেরো বছরের ছেলেটা সারা জীবনের ভালোবাসার লোহিতকণিকা, ভালোবাসার গাঢ় নিষ্ঠা ঢেলে দিয়ে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের বুক থেকে ছিঁড়ে নিল সবুজ এক মুঠো ঘাস। সেই ঘাস ছেলেটার আলগা মুঠো থেকে বিজয়দার কালো কুষ্ঠী রিকেটের মেয়েটার মঙ্গল কামনায় বেলেঘাটার পোড়া বুকে ছড়িয়ে গেল। আর বেলেঘাটা শহিদের সম্মান নিয়ে অনড় হয়ে গেল। বেলিয়াহাট্টা, পুতলিকলের বেলিয়াহাট্টা, যে খোয়াবের পুতুল বানায়! মানুষের স্বপ্নের মাটি দিয়ে গড়া পুতুল। বেলিয়াহাট্টায় বধ্যভূমির গলা চোখ আঁকা যায় না, কেননা ব্যাঙের ছাতার মতো চ্যাপ্টা বস্তির তলায় কালো নোংরা ন্যাংটো একটা ছেলে বারবার ওঁয়া-ওঁয়া করে ডুকরে ওঠে। আর ভুখের পেটে পা দিয়ে মজবুত মানুষ এখনও গান গায়। দিল্‌লাগি করে।

বেয়াদপ বেলিয়াহাট্টার আশমানউঁচা শির। কিশোর নামে ছেলেটার দলাদলা থুতু আর রক্তে ভেজা বেলেঘাটা পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। আশপাশের বিল্ডিঙের কোনো একটা জানলা থেকে বাঙলাদেশের এক পোড়াকপালী মা ছেলের নাম ধরে তরাসে ডাক ছাড়ল : খোকন রে!

আর রিভলভারের নল হিস্ হিস্ করে উঠল।

তিনপাক চক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ার আগে সুকুর গলা সাইরেনের মতো ফেটে গেল: চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হোন!

সত্তরের মরা চাম উড়িয়ে বিল্ডিং হত্যাকাণ্ড। কাগজের ফ্যাকাসে হলুদ পাতায় সংঘর্ষের পুলিশি রিপোর্ট। আর তেতলার ঘাঁটিতে খাঁটি রক্তের কালচে দাগ। এবং সকাল হল অবশেষে। সত্যি সত্যি ফুটফুটে সকাল সাদা মোমের মতো, একফোঁটা চোখের জলের মতো চিকচিক করে উঠল ঘাসের খাড়া ডগায়। ভেড়ির ভেজা বাতাসে সকালের গন্ধ ।

কিশোরের লাশটার পাশে সুকু, বুড়ো আর নিবারণকে এক লাইনে দাঁড় করিয়েছিল। শান্তাকে সেফ করতে গিয়েই নিবারণ ধরা পড়ল। এতক্ষণে শান্তা রিফিউজি কলোনির নিরাপদ

শেলটারে পৌঁছে গেছে। আলকাতরার মতো ভ্যানের কালো রঙ গোরা নারাণদা আর মন্টুকে পেটের ভেতর নিয়ে হাঁসফাঁস করছিল। আর মানুষের তাবত আশা-আকাঙক্ষা চোখের তারায় নিয়ে সুকুদের লাইনে পাঁচ-পাঁচটা জলজ্যান্ত ফুসফুস ওঠানামা করছিল পুরোদস্তুর স্বাভাবিক গতিতে। সুকু বলত : শত্রুর বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ফুসফুস যদি একবারও বেশি নড়ে তাহলে আমি কমুনিস না। তাহলে বুঝবে আমার ইমান নেই।

পার্টিকে জিন্দা রাখার নিবিড় বিশ্বাস হাড়মাসে আগলে রেখে পাঁচজনের দেহ ঝাপটে পড়ল বেলেঘাটার পোড়া মাটিতে। তবু বেলেঘাটার মুখে বোল নেই। মৃত্তিকার গভীর পরতে এইসব কাহিনি প্রাচীন শিলার মতো অনড়। বারুদের গন্ধ নাকের ডগে নাচিয়ে কে যেন দীর্ঘ এক ফাঁকা বাতাস উগড়ে দিল হু হু করে। আর হাভাতি শরীরের কোষে রক্তের বান ডাকিয়ে বেলিয়াহাট্টা গম্ভীর। ভয়ঙ্কর গম্ভীর।

অথচ বেলিয়াহাট্টার খাঁ-খাঁ মাঠ, বালুচরের উদাস উদার বুক, নেড়া বস্তির পোড়া চামের তলায় অগুনতি সকেট, জালকাঠি, কৌটোর মাল আর বাংলা পেটো ডাম্প করেছিল এ বি। ব্যাটারির কালো বাক্সের ভেতরে তাজা চারটে মাল নিজের হাতে বানিয়ে, তপসের দেড়হাতিয়া খুপচির খাটিয়ার তলায় ছিপিয়ে রেখে সুকু পাশের খোপের মাসিকে ডেকে বলেছিল: ঘর সাফ করতে এসে যেন আবার টানাটানি কোরো না।

ছেলেগুলো হুট না হুট আসত। চটি একখানা কেতাব খুলে দল বেঁধে হাত ঘুরিয়ে পড়ত। মানুষের দুঃখ ঘোচানোর সাফসুফ রাস্তার কথা কেতাবগুলোয় নাকি লেখা আছে। মাসির কপালের সিঁদুরের টিপটা গলে যেত ঘামের চোটে। ঘাম ছুটত ছেলেগুলোর কথায়।

পেটের ছেলে হলে কি হবে, তোদের নাগাল পাইনে কেন বল দিকি?

বুকের ভেতর অজস্র বারুদ। আর জন্মের নাড়ি ছেঁড়া দুঃখ কষ্টের কথা নিয়েও পুতলিকলের বেলিয়াহাট্টা সুকু, নিবারণ, বুড়ো আর কিশোরের লাশের মতো অনড়। বাতাস নেই। কোথাও একটা পাতা হেলছে না। ভ্যানের ইঞ্জিনের একটা চাপা আওয়াজ উঠছে ক্রমাগত। আর সারা মুখের খাবলা খাবলা দাড়ি নিয়ে কুরিয়ারের মুখে খবর পেয়ে এ বি হয়তো পাগলের মতো ছুটে আসছে বিল্ডিঙের দিকে। পোড়া শরীরটা আছড়ে ফেলে ছুটছে। হয়তো দুপাটি দাঁতের ফাঁকে ফাটিয়ে দেবে শেষ পেটোটা।

কোন আমলে যে বনবাদাড় ঝোপ কেটে মানুষের ঝুপড়ি মাথা তুলেছিল কে জানে! কে জানে বেলিয়াহাট্টার কঠিন রহস্য! কল-কুলি-কামিনের বেলেঘাটা। সস্তার বেলেঘাটা। পুরোনো ছড়া কাটা বেলেঘাটা।

যার নেই পুঁজিপাটা/সে থাকে বেলেঘাটা।

মুখফেরতা ছড়ার বোল পালটে ফেলেছে বেলেঘাটার আশ্চর্য মানুষ :

পুঁজিপাটা কম্বল
বেলেঘাটা সম্বল।

আর এখন! চার-চারটে মরদের লাশ বুকে নিয়েও যে আবাগি মাটি অনড় তাকে নিয়ে কী ছড়া গাঁথা হবে?

পিলখানা আর পচা খালের বগল দিয়ে একঠেঙে ভিখিরির মতো পিরের গান গাইতে গাইতে বেলেঘাটায় তখন ফজির আসছে। ফজির আসছে, বাঁ চোখের অন্ধা ছানি নিয়ে ল্যাংচাতে, ল্যাংচাতে। ফজির এল ভ্যানের বিষণ্ণ ধোঁয়ায়। ভাটিখানা, মিয়াবাগান, ফুলবাগানের নিদ-যাওয়া চোখে।

চুনোচানা মেয়েমদ্দো সব দুদ্দাড় ছুটে এসেছে। নব্বই বছরের এক বুড়ি চোপসা গালে কাঁকড়ার হিজিবিজি পা এঁকে ফ্যালফ্যাল চোখ ছুঁড়ে দিল ভ্যানের খোলের ভেতর। রাইফেলের বাঁটে আছড়ে পড়ে বুড়ির ঝাপসা চোখ আঁকপাঁক করে উঠল : কোন পাড়ার ছেলে রে! যেন কস্মিনকালে দেখেনি, যেন জানত না এমন একটা কাণ্ড হবে! কার জিভ টাগরায় গিয়ে ঠেকল : ভগমান! আর দুরু দুরু ভয়ভাবনা হাড়িপোড়া বস্তির কালোকাঠ মানুষগুলোর বুকে আঁচড় কাটতে লাগল : যারা যাওয়ার তারা তো গেছেই এখন জ্যান্তগুলোকে নিয়েই ভাবনা। বেলেঘাটার মানুষজন রাস্তা দিয়ে জলুস গেলে ছুটে আসে (পার্টিপুটির বাছবিচার নেইকো) আবার কয়লাপট্টির তেরো বছরের নাদান ছেলের সাদিতে যখন সারা রাস্তায় জোনাকির মতো আলো দপ্‌দপ্‌ করে তখনও ছুট মেরে আসে। দ্যাখ, দ্যাখ, কনের মুখখানা! আজও এসেছে। গোরা, মন্টু, নারাণদাকে দেখতে, আট-দশটা ভ্যান আর চারটে জোয়ান ছেলের লাশ দেখতে। তবু ফারাক আছে। ফারাক আছে দাঁড়ানোর ঢঙে, চোখের আঁচে, বুকের হাঁপরটানে। সবচেয়ে বড় কথা দিমাগ চলছে মেশিনের মতো। বেলিয়াহাট্টার দিমাগ।

কেন বল তো? পাট্‌টির লোক? ওই লোকটা না সেই রায়ট আটকে ছিল? ওরা ভোট চায় না, না?

নকশাল....নকশাল...নকশাল...

আর কথাটার ঝাঁজ পেয়ে, মন্টুকে হঠাৎ চিনতে পেরে, রুক্ষ এক নারীর পাটদড়ি চুল এলো হয়ে গেল : কপাল!

নারাণদা আর মন্টুকে নিয়ে ভ্যানটা বেরিয়ে গেল। গোরাকে লোকাল থানায় নিয়ে এল। একগাদা পুরোনো কাগজের বান্ডিল, খানকতক মোটা খাতা, আর ডান্ডা, বেয়নেট-রাইফেল, ফোন, বেঞ্চি সব ওলোটপালোট হয়ে গেল খিস্তি আর মারের তোড়ে। কম্বল চাপা দিয়ে পেটাল খানিক। তারপর কচুয়া। পায়ের চেটো ফুলকো লুচির মতো, গোদের মতো ফুলে গেল এক রাত্তিরে। রাত্তিরটা কাটল লকআপের পেচ্ছাপের ঝাঁজ আর মশার হুলে আর অসাড় জ্বরো ঘুমে।

তারপর জেরা। ইন্টারোগেশন। শকুনের ঠোঁটের মতো অফিসারের নাক। চাঁছাছোলা মুখ। মুখের পাশে আবছা অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঘিনঘিনে দাগ। রুপোর পুরোনো টাকার মতো চকচকে লোভী চোখ। আর খরখরে জিভে খিস্তির ছ্যাদলা।

পিঁপড়ের মতো জোড়া জোড়া পায়ে হেঁটে আসছিল মৃত্যু। গোরা শিরদাঁড়া, ফোলা পায়ের চেটো, নখ ওপড়ানো হাতের আঙুল থেকে সুরসুর করে এগোচ্ছিল মগজের দিকে। শিয়ালদার টিংটিঙে রোগা কুলিটার মাথার ওপর আড়াইমনি আলুর বস্তার মতো ওর ভারী মাথাটা বেলেঘাটা থানার লকআপে গেনার মতো, রবারের বলের মতো এই মৃত্যু নিয়ে লোফালুফি

করতে লাগল। আর কী! শেষ হয়ে এল একটা উপাখ্যান, দুরমুশ পেটা একটা বিশ্বাস, পঁচিশ-ছাব্বিশ সালের একটা জীবন। লকআপের চৌকো দেয়াল, টিকটিকির জিভের মতো ভেন্টিলেটার, চামউকুন আর বুটজুতোর শব্দ গোরার চারপাশে হাত তুলে ন্যাংটো হয়ে নাচছিল। স্মৃতির একটা খ্যাপলাজালের রশি, গেরো, জালকাঠি টপকে টপকে গোরা যেন একটা নেড়া মাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেখানে একটা বকফুল গাছ হাই তুলছিল গভীর আলস্যে। হোমিওপ্যাথির বাক্সটা যে বিমারি জম্মে দূর করতে পারত না, সেই বিমারির সাথে টক্কর লাগিয়ে গোরার মতো দশ-বিশটা ছেলে ভেবেছিল : এর মানে জীবন। দেশটার ভোল পালটে দিতে হবে। সাদা ঠোঁটে ভিটামিনের ঘাটতির ঘা ছড়িয়ে মা বলত : দ্যাখ তোর পিসতুতো ভাই এখন পাশ দিয়ে কলেজে পড়াচ্ছে, আমাদেরও তো একটা আশা হয়। গোরা তখন সেই নারীর দিকে তাকাত সরল একটা রেখায় : আমিও ও-রকম কিছু একটা হই, তারপর না হয় গরিব-দুঃখীকে একটু আধটু দেখলাম, এই তো? আর তেইশ নম্বরের লোনা দেয়াল ধরে ল্যাংড়া খবরটা হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়লে গোরার সেই গর্ভধারিণী জননীর সাদা ঘা শরীরময় ছড়িয়ে যাবে পূর্ববঙ্গীয় বিলাপের বাঙাল সুরে : কপালে এইয়াও ছিল...।

জানবে না বুঝবে না কেন পেটের ছেলেটা এমন ঝক্কি নিয়েছিল।

মাঝে একটা শব্দ হল হুড়কো টানার। এই লকআপ। গোরাচাঁদ ...পাড়ার মাঝবয়েসি কোনো কেরানির মতো ভোলেভালে চেহারার একটা মানুষ ওর মুখোমুখী। মাঝখানে টেবিলের চকচকে বার্নিশ। সেই চকচকে রঙের ওপর খোলা একটা খাতা আর লোকটার উলটো করে রাখা চশমা। চশমার কালো ডান্টি আর আতশকাঁচ। চশমাটা তাকিয়েছিল গোরার জ্বরো মুখের ফ্যাকাসে রঙ আর কপালের কাটা দাগটার দিকে; চশমাটা গোরার চোখ দুটোর ছবি তুলে নিচ্ছিল।

: গোঁফ রাখতেন না আগে?

: হু।

: নিন, চারমিনারই তো খান, তাই না...পাশ করেন বঙ্গবাসী থেকে, কলেজ ইউনিয়নের নেতা ছিলেন তো, হঠাৎ ইউনিয়ন বাতিল করলেন কেন...করেননি?

আচ্ছা...আচ্ছা...আপনার হাতেখড়ি কি কলেজেই...কার কথায় প্রথম ইনস্পায়ার্ড হলেন...মানে হ্যাঁ সত্যিই দেশের অবস্থা তো শোচনীয়, একটা পরিবর্তন।

ভদ্দরভদ্দর কথা, দরজির ফিতে মাপা হাসি, পেনের নিবের সোনার জলের খসখস শব্দ, চোখের ওপর চশমাটার ভ্যানমার্কা কালো রঙের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া বুট, একেবারে হঠাৎ।

: কোরে কে কে ছিল?

: আমি কোর মেম্বার নই।

: এ বি-র শেলটার কোথায়?

: মাঠে-ঘাটে।

: তোর মাকে ছেড়ে দিয়েছি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে...

কোমরের ওপর কাপড়টা সবসুদ্ধু তুলে অফিসারটা (এস বি) অণ্ডকোষ সমেত যৌনাঙ্গ গোরার মুখের কাছে এনে উরুতে চাপড় মারতে লাগল : খা...শালা...মুত খা।

লোকটার ঘোড়ামুখ আর চোখের সামনে কাঁচা মাংসের ঝুলন্ত ল্যাওড়া সারাটা দুনিয়া আড়াল করে গুয়ো ব্যাঙের পেটের মতো নড়তে লাগল।

এরপর সব দুদ্দাড়, হুড়মুড়িয়ে হয়ে গেল। ফটো তোলা, হাতের ছাপ, মাপজোক, জন্মদাগ খোঁজা, সি আর এস। তিন-চার থানায় টানাহ্যাঁচড়া। লালবাজার, লর্ড সিন্‌হা রোড। আর এস বি-র নেয়াপাতি ভুঁড়ি। ফেরেববাজ অমায়িক মুখ। আর ভদ্দরতা।

তারপর জে সি। জেহেল। কারাগার। জেলখানা। খাঁচা। খাঁচার পাখি। কে যেন বলেছিল: কমিউনিস্টের আসল পরীক্ষা—বধ্যভূমি, কারাগার, একঝাঁক বুলেট। মন্টু না সুকু? বুড়ো না সোনা? নাকি সবাই? মনে আসে না ঠিক। আলজিভে কে যেন নাচিয়েছিল কথাটা। আর নারাণদা বলত : জিন্দেগিভর মজদুরের ঝান্ডার তলায় থাকতে হবে তবে না?

কেস-টেবিলের ডান্ডার আগায় গিনতি দিতে উবু হয়ে বসে গোরার নারাণদার সাথে ভেট হয়ে গেল। গোরার আগেই নারাণদা চালান গেছিল প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলের সাতখাতায়। আটচল্লিশের কমরেডরাও নাকি ওখানে ছিলেন। আর সাতচল্লিশের আগে এ বি-র অ্যানার্কিস্ট বাবা এক সাহেবকে থালি দিয়ে মেরেছিলেন সাতখাতায় কাঠের সিঁড়িতে। সাতখাতার সিঁড়ি বন্দিত্বের যাতনায় অন্ধকার হয়ে থাকে। আর দোতলার টানা হলে বাইরে থেকে ছুটে আসে দরাজ বাতাস। বাতাসে পুরানা জামানার গন্ধ। রাত গভীর হলে সেই গন্ধ বুকে নিয়ে দু-একজন মাঝবয়েসি কমরেড হিজলির শহিদ বন্দনা করে:

আমরা তো ভুলি নাই শহিদ...একথা তো ভুলব না

তোমার কইলজার খুনে রাঙাইল কে আইন্ধার জেলখানা...

দুটো ছেঁড়াখোঁড়া ফর্দাফাঁই কম্বল, কম্বলের অজস্র চিল্লার আর থালি বাটি বগলে নিয়ে গোরা সাতখাতায় হাজির হয়েছিল। সাতখাতার ডানহাতি বড়োচৌকা। হাজার মানুষের পেটের জোগান যায় বড়োচৌকা থেকে। সাজাওয়ালা কয়েদি, আর ফালতুর জবজবে শরীর। আর সাত তরকারির খোসা-ডাঁটার ঘ্যাঁট সেদ্ধ, ঘ্যাঁটের অদ্ভুত গন্ধ। পেছনে টানা পাঁচিল।

এক শেলটারে তেরাত্তির কাটিয়ে মনুমেন্টের গোদা পা অব্দি জুলুসে হেঁটে, নাড়া লাগিয়ে, কিংবা গোপন বৈঠকে কবে যেন এক কারখানার ভেতর লাইন নিয়ে ফাটাফাটি করে দোস্তি হয়েছিল। কমরেড। পুরানা কমরেড। গোরা তার হাঁড়ির খবর জানত। এখানে, এই জেলে কি অন্দর কি বাহার সব্বার সাথে ভেট হচ্ছে। এখনও যারা সরে ছিটকে আছে এমন বিশ-তিরিশ জন, আর যারা মরে তরে গেছে তাদের বাদ দিলে সবাই এখন জেলে। পাঁচুর সাথে কেস-টেবিলে দেখা হয়েছিল। আনপড় পাঁচু। বসন্তের ফুটকি ভরা মুখ। চোখা নাক। থ্যাবড়া কড়াপড়া হাতের পাঞ্জা। আর সব দেখেশুনে ঠোঁটকাটা মন্টু বিড়বিড় করে : কমিউনিস্ট পার্টি অব জেল ইণ্ডিয়া!

হর রোববার বড়োকম্বল। মতলব : সাতখাতার দু-দুটো হলের কমরেডরা সব এক ঘরে জড়ো হবে। পয়লা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জঙ্গের গান। ইনকিলাবি গান। ক্রান্তির আহ্বান।

তারপর কবিতা আবৃত্তি। আলোচনা। সমালোচনা। তা ছাড়া হপ্তাভর এই এক জিনিসই ছোটো করে হয় বলে তার নাম ছোটোকম্বল। সেখানে কম্বলও থাকে একটা। আর চার পাঁচজন কমরেড। সবেরে ন-দশ বাজে সব তেল মাখতে বসে সার বেঁধে। যেন সামরিক কেল্লা। লাল ফৌজ। আর মোলাকাত থেকে ফেরার সময় সব বাপ-মা ভাই বোন রিস্তেদারের মুখ থেকে নিয়ে আসে জব্বর লড়াইর তাজ্জব খবর। আর সাতখাতা টগবগিয়ে ফুটতে থাকে। লড়াইর তাতে। কি দারুন তাত। নারাণদা, গোরা আর মন্টুর চামড়ায় ছ্যাঁকা লাগে এমন তাত। ছ্যাঁকা লেগেছে আরও দু-দশজনের। সব হাতড়াতে শুরু করেছে।

আর এতসব গরমাগরম খবরের ভেতর হঠাৎ হঠাৎ পুলিশের গুলিতে নিহত প্রিয় কমরেডের মুখ ভেসে যায় এক-আধটা। পার্টির ভেতর ভাঙনের খবর শুনে জেল কমিটির সম্পাদক নীহারদার বিয়াল্লিশ বছরের মাকুন্দো মুখ কঠোর হয়ে ওঠে : শোধনবাদী। শোধনবাদ—নিপাত যাক!

আর ইস্কুলের ছেলে পি ভি অ্যাক্টে বন্দি নিউ ওয়ার্ডের নাদান বিষ্টু, যে তখনও জানে না যে মার্কস রাশিয়ার বাসিন্দা ছিলেন না, রাশিয়ায় জন্মানও নি, পার্টির সেই একনিষ্ঠ ক্যাডারের ভক্তপ্রাণ উথলে উঠল রাগ-দুঃখ-জ্বালায়। রেডবুকের লাইনগুলো আস্ত গোটা গোটা গিলেছিল ছেলেটা। আর নীহারদার সাথে বাতচিতে বুঝেছিল : শোধনবাদ হল একটা ঘিনঘিনে পোকা। কাজেই দাঁতের আগায় খড়কুটোর মতো শব্দটা কাটলে কেমন একটা খাড়া লড়াইর উপলব্ধি হত বিষ্টুর।

অথচ, ভগীরথের গঙ্গা এদেশের মাটির ভেতর চোরা বান ডাকায়। অন্তঃসলিলা নদীর জলের মতো চেনা মেজাজের উথালপাথাল, সিনাফাটা মুক্তির জয়গানের মধ্যে কোথায় যেন তপস্যা আর আরাধনার শান্ত শীতল স্রোত বহমান। কবে যেন নারাণদা মুখ খুলেছিল। বাইরের তালেতালে। বাইরের পার্টি। সেখানেও সংগ্রাম। মৃত্যুর সাথে মাটি কামড়ে যোঝা, দুশমনের মোকাবিলা আর সঠিক রাস্তা খোঁজার লড়াই। জেলের ভেতরও তাই। জেলভাঙার উত্তাল লড়াইর ডাক। আর জনতার বন্দিমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার চিন্তা এক ফাইলে বসে গিনতি দেয়। জেলে পার্টি ভাঙছে। আর দাঁতে দাঁত লাগছে। আর বর্শার মতো প্রশ্ন ফণা তুলছে পাঁচিল ডিঙিয়ে। মিনতি বউদি মোলাকাত করতে এসেছিল : শান্তা আমাদের সবাইকে নিয়ে সমিতি বানিয়েছে, সেলাইফোঁড়াই করে চালিয়ে নিচ্ছি...দ্যাখো, বিড়ি দু-বান্ডিলের বেশি আনতে পারিনি! গোরার সাথে ইন্টারভিউ করতে এল সোনার মা : তোর বাবাকে তো জানিস, বলে মেয়েমানুষ থানাপুলিশে যাবে কী...মা টা তো কেঁদে খুন...ভাবিস না, বিজয় তো ছাড়া পেয়েছে, উকিলকে দিয়ে বিজয়ই তোদের কেস লড়বে... সেজন্যে একটা ক্লাবও করেছে...কী যেন নাম...

: মিনুর খবর কী? খুকু কেমন আছে? ছিরি বউদি?

: ভালো, ভালো সব ভালো শুধু...শুধু মিনুর কোনো খোঁজ নেই। কোনো খোঁজ নেই। মোলাকাতের শেষে গোরার চোখে জ্বলন লাগল, অসহ্য এক জ্বলন।

এমনিতে বোঝার জো নেই। কিন্তু ভেতর ভেতর আরও দু-চার জন ফুঁসছিল। ভুখ হরতাল নিয়ে বার্স্ট করল তারা।

সাতখাতা ভুখ হরতালের ডাক দিচ্ছে রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদার দাবিতে। লাগাতার হরতাল। পেটে দড়া বাঁধা লড়াই। সাতখাতা তোলপাড় তা নিয়ে। জেল কমিটি ভেঙে যায় যায়। ভেতরে এসে সব কেমন ভাঙচুর শুরু হয়েছে। একদল আরও কাঠকাঠ হয়ে উঠেছে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে : জেলের ভেতরও খতম অভিযান চলবে, ভুখ হরতাল ভিখিরির লড়াই। ন্যাংটো বাবাজি গান্ধীর বদগন্ধ। নারাণদার দেহাতি গোঁফের ফাঁকে ইমানদার হাসি : জায়গা বুঝে লড়াই। এটা জেল। হাঙ্গার স্ট্রাইক এখানে একটা জব্বর হাতিয়ার।

এটা জেল। জেহেল। চানা খাও বেদানা সমঝকর, জেল খাট্‌টো কারখানা সমঝকর—কথাটা বি-ক্লাশরা হরবখত বলে। চুরি ছিনতাই করে মাহিনায় এক দু-দফা আসে, কমসে কম বছরে চার-ছ বার তো বটেই। জেল ওদের কাছে কারখানা। আর কমিউনিস্টদের কাছে?

বিশ্ববিদ্যালয়। ইউনিভার্সিটি।

তেরো নম্বর জালের পাঁচু কথাটা শুনে খুশ হয়েছিল। বহুত খুশ। পাঁচুর লেখাপড়া প্যাঁজের দোকান বাগের হাট খোলা। কানের লতি অব্দি হাসিটা টেনে নিয়ে গিয়ে পাঁচু ছড়াটা বলেছিল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছিল : মা পাঁচ বাড়ি খেটে তবে দুটো দানা জোগাড় করত, কী করে লেখাপড়া হবে গোরাদা? মা বলত, কিন্তু আমি হুঁশ হতেই কাজে লাগলাম। মোটরের পেছনে। মাপজোক সব কিন্তু জানি। তবে হ্যাঁ, তুমি একটা লাইন পড়তে বলেছ কী ব্যাস...

নারাণদা ওঠে পয়লা গিনতির আগে। ন্যাকড়া পেঁচিয়ে তাতে ঢেলে দেয় বরাদ্দ এক ছিটে তেল। পলিতা। পলিতা জ্বালানো মুখের কথা না। নারাণদার এলেম আছে। লেবুর মতো গাল দুটো ফুলিয়ে বিড়ির আগুন ধরিয়ে ফুঁক মেরে চলে। তারপর ধোঁয়াতে থাকে। সেই ধোঁয়ার ভেতর চোখ দুটো লাল করে নারাণদা ফুঁক মেরে চলে : গোরা ডিব্‌বা বসিয়ে দে। ততক্ষণে গোরা লাল চায়ের জোগাড়যন্তর করে থালিতে ঢেলে দিয়েছে। এইভাবে ওরা রোজ আগুন জ্বালে। আর ভাবে : আগুন আগলে রাখতে মানুষের কত কসরত করতে হত। পাঁচুর কাছে একবার তল্লাসিতে দেশলাই পেয়েছিল। ব্যাস। সিধে কেস-টেবিল। আর একটু হলেই ল্যাংড়া জমাদার সেলে পুরে দিত।

তাই ন্যাকড়ার আগুন। বিড়ির ফুঁক। লাগাতার। তবে না লাল চা। সেই চায়ে চুমুক মেরে নারাণদার দিল খুলে যেত। গলা সাফ হত : ইউনিভার্সিটি মানে কী? দুশমনের অত্যাচারে দমছি না, কিন্তু যে যন্তরটা দিয়ে তামাম জনতাকে দাবিয়ে রাখে তার নাট বল্টু ইস্ক্রুপ সব দেখে চিনে নিচ্ছি...পরীক্ষা দিচ্ছি...ইনতেহার, সহ্যের আর মনের তাকতের, তা ছাড়া ধর এই তো টাইম বইপত্তরগুলো সব পড়, বোঝ, মিলিয়ে নে তবে না।

আর কেলে পাঁচুকে বড়ো একটা 'অ' লিখে তার ওপর হাত বুলোতে দিয়ে গোরা ভাটপাড়ার পোলের ওপর চোখ দুটো ছুঁড়ে দেয় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। মানুষজন মালাইচাকির শব্দ তুলে হাঁটে। গাড়ির হর্ন। আর হঠাৎ মিনুর মুখটা কাটা মুণ্ডর মতো ঝুলে পড়ে পাতলা একটা বেণী নিয়ে। মিনুর কোনো খোঁজ নেই।

চীনা চৌকার গায়ে, নামাজ পড়ার চত্বরে নারাণদা কার সঙ্গে ঘন হয়ে কথা বলছে। হঠাৎ গোরার খ্রিস্টের ঘনিষ্ঠ সেই বারোজন শিষ্যের কথা মনে হল, যাদের ভেতর একজন তাকে

ধরিয়ে দিয়েছিল। আর বিল্ডিং ঘেরাও হয়েছিল নারাণদার খবর পেয়ে। এখন অব্দি মানুষটা নাম পালটে আছে। কিন্তু... সেই বারোজনের একজন?

এরকম কত যে গেরো পড়ে গেছে জীবনে। আর তাই নিয়ে মজাসে হো হো হেসে সব ফাইল মাতিয়ে রেখেছে। মাঝে মধ্যে ঝিম্ নামে নিমগাছটার বেঁকা ছায়ার মতো জেলকারখানার শেডের ওপর। ঠোঁট দুটো সেঁটে যায় জন্মের মতো। তখন গোরাকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তখন গোরা ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন চলে যায়। পড়ে থাকে শুধু জোড়া দুটো হাঁটু, দুবলা একটা কাঁধ, আর আড়ষ্ট লম্বা হাত। সরকারি সাজার কানুনমাফিক। পাঁচিল আর বেয়নেটের গোল একটা জালের ভেতর।

শৈ শ ব

কানায় কয় বয়রায় শোনে
পর্‌তি কথায় হয়-হয় করে

হারাদিন গেল হেলাফেলা
রাত্তর হৈলে বুড়ির কাপাসডলা।।

ক্যাওড়াপাড়ার উলঙ্গ ছেলেটার শিরদাঁড়ার গাঁট বেয়ে বেয়ে খুনখারাপি রঙে ভরা বেলুন পশ্চিমে শব্দহীন ফেটে গেলে হোলির গাঢ়তা আসে। আর সেই রাত, অন্ন-কথিত সেই নির্বোধ, নিষ্কর্মা রাত প্রায় এসে যায়।

তখন মোষের চামড়ার মতো অন্ধকার পানাপুকুর ভাঙতে ভাঙতে উঠে আসে। কোথাও আলোড়ন থেকে যায়। অন্ধকার চারু মার্কেট, রেললাইন আর ক্যাওড়াপট্টির ভেতর দিয়ে এগোয়। ক্রমে, সুলতান আলম স্ট্রিট, ডোবা, জলা, টেলিগ্রাফপোস্টের ঊর্ধ্ববাহু আর লাইনের সিগন্যাল অন্ধকার মাখতে থাকলে ঢালাই কারখানার গম্ভীর বুকচাপা আর্তনাদও থামে। পচা ডোবার জলে উলটে থাকে নিরীহ শ্যাওলা, সেই অন্ধকার। আর তার ঢের আগে তামাম পাড়াটাকে ফালা ফালা করে করাতকলের ঘ্যাস ঘ্যাস ঘিস ঘিস শব্দের অন্তিম রেশ। রণর বাবাসমেত চার-পাঁচজন মজুরের ছোট্ট দলটা ছাড়া ছাড়া হেঁটে গেছে, ফিরে গেছে, পিছনে অন্ধকার টানতে টানতে, মৃত্যুর গাম্ভীর্যে। তাদের শুল্পি মারা বুটজুতোর শব্দ অনুসরণ করে ভঙ্গুর ছায়া অশ্বত্থ গাছের নীচে সমাধিস্থ। যেখানে শেতলার থান সাদা, চকচক করতে থাকে। জলামাঠে দাঁড়িয়ে সদু রণর বাবাকে একটা বাঁক নিতে দেখে। রণর বাবা সাঁকোর খুঁটি ধরে ডোবা পার হয়ে যায়।

আসলে ওটা মোটেই ডোবা নয়, পুকুর, বেশ বড়ো পুকুর। সদু আগে ভাবত সমুদ্র, কে যেন বলেছিল। শেষে কথায়-কথায় অন্ন বলে— 'খ্যাপছোস!'

কেন?

সমুদ্দুরনি এত ছুটো!

তালে?

পস্কুন্নি, সমুদ্দুর কী বিশাল!

অথচ অন্ন কখনও সমুদ্র দেখেনি।

আজ দুপুর থেকে অন্ন বাড়িতে নেই, কোথায় যেন গেছে, ছেলেটা জানে না। মা বাড়ি নেই, সদুর দু-চোখে কোথাও ভাসছে না ছোটোখাটো মানুষটার বেড় দিয়ে পরা সাদা থান ক্ষিপ্র গতি। ফলে সদুর কষ্ট। সদুর কষ্ট হয়। বুকের ভেতর কত শব্দ জমতে থাকে, তার দম আটকে আসে। মোচার মতো সরু, ফ্যাকাশে-মুখটা কেবলই ভাসতে থাকে। দূরের অবয়বে তার নিত্য ভুল হয়ে যায়— ওই তো মা আসছে! অথচ মা আসে না, মা যেন কোনোদিনও আসবে না। এসবই সে উচ্চারণ করে মনে-মনে : মা চলে এসো, আমি আর হজমিগুলির পয়সা চাইব না, রোজ রোজ পড়ব। আর তার কষ্ট হয়। তখন সদু কিছুই চেনে না, চিনতে

পারে না। উকিল-ঠাকুমার বাড়ির পাশ দিয়ে পাক খাওয়া সুলতান আলম স্ট্রিট তখন এক ফাঁস মাত্র। সেই ফাঁস গলায় লটকে সে কেবল মাকে খোঁজে, খুঁজতে থাকে— 'কাকিমা, মা কখন ফিরবে? মা কোথায় গেছে? মা কোথায় যায়...।'

অ্যাই আইল বইলা...

থেকে-থেকে সদু ঘর-বার করছিল। মাঝে-মাঝে চলন্ত মানুষের ছায়া দেখে, বা দু-চারটে পাখির ডানার শব্দে, লাইনের সিগন্যালের রং বদলে থেমে যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে ভেজামাটিতে ডান পায়ের পাতার চাপ দিল। ক্রমে মাটির বুকে তার খুদে পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠলে সে গোড়ালিতে ভর দিয়ে দু-একটা পাক খেল। সেই পদচিহ্ন গভীর এবং ঢালু এক গর্ত হয়ে গেলে সদু একটু চঞ্চল, তার হাসি পেল। একেবারে হঠাৎই মনে পড়ে গেল 'পৃথিবী' এই শব্দটা। মা কাল কিছুতেই বলতে পারছিল না।

চনুর মা ডাকল, 'সদু! অ সদু! চা-রুটি খাবি নাকি?'

সদুর সাড়া নেই, চনুর মা আর একবার ডাকে। সদুর সাড়াশব্দ নেই। থেকে-থেকে সদু এরকম ডুব দেয়, তখন কোথায় যেন শীতের সকাল, কুয়াশা, ফ্যানের গন্ধ। রেফিউজি কলোনির সন্ধে, কাঁচা কয়লার ধোঁয়া। মালগাড়ির টিকিস-টিকিস শব্দ। সদু তখন চেয়ে আছে তবু দেখছে না, এক হাত দূরের কোনো কথা, শব্দ শুনতে পায় না। তখন সদুর সাড়া পাওয়া যায় না। চনুর মা-র গলা ফ্যাসফ্যাস করছিল : 'সদু! অ সদু!' সদু তখন পায়ের ছাপের ওপর চোখ বিঁধিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আর মাটি মানে তো পৃথিবী! অন্ন বলেছিল। সদু পৃথিবীর বুকের ওপর আবছা কচি পায়ের ছাপ তন্ময় হয়ে দেখছিল। চনু এসে ওর ইজের ধরে টানল, 'কী রে চ!'

নাহ্‌।

চ না!

নন্‌ না।

মার জন্যে মন খারাপ?

জানি না, ভাগ!

তখন হালকা শরীরের চাপে মাটিতে খোদাই হয়ে যাচ্ছে তার পায়ের ছাপ। মেয়েটা ভয় পায়, অযথা, বড়ো-বড়ো চোখে চনু সদুর লিকলিকে পা, পায়ের পাতা দেখতে থাকে। আর সেই টিনের চালা এবং পেয়ারা গাছের বেঁটে ছায়ার প্রায় নির্জন, ভূতুড়ে বাড়ি থেকে শ্লেষ্মার শব্দে তখন... 'কহিল সঞ্জয় তবে শুন নৃপবর...'

চনুর দিকে একবার তাকিয়ে সদুকে ভেবে নিতে হয় পরবর্তী কার্যক্রম, আর এমনিতেই সে বড়ো ফাঁকা, শূন্য হয়ে আসছিল। চনুর মার ডাকে সাড়া না দেওয়া, সামনে উড়তে থাকা চনুর গোলাপি ফ্রক অস্বীকার করা, তাকে আরও নির্দয়-একা করে দেয়। অথচ, ছেলেটা গোঁয়ারই থেকে যাচ্ছে। চনুর দাদুর গলায় তখন সঞ্জয় ক্রমাগত সৎ পরামর্শ দিয়ে যেতে থাকে, শীতের আকাশ কেবল ধোঁয়ার অবলম্বন হয়ে ওঠে। অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির তেরচা মাঠে হিসি করতে-করতে অযথা খিস্তি করে কেউ। তীব্র গন্ধ উঠে আসছে, বা সেই খিস্তিতে ওরকম ঝাঁঝ ছিল।

চনু সদুর হাত ধরে টানছে : বেশি পাকা না, চ। সদু ঘাড় কাত করে, আর চনু এই ভঙ্গির মানে জানে বলে তার গোলাপি ফ্রক দুলে ওঠে, 'মর!'

চনু সদুর থেকে বছর দুয়েকের বড়ো, কিন্তু হাবভাবে সদুকেই বড়ো মনে হয়। বিশেষ সে যখন চনুকে মামুলি আক্রমণ করে লম্বা চুল টেনে। চনুর সঙ্গেই তাকে প্রায় দুপুর কাটাতে হয়, পেয়ারা গাছের তলায় যেখানে ফাটা মেঝে থেকে ঝাঁঝ উঠে আসে। বা কখনো-কখনো কুলগাছের নীচে অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির লাগোয়া পুকুরের ধারে। রান্নাবাটি খেলা বা বর-বউ খেলা। খেলতে-খেলতে কে যে কখন লুচিপাতা ছিঁড়ে সংসার লোপাট করবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আবার কুলকাঁটার ডগায় এই সদুই রেখে যেত রক্তের ফোঁটা। চনুর জন্যে সদু অ্যাম্পুল খুঁজত, একবার একটা ফিতে পেয়ে চনুকে দিয়েছিল। আর এখন তার চনুকে ভালো লাগছে না। চনু চলে গেল, সদু অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির হলুদ ডোবার দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে দিল। ছাগলের নাদি ছড়ানো বারান্দায় বসে থেকে রেললাইন দেখে, এই লাইন তার অতি পরিচিত। সিগন্যাল বদল হলে, সবুজ হলে সদুর আনন্দ হয়। এখন লাইনের পাশে অন্ধকার ঢিপি হয়ে আছে। ক্যাওড়াপট্টি আর রেফিউজি কলোনিতে কেরোসিনের ম্লান আলো জ্বলে ওঠে। কোথাও পাখির ক্ষুদ্র শরীর ডানা ঝাপটায়। সেই শব্দ শোনা যায়, কিন্তু পাখিটাকে সে দেখতে পায় না। তখন কাঁচা নর্দমার ওপর ফেলা নারকেল গাছের গুঁড়িতে সাদা রং বিস্তৃত। এই রং ক্রমে থানের মতো, আঁচলের মতো খুলেমেলে গেলে সে টের পায় অন্নর ভাঙা অবয়ব। নারকেল গুঁড়ির ওপর সতর্ক, টালমাটাল সেই অবয়ব এগোতে থাকলে সদু ছুট লাগায়। কারণ 'সন্ধ্যা বইয়া যায়', সদুর এখন পড়ার কথা। একছুটে ঘরে ঢুকে বর্ণপরিচয় খুলে আসনপিঁড়ি হল এবং দুলতে থাকে। সামনে লম্প উগরে চলে কালো ভুসোধোঁয়া আর কেরোসিন-গন্ধ।

হ্যারিকেনের কালচে শিষ, ধোঁয়া, আর কেরোসিনের ঝাঁঝের ভেতর তার নাক অন্ধকার দেওয়াল তোলে। গালের একদিক অন্ধকারের তলায় ...'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে' বাক্যটি শেষ হবার আগেই হাই ওঠে, খিদে পেয়ে যায়। তখনই টের পেল, চনুর মা ডাকলে তার যাওয়া উচিত ছিল, তার খিদে পেয়েছিল। হাই উঠতেই থাকে, ফলে দুলুনির মাত্রা বাড়তে থাকে। যেন সে এই প্রচণ্ড দুলুনি দিয়ে ঘুম তাড়াবে। অথচ দোলার ছন্দে সে ক্রমেই সরে যাচ্ছে কোথাও, সেখানে নীল রং স্রোত হয়ে আছে। সদু প্রতিটি তরঙ্গ টের পেতে থাকে, সরে যাচ্ছে দুস্তর সময়। অন্ন কি এসে গেল? এসে যাচ্ছে?

দুলুনির সঙ্গে গলায় কেমন সুর এসে যায়, সে এখন সুর সম্পর্কেও সচেতন বলে উচ্চারণে কোথাও কোথাও অতিরিক্ত জোর দিতে থাকে। 'অ' এই অক্ষরটি অস্ফুট আর 'অজগর' তার উচ্চারণ, মাত্রা এবং সুরে বিশাল ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

টিনের গোল চাকতিটা উনুনের ওপর চাপিয়ে রুটি সেঁকতে-সেঁকতে চনুর মার সঙ্গে কথা বলছে অন্ন, 'কোনো কামই হইল না, হুদাহুদি গ্যালাম, ক্যাবল ঘুরায়... আইজ না কাইল, য্যামন আগে ঘরের বাইর হই নাই ত্যামনই ভগবান কয়, খাড়া তরে জব্দ করতাছি।'

আটা সেঁকার খিদে-জাগানো নরম উষ্ণ-গন্ধের সঙ্গে এইসব কথা মিশে যায়, মিশে যেতে থাকে। রুটির মধ্যভাগ ফুলে উঠছে, ধোঁয়াও থাকে, লম্বা ধাঁচের মুখটিতে তাপ ও বাষ্প।

অন্ন তাতে আলোকিত। সদুর খিদে পেয়েছে জেনেই কোনোক্রমে হাত-পা ধুয়ে রুটি করতে বসে গেছে। সদু জানে না কে বা কারা অন্নকে জব্দ করছে এবং কেন। সে কেবল খিদের চোরাগোপ্তা মার, তলপেটের মোচড় সামলায়। অন্ন চনুর মাকে সাক্ষী রেখে অতীত ও বর্তমানের টুকরো-টাকরা কথা, গল্প জুড়ে যাচ্ছে। ক্রমে একটা কাহিনি হয়ে ওঠে। অন্ন বলে, 'বুঝলেননি দিদি' এবং গল্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চনুর মা ধৈর্য রাখে। তারপর বলে, 'বুঝি না আবার...।'

আর শোকের তীব্র অথচ শীতল এক অনুভূতি সদুকে আস্তে-আস্তে গিলতে থাকে। সদু ভাবে, হায় রে মার কাজটা কেন যে হাসিল হয় না। সদু অবশ্য খুঁটিনাটি কিছুই জানে না। কেবল ওই টুকরো-টাকরা কথা থেকে আবছা-আবছা একটা ধারণা হয়েছে। তাতে এইটুকু মাত্র বুঝেছে, পেনশন পাশ হয়ে গেলে মাসে চারটে রেশনের টাকার ব্যাপারে অন্ন নিশ্চিন্ত হবে। তবু কাজটা কিছুতেই হাসিল হয় না বলে অন্ন কপালের দোষ দেয়। বিলাপ করতে থাকে। সেই বিলাপে পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরো একটা জীবন নড়েচড়ে ওঠে অজস্র ভাঙা ছায়া, মরা ডাল আর খিন্নতা নিয়ে। আর পাতলা অন্ধকার লাইন-ধারের জলায় বুনে যেতে থাকে মিহিজাল।

'ছুটোকালে মায় মারা যায়... মায় কী বস্তু জানিনাই... তেরো বছরের কালে বাপে বিয়া দিল... অন্ধকার থাকতে উইঠা ধান সিদ্ধ করা, বাইরবাড়ি উঠান ল্যাপা-মোছা... একগুষ্টির রান্না আর পিসশাশুড়ির কিল খাইছি...।'

এভাবে বুকের ভেতর থেকে, পাঁজরার হাড় থেকে, মজ্জার ব্যাথা নিয়ে উঠে আসে পুরাতন দুঃখকষ্ট, যা দিয়ে অন্নপূর্ণা নির্মিত। সদুর কুয়াশার পরত-জমা মস্তিষ্কে অন্ন-সম্পর্কিত যা-কিছু অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি সবই এরকম টুকরো কথা আর ঘটনা। বস্তুত অন্নর ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই তার কাছে, ফলে সেই বালক নিক্ষিপ্ত, একাকী, নীল শূন্যতায়। সে শোকদুঃখের গন্ধ পায়, শোক এবং দুঃখের গন্ধ থাকে।

গলা ছেড়ে পড়তে থাকে 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে'... আর পড়তে-পড়তে তার চোখ হঠাৎ ক্যাওড়াপট্টির মাথার ওপর দিয়ে রেললাইনের দিকে উড়ে যায় আবার ফিরে আসে গোলাপি মলাটের পুস্তকে, যেখানে ঈশ্বরচন্দ্রের গম্ভীর মুখ। সে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে থাকে। গ্যাসপোস্ট আর দামোদর নদের গল্প মস্তিষ্কে উজ্জ্বল থেকে যায়। দ্রুত মলাট ওলটায় বলে অজগরের ছবি দেখে এবং হঠাৎ মনে হয় অ-এর অজগর জ্যান্ত, তা নড়তে থাকে, কুণ্ডলী খুলে যায়। অথচ সে ভয় পায় না। ক্রমে সেই অজগর আপসে ছবি হয়ে গেলে সদু বোঝে তার ঘুম পাচ্ছে। আর ভাবে, ভাবতে থাকে— অ-এ অজগর কেন হয়? কয়েকদিন আগে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, অন্ন তখন বড়োই কোমল, সদুর পিঠে সে হাত রেখেছিল, 'আরও লিখাপড়া করলে তয় জানতে পারবা সুনা!'

আজ আর সদুর ইচ্ছে নেই মাকে জিজ্ঞেস করার। কারণ সে জানেই, অন্নর পক্ষে এ-কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বরং কাকামণি ঘরে থাকলে এই সুবাদে আবার জানাবেন যে, শিশুরা বড়ো জিজ্ঞাসু হয়, কিন্তু তাদের কথার মিথ্যে জবাব দেওয়াটা ঘোরতর অন্যায়।

কাকামণির কথাটা শেষ হওয়ার আগেই কোথাও থালা পড়ে যাবে নির্ঘাত। ঝনঝন শব্দ গড়িয়ে যাবে। কেউ হাসবে, কেউ বলবে : ওই আবার শুরু হইল। তারপর আর কোথাও থাকে না। মানুষটা হঠাৎ-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন।

সদুর জিজ্ঞাসা না করার অন্য কারণও আছে, আজ অন্ন বেজায় কাহিল। সদু অন্নর কানের লতির নীচে খুদি খুদি লাল তিলগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সর্ষের দানা সেই তিলগুলো সম্পর্কে অন্ন বলে, 'লাল তিল দুঃখের কারণ।' এইসব কথায় সদু ক্রমে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, দুঃখ শোক শরীরেই থাকে, বা দুঃখের শরীর হয়।

ফিরে এসে অন্ন ছর্ ছর্ করে হাত-পায়ে জল ঢেলেছিল। জোলো হাত বুলিয়ে নিয়েছিল ঘাড়ে। তারপর তোলা-উনুন পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে ক্রমাগত ধোঁয়া ওগরাতে থাকলে, আঁচলের তলায় কাঁসার বাটিটা (যা দিন দুয়েক আগে ছাড়িয়ে এনেছিল) লুকিয়ে চনুর মার কাছে যায়। বাটিটা আঁচলে ঢেকে হুট করে অন্ন চলে গেল। তখন এই টিন আর টালির চালার নীচে বয়স্ক প্রাণী বলতে দুজন, অন্ন আর চনুর মা। অন্নর আঁচলের তলায় বাটিটা লুকিয়ে নেওয়ার অর্থ, যাতে সদু না দেখে। অথচ সদু জানে অন্ন চনুর মাকে বলবে, 'অ চনুর মা দিদি, আমারে একবাটি আটা হাওলাত দ্যান, পরশু দিমু।' আর এতসব জানে বলে সদু বুঝতে পারে না, মা কেন আঁচলের তলায় উজ্জ্বল কাঁসার বাটি লুকোয়! সে তো সবই জানে! স-ব। তখন অন্নকে বড়ো অসহায় দেখায়। যেন সে কোনো পাপকার্য করছে। গোপন চলাফেরা করে। আঁচলের তলায় ঝকঝকে বাটি লুকোয়।

অজগরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ঝিম এসেছিল, তখন চনুদের দাওয়ার পুরোনো খুঁটিতে পিঠ ঘষতে-ঘষতে বিপুল উপাখ্যান শেষ করে অন্ন চিৎকার করল, 'কী রে গলায় আওয়াজ নাই কেন?'

তুমি থাকো না ক্যানো?

অ মা! যার লাইগা চুরি করি হেই কয় চোর!

কথাটা সদু অনেক বার শুনেছে, নানান প্রসঙ্গে। আর যে-ক্ষেত্রে সে নিজেই এই কথার লক্ষ্য তখন তীব্র এক অপরাধবোধ তাকে দংশন করেছে। বা, সেই বোধ তখন এক শানানো ছুরি যা আমুল বিদ্ধ হয় তারই শরীরে। অথচ সে কখনও অন্নকে চুরি করতে বলেনি, সে জানে অন্ন চোর নয়, কেবল লক্ষ করেছে কাপড়ের তলায় বাটি লুকিয়ে অন্নর কর্জ করার ক্ষিপ্রতা।

সাকুল্যে এক বারই মাত্র সদু চোর দেখেছে। তার আগে চোর সম্পর্কে যেসব গল্প ঘটনা ইত্যাদি শুনেছে তাতে তার ধারণা ছিল চোরের শরীর লোহা দিয়ে তৈরি, থ্যাবড়া মুখ, হাতের থাবায় লোম থাকে এবং পিটপিটে চোখে টর্চের আলোর মতো শয়তানি জ্বলজ্বল করে, ফোকাস মারে। সদু যাকে দেখেছিল, লোহার শিকল দিয়ে তার পা গ্যাসপোস্টে বাঁধা। পেছনে ঘোরানো হাতেও শেকল, গায়ে শার্ট না থাকায় তলপেট, ওলটানো নাইকুণ্ডু আর পাঁজর দেখা যাচ্ছিল। তার মুখ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সদুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সম্ভবত সে এক গ্লাস জল চায়। পেট দড়ির মতো শুকোচ্ছিল, খুব খিদে। পুরোনো খিদেয় তার পেট পোস্টের সঙ্গে মিশে ছিল।

জল, জল!

সেই কিশোর, যাকে চোর বলে বেঁধে রাখা হয়েছে, পাঁচ জনে যাকে পুলিশে তুলে দেওয়ার মত জাহির করে বাজারে বা কাজকম্মে চলে গেছে, সদুর কাছে সে জল চায়। কিন্তু চোরের পিপাসা থাকতে নেই, চোরের ওষুধ এবং পথ্য দুই-ই হল নির্দয় ধোলাই, গ্রীষ্মকালের দুপুরে পিচ রাস্তায় চিত করে ফেলা। আর ভদ্রজনে বড়োজোর সদুপদেশ সমেত দশটা পয়সা দিয়ে যাবেন, তার দায়িত্ব উপদেশগুলি মুখস্থ করা। ত্বকের গভীরে চালান করে দেওয়া।

কাঠগোলার মালিক ভুলুদা ছেলেটাকে জলবিছুটি দিয়ে প্যাঁদাতে থাকে, সঙ্গে 'বাঞ্চোৎ, খেটে খেতে পারিস না, এই বয়সে চুরি...!' আজাদ হিন্দ ক্লাবের ব্যায়াম করা দু-চার জন লোক গ্যাসপোস্টের গায়ে ঝোলানো সেই ছিবড়ে মাংসের পেটে দমদম ঘুসি ঝেড়ে যায়। ভুলুদা থুতু আর গয়ের ছিটিয়ে দেয় তার থ্যাঁতলানো মুখে। সদু এক গ্লাস জল নিয়ে সেই চোরের সামনে গেলে ছেলেটার ফোলা চোখের কোল জুড়ে নীল কালশিটে ফেটে রক্তের ধারা নামে। তখন ভুলুদা সদুর সামনে, ভুলুদা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে : 'কী রে?'

জল চাইছিল যে!

মুতে দে।

কেন?

বলছি মুতে খাওয়া।

কেন!

চোরের শাস্তি, মুতে খাওয়া।

নাহ্।

না?

নাহ্।

ঠিক আছে গ্লাসটা নিয়ে আয় আমি...

নাহ্।

ভাগ্ শালা...।

সদুর হাত থেকে কাচের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ভুলুদা গ্যাসপোস্টে আছড়ে ভেঙে ফেলে— গোলায় যাস ফুলকি নিতে, বেঁধে রেখে দেব, মুতে খাওয়াব শালা... পিরিত নাহ্। গ্যাসপোস্টে বাঁধা সেই ছেলেটার শরীর আস্তে-আস্তে ঢিলে ভাবে নেমে যাচ্ছিল, সামান্য গোঙানি ছিল, ক্রমে অজ্ঞান হয়। এবং ছেলেটার অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাকে ভুলুদা অবিশ্বাস করে বিছুটির বাড়ি মারতে থাকে, সদু কেঁদে ফেলে। এবং এমন একটা লোকের কথা ভাবতে পারে না যাকে বলা যায় ওকে ভুলুদার হাত থেকে বাঁচাও। আর অদ্যাবধি সদু জানে না ছেলেটা আসলে কী চুরি করেছিল, তারপর অনেক দিন সদু কাঠগোলায় যায়নি, দিদি একা-একা যেত। দিদির একা যেতে ভয় করে। তবু যেত, না গেলে যে উনুনই ধরবে না। দিদির যে কেন ভয় করে সদু ঠিক জানে না, অথচ দিদি গেলে ভুলুদা কত ফুলকি দেয়! তবু দিদি ভয় করে!

জাগা আছেননি, অ অন্নদি!

কন।

কই, টাকা পাইবেন তো নাকি?

ঘুরতাছি তো কম না, অ্যাহন হগলই কপাল।

সদুর পড়া চুকেবুকে গেছে, অন্নর খুচরো কথার ভেতর সে মার মেজাজ ধরার জন্য সচেষ্ট। আর টাকাপয়সার কথায় তার চোখ চলে যায় রেললাইনে। রুটি সেঁকার সেই কাঁচা গন্ধ তখনও পাতলা এবং উড়ছে। যদিও সদুর এখন খিদে নেই আর। রেললাইনে এখন তার চোখ; ওই লাইন ধরে বহুকাল যাবৎ সবুজ রঙের ঢাকা মেল আসবে এমন কথা ছিল। সেই গাড়ি ক্যাওড়াপাড়ার সামনে, জলার সামনে হঠাৎ দাঁড়ালে একটা মানুষ হাঁটতে থাকবে। সঙ্গে বাক্স-পেটরা বা কিছু মালপত্র থাকবে। সে হয় কাউকে জিজ্ঞেস করবে : 'সরিদের বাড়িটা কোন দিকে? সদুকে চেনেন? কোথায় থাকে?' বা, এই টিনের চালায় কড়া নাড়তে থাকবে।

মার মুখে বহুবার শোনা এই বৃত্তান্ত সদুর কাছে এরকম একটা ছবি হয়ে ফেরত আসে। অন্ন বলত, 'অ্যাই রেললাইন ধইরা ঢাকা মেলে তর বাবায় ফিরব, বুঝছসনি সদু।'

জন্ম থেকে শুনে আসছে কথাটা। আর বাবার ফিরে আসাটা স্বপ্নের মতো। হাতে পায়ে ওম পায়। শীতের আরাম আসে, খেশ গায়ে দেওয়ার মতো, বাবার একটা খেশ ছিল, এখনও আছে। যত বার সদু খেশটা গায়ে দিয়েছে, অন্ন ঠিক বলে উঠত, বলে ফেলত— 'নারানগঞ্জ থিকা ফেরার পথে কিনছিল...।' সদু গন্ধ পেত নারানগঞ্জের, জলের। অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তখন। কুলগাছ ভরে যায়, নিষ্ফলা পেয়ারা গাছও ফেলে দেয় অতীব পাকা দু-একটা ফল, অন্ন পায়েস রান্না করে। সরি এলোচুলে গন্ধ তেল মাখে আর সদুর ইস্কুলে যাওয়ার দিন এসে যায়। সে বিড়বিড় করতে থাকে : বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমাদের খুব কষ্ট; মার কষ্ট হচ্ছে, আমাদের কষ্ট হচ্ছে...। সদুর গায়ে কাঁটা দিতে থাকে, কষ্ট তীব্র হয়। যেমন হয়েছিল সরির সঙ্গে বারোয়ারিতলায় যাত্রা শুনতে গিয়ে। নদের নিমাই পালা ছিল, সরির কোলে বসে যাত্রা দেখতে দেখতে হঠাৎ সদু ডুকরে কেঁদে ওঠে, নিমাই তখন সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে। সরি আঁতকে ওঠে, 'অ্যাই ভাই, ভাই কান্দোস ক্যান সুনা... কান্দোস ক্যান...!' সদু কেবল হিক্কা তোলে, ফিরে এসে মার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মা, বাবু সন্ন্যাসী হয়েছে? বলো না মা? ও মা! বলো না!' অন্ন কোনো জবাব দেয়নি। থাবড়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করেছে, 'এত বড়ো মাইয়ার বোধাবোধ নাই, উনি যাত্‌রা দ্যাখতে যান, যাত্‌রা দ্যাখে ফাত্‌রা লোকে...।'

ও মা, বলো না।

চুপ যা। ঘুমা হারামজাদা... হাড়মাস কালি কইরা দিল... তিনি তো পলাইয়া বাঁচছেন... যত হাঙ্গামা অখন তুই মাগি পোয়া...।

অন্ন রুটি সেঁকতে-সেঁকতে সরি ফিরল। চটের থলের ভেতর থেকে কাঠের ফুলকি বের করে উনুনের পাশে ঢালতে ঢালতে বলল, 'কহন ফিরলা? বুঝলা মা, র‍্যাললাইনের সামনের ডোবাটায় না ম্যালা কলমি শাগ হইছে, কাইল নাওনের সময় আনুম অনে, আর হ... কানাইদা কইছে সদুরে লইয়া যাইতে, ভরতি কইরা নিব।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলতে বলতে সরি চাতালে যায়, জল ঢালার ছর্ ছর্ শব্দের সঙ্গে মিশে ওর কথা দ্রুততর হয়। আর একটু দুর থেকে বলে স্বরের সেই তীব্র সূক্ষ্মতা টের পায় সদু। সরির গলা বড় মিহি, গলুর দাদা বলে গানের গলা। কিন্তু সরি গান শেখেনি, গান শেখে না, বনবাদাড় ঘেঁটে বেড়ায়, টুকিটাকি সংসারের জিনিস জোগাড় করে, কাকিমার কিংবা পাড়ার লোকের ফরমাশ খাটে। আর সেই গানের গলা পাঁচটা কাজের কথায়, সুঁচের সূক্ষ্মতায় বিদ্ধ করে, ফোঁড় টানে তিনটি প্রাণীর সংসারে। সদু হঠাৎ লাফ দিয়ে খাট থেকে নামল। অন্নর পিঠের কাছে দাঁড়ায়। অন্নর আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকে : 'কানাইদার ইস্কুল ভালো না, কানাইদার ইস্কুলে পড়ব না।'

তয় কি মুখ্যু হইয়া থাকবি!

কানাইদা মারে।

'ঘ্যান ঘ্যান করিস না, সরি রাইত হইছে খাইয়া ল,' অন্ন এনামেলের থালায় দু-খানা করে রুটি দেয়, পেছন ফিরে একটা কৌটো নামায়। তখন অন্নর বেঁটে ছায়া সেই মাঠকোঠায় থ্যাবড়া হয়ে ঝুলতে থাকে। ছেলেমেয়ের পাতে গুড় দেয় অন্ন। আর সদু খেতে খেতে অলস হাত থালায় ফেলে রাখে, পানাপুকুরের নড়বড়ে সাঁকো ধরে সরির ইস্কুলে যাওয়া ফ্রক উড়তে থাকে। দিদির বগলে বই, আর কানাইমাস্টারের ড্যাবডেবে চোখ গোরুর মতো হামলাতে থাকে। সদু ভয় পায়। সদুর কেমন ভয় ভয় করে। এই তো সেবার যখন সবাইকে বোঁদে খাওয়াল, সেদিন কি মারটাই না মারল! কী যেন ছিল, সদুর ঠিক মনেও পড়ে না... স্বাধীনতা...। কানাইমাস্টার নিজেই তেরঙা তুলল বাগ্‌দিপাড়ার বুকে। ক্যাওড়া, বাগ্‌দি আর কাঠগোলা আর পাইপের ভেতর থেকে সব ছানা-পোনার দল, ইজেরের দড়ি টানতে টানতে এসে বোঁদের ঠোঙাটা ঘিরে দাঁড়াল। কোমরে ন্যাতা জড়ানো ছেলেটাকে আঁকপাঁক করতে দেখে সদুর হঠাৎ মনে হয়েছিল— কেড়ে না নেয়! ছেলেটাকে সদু আগেও দেখেছে, লেকের ধারে বড়ো বড়ো পাইপগুলোর ভেতর ওরা থাকে। বাপ, মা, ভাই, বোন সবাই। সবাই মিলে বাজার থেকে তরিতরকারির খোসাটোসা কুড়িয়ে আনলে ওর মা সারাদিন ধরে সেই জাবনা ফোটায়। ছেলেটা বোঁদে খেয়ে গলা ফাটিয়ে 'বন্দেমাতরম' দিল। এক বার, দু-বার, তিন বার। শেষে হঠাৎ কানাইদার হাত ধরে ছেলেটা বলেছিল, 'এবার থেকে রোজ হবে তো?'

কী!

স্বাধীনতা...

হঠাৎ কী যে হল কানাইদা দম বন্ধ করে ছেলেটাকে মারতে লাগল। বোঁদের হলুদ ছোপ, রক্তের দাগ আর সর্দি লালায় মাখামাখি ছেলেটাকে হিক্কা তুলে কাঁপতে দেখে অসহ্য রাগে সদুর গা ঘিনঘিন করতে থাকে। চলে যেতে-যেতে ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা ফিরে-ফিরে কানাইদাকে দেখছিল। আর হিক্কা তুলছিল।

সদু এখনও স্পষ্ট দেখতে পায় : কানাইমাস্টারের সেই ড্যাবডেবে চোখ, পাইপপাড়ার ছেলেটার আমসি-মুখ, মুখে রক্তের ক্ষীণ রেখা। এই নির্দয় স্মৃতি যেহেতু কানাইদাকে দেখামাত্তর মাথায় চাগাড় দেয় সে-কারণে সদু আর কখনও স্বাধীনতা উৎসবের ভিড়ে দাঁড়ায়নি। ব্যান্ডপার্টির

শোভাযাত্রা বেরোলে পুকুরপারে কুল গাছের ঠান্ডা স্যাঁতসেতে জমিতে কিছুক্ষণ অযথা কাটায়। ভেজা গন্ধ গড়ে ওঠে, আলখাল্লার মতো সেই গন্ধ ঢিলে হয়ে থাকে। এখন তার হঠাৎ এইসব সাত-সতেরো কথা মনে হওয়ায় রুটিতে বেকায়দায় কামড় দিয়ে ফেলে। আর খট্ করে একটা শব্দ হয়, সেই শব্দের সঙ্গে মগজে চালান যায় পয়লা দুধের দাঁত নড়ার স্পষ্ট ব্যথা। সে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে, চোখে জরির সুতো, জল ঝরতে থাকে।

কী হইল, অ্যাই সুনা?

সদু অ সদু কী হইছে ভাই! জল খা।

সরির আর খাওয়া হয় না, সে সদুকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেয়। মুখের কাছে গ্লাস ধরে: খা, খা। বার দুই-তিন ঢোঁক গেলার চেষ্টার পরে সদু গোঙায় : নড়ছে!

কী?

দাঁত।

অন্ন আঙুল দিয়ে টিপেটুপে দাঁতটা পরখ করতে থাকে: সরি একনাল সুতা আন দেখি। সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অন্ন দাঁতটা বেঁধে দিল। সদু অল্প অল্প টানতে থাকে। টানে আর মাথার দিকে বেদনার স্রোত চলে যায়। সদু ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে পারে, সরি একটুতেই কাহিল হয়। এই তো গেল বছরের কথা, অন্ন উনুন ধরিয়ে চান করতে গেছে। শীতকাল। বড়ো শীত। সদু উনুনে পা সেঁকতে-সেঁকতে ফোসকা ফেলে দেয়। ফিরে এসে অন্ন তার ওপরই দুমদাম বসিয়ে দিয়েছিল : 'কী করুম হা কপাল! কপালে কী অ্যাইয়াও আছিল... এই ছাওয়াল লইয়া আমি অখন কী করি... বোধাবোধ নাই...।' ধীরেসুস্থে টানতে-টানতে সদু দাঁতটা খসিয়ে ফেলে, দেদার রক্ত পড়তে থাকে। রক্ত দেখলে সরির মাথা ঘোরে, সরি সদুর হাত ধরে : 'চল ভাই, গর্তে দিয়া আসি।'

অন্ন হঠাৎ মায়াময় : যাও, দিদির কথা শুনতে লাগে।

অন্নর মেজাজমর্জি ভালো থাকলে ওদের 'তুমি' বলে ডাকে, তখন সদু ফুরফুর বাতাস পায়, অকারণ এক আনন্দ সেই মাঠকোঠার খুপরিতে ক্রমে অনুজ্জ্বল আলোয় ভাসতে থাকে। এরপর সরি কথা বলে : 'ভাই বড়ো হইয়া গেছে...।'

সদুর দুধের দাঁত পড়ে যায়, সে এখন ফোকলা, কথা বলতে গেলে থুতু ছেটাবে।

সরির হাত ধরে সদু চাতালের পেয়ারা গাছটার তলায় গেল। ওখানে ধেড়ে ইঁদুরের আস্তানা। গাছটার ছালবাকল নেই, সাদা ডাল জটিল হাড়ের বিন্যাসে দীর্ঘকাল একইরকম। এ বাড়ির অনেকের দুধের দাঁত জমা আছে পেয়ারা গাছটার গোড়ায়, অন্ধকার সুড়ঙ্গে। মাটি তুলে তুলে ধেড়ে ইঁদুর নরম এক ঢিবি বুনে রেখেছে। সেই ঢিবির ওপর থানকুনি পাতার বাহার, যা আমাশায় ভোগে বলে কাকামণিকে খেতে হয়। সরি সদুর হাতটা সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, ঢুকিয়ে ধরে রাখে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকে সরি। সদু দিদির মুখের দিকে চেয়ে আছে, সরি থামামাত্তর জিজ্ঞেস করে, 'কী বললি রে দিদি?'

আমার দাঁত তোমায় দিলাম, তোমার দাঁত আমার...

মানে?

তোর ইঁদুরের মতো দাঁত হবে, কুট কুট করে খাবি।

কেন বললি?

বেশ করেছি, ওঠ।

আমি কি ইঁদুর?

হ্যাঁ, সাদা ইঁদুর।

দিদি!

কী তবে কী তুই?

মানুষ।

ওরে আমার মানুষ রে!

সরি পাঁজাকোলা করে সদুকে নিয়ে এসে খাটের ওপর ঝুপ করে বসিয়ে দিল। সদু তখনও গজরাচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। আর এভাবে সে কাহিল হয়, শ্রান্ত তার মুখে বাইরের ধবল স্রোত দরমার ঝাঁপ ঠেলে এসে পড়ে। ঝিল্লির টানা শব্দও থাকে। সামান্য পোকা নীল আলো সমেত জাল বোনে, খসে যায় দু-একটা নক্ষত্র। আর সদু একরাত থেকে পৌঁছে যাচ্ছে আর এক রাতে। যখন অবশ্যম্ভাবী দিনগুলো নানান দৌরাত্ম্য, বর্ণপরিচয় আর নব-ধারাপাত এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমেত ঢোলা জোব্বার মতো খুলে যায়। নিতান্ত বালক বলে কোথাও হারায় সেই জোব্বা।

ধন বাইর কর ধন বাইর কর তিনডা খুদের হাঁড়ি
জন বাইর কর জন বাইর কর তিন মাগি রাঁড়ি॥

এনামেলের থালাটা হাতের চেটোর ওপর বসিয়ে সরি ঘাটে গেল। ততক্ষণে অন্নর খাওয়া হয়ে গেছে। ন্যাতা বুলিয়ে অন্ন উঠতে-না-উঠতে সরি ফিরে এসেছে। চট আর সুঁচের ফোঁড়ে তোলা নকশি কাঁথা বিছিয়ে বিছানা পেতে ফেলে আর শূন্যে ঘটি তুলে আলগোছে জল খায় অন্ন। প্রতি ঢোকে কণ্ঠনালীর হাড় এবং শিরা খেলতে থাকে।

খাইছ?

কোন আখার ছাই আছে যে তাই দিয়া খামু? কী রাইখ্যা গেছে? বলে...

তখন অন্ন ছড়া কাটে, যাতে 'মাগি' এই শব্দটা ভয়ানক গুরুত্ব পায়। আর পেয়ারা গাছের ডাল অন্ধকারের শরীর। অন্ধকার সেই নিষ্ফলা গাছের ডালে ফাঁস। সদুদের চালায় একটা থ্যাবড়া ছায়া আছড়ে পড়ে। দীর্ঘ শীতের রাত বাড়ছে। পাশের বাড়ির চাটগাঁইয়া বিশুদের খুপরি থেকে শুটকি মাছের তীব্র গন্ধ আসছে। চনুর মা এই গন্ধ পেলেই জিজ্ঞেস করে, 'অ বিশুর মা দিদি কী রান্ধলেন আইজ?'

হুটকি মাছের ঝুল আর পদিনা পাতার...

বিশুর মার ফ্যাসফেসে গলা আশপাশের শূন্যতা বিদ্ধ করে। ততক্ষণে অন্ধকার গোল হয়ে দুলতে থাকে। ক্রমে সংকীর্ণ। তিনটি প্রাণীর শরীরে পেয়ারা ডালের ছায়া পর্যায়ক্রমে ঘুরে ফিরে আসে। টিনের চালার সর্ষে-ফুটোয় শুদ্ধ সাদা রঙ। কদাচিৎ তারার ঔজ্জ্বল্য। ক্যাওড়াপাড়ার পিছনের জলায় আর লাইন-ধারের ঝোপে জাগ্রত শেয়াল প্রহর গুণে যাচ্ছে।

অন্ন ছেলেমেয়ে দুটোকে দু-পাশে নিয়ে শোয়। আর শুলেই সারাদিনের ধকল, ঝঞ্ঝাট, সে ক্রমে ভুলে যেতে থাকে। শরীর নরম। একপ্রকার নীল মায়া তখন ওই চল্লিশোর্ধ শরীরের দখলদার। সদু মার বুকের কাছে মাথাটা কাত করে রেখেছে। অন্ন কোনো কথা বলে না কিন্তু তার শ্বাস এবং মৃদু আন্দোলিত হাত জানায় যে অন্ন জেগে আছে। জেগে থাকছে। সদুর সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি তখন কেবলমাত্র দুটি কান তীব্রতর সজাগ করে রাখে। সে অন্নর মুখে কিছু একটা শুনতে চায়, আর স্তব্ধতার ঘন আনন্দ বয়ে যেতে থাকলে অন্ন হঠাৎ কিছু একটা দিয়ে শুরু করে। যাতে সুখ, সম্পদ বা বৈভবের কথা থাকে। ভবিষ্যৎ এক দূরগামী মেলট্রেন চেপে সশব্দে প্রায় এসে যায়। অন্নর সন্তানাদি তখন তারই শরীরে আঠা হয়ে থাকে। আজ সদু নিজেই হঠাৎ মার গলা জড়িয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে, 'আমি দেশপ্রিয় ইস্কুলে ভর্তি হব মা!'

অমা! এত্তদূরে একা-একা যাবি ক্যামনে!

কেন? দুলুর সাথে যাব।

মেলা টাকা পয়সার কাম, আমরা গরিব মানুষ কই পামু?

কেন? আমরা গরিব ক্যানো?

জানি না, এত কথা তো জানি না। গরিব, গরিব... ব্যাস।

কেন?

জ্বালাইস না কইলাম।

বলো না?

আইচ্ছা বিপদ হইল, অ সরি শোনসনি সদু কী কয়!

সরি তখন সদুর থোকা চুলে কয়েকটা আঙুল ছেড়ে দিয়েছে, অনায়াসে খেলা করে সেই আঙুল। অন্ন দরমার খোপকাটা জানলার ভেতর দিয়ে রেল লাইনের দিকে জল-চোখ মেলে বিড়বিড় করে : 'তর বাবায় নাই কিনা তাই। হেই মানুষটা থাকলে আমাগো কীসের দুঃখ, কীসের কষ্ট!'

বাবা কবে ফিরবে?

ফিরব।

বাবা ফিরছে না কেন?

মেলা কাম, তয় ফিরব, নিশ্চিত ফিরব।

তারপর তারা তিনজন সেই নিরুদ্দিষ্ট মানুষটা সম্পর্কে আলোচনা করে। সদু এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। সরি তার স্মৃতি থেকে সন্দেশ খাওয়ার আর ঝলমলে ফ্রক পাওয়ার গল্প বলে। আর এভাবে সদু বাবার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নিতে থাকে, অস্পষ্ট, ধোঁয়া-ধোঁয়া জায়গা ভরাট করে তার নিজস্ব অনুমান ও কল্পনা। ক্রমে সে তার বাবাকে একান্ত নিকটে পেয়ে যায়। তার কেমন একটা আশা হতে থাকে বাবা ফিরে এল বলে। অন্ন এই সুখের স্মৃতিচারণার মধ্যে অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে, আর সদুর হঠাৎ মনে হয় পাইপপাড়ার সেই ছেলেটার কথা। ওরা বাবা-মা, ভাইবোন সমেত পাইপের ভেতর থাকে। ওদের তো বাবা আছে, তবু ওরা গরিব কেন? ওদের তো বাবা আছে তাহলে ওরা পাইপে থাকে কেন?

সদু অন্নকে ঠেলল। অন্নর সাড় নেই। সারাদিনের ধকলে অন্ন এখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সদু এপাশ-ওপাশ করে। তারপর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে; আর এক নির্দয় স্বপ্ন তাকে টেনে নেয় সেই পাইপের ভেতর। অন্ধকারে, স্বল্প-বাতাসে, তার দমবন্ধ হয়ে আসে, সে ছটফট করে। বেরিয়ে আসতে চায়, ক্রমাগত হামা দিয়ে চলে, কিন্তু কিছুতেই পাইপের সেই মুখটা পায় না যার পর ছিন্ন আকাশ পাখির পালক।

অ্যাই সদু, কী হইল ভাই, অ সুনা, বোবায় ধরছে, পাশ ফিইরা শো!

সদু পাশ ফিরে শোয়।

ল্যাখাপড়া করে যে, গাড়িঘুড়া চড়ে সে।

চিক্কইর দিয়া পড়, জানি কতকাল খাস না, জানি শুকাইয়া আছোস।

কথাটা বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে অন্ন চলে যায়, সদুর দিকে তাকায় না। আর এই সমগ্র কাণ্ড ও কয়েকটি মুদ্রার মধ্যে অন্নর ব্যগ্রতা স্পষ্ট। সে দুদ্দাড় ঘাটে চলে গেল। শুকনো পেয়ারা

পাতার শব্দ কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। সদু তখন দুলে চলেছে— তালব্য 'শ' আর 'ঠ', 'শ ঠ অ... শ আর ঠ...শ...ঠ...অ...শঠ'...' মানে? আবার মানে? শঠ মানে কী? সে ফ্যালফ্যাল করে চারদিক এমনভাবে দেখে যেন সে এক্ষুনি তাকে দেখতে পাবে, শঠ-কে। আর এই দুটি অক্ষর, তাদের মিলিত উচ্চারণে কী জাঁক! যেন মেলাই পোশাক পরা বেঁটেখাটো কোনো মানুষ চ্যাপটা নাক, ভয়ংকর গম্ভীর...। শঠ মানে কী? অন্ন নেই। ঘাটে গেছে। আর থাকলেও কি জিজ্ঞেস করা চলত? মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে আছে। কনকনে ঠান্ডা একটা ভাব ধোঁয়ার মতো উড়তে থাকে। অন্নর তখন কান্না পায়। অন্নর কান্না পাওয়াটা বমির মতো বুক ভেঙে উঠে আসে। আর কান্না পাবে না-ই-বা কেন? সকাল থেকে এত বেলা হয়ে গেল, সে সদুর মুখে একখানা শুকনো রুটিও তুলে দিতে পারেনি। উলটে তাকে বলতে হয়েছে, 'গলায় আওয়াজ নাই দেখি... জানি শুকাইয়া আছোস!' এ যে অন্নর কী কষ্ট তা সদুও বোঝে। সদু আরও টের পায় তার দিকে মার যত টান দিদির দিকে ততটা নয়। নাহলে সরিও তো সেই কোন সকালে বাসি মুখেই বেরিয়ে গেছে শাক-পাতা-লতার খোঁজে! আর সদুর থোকা চুলে আঙুল চালিয়ে অন্ন বলবে, 'সুনার আংটি আবার বেঁকা!'

সদু তখন ভেবেছে— দিদি কি ফ্যালনা? দিদি কি মানুষ না?

অন্ন বলে : মাইয়া মানুষ/মাইয়া সন্তান...

মাইয়াসন্তানের এত জেদ ভালো না!

মাইয়ামানষের এত জেব্বা কীসের!

সরি ক্রমাগত পিছন দিকে সরে যাচ্ছে দুধের লাইনে, ক্যাওড়াপট্টি ছাড়িয়ে জোলো মাঠে সরির একবেণী হারায়, যেখানে সে কোমর ভেঙে কলমি অথবা হেলেঞ্চার সন্ধান করবে... কচুর লতি কিংবা খারকোল পাতা খুঁজে আনবে, 'অ মা দ্যাখো আইসা কতডি লতি!'

হইছে, হইছে... অহন ছান্ কইরা উদ্ধার করেন দেহি; ক্যাবল পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে পারলেই হইল, নাহ্? লাজ নাই... লজ্জা নাই... এই মাইয়ার জন্য মাথা কাটা যাইব... বিক্কিরি বসতে হইব... অইচ্ছা জব্দ কইরা গেছে আমারে!

অন্ন ঘাট থেকে ফিরল। চুলের গোছা কপালের বিনবিনে ঘামের সঙ্গে লেপটে থাকায় দু-এক গাছা সাদা সুতোও মালুম হয়। সামনের উঁচু দাঁতটার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। দুমদাম শব্দে সে কাজ করে যেতে থাকে। উবু হয়ে ঘর মুছতে গিয়ে খাটের নীচে ঠোক্কর খায় একবার। আর তখনই সদু সেই বমির বেগ টের পেল, আদতে যা কান্না। অন্ন যেন এক্ষুনি সেই কান্না পেট আর বুক থেকে টেনে এনে পিত্তি সমেত ঢেলে দেবে কাঁচা মাটির ঘরে, দেওয়ালে।

সরি গেছে কানাইমাস্টারের ক্লাবে। সেই সকালবেলা গেছে এখনও ফেরার নাম নেই। ক্লাবে দুধের জন্যে যে লম্বা লাইন পড়ে সরি সেই আঁকাবাঁকা লাইনের ধাক্কাধাক্কিতে ক্রমশ ক্লান্ত হবে। সরির খিদে পাবে। আর লাইনটা একটু একটু করে এগোবে। খিস্তিখেউড় আর [illegible] [illegible] ক্যাওড়াপট্টির সইতে সইতে লাইনটা এগোয়। দুধের সেই লাইনের হাতে থাকে হিজিবিজি কাটা হলুদ কার্ড। দুধ মেপে দেওয়ার আগে কানাইদার ক্লাবের ছেলেরা খস্‌খস্ করে কার্ডে দাগ দিয়ে দেয়। একবার ওই দাগ পড়ে গেলে কেউ আর ঠকিয়ে দু-বার দুধ নিতে

পারবে না। তবু ফাঁকি দিতে চেষ্টা করতে গিয়ে মার খায়। হাতের সুখ মিটিয়ে কানাইদা মারে। একবার সরি ফিরে এসে বলেছিল, 'কী কাণ্ড জানো মা! মিলিক পাউডার তো গরমেন্ট বিনা পয়সায় দেয়... তা হইছে কি মিলিক পাউডারের ব্যাগ আইলেই অরা আদ্দেক নাকি বেইচা দেয়।' সরির ফিরতে বেলা হয়, সরি ফিরলে অন্ন চা বানায়। সদু জিজ্ঞেস করে, 'শঠ মানে কী।' সরি কোনো উত্তর দিতে পারে না, সে কেবল দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রাখে, 'কালুর মায় র‍্যাশন ছাইড়া দিতাছে... টাকা থাকলে...' অন্ন কোনো উত্তর দেয় না।

সদু নিশ্চিত যে সকালে একখানা গোলা রুটিও জুটবে না, একটু পরেই অন্ন তাড়া লাগাবে, 'সদু নাইতে যা'। আর তখন সে পূর্বাপর সমস্ত বুঝে চিৎকার করে পড়তে থাকে, 'অ, চ আর ল... অচল, অ...ধ... আর ম...অধম।'

সদুর এত চিৎকার কেবল অন্নকে খুশি করার জন্য। মাকে খুশি করার কেমন একটা লোভ আছে। বিশেষ যখন চনুর মা বলে, 'দেইখেন অন্নদি, পোলায় আপনার ভালো হইব...হগল দুঃখ ভুলাইব, কি রে সদু কথা কস না ক্যান?' সদুর তখন বস্তুত কথা বলার ক্ষমতা থাকে না, তখন সেই লোভ ছিন্নভিন্ন। আনন্দে গলে যেতে থাকে সে। কেমন লুলা হয়ে যায়। আর একটা কথা কেউ-না-কেউ বলে, 'ল্যাখা-পড়া করে যে...।' যে বলে কখনো সে রণর বাবা, কাকামণি কিংবা চনুর দাদু। তারা যে খুব একটা বিশ্বাস করে তা নয়, তবে কেমন একটা আমোদ আছে। কোথাও স্ফূর্তি হয়। সদু স্বপ্নে পটু নয়। অন্নর হা-হুতাশ এবং এমন অনেক সম্ভাবনা অযথা বিনষ্ট হতে শুনেছে যাতে অন্ন স্বস্তির আশা করেছিল। ফলে সে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না যে সে বড়ো হচ্ছে, পুরোদস্তুর মানুষ হচ্ছে। এবং চাকরি করে টাকা এনে দিচ্ছে অন্নকে। যেমন সকলে ভাবে, অথবা বলে। কোথায় যেন তার বিশ্বাস হয় না।

ঢাকের বুকে কাঠি বাজে। বারোয়ারিতলা, কাঠগোলা, নতুন কলোনি আর পাঁক-পচা ডোবা পেরিয়ে ক্যাওড়াপট্টি তক ঢাকের গুড়-গুড়, গুড়-গুড়, শব্দের প্রতিধ্বনি হয়।

...ট্যাং টা...ট্যাট্যাং...ট্যাং টা...ট্যাট্যাং এই শব্দ অবোধ অপোগণ্ড বালক-বালিকার এক ঝাপটা বইয়ে দেয়। বিভিন্ন দিক থেকে কাদা ভেঙে, খোয়ায় পা কেটে ইজের আর ফ্রকের পেছনে ধুলো লেলিয়ে তারা আসতে থাকে, ছুটতে থাকে। ঢাকের এই শব্দ যেন ডাক, আহ্বান। যেমন বিহারি রামসেবক কালো কাপড়ে ঢাকা সিনেমার বাক্স নিয়ে এলে হয়। সে ঘণ্টা নাড়তে থাকে। আর সেই শব্দে গরিবগুরবোর ঘরে দু-একটা তামার পয়সার জন্যে শিশুরা চঞ্চল। অযথা মার খায়, আর কয়েকজন ভাগ্যবানের সামনে পেতলের ঢাকনা খুলে গেলে নিরুপায় অন্যান্যরা হুমড়ি খায়। কখনো হাতাহাতি হয়। আর বৎসরান্তের এই ডাক যখন লাইন ধারে কাশের বনে ছেঁড়া মাতাল তুলোর হুটোপুটি ছড়িয়ে অকস্মাৎ ঢাকের বোল, তখন ঢালা এক রাঙা উৎসব শিশুদের ধমনিতে স্রোত আনে। সেই শব্দ বুকের ভেতর জটিল ধ্বনির আবর্ত।

থুত্থুড়ে ঘোড়ানিমগাছের থ্যাবড়া ছায়ার জড়ভরত গুঁড়ি ছুঁয়ে প্যান্ডেল। এবার নিয়ে বারোয়ারিতলায় পুজোর একশত বর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। প্রথম পুজোর চল করেছিল কানাইদার দু-পুরুষ আগে ছানুবাবু, তখন বলা হত ছানুবাবুর পুজো। ছানুবাবুর এখানে বিশাল বাগানবাড়ি

ছিল, ছানুবাবু ভবানীপুরের মিত্তিরদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। দশ টাকার নোট লাগিয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন। পায়রা ওড়াতেন। গোঁফে আতর মাখতেন। কানাইদাদের বাড়িতে ছানুবাবুর ছড়ি এখনও সযত্নে রক্ষিত।

তেরপলের পর্দা টাঙিয়ে দুর্গাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। ষষ্ঠীর দিন উম্মোচন করা হবে দুর্গার পর্দা। অন্ন বলে, দুগ্‌গা পরতিমা। কখনো কখনো কেবল 'পরতিমা' বলে। ঢাকের শব্দে সদুর মা-র কথা মনে পড়ে, পরতিমার পানপাতার মতো ভরাভরা-মুখ ভাসতে থাকে। নতুন জামা আর গ্যাসবেলুনের অনুষঙ্গ আসে। ঢাকের বোলে মোষের কাটামুণ্ডু ড্যাবড়া চোখ ভেসে ওঠে, যে কারণে দুর্গাঠাকুরের নাম মহিষাসুরমর্দিনী। দু-একদিন আগেই মহালয়া হয়ে গেছে। চনুর দাদু কালীঘাটের গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়েছিল। আর অন্ন মহালয়ার দিন সারা সকাল অকারণে বিমর্ষ ছিল। একবার সদুকে গালমন্দ করে, 'যাওনের সময় আমারে বাঁশ দিয়া গেছে... জানি না যা আছে খা গিয়া... তিনি তো তার বাদ্যি বাজাইয়া গেলেন, অ্যাহন তুই মাগি জ্বইলাপুইড়া মর... এই ছাওয়াল তখন প্যাটে... বোঝেন অবস্থা...।'

সদু প্রতিমার মুখ দেখতে পেল না, ক্যাওড়াপট্টির ছেলেদের পেছনে, ভিড়ের ভেতর লুকিয়ে-ছিপিয়ে থাকল। কানাইদা যে সামনেই, আর যদিও এখন চাঁদা তুলে বারোয়ারি পুজো তবু কানাইদার হম্বিতম্বি বেশি। ফসফস করে সিগারেট টানছে কানাইদা, হুকুম করছে। কী যেন ভেবে হা হা করে হেসে উঠল কানাইদা, প্যান্ডেলওয়ালা জড়সড়। কানাইদা যেন ভগবানের মতো। কানাইদা ইচ্ছে করলে কী না পারে! প্যান্ডেলওয়ালাকে আগাম টাকা দিতে পারে, দুর্গার পর্দা তুলে দিতে পারে, সদুকে কাঁধে তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারে, এবং ইচ্ছে করলেই আবার লুফে নিতে পারে। কানাইদা রাজা। সুলতান আলম স্ট্রিটের চাপা গলি, ভাঙা সাঁকো, কিছু বৃক্ষ, জলাশয় এবং বরফকল সমেত তামাম এলাকায় কানাইদা রাজার মতো। সুলতানের মতো, প্রকৃতই সুলতান। এই একে চাবকে সিধে করে দিচ্ছে, অমুকের টেম্পোরারি ছুট কাজের তদবির, তমুককে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে জুড়িয়ে দিচ্ছে। রামাশ্যামাকে প্রশ্রয় দিয়ে উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে। কানাইদার মুখের একটা কথায় তারা গুম খুন করতে পারে। একবার করেছিল বলে শোনা যায়।

মণ্ডপের সামনেই যেহেতু সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরি হচ্ছিল সেজন্য সদু তার ক্ষুদ্র শরীর ভিড়ের ভেতর বিশেষ কায়দায় চালান করে। নচেৎ কানাইদার হাতের চাপড় সইতে হত। কানাইদার সদুর ওপর খুব টান, কথায় কথায় চাপড় লাগায়। সেই কানাইদার ভিট কপাল একেবারে সামনেই। এখন সে কী করে? পালাবে? তা হলেও তো কানাইদা দেখতে পাবে, আর দেখলেই প্যাঁদাবে। চনুর মা বলে— শনিঠাকুর। তেজে অস্থির। সদুর তাই কানাইদাকে দেখলেই ভগবানের কথা মনে হয়। আর ভগবানে সদুর বড়ো বিরক্তি, রাগ। অন্ন কত ডাকে, ভগবান তবু দুঃখ ঘোচায় না। অন্ন কাতরায়— ঠাকুর আর তো পারি না। সদুও মানত করেছে, হে ভগবান, বাবুকে এনে দাও (বাবাকে 'বাবু' বলাটা সদুর সরির কাছ থেকে শেখা)। বাবাকে সে কখনও দেখেনি, বাবার কোনো স্মৃতি নেই তার। কেবল কিংবদন্তির গল্প আছে বাবাকে ঘিরে। সদু বাবার জন্যে ভগবানকে বলে বলে হয়রান হয় এবং শেষমেশ গাল দেয়, কারণ ভগবান শোনেনি। শালা। হারামি। শালাহারামি।

সদু আরও গালাগালি জানে। একবার অন্নর সামনে কী একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলায় ঠেঙানি খায়। এবং অন্ন তারপর স্বভাবজ বিলাপে মগ্ন থাকে; যে বিলাপ তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে শোকের ঝান্ডা গেড়ে দেয়। রাতে অন্ন খায় না, 'হা ভগবান কপালে এইয়াও ছিল... ছুটোলোকের সাথে মিশ্যা'...

ক্যাওড়াপাড়ার গলুদের এসব বালাই নেই। গলু রাগলে যা-তা বলে, ক্ষেমিপিসির মুখ তো একেবারে পাশ করা। আর সদুর যেন রাগ নেই, সে যেন মানুষ নয়। অন্ন এই বৃত্তান্ত জানে বলেই গলুর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে না। বলে, 'ল্যাখে না পড়ে না, অর লগে তর বন্ধুতা কীসের শুনি! অগো আর কী, উইড়া আধার খাইতে শিখলেই হইল। আর তর? তর চলবোনি?'

সদু ঠিক বোঝে না অন্ন কী বলতে চায়। এমনকি এখনও পর্যন্ত সে লেখাপড়ার আবশ্যকতাই তেমন বুঝে উঠতে পারেনি। কেবল ভবিষ্যতের ধোঁয়া-ধোঁয়া যে নকশা অন্ন বুনে রাখে, সদু এটুকু বোঝে সেখানে পুস্তক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সে নিজে সেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারে না বরং গলুর দিগম্বর মূর্তি ও হাতের গুলতির নিশান অব্যর্থ বোধ করে, সেজন্য তাকে ভাবতে হয়, ধুস্ পড়লেই যেন হল! পারবে কেউ গলুর মতো উড়ন্ত বেলেহাঁস এক টিপে মারতে? ঝপ্ করে কাঁকড়ার দাঁড়া ধরতে? গলু সব পারে। এমনকি গলু রেললাইন ধরে যাদবপুরের রাস্তা চেনে, সদুকে নিয়ে যাবে বলেছে। সদুর কাছে গলু নায়কের মর্যাদা পায়। সে নিজেকে মনেপ্রাণে গলুর চেলা ভাবে।

কানাইমাস্টারের চোখ এদিক-ওদিক ঘুরপাক খেতে খেতে সদুর মুখের ওপর দাঁড়ায়। ঢাকের আওয়াজ আর সমানে নাচের ছাঁদ তখন বারোয়ারিতলায় মজা ওড়াচ্ছে। নাচের এক একটা মুদ্রায় যুদ্ধের, আক্রমণের ভাঙা ছায়া থাকে। ক-দিন এই লোকটা বাড়ি বাড়ি পালা করে খাবে, পুরোনো কাপড় আর খুচরো পয়সা তুলবে। গতবার চনুদের ওখানে একবেলা খেয়েছিল। চাষবাস, পালাপার্বণ আর দেশগাঁ গেরস্থালির গপ্প করেছিল, গাঁয়ে নাকি অভাব, দারুণ অভাব। আর বলেছিল সিমলার বাবুদের কথা, একবার বাজিয়েছিল সিমলায়, কিন্তু এক পয়সা ঠেকায়নি, উলটে নাকি মেরেছিল। আর তবু সে বাবুদের পুজোয় এসে পড়ে ঠিক, বাজায়— ট্যাং ট্যা ট্যাট্যাং ট্যাংট্যা...। বাজনার এরকম মানে করে নেয় সদু, গলু, রণ: ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

কী রে ছোঁড়া!

কানাইমাস্টারের ড্যাবড্যাবে চোখ সদুর মুখে ফোকাস মারে।

ইস্কুলে যাচ্ছিস না কেন?

বই কিনে...

সদু কী একটা জবাব বানানোর চেষ্টা করে, আসলে সেই ভিড়ের মধ্যে সদু ফাঁকফোঁকর খোঁজে। আর হঠাৎ সে ক্ষিপ্র শরীরটা গলিয়ে দেয় এক বৃদ্ধার পাশ দিয়ে এবং ছোটে যেন দিগন্তে নিক্ষিপ্ত ঢিল। পেছনে সর্দিবসা গলার গম্ভীর হাসি ফেটে পড়ে, 'কী হল রে! অ্যাই ছোঁড়া!'

সদর দরজা দিয়ে ঢোকার ভরসা পায় না। কারণ সে চটপট মিথ্যে কথা বানানোয় ওস্তাদ নয়। এ কাজটা সরি ভালো পারে, এমন মুখের ভাব করবে যে বোঝার জো থাকবে না। সরি অনায়াসে, অকারণে গাদা গাদা মিথ্যে বলে, মিথ্যে বললে সরির ভাল্লাগে, সুখ হয়। দ্রুত এত কিছু ভেবে নিয়ে সদু বাড়ির পেছনে দুবলা কুলগাছটার সামনে এসে থামে। এই কুলতলায় সর্বক্ষণ যে ভেজা ছায়া থাকে সেখানে হঠাৎ চলে আসা সদুর পুরোনো অভ্যাস। লিকলিকে একটা ডাল ধরে সে হাঁপায়। ঢাকের শব্দ, বাজনদারের বিবিধ মুদ্রা, আর সমবেত উল্লাস এমনকি এখানে এই কুলকাঁটায় বিদ্ধ হয়ে আছে। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেইসব সূক্ষ্ম রেশম সুতো ছিঁড়ে যায়, খামকা ট্রেন আসে। সবুজ ট্রেন আসছে ইস্পাতের শব্দ তুলে, সিটি বাজে, আর কাঁপতে থাকে তলতা বাঁশের তুচ্ছ গৃহ। ঘ্যাসঘ্যাস ঘিসঘিস শব্দ সদুর তাবৎ আচ্ছন্নতা কচু কাটা করে, যেন সে মারা পড়ে, কাটা যায় লাইনে। ফায়ারম্যানের উড়ন্ত রুমাল সে দেখেও দেখে না। কেবল মনে হয় যদি ওই ট্রেন ক্যাওড়াপট্টির ডোবার ধারে না থামে, বাক্সপ্যাঁটরা সমেত কাঁচাপাকা চুল উড়িয়ে একজন মানুষ সদুদের বাড়ির দিকে যদি না হেঁটে আসে তাহলে সে, সদু কি বেঁচে থাকবে? বাঁচবে? সদু কেবল বয়লারের আগুন দেখে, দেখে বয়লার থেকে বাতাসে লাফ দিচ্ছে আগুন। সিগন্যাল বদল হয়, সবুজ ট্রেন থামে না।

অন্নর কাছে শোনা, সদুর মুখটা বাবার মতো। একেবারে কেটে বসানো। আর বাবার কথায় তার আশ্চর্য গর্ব। বাবার জন্যে সদুর গর্ব হয়। সদুর বাবা দেশের জন্যে লড়েছিল, যেজন্যে আই এ পাশ করা হয়নি, চাকরি করা হয়নি, অন্নকে ভ্যাসাল সংসারের তিরিশখান পাতের জন্যে দু-বেলা ডেকচি খুন্তি নাড়তে হয়েছে আট মাসের গর্ভ-সমেত। অন্ন যখন এসব গল্প বলে, ঠিক বোঝা যায় না এই স্মৃতি কি তার কাছে কেবলই দুঃখ, ধোঁয়ার প্যাঁচ, নাকি কোথাও গর্ব আছে, আনন্দ আছে। সদু দেখেছে বাবার কথা উঠলেই অনেকে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়, 'আহা, বেচারা বুঝল না বাপ কী বস্তু!' বা, সেই তাকানোয় কখনো ইঙ্গিত থাকে এরকম : অমন বাপের ছাওয়াল! আর সে তো মার মুখেই কত শুনেছে। পিকেটিং। বিলাতি জিনিসের দোকানে আগুন। লবণ আইন অমান্য। কলাগাছের গোড়া কেটে সেদ্ধ করা। আর আগুন। পিকেটিং ভারত ছাড়ো। বন্দে...ই মাতরম্। বন্দে এ...এ...। মা...আ...ত...অ...র...অম্! আর আগুন। অন্নর কাপড়ে। কপালে। আগুন।

হেই দ্যাশ স্বাধীনতা পাইল... মানুষডায় দ্যাখলো না— অন্ন বলে। আরও কত কথা... সব মনেও থাকে না। ফরিদপুরের কালেক্টরকে ধরে পদ্মায় চুবিয়েছিল। "ইংরাইজ খ্যাদানোর লড়াই... তর বাপে ছিল হগলডির মাথা। পান থিকা চুন খসলেও হগলডি 'কালাদা' 'কালাদা' কইর‍্যা পাগল করত"... এবং এসে যেত জাতীয় ইতিহাসের আর একটি উজ্জ্বল কাহিনী...

...একবার হইছে কি হকালবেলায় দারোগা আইসা উপস্থিত... আগের দিন কোনহানে জানি ঝান্ডা তুইলা আইছিল... দারোগার শব্দ পাইয়া হশুরে তো পোলারে টাইনা নিয়া হোগলার বেড়ার পাশে লুকাইয়া রাখছে... আর দারোগায় যেই না বাড়িতে পাও দিছে হ্যায় করছে কি... হোগলার ফাঁক থিকা চিক্খইর দিয়া উঠছে, 'বন্দেমাতরম্'... হ্যাশে আর কি!

ইংরেজ নাকি চলে গেছে। তবু বাবা ফিরছে না। কেন ফিরছে না? বাবার নামে ইংরেজ আমলে হুলিয়া ছিল। এখনও কি বাবার নামে হুলিয়া আছে? 'বাবু তুমি ফিরে এসো' সবুজ ট্রেনের জন্যে সদু এই শব্দ ক-টি ঝুলিয়ে রাখে। অথচ ট্রেন থামে না, অদ্যাবধি কোনো ট্রেন থামেনি, কে বা কারা নিষ্ঠার সঙ্গে বয়লারে কয়লা মারে। তাদের হাতের রগ আর আগুনের ফুলকি ঝলসায়। আর সেই আগুন গিলতে গিলতে সবুজ ট্রেন সিগন্যাল পেরোয়। কেবল জলো দুনিয়ায় ইঞ্জিনের হারিয়ে যাওয়া শব্দ কিছুক্ষণ নিঃসঙ্গ কাঁপতে থাকে— ঘ্যাস-ঘ্যাস-ঘ্যাস।

এখন, এই কুলতলায়, ভেজা ছায়া বড় কষ্টের। সকালের ফ্যাকাশে আকাশ পুরোনো ঘুমে ঢিলে হয়ে আছে, অনেকটা নেমে আসা সেই সাদাটে আস্তর অবধি টেলিগ্রাফের পোস্ট, বড়ো বেশি ঋজু। পোস্ট ছেড়ে মুহূর্তে উড়ে যায় ছিন্নভিন্ন তুলো, পাখির শরীর। কুট্টিবোনের লুকোনো বালার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। সরি বালাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল, আর কুট্টিবোন সম্পর্কে দু-চারটে কথা আপনিই এসে পড়ে, অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ডোবায় তখন দানা দানা অন্ধকার জমছে। দু-একটা জোনাক পোকা সেই অন্ধকার ফুটো করে যেতে থাকে।

সরি!

কী-ই-ই।

হাত ম্যাল।

কী!

হাত ম্যাল কইলাম!

ক্যান?

কথা বাড়াইস না!

কী... ই।

হারামজাদি হাত ম্যালোস কি না...

অন্নর হাতের থাবায় উঠে আসে সরির রুক্ষ চুল আর লোহার একটা বালা। মুহূর্তের স্তব্ধতা, তারপর ফিকে অন্ধকার আর জোনাক পোকার নীল আলোক বিন্দুর দিকে ছুটে যায় কুট্টিবোনের স্মৃতি। সরি কাঁদতে থাকে যেন এইমাত্র কুট্টিবোন মারা গেছে, সৎকার হয়নি। আর সদুর এখন মনে হয়, কুট্টিবোনটা বোকার ডিম! কেন যে মরল!

সে কি জানত না সবুজ রেলগাড়ি চেপে পুজোর ঠিক মুখে একগাদা কোরা কাপড় নিয়ে বাবা ফিরে আসবে?

প্রঃ ১ সের দুধের সহিত জল মিশাইয়া ৩ টাকা সের দরে বিক্রয় করায় গোয়ালা ৬ টাকা পাইলে দুধে কত সের জল মিশাইয়াছিল?

গোটা-গোটা অক্ষরে অঙ্কটা বোর্ডে আঁকা ছিল। বিনে পয়সার ইস্কুলে শিক্ষকের চেয়ার শূন্য, টেবিলে একটা ডাস্টার। ভগলু টেবিলের ওপর ডাস্টার ঠুকছে বলে চকগুঁড়োর একটা স্রোত দরমা আর টালির ঝুপড়ি উজোয়। সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে সরু হাড়ের কাঠামো, ইজের আর গেঞ্জির ভেতর ধামসায় বুকের খাঁচা, মারামারি করে— বোর্ডের অঙ্ক চুপচাপ সব দেখে যায়। পেনসিল কিংবা খাতা কাড়াকাড়ি, ধস্তাধস্তি, বুনোকুলের লালা-মাখা বিচি ছোঁড়ে কেউ। যখন এই অঙ্ক তার ভাষার সাধুত্ব, সদুর সামনে এক অবশ্যম্ভাবী ফল ঝুলিয়ে রাখে— শরীরের বিশেষ এক মুদ্রা, বা ভঙ্গিমায় তাকে ব্যাং হতে হচ্ছে। কারণ তাকে আর পাঁচটা ছেলে থেকে আলাদা করা হয়, কারণ ক্যাওড়াপাড়া কিংবা কাঠগোলা বস্তি, নতুন কলোনির একটা ছেলে যাহোক কিছু করে খাবে, কারণ সদু ভদ্রলোকের সন্তান। তার মা কানাইদার হাত ধরে বলেছে, 'প্রাণটুকু রাইখ্যা কানাই য্যামনে পারো।'

সুতরাং ভেজালের অঙ্কটা হয় তাকে মিলিয়ে দিতে হবে, না হলে মায়াবী রাক্কোস লীলাচ্ছলে আঙুল নাড়া মাত্র সে ব্যাং হয়ে যাবে। ফলে অঙ্কটার বয়ান নিয়ে সে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য, আর ঘামতে থাকে কারণ চূড়ান্ত সেই মুহূর্তে এসে গেল প্রায়... এবং সত্য এই যে দুধ ও জলের সম্পর্ক নিয়ে কোনো নৈতিকতায় সে পীড়িত নয়। ভালো করে বুঝেও উঠতে পারেনি। আসলে তাকে যেটা করতে হবে তা হল মেলানো, যেহেতু অঙ্কমাত্রেই মিলে যাবে। যেভাবে হোক মিলবেই। অর্থাৎ ছ টাকার ভেতর কতটা পরিমাণ দুধ (জল+দুধ) পাওয়া সম্ভব সেইটে তাকে বের করতে হবে। কিন্তু যা দেওয়া আছে তা হল তিন টাকায় ওই মিশ্রিত পদার্থ কতটা পাওয়া যায় এবং আদতে দুধের পরিমাণটা। যা নেই তা হল জল এবং জলমিশ্রিত দুধের পরিমাণ।

আর সেখানেই সমস্যা, দুটোর একটা তো অন্তত বলে দিতে হবে, না হলে ৬ আর ৩ এই সংখ্যা দুটো দিয়ে ছাই... তার সমস্ত ভাবনা অঙ্কটাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে-খেতে এক সময় স্তম্ভিত, সে তখন ব্ল্যাকবোর্ড দেখছে যা অসীম কালো। স্থায়ী শোক। আর ডাস্টার, দুটি মাত্র ব্যবহার সম্ভব যে বস্তুর, এক তো বোর্ডের কালো রংটি শানিয়ে নেওয়া, দুই সদুর ঘিলু অবধি নড়িয়ে দেওয়া। চ্যাটাই, চেয়ার আর কানাইমাস্টার সমস্তই যেখানে এক চৌকো খুপরির ভেতর ওই অঙ্ক সমেত ইস্কুলের রূপক, তা কেবল সদুকে শায়েস্তা করার জন্যে। আর এতে সে আরও ঘাবড়ে যায়। তখন ভয়। ডাস্টার ঠোকা হয় পুনরায়। আকাট মূর্খ তিরিশটা ছেলে পুতুল।

পিনড্রপ সাইলেন্স।

সমস্তই নীরব তখন।

সদু অনিবার্যত ব্যাং হয়, পুড়ে যায় গভীর শঙ্কায়। কারণ, তার জানা নেই মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে কে কবে তাকে ফের মানুষের আকৃতি দেবে, মানুষ বানাবে। আদৌ যদি কেউ না করে, তাকে কি আজীবন ব্যাং থেকে যেতে হবে?

একসময় হুড়মুড় করে ঘাড়ে ছুটির ভাপ লাগে, ঘণ্টি নাড়া হয়, কোথাও হো হো শব্দে গড়ায় জলস্রোত। ধুলোয় হুটোপাটি করে কয়েকটা ছেলে, তাদের বুকে পিঠে রোদ লাগে। পেছনে সুরকির গুঁড়ো ওড়াউড়ি করে। এসময় ঘরে অন্ন কিংবা সরি থাকে না, থাকে খিদের চোট। রুটি গুড় নিয়ে সদু বসে গেছে। তারপর সন্ধের অপেক্ষা।

কীরে?

উঁ।

অ্যাই সদু!

কী।

কী কচ্ছিস রে?

বস্তুত সে কিছুই করছিল না। কুলতলার ভেজা ছায়ায় তার শরীর, সেখানে যে ক-টি বক্ররেখা, ভাঁজ, সে সবই আলস্য। তবু রণর মামুলি জিজ্ঞাসাও তাকে চিন্তিত করে। যেন কিছু একটা করছিল, কীসে যেন বেজায় ব্যস্ত ছিল। যেজন্য ক্লান্তি। রণর আচম্বিত ডাকে কিছুটা স্তম্ভিত। সেরকম বুড়োমি থাকে। নিষ্ক্রিয় বসে থাকা সত্ত্বেও টুকরো কথা ধামসেছে তাকে। ঘটনা আর প্রাচীন স্মৃতি। সবটাই কেমন স্বয়ংক্রিয় বলে রণর জিজ্ঞাসায় এই বিপত্তি।

বিকেলের দিকটায় এ-পাড়ায় কোনো খেলা হয় না, দল বেঁধে যারা হাডুডু খেলে তারা বিড়ি খায় এবং গলু, সদু ও রণরা মাঠে গেলেই মেরে তাড়ায়। ফলে হয় নিষ্কর্মা বসে থাকা, নয়তো দু-তিনজন মিলে কোনো খেলা আবিষ্কারের চেষ্টা এবং শেষটায় ঝগড়া করে তারা ফুরিয়ে ফেলে বিকেল।

রেলগাড়ি কখন যে চলে গেছে সদু জানে না। রণ পেছন থেকে ঠেলে দেওয়াতে অনড় এই অবস্থা ভাঙে, যেন বা কাচপাত্র। সে হেসে ফেলে বলে ফোকলা মাড়ি দেখা যায়। অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ঘোলাটে জলে তখন চুনোমাছের দেয়ালা, মাথার ওপর রুপোর স্রোত, সামান্য দাহ্য। রণ সদুর হাতে একটা হ্যাঁচকা টান লাগায়, 'চ।'

কোথায়?

চ না!

আর একবার জিজ্ঞেস করার আগেই রণর টানে তাকে ছুটতে হয় এবং শঙ্কা থাকায় জিজ্ঞেস করে— 'তোর বাবা নেই তো'। 'থাকুক গে', সদু আর রণর হাতে-হাতে যে শিকল তৈরি হয়েছিল মোক্ষম টান পড়ে সেখানে। ফলে হাঁফাতে হয়, কারণ সদু ততটা প্রস্তুত নয়, শরীর সঞ্চার করেনি ক্ষিপ্রতা— যদি বেল্ট দিয়ে প্যাঁদায়? ততক্ষণে পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে নরম ঘাস, জলপোকা, আর জোলোমাঠ গিলে নিচ্ছে, ধরে রাখছে এই দুই বালকের হদিশ।

মাঝ বরাবর পৌঁছে গেছে তারা। আর সদুর শঙ্কার জবাবে রণ শিস-ধ্বনিতে বের করছে সামান্য তপ্ত বাতাস, 'ধুস!'

অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ডোবা রঙিন জলে ডানদিকে ভাসিয়ে রাখে চ্যাপটা থালা। তার ওপারে বুনো ঘাস, জল-কাদা, নালা আর সুপুরি গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে আড়াআড়ি বাঁশের ফ্রেমে। কচু আর লতানে গাছ সবুজের আচ্ছাদনে, নিবিড়তায়, অন্ধকার পাল-পোষ করে। চোরাকাঁটা কামড়ে ধরে রুগ্‌ণ গোরুর লেজ, সন্ধের মুখোমুখি সন্তানের নাম ধরে চিৎকার করে ঘোমটার বউ। সেই চিৎকারের বিস্তার এই এলাকা, রণদের পাড়া। ঠিক হয়েছিল নবজীবন পল্লি নাম হবে, কী জন্যে যেন ভেস্তে যায় সেই প্রস্তাব। হোগলা তলতা টালি এবং বাঁশের উপকরণে নির্মিত এই অঞ্চল এখন নতুন কলোনি বা রেফুজিপাড়া। হঠাৎ হাঁড়ি-পাতিল বালবাচ্চা সমেত তারা আছড়ে পড়ে এখানে। সদুর কিছুই স্পষ্ট মনে নেই, সব শোনা কথা, চনুর দাদু, অন্ন আর কাকামণির মুখে শোনা।

'৪৬ না '৪৭ সাল। স্রোতের শ্যাওলা, মানুষজনের ছেঁড়াফাটা দল। ভাসে, ভাসতে-ভাসতে যায়। ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে ছিটকে পড়ে একটা দল, এখানেই শেকড় চালায়। সব শোনা কথা, সদু দেখেনি, কিচ্ছু দেখেনি। বা, তখন তার চোখজোড়ার সামর্থ্য ছিল না একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তুকে পৃথক করার, স্মরণে রাখার। কেবল সে আদ্যাবধি শোনে•

কী কাণ্ড। নৈনেত্তোর!

যুদ্ধ। বোমা। দেশ স্বাধীন। দেশ ভাগ। দেশত্যাগ। স্বাধীনতা। মন্বন্তর। রায়ট, স্বাধীনতা, যুদ্ধ, দেশভাগ, স্বাধীনতা, আল্লাহ আকবর, বন্দে...এ...এ...মাতরম্‌...

আর এত সব কিছু ঘটে গেছে একসঙ্গে হুড়মুড় করে, কয়েক বছরে ঘটে গেছে। তারপর আর কিছু ঘটছে না, ঘটেনি। কিন্তু শুনে-শুনে এমন দাঁড়িয়েছে যেন গত দশ-বিশ বছরের ইতিহাসের সে প্রত্যক্ষদর্শী। সে সব জানে, সব দেখেছে, এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পায়। যদিও আসলে তার মনে আছে ভোর রাতে বিউগলের শব্দে সে তরাস খেয়েছিল। তরাস খেয়ে জেগে ওঠে, সরি তখন রাতভর উপোসি অন্নকে অযথা ঠেলছে।

মা। অ মা।

অন্ন ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে। সদু তখনও ঘুমের ভান নিয়ে নির্জীব, যেন কিছুই জানে না। অন্ন উঠতেই বিউগলের শব্দটা শুনতে পেল। সরি বাঁ হাতে মুখের লালা মুছে নিচ্ছিল। সরি একটু ঘুমোলেই বালিশে লালা লাগিয়ে ফেলে, বিছানা চ্যাটচ্যাটে হয়ে থাকে। অন্ন বিউগলের শব্দ শুনেই কপালে জোড়হাত ঠেকায়। 'নমস্কার করলা ক্যান?' সরি জিজ্ঞেস করেছিলে। অন্ন হাসে। তার অসাড়, শিরাজাগা হাতের দুটি পাতা তখনও কপালেই ঠেকানো। রেফুজিদের পাড়ায় লেড়িকুত্তা আর শাঁখের আওয়াজ পাওয়া যায় একসঙ্গে। বুকের দম নিংড়ে বের করে কারা যেন আমৃত্যু শাঁখ বাজাচ্ছিল। সরি জানে একমাত্র ভূমিকম্প হলে শাঁখ বাজায়। সে অন্নকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দেয়, 'অ মা!'

কী হইল?

শোননি? ভূমিকম্প!

আলইক্কা!

ক্যান?

হা আমার পোড়া কপাল... আইজ স্বাধীনতা না, রাত্তরকালে যে কানাই আইসা বইলা গেল, মনে নাই!

কী বুঝল কে জানে, সরি আর কথা বাড়ায় না। তবে সে যে খুব একটা মেনে নিচ্ছে এই কথা, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অবোধ শিশু সেই কপট নিদ্রায় বুঝে নিতে চায় স্বাধীনতা। আর রেফুজিদের শাঁখ ক্রমাগত বেজে চলে, শাঁখের আওয়াজ ক্রমে উন্মাদের মতো চড়তে থাকে।

আর তারপর প্রায়ই রাতে সদু অন্নর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করেছে, 'মা, বাবু ফিরবে না এখন? বাবু কবে ফিরবে? এখন তো স্বাধীনতা... বাবু কবে ফিরবে?'...

হ ফিরব। নিশ্চয় ফিরব। না ফিইরা যাইব কই? কই যাইব!

তখনও স্বাধীনতার জের কাটেনি। রায়টের তাণ্ডব কমেনি। হিন্দু মুসলমান রায়ট। রায়টের আগে মিলিটারি। রায়টের পরে মিলিটারি। আর বুকফাটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ গম্ভীর আকাশ ছ্যাঁদা করেছিল : আমি... আমি রসুল। আর —শুয়োরের বাচ্চা! তখন কৎ করে একটা শব্দ। ঢিলে নরম শরীরে বিদ্ধ হয় অস্ত্রের ফলা। আর আক্রান্ত মানুষটা হেঁচকি তোলে : আমি... আমি রসুল...। তার একটা ঠ্যাং ক্যাওড়াপট্টিতে ঘসটাতে থাকে। টালিগঞ্জ ঘড়িঘর থেকে ভেসে আসে, 'আল্লাহ আকবর!' আর হোগলার বেড়ার পেছন থেকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দশ-পনেরো বছর এক লাফে পার করে আছড়ে পড়েছিল রসুলের বুকে। তখন বন্দেমাতরম্।... তখন আল্লাহ আকবর।

সদু এসবের প্রত্যক্ষদর্শী, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি, কেউ তাকে কিছু বলেনি। এখন এই দু-তিন বছর পরে মনে হয় সদুর কি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল? রসুলের বুকের ভেতর বর্শা বিঁধে ছিল, রক্তক্ষরণ। আর এসবই সে নিশির ডাক, মানুষের আর্তনাদ, ডাইন, অমাবস্যায় মিশে যেতে দেখে। কিম্ভূত অন্ধকার তখন কেবল বাসি রক্তের ডেলা। সে অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়ে একা যেতে ভয় পায়। এমনকি খর, সাদা, দুপুরেও। ওই গাছের ভয়ংকর গল্প আছে, কে যেন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছিল। তার আত্মা গাছটায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকে... কে না জানে, কে না দেখেছে!

তুলকালাম কাণ্ডের ভেতর হাঁড়ি-পাতিল, ছেঁড়া-মাদুর, চট, বালিশ, কাঁথা বগলে নিয়ে রণদের দলটা এল। ভাসতে-ভাসতে এল। ছন্নছাড়া, উৎখাত এক জনসমষ্টি। আর তারপর এল জমিদার আর পুলিশ। হাঁড়ি-পাতিল, কাঁথা-কম্বল টেনে ফেলে দিল, শরীরে কাঁচা ক্ষত নিয়ে, রক্তের দাগ কেটে-কেটে কেউ কেউ পালাল। যারা টিকে গেছে, ধীরে সুস্থে কাজকাম ধান্ধাপানি জুটিয়ে নিয়েছে, এখন যা কিছু সাড়াশব্দ তাদেরই, রণর বাবা এই টিকে যাওয়াদেরই একজন। তার মাথায় লাঠি পড়েছিল। সে নড়েনি, ইন্দুবালা হাউহাউ করে কেঁদেছিল, 'চল যাই গিয়া'! আর মাথায় হাত চেপে রণর বাবা দাঁড়িয়েছিল যেন ঋজু বৃক্ষ, এমনকি বজ্রপাত ঘটে গেছে এত স্থির, 'মরলে এইহানেই মরুম... দেখি হালার পুতেরা কী করতে পারে।'

তারপর একদিন রণর ঠাকুমা চশমার সুতলি কানে জড়িয়ে লম্পর পলতে উসকে দেয়। পদ্মপুরাণ খুলে বসে :

ওয়া বালি চোওয়া বালি বিষের নাম
কোন কোন বিষের কোন কোন ধাম
বিষ... অ... নাই নাইরে
লখাইর শরীলে বিষ... অ... নাই।

সন্ধে হলেই বেহুলার ভাসান গাইত রণর ঠাকুমা। অন্ন বলত, 'বাপের জন্মে শুনি নাই যে সন্ধ্যাকালে পদ্মপুরাণ গায়। পদ্মপুরাণ গাইতে লাগে দুপইরা কালে।' আর সদু অন্নকে তিতিবিরক্ত করে তুলত: মা বেহুলার জন্যে রণর ঠাকুমা কাঁদে কেন? পানের দোকানের রসুলের জন্যে তো কেউ কাঁদে না। আচ্ছা বেহুলা কি বেঁচে আছে? বেহুলার কি খুব কষ্ট... তোমার মতো! বলো না?

তখন অন্ন সদুকে কাছে টেনে নিত, ঠিক বোঝা যেত না অন্নকে। অন্ন তখন বড়ো দুর্বোধ্য। সে সদুর কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাত, 'হ, বেহুলা অহনও বাঁইচ্যা আছে... লখাইর ডংশন পড়লে লখাইর জীয়ন পর্যন্ত পড়তে লাগে— নাইলে পুত্রশোক হয়...'

অন্ন বর্ণনা করে চলে বেহুলার উপাখ্যান, কখন যেন সেই বর্ণনায় সমাধিত অন্ন কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি জুড়ে দিতে থাকে। সদুর নির্বোধ চোখে ধূসর ছায়া নামতে থাকে, কোথাও সিটি বেজেছিল। আকুল সমুদ্রে ভাসমান মান্দাস, আর দুঃখিনী বেহুলা লখাইর হাড়গোড়ের সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে গিঁট দিয়ে সদুকে বেঁধে ফেলে। সে তার মাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, বেহুলার এত কষ্ট কেন!'

তয় শোন—

এবং সেই পূর্ণাঙ্গ কাহিনি এবার শোনার কথা। যখন অন্নর গলার স্বর সুদূর হতে থাকে, সামান্য চিকনও। তার সারা মুখ ছেয়ে ফেলে উদাস গাম্ভীর্য। সদু হাঁ করে গিলতে থাকে—

লখাই হইল চান্দো বাইন্যার ছাওয়াল।... চান্দো বাইন্যার জেদ : যেই হাতে পূজি গো আমি দ্যাব শূলপাণি সেই হাতে পূজিব আমি চ্যাঙমুড়ি কানি?... চান্দো বাইন্যার জেদ ভাঙনের লাইগ্যা বেহুলার স্বামী লখাইরে ডংশন করাইল মা মনসা... সোনার অঙ্গ নীল হইল...

মার কটা চোখের দুর্ভেদ্য ঘোলা রঙের দিকে সদু একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আর অন্নর সেই জলদ স্বর, 'হ, বেহুলা অহনও বাঁইচ্যা আছে! অহনও। বাঁইচ্যা আছে।' সুলতান আলম স্ট্রিটের ঝুপড়ি বস্তি আর তলতার দেওয়াল তখন ক্রমে ফিকে ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, মালগাড়ি শ্লথ চলে যায়, দু-একটা পাখির ভয় অদ্ভুত ডাক দেয়। সন্ধ্যা থিতু হতে থাকে, লম্প জ্বলে, হ্যারিকেন দুলিয়ে কেউ সাঁকো পার হবে এরপর।

আমি বড়ো হয়ে দ্যাখো না কী করি!

কী আবার করবি?

কচুকাটা করব।

কারে?

মনসাকে।

হা সর্বনাশ!

কেন?

মা মনসা দ্যাবতা, সাক্ষাৎ দ্যাবতা... কইস না, জেব্‌বা খইস্যা যাইব।

দেবতা, না হাতি।

হত্য!

থাকুকগে।

কস কী সদু... এ দেখি জল্লাদ ধরছি প্যাটে...।

দ্যাখো না বড়ো হই আগে... মনসাকে ন্যাড়া করে...

গ্যাসপোস্টে বেঁধে...

চুপ যা, চুপ যা হারামজাদা!

রণর ঠাকুমার চোখে ছানি পড়েছে, এখন আর পদ্মপুরাণ খুলে পড়তে পারে না। এখন এমনিই চোখে জল কাটে। সর্বক্ষণ। চনুদের দাওয়ায় বসে রণর মার নিন্দে করতে-করতে কাঁদে : অ্যামুন বউ ঘরে আনছিলাম হকাল হন্ধ্যা দুইহান রুটি দেয় না খাইতে... কয় আমি নাকি রাক্ষস, ক্যাবল খাই... তুমরা তো আছ, দেহ তো হগলই... কও দেহি।

চনুর মা খান দুই রুটির সঙ্গে এক কাপ চা করে বুড়ির দিকে এগিয়ে দেয় : এইটুকু খান অ্যাহন। একখানা রুটি গোল করে পাকিয়ে বুড়ি চায়ের কাপে ডোবায়, তারপর মাড়ি দিয়ে কামড়াতে-কামড়াতে গোগ্রাসে গিলতে থাকে বলে তার মুখের অজস্র হিজিবিজি জটিল রেখা অকস্মাৎ সচল। বুড়ি একসময় বারান্দার খুঁটি ধরে উঠতে-উঠতে বলে, 'অ চনুর মা...।' বুড়ি চলে গেলে চনুর মা বলে, 'খামকা বউডারে দোষে... হ্যায় কী করব... পোলায় কত রোজগার করে যে খাবা! ভিমরতি ধরছে... বউডার হাল দ্যাখছেননি অন্নদি!' অন্ন সাড়া দেয় : 'দেখি নাই আবার!'

সদু কোনোদিন রণদের বাড়ি যায়নি। ক্যাওড়াপট্টিতে সদু যখনই গিয়েছে সর্বদা গলুর সঙ্গেই কাটিয়েছে। তা ছাড়া অন্ন পারতপক্ষে সদুকে ক্যাওড়াপট্টিতে যেতে দেয় না, ওদিকে পা বাড়ালেই সে পেছনে একটা ডাক শুনতে পায়:

সদু...উ...কই যাস? এখন রণর সঙ্গে জলামাঠ ভেঙে ছুটতে বেশ মজা লাগছিল। ছুটতে ছুটতে কলের-গান-ওয়ালা মেটে বাড়িটা ওরা ছাড়িয়ে যায়। মেটে বাড়ির কলের-গান। চোঙটা সদুকে দারুণ টানত, এখনও টানে : মেরে দিল নে পুকারে আজা...।

রণর মা চাল ভাজতে বসেছে। রণ বলে, 'চালভাজা।' আসলে খানিক খুদকুঁড়ো আর গম। ফট্ ফট্ শব্দে দুধের গুড়োর মতো আটা বেরিয়ে আসছে। চিটে উড়ছে। রণর একগণ্ডা ভাইবোন দরমার সেই ঘুপচির ভেতর আগুন, কড়াই আর সেই নারীকে ঘিরে ক্রমে ঘন হয়ে আসে। ছোটো মেয়েটা খুন্তির বাড়ি খেয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে। আবার হাত পাতে। রণরা অনেক ভাইবোন, সদুর কেমন ভালো লাগে। সদুর বোনটা যদি বেঁচে থাকত! রণর ঠাকুমার দাঁত নেই, ভাজাভুজি খেতে পারে না। গমভাজা শিলনোড়ায় পিষে একটু জল ঢেলে রণর মা এগিয়ে দিল বাটিটা। আর বুড়ি সেই গুঁড়ো চটকাতে-চটকাতে সদুকে জিজ্ঞাসা করে, 'অ মনু,

তুই খাবা?' আর খুদকুঁড়ো গেলার কৎ কৎ শব্দ হতে থাকে। সেই শব্দে রণর ঠাকুমার মুখ, সেইসব জটিল রেখা নানান আকার নিতে থাকে। রণর ঠাকুমা হাসে। আর রণর মা ন্যাতা বুলিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে-করতে বলে, 'অ রণ! তর বন্ধুরে কী খাইতে দিবি!' আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফালা-রোদ রণর মার চাপা-নাকে-বসানো সাদা পাথরে আছড়ে পড়ে, পাথরে রোদ ঝিকোয়। রণ আলগা একটা জবাব দেয়, 'এক বাটিতেই দ্যাও।'

রণর মা এনামেলের একটা বাটিতে খানিকটা খুদকুঁড়ো আর গমভাজা দিল। এমনিতেই বেশ লোভ ছিল সদুর। ওদের বাড়িতে এসব হয় না। হয় দুখানা রুটি নয়তো নিরম্বু উপোস। কখনো-সখনো গোলা-রুটি বানিয়ে দেয় অন্ন। রণর সঙ্গে একবাটিতে দুজনে খেতে থাকে। রণর রুগ্ণ বোনটা পুকুর থেকে একটা থালা মেজে নিয়ে এল। তার পায়ে কুচোপানা। রণর বাবা খেতে বসেছে। আর রুগ্ণ মেয়েটা গালের দু-পাশে উঁচু হাড় জাগিয়ে বাবার খাওয়া দেখতে থাকে। রণর বাবা উবু হয়ে বসেছে। পাঁজরার হাড় ওঠে, নামে। থালায় ট্যালট্যালে ডাল ভেসে যেতে থাকলে সদু রণকে জিজ্ঞেস করে, 'এই রণ! তুই ইস্কুলে যাস না?'

নাহ্।

কেন?

কী হবে?

বাহ রে।

লেখাপড়া শিখতে টাকা লাগে না?

রণ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে। আর যা বলে তার মানে শিগ্‌গিরই সে প্যাকিং কোম্পানিতে ফুরনের কাজে লাগবে। না-না করে ঘরে রোজ দুটো টাকা আসবে তাতে। হঠাৎ এইসব কথায় রণকে ভারিক্কি লাগে, লম্বাটে মুখে রণর নাক তখন খড়্গা। টান টান হল রণ। পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে ওষুধ কারখানার রঙিন জলে ছুঁড়ে দিল। টুপ করে একটা শব্দ।

তুই কাজ করতে পারবি!

হুঁ।

যাহ্।

সত্যি। বলে আমার মত কত ছেলে কাজ করছে!

বেশ মজা তোর, আমাকে তো কানাইমাস্টারের ইস্কুলে যেতে হবে।

বেশ হয়েছে। বেঞ্চির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকগে এখন।

তুই বই পড়তে পারিস?

নাহ্।

একদম না!

একদম না।

এরপর কিছুক্ষণ ওরা চুপ থাকে এবং চিন্তিত দেখায়। রণর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যেন সে আদৌ দুঃখিত নয়। বরং এই যে উকিলদাদুর বাড়ি থেকে খবরের কাগজ

চেয়েচিন্তে এনে ঢেবি আর মা ঠোঙা বানাচ্ছে তার থেকে প্যাকিঙের কাজে লেগে যাওয়া ঢের ভালো।

রণ একমুঠো ভাজা মুখে পুরে দেয়। রণর বাবা আঁচাচ্ছে। সদু রণর বাবার হাতের কড়া দেখতে পায়। শক্ত শক্ত ঢিবলি। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের অর্ধেকটা কাটা। সদু সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে, 'তোর বাবার হাত দুটো অমনি কেন রে!'

দু-পাটি দাঁতের ফাঁকে একটিমাত্র গমদানা কাটে রণ— মেশিনে।

হুঁ।

কেন, হাত পড়ে গিয়েছিল?

ভ্যাট!

তবে?

মেশিন দেখেছিস কখনো?

নাহ্।

থালে আর কী বলব!

রণর বাবা হাফপ্যান্টের ওপর ঢোলা জামা চাপাতে-চাপাতে সদুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কানাইমাস্টারের ইস্কুলে ভর্তি হইছ, না?' কথাটা শেষ করে রণর বাবা তার কালো মাড়ি জাগিয়ে নিঃশব্দে হাসে, থ্যাবড়া নাকে শব্দ হয়। আর সদু ভয়ে জড়সড়, কোনোক্রমে ঘাড়টা কাত করে, 'হইনি, হব।' রণর বাবা বলে। 'ওই একই কথা, শুনলাম জানি কার মুখে।' সদু তখনও ভাবতে পারছে না এই মানুষটাই কোমরের বেল্ট দিয়ে রণকে মারে, বা রণর মার কপালের কাটা দাগটা বেশি পুরোনো নয়। রণরও যেন এসব খেয়াল নেই, কেমন হাসিখুশি। আর হঠাৎই রণর বাবা গলা চড়িয়ে রণর মার দিকে ফেরে, 'দ্যাখো, দ্যাখো... দেইখ্যা শেখো... বাবায় মইর‍্যা বাঁচছে আর মায় ছাওয়ালডারে মানুষ করার জন্য কী না করতাছে... চনুর বাবায় তো কইল কোথায় জানি কাম নিছে...।'

এসময় চালভাজার বাটিটা উলটে যায়। রণর মা হঠাৎ খুন্তি ফেলে চেঁচায়— দিলা ছাওয়ালডার খাওয়া... পোলাপান মানুষ মায় হেরে কিছুই জানতে দেয় নাই... করলা এক সর্বনাশ... অ সদু! সদু! কই যাও মনু, শুইন্যা যাও। রণর বাবা এবং রণ দুজনেই ছুটছিল। আর সদু যেন পাগলের মতো ছুটছে, এত ক্ষিপ্র যে সে কী করে হল! ক্রমে সে তাদের চোখের আড়াল হয়ে যায়। ভূতুড়ে গাছও পেরোয়।

চনুদের মাঠকোঠায় তখন সমস্তই একান্ত স্বাভাবিক ও শ্লথ। কাকামণি তিনদিন যাবৎ বেপাত্তা, কোথায় যেন শো ছিল। চনুর দাদু কোর্টে গিয়েছে, চনুর মা দাওয়ায় পানের বাটা নিয়ে বসে। অন্ন একমনে কচুর লতি ছাড়াচ্ছে। আর কী নিয়ে যেন গল্প করছে, 'অগো কথা আর কইয়েন না, কত দ্যাখলাম, হ!' পেয়ারাগাছের কিম্ভূত ছায়া অনড়, উঠোনে পড়ে ঝিমোচ্ছে। চাতালে নরম লাফ দেয় ক্ষিপ্র বেড়াল। সদু এরকম পরিস্থিতিতে এসে পড়ে হঠাৎ এবং একটু একটু কাঁপে। আদতে হিক্কা চাপতে গিয়েই তার এই কম্পন। সদু দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্ন গল্প করে যায়, বেড়ালটা শিকার কবজা করতে না পারায় ফিরে গেছে, আর মেয়েলি গল্প

নরম রোদে মেলে যেতে থাকে। বেশ খানিকটা এগোলে বোঝা যায় তারা উকিল ঠাকুমার নিন্দে করছে। সদুর কাছে মুহূর্ত তখন একটা পুরো দিন। গল্প চলছে তো চলছেই, 'হ' 'হুনছি', 'জানেন-নি'। সে অপেক্ষা করতে পারে না, কাঁদতে পারে না, কেবল হিক্কা, একরাশ কচুর লতি ছাড়ানো হয়ে যায় অন্নর। সে আপন মনে বলে, 'কীরে, খাড়াইয়া আছোস ক্যান?' সদুর কোনো জবাব পাওয়া যায় না, অথচ তার ওই নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কিছু একটা ছিল। ফলে অন্ন পুনরায় বিড়বিড় করে, 'কবি তো?'

তুমি মিথ্যুক।

কী?

তুমি মিথ্যুক।

কী কস, কস কী তুই অ্যাঁ?

মিথ্যুক, মিথ্যুক, মিথ্যুক।

অন্নর কোলের কাছে বঁটি উলটে যায়। একরাশ কচুর লতি কোথায় ছিটকে পড়ে, খামকা কয়লা পুড়তে থাকে উনুনে, সদুর হিক্কা এবার শব্দ হয়ে যায়, এতক্ষণ গলার কাছে আটকে থাকা দুষ্ট বাতাস ভাপের মতো উড়ছে, অন্ন চিৎকার করে, 'কী কইলি তুই... তোর এতখানি সাহস... বাইরা... বাইরাইয়া যা... মর... মর... মর...।' দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অন্ন চড়াতে থাকে, আর ছেলেটা গোঁজ হয়ে মার খায়, 'হ্যাঁ মিথ্যুক... মিথ্যুক... মিথ্যুক।' চনুর মা মধ্যস্থতা করে, সদুকে আড়াল করে দাঁড়ায়, 'অ অন্নদি, করেন কী, মইরা যাইব যে!'

যাউক। অমন ছাওয়াল থাকার থিকা না থাকা ভালো... এই যে তিনডা চইলা গেল মরছি... মরি নাই। দুধকলা দিয়া আমি কালসাপ পুষতাছি!... মরুক। আমার হাড় জুড়াইব।

চনুর মা সদুকে সরিয়ে নেয়, 'ছাওয়ালেরও বলিহারি খাড়াইয়া খাড়াইয়া মার খাইতাছে... ছুইটা পলা।' আর প্রবল বৃষ্টিপাতে, বেমক্কা মারের চোটে সদুর শরীর নরম, ঢিলে। সরি ফিরলে সে কেবল বলে, 'তুইও মিথ্যুক... বাবু আর কোনো দিন ফিরবে না।'

অন্ন কখন আবার উনুনের ধারে বসে গেছে। কড়াইয়ে কচুর লতি সেদ্ধ হচ্ছে। সরিও কথা বাড়ায় না, সে সদুর ইজের আর কীসব কাপড়-চোপড় কাচতে পুকুরঘাটে যায়। মাঠকোটায় শান্তি অক্ষুণ্ণ। সকালের কুয়াশা-ধোঁয়া উড়ে গেছে, এখন ওষুধ কোম্পানির শূন্য ডোবা, ডোবায় সাদা বক। আর বিড়বিড় করে 'প্যাটই হইল আসল শত্তুর... নাইলে আর কী!' এতসব কথা ভেবে অন্ন খুঁটির মতো নিজেকে শক্ত রাখে। না হলে অ্যাদ্দিনে সদু আর সরি কোথায় যে ভেসে যেত।

প্যাট হৈল জলন্তর
তর লইগা হই দ্যাশান্তর।।

আবার বর্ণনা, যাতে এই ছড়া গড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে মূর্ত এবং শরীর পেয়ে যায়। এমনকি প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও ঘটে দীর্ঘশ্বাস সহযোগে। তখন অন্নর সামনে অনড় এক প্রাচীন খুঁটি বা থাম, যা ধারণ করেছে আংশিক এই মাঠকোঠার ওজন। ওই থামে পুরাতন পারিবারিকতা আছে। আছে মলিন আলকাতরা। তথাপি তা বড়ো ঋজু। চনুর দাদুর জমিতে প্রোথিত সেই খুঁটিতে ইতস্তত গর্ত আছে, আছে সাদা ঘুণ। এমন নয় যে অন্ন ওই কথা, ছড়া, কেবল খুঁটি সাক্ষী রেখে বলে চলেছে, যেমন সে প্রায়ই বলে। কারণ, ভিন্ন শব্দ ছিল। পিঁড়ি ঠেলে উঠে যায় চনুর মার শরীর, সপাটে আছড়ে পড়ে দীর্ঘ ছায়া। সেই ছায়ায় ওতপ্রোত ওজন এবং ছায়ার শরীরে অঙ্গসংস্থান বৈশিষ্ট্য হেতু থেকে যায় সাদা এবং শূন্য কিছু অংশ। সেইসব অংশ নড়েচড়ে, ভাঙেও। ওদিকে কাপড় আলগা বলে চনুর মার সায়ার গেরো দেখা যায়; আঁচলে হলুদ ছোপ, তাও দেখা যায়।

...দুঃখের ধান্ধায় ফিকিরে শরীর আউল হয়... পাথইরা মনডাও পোড়ায়... দ্যাশ যে দ্যাশ... প্যাটের জ্বালায় মাইনষে সেই চোদ্দ পুরুষের ভিটা ছাইড়া... ছুটে, ছুটে... ছুটে...।

তখন কোথাও চিৎকার : পলাইনা, পলাইনারে...। তখন কাদা অন্ধকার ভাঙে মানুষের যূথবদ্ধ পা। কোথাও পুঁটলি সেই জনসমষ্টির হাতে হাতে হাত-শিকল, ছুটছে। মাঝ নদীতে অনড় এক জলযান, স্টিমার গাঁ গাঁ করে ডেকে তাদের ভয়, তাদের শৈথিল্য, তাদের আড়ষ্টতা ছিন্ন করে। ক্রমে পাড়ের দিকে অসম্ভব শ্লথ এগোয়। যুবতী কন্যার শোকে নদীবক্ষে ঝাঁপ দেয়, কেউ ঝাঁপ দিতে চায়। নদীর ওপারে যে জলছবি বাঁশপাতা ও হিল্লোলিত ধানে নত, যেখানে লতানে গাছ ছড়ায় অন্ধকার, ভেজা ভেজা গন্ধ, বাইর-বাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ, দানশা চোরার গল্প সমেত সেই দেশ থেকে ক্রমে তারা সরে যেতে থাকে... পলায়... পলায়।

সমগ্র এই বর্ণনার আগুপেছু ওই সংক্ষিপ্ত ছড়া থাকে। আর এভাবে তত্ত্বটা তৈরি হতে থাকে বলে বারংবার ছেদ। শ্বাস ক্ষেপণে অপারগতা স্পষ্ট, চিহ্নিত। ওই ছড়া, তদুপরি টীকায় অন্নর কাছে দেশ এবং দেশ-বিভাগ আবদ্ধ। আবার তা আবদ্ধ বলে শ্বাস, দীর্ঘ, ক্রমে আরও দীর্ঘ। আর জটিল এই পরিস্থিতিতে মানুষের কেবলমাত্র বাঁচার জন্যে নির্দিষ্ট, সংগঠিত ও অ-সংগঠিত সমস্ত আচরণের পশ্চাতে যাকে শত্রু বলে সে শনাক্ত করেছে তার বসবাস তারই শরীরে। মানুষের শরীরে। ফলে ওই পেট, যাকে সে শত্রু বলে জানে তার বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণের কোনো দিশা না-থাকায় সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘসূত্রী।

চনুদের ফাটা বারান্দা তখন এরকম : উনুনে প্রজ্বলিত সাদা ভয়ংকর আগুন ভাত ফোটাচ্ছে; আগুন, বাষ্প এবং খানিকটা নির্ভেজাল বাতাস পরস্পর মিশে গিয়ে উড়ছে... চনু তখন মর্নিং

ইস্কুল থেকে না-ফেরায় কোনো তাড়া নেই, আবার চনুর বাবা এবং দাদু না-থাকায়, সরি না-থাকায় সামান্য নির্জনতা আছে। সদু খেতে বসেছে, পাঠশালায় যাওয়ার ব্যগ্রতা আছে, যদিও অন্নর টানা সংলাপ বেচারাকে বিব্রত করছে। চনুর মা গেরস্থালির কাজে থেকে-থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে বলে অন্নর শব্দগুলো দ্রুত অনুসরণ করে চলেছে তাকে। তথাপি যখন মাঝে মাঝে তাকে এমনকি চোখেও দেখা যাচ্ছে না তখন অন্ন যেন-বা ওই খুঁটির কাছে সোপর্দ। আর বলে চলে একই বৃত্তান্ত। এভাবে সময় গড়ালে একসময় চনুর মার চ্যাপ্টা-মুখ অর্গলমুক্ত, সে উগরে দেয় সামান্য বদ্ধবাতাস, পোকা দাঁত খুলে পড়ে যেন-বা— হ, হত্য।

মুহূর্তে তারা বড়ো একাত্ম। বয়সের মাত্রা ও ভার দ্রুত তাদের একাত্ম করে, পশ্চাতে থেকে যায় দীর্ঘ, প্রলম্ব স্মৃতি, জট ও জটা। হয়তো পশ্চাদভূমির সেই স্মৃতি তাদের জাগায়। টের পাওয়ায় ওইসব কথার আমূল নগ্নতা। যা সত্য, যে সত্য তারা দেখেছে, প্রত্যক্ষ করেছে, যাতে তারা নির্যাতিত। কথাবার্তায় ক্রমে সেই দৃঢ়তা এসে যাচ্ছে, সাবলীল। বিস্তৃত করছে নিজস্ব লীলা। ফলে মায়া ও নির্দয়তা। তাদের মুখে অনায়াস আলো-আঁধারির জাল বোনা হয়:

'সন্তানের মুখের গরাস মায় কাইড়া খাইতাছে... স্বচক্ষে দ্যাখছি...' এবং উচ্চারণের ঘাত বাক্যটিকে কাটে। খণ্ড খণ্ড করে। যেন-বা ওই বাক্যের মধ্যস্থিত তাবৎ বস্তুকে সে পৃথক করে, সামান্য দূরত্ব দেয় : সন্তান। মুখের গ্রাস। মা। আর থাকে শীর্ণ রগের তরঙ্গ আন্দোলিত হাতের ফণায় বেগসম্পন্ন একটি মুদ্রা। যাতে সেই হাত শ্যেন-পাখি।

পঞ্চাশ সন...

তখন দেশভাগ নেই, তখন স্বাধীনতা নেই।

ভবানীপুরের ত্রি-তল বাড়ির যৌথ পরিবারের তখন একচ্ছত্র অধিপতি, কর্তা, জেঠু। ঝাঁকা-মুটের মাথায় চড়ে জগুবাবুর বাজার কাতলার ঘাই সমেত উঠে আসে রক্তিম শানে, ঘোমটার বউ নরম আঙুলে টিপে নেয় মাছের শরীর : যদু দেইখো পিত্তিফাটাইও না...। বৃহস্পতিবার নাপিত-বউ নখ পরিষ্কার করে আলাদা সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে যায়। তখন দেশ ছিল। খোয়াক্ষীর, পান-সুপারি, যোশুরে কই ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। পুজোয় ঢাকাই শাড়ি। এসেন্সের গন্ধ।

নামতা মুখস্থ করতে করতে সদু সেই দেশ দরমার ঝাঁপে লটকে থাকতে দেখেছে এই সেদিনও :

ফরিদপুর জেলার আমগ্রামের দেওয়ান চক্রবর্তীদিগের

বংশলতিকা
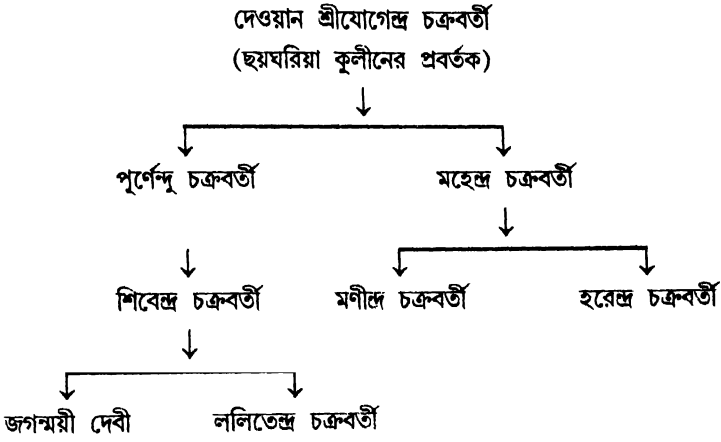
পারিবারিক বৃক্ষ। মণীন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র সদানন্দ চক্রবর্তী ওই তালিকা (বা লতিকা) বর্জিত। বা, সে যেন ওই বৃক্ষ থেকে জাত কোনো বৃক্ষ নয়, ফল মাত্র। যা মাটিতে পতিত, পরিত্যক্ত। যখনই সে তাকিয়েছে ওই বৃক্ষের দিকে, তখনই সদুর বড়ো আলগা লেগেছে। কিছুটা এমন যেন সে সম্পর্করহিত।

আর, এখন এই মন্বন্তরের বর্ণনায় অন্ন গেয়ে উঠবে পারিবারিক গৌরবগাথা, দাতব্যের সুদীর্ঘ কাহিনি সেইসব বর্ণনায় ওতপ্রোত। চনুর মা বলবে : অহন ওই যে বাইর বারান্দা... দুই বেলা পঞ্চাশখান পাত পড়ত।

অন্ন তার শরীরস্থ পেটের যে সমস্যা থেকে গুহ্যতত্ত্বে চলে গিয়েছিল তখন সেই তত্ত্ব উভয়ের বিচিত্র সব স্মৃতি ও গৌরবে আনন্দস্রোত মাত্র। তারা পান খায়।

এট্টু চুন দ্যান দিদি।

আটটা বাজতে-না-বাজতে অন্ন সাদা থান মাথায় টেনে দেয়। ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে, 'সদু সকাল-সকাল খাইয়া লইস, (চনুদের ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলে) দেইখেন চনুর মা দিদি।' ঘরের ভেতর থেকে পানের রসে ভেজা শান্ত স্বর রেশমের মতো খুলে যায় : 'আইচ্ছা, কো-নো-ও ভাবনা নাই, আপনে যান।' তখন তুলসীগোড়ায় দীর্ঘ ছায়া। তারপর যে ট্রেনটা দূরের শব্দ নিয়ে আসতে থাকে নরম রোদের মধ্যে, সেই ট্রেন ডোবার জল কাঁপালে পুরো আটটা বাজবে। অন্ন ফেরে যখন ছুরির ফলায় বিদ্ধ সোনালি বিকেল হাপিস হয় অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ঘোলাটে জল পেরিয়ে। লম্পট রাত তখন কালো জামার বুক-পকেটে টাকা নিয়ে ক্যাওড়াপাড়ায় জুয়োর তাস ফেলে। অন্ন ফিরে আসে। তার শরীরের ব্যাসার্ধ জুড়ে টোকো গন্ধ-ঝাঁজ থাকে। ফিরে এসে অন্ন স্নান করে, তার নাক, মুখ, গলা বেয়ে অজস্র ধারায় জল নেমে যায় নোংরা পায়ের দিকে।

ভেজা কাপড় সেঁটে যেতে থাকে ফর্সা চামড়ায় আর জলস্রোত কুঁচকে দেয় সেই বিস্তীর্ণ

থান, শীতল করে। সদু এরকম সময় গামছা দেওয়ার আদেশ শুনবে বলে উৎকর্ণ। আর একটু পরেই তাদের মাঠকোটায়, দরমার বেড়ায়, বাতাস পাঠাবে নরম গন্ধ। অন্ন পিঁড়ি পেতে দু-দণ্ড উদাস বসে থাকবে, ক্যাওড়াপাড়ায় গড়াতে থাকবে মৃদু আলোর বল। আর সদু সটান ফেরত যাবে বিদ্দেসাগরের কাছে। সেঁকা রুটির গন্ধ ওড়াউড়ি করবে চনুদের বাড়িতে।

গত সপ্তাহে সরি জেঠুর কাছে যায়, মাসকাবারি পাঁচ টাকার খয়রাতি সাহায্যের জন্যে। টাকা তো পায়ইনি, উলটে দাগা দেওয়া সব কথা শুনে আসে। সরি ফিরে আসে নির্বোধ ফোলা মুখে। কোনো কথা না বলে সে এটা-সেটা করতে থাকে, অনর্থক বইয়ের তাক ঝাড়ে। পলকা কাঠের তাকটিতে সদু ও সরির পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পোকায় কাটা আর একখানা বই আছে, 'কুমারসম্ভব'। বইটি কখনও ছোঁয়া হয় না। অন্ন, সরি দুজনেই গ্রন্থটিকে শ্রদ্ধা করে। সরি এখন সদুকে টেনে নিয়ে যেতে চায় সাবান ঘষবে বলে। তারপর করার মতো তৃণটুকুও না-পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত : 'মায় কই!'

এখানে এক বৃত্তান্ত ছিল। অন্নর মুখে শোনা সেই বৃত্তান্তে সদু এবং সরির পিতা এক ধনবান ব্যক্তি। ব্যবসায়ী। জেঠুর সঙ্গে বাবুর নাকি ব্যবসা ছিল, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের। বাবুর নিজস্ব লরি ছিল। সেই লরির মালিকানা বাবুর অনুপস্থিতিতে অন্ন অবলা-মেয়েমানুষ জেঠুকে লিখে দেয়। ফলে লরি বাবদ অন্নর মাসখোরাকি পাওয়ার কথা। ব্যবসার সেই অমৃতফল এখন মাসকাবারি খয়রাতি সাহায্যে পরিণত। আর অবোধ অপোগণ্ড শিশুরা পর্যন্ত অন্নর শরীরের তাপে টের পায় : মান, সম্মানইজ্জত। ফিরে এসে সরি মুখ খোলেনি, সরি কোনো কথা বলতে চায় না, সে বর্ণনা করে চলে জেঠুর বাড়ির প্রাতরাশ : অরা না রোজ ফল খায়... মেজদি যা একখান জামা কিনছে বুঝলা...। আর অন্ন অস্থির হতে থাকে, ঘামে : আদেইখলা! ম্যাজদি জামা কিনছে হেইয়ায় তর আনন্দ কীসে, বলদ কিঁ আর গাছে ধরে। অন্ন ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে : আসল কামের কী হইল, তুই জানি হ্যাগো সুখ দ্যাখতে গেছিলি; সরি তখন নির্বাক। সরি তত নির্বাক হতে থাকে। ক্রমে তার মুখে থেমে যায় পেশিসঞ্চালন। কপালের নীচে সরির কানের লতি-ছোঁয়া সূক্ষ্ম নীল বিদ্যুৎরেখা, মন্থর প্রাণ, ক্রমে তা-ও নিশ্চল। কেবলই একটা রেখা, বক্র, মামুলি। আর অন্ন চেঁচায় : কথা কানে যায় না দেহি! হারাইছস নাকি গিলা আইছস, কথা ক কইলাম... হারামজাদির শরীলে জেদ দ্যাহ...।

এ-সময় সদু একেবারে ফালতু হয়ে যায়। অন্ন আর সরির মধ্যে দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে সরাসরি এক নির্দয় সম্পর্ক। সদু সেখানে কেউ না, কিছু না। আর ক্রমে অন্নর শরীরে সেই-সব লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে, সাদা দাঁত ঝলসাচ্ছে। চাবির রিং সমেত আঁচল ঘষটাতে থাকে ফাটা মেঝেয়। চোয়ালের হাড় দেখা যায়। সরির চোখের সাদা জমিটুকু গ্রাস করতে থাকে তারই কালো তারা। অন্ন আক্রমণকারী, দাঁতে পিষে ফেলছে 'মাগি' এই শব্দ। সরির বসার ভঙ্গি আচমকা ভেঙে যায়, শরীরটা টানতে থাকে, ঘষটাতে থাকে। এবং পেছনে মাটির দেওয়াল, সরি গুটিয়ে নেয় হাত-পা, কী একটা শব্দ করে। আর তার শরীর কেমন চারপেয়ে জন্তুর আদল পেয়ে যাচ্ছে। একসময় সে হাত দুটো করজোড়ের ভঙ্গিতে তুলে ধরে বলে কেমন শৃঙ্খলিত। আর অন্ন আছাড় খায় তার নিজ শরীরের সেই দুর্বল মাংসপিণ্ডে। তাদের শরীর তীব্র

টানে, আর দু-একটা কুচ্ছিত গালাগাল, শ্বাসধ্বনি ইত্যাদিতে পরস্পর মিশে যেতে থাকে। অন্নর কনুইয়ে সরির সর্দি লেগে যায়। আর ঠিক কখন যে দুটি শরীরের মধ্যে নিরুপায় সদু নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল অনিবার্য ভেবে, সে নিজেও জানে না : মারবা না।

সদু!

নাহ্।

সইরা যা কইলাম।

নাহ্।

খুন কইরা ফেলামু।

করো, খুন করো, করো...

অন্নর আঁচল ফেঁসে যায়, সদুর শরীরে সে বল প্রত্যক্ষ করে। সেই বল, শক্তির মুখোমুখি অন্নর নিজেকে কিছুটা বা অপারগ ঠেকে। আতঙ্কিত, সদুর ক্রোধে সরি যে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য ও ঘেন্না টের পায় তাতে সে আতঙ্কিত। আর অন্ন হাতের বেলুন দিয়ে সদুর মাথাটা এক লহমায় ফাটাতে পারে না বলে বাধ্য হয় সরিকে ছেড়ে দিতে। খণ্ডযুদ্ধের এই পরাজয় তাকে হঠাৎ আরও বিষণ্ণ করে, সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। খানিক পরে সদু তার আচরণের অসংগতি টের পায়, গায়ের জোরে সে অন্নকে ঠেলেছিল। সেই ঠেলা যেন-বা আকস্মিক নয়, যেন সে অনেকদিন ধরে ভালোবাসা ও ঘেন্নায় অন্নকে ঠেলে দিতে চাইছিল— কোথায় যেন জমা ছিল আক্রোশ, কোথায় যেন অন্নর জন্যে তার মায়া নেই, অথচ সে তো মাকে ভালোবাসে?

সরিও বেজায় ঘাবড়ে গেছে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঠায় বসে থাকে সে। হিক্কা ওঠে। হিক্কার মাঝে নিয়মিত ছেদ থাকে। অবশেষে এই হিক্কার ছেদ পূর্ণ করে উঠে আসে নিদারুণ শুষ্ক শ্বাস: কেউ কিছু কয় না... বইসা আছি তো বইসাই আছি... হ্যাশে জেঠিমা জিগায় কিছু কবি সরি... মায় পাঠাইছে... শুইনা জেঠুর মুখখান... এইখানে কী গচ্ছিত রাখছে?

সবটা শোনার ধৈর্য ছিল না অন্নর, বারান্দায় ঠেস দিয়ে বিলাপে সমর্পণ করে। তার শোক গভীর গর্তের মতো খুঁড়ে চলে চল্লিশটি বছর, মৃত স্বামী, টাকার অভাব, বিনা চিকিৎসায় মারা-যাওয়া কোলের মেয়েটা, খাম্‌কা সে মেয়েটাকে মারল...। এইসব কেমন অন্যায়, পাপ এবং তাকে কেন্দ্র করেই সব আবর্তিত, ফলে অন্নর ক্রোধ, গ্লানি নিরাকার অত্যাচারে তাকেই ফালা ফালা করে : মায়রে মারলি! তুই মায়রে মারলি!

সদু তীব্র মৃত্যু প্রার্থনা করে, প্রার্থনা করছে বলে সে নির্ঘাত মারা যাবে এরকম বিশ্বাস তাকে জাপটে ধরছে।

কাজটা পাওয়ার পর থেকে অন্নর চোয়ালের হাড় আরও জেগে উঠেছে। প্রথম একটা দিন গুম হয়ে যায়। যুদ্ধের বাজারে টকি দেখতে গিয়ে গোরা সেপাইর তাড়া খেয়ে কেমন ভয় পেয়েছিল— সেই গল্প চনুর মার কাছে কতবার করেছে। 'সরির বাপে থাকতে য্যামুন একলা বাইরাই নাই, ত্যামুন ভগবান অহন কয়— খাড়া তরে দ্যাখাই...।' এই অবধি বলেই মাঝপথে অন্ন থেমে যায়। আর নিঃশ্বাস গোনা যায় তখন। চনুর মা কোনো কথা বলে না। অবুঝ সন্তানের জন্যে, বাঁচার জন্যে সেই মানুষ এখন প্লাস্টিক কারখানায় কাজ নিয়েছে। পুরো একটা

দিন অন্ন মুখ বুজে ছিল। সদুকেও একটা কথা বলেনি, একবারও বলেনি— কী রে ছ্যামড়া, পড়তে বইলি?

এখন ন-টা বাজলেই সদু টের পায় চনুর দাদু তেল মাখছে। তার লোমশ কানে প্যাঁচানো থাকে পইতে। নাকে তেল টানে বলে সঁৎ সঁৎ শব্দ, তারপর নাভিতে আঙুল ঠেকায়। দূরের কারখানা থেকে ভেসে আসে সাইরেনের শব্দ। সাইরেন মানে যুদ্ধ, যুদ্ধের সময় সাইরেন বেজেছিল। যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজত। সদু যুদ্ধের গল্প শুনেছে, বোমারু বিমান। সাইরেন। খিদিরপুর ডকের বস্তিতে বোমা মেরেছিল। খিদিরপুর কোথায় সে জানে না। সে শুধু শুনেছে যুদ্ধের সময় খিদিরপুর বস্তিতে বোমা পড়েছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে সে আর কিছু জানে না। কেবল অন্নর মুখে শুনেছে যুদ্ধের পরে তার জন্ম। ঠিক যেমন অন্ন তার খুড়িমার মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কথা বলে ফেলে। বা আর কারো জন্ম কিংবা বিয়ের কথা বলতে গিয়ে বলে : হেই মন্বন্তরের কালে...। কাঠগোলা, বস্তি আর ক্যাওড়াপাড়ার দু-চারটে ঘর থেকে হিড়হিড় করে লোকজন টেনে বের করে সাইরেনের শব্দ। রণর মা বলে : শ্যামের বাঁশি। আর ক্ষেমি পিসি ভোঁ শুনলেই খিস্তি করে। কেন যে করে সদু জানে না। সদু কেবল জানে কারখানার ভোঁ। দূরের কারখানা। আর সাইরেন। সাইরেন মানে যুদ্ধ। সে যুদ্ধের পরে জন্মায়।

লম্বা চালার নীচে সদু ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসেছিল। আগে নাকি এই চালার নীচে দু-বেলা বিশখানা পাত পড়ত। কাঙালিভোজন হত। সেই যুদ্ধ, আকাল আর মাগ্‌গির দিনে। ক্যাওড়াপট্টির কেউ কেউ আজও সে কারণে সম্ভ্রমে চনুর দাদুকে পথ ছেড়ে দেয়, দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে, সামান্য হুকুম নিষ্ঠায় পালন করে। কারণ, হয়তো সেই ছোকরার বাপ যুদ্ধের বাজারে এই চালার নীচে পেটের আগুন নিভিয়েছে। এতসব সদুর জানার কথা নয়। কিন্তু সবই সে জেনে যায় আশ্চর্য কৌশলে। আসলে বয়স্করা বিভিন্ন অবস্থায় গল্প, ঝগড়া বা পুরোনো দুঃখের জাবরে জিভের আগায় ইতিহাস সচল রাখে। আর উৎকর্ণ সদু সব শোনে, শুনতে পায়, ফলে সে জেনেও যায় অনেক গর্হিত কথা। যেমন, চনুর দাদু তখন হোমরাচোমরার চাকরি করতেন। আর যথেষ্ট উপরি অর্থাৎ ঘুস ছিল নিত্যকার আমদানি। বিলিতি মদ খেতেন। বাড়িতে রোববার মাংস হতো, রাতে লুচির সঙ্গে মিষ্টি। কাকামণি ম্যাট্রিক পাশ করেই লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়েছিল। ম্যাজিকের বাক্স ছিল। সেই বাক্স কাকামণির আত্মা, দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াত ওই বাক্স সমেত। পান্তাভাত খেতে ভালোবাসত আর গলা ফাটিয়ে হাসত। চনু হওয়ার পর একবার দেড় মাসের জন্যে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চনুর ঠাকুমার গায়ের রং কালো ছিল, মাত্র তিরিশ বছর বয়সে হঠাৎ মারা যায়; কী করে কেউ জানে না। দাদুর সঙ্গে চনুর মার লাগলেই নানান সব তথ্য বেরিয়ে আসে। আর ছুতোনাতায় প্রায়ই দু-কাঠি বেজে উঠত। চনুর মার নাকের পাটা তখন ঈষৎ ফুলে উঠত, আর দাদু পিছু হঠতেন : বুইড়া হাড়মাস খাইল... লজ্জা নাই বুইড়া...। তারপর তুইতোকারি শুরু করত; যদিও চনুর মা শ্বশুরকে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলত, শরীরে নীল ক্রোধ জটিল, ছড়িয়ে পড়লে, চনুর মার লাগাম থাকে না। আর কী এক অজ্ঞাত কারণে পিতাপুত্র

দুজনেই চনুর মাকে উত্তেজিত দেখলে তটস্থ থাকত। চনুর দাদুর মুখে তখন ভীত এবং নিরুপায় হাসির মালিন্য : বউমায় আমার এক্কেরে পাগলি!

থোন ফ্যালাইয়া আপনের আদিখ্যেতা!

আহা!

চুপ কইরা থাকেন, ভাত দিছি খাইয়া বিদায় হন!

এখন চনুর দাদুর রোজগার বলতে একমাত্র ভূসম্পত্তি, মালদা না কোথায় কিছুটা দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। বৎসরান্তে নারকেল আসে, আর কাঠ বিক্রির টাকা। আলিপুর কোর্টে মুহুরির কাজটা নেহাত শরীর সচল রাখার জন্যে। ফলে সংসার চলছে পুরোনো কাসুন্দির ঝাঁজে। এখন আর বারান্দায় পাত পড়ে না। এখন বেয়াড়া ছাগল সেই ঐতিহাসিক বারান্দায় কেবল নাদতে থাকে।

সেই বারান্দার দিকে চনুর দাদুর বেঁটে আঙুল কী যেন দেখায় : কত লোক যে খাইছে এইহানে বইসা... বুঝলা মনু!

মনু অর্থাৎ সদু তখন কী বোঝে কে জানে। সে দাদুর মরা চোখ দেখে, গালের চামড়া দেখে। বাঁকা শরীরে আবিষ্কার করে রহস্য। অথচ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কেন যে মানুষটা গীতা পাঠান্তে এখানে এই বারান্দার সামনে, দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়! অযথা তার ঘোলা চোখ কোন স্মৃতির নীচে চাপা পড়ে, চনুর মা অত কড়া কড়া কথা বললেও; কাকামণি কেন কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না, কেবল ম্যাজিক দেখায়। আঙুল কাটার খেলা, মেমসাহেব হাপিশ। আর চনুরমা নিত্যদিন বিকেল চারটে অবধি ঘুমোয়। রুক্ষ মেজাজ তার শরীরের পাহারাদারি করে।

রসুল দাঙ্গায় মারা গেলে গুজব রটে কানাইদাই সেই বীর। চনুর দাদু কানাইদাকে ডেকে দেশের হালচাল নিয়ে গল্পগাছা করেছিল। মিষ্টি খাওয়াতে চেয়েছিল, চনুর মার নীরব ধিক্কার মাটকোটার বাড়ির থামে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। তোলা উনুন পাতলা ধোঁয়া আর কাঁচা আগুনের ক্ষয় অব্যাহত রাখে। কানাইদা হাসছিল, কথা বলছিল, আর সুলতান আলম স্ট্রিটে গেরস্থের বউয়ের চোখে সেই ছবি অদ্ভুত বদলে যায়। সে দেখে কানাই বমি করছে; হাসতে-হাসতে, দুটো চিন্তার কথা বলতে-বলতে কানাই আসলে গলগল করে বমি করে চলেছে। সদু জানে না কেন, কেন দাদু অত আপ্যায়ন করে কানাইকে, কানাইদাকে। কারণ এই চনুর দাদুই আবার কানাইদার অসাক্ষাতে যে কথা বলত তাতে সেই পিত্ত, বদগন্ধ, আর বমির ঘেন্না।

আইজকাল আর লতাগাছও মেলে না। শাক লতাপাতা কিচ্ছু না। আগুন লাগছে। আগুন। আগে-আগে যা হউক চাট্টি দিয়া গর্ত বুজাইত। আর অ্যাহন!

অন্ন এভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শরীরধারণের আবশ্যিক রসদ, খিদে ইত্যাদি তার কাছে অদ্ভুত সব উপমায় ধরা দেয়। পেট হয়ে যায় গর্ত, শরীর রেলইঞ্জিন। আর খাদ্য এমন কোনো বস্তু যা জ্বালানির মতো ব্যবহৃত হয়, যেমন কয়লা! আর এসব নিশ্চয়ই চলার জন্যে, ইঞ্জিন কোথাও একটা যাবে, কিছু একটা করবে। অন্নর এই বচনে যে অনির্দিষ্ট ক্রিয়ার উল্লেখ থাকে সদু বারবার তার অনুসরণে ব্যর্থ এবং কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

সইর্‌শা বাটা দিয়া ইলশা মাছের পাতরি... এক এক জাগায় এক একরকম, আমাগো দ্যাশে ইলশার পেটিতে মসল্লা মাইখ্যা কচি কলাপাতায় মুইড়া ভাতের মধ্যে দিতাম... ভাপে সিদ্ধ... অ্যাহন...

এখন লাইনধারের জঙ্গল, ডোবার পাশে জলা হাতড়ে সরি হন্যে হয়, তার হাত এবং পায়ের পাতা স্যাতা হয়ে আসে, খুচরো ফালতু উড়ো চুল তার নাকের পাশ আর একটা চোখ আড়াল দেয়। সে খুঁজতে থাকে খারকোল পাতার গাছ, কচুশাক। বিনবিন ঘাম বোনা থাকে সরির নাকে। সামান্য ছায়া হেলে পড়ে চুলের অলস নৈরাশ্যে। অথচ সরির উদ্যম দুটো হাত আর পায়ে অসম্ভব বেগবান। আর সর্বদা সামান্য আবিষ্কার, এই খোঁজার চেষ্টায়, আত্মগোপনকারী আনন্দ তাকে ঠেলতেই থাকে। সরি ফিরে আসে খানিক শাক লতাপাতা আর নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে। কলকল শব্দে, ধারায়, মুখের নানান ভঙ্গিমায় কথা বলে চলে : 'জানো মা... বুঝলা... আমি তো আগে দেখিই নাই... হ্যাশে করলাম কী... লতিগুলা দ্যাখছো...!' সে যেন যাবতীয় শ্রম করে এই কথাগুলোর জন্যে। অন্নকে কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখে, সামান্য হইচই...

সরির চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত, সে কোত্থেকে দুটো কতবেল জোগাড় করে এনেছে। শিলনোড়ায় লঙ্কা পিষতে থাকে; 'খাইয়া কইস সদু!' অন্ন কাজে লাগার পর থেকে দুপুরের রান্না সরিই করে। আর রান্না মানে তো চাট্টি ফোটানো, কিছু একটা সেদ্ধ কিংবা বাটাবুটি। কোনো-কোনোদিন ফিরতি পথে ওড়িয়ার দোকান থেকে অন্ন দু-চার পয়সার ধোকা কিনে আনে।

একা খাইস না রাক্কুসি!

ঠোঙাটা তখন সরি হাত পেতে নিচ্ছিল, তার চোখ জ্বলছিল। আঙুলে করে সে হয়তো সামান্য একটু খুঁটে নিয়ে টাগরায় জিভ ঠেকাত। আর সেই সরল রেখাগুলো খেলাচ্ছলে ভেঙে যেত মুখে, সে হাসত : 'বেশ ঝাল দিছে... খাইস না সদু।'

সরি বড্ড ধোকা ভালোবাসে, ঝাল ভালোবাসে। আজ আর ছুঁয়েও দেখবে না। ঠোঙাটা অমনিই নামিয়ে রাখে। তার দাঁত টেনে নেয় ওপরের ঠোঁট। অন্ন কাজ থেকে ফিরে ঘরের ভেতর নড়াচড়া করে।

চাইয়া আছোস কী!

কই!

তর জেববা জানি ট্যার পাই না?

একটু পরেই সরির শরীরটা আউল হয়। তলপেটে বেদনা জাগে, জেগে উঠতে থাকে। অন্ন টের পায়, কিছুই বলে না। সম্প্রতি সরির এই এক ব্যামো শুরু হয়েছে। আর যখনই অসুখটা দেখা দেয়, লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে, অন্ন অযথা সরির ওপর ক্ষেপে ওঠে। তখন অন্নর চোখ সরির দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তা বিষাক্ত তীর মাত্র। অথচ অন্ন সবই করে। যেমন ঈষৎ উষ্ণ গরম জল ভরে দেয় কাচের বোতলে। খাটের ওপর উপুড় হয়ে, কাত হয়ে, সরি ছটফট করে। শরীরে তাপ এসে যায়। আর সদু কাঠ হয়ে থাকে। তার কুট্টি বোনের কথা মনে

পড়ে যায়। দিদিও যদি হঠাৎ চলে যায়! এই চলে যাওয়ার সমন পেয়েছে সরি, তার তলপেট আঁচড়ে খামচে সেই সমন ক্রমে মূর্ত হতে থাকে। সত্যিই যদি সরি চলে যায়। তখন? তখন সদু কী করবে?

বেদনা বেশিক্ষণ থাকে না, বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক। তারপর সরি অকাতরে ঘুমোয়। সারারাতে কিছুই খায় না, কেবল ঘুমোয়, যখন ঘুম থেকে ওঠে বড়োই দুর্বল। কেমন ফ্যাকাশে দেখায়। পা টিপে-টিপে অতি সাবধানে হাঁটে, চাতালে যায়। আর সদুর দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে, তখন সদু দিদিকে ধন্যি দেয় কী কষ্টই না সইতে পারে! আর অন্ন চনুর মার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে : কী যে করি...। জবাবে চনুর মা লম্বা হাই তোলে, তুলতেই থাকে, যেন ওই হাই আর কোনো দিন শেষ হবে না। চনুর মার দুর্লভ মতটি শোনার জন্যে সদুর একাগ্রতা ধ্বংস করে দিচ্ছে ওই অলস, মন্থর হাই। অখণ্ড সময় ঢুকে যাচ্ছে চনুর মার মুখে, অন্ধকার গর্তে। আর হাইটা কেবল উঠতেই থাকে।

সরির মতো বয়সে আমাগো তো বিয়া হইয়া গেছে...

অন্ন ধুয়া তোলে : আমার দিদির বিয়া হইছিল নয় বছরের কালে... আাহন হইছে কী... একদিন বাইর দুয়ারে বইসা দিদি তো খ্যালতে নিছে এমনকালে জামাই আইয়া উপস্থিত। সাড়া পইড়া গেল এক্কেরে, হগলডি একলগে চিক্কইর দিয়া উঠছে— অ ননী দ্যাখোস নি কেডা আইছে, জামাই আইছে। যেই না হেই কথা হোনা দিদি তো পাছার কাপড় তুইলা ঘুমটা দিয়া...

হত্য!

হত্য।

কন কী!

তয় আর কই কী। লজ্জা লজ্জা...

আর তারা অনর্গল হাসতে থাকে।

সুলতান আলম স্ট্রিটের দুপুর বড়ো নির্জন। বড়ো অলস। মন্থর। কেবল থেকে-থেকে ঢালাই কারখানার হাতুড়ি সেই উলঙ্গ দুপুর থেঁতো করে চলে। গুম গুম শব্দ হয়। এরকম শব্দ আর গপ্পগাছায় সখীর মতো দুই বয়স্কা নারী অলস অথচ অন্য এক ক্লান্ত ছুটির দিনে পা মেলে দেয়। চনুর মা পানসাজতে থাকে, একটা ঠ্যাং আড় হয়ে আছে। অন্ন আঙুলের ডগার চুনটুকু দাঁতে ঠেকায়।

ওষুধপথ্যি ছাড়াই সরি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সদুকে ডাকে, অথচ গলায় যেন আওয়াজ নেই। সদু দেখে দিদির সরু কপালটুকু জুড়ে বাষ্প, ঘাম। সরি হাসে— অ্যাই ভাই!

উঁ।

এক কাজ করবি?

কী?

চাট্টি কাঁকড়া আনতে পারবি?

হুঁ।

দেখিস, মায় যেন টের না পায়।

আচ্ছা।

সদু বেশ ভারিক্কি চালে হেঁটে যায়। এবং এই সামান্য কাজটির দায়িত্বে সে কেমন যেন মর্যাদাবোধ করে। তা ছাড়া এ আর এমন কী কথা! না পারার কী আছে? ভারি তো চাট্টি কাঁকড়া! এর থেকে ঢের শক্ত কাজ সে করে দিতে পারে। গলু তো উড়ন্ত বক টেনে নামায় এক টিপে আর সদু চাট্টি কাঁকড়া ধরতে পারবে না!

সুলতান আলম স্ট্রিট, ক্যাওড়াপট্টি আর শান্তিপল্লির ভেতর ছড়ানো ডোবা আর পুকুর। লাইনধারের জমির ঢাল বেয়ে জলস্রোত। এই তল্লাটের পশ্চাদ্‌ভূমি বলে আর কিছু নেই, শুধু জল, কচুরিপানা, বাঁশের সাঁকো। আর সেই জলরাশির ভেতর উত্তরপ্রদেশের গোয়ালা মোষের পিঠে খড় ঘষতে থাকে।

সদু কোনো লক্ষ্য স্থির করতে পারে না বলে কিছুটা বিভ্রান্ত। তখন সে রেললাইনের দিকে এগোয়। বিছুটি আর আশ শ্যাওড়ার ঝোপ ভেঙে গুটি-গুটি হাঁটে। তার কোমর পর্যন্ত বুনো টমেটো বা কখনো হলুদ বিছুটি ফুল। গঙ্গাফড়িং সমস্ত ইন্দ্রিয় ধরে টান মারে। সদু কাঁকড়ার কথা ভুলে যায়। টিপে-টিপে সতর্ক পায়ে সে এগোয় যেন এক পটু শিকারি। আর গঙ্গাফড়িং বিষয়ে সরির মতামত মনে পড়ে যায় : গঙ্গাফড়িং মেলা চালাক, ধরতে-না-ধরতে ফুড়ুৎ...। সদুর হাতের পাঁচটা আঙুল খুলে গেছে, চোখ নিবদ্ধ বিছুটি পাতার কেবল সেই অংশে যেখানে নির্বিকার ফড়িং। যেন এমনিই ধরা দেবে বলে বসে আছে। সে হাতের থাবার সাপটায় টেনে নিতে চেষ্টা করে ক্ষুদ্র ফড়িং। কোথাও নিশ্চয়ই ফাঁক ছিল বা তার হাত আসল লক্ষ্য স্পর্শও করেনি। ফলে পুনর্বার সরির মতামত তাকে ধাওয়া করে : গঙ্গাফড়িং মেলা চালাক, ধরতে-না-ধরতে ফুড়ুৎ...

আর দু-পা এগোতেই ফ্যাকফেকে সাদা মাঠ। দিনকতক আগেও নানান গাছপালা লতাপাতায় মাঠটা গাঢ় সবুজের গভীরতায় ভরে ছিল। এখন নির্মূল ঘাস, কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। উকিল ঠাকুমা বলে : রেফুজিদের দল এয়েচে থেকে আর কিচ্ছুটি নেই। কচু ঘেঁচু কিচ্ছু রাখেনি কো... সব খেয়ে ফেলেছে... এখন কী খাবি? শেষমেশ ছড়া কাটে— বলে গু খায় না-কো গন্দে আর নোয়া খায়... না-কো শক্তে...। উকিল ঠাকুমাকে অন্ন দু-চোখে দেখতে পারে না। বলে : অ্যাই পোড়ার দ্যাশে আছেড়া কী!

মার মুখে সদু পদ্মার গল্প শুনেছে। গোয়ালন্দ, স্টিমার, আর পদ্মা উথালপাথাল। শুনতে শুনতে সদুর আজকাল মনে হয় সে যেন কতবার গেছে, কত চেনে। যেন এক বুড়ি তার থুতনি ধরে বলছে : আমাগো কালার ছাওয়াল... এতকাল ছিলা কই চাহ্‌ন...। পদ্মা উথাল পাথাল, ইলশা মাছ চান্দের মতো ফসকাইয়া যায়...

সদুরা মাছ খায় না। দরমার ফাঁক দিয়ে চাটগাঁইয়া বিশুদের শুটকি মাছের গন্ধ নাকে লাগলে সদুর গা গোলায়। আর সরির এক টুকরো মাছ পেলেই খাওয়া হয়ে যায়। তবু অন্ন মাছ আনে না। আনতে পারে না। চনুর মা বলে : আপনের সরির মাছের গন্ধ হইলেই হইল। মাছের এই গন্ধটুকু কোনো-কোনোদিন চনুর মার বাটিতে থাকে : সরিরে দিয়েন অন্নদি!

চনুর মা যেন কী! মাঝে মাঝে তার মুখ হঠাৎ ভারী হয়ে যায়। অন্নর সঙ্গে কথা বলে না, ডাকলেও কোনো জবাব পাওয়া যায় না তখন। সদুদের দুয়োরে অবধি পা ফেলে না। সদু দেখেছে অন্ন তখন কেমন কাঁটা হয়ে থাকে। কখনো-সখনো আট আনা এক টাকা কর্জ নেয় অন্ন। তা ছাড়া এক কৌটো চাল, একবাটি আটা এসব তো আছেই। বিশেষত এইসব খুচরো ধারের হিসেব না রাখার এক মহিমা আছে। ফলে প্রতিবার ঋণ পরিশোধের সময় অন্নর চনুর মার সঙ্গে এরকম কথাবার্তা হত :

চনুর-মা-দিদি, আপনে দুই কৌটা চাল পান!

দ্যাহেন, আমার মনেই নাই...

আমার মনে আছে... অ্যাহন এক কৌটা দিলাম...

থাউক না পরে দিয়েন...

নাহ্ এইয়ার মধ্যেই দিতে হইব।

এমন একটা ভরসার মানুষ বিরূপ হলে যা হয়। অন্নর মধ্যে সদু তখন সেই ভয় দেখে। যেন আসলে ঋণের সমস্ত হিসেব, পাইপয়সা পর্যন্ত চনুর মার মুখস্থ আছে। আর এখন এই মুহূর্তে সে যদি সমস্ত ফেরত চায়! অন্নর ভয় হয়, সে খামকা পালার উঠোন পরিষ্কার নিজের হাতে টেনে নেয়। চনুকে ডেকে হাত মুখ ধুইয়ে দেয়। আর এসব চলতে থাকলে হঠাৎ একসময় চনুর মার ভাব বদল হয় : জাগা আছেননি অন্নদি, অ অন্নদি! আর তারপর কিছুদিন চনুর মা অন্নদি বলতে অজ্ঞান। অন্নর মুখে, কানের লাল তিল ছুঁয়ে প্রথম দিকে বেদনা থেকে যায় ফ্যাকাশে। আর চনুর মা যেন ফুটতে থাকে : শুনছেন নি, অ অন্নদি... দ্যাহেন ছাওয়ালের কাণ্ড... পান খাবেন নি অন্নদি..। চনুর মার এইসব আচরণে প্রচ্ছন্ন গর্ব সদু টের পায়। কীসের একটা গর্ব! সদুর রাগ হয়, কেন যে মা আবার কথা বলে! কীসের মোহে? চনুর মা এবং অন্নর সম্পর্কের এই বিশেষ পর্যায় এভাবে শেষ হয় : বেশ আছেন অন্নদি... সদুটা মানুষ হইলেই হইল... আপনের আবার দুঃখ কীসের, টাকা পয়সাই কি সুখ! এবং এই দুই নারী পুনরায় সখী হতে পারে, সখী হয়ে যায়।

ক্রমে অন্ন বিশ্বাস করতে শুরু করে টাকা পয়সাই সব নয়, সমগ্র নয়, যেন-বা সে তখন সমগ্র যা, তা বুঝে ফেলে বলে সামান্য প্রীত। চনুর মা কী সেজন্যেই তার পানপাতা-সদৃশ মুখে আনে আষাঢ়? চনুর মার অন্নর প্রতি সাময়িক নির্দয়তা কী কোনো গুপ্ত ঈর্ষার কারণে? সরির সঙ্গে অন্নর চাপা আলাপে প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই ইঙ্গিত : অ-ঋণে অ-প্রবাসে সায়াহ্নে যে শাকান্ন খায় সেই প্রকৃত সুখী। এই তত্ত্ব জানায় অন্ন এবং বলে, 'গীতায় ভগবান বলছেন...।' তার পর তারা চলে যায় চনুদের সাংসারিক কথায় যেমন চনুর দাদু 'বদ', চনুর বাবা 'বলদ' আর...। অন্ন আর সরির মধ্যে তখন বয়সের প্রাচীর ধূলিসাৎ, সরি স্বচ্ছন্দ মন্তব্য করে : আহা!... দ্যাখছ নি!

যদিও আষাঢ় অতিবাহিত হওয়ার পর, পরেও, অন্ন বড় সতর্ক থাকে। কোথাও যেন-বা বিদ্ধ থাকে কাঁটা। চনুর মাকে তার অতিরিক্ত তোয়াজটুকু অব্যাহত থাকে। এরপর সরির জন্যে চনুর মার হাতে একটা কাঁসার বাটি : 'অ... অন্নদি... সরিরে দিয়েন, ছেমড়ির মাছ ছাড়া খাওন হয় না।'

সেই সরির জন্যে সদুর কাঁকড়া শিকার। অভিযান। ডোবা থেকে মাত্র কয়েক মাস আগে সদু সরির জন্যে কাঁকড়া ধরেছিল। এখন সেই ডোবা আর নেই। মানুষের রুদ্ধশ্বাস কাজে, গঠনে, সেই ডোবা বুজে গেছে। সেখানে শালখুঁটি পোঁতা হয়েছে, বিশাল এক কারখানা হচ্ছে। ইতস্তত তেরপলের তাঁবু, ইটের উনুন, স্ত্রী-পুরুষের রঙিন কাপড় রোদে পড়ে থেকে শুকোচ্ছে। ডোবা আর পুষ্করিণী ভরাট হতে-হতে এখন সামান্য জল কোথাও শুধু পায়ের পাতা ডোবায়। সেখানে দাগ কাটে ক্ষুদ্র জলপোকা, মৃদু কম্পন থাকে। দূর দূর থেকে বুনো হাঁস এই জলাশয়ে উড়ে আসত। আর গত ছ-মাস যাবৎ ট্রাকের ঘর্ঘর শব্দ। লৌহশৃঙ্খল, জয়ধ্বনি, শ্রম-লাঘবের সমবেত বিহারি গীত, আর শাবল, গাঁইতি এবং ক্রেন। ক্রেনের শব্দ। হেলেঞ্চা, কলমি আর গিমেশাক নেই। নেই গলুর বুনোহাঁস শিকার। ক্রেনের শব্দ। কেবল ক্রেনের শব্দ। লোহার বিম, লোহার শিকের ফ্রেম ইত্যাদি বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিয়ত ঘুরে চলেছে সিমেন্ট, বালি আর পাথরকুচি মেশানোর যন্ত্র। ভারা বেয়ে উঠে যাচ্ছে নারী ও পুরুষ। শোনা যাচ্ছে বিচিত্র ভাষায় আহ্বান, উচ্ছ্বাস, আর নানাবিধ গল্প। উড়িষ্যাবাসী লিঙ্গরাজ, ঠিকেদারের হুকুমে কাজ করতে-করতে মাথায় ইটের পাঁজা সমেত ভারা থেকে উলটে পড়ে। মরে। তৎক্ষণাৎ। খবরটা চাউর হওয়ায় মানুষটার নাম জানা গিয়েছিল, কিন্তু কাজ বন্ধ হয়নি। ক্রেনের শব্দ যেমনকার তেমন।

ক্যাওড়াপাড়ার ক্ষেমির ফাটা ত্বক আর মুখের কুটিকুটি রেখা, ভাঁজ ও কুঞ্চনে ছিল এই ঘোষণা : বসুন্ধরা হল গে মা, রুষ্টু হয়েছে, হবে নি... আগে ভক্তিছেদ্দা করে পুজোআচ্চা দে... টমেটম সাহেবেরও ভেদবমি হল বলে...

সদু দেখছে ক্ষেমিপিসির মুখে কাঁকড়ার পায়ের, দাঁড়ার, চেরা দাগ, হিজিবিজি আঁচড়। এইসব আঁচড় সামনে জাগিয়ে, মুখে নিয়ে, তার অলস চোখ নড়ে।

একদিন সবুর করেনি, একটা দিন রেহাই পায়নি। ক্রেনের এবং সেই মেশিনের শব্দই ছিল লিঙ্গরাজের অন্তিম বিদায়ে একমাত্র সম্মান। মজুরের দল হা-হুতাশ করেনি, করার সময় পায়নি। আর এখন তো কারখানা প্রায় শেষ হতে চলল। সেই কবে সে শালখুঁটির ওপর লোহার মুগুর পড়তে দেখে, গুমগুম শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করেছিল : হ্যাঁ গো এখানে কী হবে?

ফ্যাক্টরি বনে গা।

ফ্যাক্টরি!

হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি নেহি জানতা?

না।

কারখানা... ভোঁও—ও... কাম হোগা।

তুমি কোথায় থাক?

...ও...ওঁহা

না।

মুলুক? দেশ? ছাপড়া জিলা।

কোথায়? ছাপড়া কোথায় গো?

নেহি মালুম। ইঁহা সে হাবড়া, হাবড়া সে রেল...

সদু বস্তুত খুবই হকচকিয়ে যায়। হাওড়া, বিহার এসব সে চেনে না, কোথায়, সবই কি দেশ, একটি মাত্র দেশ, কত বড় দেশ! রেললাইনের উঁচু পাড় ছোঁওয়া ইট, সিমেন্ট, ক্রেন, লোহালক্কড়ের ভেতর হাঁটু ভেঙে বসেছিল ছেলেটা, আধাহিন্দি আধাবাংলায় কত কী যে শোনে...। ক্ষেতি। ভঁইস। গেঁহু। বারিশ।

ফলে তার বিশ্বাস হয়, দেশ সম্পর্কে কিছু জেনেছে। সরিকে সদু তার এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। গলুকে বলতে গিয়ে দেখেছে গলু অনেক বেশি জানে, কত জানে! ও তো একা একা যাদবপুর চলে যায় লাইন ধরে। হাঁস মারতে। বলে— 'বানাকগে কত কারখানা বানাবে!' কারণ গলু জানে, দেখেছে, পতিত জলাভূমির অভাব এদেশে কোনোদিন হবে না।

সদুর আর কাঁকড়া শিকার করা হয়ে ওঠে না! কঞ্চিতে দড়ি বেঁধে সে যে গুগলির সাদা মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছিল সে-সবই ফেলে দিতে হয় 'ধ্যুৎ' বলে।

দিদি!

উঁ।

তোর শরীর খারাপ?

না রে।

জানিস... কিছুতেই কাঁকড়া পেলাম না।

থাকগে।

ধ্যুৎ!

থাকগে, তুই এক কাজ কর, খাটের নিচে একমুঠো ভাত থালা চাপা দেওয়া আছে, খেয়ে নে আগে।

আচ্ছা তোর লিঙ্গরাজের কথা মনে আছে?

কেন?

লিঙ্গরাজকে না...

চুপ কর তো, বড্ড বকবক করিস আজকাল, যা খেয়ে নে...

আলোর সূক্ষ্ম রেণু ক্রমে অদৃশ্য, মরে যাচ্ছে, সুলতান আলম স্ট্রিটে বৃহৎ ধূসর ডানার বিস্তারে কখন সন্ধ্যা নেমেছে। এই সন্ধ্যায় মালিন্য নেই, রাতের সূচনাও নেই। দু-চারটে গাছ, ডোবা ও তাবৎ জলাশয় বড় বেশি স্পষ্ট তাতে। ভাতের ফ্যান আর সেঁকা রুটির গন্ধে অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির ডোবার উৎকট ঝাঁজও বিলীন। চনুর মার বিশৃঙ্খল চুলের গোড়া থেকে উড়ে আসছে নারকেল তেলের পুরোনো গন্ধ।

অন্ন এখনও ফেরেনি, অন্নর ফিরতে আটটা বাজে রোজ, তখন কাকামণিও ফেরে। সরি খাটে মড়-মড় শব্দ তুলে কাহিল শরীর নামায়, সতর্ক টেনেটুনে দেয় পুরোনো ফ্রক। পেয়ারাগাছের তলায় খানিক দাঁড়ায়, সেখানে পাগলা বাতাস। তার ছাড়া চুল ভাসায় সেই স্রোত। সন্ধ্যা।

চনুর মা আর উকিল ঠাকুমা তখন লোকের নিন্দে করছে, দোক্তা খাচ্ছে। চনুর মার কড়াইয়ে ছ্যাক ছ্যাক শব্দ। উকিল ঠাকুমা : দিনে দিনে কত দেখব!

নাহ্ মাসিমা আপনে ঠিক কইতেছেন না...

বলে ব্যাটাছেলে কাজ পাচ্ছে নাকো আর মেয়েছেলে... দেখোগে কোতায় কী কচ্ছে...

এই কথা কইয়েন না, অন্নদি সেই মানুষই না।

কত দেকলুম, বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট।

সরি এসে খাটের ওপর ঝাপটে পড়ল। ফোঁপাতে লাগল, সদু বহুবার সরিকে কান্নার বেগ হজম করতে দেখেছে, কিন্তু কাঁদতে দেখেনি, সে আস্তে-আস্তে সরির হাত ধরে টানতে লাগল: কী রে দিদি! কী হয়েছে? এই দিদি! বল না?

ওরা মার নামে...

কী... কী...

বিচ্ছিরি সব কথা... সদু!

কী? কী কথা?

তুই বুঝবি না, বুঝবি নারে সদু...!

বল না!

তুই যে বড়্ডো ছোটো সদু!

এই দিদি বল, বল বলছি, কেন, আমি বুঝি, সব, সবই বুঝি, বলে দ্যাখ না, বল না।

ভগবান!

তা হলে আমি মরে যাব, এক্ষুনি মরে যাব, বল বলছি...

সদু জানে, জানত, ও ইচ্ছে করলেই মরতে পারে। স্রেফ ইচ্ছে। আর সরি তখন বুকের কাছে টেনে নেয় তাকে : পাগল! কান্দে না! কান্দিস না ভাই... পাগল... মরবি ক্যান! ক্যান মরবি সুনা! সদুর তখন বিশ্বাস সে মরবে না, কুট্টি বোনটা বোকার ডিম, তাই...।

চনু এখন সাদা ইউনিফর্ম পরে মর্নিং স্কুলে যায়, আর রাত আটটা বাজতে-না-বাজতে ঘুমে ঢুলে পড়ে। সদুর সঙ্গে তার দেখাশুনো বড় একটা হয় না। সদুর পাঠশালা বসে দশটায়, বিকেল তিনটে-চারটেয় ফেরে, ফিরেই যা হোক কিছু মুখে দিয়ে ছোটে ক্যাওড়াপাড়ায়, না হলে গাংগুলি মাঠে কিংবা টো-টো করে ঘোরে, বল খেলে। চনু আর সদুর মধ্যে এভাবে অনেক কিছু ঢুকে পড়েছে। তার ওপর চনু যে শক্ত শক্ত ইংরেজি শব্দের মানে জিজ্ঞেস করে : বল তো এলিফ্যান্ট মানে কী?

ভেলভেট।

তোর মুণ্ডু।

ভাগ, ভেলভেট।

এলিফ্যান্ট মানে হস্তী...

হস্তী আবার কী?

হাতি।

সুতরাং চনু ধারে কাছে এলেই সদু জোরসে চিমটি কেটে দেয়, কাকিমার সদুর প্রতি অযৌক্তিক প্রশ্রয় থাকায় ও নিয়ে নালিশ ঠুকে চনুর কোনো লাভ হয়নি। উলটে মার খেয়েছে। সম্প্রতি দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ আছে।

সদুর এখন ইচ্ছে করছিল চনুর পাশে গিয়ে বই খুলে বসে। কিন্তু উপায় না থাকায় তাকে লম্প জ্বালতে হয় : দেশলাইটা কোথায় রে দিদি?

ওই তো বালিশের নীচে।

সদু অঙ্ক করবে ভেবে, পরক্ষণে বিস্মৃত হওয়ায় হাতির ছবি আঁকতে থাকে। এবং কিছুতেই শুঁড়টা বাগে আনতে পারে না, ক্রেনের মতো কিছু একটা এঁকে ফেলে বারবার।

অন্নর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। সামান্য শব্দে সদুর কেবলই ভ্রম হতে থাকে, আবার বারবার ভেঙে যায় সেই ভুল আর ভঙ্গুর এই আকাঙ্ক্ষার শহিদ হতে-হতে ক্রমে দীর্ঘ হাই ওঠে। সরি বটতলার ভুসো মলাটের বই কাত করে হুঁশিয়ারি দিল : এই ভাই ঘুমাইস না... মায় আইল বইলা... পদ্য মুখস্থ হইছে? মুখস্থ কর নাইলে কানাইদায়...। তখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত সদুকে চিৎকার করতে হয় : মন্বন্তরে মরিনি আমরা...। যদিও তার চোখ দুটো ইতিমধ্যে লাল হয়ে উঠেছিল, আসনপিঁড়ি হয়ে বসার ভঙ্গিটি ঢিলে হচ্ছে ক্রমে এবং শেষে একটি হাতের ওপর নিজের গাল রেখে করে পরম নির্ভরতায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়।

অন্ন, এখুনি এসে যাবে, এসে গেল প্রায়। আর অন্ন এসে গেলেই সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ। সে, সরি এবং অন্ন দীর্ঘকাল পরস্পরে সীমাবদ্ধ, অভ্যস্ত। কেমন অখণ্ড মনে হয়। যাতে সে ভাবে আদিতেও যেন এই তিনটি প্রাণীই ছিল চরাচরে। আগে সে নিরুদ্দিষ্ট পিতা এবং অন্য প্রিয়জন যথা চনুকেও ধরে নিত। কিন্তু অন্ন এবং সরির বুঝদার 'আমাগো', 'আমাগো তো অগো মতো চলবো না', ইত্যাদি কথায় বুঝেছে, এই আমরা বড়ই পৃথক, অখণ্ড গ্রন্থনায় নিবিড় তিনটি প্রাণ। এখন, এমনকি তা অনুভবেও স্থায়ী। তারা মন্বন্তরে মরেনি, কোনোদিন মরবে না। সদুকে পদ্য মুখস্থ করতে-করতে ভাবতে হয় : তা হলে মন্বন্তরে কারা মরেছিল? কারা বেঁচেছিল? কেউ কি মরেছিল? তারা কারা? তারা কেন মরেছিল? মন্বন্তরে!

পঞ্চাশ সন...

সন্তানের মুখের গরাস মায় কাইড়া খাইতাছে...।

অন্ন দেখেছিল। স্বচক্ষে। নিজের চোখে অন্ন দেখেছে। আর সদু তো এখন ছাপার অক্ষরে দেখছে, কেবল সনটাই লেখা নেই। না থাকগে, পঞ্চাশ সনই হবে। নাকি বহুবার? সে যাই হোক, ছাপার অক্ষর মানেই 'বিদ্যা', 'বিদ্যা' মানে 'সত্যি', সত্যি মানে যা সত্যিসত্যি হয়েছে, হবে। তা হলে মন্বন্তর হয়েছিল। কিন্তু আমরা মরিনি। শুধু কুট্টি বোনটা মরেছে। কিন্তু আবার যদি মন্বন্তর হয়, তা হলে? তা হলেও কি আমরা আবার বেঁচে যাব? কতবার বাঁচব?

সদু!

এই ডাক সেই নারীর, যার জন্যে সদুর বই খুলে বসে থাকা, পড়া, পড়ার চেষ্টা করা। কারণ বাড়ি ফিরে সদুকে এ-অবস্থায় দেখলে অন্নর শরীর থেকে চোঁয়ায় সেই রস, মমতা।

ওঠ। খুব হইছে। অখন খাইয়া লও।

মা! অমা!

কী?

যোগেন্দ্র, মহেন্দ্র, হরেন্দ্র চক্রবর্তী...

কী কস হাবিজাবি, পূর্বপুরুষের নামে ঈশ্বর বসাইতে লাগে।

আচ্ছা ওরা সবাই মন্বন্তরে মরেছে না?

শোনসনি সরি! হ্যাগো কত ধান! কত জমিজমা! তগো বাড়িতে রোজ না হইলে দশজন চাষা খাইয়া যাইত! নে অহন ওঠ, খাইয়া ল দেখি, মেলা জ্বালাইস না, অ সরি তরও দেখি ঘুম লাগল, ওঠ।

কোনোক্রমে খেয়ে নিয়েই সদু ডুবে যেতে থাকে, তার শরীর কোথাও নেমে যেতে থাকে অতি দ্রুত। এলিয়ে যায় ঘুমে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না, কিছুই থাকে না। শুধু রাতের দাপট।

মরে নারী, ওড়ে ছাই
তয় নারীর কলঙ্ক নাই।।

অন্ন সম্পর্কে কেচ্ছার গল্প করতে এসে তিনবারের বার উকিল ঠাকুমা চনুর মার কাছে নিদারুণ অপদস্থ হয়ে ফিরে গেছে। এক মাসের ওপর আর এ-রাস্তা মাড়ায়নি। কাদা ও জোলো গন্ধের ক্যাওড়াপাড়া, সুলতান আলম স্ট্রিট আর শান্তিপল্লির তিনটি কোণ জুড়ে, সেই কেচ্ছা এই একমাসে বিস্তৃত। কেচ্ছাটির পাখা গজিয়েছে। মাত্র একমাসের মধ্যেই তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এমনকি, এখন কোথাও তার সূত্রপাতে অন্নর জন্যে সহানুভূতিও থাকে : আহা নিঃসম্বল বিধবা, তা যা হোক করে তো ছেলেমেয়ে দুটোকে দাঁড় করাতে হবে! তারপর তারা নিবিষ্ট হয়। কেচ্ছা জমে ওঠে। আবিষ্কৃত হয়ে যায় অন্ন রাত করে ফেরে। কখনো-কখনো ফেরে না। যে বা যারা তাতে সংশয় প্রকাশ করে, আদতে তারা আরো নির্দিষ্ট তথ্য চায়, প্রমাণাদি চায়। অথচ সকলের মুখে ও পরিস্থিতিতে কী ঔদাসীন্য! তারা এক নিঃসম্বল বিধবার উপায়হীনতায়, নির্যাতনে ক্লিষ্ট। যেন-বা সেই শোক তারা ভাগ করে নিচ্ছে। এজন্যে সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যে আছে অন্নর পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হওয়া। এই তথ্যটিতে তারা গুরুত্ব আরোপ করেছে, যদিও পঁচিশ বছর বয়সের অন্নকে তারা কখনও দেখেনি। কিন্তু ওই বয়সের মাহাত্ম্য, ওই বয়সে বিধবা হওয়ার করুণ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ বলে খেদ থেকে যায়। তখন দিব্যচোখে পঁচিশ বছরের অন্নকে দেখা যায়। সামান্য চেষ্টাতেই এ-কথাও আর গোপন থাকে না— সরির বাবা মৃত্যুমুখে ঠায় দু-বছর পড়েছিল। বিশেষ, ওই ব্যক্তি ক্ষয়রোগে অনেক সময় নিয়ে মারা গেছে। ফলে, যে দৃশ্যটি তারা নির্মাণ করে তাতে ওই যৌবনবতী নারী ও মৃত্যুর নির্দয় ক্ষরণ ক্রমে মিশে যেতে থাকে।

এই বৃত্তান্তের অনিবার্য ডালপালা একসময়ে মাঠকোঠা স্পর্শ করেছে, যদিও তার আগে এবং পরেও, যথেষ্ট আড়াল ছিল। আড়ালের চেষ্টা ছিল। অন্ন ও সদুর ক্ষেত্রে ওই চেষ্টা সার্থক, কিন্তু সরি সবই জানত। চনুর মা সরির কাছে কিছুই গোপন রাখেনি, অন্নর অনুপস্থিতিতে সে বলেছে : 'অরা নাকি ল্যাখাপড়া জানে... এইয়ার নাম শিক্ষা... খাম্‌কা একটা মাইয়া-মানুষের নামে... ছিঃ- ছিঃ- ছিঃ-।'

এরকমই হয়তো চলতো, শান্তি-পল্লির সচ্ছলতায়, বাজারের ভারি থলের হাঁটাচলায়, কেচ্ছার পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটত। কিন্তু বিপত্তি হল সদুকে নিয়ে, ক্যাওড়াপাড়ায় মেলামেশার সুবাদে, গলুর সঙ্গে মাখামাখি থাকায়, ওই অপবাদের একটি প্রতিশব্দ সে জেনে ফেলে। কিন্তু শব্দটির অর্থ তার জানা ছিল না। সমুদ্র, পৃথিবী ইত্যাদির মতো সদুকে তখন 'খানকি' শব্দটির অর্থ জানতে হবে, ওই শব্দটি সে চিত্রময় করে নিতে চায়। অন্নর কাছে সদু অর্থটুকু জানতে চেয়েছিল। সরি তখন অ-কল্পনীয় ক্ষিপ্রতায় তাকে জাপটে ধরে, অন্ন রুদ্ধশ্বাসে জেরা করে

চলে শব্দটির উৎসে যাওয়ার জন্যে : কে কইছে? কার থিকা... ক...ক... কে? কে? কার থিকা শুনছস? কে কইছে?

অন্ন যার খোঁজ করেছে, প্রতিবারের জিজ্ঞাসায় তার প্রতি যে বিদ্বেষ দাঁতে, চোয়ালে ও চোখের তারায় ঝলসেছে, তাতে সে খুন হয়ে যেতে পারত। অন্ন তখন খুন করতে পারত। প্রলয় তার শরীরে তখন ছত্রখান। সপাটে আছড়ে পড়ছে বিশুদ্ধ ক্রোধ, হঠাৎ স্তব্ধ হলে ক্রোধই তাকে খাড়া করে রাখে। জ্যোৎস্নায়, রাতে। আর ঝিঁঝি ডেকে যায়। সমস্ত জিজ্ঞাসার খননকার্য সমাপ্ত করে তিনটি নারী তখন সেই কেচ্ছার গলিত শব টেনে তুলেছে, তাদের হাতে পচা মাটি, গলা মাংস আর দুর্গন্ধ। শিকড়-আঙুল তাদের মুখ, চোখ খুবলে নিচ্ছে। ক্রমে তারা নিস্পন্দ, স্থাণু। কোথাও কোনো শব্দ হয় না, এক ওই ঝিঁঝির ডাক ছাড়া, ফলে অপার সময়ও তাদের বৈরাগ্য দিতে থাকে।

চনুর-মা-দিদি, আপনের আশ্রয়ে থাকন আমার কপালে উঠল...

কই যাবেন!

যে-দিক দুই চক্ষু যায়...

আপনে থামেন...

আর চনুর মা সেই জ্যোৎস্নায়, হিমে, সমগ্র পরিস্থিতির ক্রোধ আত্মসাৎ করে এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে ফেলে। জানা যায় এই অপবাদের উৎসে পৌঁছে গেছে সে। সে জানে, জানে বলেই ওই জিভ উপড়ে ফেলা তার আশু কাজ। আর এজন্যে করণীয় কোনো কিছুতেই তার আটকাবে না, এমনকি জেল হাজত করতেও তার আপত্তি নেই। আর এক্কেবারে ঠান্ডা মাথায়, অবলীলায় সে খুনের কাজটা সেরে ফেলতে পারবে, কারণ তা হবে অতিমাত্রায় স্বাভাবিক। সে আরও বলে : মনুষ্যত্ব নাই, হোয়ামি টাকার আন্ডিল আইনা দিতাছে, হ্যার আর কী! মাগির জিভখান খুইলা ন্যাওন লাগে...

আর হোয়ামিও এক্কেরে ভ্যাড়া...

এরকম মানুষের জিভ উপড়ে নেওয়ায় কোনো অন্যায় তো নেইই বরং পুণ্য। চনুর মা এই পুণ্য কাজটি অতি দ্রুত সেরে ফেলবে। অন্ন দেখতে পাবে।

তখন অন্নর স্মরণ হয়, চনুর মা ক্রোধ দমনে অক্ষম, নিজের স্বামীকে একবার থালা ছুঁড়ে মেরেছিল। কাকামণির কপালে সেই কাটা দাগ আজও গভীর হয়ে আছে অতএব চনুর মাকে নিরস্ত করার প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। এতসব কিছুর ভেতর সদু এবং সরির কথা খেয়াল রাখে না ওই দুই নারী। পুনরায় একটি প্রবাদে অন্ন তখন স্বাভাবিকতা ফেরত পাচ্ছে : মরে নারী...

একসময় সে গল্পও বলে। যে গল্পে জানা যাচ্ছে অন্ন তেমন হলে আজ সরি আর সদুকে নিয়ে তার এত হেনস্থা হত না। কাহিনির সেই খলনায়ককে সদু আর সরি চেনে। জ্যাঠামণি অন্নর সেবাযত্নের নামে আরও ঘনিষ্ঠতা চেয়েছিল। জ্যাঠামণির তখন অসুখ, সেই অসুখের সময় অন্নকে তার সেবা করতে হয়েছিল কর্তব্যজ্ঞানে। সদুর বাবাও তখন বেঁচে, কিন্তু ক্রমশ সে চলে যাচ্ছিল মৃত্যুর দু-পাটি অত্যুজ্জ্বল দাঁতের মধ্যে। অন্ন পারেনি জ্যাঠামণির সঙ্গে রফা করতে। অথচ সেই রফায় জরুরি ব্যবসা ছিল, বাস্তব ও আখেরের বোধ ছিল, ছিল অতিমাত্রায়

সরল একটি অঙ্কের হিসাব। এখন সে কেবল অপারগতার কথা, অনিচ্ছার কথাই জানিয়ে যাচ্ছে। এই স্মৃতিচারণে কোনো ঘোষণা নেই, তা কেবল বিরতি। এ বিষয়ে সতীত্বের অনুষঙ্গ ছিল না। অমোঘ সেই ছড়াটি অন্ন উচ্চারণ করেছে, যাতে কলঙ্ক না থাকাটাই বাস্তবে অসম্ভব। কলঙ্ক তাদের জীবনে ওতপ্রোত আছে এই উপলব্ধিতে শরীর এলো করে দিচ্ছে। এমনকি এসে যাচ্ছে মৃত্যু। চনুর মাকেও ছেড়ে যাচ্ছে ক্রোধ। ঘামছিল। ঘাড় নাড়ছিল।

রাতে এক নিদারুণ ভয়। ক্রমে আতঙ্ক। আর সেই আতঙ্ক পরে নিদ্রা হয়ে গেলে, সদুর কোনো প্রতিরোধ থাকে না। কেবল পরের দিনের যাবতীয় ছক প্রাকৃতিক কারণেই যেন-বা হুবহু ঘটে যেতে থাকলে, সে একবার ক্যাওড়াপট্টির দিকে এগোয়। যেখানে রোদ হাভাতি চোয়ালে ঝুলেছিল। ঘষা চামড়ায় আলোকিত বিশ্বগ্রাসী খিদে। বইশ্লেট বগলে নিয়ে সদু গলুর সঙ্গে বেরিয়ে যায় কোনো দূর স্টেশনের উদ্দেশে। গলুর পকেটে যথারীতি গুলতি আছে। ফাঁকা ট্রেনের কামরায় জাঁকিয়ে বসে গলু সিগারেট ধরায় : টানবি?

নাহ্।

কেন?

নেশা হয়ে যাবে, গন্ধ হবে মুখে।

গন্ধ হবে! কিস্‌সু হবে না, টান, তুলসিপাতা চিবিয়ে খাবি ব্যাস...

কারখানার শেড ও পাকাবাড়ি ফেলে কয়লার ইঞ্জিন তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সদু একগাল ধোঁয়া ছাড়ে, কাশে। হরিৎ ধানখেতের পাশ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুটছে, সদুর আতঙ্ক, বিস্ময়ও। সে আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারবে না, ফিরবে না।

ফেরার পথে গলু চেকারের খপ্পরে পড়ে যায়, আনাড়ি সদু সমর্থ হয় এক লাফে পালাতে। অনেকবার ভুল রাস্তায় হেঁটে ক্যাওড়াপট্টির ভেতর দিয়ে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে। গলুর দাদা ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল। সাইকেল কারখানা থেকে ফিরে শ্যাম নিয়মিত এই সময় যন্ত্রটা নিয়ে বসবে। রণদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সদু রণ ও তার ঠাকুমার এরকম সংলাপ শোনে :

মনু!

কী... ই... ই...।

ক্ষুদা লাগছে?

নন্‌না।

উঁহু।

কী?

মুখখানা শুখনা দেহি...

রুটি চেয়ে এনেছো ঠিক...

ক্যান, ভিক্ষুক না কি?

তা হলে আনো কেন?

সাধা অন্ন পায় ঠ্যালতে নাই... শোন তয়, আমগো দ্যাশে...

হইছে! ভিক্ষুক!

কী কইলি আমি ভিক্ষুক...

রণর ঠাকুমার গলায় ও বুকে তখন পুরোনো শ্লেষ্মা ঘর্ঘর ঘর্ঘর করছে, হঠাৎ সে কথা বলতে পারে না। অথচ কথা বলার চেষ্টা ছিল বলে ওই ঘর্ঘর ধ্বনি সম্ভবত খানিকটা শ্লেষ্মা তুলে আনে। বৃদ্ধা কথাটা মানতে পারে না। সে বিশ্বাস করে না। যদিও ট্রামলাইনের ধারে, রাস্তায়, কেউ কেউ তাকে সত্যিই ভিক্ষে করতে দেখেছে। রণর মা ও বোন এখন ঠিকে ঝির কাজ করছে। আর রণ যেন বুঝতে পারছে তারা ভিখিরি হচ্ছে, ক্রমে তারা ভিখিরি হয়ে যাবে। যেজন্যে তার চিৎকার। জ্বলন্ত খিদেয় সে বরং নিজের পাকস্থলী পুড়িয়ে ফেলবে। বস্তুত সদু ঘাবড়ে যেতে থাকে, গলুকে চেকারে ধরার বিপদ গৌণ হয়ে যায়। ভিন্ন এক ভয় ক্রমে স্ফীত ও পরিণত হয়ে উঠছে। অবোধ, ভয়ংকর। ক্যাওড়াপট্টির অশ্বত্থ গাছের মগডালে যেন সেই আতঙ্ক উলঙ্গ ঠ্যাং ঝুলিয়ে রেখেছে। মাঠকোঠায়, শুকনো পেয়ারাপাতার চোরা ঘূর্ণিতেও যেন ওই একই আতঙ্ক। এই আতঙ্ক চতুর্দিকে আগুনের বেড়াজাল। কোথাও আগুন জ্বলছিল। সেই দাহে যেন-বা অর্ধদগ্ধ নিষ্ক্রমণও আছে। মা কি ফিরে এসেছে? অন্ন কি জেনে গেছে সদু ইস্কুল পালায়? প্রায়ই ইস্কুল পালায়, কোথায় যেন পালায়! পালিয়ে গেলে কি এসব আর থাকবে না? দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি কিছুই থাকবে না?

সদু জানত না ওই পলায়ন আদতে নিষ্ক্রমণ। যেমন সে জানত না গলু কেন তার কাছে হিরোর মর্যাদা পেল। আজকাল কেমন এক রুক্ষ মেজাজ তার ভেতর জাল বুনে চলেছে। সদু বড়ো অনভিজ্ঞ। সে জানে না, কিছুই জানে না। কেবল জ্বালা করে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল রেললাইন, সিগন্যাল। যেখানে যত ঝুঁকি ও বিপদ, সেইসব জলাশয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্যে সে শূন্যে লাফিয়ে উঠতে চাইছে। তাতে যেন চূর্ণ হয়ে যাবে সমস্ত অন্ধকার, অজ্ঞান। প্রত্যক্ষ শারীরিক আচরণ ও অত্যাচারে সে যেন তা সম্ভবও করতে পারে। অনুতাপও আছে: গলুর সঙ্গে তারও কি ধরা পড়া উচিত ছিল না? কেন সে চলন্ত গাড়ি থেকে মারাত্মক লাফ দিয়েছিল?

কারখানার কাজে, ওভারটাইমে, অন্ন যত চাপা পড়ে যাচ্ছে, সদুর প্রকাশ যেন ততই প্রতিদিন বৈচিত্র্য ও দুঃসাহসে অত্যুজ্জ্বল, দ্যুতিময় হয়ে উঠছে। এক তো সে অভিভাবকহীন, ছত্রহীন দীর্ঘ সময় পেয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিপর্যস্ত থাকায়, ক্লান্তি থাকায়, অন্নকে সে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে দেখে না। বড়ো তাড়াতাড়ি অন্ন ঘুমিয়ে পড়ছে। আর ভারতবর্ষ বিষয়ে সদুর ভূগোলের ধাঁধাটিও এতে করে ক্রমশ তরল। গুহ্য রহস্য যা ছিল তারের ধাঁধার মতো, অবিরত নাড়াচাড়ায় সেই জট খুলে যাওয়ার বিস্ময় ও আনন্দ আছে তার।

এই ধাঁধায়, ভূগোলের পাঠে, সে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে সর্বদা দু-হাতওয়ালা কামিজের আকারে দেখেছে। কামিজটির বুক পকেটে বাংলাদেশ গচ্ছিত রয়েছে। ওই কামিজটা আবার সেঁটে দেওয়া হয়েছে পাঁচ নম্বর ফুটবলের গায়ে, ফুটবলটিতে কোনো লেস নেই। ভূগোলের একটি সূত্রে বলা হচ্ছে এই গোলকটি অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরছে। কিন্তু মানুষ কখনো ছিটকে পড়ছে না, এরকম তাজ্জব কাণ্ড আছে। এই আশ্চর্য ছাড়াও সদুর কাছে বিষয়টি ধাঁধার কেননা মানচিত্রের কোথাও সে সুলতান আলম স্ট্রিট খুঁজে পায়নি।

অথচ তার বিশ্বস্ত জ্ঞানে সুলতান আলম স্ট্রিট কি পুরো বাংলাদেশে কীলকের মতো প্রোথিত নয়?

সদু জানে, জেনে গেছে, ডানদিকে জলার ওপাশে গুলতি ছুঁড়লে সেই উধাও ঢিলের গতি থাকবে রেললাইনের দিকে, তারপর লাইন ছুটছে... ছুটছে... যাদবপুর... সোনারপুর... কালিকাপুর... চম্পাহাটি। সে এমনকি ইদানীং জেনেছে, মানচিত্রের ওই কামিজটি উড়োজাহাজে চেপে সংগ্রহ করা হয়েছে। আর একইভাবে জানা গেছে পৃথিবী ঈষৎ চাপা একটি কমলালেবু, বা নাসপাতি। সমস্যা হল সত্যিকারের পৃথিবী কি তা হলে কেবল আকাশ থেকেই দেখা যায়? অতদূর শূন্য ছাড়া কি কিছুই দেখা যায় না?

রণদের বাড়ি অতিক্রম করতে তার তেমন সময় লাগে না। ক্ষেমির মুখোমুখি হয়ে নিদারুণ সত্য জানিয়ে দেয় : গলুকে চেকারে ধরেছে। প্রত্যুত্তরে ক্ষেমি তার মাথায়, অবিন্যস্ত চুলে হাত বোলায়। এমন চুপ থাকে যেন বিষয়টার কোনো গুরুত্ব নেই। যেন ওই তথ্য তার না জানলেও চলত। ফলে সদুকে আবার জানাতে হয়। এতে ক্ষেমি গলুকে উদ্দেশ করে প্রশ্রয়ের সুরেই বলে যায় : হবে না... য্যামুন গ্যাচে... বড্ড তেল হয়েচেলো... ওর শিক্ষে হওয়া দরকার... আসুগগে অ্যাকুন জেল খেটে...

এবং হেসে ফেলে। গলুর দৌরাত্ম্যের গপ্প বলে চলে, 'জম্মে থেকে ওর ওইরম ধারা'...। এতে প্রকাশ পায় গলুর ধরা পড়ায় ক্ষেমি খুশি, সে যেন এই ঘটনায় গলুর সাবালকত্ব দেখতে পাচ্ছে; গলু তার বয়স ও প্রকৃতি অনুযায়ী অত্যন্ত স্বাভাবিক, অথচ এক দুঃসাধ্য কাজে লেগে গেছে। ক্ষেমি আরও বলে, 'তুমি ওর সঙ্গে মিশোনি বাবা, ও একটা নচ্ছার... মা-বোন ভাবছে, এব্‌রে বাড়ি যাও।' এই কথায় হয়তো বা নির্যাতন ছিল, ছিল সদু সম্পর্কে সস্নেহ তিরস্কার। গলুর কাছে, গলুর তুলনায়, তাকে খাটো দেখায়। ফলে, সদুর মনে হয় ট্রেনের কামরা থেকে ওই ভয়ংকর লাফ দেওয়াই তার স্খলন ও পরাজয়ের মূল কারণ।

অন্ন হয়তো এখনও ফেরেনি। সদু দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করে, না হলে তার কীর্তিকলাপ সরি ফাঁস করে দেবে। এমনিতে সরির কাছে সে কল্‌জের অংশবিশেষ, কিন্তু এসব ব্যাপারে সদুর মঙ্গলামঙ্গল জড়িত, দূরদর্শী সরি এসব ক্ষেত্রে বড়ডো শক্ত। তখন আর মায়া-ফায়া থাকে না। এই তো সেদিন অন্ন আসতেই— জানো মা সদু না আইজ ইস্কুল পলাইয়া...। তালপাতার আস্ত একটা পাখা সেদিন সদুর পিঠে ফর্দাফাই হল। আর দুঃখের গাজনের সূত্রপাত, 'আমার কপালে সুখ ল্যাখে নাই—।' তখন সরির মুখে চিবুকে ক্রমে নীল মেঘ স্তূপীকৃত, অন্নর পায়ের নখ খুঁটে সে ময়লা তুলে যাচ্ছে। সরির তখন এইসব স্বগতোক্তি : না বলেই বা কী করব? সদুর তো একটা ভবিষ্যৎ আছে?

আর এখন, এক পলক মাকে দেখেই সটান খাটের কাছে চলে যায়, নিশ্চুপে। কিছুটা সিঁটিয়ে ছিল সে, যেহেতু ভবিষ্যৎ জানত না। অথচ অন্ন আজ বকাঝকা করল না, আজ সে বড়োই প্রসন্ন। এমনকি গুনগুনিয়ে সে দেহতত্ত্বের একটা গান গেয়ে যেতে থাকে। সদু হাত-পা ধুয়ে এসে দেখে সরি এক কোণে বেজায় আলগা হয়ে পড়ে আছে, চোখ দুটো খোলা কিন্তু কিছুই নজর করছে না। অন্নর গলায় যখন শব্দ তরল ও মসৃণভাবে গড়াচ্ছে: ল, এই

সন্দেশখান খাইয়া ল— বুঝলি সদু, দিদির বিয়া ঠিক হইয়া গেছে...। সদু অন্নর কথাটাকে শেষ করার ফুরসত না দিয়ে সরির হাত ধরে টানতে থাকে : হ্যাঁরে দিদি! তোর বিয়ে?

চুপ কর।

দই রসগোল্লা হবে!

চুপ কর।

বল না?

চুপ কর সদু!

সশব্দে সদুর গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়ে দেয় সরি : চুপ কর! এতে কর্কশ আদেশ ছিল, সদু অমান্য করতে পারে না।

হারামজাদির জ্যাদ কত! আমি ভাবতাছি কোথায় ভাত-কাপড়ের কষ্ট ঘুচল আর উনি কাইন্দাই কূল পান না—

সরি এক কোণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, তখন সে প্রার্থনা করছে একটি কঠিন আচ্ছাদন। যেখানে সে স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে, আত্মগোপন করতে পারে। কী এক ভীতি সশব্দে হামলে পড়ছে সরির ওপর, যেজন্যে তার শরীরের ওই ভঙ্গি— হাঁটু দুটো টেনে নিয়েছে নত মুখ, ফলে তার বুকও আচ্ছাদিত। তার শরীর তখন নির্ভেজাল ভীতি, আতঙ্ক। অন্ন উঠে যেতেই সদু দিদির কাছে সরে আসে, চোখে অপার জিজ্ঞাসা, আর একই ভীতি।

সত্যি!

কী?

তোর বিয়ে হয়ে যাবে?

জানি না।

বল না?

সদুর এই জিজ্ঞাসায় আর উচ্ছ্বাস নেই বরং সে যেন নেতিবাচক উত্তরই চাইছিল। যেন-বা সে হঠাৎ টের পেয়েছে সরির আতঙ্কের মূল ও কাণ্ড। দিব্য চোখে প্রত্যক্ষ করছে যাবতীয় বিষণ্ণতা এবং নিঃসন্দিগ্ধ যে দিদির বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

বিয়ে দিলে আমি মরে যাব— দেখিস— দেখিস—

সদুর ক্ষমতা ছিল না আর এই নির্যাতন ধারণের। কারণ সে কিছু না হলেও এই আদত সত্যটিতে বিপদগ্রস্ত। আশৈশব যেখানে যতটুকু স্মৃতি ও কল্পনা আছে সর্বত্র সরির রুখো চুল উড়ছে তো উড়ছেই। 'মার মতো আমিও তো কাম নিতে পারি', সরি নিজের সম্পর্কে ভাবনার এই কথাটুকু বলে। তা হলে ভাত-কাপড়ের তেমন সমস্যা হবে না, সরি জানে, সঙ্গে-সঙ্গে সে তো জানে অন্নর আশঙ্কা আরও কত গভীর! অন্ন কত দূরদর্শী। কাজেই তাদের এই একাগ্র আলাপে সদু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ঘোষণা করে, 'তোকে বিয়ে করতে হবে না।' সরি জানে তা কত ভঙ্গুর, অপরিণত। সদু যদিও একটানা বলে যেতে থাকে তার বড়ো হওয়ার গল্প, যে গল্পটি সে নিজেই বানিয়েছে, যে-গল্পে সরি আনন্দিত হয়ে ওঠে, অথচ গল্পের সঙ্গে সদুর দৈনন্দিন কার্যাবলীর, বিশেষত ইস্কুল পালানোর বৈরিতা আছে। সরল

বিশ্বাসে সদু সেই গল্প বলে চলে, দেখিস না, আমি লেখাপড়া শিখে চাকরি নিই তার পর—

পাক্কা দেড়মাস পরে গলু ছাড়া পেল। দিন কতক শ্যাম খুব দৌড়োদৌড়ি করেছিল, তার পর ক্যাওড়াপাড়ার স্থায়ী রীতিতে আল্লার নামে ছেড়ে দিয়েছে। জানে বেঁচে থাকলে একদিন-না-একদিন ঠিক ফিরে আসবে। আসেও, দুটো পয়সা কামাতে জোয়ান বয়সে কেউ-না-কেউ এরকম হাপিশ হয়েছে আগেও, আর একসময় তাঁরা চাট্টি মনিহারি দ্রব্য সমেত ফিরে তামাম পাড়ায় হাল্লা জাগিয়েছে। হয়তো ওই মানুষটার কথা সরল ও বিবাগী এই পাড়া ভুলতে বসেছিল তদ্দিনে, ততোদিনে নিজস্ব ঝঞ্ঝাট ও সঙ্কটে তারা ভুলে গিয়েছিল ওই ব্যক্তির তাবৎ স্মৃতি। মাত্র দেড়মাসে গলুকে কেন্দ্র করে ক্যাওড়াপাড়ার সেই অভ্যস্ত উদাসীনতা এসে গেছে। এমনকি সদুর অপরাধবোধও বেশ ফিকে হয়ে এসেছিল, যদিও নির্বান্ধব সে ভারী পা ফেলে হাঁটাচলা এবং নিয়মিত ইস্কুলে হাজিরা দেওয়া ইত্যাদিতে কেমন নিস্তেজ। তখন হঠাৎ... একমাথা চুল, খুশকি আর চুলকানি নিয়ে গলু ফিরে আসে সদুর শান্ত ক্রমিক বড়ো হওয়ার কুসুম-কণ্টক বিন্যস্ত অধ্যায়ে শনিগ্রহরূপে অন্ন যাকে গণ্য করে থাকে, নির্দয় শাপান্তে অন্ন যাকে খল ও অশুভ বলে চিহ্নিত করেছে : 'সদু অর লগে যদি আর একদিনও দ্যাখছি...' তারপর সে বর্ণনায় তুলে ধরত দুটি জীবন-চিত্র : গলুর জন্যে কল্পিত, অবশ্যম্ভাবী, সেই চিত্র বড়ো নিষ্করুণ, তাতে কঠিনতম মেহনত থেকে করুণ ভিক্ষাবৃত্তি, এমনকি চুরিচামারির কথাও বাদ যেত না। ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সদু ওই চিত্রটিকে ধিক্কার দিতে পারেনি অন্নর মুখোমুখি। নির্দয় ও ভয়ংকর ভবিষ্যৎ তখন সদুকেই আশ্লেষে টেনে নেবে বলে নয়, আসলে সদুও টের পায় গলুর ললাটে কালো মেঘ, মেঘপুঞ্জ। তা ছাড়া সত্যিই তো গলু লেখাপড়া করে না। আর এই লেখাপড়ার ব্যাপারটাই সমস্ত সুখের মূল, প্রধান শিকড়। আতঙ্কে ও সংস্কারে সদুর চেতনায় ওই শিকড় প্রবিষ্ট। এত গভীরে চলে যাচ্ছে এই পীড়ন যে সে বাৎসরিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আরামপ্রদ, নিশ্চিত ঘুম থেকে বঞ্চিত করেছে নিজেকে, অন্তত একটি রাত। এই বঞ্চনায় মস্তিষ্কে বিচিত্র রসের ক্ষরণ হয়েছে আগামী সচ্ছলতার নিশ্চয়তা ছিল ওই রসে। ক্রমে এই বিশ্বাস আসছিল, সে নিজেকে বিভক্ত করে নিতে পারছে। এক দিকে আছে তার দৌরাত্ম্য, দুর্বার গতি ও উচ্ছ্বাস, যাতে সে মুক্ত, আনন্দিত। অন্যদিকে টপাটপ বাৎসরিক অগ্রসর, মসৃণ ও সুনিশ্চিত প্রশংসা, ইচ্ছাপূরণ ও অস্পষ্ট আরও সুখ।

গলু ফিরে আসে থুতনির ওপর লম্বা একটা কাঁটা দাগ নিয়ে, 'লপ্‌সি খেতুম বুঝলি...।' গলু আরও অনেক কথা বলে, মামলা, আইন-আদালত, পুলিশের গন্ধ, লাঠি ও হাজতের পেচ্ছাপস্রোত। গলুর তিনদিনের মধ্যে ছাড়া পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জি আর পি কেস খাইয়ে দিল। সে তখন জি আর পি কেসের গল্প সোৎসাহে বলে চলে; বীরত্ব, অভিযান, রোমাঞ্চ ইত্যাদি গোপন থাকে না। গলু তখন মহান।

কালিকাপুর লাইনে ওয়াগন-ব্রেকারদের সঙ্গে জি আর পি দারোগার সাট্টিল আছে... মালগাড়ি লুঠের মামলায় গলুকে খামকা জড়িয়ে দিয়েছিল। ওর চোখের সামনে এক মস্তান পেচ্ছাপের মামলা লিখিয়ে পাঁচ টাকা ফাইন দিয়ে খালাস পেয়েছে। এই বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে গলু সদুকে

কারখানার শেডের তলা দিয়ে খানা, ডোবা আর জলা মাঠের দিকে প্রসন্ন মেজাজে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

একসময় সন্ধে উতরে যায়, গলুর নাকের সামনে তখন নীল জোনাক-পোকা। খপ্ করে গলু পোকাটাকে ধরে ফেলল। আর হঠাৎ নিষ্ঠুরতা চড়াও হয় গলুর শরীরে। পোকাটাকে শেষ করে ফেললে থুতনির কাটা দাগ ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে।

ফেলে পালালি কেন সেদিন?

বাহ্! কখন!

ন্যাকা!

গলু!

দেখাচ্ছি...

এই দুই কিশোরের সামনে গর্ত ছিল। অন্ধকার ছিল। আর গলুর শরীরে তখন বিদ্যুৎ-স্রোত। সে মুখখারাপ করে। 'ভেড়ুয়া' শব্দটি বমনের বেগে, তীব্রতায় সদুর মুখে নিক্ষেপ করে। এবং একটি হ্যাঁচকা টান, ফলে দুজনই সেই গর্তে, খোদলে গড়িয়ে পড়ে। গলুর দু-চোখে তখন সাদা ডবল পয়সার চাকচিক্য, থুতনির কাটা দাগে ঝিলিক : শ্‌শালা! সদুর ঠোঁটের কষ নোনতা, সঙ্গেসঙ্গে শরীরে উত্তাপ এসে যাচ্ছে, উত্তাপে-উত্তাপে শরীর নস্যাৎ করে দিচ্ছে ভয়। প্রতিআক্রমণও রচিত। আর এত সবে সদুর মুখ জমাট নীল। কাহিল হতে-হতে হিক্কা এসে গেছে: নন্‌না...। গলু তখন সদুর কাঁধে বসিয়ে দিয়েছে, একটি থাবা, শিরায় বাহিত শক্তি সেখানে প্রবল আকর্ষণ রাখে : ননীর পুতুল।

তখন তরঙ্গ-স্রোতে সদুর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথম লড়াইয়ের বিচিত্র স্বাদ। লড়বে এমন সিদ্ধান্ত ছিল না, সবটাই স্বয়ংক্রিয় বলে এখনও কাঁপছে। এখন আর ভীতি নেই, আর ভীতি নেই, আর কোনো ভীতি নেই। তারা গর্ত ছেড়ে উঠে আসে, যেন-বা ভয় সেখানে মাটির ডেলার গুঁড়োয় চূর্ণিত। গর্ত। ফলে আনন্দ ও ক্লান্তি। জোরে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে।

কারখানার লম্বা টানা শেডের গায়ে, ন্যাড়া মাঠের বিশাল শূন্যতার ভেতর ওদের থ্যাবড়া ছায়া। দু-জোড়া হাত সশব্দে ঝেড়ে ফেলছে ধুলো। ওই শব্দের প্রতিধ্বনি থাকে।

হঠাৎ-ই গলু প্রসঙ্গ বদলে ফেলল : শুনেছিস।

কী?

সামনের মাসে কারখানা চালু হবে।

কে বলল?

কে আবার কানাইদা, ও-ই তো সব ঢোকাবে... এখন থেকে লিস্টি বানাচ্ছে...

লিস্টি?

হ্যাঁ মাথাপিছু কুড়ি টাকা... কুড়িটা টাকা ছাড়লেই লিস্টিতে নাম উঠে যাবে।

কানাইদার কথা মালিক শুনবে কেন?

মালিকের বাপ শুনবে. ভোটে দাঁড়াবে বুঝলি... কারখানা চালু হলেই শালা ঢুকে যাব...

কেন?

কেন আবার, কে শালা বসিয়ে খাওয়াবে... ভালো লাগছে না, ফালতু পাখি মেরে...!

যাহ্!

হ্যাঁ।

অন্ধকার এবার সম্পূর্ণ গিলে ফেলে তাদের, শীত-শিশির নেমে আসছে সমগ্র তল্লাট জুড়ে, সদুর কাঁধের ওপর গলুর সেই থাবাটি তখন ক্রমে ঢিলে হচ্ছে...

অ্যাও দিন যাবে
খ্যাড় দিয়া যে চুল বান্ধে
সে-ও ভাতার পাবে।।

পশ্চিম-দেওয়ালে অন্ধকার বোনা ছিল। আর একটি পুরোনো ছবি। ছবিটা দীর্ঘকাল ঝুলছে বলে ওই ছবি আর দেওয়াল একাকার, ফলে ছবিটির কথা সবাই বিস্মৃত। পেটের তলায় জমানো তুলো সমেত স্থবির মাকড়শা নিষ্ঠার সঙ্গে ছবিটির পাহারাদারি করে। ক্রমাগত মন্থর বুননে সেখানে সূক্ষ্ম তন্তুজাল। অজস্র রেখা অন্ধকারের অবলম্বন। ফলে ছবির দুটি মুখ কেমন খণ্ডখণ্ড। জালটি ছেঁড়া, সুতো উড়ছে, ধুলোও জমেছে। এসবে প্রাচীন গন্ধ, যেন অন্ন তার ট্র্যাঙ্কটি খুলেছে, যেন খাটের তলা থেকে টেনে বের করা হচ্ছে কাঁসার বাসন। ফলে মায়া, গভীর মায়া। পুরোনো কামিজ সমেত ছবির সেই মানুষ হেঁটে আসছে : 'যে-মানুষ নিয়া ঘর করছি দিদি... মাঝরাত্তিরে ইলশা মাছ নিয়া উপস্থিত... সদু তখন প্যাটে... সাতমাস, ঘুমে চক্ষু বুইজা আসতাছে, একটা শব্দ করতে পারি নাই...'

সবুজ রেলগাড়ির সঙ্গে কত মোহ যে ভেঙে গেছে! এখন ছবির জটিল রেখা, ধুলো তন্তুজাল সবই সদু অতিক্রম করে যাচ্ছে। তার স্থির চোখ নিক্ষেপ করছে অজস্র শর, শর ছুটে যাচ্ছে ধোঁয়া-ধোঁয়া অতীতে, স্মৃতি বিদ্ধ করছে। সে উদ্ধার করতে পারছে বাবার বিনষ্ট মুখ, অঙ্গ সংস্থান বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়দের স্মৃতিপীড়িত উচ্চারণ, (এক্কেরে কালারে বসাইয়া রাখছে জ্যান...) সদু যাচাই করে নিতে চাইছে বলে বিব্রত : সে কি তার বাবার মতো? হুবহু? সদুকে তার বাবার মতো দেখতে এতে সবাই খুশি হয় কেন?

সরি ও সদুর পিতৃদেবের কথা, স্মৃতি ও কাহিনি অন্নর বিচ্ছিন্ন সংলাপে কয়েকবার এসেছে। সেইসব সংলাপে সময়ের মাত্রা ছিল, ঘটনা পারম্পর্য ছিল মিহি, রেশমি সুতোর গ্রন্থনায়, ওই সুতোটিই বিরহ। আর ঘটনাবৈচিত্র্য এক বৈভব। তাতে সুখ, স্পর্শ। তখন সমস্ত দৃশ্য, কল্পনা ওই স্মৃতির অনুষঙ্গ পেতে থাকে। ধূসর সেই কাচ চোখের সামনে রেখে তারা চার পাশ দেখে যাচ্ছে। দিন কতক আগেও চনুর মার চৌকাঠের গোড়ায় অন্নর স্থায়ী মূর্তি উবু হয়ে থাকত। চনুর মা শব্দ করে পান চিবোতে-চিবোতে পিক কেটে বলত : 'অত ভাববেন না অন্নদি... মাইয়া কি আপনের জলে পড়ছে... খামকা দোজবরে মাইয়া দেবেন ক্যান...'

সেই শররাজি তখন ছবির মুখ থেকে এক একটি বিশেষ লক্ষণ নির্বাচন করে নিচ্ছে : সে কি তার বাবার মতো? এই অন্বেষণের প্রান্তে পৌঁছলে, সাকুল্যে ছবির মেজাজটি ধরতে সক্ষম হয় : অন্ন চেয়ারে সমর্পিতা, বসে আছে, আর চেয়ারের হাতলে বাম উরু রেখে লোকটির ডান পা স্পর্শ করেছে ভূমি, বাঁ হাতের আবেষ্টনে সে যতটা শূন্যতা ধারণ করেছিল, সেখানে, সেই অর্ধবৃত্তে, অন্ন প্রোথিত। হাতলে উরু স্থাপন করে লোকটি প্রসন্নতাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

আদতে বাবার আর কোনো ছবি না থাকায়, ভদ্রলোকের স্মৃতিও অনুপস্থিত বলে, ওই মেজাজটিই সদুর কাছে বাবার একমাত্র ও চূড়ান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থিত। এখন লোকটির এহেন মুখ ও শারীরিক আচরণ বেজায় গোলমেলে। কারণ মানুষটি অ্যানার্কিস্ট ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বীরত্বব্যাঞ্জক গল্প ও ত্যাগের বৃত্তান্ত আছে। এমনকি সেইসব স্মৃতি, ঘটনাবৈচিত্র্যে বন্দুক-স্ফোটনও থাকায় ওই হাসি অনুচিত। নকশা-তোলা শালটি বেমানান।

ধূলিধূসর, মাকড়সার মায়াজাল সমেত ছবিটি অন্ন নামিয়ে এনেছে। সে তার আঁচল ছবিটির ওপর প্রলেপের মতো ব্যবহার করছে : তর বাবার টি বি হইছিল, কইস না জানি!

এই বাক্যে ছবিটি বিদীর্ণ। অন্ন, মামুলি সেই নারী কাঠ-বোর্ডের ফ্রেমটি ফাটিয়ে চলে এসেছে মাঠকোঠার গেরস্থালিতে আর ব্রিটিশের খিলাপে পিস্তলধারী ব্যক্তি, অজস্র কিংবদন্তী যার পদতলে, নক্ষত্রলোকের সেই অবিশ্বাস্য মানুষ, যাঁর মাথার পেছনে সাদা গোলাকার জ্যোতি থাকার কথা, তাকে বড়ো নিষ্প্রভ লাগে। যেন বাস্তবে ব্রিটিশসিংহের বিরুদ্ধে যা-কিছু সংগ্রাম, সবই অন্নর অকাতর পরিশ্রম ও ক্ষিপ্রগতি মাত্র। ওই লোকটি কুশের পুতুল, অন্নই ওইসব গুণাবলি ছবির মানুষটিতে অর্পণ করেছে। না-হলে ওই ব্যক্তি নগণ্য। এই সত্য আরও বিশ্বাস্য ঠেকে যখন অন্ন অতীতগৌরব বলে যায় নিস্পৃহ, অথচ সাবলীল। তার সেই বাচনভঙ্গিতে ইতিহাস বড়ো নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তি অন্নকে ওই ইতিহাস থেকে চ্যুত করার সমস্ত দক্ষতা করায়ত্ত। এখন সে যেমন সরিকে বলল, 'তর বাবার টি বি হইছিল কইস না জানি...।' এরপর আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না। সেই মহাপুরুষ সদুর চোখে তখন করুণ, লোকটির জন্যে তার মায়া থাকে। আক্রান্ত ফুসফুসই সত্যের প্রতীক। যেন এটুকুই সত্য।

অন্ন সরিকে টেনে নিয়ে গেছে ন্যাড়া পেয়ারাগাছ তলায়। সেখানে হাড়গিলে ছায়ায় রচিত আছে জ্যামিতিক আকার। তাদের শরীরে এখন রোদ, তাদের শরীরে এখন ছায়া। রোদ প্রলম্বিত বলে অন্নর শরীর বিছিয়ে দিয়েছে দীর্ঘ ছায়া : 'রঙও করছোস একখান, বাবাহ্!' আর সে এককুচো সাবান ঘষে যাচ্ছে সরির ঘাড় ও চিবুকে, গলা ও মুখে : 'চক্ষু বন্ধ কর!' সরি তখন সেই ক্ষারযুক্ত সাবানফেনায় বিসর্জন দিচ্ছে তার দৃষ্টিশক্তি। তার চোখে তখন জ্বালা। সরির আর্ত চিৎকার, 'মাইরা ফ্যালাবা নাকি?' অন্ন তখন ক্রমাগত ঘর্ষণে সরির চামড়ার পরত থেকে একটি জ্যোতির্ময় বর্ণ পেতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওই বর্ণই মঙ্গল, যা দুধে-আলতায়, কাঁচা-হলুদে। সরির আর্ত ধ্বনি অন্নকে বিশেষ বিচলিত করে না। সে তখন বড়ই আহ্লাদিত।

হ, মারুম!

এখানে, সদুর নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল, সে তড়িৎগতি পায় : কেন?

সদুর এই কথায় প্রতিবাদ ও ক্রোধ ছাপিয়ে অন্য কিছু ছিল, বড়ো মজবুত ও নির্ভরযোগ্য কিছু। ফলে অন্নর মজা লাগে, চকিতে সে ভেবে ফেলে সদুকে কতটা গুরুত্ব দেবে। আর এই ভাবনায় আনন্দ, অন্ন তখন ক্রীড়াময় : বেশ করুম, আমি তো তগো শত্তুর! তার পর মুখের খাঁজে আর গোপন থাকে না হাস্যরেখা এবং সরি ফিরে বসে, 'পিঠটা ডইলা দাও।'

রোদ মরছিল। সরির ঘাড় ও চুলের ভেতর থেকে গোপন মালিন্য অতর্কিতে শূন্যস্পর্শ করে। ঠুনঠুন শব্দে ও তরঙ্গে সন্ধ্যা তখন সদুদের মাঠকোঠার কাদা মাটিতে নেমে এসেছে

ধোঁয়া-গন্ধে। সেই ধোঁয়ায়, গন্ধে, মাটিতে, রিকশার হাতলের সিংহ নখ বিঁধে গেল নিঃশব্দে। তার আগে পরে ঘণ্টাধ্বনি ছিল। চনুর মা চাপা উচ্চারণ করে : 'অন্নদি।' অন্ন সাদা থান টেনে টেনে আনে কপাল পর্যন্ত : আসছে। ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ গতি তখন চড়াও হয় তাদের ওপর। ভাড়া নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি। সেসবই দরজার ওপাশে। একটি কর্কশস্বর প্রাধান্য পাচ্ছে। এই বিবাদ অন্নকে সময় দিলেও তার বিরক্তি গোপন থাকে না। যদিও এক সময় পাল্লাটি টেনে তাকে বলতে হয় : আসেন!

সমস্ত দিন যে-আহ্লাদে অন্ন পালক-সদৃশ, হাস্যোচ্ছ্বল, তারই ঘণ্টাধ্বনি ছিল রিকশাওয়ালার মুঠোয়, তিন আরোহীর অবতরণে। মাথা নিচু করে তারা সদুদের চালায় ঢোকে, সদুকে ছুটতে হয় মিষ্টির দোকানে। ডবল সন্দেশ একসঙ্গে গালে ফেলে একজন, তার নীল জড়ুল ও জড়ুলের পাতলা লোমে জিজ্ঞাসা : মাইয়া কাম জানে নি? আমগো আবার ভ্যাশাল সংসার... দুইবেলা বিশখান পাত... পারব নি?

শুরুতে অন্ন কুণ্ঠিত, সে প্রত্যক্ষ করছে সরির ঘর্মাক্ত মুখ ও সাংসারিক চাপ। অন্নর গলায় সেই চাপ শুরুতে শুরুতে বিদ্ধ থাকে সূক্ষ্ম কাঁটায়। পরে সে সামলায় এই স্নেহ। কাণ্ডজ্ঞান তাকে মুক্ত করে, উদ্ধার করে, সেই তুলোর স্তূপ থেকে। গড়গড়িয়ে এমন বলে যায় যেন ওইসব কথা বহুবার শোনা ও বলায় তা অভ্যাসে নিয়ে এসেছে, যেন পশ্চাদ্গামী স্মৃতি বিসর্জনে সে সক্ষম, ওই স্মৃতি তাকে তিরিশটি বছর পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক লাফে। সেখানে অন্ন নামে এক কিশোরী বিশজন মানুষের ভাতের হাঁড়িটি নামাতে শরীরে জলস্রোত এনে ফেলছে। হাঁড়ির সব ফ্যান তার পায়ের পাতা পুড়িয়ে, ছ্যাঁদা করে, আগুন রক্তে মিশে যাচ্ছে। রক্তে ফ্যান, ফ্যানের গন্ধ। আর্ত ধ্বনি উঠে আসছিল শাড়ি, সায়া, ঝুল অন্ধকার আর তামাকের গন্ধ ঠেলে। সেই ধ্বনি এখন বড়ই সুদূর, সেই ধ্বনির কোনো স্মৃতিও নেই : 'দ্যাখেন মাইয়া আমার অবাধ্য না... পুলাপান মানুষ য্যামুন ইচ্ছা গইড়া লইবেন... শিখাইয়া লইলে পারব না হেন কাম নাই... বিধবার সন্তান সুখ-আহ্লাদে তো বড়ো হয় নাই, পারব না ক্যান...।'

তখন জড়ুলটি নড়ে। ডবল সন্দেশ আয়ত্ত করতে বেগ থাকে বলে মৌন। কেবল ঘাড় কাত করায় বোঝা যায় তারা এরকমই একটি পাত্রীর খোঁজ করছিল। সদ্‌বংশজাত, দরিদ্র, পরিশ্রমী ও বাধ্য একটি মেয়ে, যে সহাস্য থাকতে পারবে। অনন্তকাল। পাত্রপক্ষের সেই মামার চোখ দুটি এসব কথা বলে চলে। অন্নকে নিরস্ত করে ইঙ্গিতে, হাতের একটি মুদ্রায় ওই ইঙ্গিত থাকে। মামা জল খান। সন্দেশচূর্ণ তলিয়ে যাচ্ছে। গ্লাসের খানিকটা জল মাটিতে ঢেলে দিলেন। তাতে সদু আশ্চর্য, 'যাহ বাবাহ।'

অন্ন তখন বিদ্যুৎখেলায় : 'সরি জলের উপর দিয়া হাঁট... হাঁইটা যা...'

মাটিতে সরির পদচিহ্ন।

সরি হেঁটে যায় দু-চার পা, কিন্তু জল শুকিয়ে যাওয়ায় কোনো ছাপ থাকে না, সরি থাকে না। তিনজনের একজন, সম্ভবত পাত্রের মা, সেই পদচিহ্ন দেখে বলে : মনে হয় খড়ম পাও... জড়ুলটি স্পষ্ট অস্বীকার করে : নাহ্... কী যে দ্যাখোস...!

এক সপ্তাহের ব্যবধানে তারা ফিরে এসেছে, এবার তাদের সঙ্গে সেই জড়ুলটি নেই, ওই জড়ুলটি বোধ হয় কেবল পাত্রী-নির্বাচনেই দক্ষ। জড়ুলের পরিবর্তে তারা এবার একটি খর জিভ এনেছে 'লন দেহি একহান রূপার টাহা...।' এই নির্দেশ অন্নর প্রতি। অন্ন মাথার ওপর ব্যান্ডেজের উপমায় যে থানটি ছিল তা আরও টেনে দেয়। সরির কোনো ভূমিকা নেই। সে তার হালকা শরীর, সাবান-ঘষা খসখসে হাত, মুখ আর কণ্ঠনালীতে দবদব নীল শিরা ইত্যাদি সমেত কোথাও আত্মগোপন করেছে। অন্ন তখন মত্ত। সে খোঁজ-তালাশ চালিয়ে যাচ্ছে, কোথায় রুপোর একটি টাকা পাওয়া যায়। ত্রাতা চনুর মা তখন চাপা স্বরে আহ্বান রাখে : 'অন্নদি।' গোল টাকাটায় তেল-সিঁদুর মাখানো হয়। ফরফর করে সদুর অঙ্কখাতা, একটি পাতা ছিঁড়েছে অন্ন। আর নিঃশব্দে কাগজে লাফিয়ে পড়ে রাজার কাটা মুণ্ডু তখন খর-জিভে শব্দ নাচে : তাইলে ওই ১০ই ফাল্গুনই ধাইর্য...।

অন্ন সাদা থানটি আর একটু টেনে দেয়। শরীরে, পানসে এনামেল দাঁতে সামলাতে পারে না জটিল হাসির আবর্ত। ফলে মাথার ওপর থেকে শ্বেতছত্রটি খসে যায়। সাকুল্যে বিবাহের এই উদ্‌যোগ পুনরাবৃত্তি মাত্র, সরি যেন আদতে অন্ন, অন্ন যেন সরি, অন্ন সরি হয়ে যাচ্ছে। তার আচরণে সেই কুণ্ঠা, সংকোচ, লজ্জা ও ভয়। ভয় হয়।

চনুদের ঘরে, এক কোণে, সরি তার অস্তিত্ব গোপন করার চেষ্টায় জড়ো হয়ে ছিল। সেখানে বেড়ালের লোম, পেচ্ছাপ, ছেঁড়া লেপের তুলো আর কয়েকটা তোরঙ্গ আছে। সে অযৌক্তিক ভয় পেয়েছিল, সরির মুখে জোলো ভাব, চোখ দুটো কেবল সাদা জমির বিস্তার, নাসাপুট সূক্ষ্ম খাঁজ সমেত কাঁপছিল।

সরির খোঁজ-তালাশ শুরু হয়। চনুর মা তাকে এনে দাঁড় করায়, যা ঠিক দাঁড়ানো নয়, কলাগাছের সাদৃশ্যে সে ক্রমেই নত। আরও নত। অন্নর খাদ্যনালী থেকে জারিত অম্ল ও অন্ধকার উঠে আসে গুটিকয় শব্দে : 'আশীর্বাদ করেন যেন সুখী হয়...

কাগজের ফালিতে সেই পুরোনো টাকার রাজকীয় মুণ্ডুর ওপরে মুকুট। সমস্তটাই সিঁদুর-চর্চিত হওয়ায় ওই মূর্তি বিমূর্ত, তাতে এমনকি দেবত্ব থাকে। পরিবেশ আয়ত্ত করে নিচ্ছে নিদারুণ ধর্মীয় গাম্ভীর্য, অন্ন নতজানু। অন্নকে হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়তে হয় দ্রুত বসার জন্যে, কাগজে খসখস শব্দ, কাগজ থেকে উঠে যাচ্ছে সূক্ষ্ম আঁশ :

ফরিদপুর নিবাসী... কুলীনকুল সর্বস্য... কন্যা সুলক্ষণা সরস্বতীর সহিত পাবনা... কনিষ্ঠ পুত্র বাবাজীবন কালাচাঁদের শুভ পরিণয় ১০ই ফাল্গুন ধার্য হইল... উভয় পক্ষের মতানুসারে নিম্নোক্ত দ্রব্য দানস্বরূপ কন্যাপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইবে...

নগদ— ৫০০৲

সোনা— ৩৷৷০ ভরি

বিছানা— ১ প্রস্থ

বাসনকোসন— ১ প্রস্থ

সরির চোখ তখন পারদ-বিন্দু, গড়াচ্ছে দেওয়ালে, থামে ও সেই জটিল ছবিতে।

লালমুখো সাহেবটা বেপাত্তা হয়ে গেছে।

এরকম একটা প্রচার ছিল, মাঝে-মাঝেই এরকম প্রচার হত। ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উর্ধে সেই প্রচার যতটা না রহস্য ধারণ করত তার থেকে অনেক বেশি কৌতুক ও আলস্য ছিল। আদতে সাহেবটি আরও কয়েকজন বাঙালি-গুজরাতি সাহেবের সঙ্গে, বা কখনো একাই কাজের তাগাদায় আসত। ক্যাওড়াপাড়ার নিজস্ব ব্যাধিই এ ধরনের চিন্তার উৎস, যা আবার কোনো চিন্তা নয়। চিন্তার উর্ধে এক ধরনের সত্যকথন; যেমন : এক জেবনে গোরা তো আর কম দেখিনি... সাহেব না ছাই... দো আঁশলা...। ক্ষেমি সবই জানে, যেহেতু সে অনেককাল যাবৎ এক দীর্ঘ বাঁচা বাঁচছে। সুতরাং ক্ষেমি জানে। ক্ষেমি সাহেবের রং বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে তার গায়ের রং ও মুখের রঙের ফারাকটা এবং ক্ষেমি আর একটি সত্য কথা বলবে বলে প্রায় প্রস্তুত। তখন কোনো কালো মেয়েছেলের গল্প বলে ক্ষেমি, সেই গল্পেও সাহেব থাকে, আর সবই তার চোখে দেখা। সাহেব প্রসঙ্গ অচিরাৎ কেচ্ছা রস হয়ে যায়, অপোগণ্ড বালকের দলেও সেই রস সংক্রামিত বলে তারা সাহেবের পেছনে দুদ্দার ছোটে : 'টমেটম... টমে... টম...'।

সাহেবটি সম্প্রতি বেপাত্তা হলেও, জানা-ই যে সে আসবে। টিন, সিমেন্ট, সুরকি, লোহার বিম, শ্রম-লাঘবের গীতে ও উর্ধগামী চিমনিতে সেই ইঙ্গিত। আবার সে-সবই সাহেবটির জাঁক বলে গৃহীত। মানুষ যে তার কথা ভুলছে, ভুলতে চাইছে, এর মধ্যে আছে ওই চিমনি ও জ্যামিতিক আকারে আবদ্ধ কয়েকটি পাইপ, ট্যাঙ্ক ও নানাবিধ যন্ত্র। যন্ত্র-জাল। এই স্থাপত্যের প্রবেশপথ উজ্জ্বল করেছে চড়া রঙে লেখা সাইনবোর্ডটি : নিউ ইন্ডিয়া টুলস। হয়তো কোম্পানি কিংবা ফ্যাক্টরি এই নামটি স্বাধীন এক অস্তিত্ব বলেও সাহেব গৌণ।

লাইনের ধারে বিস্তৃত সেই ভূখণ্ডে, যেখানে এখন নিউ ইন্ডিয়া, সেখানে কাচজল ও জলপোকা ছিল। মগ্ন হাঁস ক্ষুৎকাতর চঞ্চু পিঠের পালকে গুঁজে ঝিমোত, ভাসত, সেখানে এক-ঠেঙে বক ছিল। নিরবধি জলে তরঙ্গ ছিল বৃত্তে, বৃত্তের আকারে; আর ছিল ইতস্তত অন্ধকারের অবয়ব, মাটিতে, জলে ও মাটির ওপরে। ওই অন্ধকার আদতে জলে স্থলে সবুজ হয়ে থাকত, সবুজ পচত, পচে অন্ধকার হতো। হাড়ের কাঠামো নিয়ে মানুষের ছুট-কাজ ও চলাফেরা ছিল সশব্দ, নিঃশব্দ। সেখানে, সেই ফাঁদ ও গহ্বরে, ফি-সন সর্পদংশন।

নির্বিকার, পরিত্যক্ত জলায় মৌন প্রতিমা, কোমরের ঘুনসিতে ঝাঁকি মেরে হারমাদ বালকের দল ঝপাং শব্দে তা বিসর্জন দিত। কখনো কখনো হাতের বিস্তারে তাদের আলিঙ্গন করতে হয়েছে মৃত্যু, পাঁকের শৈত্যে খুঁজে নিতে হয়েছে মৃত্যু। চ্যাপটা নাক ও মুখ তখন পাঁকের উৎস।

অথচ সম্পদ ছিল, দিগন্ত ব্যাপী। সবুজ বর্ণটি মোহময়, বড়ো ঐশ্বর্য আছে জলে। ওল, কচু, খারকোল, হেলেঞ্চা ও কলমি। জলে চুনোমাছ, কাঁকড়া। আর তার বিপরীতে তীব্র সাদা রঙে ও সেই আদিম লতাগুল্মে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণে, চিরায়ত অমাবস্যা। এ সবই অভ্যাসে, অস্তিত্বে একাকার বলে, কোথাও বিচ্ছেদ ছিল না। চনু কিংবা রণ, কিংবা গলুর সঙ্গে প্রিয় নিরিবিলি পেয়ে যেত সদু। এই সৌন্দর্যে তারা ওতপ্রোত দেখেছিল দূরের সিগন্যাল, যাতে চড়া রং বদলে যেত মুহুর্মুহু; আবার সিগন্যাল যেহেতু স্পষ্ট করে সবুজ মেল, অতএব ব্যক্তিগত দুঃখ

স্মৃতি, এসবও ছিল। সদুর মনে পড়ে সেই অভিজ্ঞতা, অন্নর নির্দয় প্রহার। বাবা জীবিত নেই এই তথ্যটুকু জানায় কতক্ষণ তাকে মৌন থাকতে হয়েছে। ওই দিনটিই অচিরাৎ কেমন বদলেছে, ওজন দিয়েছে তাকে। সে তো ক্ষেমির মুখে শুনেছে বৃষ্টিপাত, বর্ষগণনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের, পৃথিবীর জন্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত। তাবৎ পৃথিবী পৌরাণিক হয়ে উঠেছে, মেঘ-সঞ্চারে অদৃশ্য যোদ্ধা ও গোপন শরের সন্ধান করেছে সে। অন্ন ও চনুর মার ব্যাখ্যায় সেই পৌরাণিকতা একটি ছেদ রাখে। তারা বর্তমানকে ওই পৌরাণিকতা থেকে রেহাই দেওয়ার পক্ষপাতী। বিশ্বাস করে 'কলিযুগ' খণ্ডিত, অস্থায়ী এক সময়, যা ধ্বংসে বিলীন হলে কালচক্রটি পুনরায় আদি থেকে যাত্রা শুরু করবে। রণ কিংবা গলুর সঙ্গে এসব ছায়া ছায়া কথার কোনো লেনদেন হয় না। এটুকু সে সঞ্চয় করে রাখে সরির জন্যে। তুলো ওড়া ছিন্ন লেপে, অনিয়ন্ত্রিত ঢিলে শরীর-দুটি এলো হয়ে থাকে। সরির দু একটা আঙুল ছাড়া থাকে সদুর মাথায়, চুলে।

দিদি!

কী।

মানুষও আগে বানর ছিল?

হুঁ।

কী করে মানুষ হল?

আস্তে, আস্তে, বদলে যেতে লাগল।

কী করে?

বা, পৃথিবীও তো বদলাচ্ছিল।

তা-ই?

হ্যাঁ।

পৃথিবী কি আরও বদলাবে...

তা তো জানি না... বদলাতে পারে।

মানুষও তা হলে আরও বদলাবে?

বদলাতে পারে...

মানুষ তখন কী হবে?

জানি না।

কেউ জানে না?

জানা যায় না, হাজার হাজার বছরের ব্যাপার।

কিছুই জানা যায় না, নাহ্?

জানি না।

কেন?

বললাম তো হাজার বছরের কথা কে, জানবে...

কেন জানে না!

সদু, দেখ, এত কথা জানি না, কানাইদারে জিগাইস।

কানাইদা ঘোড়ার ডিম জানে!

তা হলে ভগবান জানে!

ভগবান-টগবান বাজে।

কে বলল?

কে আবার বলবে, আমি জানি।

তুই তো দেখি সবই জানিস!

জানিই তো, কদিন বাদেই তোর বিয়ে হয়ে যাবে, আমি পাশ করে চাকরি করব, মা আরও বুড়ো হবে, তোর ছেলে হবে, চনুর মার মতো ঝগড়া করবি তুই, একদিন মা মরে যাবে আর তখন আমি পালাব...

সদুর বাক্যস্রোত অব্যাহত থেকে যেত, এ-বিষয়ে সে এত জানত যে অনর্গল কথা বলে সেসব মূর্ত করে দিতে পারত, এমনকি তাতে খুঁটিনাটিও বাদ যেত না।

কিন্তু সরি হঠাৎ-ই তাকে টেনে নেয়, ঘনিষ্ঠ, পিঠে কিল মেরে বলে ওঠে 'পাগল'। সেই ধ্বনিতে কৃত্রিম বেদনা মিশিয়ে সদু 'আহ্' করে ওঠে। এবং পূর্ণ কলস যেন উলটে যায় তখনই, সরি আর সদু খলখল হাসছে তো হাসছেই।

ক্ষেমির ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল : ও সাহেব বাঁচবেনি, নির্যস ভেদবমি হবে!

এই ক্রোধ ঠিক বোঝা যেত না। সমগ্র ক্যাওড়াপাড়ার এতে কোনো সমর্থন নেই। ক্ষেমির আচরণ ভিমরতি মাত্র। আর তারা একত্রে, যৌথ এক স্বপ্নেও ফিরে যাচ্ছে ক্ষেমির বিপরীতে, যেহেতু সেখানে রুটি ও রুজির আশ্বাস। অথচ ক্ষেমির ওই বচন, বচনের তাৎপর্য নিয়ে যেন-বা পুনরায় জেগে উঠবে দীর্ঘ ও গভীর এক জলা। ভগ্নাংশে রচিত আদিম লতা ও গুল্ম, সেখানে পচা পাঁকের গন্ধ বুকে নিয়ে উলঙ্গ ও কালো শিশু ফিরে আসবে অশত্থের জটাজুট সরিয়ে, কোথাও দুপুর ঘাই মারবে পচা জলের ভেতর থেকে। এখন পাঁকের ভেতর রোহিত বর্ণ সেই মাছের খোঁজে ফাটা হ্যারিকেন অন্ধকারে জ্বলে। ভট্‌ভট্ শব্দে পাম্প চলে। পাশে ছেঁড়া মাদুরে রাতভর শুয়ে থাকে তাড়ি খাওয়া মানুষ। ক্যাওড়াপাড়ার সতের বছরের মা পাঁচবাড়ির কাজ সেরে এসে সন্তানকে শাপান্ত করত, সেই মা ও শিশুটির কী হবে? তারা কী করে অতিক্রম করে, এড়ায়, সেই জোলোটান?

এই জলে কলহ ও শৈত্য। ক্ষেমির বর্ণনায় আবার এইসব ছায়া, অন্ধকার ও সবুজে সৌন্দর্য থাকে। নত বাঁশঝাড় ও সাঁকোয়। এই জলা সেই রূপকথার বৃত্তান্তের মতো, কেননা এখানে পানকৌড়িও আসে! আর কে না জানে পানকৌড়ির ডুব ও অতল জলের সেই কৌটোর কথা, যেখানে আত্মার নিবাস! ফলে যা-কিছু দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় সমস্তই ভর করে অপোগণ্ড শিশুদের ওপর। রণ, গলু ও সদুরা তাদের মাথায় চাটি মেরে বলেঃ 'ধুস!'

গলুর দাদাকে ফের বসিয়ে দিয়েছে, মাঝে-মাঝেই বসিয়ে দেয়। এক হপ্তা, দেড় হপ্তা। তখন ক্ষেমির ঘুঁটে-বেচা, ডিম-বেচা দু-চার পয়সার সঞ্চয় থেকে চলে, তারও পরে কয়েকদিন ভাত রান্না হয় না। ফলে নিউ ইন্ডিয়া টুলস শুধু গলু নয়, গলুর দাদাকেও টানছে, কারণ গুজব এই যে বেশ কিছু স্থায়ী লোক নেওয়া হবে। পাঁচ-ছ বছর কারখানায় কাজ করে শ্যাম অনেক

কিছু জেনে ফেলেছে, দু-একখানা চটি বইও আছে, সে মধ্যে-মধ্যে পড়ে। কখনো-কখনো ওই চটি বইয়ের ছাপানো অক্ষরগুলো হুবহু গলু, রণ ও সদুকে শুনিয়েছে। বক্তৃতার আদলে সেইসব কথা উচ্চারণ করে শ্যাম বেজায় সুখ পেত, তাকে বড় খুশি দেখাত। তবে শ্যাম কথাগুলো একটানা বলতে পারত না, কথা বলার ভঙ্গিটিই তার প্রিয়, অন্যদিকে শব্দচয়ন ও বাক্য নির্মাণে সে ওইসব চটি বই ও ক্যাওড়াপাড়ার মিলন ঘটাত।

মালিক শালা হারামির গাছ!

হুঁ।

বুঝলি।

হু।

শোষক, ওয়ার্কারদের শুষে নিচ্ছে...

হুঁ।

ওয়ার্কারও ঘাস খায় না... বুঝলি...

হুঁ।

কী বুঝলি!

এই জিজ্ঞাসা বড়ো নিরাসক্ত, তাতে কোনো তীক্ষ্ণ ফলক নেই। ফলে তা সদুকে বিদ্ধ করে না। বাধ্য করে না জবাব দিতে। সদুর তেমন কিছু করণীয় নেই চুপচাপ শুনে যাওয়া ও বোঝার ভান করে যাওয়া ছাড়া। আবার এই সত্যটি ধরে রাখতে তার একটি নির্দিষ্ট আচরণ থাকে। ঝাঁকড়া মাথা ঝুঁকিয়ে, দাঁতে নখ কাটতে কাটতে সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয় শ্যামের প্রতি। আচরণটি ক্রমে গড়ে উঠেছে, এখন তা স্বয়ংক্রিয়। শ্যাম এই শ্রদ্ধাটুকু গ্রহণ করে থাকে। আর সত্যিই তো সদুর আচরণ তেমন কপট কিছু নয়। শ্যামকে সে গলুর দাদা বলে সমীহ করে না। শ্যাম অনেক কিছু জানে, কী করে যে জানে! তীব্র সুর সৃষ্টি করে মাঝরাতে, চাঁদনিতে। কী করে! শ্যামে রহস্য আছে, আনন্দ আছে, এই সবই সদুর সমীহ ও শ্রদ্ধার উৎস!

এখন শ্যামের কথা বলার ওই মুদ্রাদোষটি 'কী বুঝলি' যদিও গৌণ, তবু সে অজান্তেই প্রতিবার বলেছে, 'হুঁ'। শ্যামের কেতাবি কথার কতটুকুই-বা সে বোঝে, তদুপরি 'শোষক'। সে তো কখনও শোষক দেখেনি। শোষকের সঙ্গে 'শুশুক'-এর কি কোনো সম্পর্ক আছে? সে জানে না। ধনী-দরিদ্র বোঝে। দারিদ্র্য বোঝে! তথাপি সদু যে প্রতিবার অন্যমনস্ক 'হুঁ' নিক্ষেপ করছে তার কী অর্থ! তা কি বুড়োমি নয়, মিথ্যে নয়, যাতে সে সামলে নিচ্ছে অতিপ্রিয় 'কেন' এই সরল সত্যটি? 'কেন' এই শব্দটিতে যে রোমাঞ্চ, আলোড়ন ও খননকার্য আছে সে কি ক্রমে সেখান থেকে সরে আসছে? বদলে নিচ্ছে ওই হ্রস্ব নিরর্থক 'হুঁ' ধ্বনিটির সঙ্গে।

অ্যাম্পুল ফ্যাক্টরির নোনা ইট বেয়ে তীব্র অ্যাসিড-জল বেরিয়ে আসে। দেওয়ালটি অংশত সাদা হয়ে গেছে, সেখানে আর শ্যাওলা-অন্ধকার নেই। যে অন্ধকার জমে ছিল সুলতান আলম স্ট্রিটের ভেজা গলিতে, গলি সংলগ্ন মাঠ ও জলায়। পচা সবুজে বেগুনি ফুলের বাহারি ফুটে থাকা, আদিগন্ত সেই কচুরিপানায় আন্দোলিত মোষের লেজ, ছুট আলস্য নিকটের সাঁকোয় দীর্ঘ ছায়া ভাঙছে। তখন সিগন্যাল বদলে যাচ্ছে বলে সমগ্র তল্লাট কেঁপে উঠছে ভিত্তিভূমি সমেত।

ওই কম্পন স্রোত হয়ে যায়। ট্রেনটি হুইসিল দেয় না, চলে যায়। কম্পন স্রোতও বিলীন, ফিরে আসছে নিষ্কম্প স্থবিরতা। লাইনের ঢাল বেয়েই তা গড়াচ্ছে। তাতে নিদ্রাস্পর্শ। কোথাও সামান্য পাখসাট।

খাড়া, স্থির এই অঞ্চলে টালমাটাল সাঁকো স্বীকৃতি জানায় কারখানা বিষয়ে অন্তিম গুজবটিকে: কাল থেগে লোগ লেবে। প্রতিবার এই সংবাদ পরে গুজব বলে প্রমাণিত হয়েছে, অযথা চাঞ্চল্য এনেছে, কৌতূহল ও শঙ্কা বেমক্কা ঘায়েল করেছে। নিতাই ক্যাওড়া ভোলার দোকান থেকে বন্ধক দেওয়া থালাটা ছাড়িয়ে নেবে এরকম কল্পনা ছিল। লালপেড়ে ডুরে শাড়িও তাদের প্ররোচিত করেছে কারখানা সম্পর্কে আশা বজায় রাখতে। বা ওই চিমনিটিই স্বয়ং প্ররোচিত করেছে ভাবতে যে সে আছে, কিছু একটা হবে। আর এত কৌতূহল ও শঙ্কার নির্যাতনে, প্রহারে, এক সময় তারা ভাবনারহিত বড়োই স্থাণু। তখন হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে সেই গুজব রূপান্তরিত হল নিছক সংবাদে। গুজবটি সংবাদের মাহাত্ম্য পায় শেষে।

পরপর কয়েকটি ট্রাক আসে, তাতে ধুলোর শরীর ভেসে ওঠে, সুলতান আলম স্ট্রিট ধুলোর শরীর হয়ে গেছে। মেঠো রাস্তার কয়েক হাত ওপরে ধুলোর ওই অবয়ব কিছুক্ষণ ভাসে, তাতে মন্থর গতি থাকে, ট্রাকের শব্দ থাকে আর এসবের অনুষঙ্গে গলু ফের বলে ওঠে : লেগে যাব এবার! এই উচ্চারণে যে-স্বস্তি ছিল, চিমনি, শেড, পাঁচিল ও গুদাম সমেত তা এক ভাস্কর্য।

এখন পিঙ্গল ধোঁয়ার প্রতীক্ষা!

দীর্ঘকাল পরে সরির বিয়েকে কেন্দ্র করে জ্যাঠামণি বৃত্তান্তটি আবার এসে যায়। এবারের সমগ্র বর্ণনাটি অন্নর। সদু সঙ্গে গিয়েছিল ঠিকই, জেঠুর ঘোষণাটিও তার স্মরণে আছে। সেই ঘষা স্মৃতি থেকে সে পরিত্রাণ পায় অন্যত্র তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায়। এখন অন্ন সেই বৃত্তান্ত, সরিকে জানাচ্ছে, আর সদু ফিরে পাচ্ছে সেই স্থির মুহূর্ত। জ্যাঠামণির মুখমণ্ডল তখন ছেনির ঘায়ে গড়ে উঠতে থাকে যাবতীয় ভাব, ব্যক্তিত্ব ও কুণ্ডন সমেত : শরীরের অনুপাতে, গোলমাথাটি বেশ ছোটো, নিখুঁত ভুরুর তিন আঙুল ওপরে এসে সেই গোলাকার কালো বর্ণটি থেমেছে। ভুরুসন্ধি থেকে গভীর রেখাটি সামান্য নেমে গেছে দু-পাশের ভিত্তিভূমিতে। নাসাছিদ্র দুটি প্রকট। শক্তিশালী কুচি দাঁত গোপন থেকে গেছে গালের ভেতর, বাইরে সূক্ষ্ম একটা রেখা। রেখাটি এঁকেবেঁকে যাচ্ছে : হাসি, অনুকম্পা। ওপরে বা নীচে কোনো স্ফীতি না থাকায় জেঠুর যাবতীয় গাম্ভীর্যের সহায়ক ওই রেখাটি। রেখাটি বিদ্যুৎ-গতিসম্পন্ন : তা কে তোমাকে বারোমাস দেখবে মেজোবউ, আমার তো কুবেরের ভাণ্ডার নেই, আর কাঁহাতক আমি টানব... একটু চেষ্টা করো, ছেলেটাকে এবার লাগিয়ে দাও কোথাও... সরির বিয়ের জন্যে একটু পাড়ার লোকদেরও তো বলতে পার। তুমি বিধবা-মানুষ কী করে সামলাবে না হলে... দেখ।' এইসব কথা ও বেঁচেবর্তে থাকার উপদেশ সমূহের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে, অন্ন গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে কথাগুলো।

দুপুর ছড়িয়ে ছিল চারপাশে, বাতাসে ধুলো ও দুপুর, দুপুরের নুন গন্ধ। আর এই ক্ষত নিরাময়যোগ্য নয়। এই ক্ষত অনেক অতীত আঘাত ও ব্যাধি জাগাচ্ছে। নেশা, বিকার। কবে যেন জেঠুই বলেছিল আর একটি আঁকাড়া সত্য, সেই সত্য আদতে নিন্দা, কলঙ্ক। অন্ন তখন বিকারের ঘোরে চলে যাচ্ছে। সে সরিকে সমস্তই বলে যেতে থাকে। এই ঘটনাস্রোত, পারিবারিক

কালপঞ্জিতে কত ঘেন্না, কুৎসা ও তুচ্ছতা। অন্ন এখন সংকটের শীর্ষে, অকপট, এই মুহূর্তে সে সরি ও সদুর জন্যে কোনো পশ্চাদ্‌ভূমি রাখে না। সরি ও সদুর স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে সমগ্র পারিবারিকতা, পিতৃ-পরিচয়।

তরা ভাইস্যা আইছস...

তগো তিনকুলে কেউ নাই...

ভালো নাই...

মন্দ... নাই... নাই...

নিঃসঙ্গ সেই নাস্তির শাসনে, শৃঙ্খলে, সদুর অন্নকে বড় ঋজু, ক্ষাত্র মনে হয়। তারা, সে ও সরি, শুধু এই নারীকেই শনাক্ত করতে পারে তাদের উৎস ও আশ্রয় হিসেবে। হঠাৎ-ই অন্ন বলে ফেলে : কি রে সদু বুইনের বিয়া দিতে পারবি না!

কোনো জিজ্ঞাসা নয়, বিস্ময় নয়, প্রত্যাশাও না-থাকায় এই কথা কেবলই শব্দলহরী, ধ্বনি রেখা, শূন্যে ক্বচিৎ কম্পনই তার পরমায়ু ও তাৎপর্য। তথাপি অমোঘ এই বাক্য অন্নর তীব্র ও একাগ্র দৃষ্টির সংস্পর্শে বড় কর্কশ। তাতে এমনকি আত্মহননও আছে। একসঙ্গে তিনটি প্রাণীর এই জাদুকরি বাঁচাতেই যেন কিছু একটা ছিল যা বধ্য, তাতে এই তিনজনই পৌঁছে যেত হত্যাকারী আবহাওয়ায়।

অন্নর কণ্ঠস্বর তখন আবেগবর্জিত, কটা চোখে কোনো উজ্জ্বলতা নেই। তার মুখ তখন পাথুরে। বৈচিত্র্যহীন, কাঠ-গলায় সে আত্মহননের তথ্য ও কাহিনি বলে যাচ্ছে। কলকাতায় কবে, কখন দরিদ্র মানুষ আত্মহত্যা করেছে— অন্ন জানে। এতসব তথ্যে প্রকাশ যে অন্ন আদমশুমারির নিষ্ঠায় হুবহু সে-সব মনে রেখেছে, এই মনে রাখার এক দায়িত্ব ছিল তার। অন্ন সেই দায়িত্বে অটল।

বর্ণনায় জানা যাচ্ছে মৃত ও অর্ধমৃত, মৃত্যুর-প্রতীক্ষায়-থাকা সেইসব মানুষ বড়ো দলবদ্ধ, বড়ো সংগঠিত। মৃত্যুর, হত্যার কারণ ও প্রকারে সেইসব লক্ষণাদি আছে যাতে তারা এই চিহ্নটুকু রাখে যে, তারা একলা নিজের জন্যে মরেনি। একটি পরিবার একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে কোথাও-বা পরিবারের একজনই হত্যাকারী। বঁটি জাতীয় অস্ত্রে সবাইকে মেরে ফেলে, নিজের গলায় কোপ বসিয়েছে সে। রক্তপাতে, আকস্মিক, অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠলেই সদুর কেন যেন ব্রিটিশের কথা মনে পড়ে। সে উত্তেজিত হয়, তখন কোথাও অশ্বখুরে ভাঙতে থাকে ধুলোর প্রাসাদ। উলঙ্গ অস্ত্রের ধাতব চাকচিক্য ও রেখাই তখন আলোর উপমা। আর গতিময় অশ্বের উরুতে তীব্র যে কম্পন, সেখানে সে নিজেকে, কাউকে দেখে।

অন্নর অভ্যাসে, বিশ্বাসে, যা-কিছু ব্যক্তিগত সবই এভাবে ফুটপাথ, দেশ ও গ্রামের প্রসঙ্গ পেতে চায়, ফলে সে মুক্তি পায় অন্ধকূপ থেকে। যেখানে যত অবসর, স্থিতি ও শ্রম আছে সবই তার করায়ত্ত। ফলে সেই ভ্রমর-মেঘ দংশনহীন। তা কেবলই গুঞ্জন, অচিরাৎ বর্ষণ উন্মোচিত করে দিচ্ছে অমলিন সাদা দিগন্ত। বাঁচার কৌতুকে অন্ন তখন পূর্বউচ্চারিত বাক্যটিকে ফালা ফালা করে, ফলে সেই মৌল নাস্তি এখন সহাস্য : 'ক। কী রে সদু! ক, দেখি!' আনন্দস্রোত তখন।

বাঁ দিকের মাড়িতে দু-একটি দাঁত না-থাকায় সহাস্য অন্ন মুখবিবরে যেটুকু অন্ধকার স্থায়ী রেখে দেয়, তা বড়োই নির্ভেজাল, নিপুণ সেই লীলায় সে গতিময়, সস্নেহ : ক। সে সদুকে কাছে টানছে ওই শব্দে এবং ধবল বাহুর আলোড়নে। যেন বা সে অতিক্রম করে যাবে শূন্যতা, কালো জলস্রোত। অন্নর বাহু বৈঠা হয়ে যাচ্ছে। 'সাঁতর দিয়া আমি আর ননদ-ঝি ম্যালা শাপলা তুইলা আনতাম', সদু এই কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। মৌন অন্ন এখন ক্রমে ভুলে যাচ্ছে যাবতীয় শোক, শোক-গাথা। অন্ন তখন অমর, বড়ো প্রাচীন এক জীবন আছে অন্নে, চুলরাশিতে কয়েক গাছা সাদা সুতো তারই সাক্ষ্যপ্রমাণ। ওই সাদা চুল উড়ছে পতাকা। সাদা এই বর্ণ তুলকালাম যুদ্ধের হ্রেষা ও তীব্র গতি স্তব্ধ করে। অশ্বটি সামনের দু-পা তুলে দেয়, তখন সাদা ফেনা ও বুদবুদ। প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথ, পলাশিতে স্তব্ধতা, জয়-পরাজয়, মৃতের শরীরে টেনে দেওয়া হচ্ছে সাদা থান। জয়-পরাজয় ও সন্ধিতে ওই সাদা রঙটি বহুবার মহিমান্বিত। অন্যদিকে মানুষের তাবৎ অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় যেখানে যত সরল শুদ্ধতা, নিমেষে তা স্মরণ করায় এই বর্ণ। বর্ণটি স্বয়ং প্রতীক। অন্ন প্রকট সাদা, তার থান, ধবল শরীররেখা ও ত্বক, ঊর্ধ্বে কয়েক গাছা সাদা চুল।

সদু অন্নকে হারাতে থাকে, অন্ন যেন নেই, অন্ন যে আছে তা মায়া, ভ্রম। যত সে দুর্লঙ্ঘ্য টানে অন্নর শরীরের গন্ধ পেতে থাকে ততই সে টের পায় অন্ন মরে গেছে, মরে যাচ্ছে।

তুমি খেয়েছ?

অ... হ...।

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেল্যা দিছেন কেশ
তাই দেখ্যা সূর্য-ঠাকুর ফিরেন নানান দ্যাশ॥

কয়েকদিন যাবৎ অন্নর রাতে জ্বর হচ্ছে, ওপরের ভারী ঠোঁটে জ্বর-ঠোসা হচ্ছে। ছেলেবেলায় শোনা, সারা জীবনের আতুর-বিশ্বাস সমেত সে সুরজাইর ব্রত বলে চলে ঠোঁটে হাত বুলিয়ে: হত্যের বিনাশ নাই... সূর্য হইল হত্য... দশ দিক আলো কইরা রাখছে... ছুটোকালে কত বরতো পালছি...। তখন পেতলের ছোট্ট ঘড়াটি আমসরা ও স্বস্তিকা চিহ্ন সমেত রণর মার মাথার ওপর, তাতে ওই নারী বড়ো গম্ভীর। যেন ভর হয়েছে। মা শেতলার ভর, ক্যাওড়াপট্টিতে নিতাই সর্দারের মাগটার যেমন হয় ফি-হপ্তায়, শনি মঙ্গল বার। নিতাই সর্দারের মাগ তখন দেবতা, সবাইকে তুইতোকারি করে, টাকা ও ফল পায়, সে নাকি নেশাভাঙও করে। আর রণর মা কেবল ভয় পায়, আতঙ্ক, যখন রণর ঠাকুমা সংকটার কাহিনি বলে।

কী চাস?

না— শান্তি, অক্ষয় সিঁদুর, বালাই-বিপদ দূর, সন্তানের স্বাস্থ্য...

কী চাস?

না— পড়শির মরা গাছ ফলন্ত হোক, গোরুর বাঁটে দুধ আসুক বটের আঠা... ইলিশের পেটে ডিম... সতিনের ছেলে... মেঘে জল... খেতে ফসল...

উপবাসে, ধর্মভাবে ও পার্থিব কামনায় তারা ফিরে যাচ্ছে নিজস্ব কৌমে, দুটি বলদ যেখানে এঁকেবেঁকে হাল টেনে যায়, কুলো শূন্যে তুলে দু হাতে আলগোছ টোকা মেরেছিল তারা, ভরা পুকুরে সোনার নথ ও শ্যাওলা সমেত ঘাই মেরেছিল পুরাতন মৎস্য, মুখের কাছে হাত নিয়ে কেউ প্রিয়জনকে আহ্বান করেছে দিগন্তব্যাপী : 'আ... কা... ই... লা...'

আর এখন হারান ক্যাওড়ার হাঁদাবোকা বউটা মেছো চোখের ওপর থেকে রুখু চুল সরিয়ে ছেলেটাকে লাল ডবল পয়সা দিয়ে বলে : যাহ্, চিটগুড় খেগে যা। আজগের বেলায় রান্না হবে। তখন উল্লাস, তখন আহ্লাদ। সমগ্র তল্লাট জুড়ে তথাপি যে ধুলো ও শুষ্কতা সে-সবই অলৌকিক বদলে যাবে। মঙ্গল-শিশির পতনের শব্দ শুনবে তারা।

এরকমই একটা ধর্মীয় দিন। এক হাঁড়ি ভাত কুকুরকে ধরে দিয়েছে চনুর মা। যে-মানুষটার অস্তিত্ব মাঠকোঠায় কদাচিৎ টের পাওয়া যায়, উপার্জনে অক্ষম সেই চনুর বাবা, কাকামণি এতে বিরক্ত, 'মানুষ একমুঠো ভাত পায় না আর...।' চনুর মা গর্জে উঠেছিল, যুক্তিও থাকে। কারণ প্রকৃতই চনুর বাবা যে সেইসব অভুক্ত মানুষের জন্যে উদ্বিগ্ন এমন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। বরং গ্রহণের খাদ্য যে অমঙ্গল, তা সমগ্র জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, ওই মানুষটির ভবিতব্য তখন উচ্ছিষ্টভোগী, অন্ধ পরিব্রাজক, অমঙ্গল তার কপালে স্থায়ী ও গভীর রেখা এঁকে দেবে। তৃষ্ণার্থে সে সমুদ্রে গেলে জলরাশি বাষ্পীভূত, শ্যামলভূমি শুষ্ক প্রান্তরে পরিণত হবে, প্রিয়জনের

অকালবিয়োগ, সেই ব্যক্তি মহাপাতক, কালকর্ণী, আগুন তাকে দাহ করবে না, জল তাকে ভাসাবে না, তার এমনকি মৃত্যুও হবে না, সে অনন্ত অশুভ। এতসব কথার পরেও ভুলা মানুষ চনুর মা পা ছড়িয়ে পান সাজছিল : ন্যান্ অন্নদি!

না গো বুইন, এই সময় কুটা-গাছও মুখে দিতে নাই...

চনুর মা সাজা পানটি ফেলে দেয় ও অন্নর দিকে নিষ্পলক তাকায়, তাতে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। যেন-বা সে জানতে চায় অন্নদি আপনার তা হলে এ-অবস্থা কেন, আপনি তো পাপ, অনাচার কিছুই করেননি, আপনার এত হেনস্থা কেন। চনুর মাকে অবিশ্বাস স্পর্শ করে : 'কত তো পাললেন!'

হ, নাইলে কপালে আরো কী ছিল কে জানে!

তখন নীল শূন্যে ছিল শিকারি পাখির আলোকিত ডানা। ধাতব ঔজ্জ্বল্য। ছিন্ন সেই ডানা ক্রমে গ্রাস করতে থাকে কঠিন ধোঁয়ার আস্তর তাতে পূর্ণগ্রহণ। আর তখন দীন দুনিয়ায়, জলায়, মাঠে, মাঠকোঠায় নির্ভেজাল অন্ধকার। অন্ধকার তারই ছায়া, সেই ছায়ায় গলুর দাদা খোঁজ করে যায় : সদু পিসি এসেছে নাকি রে!

কই না; কেন রে শ্যাম।

কোথায় যে গেল?

চ্যান করতে যায়নি তো?

বলে যাবে তো!

চনুর মা ফিরে আসে, তারা ক্ষেমি সম্পর্কে দু-চার কথা বলে, যেমন মানুষটা ন্যায়-অন্যায় বোঝে, অনেক কিছু দেখেছে, শরীরে মায়াটান আছে, মুখের গ্রাস সে তুলে দিতে পারে অভুক্তকে। এই এক প্রসঙ্গ গ্রহণ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তামাম তল্লাটে চারিয়ে যেতে থাকে, তারা বড়ই নরম তখন, স্মৃতির আনন্দ প্রহার থাকে ক্যাওড়াপট্টিতে।

আর বলিস নে সেই দুর্ভিক্ষের টেইমে...

পিসি লাল মুলোকে কেন দেখতে পারে না বল দিকি।

গেল মাঘে চার কুড়ি পাঁচ বছর হল...

গলুদের দাওয়ায় বৃত্তাকারে তারা বসেছে, উদ্‌বেগ ও শঙ্কার তাড়না টেনে আনছে নানান বৃত্তান্ত, এইসব ঘটনা ও কালপঞ্জিতে ওই নিরুদ্দিষ্ট মানবীর জীবনকাহিনি রচনা করে চলে তারা, যাতে তার জীবনের প্রাচীনত্ব সংশয়াতীত, তারা সিদ্ধান্ত করতে পারে ক্ষেমি এক এবং একক, ক্ষেমির পরে আর কেউ নেই, কিছু নেই।

ক্যাওড়াপট্টি ডবল বাঁশের সাঁকো পানাপুকুরের গাঢ় সবুজ (এখন কালো) এক খাবলা রঙের ওপর দিয়ে গলুদের মেটে ঘর অবধি খোঁচার মতো চলে গেছে, ওই সাঁকো বিদ্ধ করেছে ঘরটিকে। যেন-বা, এই জনসমষ্টির প্রাচীনা মানুষের তাবৎ গুরুত্ব স্পষ্ট হচ্ছে সাঁকোটির এই অবস্থানে। গলুদের ঘরের কাছে এসে ওই ডবল বাঁশ দুটো নিয়ত পায়ের চাপে ফেটেছে, তাতে চোঁচ শতমুখী, ফলে এই যে বাঁশ দুটি ক্রমশ বিলীন তাও এক প্রশস্তি। সন্ধ্যা গাঢ়তর বলে এখন অন্ধকারের বুদবুদ, লম্প ও হ্যারিকেন জ্বলছে ক্যাওড়াপট্টিতে, বিচ্ছিন্ন সেইসব

আলোকবিন্দুতে অন্ধকার তরল হয়। যেন বনজ, চান্দ্র-রৌপ্য, উড়বে ধুনুরির নৈপুণ্যে এখুনি। গলু, রণ, শ্যাম ও ক্যাওড়াপাড়ার আর পাঁচটা মেয়ে-মদ্দ কেবলই জিজ্ঞাসা রাখছে পরস্পরের কাছে :

ফিরেছে?

ফিরল?

ফেরেনি?

এখনো ফেরেনি!

আর এতসব প্রশ্নের জবাবে কালোমাংসের ভাঁজ থেকে কোথাও নড়ে উঠেছে অধর ও ওষ্ঠ: নাহ্, না, নন্‌না। এই ব্যাপক তল্লাসিতে এখন সদুও অংশীদার। টালিগঞ্জ ব্রিজ, চারুমার্কেট, শেতলার থান, লোহাপট্টি ট্রামরাস্তা প্রভৃতি জায়গায় সে অন্ততপক্ষে তিন দফা ঘুরে এসেছে। আর যত অন্বেষণ তীব্র হচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে ও এই সংশয় প্রচার হচ্ছে ততই যেন অন্বেষণে মত্ততা আসছে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ক্ষেমি আর কোনোদিন আর কখনও ফিরবে না, তার এই যাত্রা যেন একপ্রকার নির্দিষ্ট ছিল, যেন তারা জানত। তারা জানত এমনটা হবে, এরকমই হওয়ার কথা।

পুরাতন অন্ধকার তখন গ্রাস করেছে যেখানে যত ছিন্ন আলোক ও আলোকবিন্দু। ইতস্তত বা জলস্রোত সবই এখন কালো মাটির ওপর। যা-কিছু গঠন সমস্তই অন্ধকারের আকার, অন্ধকার সর্বগ্রাসী। তাতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাবৎ ব্যবধান, চরাচর ভদ্র গেরস্থি সমেত ত্রিভুজ ভূখণ্ডে একাকার, উপরন্তু মানুষের নড়াচড়া আছে সাম্প্রতিকতম ঘটনাকেন্দ্রিক। উকিলদাদু নিজ বিবেচনায় থানায় গেছে কেস লেখাতে, কানাইদা করিতকর্মা লোক, ক্ষিপ্রগতিতে সে গলুদের পাড়ায় এসে গেছে : তখনই বলেছিলুম শামুকে... বুড়ো হাড়ে অ্যামন কেত্তন করে বেড়ানোর কী দরকার...।

রাতের ওজন বেড়ে চলে, অন্ধকার ঘন ও নির্ভেজাল, এক এক করে অনেকে ফিরে গেছে। এখন গলুদের দাওয়ায় বউ-ঝি আর চুনোচানার দল পড়ে আছে বেড়ালের মতো, তাদের শ্বাসধ্বনি ধারাবাহিক। পানাপুকুরে তখন ছায়া দেখা গেল, ছায়ায় গতি ছিল, এই স্যাঁতসেঁতে ভেজা পাড়াটায় জেগে উঠল হুম্ হুম্ ধ্বনি। এতাবৎ যে শুদ্ধতা ছিল ওই ধ্বনির তীব্র আক্রমণ তা নস্যাৎ করায় চাঞ্চল্য। মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, গলুর দিদি হ্যারিকেন হাতে ছুটল। হ্যারিকেনের আলোয় সাঁকোটা অংশত মেলে দিতে লাগল সাদা রং, একসময় মানুষজনও দেখা গেল। ডোবায় তাদের শরীরের ছায়া গতিময় আর চিৎকার: পিসি গো!

পানাপুকুর কেঁপে ওঠে, সেই চিৎকারে সড়সড়িয়ে জলে নেমে যায় মেটে রঙা ঢোঁড়াসাপ, ছলাৎ শব্দ থাকে পুকুরে, কী যেন ডুবে যায়। কী যেন ডুবে গেল!

ক্ষেমির এই চলে যাওয়া পর্যায়ক্রমে এনে ফেলে স্মৃতির যাবতীয় ঝাঁক। পুনর্বার উদ্‌ঘাটিত সেই কালপঞ্জি। আর যেহেতু তার এই মহতী যাত্রায় বিদায়ী শুভেচ্ছা থাকে সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপট্টির, ফলে সকলে বাধ্য থাকে এই পরিক্রমায়। সঙ্গী হয়।

এখন বিকার সাহেবসুবোর হ্যাটকোট চাপিয়ে, ফর্সা রঙে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন

করে জানায় ধর্ষণের কাহিনি। সমগ্র জীবনকালে ক্ষেমি দু-দুবার ধর্ষিতা হয়েছিল, একবার ফর্সা আরেকবার কালো চামড়ার মানুষ ছিল সেই বলাৎকারের নায়ক। কবে যেন মন্থর গতি ছিল, জর্দা-সুরভিত পানের শ্বাস ছিল, জুড়িগাড়ির ছিপটিতে ছিন্ন বাতাস ছিল। গাঁদীবাবার কথা, বাবার চেলার কথা উল্লেখ করে ক্ষেমি জোড়হাত কপালে ঠেকায়। সে কাঁদে, ধ্বনিবিহীন সেই কান্নায় কেবল অশ্রুপাত, ওই অশ্রুপাত মায়া। মায়া কান্না, যার অন্তিমে মৃত্যু।

এভাবে দুদিন বেহুঁশ কেটে গেল, ক্ষেমির শরীরে শুধু আগুন, আগুনের শরীর। অন্নর বাধা, নিষেধ বিস্মৃত বলে সরি ও সদু বসে থাকে গলুদের দাওয়ায়। তারা প্রতীক্ষায় আছে। দুদিনের সেই উগ্র প্রতীক্ষায় ক্যাওড়াপাড়ায় নেশাগ্রস্ত শরীর বড়োই ঢিলে। কে যেন চলে যাবে তারই প্রস্তুতি থেকে যায়, ক্ষেমির চোখ মুছিয়ে দেয় কেউ! আর সেই ফাঁকে শূন্য থেকে থলথলে নীল রং গলুদের ঘরে লাফ দিয়ে পড়ল।

মৃত্যু হরিধ্বনি দিল।

এই যে দন্ত তেজমন্ত
পড়লে হবেন তোতা॥
এই যে কেশ দেখতে বেশ
পাকলে পাটের দড়ি॥
এই যে মাজা হবেন কুঁজা
যাবেন গড়াগড়ি॥

হু হু জ্বর এসেছিল, ক্ষেমির শরীরে প্রলয়-আগুন ছিল দাউ দাউ। মৃত্যুর আগে কাঁপুনি ও প্রলাপ ছিল। প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা আশ্রয় করে সেই শরীর, উৎপাটিত হচ্ছিল প্রাচীন বৃক্ষ, তার রুক্ষচুল ও আউলে শরীর বনস্থলী হয়ে যায়। ক্ষেমির নেতানো শরীরে জোলো ভাব ও গন্ধ, কিছু রেখাও ছিল। বয়স-চিহ্ন। চামড়ার অজস্র ভাঁজে প্রাচীনত্ব মুদ্রিত ছিল, এখন এই চামড়াটি ছেড়ে যাচ্ছে ক্ষেমির হাড়-কাঠামো। সেই ঝঞ্ঝা-সংকেতও ছিল। ক্ষেমির মৃত্যু ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছে, তারা জেনে গেছে শোক ও রোমাঞ্চ সমেত সেই মৃত্যুই এখন দ্বারপাল। বিশ্বাস করছে মৃত্যু দেখা যায়, মৃত্যুর আকার ও বর্ণ আছে। ক্ষেমির অন্তিম যাত্রা প্রত্যক্ষ করার জন্যে তারা রাত জাগতে থাকে। গলুদের উঠোনে লম্পর ফিতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল লাল দু-একটা আলোক বিন্দু, ধোঁয়ার স্রোত। সেই স্রোতে সামান্য আলো তলিয়ে যায়, চোয়ালের অন্ধকার ও শরীর ছায়ায় নড়চড় হয়। এই রাত জাগায় তারা মুখে-মুখে মৃত্যু বিষয়ক যাবতীয় জল্পনার শেষে খুন রং বেছে নিচ্ছে। ওই রক্তবর্ণই জীবন, শরীর চৌচির হয়ে ফেটে গেলে, চামড়াটি অসংলগ্ন হলে প্রকৃত মৃত্যু আসবে রক্তস্রোতে... তখন গোল হয়ে বসে থাকা মানুষজন বড়ো অলৌকিক, অবিশ্বাস্য।

কুট্টিবোনের ক্ষেত্রে মৃত্যু বড়ো আকস্মিক ছিল। যেন ভোজবাজি, তাতে অন্ন বুক ভাঙতে চেয়েছিল আছড়ে, হিংস্র মৃত্যু গোপন ছিল। যে জন্যে তা খুন, কুট্টিবোনকে খুন করা হয়েছিল। ওই মৃত্যু বিদ্যুৎ-আঘাত, তা উৎখাত করে, ভাঙে, তাতে তুলকালাম ধ্বংস।

আর ক্যাওড়াপাড়ায় ছিল ক্রমিক মৃত্যু, মৃত্যুর বিকাশ। মৃত্যু সেখানে গড়ে উঠছিল পক্ষ বিস্তারে, ক্রমে ছায়ায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণে। যাতে তার অপ্রতিরোধ্য বিজয় উদ্‌ঘাটন করতে থাকে প্রতিটি পর্ব। পর্বে পর্বে সেই তরঙ্গ মস্তিষ্ক থেকে স্পর্শ করছে নখাগ্র। মৃত্যুর আশ্রিত মানুষটি থেকে একসময় তা শূন্যে কালো চন্দ্রাতপের বিস্তৃতিতে টেনে নিয়েছে মরণশীল এক জনসমষ্টিকে। অথচ কেউ এই পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে না। তারা কেউ মৃত্যু-স্তুতি করছে না। ভগ্ন স্বরে বলে যাচ্ছে ক্ষেমির জীবনপঞ্জি। সেখানে আরোপ করছে কিছু। স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার ছিন্ন বাতাস উড়ছিল পালকে, তারা পালক স্পর্শ পায়। যদিও এইসব মানুষ ধিক্কৃত মৃত্যু নিজেদের বাঁচায় বহুবার বন্দনা করেছে। আলগোছে, বেখেয়ালে কতবার বলেছে, 'মর! মর!' তখন কি তারা

মৃত্যু-সচেতন ছিল না? নাকি তা কেবল স্নেহের, ক্রোধের প্রকাশ! চনুর মা, অন্ন, রণর ঠাকুমা, এমনকি এঁচোড়ে-পাকা চনু অবধি মন মেজাজ খিঁচড়ে গেলে, দুঃখ পেলে, মরার কথা বলে। সরিও। নিজের কথা মনে হয়, সদু কতবার মরার কথা ভেবেছে!

কুট্টিবোন আর ক্ষেমিকে ধরলে সদু দু-দুটো মৃত্যু দেখল, এই দুটি মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। কুট্টিবোন মারা গেলে সে নির্বাক শোক ও শুদ্ধ ক্রোধ দেখেছে। অন্ন এক সপ্তাহ বোবা হয়ে যায়, তার কান্না এত শুষ্ক ছিল যে তা ধ্বনিবিহীন বালিপ্রান্তর, বাত্রাসে বালির ঘর্ষণ ছিল। সদুর শরীরে, স্নায়ু ও কোষে তখন বিপুল ধ্বংস। সে অস্থির হয়। আর যে-মৃত্যুর কথা সে পরে জেনেছে তা কেবলই ছেদ, ধোঁয়া-মেঘ সেখানে ক্বচিৎ ছায়া ফেলে। বাবার কথা তার খুব কম স্মরণ থাকে, এমনকি ওই ব্যক্তির প্রয়োজনও সে সর্বদা বুঝে উঠতে পারে না। এখন তিনটি মৃত্যু পটু রাজমিস্তিরির ক্ষিপ্রতায় তিনটি দেওয়াল খাড়া করে, সুতো ধরে ওলন নেমে যায় যেন লাটিম। ওলনটা ঘুরতে থাকে, সদু ঘূর্ণায়মান ওলন ও দেওয়াল তিনটি দেখেছিল। এক-একবার ভয় ঘামাচ্ছে তাকে, তখনই মৃত্যু ঝেড়ে ফেলছে ডানা। পালকহীন সেই ডানার বিস্ফার। তাতে ভেজা, হন্যে শকুন দু-ঠ্যাঙে লাফ মারছে। লাফ মারতে মারতে বদলে নিচ্ছে অবস্থান। সদু অন্নর কথা ভাবছিল, কারণ অন্নর বয়স হয়েছে, সে ক্লান্ত। ক্লান্ত হলে কি মানুষ মরে যায়?

ক্ষেমিকে যারা সাঁকোর ওপর দিয়ে বয়ে আনে, যারা তাকে আবিষ্কার করে, তাদের স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে কুকুরের চিৎকার ও অনুসরণ। কাঁচা নর্দমার ধারে ক্ষেমি মুখ গুঁজে পড়েছিল... তখন তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাকত হারাচ্ছিল, ফলে অনুভূতি... সে অন্ধকার দেখছিল... বিচ্ছেদ ছিল... আর বাসের অপেক্ষায় থাকা মানুষ, আলসে, আড্ডাবাজ ছোকরা এবং শিশুরা ছিল তাকে ঘিরে! ক্ষেমির ওভাবে অচৈতন্য থাকা ক্রমশ অচৈতন্য হওয়া, রচনা করে স্থায়ী কয়েকটি মুহূর্ত যাতে লোকজন আটকে যায়। আর এই ভিড়ের কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকা তিনটে লেড়িকুত্তার এমন আচরণ যেন তারাই মনিব, ক্ষেমি এখন তাদের হেফাজতে আছে। তারপর সমস্ত রাত ওই তিনটে কুকুর প্রহরায় ছিল। তারা যেন ক্ষেমিকে বহুদূর অনুসরণ করবে এরকম প্রতিজ্ঞা, আন্দোলিত লেজেও সেই উত্তেজনা। উত্তেজনায় হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসছিল গোপন নখ, ঘর্মাক্ত জিভ ভেজাচ্ছে মাটি।

অথচ তারা চারচক্ষু নয়। নেই বিশাল নাসারন্ধ্র। ফলে তারা কৃতান্ত নয়, যমের অনুগামী নয় নেহাতই লাথ ঝাঁটা ও অবসর আদরে বেড়ে ওঠা গু মুতে মুখ ঘষা পার্থিব জীব... তারা কেন এই অন্তিমে একাগ্র থাকছে? তারা কী অলৌকিক টের পেল ওই অন্ত!

আর আশ্চর্য! ত্রিলোক সংহারক মৃত্যু, সবুজ স্রোত চঞ্চল ক্ষেমিকে তৃণবৎ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ক্যাওড়াপাড়ার বয়স্কা নারী জানায় যে সে সবুজ দেহধারী রক্তবর্ণভূষিত যমকে চাক্ষুষ করেছিল। ক্ষেমির শিয়রে অগ্নিময় যম ছিল, রক্তবর্ণ ওই আগুন, যা যমের ভূষণ। তখন সে এমনকি লক্ষ করেছিল কুকুরের বর্ণবৈচিত্র্য। এতে সেই নারী গুরুত্ব অর্জন করে, তখন সে অজস্র মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ঘোষণা করে ক্ষেমির পশ্চাদ্‌গামী কুকুরকে সে দাউদাউ আগুনে অন্তর্হিত হতে দেখেছে। ফলে রহস্য, ক্ষেমির মৃত্যুতে বহুত রহস্য!

দাহ করে এসেও ক্যাওড়াপাড়া একটা গোটা দিন ক্ষেমির সঙ্গেই কথা বলেছে, কেঁদেছে। কান্নায় নেশাগ্রস্ত তারা খুলে রেখেছিল দরমার ঝাঁপ, কপাট; এঁটোকাঁটা, ডুরে শাড়ি রোদ ও হিম পেয়েছে যুগপৎ।

খাইছস?

গলুকে জিজ্ঞাসা করা হয়। চনুর মা তখন যেভাবেই হোক ভূতগ্রস্থ গলুকে সান্ত্বনা দেবে। সে বদ্ধপরিকর। চনুর মার মধ্যে তখন প্রত্যক্ষ করা যায় সেইসব চেষ্টা যাতে প্রমাণ থাকে সে নারী, সে মা। তার বালবাচ্ছা আছে, বড়ো ভালোবাসে সে, ভালোবাসতে পারে। উদ্‌বেগ ছিল, সে গোপন করছে অশ্রু-ঔদাস্য, মৃত্যু-প্রতিক্রিয়া। এই পরিস্থিতিতে সে যদি গলুকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে একমাত্র তা হলেই চনুর মা বাঁচে, তার অস্তিত্ব রক্ষা পায় ফলে উৎকণ্ঠা তীব্র এবং ব্যক্তিগত। সে পুনর্বার ওই সম্বোধন রাখে, আরও আর্দ্র।

চিরডা কাল কেউ থাকে না...

অন্ন বড়ই আন্তরিক, তাতে শোক ওই বালক থেকে সদুর মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে, সদু সরু সরু শেকড় দেখছে, দেখতে পায়, শেকড় মাটিতে ও শূন্যে, রোদ তাতে জালি ফেলছে।

চিরডাকাল কেউ থাকে না...

অন্ন যেন-বা লটকে দিচ্ছে নগ্ন বৈদ্যুতিক তারের জটিল-বিন্যাস... ওইসব তারে গতি আছে, ওই তার প্রত্যক্ষ বিদ্যুৎ, ফালা দিচ্ছে আকাশ, তীব্র সাদা ও বক্র রেখায় তা হামলে পড়ছে... একটা খুলি কথা বলছে... চিরডাকাল কেউ থাকে না...

এইসব কথায়, অনুষঙ্গে, গলু আদৌ ঘায়েল নয়, কিছুটা নির্বিকার সে, গলু যেন অপেক্ষায় ছিল কখন ওই দুই নারী সরে আসবে মৃত ক্ষেমির কাছ থেকে। সে জানত তাদের সরে আসতে হবে। গলু সদুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, তখন চনুর মা পুনরায় ওই প্রস্তাব দেবে : তরা এইখানে খাইয়া যাইস।

চনুর মা কেন্দ যে বারবার খাওয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছে! তাতে কি তারা এড়াতে পারছে সাম্প্রতিক মৃত্যু? নাকি কোনোক্রমে সে নিজেই নিস্তার চাইছে? সে ভয় পেয়েছে?

হ, আমি রান্ধুম!

অন্ন গলুর মাথায় হাত রেখে, হাত বোলাতে-বোলাতে হঠাৎ বলে ফেলে। সে আরও বলে: চান করছস? এতে করে গলু যেন বন্দি হয়ে যাচ্ছে, তার হাবভাবে তীব্র অসহায়তা, বেচারা পালাতে পারলে বাঁচে... সে হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারছে না, মানিয়ে নিতে পারছে না এই কোমলতা, এই স্নেহ। গলু উসখুস করে, সে উঠে পড়ে, চনুর মা হাত ধরে থাকায় ফের বসতে হয়। কিন্তু গলু সক্ষম হয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে : দাদা ফিরলে এক জায়গায় যাব... আজ খাব না মাসিমা... দাদার সঙ্গে যেতে হবে...। অন্ন এতে ব্যগ্র, তার কত উৎকণ্ঠা, সে গলুর পিঠে স্পর্শ রাখে... তাকে জীবনের গূঢ় অর্থ বোঝায়... বলে, যে যাওয়ার হে তো গ্যাছেই...

অথচ অন্নে স্বাতন্ত্র্য ছিল। সে সদুকে বহুবার শুনিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের পশ্চাৎপট, যাতে মিথ্যার, কল্পনার প্রলেপও ছিল।

সদুর বাবা মারা যেতে তারা চনুদের মাঠকোঠায় এসে ওঠে... সাহেব খুনের মামলায় সদুর বাবা টানা আট বছর জেল খাটে... জেল থেকে বেরিয়ে আসে কঠিন ব্যাধির কম্বল জড়িয়ে। একসময় মারা যায়। তবে পিতৃপুরুষ জমিদার ছিল, সুবর্ণ ধান্যস্রোত ছিল, মঙ্গল-মৎস্য ...আর 'আমার বাবায় ইশ্‌কুল বসাইছিল', এই কথার সঙ্গে অন্ন উচ্চারণ করত সেই দুর্ভাগ্য : কপালের ফ্যারে এইহানে আইছি তাই বইলা তুই আর গলু তো এক না।

অন্ন ক্ষেমির শিয়রে পুরো রাত শেষ করেছে, এমনকি সে সন্নিকেও আটকায়নি... এখন তো গলুর প্রতি তার অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ... এসবে কি ওই ব্যবধান অন্তর্হিত? নাকি সবই মৃত্যুর দাপট, নেশা, মৃত্যু কি তাকে এতখানি অপার্থিব করেছে...

নিউ ইন্ডিয়া টুলস-এ পুরোদস্তুর একটা কারখানার জন্যে যা যা প্রয়োজন সবই ছিল, মায় নেপালি দারোয়ান পর্যন্ত, দারোয়ানের খাকি উর্দির ওপর সেই প্রতীক ভোজালিও। তাতে হাঙ্গামা, রক্তপাত। কেউ কি ভোজালির কোপ খেয়ে অনিবার্য ছুটে যাবে? গর্হিত অপরাধ ঘটবে এরকম অনুমান থাকে বাঁকা অস্ত্রটিতে, অস্ত্রটির চামড়া-আচ্ছাদনে। অস্ত্রটির ফলায় অর্ধবৃত্তের ঝোঁক, তাতে ক্ষিপ্রগতিও আছে। আশঙ্কা এই যে, ওই নিরীহ দারোয়ান হঠাৎ এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলবে ঝিমুনি, আলস্য, অস্ত্রটি তাকে হিংস্র করবে। হয়তো সাদা রোদ তখন তার সরু চোখে সরাসরি বিদ্ধ, কোমরের গ্রন্থিতে ওই অস্ত্র-স্পর্শ পয়দা করবে নির্বোধ অত্যাচার।

সে ঘাতক হয়ে যাবে।

যদিও টুলে বসে ঝিমোনোই মূলত তার কাজ, মাঝে-মধ্যে গেট খোলে ও বন্ধ করে। ক্রমে লাইনের ঢাল ও দূরের জলাশয়ের অন্তর্বর্তী কারখানা শেড চিমনি ও ধোঁয়ায় একটা সমঝোতা গড়ে ওঠে, কারখানাটা আস্তে আস্তে ক্যাওড়াপাড়ায় গৃহীত হয়েছে, শূন্যে চিমনির সামান্য লাফটিও বরদাস্ত করা গেছে। মোটের ওপর এখন তার আর পৃথক অস্তিত্ব নেই, যেহেতু ক্যাওড়াপাড়ার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সবুজ বিন্দু, সাঁকো ও জলাশয়কে রেহাই দেয়, ফলে এই নিসর্গে কারখানা ঈষৎ বৈচিত্র্য এনেছে। তেজপাল গলুদের পাড়ায় হরদম যাচ্ছে-আসছে। শুরুর দিকে তেজপাল ওই টুলটিতে বিষণ্ণ ছিল, অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা ছিল। তখন ভোজালিটি দীর্ঘ মনে হত। তেজপাল এখন বাচ্চাদের পেছনে লাগে, হো হো হাসে, ধার-হাওলাত দিচ্ছে নামমাত্র সুদে।

পানবিড়ি ও চায়ের গুমটি দোকান গড়ে উঠবে বলে জমিজমার ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়, তাতে খুনোখুনি হতে পারত। যে ছোকরা পয়লা দরমার ঝাঁপ, ভোটের চাটাই-পোস্টার এইসব জোড়াতাপ্পি লাগিয়ে ওই গুমটি বানায়, সে কিংবা ক্যাওড়াপাড়ার কোনো অভিজ্ঞ লোকও ভাবতে পারেনি এজন্যে জমির মালিকের খোঁজ ও পরামর্শ নিতে হবে, এমনকি ভাড়া দিতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে সেই উদ্যোগী ছোকরাকে ঠান্ডা মাথায় সবটা বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছে কানাইদা : দ্যাখ আজ অব্দি এ পাড়ায় থানা-পুলিশ করতে হয়নি... তুই কি হাজত যেতে চাস? এ তো আর আগেকার আমল নেই... এখন কিছু করতে গেলে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হবে।

তারা ভয় পায়। ছেলেটা ভয় পেয়েছে। কাগজ-কলমে তার ভয় ছিল। অথচ থানা-পুলিশ হুজ্জোত ভাবতে পারছিল না বলে চট করে এগোতে পারছে না। সংশয় থাকে। তখন ওই ঠান্ডা মেজাজ ফুরসত পায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। তাকে বোঝানো হয় এতে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, বরং ভূসম্পত্তি বিধিই এরকম, বছরে নামমাত্র একটা টাকার চুক্তি হবে, সে পারলে দেবে, না পারলে দেবে না। কিন্তু স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হলে, যখন তা করার মতো অবস্থা হবে, তখন দস্তুর মতো গুনে দিতে হবে। চনুর দাদু তখন থুতু দিয়ে নোট গুনে নেবে। ছোকরা জানত দোকান চলবে, তাকেও কিছু একটা করে খেতে হবে, ফলে সে রাজি হয়। এই বৃত্তান্তটি ক্যাওড়াপাড়া মেনে নিতে পারেনি। ব্যাজার ভাবসাব ছিল। তিনকড়ি ছোকরা যে ক্যাওড়াপাড়া থেকে আলাদ কিছু নয়, এর জন্যে এত লেখালিখির কী আছে! অর্থাৎ ঘোরতর সন্দেহ। অথচ তারা তো কখনও কিছু নেওয়ার ধান্দা করেনি। এত অবিশ্বাস কেন? আগেকার আমল নেই মানে কী? কী নেই?

তখন এই কারখানা বড়ো মলিন এবং এই অলকাপুরীকে কেন্দ্র করে সচ্ছল-জীবনের যে ভ্রান্তি বিস্তৃত ছিল সে-সবই কর্পূরধর্ম! যদিও সমুদ্রতরঙ্গ ছিল। এই কারখানায় প্রশ্রয় ছিল মুক্ত কল্পনার। এখন তা কেবলই ধোঁয়া, ধোঁয়ার শরীর। তীব্র কোলাহল নির্বাপিত।

কী নাম?

গণেশ ক্যাওড়া।

বাপ কা নাম?

নিমাই।

ঠিকানা?

ক্যাওড়াপাড়া।

বয়েস?

তিরিশ।

মুটে-কাজ করেছিস আগে?

হুঁ।

জন্মদাগ দেখা... বাহাদুর ছাতির মাপ নেও...

প্রবল উত্তেজক কয়েকটি ঘণ্টা এভাবে বাচাল ছিল।

সুলতান আলম স্ট্রিটে তারপরও ধুলো-বাতাস ছিল রেণু রেণু। বাতাসে ধুলোর অবয়ব, ভ্যানগাড়ির গতি ও ওজনই ওই অবয়ব খোদাই করেছে। ফলে যে আঁধি তাতে তুলকালাম কাণ্ড। যদিও তা ঝড়ঝঞ্ঝা নয় এই ধুলোট আলোড়ন, শুষ্ক তরঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যদিও মাটির ওপর হাত খানেক শূন্যে ধূলিকণা পরস্পরসংলগ্ন হবে বলে ক্ষিপ্র। ধুলো-ধোঁয়া গড়ায়। এভাবে ওই ধুলোট-আবর্তে, আশু ভাঙচুর, ছিন্নপালক, বালিকার কেশ ও একটি ঠোঙা ওড়ে।

প্রচার তাদের জীর্ণ কুর্তায় সূক্ষ্ম সেলাই রেখেছিল, কল্পনা, আশা। সমগ্র তল্লাট জুড়ে গাঢ় মোহময় একটি বর্ণস্রোত ছিল। কয়েকটা মাস তাদের টুকটাক কাজ ও নড়াচড়ায় মদত দিচ্ছে ওই বর্ণ, বর্ণের প্রাবল্য। এখন ভোজালির পাশ কাটিয়ে কিছু মানুষ দুটি শিফটে ঢুকে গেলে

তারা প্ররোচনা বোঝে। অস্তিত্ব-ধর্ম ছুট কাজে ঠেলতে থাকে। কারখানার নিষ্প্রাণ শিফট তখন চালু আছে। ক্যাওড়াপাড়ায় বিক্ষিপ্ত সবুজ স্রোতটি ফল্গু-মৃত্যুর ইজারায় চলে যাচ্ছে।

পরিবর্ত ধোঁয়ার প্রস্তাব তখন।

ক্যাওড়াপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সাকুল্যে ষাটজন মজুর নেওয়া হয়েছে, বাইরে থেকে আসে জনা পঞ্চাশেক। লোকজনের চোখে আর আগুন-নেশা নেই, তারা ভবিতব্য জেনে গেছে। কোথাও কোনো প্রতিবিম্ব নেই অলীক। সেইসব জেল্লা অন্তর্হিত, এমনকি তার শোকও। কারখানার পাঁচিলে পোঁতা বাহারি কাচটুকরোয় আলোকবিম্ব। শূন্যে ফোয়ারা। আর কয়েকদিনের ব্যবধানে মেশিন, শব্দ একঘেয়ে ক্লান্তি। অভ্যাস, ধোঁয়া, এখন ধোঁয়াই সত্য। এই ধোঁয়াস্রোত ভেঙে, তছনছ করে গলু হেঁটে আসছে, হেঁটে আসছে ভাঙা চোয়াল আর পায়ের গাঁট। সামান্য খুচরো পয়সা আর মার্বেল ঠোকাঠুকিতে বাজনা বাজছিল।

দ্যাখ!

ই...

শালা!

কোথায় পেলি?

কিনলাম... কালীঘাট থেকে...

কী করবি!

ন্যাকা!

কেন?

লাও... কেন ন্যাকা তাও বলে দিতে হবে... যা মায়ের দুধ খেগে যা শালা... কী করে... এটা দিয়ে কী করে... মারব... রক্ত-ফোয়ারা... এইভাবে ধরে সোজা ঢুকিয়ে দিলেই হল নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে... বাপ বলার টাইম পাবে না।

কাকে মারবি?

তোকে।

ধ্যুৎ!

যে শালা পেছনে লাগবে তাকেই...

তখন ওই দীর্ঘ ছুরি তাদের মাঝখানে।

গলু ছুরিটা খাপে ভরে নিচ্ছিল। কোথাও আলো ছিল। কারখানার আলো, সেখানে একটা ঘোলা ডুম জ্বলছিল। গলুর ঠোঁটের ওপর পাতলা রেখা। তারা এবার রেখাটি সম্পর্কে কথা বলছে। জানা যাচ্ছে গলু সদুর থেকে কিছুটা বড়ো, সে ব্লেড ব্যবহার করেছে। গলু আরও বড় হতে চাইছে। আর গলুর ক্ষেত্রে এইসব চাওয়া বড়ো সক্রিয়। সদুও তো ভেবেছিল কারখানায় ঢুকে যাবে কিন্তু তা ছিল অলস কল্পনা। সে কিছুই করেনি। এমনকি লাইনেও দাঁড়ায়নি। সদুর শরীর তাকে বিপরীত অনুভব দিয়েছিল। সে ওভাবে থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে না। শরীরের এই নির্দেশ সে সবটা বোঝেনি, ফলে অন্ন আর সরিই যেন বারবার শাসিয়েছে : সদু! ছিঃ... ছিঃ... ছিঃ... সদু!

এত ধিক্কার ছিল।

তরে দেইখ্যা ক্যামন খুশি হইব... তর বাপের ছুটোকালের বন্ধু... হোগলার বেড়ার আবডালে লুকাইয়া রাখছিল দুইজনারে... অমা! দারোগা আইতেই চিক্কইর দিয়া উঠল : বন্দে...মা...তরম্... বন্দেএ...এ...

'বাপরে কী নেশা! বন্দেমাতরমের নেশা! তর দাদু তো গায়ের জ্বালায় খাবলা দিয়া পড়ল: অতি-সাইরা! হারামজাদা! একদিকে দারোগা-পুলিশে তাগো টানে, আরেক দিকে তর দাদু তাগো পিটায়... আমার আর তহন বয়স কত! বড়োজোর চৌদ্দ হইব...

ক্যাওড়াপাড়া পেছনে ফেলে তারা জিরিয়ে জিরিয়ে হাঁটছিল।

অন্নর কানে তখন পেনশনের টাকার ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ, কালুকাকু যেন আবার পদ্মাপাড়ের বেতবন, হোগলা বন ছাড়িয়ে আকাইলা পিসির সুপারি-বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে, টাকার থলের মতো। আর শব্দ হচ্ছে। ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ। ফলে স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি কখনো সদুকে, সদুদের ছেড়ে যায় না। তারা সর্বদা সেই স্মৃতির সাদা এবং কালো গর্তে থাকে। সদুর বাবার কথা উঠলে ওই তেরঙা পতপত উড়বে... তাদের কষ্ট ও খিন্নতায় অসহযোগ আন্দোলন ঠেঙাতে অজস্র ব্যাটন ছুটে আসে... শূন্যে খালি জুতো ও চাপ চাপ রক্ত থাকে। আর এখন প্রাক্তন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর স্ত্রী হিসেবে অন্ন সরকারি পেনশন পেতে চেষ্টা করছে, এখন এই পেনশনই স্বাধীনতা।

এভাবে তারা স্বাধীনতার জন্যে এগোয়, সামনে ডবলডেকার, ট্রামঘন্টি ও হুস্‌স শব্দ, রাস্তা পেরিয়ে ঘাম, লালপাগড়ি হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে নিয়ন্ত্রণ। ধুতি, প্যান্ট, সার্ট ও তৎপর লুঙ্গির সামনে তারা থামছে। অন্ন তাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছিল ফালিকাগজ 'দ্যাহেন তো দাদা! কই হইব?' ওই সব ধুতি, প্যান্ট, সার্ট ও লুঙি স্বাধীনতা জানে না, দেখেনি, তারা জানে না এই নারী ও বালক কী গভীরভাবে সেই ছিন্ন মেঘের সঙ্গে যুক্ত। ফলে এই জিজ্ঞাসায় তারা কেবল একটি ঠিকানা, সিঁড়ি ও দরজা দেখতে পায়, আবার সে-সবে আলস্য থাকায় সরু, মোটা ও লিকলিকে আঙুল উদাস কোনো দিকে উঠে যায় তাতে সমস্তই অনির্দিষ্টি। এভাবে তারা হয়রান হচ্ছিল, জনস্রোত বড়ো নির্বিকার, প্রকৃত অচেনা, যেন তারা একই ভাষায় হৃদয় চালাচালি করে না, কোনো জাতীয়সংগীত নেই। অন্ন ঘেমে ওঠে, সে সদুকে আশ্রয় করে, তার আর জিজ্ঞাসার সাহস হয় না, সে হারিয়ে ফেলছে প্রতারিত হওয়ার ক্ষমতা : 'তুই জিগা।'

এভাবে তারা অফিস কাছারি, লাল পাগড়ি ও উর্দির পাশ দিয়ে হেঁটেছে। মূল্যবান কাগজটি সর্বদা ধরা ছিল হাতে, কিন্তু কিছুতেই কাঠের সিঁড়ি সমেত লর্ডের বাড়িটা খুঁজে পেল না। কাগজের টুকরোটি মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে, সাদা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন কেবল সংশয় প্রকাশ করে যাচ্ছে : এই ঠিকানায় কোনো বাড়ি তো ঠিক...! তাদের পরিক্রমায়, অন্বেষণে, সময় বড়ো শ্লথ, ক্লান্তি দীর্ঘ ছায়া ফেলছে। অন্ন আশা করেছিল, পেনশনের টাকায় তার নির্ভরতা ছিল। এখন ক্রমে অনির্দিষ্ট যাত্রা, ব্যর্থতা ইত্যাদিতে সে তৃষ্ণার্ত, মরুভূমির শোনা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে, অথচ কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না প্রসঙ্গটি। কীভাবে, কবে, কোথায় সে মরু জানল। সরির বিবাহ-উদ্যোগই তাকে এত সক্রিয় করেছে, কারণ পেনশন পেলে সে গত ছ-

মাস বাবদ এককালীন কিছু টাকা পেতে পারে। এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা এখন পরাস্ত হচ্ছে, সদুও টের পাচ্ছে অন্নর ঘাম। অন্ন ভিজে উঠছে, 'লজ্জা... আ... আ....।' কথাটা সে ঠিক বলছে না তবে নিশ্চিত তার শরীর এতসব গ্লানি ও ঘেন্নায় এখন ভেজা কুর্তা। অচিরেই জবজব করবে।

তর বাবায় থাকলে...

একসময় সে বলেও ফেলে।

১০ ফাল্গুন সরির গায়ে কাঁচা হলুদচূর্ণ আর কোরা কাপড়ের গন্ধ।

দুল দিচ্ছে অর জ্যাঠায়।

চুড়ি কি শুধু সোনার?

না ব্রোঞ্জের, অত পামু কই!

সরির রূপ খুলছে কী কন দিদি!

সরির যেন আজ পুজো হবে, দেবী ভুবনেশ্বরীর মতো সে বসেছিল আর সামান্য অলংকার থেকে অজস্র তীক্ষ্ণ তীরের উজ্জ্বল আলোকবিন্দু ছড়িয়ে পড়ছিল। বারান্দায় রাত তিনটে পর্যন্ত লালচেলি আর স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা ডাবের ওপর সরির হাতটি, হাতের পাতা, পড়ে থাকে। জামাই কালাচাঁদের এক মামা তিরিশ পিস মাছ খায়, দীর্ঘ উদ্‌গার ওঠে, কোথাও শেকল তোলার শব্দ আছড়ে পড়ে। সধবাবিধবা আর চোদ্দ বছরের বালিকারা খলখল গলগল শব্দে গড়িয়ে যেতে লাগল। মোটা ডাব আর লালচেলির ওপর ডিগবাজি খেতে লাগল আশ্চর্য মজা: কই গো জামাই!

সারাদিন বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্ন বলল : দ্যাখছেননি কী গাধলা পড়ছে!

চনুর মা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে লতানো উদ্ভিদের এক থোকা চুল। চেকনাই পাথর বসানো দুষ্মন্ত আংটি তখন লোকানো হচ্ছে জলে ও কাদায়, আর দপ্‌দপ্ জ্বলে ওঠে অন্নর হাওলাতি-চোখ। চনুর মার মুখে তখন পাউডার, স্নো। সাদা উদাস রেণু। সে এমন চোরাগোপ্তা হাসছিল, হাত খেলাচ্ছিল, যেন তার সাদা গোল হাত-দুটোর ওপর দিয়ে কত মেয়ে তরে গেছে। কতবার সে আংটি হাপিস করেছে, পুকুর বানিয়েছে, ছড়া কেটেছে, আর উলুধ্বনি... এবং সর্বদা তার গালে পান ছিল, নাকে একটা সাদা পাথর।

...সদু হারিয়ে যাচ্ছিল মাংসের বালতি, লুচির গন্ধ ও সংস্কৃত মন্ত্রের ভেতর। সে তখন বিছানায়, যেন বালিশ। বিয়ের রাতে সদু এভাবে জলদি ঘুমিয়ে পড়ে, তার মাথায় ওজন ছিল। ভারী মাথা ক্রমে ঝুঁকে আসে বুকের দিকে। সদুর হাঁটু ও মাথা বড়ো কাছাকাছি ছিল, শরীর অর্ধবৃত্ত, ধনুক। স্নায়ুমণ্ডলী জট খুলে ফেলছে, যেন-বা গড়াচ্ছে একটি উলের বল, পশমের অনুভূতি, ধোঁয়া-ধোঁয়া, হামা দিয়ে ঘুম আসছে। তার এই ঘুমে বিবাহপর্ব, ওই আংটি-খেলা, সমস্তই ঢুকে গেছে।

চনুর মা এখন হাই তুলছে, তুচ্ছ পোকা নড়ে, আলজিভ, জর্দার ভুরভুর গন্ধ। ন্যাড়া পেয়ারাডাল, খাটা পায়খানা আর চাতাল ফেরত দিচ্ছে তখন উগ্র দুর্গন্ধ, ওই গন্ধের গতি বারান্দার দিকে। বাতাসের হামলা। বারান্দার ফাট ধরে পিঁপড়ে-রেখা কোথাও অন্ধকার গর্তের দিকে চলে গেছে। বারান্দায় চনুর মার আলগা শরীর। তার শরীরে অ্যালা ধরেছে, সে দুদিন

বড়ো বেশি কথা বলেছে, বড়ো উদ্যম ছিল, এখন সেসবই পায়ের গোছ বেয়ে ঘামস্রোত।

দূর শূন্য ও নিকটে তখন রুপোলি সুতো টানটান, সংযোগ, কী যে যুক্ত নয় তাতে! টেলিগ্রাফ-খুঁটি বৃক্ষের মহিমা পেয়েছে, ক্ষুদ্র পাখির চোখ নিশানা। রৌপ্য-তারে নাকি সমগ্র দেশ সংলগ্ন আছে, তামাম মানচিত্র কথা বলে তাতে। আর এখন ওই তার চাবুকের উপমা। দুপুরের স্বৈরতন্ত্র শাসন করছে সমগ্র তল্লাট।

মা লক্ষ্মীর এক দায় মিটল... অ্যাহন ছাওয়ালডা মানুষ হইলেই...

দীর্ঘ হাই সমেত কথাটা উচ্চারণ করে বৃদ্ধ দু-আঙুলে তুড়ি দিচ্ছে, আলস্য পোষ মানাবে যেন। তার ঘুম পায়, নরম রোদ তখন রেশম। বিস্তৃত বারান্দায় শীতল ছায়া আর দুপুর অতিশয় গভীর, স্তব্ধ। বারান্দায় ভগ্ন শালখুঁটি, ছাগল নাদতে থাকে সেখানে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতার আগে ও পরে প্রলয় যুদ্ধ এই বৃদ্ধকে দু-নম্বরি ব্যবসায় উন্মাদ করেছিল। দরিদ্রনারায়ণ সেবা বেশ কিছুকাল স্থগিত আছে। ওই বৃদ্ধও ইতিহাস বলে যায় অনর্গল। এখন সে জ্বেলে দিয়েছে বিপদ-সিগন্যাল। সদু বিশ্বাস করছে অন্ন যা প্রত্যাশা করে, যা যা ভাবে, একদিন সমস্তই হুবহু ঘটে যাবে। দিদির বিয়ে হয়ে গেল, অন্ন জানত এরকম হবে। যেমন চনুর দাদু এখন বলল সবকিছু ওই ভাবে মিলে যাবে, মিলে যাওয়ার কথা। সদু সেই 'ছাওয়াল' যার ওপর ন্যস্ত আছে জটিল এক দায়ভার। সে জানে, আজ এই মুহূর্তে জেনে যাচ্ছে। তাকে লেখাপড়া শিখে বি এ এম এ আরও অজস্র পরীক্ষা চৈতি সংক্রান্তির কাঁটাঝাঁপে পেরিয়ে যেতে হবে। 'শিক্ষিত', 'ভদ্রলোক', এবং 'বড়ো চাকুইরা' হতে হবে... যেমন তার লতায়পাতায় সম্পর্কিত ধলামামা, ফুলদি ও সোদপুরের কাকু। অন্ন তখন সদুকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথ ধরে মন্থর হেঁটে যাবে : অহন সদু তো এম এ পাশ দিছে... সরকারি অফিসার... হইলে হইব কি ছাওয়ালের মায় বলতে প্রাণ... অহন সদুর বিয়া দ্যাওন লাগে... আইসেন হগলে...

নিশ্চিত জানা যে সেই দিন আসছে, আনবে এই দুর্বল, অপুষ্ট, রুগ্ণ বালক, যার দু-দুবার টাইফয়েড হয়ে গেছে বলে কেবল ঘামে আর খিদে পায়।

ছাওয়ালডা গেল কই!

সদু! অ সদু!

বস্তুত গত দু-দিনে অন্নর সঙ্গে সদুর কোনো শব্দ-বিনিময় ঘটেনি। হতে পারে তা বিয়েবাড়ির ধর্ম, বা ওই শোলার মুকুট, তেল-ঝাল-গন্ধ তিনটি প্রাণীর মধ্যে ঢুকে পড়ে বিচ্ছেদ-রেখার মতো, শূন্য স্থান গড়ে তোলে। আর সময় যতটা ঝরে গেছে তাতে ছিল অনুভব, উদ্‌বেগ-ও। অন্নর এই সম্বোধন ভিন্ন অর্থ পাচ্ছে সদুর কাছে, সে যথার্থই কোথাও গেছে, কিংবা এর পর তাবৎ নৈকট্য ধারণ করবে বিচ্ছেদ-গর্ভ। সদুর কী অভিমান ছিল, সরির আশু গমন কি স্থায়ী গর্ত খুঁড়েছে? ধস, যাতে সম্পর্কের জোড় খুলে যায়। এখন হাঙ্গামা চুকে যাওয়ায় অবসাদ, ফলে শরীরের অ্যালাভাব কাটিয়ে তারা ফের পরস্পরের কাছাকাছি আসতে চাইছে। ভগ্ন শালখুঁটির আশ্রয়ে। সে অন্নর মুখোমুখি হয়।

আইজ দিদির সঙ্গে যাবা!

নাহ্।

হোন তো আগে...

জানি, দিদির শ্বশুরবাড়ি, আমি যাব না।

দিদি চইলা যাইব তর মন খারাপ করব...

নাহ্।

সদু!

নাহ্।

সরি চলে যাবে সেই প্রস্তুতি গড়ে উঠছে তখন, তার যাত্রার সময় উপস্থিত কিছু মাঙ্গলিকে, ব্যস্ততায়। এখন তিনটি প্রাণীর এই সংসার, সম্পর্ক, পেয়ারাডালের ছায়ায় খাওয়াদাওয়া, শোওয়া, আলস্য, বকবক, অজস্র জল্পনা, কলহ ও শৈথিল্য সমেত যে ভারসাম্য সেখানে আলোড়ন, ক্ষয়। তারা পরস্পরকে ছুঁতে পারছে না, পরস্পরের গন্ধ পাচ্ছে না। বদলে যাচ্ছে দ্রুত, দ্রুত তাদের কত বয়স বেড়ে গেল! এত সব গূঢ় রহস্য জানা থাকায় সুলতান আলম স্ট্রিট ক্ষেমির বার্ধক্য পাচ্ছে, বড়ো নির্বিকার। তখন চামড়ায় ভয়ের প্রলেপ থাকায়, যেখানে, যে-বাড়িতে যাচ্ছে তার অনুমান অসম্ভব বুঝে, সরি মেনে নিয়েছে পরবর্তী আলো-অন্ধকার। অন্ন করুণ, ভেঙে যাচ্ছে এভাবে : তয় যাবি না! যাবি নাহ্!

তখন সামুদ্রিক মাছের অনুকরণে অন্নর মুখে সাদা-সাদা সরু দাঁত দেখা যায়, চোয়াল ভরিয়ে হাঁ-মুখের অন্ধকারে মিশে গেছে সেই দাঁত, প্রতিফলিত রোদ। অন্ন প্রত্যেকটি শব্দের ওপর জোর দেয় বলে দৃঢ় দুটো চোখ ঝলসাচ্ছে কাচটুকরো : তয়। যাবি। নাহ্...

অথচ এই যে অপোগণ্ড মানবসন্তান দুটি চাঁদের দরাজ আলোয়, খর রোদ ও কাদার পৃথিবীতে ধোঁয়া আর খিদে চাগিয়ে ক্রমশ বেড়ে উঠছিল, অন্ন তাদের একমাত্র সম্পর্ক, অবলম্বন। যা ছিন্ন হলে তারা নিবর্ণ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হবে। জানতে পারবে না কী তাদের কর্তব্য, বা ভবিষ্যতের সত্য-মিথ্যা কোনো অর্থ জানা না-থাকায় কেবল পিছল খাবে। ক্লান্তির বেদি ভেঙে, তছনছ করে, প্রবল খিদে ও ঘুমস্রোত তাদের দিকে জমাট অন্ধকার ছুঁড়বে। তারা বাঁচবে না, বাঁচতে পারবে না।

ভিক্ষা কইরা খাইতে হইত... তখন বুঝতি!

এই এক বাক্যে সমস্তই নির্দয়, নির্দয় সত্য। তাতে ওলোটপালোট স্মৃতি। ঘড়িঘরের তলা থেকে তখন মহরমের জৌলুস উলঙ্গ বুক আর পিঠ নিয়ে এগোচ্ছে, রক্ত, সূক্ষ্ম রেখা ও অস্ত্রফলায় : ইয়াহাসান! ইয়াহোসেন! ইয়াহাসান ইয়াহোসেন...

হুম্ হুম্ শব্দ শ্বাস তরঙ্গ, জীবন-স্রোত।

আর অন্ন তখনও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে বলে শ্বাস কষ্ট : তয় যাবি না? যাবি না? বেশ যাইস না। তর কাম নাই যাইয়া... থাক এইহানে... সরি গেলে আমিও যামু গিয়া, থাক দেহি তুই... থাক একা... দ্যাহেন আপনারা হগলডি... কালসাপ পুষতাছি... থাক তুই।

তখন অলংকার বেজে ওঠে : ভাই!

সরি একটা নতুন জামা শূন্যে ওড়াচ্ছে : গায় দিয়া নে।

সদু প্রত্যাখ্যান করতে পারল নম্র, কাতর : নাহ্! তুই যা।

সরি নত, বসে আছে, দশাসই জোয়ান-মানুষটার ভঙ্গিতে কুণ্ঠা আর একপ্রকার অপরাধবোধ। কোথাও অশ্রুপাত স্বাভাবিক ছিল! অথচ সরি ছাড়া আর যার চোখে বাষ্প, মেঘ ইত্যাদি নির্ভুল থাকবে বলে অনুমান— সেই অন্ন, বজ্রাহত বৃক্ষের প্রকৃতি পায়। অন্নর বিমূঢ়ভাব শোক ভেবে প্রথানুগ সান্ত্বনা-ধ্বনির প্রহার থাকে। সরির নিঃশ্বাস দ্রুততর, নাসাপুটে কম্পন, এর সঙ্গে মেশে দু-একটা শব্দ যা আদপে স্পষ্ট নয়। চনুর মা সরির মাথায় বোলাতে থাকে পাঁচটি আঙুল, চনুর মার ভ্রম হয়, ওই শীতল স্পর্শ : ওঠ... সরি! এই শব্দ দুটিতে প্রতিধ্বনি, যেহেতু সেখানে রণর ঠাকুমা, উকিলবাড়ির বউ ও ক্যাওড়াপাড়ার দু-চারজন এয়োতি ছিল, তারা সমস্বরে বলে : ওঠ... সরি!

ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

সুলতান আলম স্ট্রিটে ধুলো উড়েছিল, ওই রাস্তা ও আশপাশের বসতি ধুলো হয়ে যায়। মুছে যায়। মামুলি, আনাড়ি দিন খসে গেছে। ধুলো, মরাপাতা, ছাতা-নাতায় সারিবদ্ধ দিনের নিয়মানুবর্তিতায় সপ্তাহ, মাস ইত্যাদি লুণ্ঠিত। আবহাওয়া বদলে গেছে বৈপ্লবিক, এখন শুষ্ক চৈত্র আর এই তীক্ষ্ণ ধাতব আবহাওয়ায় অন্ন ভ্রমে পড়ে, সে সরির জন্যে চাল নিয়ে ফেলে। অথবা চাতাল থেকে চিৎকার : ভাতের হাঁড়িডা নামাইস...অ সরি!

কিংবা সে হঠাৎই ডেকে ফেলে : সরি...অ সরি!

চনুর মা হেসে ওঠে : কী সরি সরি করতাছেন...

ভুল হইয়া যায় বুইন... কয় দিকে যাই... মনে থাকে না হগল সময়।

হেই ছ্যামড়া কই?

আমার কপাল! হে কি ঘরে থাকনের পাত্তর...।

ডিউটি-ফেরতা ফায়ারম্যান কালাচাঁদ হুট করে আসে যায়, কখনো রাত্রিবাস করে, নীলকুর্তা আর পাতলুনে তার শরীর ঢাকা। সঙ্গে একটা টিফিন-বাক্স, গামছা, লুঙি আর একটুকরো কাপড়-কাচা সাবান থাকে। খাটের ওপর সদুর আর সরির বরের বিছানা হলে সে অন্নর সামনেই বিড়ি ধরায় : আপনের মাইয়ায় কইতেছিল...।

সরল, আন্তরিক কত কী বলে যায় সে।

অনেক পরে অন্ন বলে : অ্যাহন ঘুমাও!

ইতিহাস-ভূগোল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেও অঙ্ক তার জন্যে গণিতশাস্ত্রের অসীম ব্যঞ্জনাময় শূন্যটি ধরিয়ে দেওয়ায় সদুকে সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কে বিসর্জন দিতে হচ্ছে কর্মময় দুপুর। অথচ এই দুপুর সর্বত্র ওড়াচ্ছে, ছোটাচ্ছে হাফ-প্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট, দুপুর কী অসম্ভব গতি সঞ্চার করে, ঝটপট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বদল করতে হয়, কী মত্ততা এই শুষ্ক নির্জনতায়। গ্রীষ্মকালীন এই অবকাশ এক প্রবল জলস্রোত, শব্দ, ভয়ানক ক্রীড়া, রোমাঞ্চ! তৃষ্ণার্ত শরীর ফেটে যায়, ঘামের আশ্লেষ চায়। সে দরদর ভিজতে চায় ঘামে, তখন হাসি, নির্দয়, সাদা।

তখন তারা, সে, গলু ও রণ, ভেলা ঠেলছে। ডোবা তখনও কালো জল, গভীর, স্থির। কচুরিপানার ভেলাটি মাঝ-বরাবর ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, জল ভাঙছে লগির শব্দ। জলের শব্দ। গলু লাফিয়ে উঠছে, গোড়ালির চাপে ভেঙে দিচ্ছে। সেখানে জল ঢুকে পড়ছে, ভেঙে দিচ্ছে

সেই তুচ্ছ ভেলা। আলগা পানা দূরে যাচ্ছে, ভেলা ক্রমে ছোটো হতে থাকে। রণ সাঁতার জানত না বলে সর্বদা আগাম নিরাপত্তা চেয়ে নিত : বেশি দূর যাবি না কিন্তু! রণ হেসে ফেলত, আসলে জানাই যে যাবে, না-গেলে কোনো মজাই নেই। মাঝ-বরাবর এসে গলু যখন পা দিয়ে ভেলা ভাঙতে থাকে, জল তখন বিপজ্জনক, নির্দোষ সেই বিপদ চিনিয়ে দিচ্ছে প্রতিটি রোমকূপ। একসময় তারা ফিরে আসে, কেউ মরে না, অথচ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থাকে। ফলে ডাঙায় উঠে হাসত, পরস্পরকে ধাক্কা দিত আর প্যান্টের পট্টি নিঙড়ে জল ঝেড়ে ফেলত। মারাত্মক অভিযান, ভয়ংকর কিছু করার এক আগুনস্রোত থাকত, কাদায় তারা আছড়ে পড়ত পরস্পরের ওপর, শরীর তদ্দিনে বুঝে গেছে প্রলয়-তাকত। তাতে অস্থিরতা। এই অস্থিরতায় সদু জলা ও সাঁকোর অস্পষ্ট প্রান্তে, ধোঁয়ায় ভাস্কো-ডা-গামার গামবুট ও বাহারি পালক দেখেছিল নিখুঁত। এত কিছু জমতে-জমতে তারা তিন বন্ধু একসময় বাধ্য হয় দুর্দান্ত অভিযানে, এই বাধ্যতা অঙ্কের সিঁড়িতেও ছিল। সদু যথার্থই সিঁড়ি ভাঙে।

দূরে ট্রামরাস্তায় তাদের সার্ট বাতাস পেয়ে ফুলছে, ডানার বিভ্রম।

ঘড়িঘর ছাড়াতেই তারা সিনেমা হলটি পেয়ে যায়, গলু হঠাৎ গম্ভীর 'দেখবি নাকি?' রণ প্যান্টের পকেট থেকে সাদা কাপড় টেনে উলটে দিল, সিগারেটের শুকো ছড়িয়ে গেল। ওদের সামনে তখন দেওয়ালজোড়া নায়িকা-বুক, নায়িকার বিশাল বুক দেওয়ালে, পানের পিক ও খিস্তি। গলু সিগারেট টানতে-টানতে বলে : এই বইটা দেখতে-দেখতে হামিদ চুয়ান্নি ছুঁড়েছিল। তারা হামিদকে চেনে না, হামিদের কথা জানতে চায় না। গলু হামিদকে নকল করল : লে চুয়ান্নি!

সদুর বিশ্বাস হয় না, সে হাসতে থাকে : লে চুয়ান্নি! ধ্যুৎ!

তোর বিশ্বেস হচ্ছে না, বেশ চ নিজের চোকেই দেখবি।

চুয়ান্নি মানে কি!

চার আনি... চুয়ান্নি... মজা হলে ছোঁড়ে।

কীসের মজা!

রূপকুমার লীলাবতীকে জাপটে ধল্লে... লীলাবতী চ্যান করলে... নাচলে... ফাইটিং হলে...

এভাবে সংলাপ অক্ষুণ্ণ রেখে হান্টারওয়ালি ছবির তিনটে টিকিট কাটা হয়। অন্ধকার ভেঙে গোঁত্তা খেতে-খেতে এগোয়, সামনে সরু আলো কেঁপে-কেঁপে তাদের ডাকতে থাকে। চৌকো অন্ধকারে তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পায় না, পেছন থেকে তীব্র আলোর ফোকাসে রোগা ঘাড়, শুকনো চামড়া, ঘাড়ের ছাঁটাচুল ঝলসে ওঠে। সাদা পর্দা চকচক করলে, চলন্ত ট্রেন থেকে হান্টারওয়ালি সদুর দিকে জাম্প মারে... বিশাল বুক তার ক্ষুদ্র শরীর টেনে নেয় ভৌতিক।

মায়ের নাম চুটকি বান্‌দি
পুতের নাম হোলতান খাঁ।।

কী করে যেন সরির একটা আস্ত শাড়ি থেকে গেছে। দেওয়ালে নারকেল দড়িতে হাওয়াই সার্ট, হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি ও থানের সঙ্গে একপাশে ঝুলছে। বেশ কিছুকাল তাতে হাত না-পড়ায় এবং ক্রমাগত সরতে থাকায় প্রতিটি কুঁচি অক্ষত। অনায়াসে কাপড়টা বেশ কিছুদিন পরতে পারত অন্ন, কিন্তু তার দ্বিধা, তার লজ্জা, এমনকি গ্লানিও। সে রঙিন কাপড় পরে না। ফলে তার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব, বা জবরদস্তি ভুলতে পারে। তার এই ভুলে যাওয়া সদুর বিশ্বাস্য ঠেকে। অত মনে থাকার কথা নয়, কী করে আর মনে থাকে। এবার এলে সরিই হয়তো নিয়ে যাবে।

অথচ এই তুচ্ছ বস্ত্রে সরির না-থাকা কত প্রতীকী! শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সরি আছে এখনও রুক্ষ, চড়া গন্ধে... সেই নোনা গন্ধ উপড়ে ফেলছে স্মৃতি। ঘটনা বিভ্রাট তাতে, সময়ের পারম্পর্য ভেঙে এটা সেটা মনে পড়ে যাচ্ছে। অথচ সদু টের পায় কেমন সশব্দে ভেঙে যাচ্ছে স্মৃতির প্রাসাদ, বেদিটিতে কত ফাটল, শ্যাওলা... বেদিটিই ধ্বংস হচ্ছে ধ্বংস হবে... সরি বিস্মৃতিতে চলে যাবে।

দেইখেন মা-লক্ষ্মী... আপনার চিন্তা কী অন্নদি... না বউমা ছেলে তোমার... আমার আর কোনো দায়িত্ব নাই চনুর মা দিদি অহন সদুর...

এভাবে সদুকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে কত শুভেচ্ছা। সরির ব্যাপারে তেমন জিজ্ঞাসা নেই, বরং স্বস্তি আছে, সরির বিকাশ সম্পূর্ণ। সে যেন-বা বিকশিত হয়েছে হুবহু, যেমনটি তার হওয়ার কথা ছিল, হওয়া উচিত ছিল। অন্নর আশা, অন্নর অস্তিত্ব এখন একটিমাত্র নির্ভরতা জানে, আর তা-ই সদু। ওই নির্ভরতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় দ্রবীভূত স্নেহ, এতে সাকুল্যে একটি গণ্ডিও থাকে। টের পাওয়া যায় সে নিজেই সব নয়, সদুর উচিত-অনুচিতের নির্ধারণও এখানে। কিছু কিছু বিষয়ে তার অতিমাত্রায় আগ্রহ ও নিষ্ঠা থাকার কথা, আর বিপরীতে শুধু নিরাসক্তি নয়, খাঁটি ঘেন্না থাকার কথা। এগুলো যথার্থ মিলে গেলে উকিলদাদু, চনুর মা ও অন্যান্যের এতসব স্তোকবাক্য, আশ্বাস মূর্ত হবে, প্রাণ সঞ্চার ঘটে যাবে।

সুতরাং আতঙ্ক। গভীর অন্ধকার গর্ত, ঘাম ও সেই মারাত্মক ট্রেন আভূমি থরথর কেঁপে উঠছে। কেউ কী কাটা পড়ল লাইনে। লাইনে কেউ পেতে দিয়েছিল গলা, ক্যাওড়াপাড়ার সঙ্গে তার কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সে তার গলাটি পেতে রেখেছিল বলে একবার চাক্ষুষ করেছে রক্তের ঘনত্ব, উষ্ণতা। দুর্ঘটনার পর সরি সেদিন খেতে পারেনি, ভিড় বৃত্তে সদুকেও দাঁড়াতে দেয়নি : চ, দেখিস না!

সরি কী খুব ভয় পেত। কেন? গলুর ভয় নেই অথচ সেও দাঁড়াতে পারেনি, বৃত্তটি নিখুঁত ছিল বয়স্ক ও শিশুর জটলায়, দীর্ঘ কাল তারা হরণ করে নেয় পর্যবেক্ষণে। অন্ন, চনুর মা, এমনকি চনুও স্বীকার করে নিয়তি, দুর্লঙ্ঘ্য লিখন। মানুষের কপালে ভবিষ্যৎ আঁকা থাকে এই বিশ্বাস।

দেইখেন মা-লক্ষ্মী...

তারা সমস্বরে বলে উঠছে :

জজ হইব...

পণ্ডিত হইব...

ভালো হইব...

হইব...

সদু কী সবাইকে ডেকে ডেকে হান্টারওয়ালি সিনেমার গল্পটা বলবে? ট্রেনের ছাত থেকে লাফিয়ে পিস্তল বাগিয়ে, ছুটন্ত ঘোড়ায় ডাকাতির রোমহর্ষক কাহিনি। গল্পটা সে যেন প্রকৃতই বলছে। সকলে চুপ, ওই স্তব্ধতায় ভর্ৎসনা, বিস্ময়, এমনকি ভীতিও।

কেউ চিৎকার করে উঠল : মর, মর।

মুহূর্তে সেই নারী অচৈতন্য, সাদা থানটিই ত্বক এবং তা উড়ছে, অম্নর মৃত্যু হবে।

ফলে এই হান্টারওয়ালি বৃত্তান্ত একমাত্র সরিকেই বলা যেত, তার ধৈর্য ছিল সবটা শোনার, যদিও সরি নির্ঘাত সন্ত্রস্ত হত : ছিঃ সদু। এই ধিক্কারে কী আকর্ষণ, একটু বা প্রশ্রয়ও। অর্থাৎ সে যেন বলতে চাইছে : ঠিক আছে তবে সাবধান মনে রাখিস। তাকে মনে রাখতে হতো, অনেক কিছুই তার মনে রাখা উচিত, উচিতও নয়, নির্দিষ্ট। সে বাধ্য। অথচ সরি না-থাকায় বৃত্তান্তটি গোপন থেকে যায়, সদুর গোপন সঞ্চয় গড়ে উঠতে থাকে।

গোপনীয়তা কি অন্যায়? সে কি পাপ করেছে? পাপ করছে? অন্ধকার, সুড়ঙ্গ আলোর তীব্রতা ও দুটি ঘণ্টার শ্বাসকষ্টে, ঘামে অসাড় দর্শকবৃন্দের উত্তাপ ও শিসধ্বনিতে সে জ্বরে পড়েছিল। টানা দু-দিন জ্বরে পুড়ে গেছে। এখানে অন্যায় কোথায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পাপও সে প্রত্যক্ষ করেনি, কেবল অপার কৌতূহল ছিল। তা-ই কি পাপ! নাকি নিষেধাত্মক হ্রস্বধ্বনি 'না' এতখানি অমোঘ। 'না' ধ্বনিটিতে প্রাচীর উঠে যায় বিদ্যুৎগতিতে। বারবার এই এক ধ্বনির মুখোমুখি তার শরীরগ্রন্থিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্র ও বিদ্যুৎ-সহ।

সিনেমা দেখার ফল কপালে নির্বোধ যন্ত্রণা। ঘুম পেয়েছিল। জ্বর হওয়ার কারণ তার জানা নেই, তবে গলুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা তখন তার অভিজ্ঞতায় নেই বলে সেসব বড়োই মামুলি। তবে মাথা ধরেছিল বড্ড। অস্পষ্ট শঙ্কা ও উত্তেজনা ছিল নষ্ট হওয়ার। নষ্ট! কী হলে, ঠিক নষ্ট হওয়া যায়! জানা সম্ভব কি? কেউ জানে? সে তো শুধুই শুনেছে : গলু অ্যাক্কারে নষ্ট হইয়া গেছে... অগো আর কী। রণ? রণও নষ্ট? অথচ কেউ নিশ্চিত নয়, কেননা 'অগো, আবার কী' এই বিচারটি থাকায় গলু-ও নষ্ট নয়, সে তার গোত্র ধর্ম অনুযায়ী ঠিকঠাক আছে। ফলে ধোঁয়া, ছোঁয়ার ছলনা নেই, শূন্য বাতাস তাতে স্পষ্ট, কত অবয়ব ভেঙে যায় তাতে। ভবিষ্যৎ-ভাবনা চকিত বিদ্যুৎ, নীল তরোয়াল উঠে আসে, চিরে ফেলে তাকেই। তখন তীব্র স্রোত ছিল শব্দের। সদু সরির অভাব বোধ করে, সম্পর্ক খোঁজে আর অন্তর্লীন ধ্বনিস্রোত। সে তখন স্বরভঙ্গ। তার গলা তখন বড়োই কর্কশ, গম্ভীর, ফ্যাসফ্যাসে, অথচ প্রতিটি শব্দের কী গুরুত্ব তখন।

সরি নেই, তার না-থাকা কোথাও কাঁটা নয়, যে বিদ্ধ হবে। এমনকি কোথাও এমন একটা তুচ্ছ মামুলি বস্তু নেই যাতে তার শরীরস্পর্শ গন্ধ। কিছুই থাকে না, রঙিন ফিতেও লোপাট। সম্পর্ক

শিকড়, ক্রমে বেড়ে ওঠা, পূর্ণায়ত গাঢ় পাতা যেন স্মরণ করাচ্ছে একটি গাছের স্থানিক অবস্থান, ডাল। কিছু আকার, রোদ ও ছায়ার ক্ষেত্র। সরির থাকা কিংবা না-থাকা প্রকৃতই কিছু নয়, এমনকি তা বিস্মরণও নয়। সে যে এখানে নেই তাতে কেউ বিদ্ধ হচ্ছে না। সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপাড়ার সান্নিধ্যে যেখানে যতটুকু ক্রমিক বদল সেসবই এক দীর্ঘ সময় নিয়ে ঘটেছে।

জ্যামিতিক এই ক্ষেত্রটি পূর্বাপর নয়। কিছু মানুষের থাকা না-থাকার ওপরও তো নির্ভর করে দৃশ্য। ভারী অন্ধকার, ধোঁয়া-বাতাস, বর্তুল আলো। আলো ও অন্ধকার, আর বর্ণবৈচিত্র্য ও ধ্বনিময় গতিরেখায় নিমজ্জন কী গভীর! সরি তো কতবার সেখানে ডুবেছিল, ভেসেছিল। দৌড়াদৌড়ি, শ্বাসঅভিঘাত ও কম্পন।

সরির ব্যাপারে অন্ন ও চনুর মা যে দু-চারটে কথা বলছে তা কেবলই তথ্য, স্বস্তি : সরি ভালো আছে... ভালোই আছে। অথচ সরি কেন ভালো আছে, ভালো কী, কাকে বলে, সেই আদত কথাটার কোনো ধ্বনি নেই। কিছু কি গোপন করা হচ্ছে? গোপন কিছু আছে কি যা ভালো নয়, যাতে জটিল সংশয়, উদ্‌বেগ। সদু ওই গোপন নাস্তি টের পাচ্ছিল। তিনটি প্রাণীর একত্রে থাকায় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল রক্তস্রোত ও স্নায়ুমণ্ডলীতে। সে, তারা, অনুভব করতে পারত পরস্পরকে। আলো, ছায়া ও নক্ষত্রের কচিৎ ঔজ্জ্বল্যে কতবার অন্ন স্পর্শ করেছে সরিকে, সরি সুদকে। অন্ন, সরি, সদু, তারা অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তখন সরির নগ্ন পিঠে অনুভূতিময় সেই বক্ররেখা দেখা যেত। এই ক্রম পরিণতি কি আত্মসাৎ করে জল ও বাতাস? যেভাবে বিকর্ষণ তেজস্ক্রিয়, গড়ে ওঠে পাকা ফল, সাদা সূক্ষ্ম বিচি, তুলোর আশ্রয়ে ভাসা বীজ।

সরির বর আইছিল... জামাই কয় কী জানেন! ...ডর লাগে... আমার ডর লাগে... পুলাপান... সরির বয়স আর কত? আপনে তো হগলই জানেন, সরিরে ল্যাংটা দ্যাখছেন। কেন জানি ডর লাগে...

আমারে কয় অগো লগে থাকতে...

চাতালের বাস্তব পেয়ারা গাছ মায়াবী তখন, সরু সরু ডাল ধুয়ে যাচ্ছে অলৌকিক জ্যোৎস্নায়, সরির কাছে এই বৃক্ষ তখন নির্ঘাত স্মৃতি। স্মৃতিতে যে ধূসর দূরত্ব থাকে তা অটুট। এমনকি তা হারিয়েছে স্থানিকতা, আকার ও বিমূর্ত সমস্ত রেখা। বৃত্তের যা-কিছু নকল ও নিখুঁত কল্পনা, তুচ্ছ ও সূক্ষ্মতম বিন্দু। সবই অদৃশ্য। অথচ এইসব রেখা, বৃত্ত ও বিন্দুতেই সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপাড়ার যথার্থ প্রকাশ, তা-ই মানচিত্র এতাবৎ। এখন তো গোলকটি প্রকৃতই কত ঘুরেছে, দীর্ঘ বক্ররেখায়, রচনা করেছে বৎসর। শূন্যে চিরায়ত কলঙ্ক, শূন্যে নিষ্কাশিত রোদ, এইসব এক সময় ফাঁস করে দিচ্ছে, 'সরি সন্তানসম্ভবা।'

আমারে কয় অগো লগে থাকতে...

খারাপডা কি!

অ্যাহন সরির বাচ্চা হইব, হেইয়ার লগে সমাদর।

তাই কন!

আমি কইয়া দিছি তেমন বোঝলে সরিরে রাইখ্যা যাও... তয় তোমার টাহা দিতে লাগব।

হ।

ঠিক করি নাই? কী কন?

অন্ন এভাবে সাত-পাঁচ খুচরো সমস্যা এনে ফেলে। এতসব ঝামেলায় সরি অস্বীকৃত হচ্ছে, যে কেউ হয়ে যাচ্ছে, অন্য এক পরিবার, অন্য কারো কথা অনর্গল বলে যাচ্ছে অন্ন। এতে জখম ছিল, গভীর চোট ছিল। সরির অনস্তিত্বের সকল ব্যঞ্জনা তার আয়ত্তে, সরি চলে গেছে প্রমাণ সাইজের শূন্যতা রেখে। সে এখন শূন্যতার অবস্থান খোঁজে। তা কি অন্ন ও সদুর অন্তর্বর্তী? ওই শূন্যতা অনড়, তাদের দুজনের মধ্যে তা প্রোথিত। ফলে দূরত্ব আছে, দূরত্ব থাকে।

কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক জটিলতা, বোধ ইত্যাদি বিস্তৃত রেখে অন্ন ক্রীড়াময়। কপট ক্রোধ ও বিরক্তির আস্বাদ পাচ্ছে। ক্ষমতারও যা পুঞ্জীভূত ঘামে, রোমকূপে। কারণ সরির হিল্লে করে দিয়েছে এই বিধবা। এখন সরি প্যাঁচাচ্ছে নিজেকে, নিজস্ব তন্তুজালে, নির্দোষ শিশু-হাস্য সেখানে খলখল, জলস্রোত। আর কী? অন্ন হয়তো এর পরেও হঠাৎ এনে ফেলবে আন্তরিক বিষণ্ন স্রোতটি : সরির প্রথম সন্তান আমাগো কত আহ্লাদের...

অন্ন যেমন-যেমন বলছে, ভাবছে, ঠিক ওইভাবে সবই মিলে যাবে। আর সদু জানে, বা আন্দাজ করতে পারছে, ওই কয়েকটা দিন অন্ন অন্নপূর্ণা। সে সরিকে বলবে : মাছখান খাইয়া ফ্যাল সরি, সদু খাইয়া ল, ফ্যালাইস না...

অন্ন দশ-বিশ টাকা ধার করে ফেলবে। প্রাচীন ও বংশানুক্রমিক এই ঋণ ধারাবাহিক তথ্য নয় শুধু, ঐতিহ্য। তাতে আনন্দ এমনকি গর্বও। যা প্রকারান্তরে গ্লানি। সদুকে শিক্ষিত করার মরিয়া চেষ্টাতেও ওই গ্লানি অমরত্ব পাচ্ছে। অথচ সদুর লক্ষ্য ছিল বাসের কনডাকটরি, তার হাতে দুর্গম জায়গার একগোছা টিকিট থাকত সর্বদা। কানাইমাস্টারের স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটিমাত্র মিথ্যাচার তাকে টের পাইয়ে দিয়েছে অনিবার্য ছকটি। এখনও সে রীতিমতো অনুভব করে কী করে কখন মহার্ঘ টিকিটগুলো উড়ে গেছে।

নীল রঙের রেজাল্টটির জন্য ভ্যানিশিং লোশন কেনার চাতুর্য ছিল। তাতে অঙ্কের শূন্য খোপটি সন্তোষজনক ছ-এর ঘরে নম্বর পায়। হাই স্কুলে যাওয়ার দিন দ্রুত এসে পড়ে। চনুর দাদু রেজাল্ট প্রসঙ্গ তুলে অন্নকে ঘায়েল করেছিল : দশজনের একজন হইব... দেইখেন...। অন্ন তখন ক্রমে সংজ্ঞা হারাচ্ছে, নেশা গেঁজে উঠছে, সে ভাসছে! বৃদ্ধের প্রতি কী কৃতজ্ঞ সে। অথচ তা প্রকাশ করতে পারছিল না, ফলে কষ্ট, বানানো ওই গল্প, গল্পের সামগ্রিক মিথ্যাচার বিশ্বাস করছে বলে অন্ন বড়োই একা। সদু তখন এই জালিয়াত বৃদ্ধকে সগোত্র ভাবে, যেহেতু সে নিজেও রেজাল্টটি জাল করেছে। আর দুজনের থেকে সমদূরত্বে অন্ন গভীর একা। সেই প্রথম সদু টের পেয়েছিল অন্নর ঔজ্জ্বল্য, তার এতসব কামনা আদতে কতখানি নির্দোষ, জালিয়াতির বৃত্তান্ত তার অজানা। সদু এখন স্পষ্ট বোঝে, সজ্ঞানে সে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে চেয়েছে, ফলে ওই ঠগি কারবার নিছক নিয়ম লঙ্ঘন নয়, বরং তা-ই সমর্পণ, আকাঙ্ক্ষা।

তখন সদুর সামনে দুটি চরিত্রের মর্মরমূর্তি। এক তো দলিলের মুসাবিদা, ন্যুব্জ চনুর দাদু ও এনামেল টাক। সাদা নির্দোষ কাগজের আয়তক্ষেত্রে বর্ণমালা হেঁটে যাচ্ছে, কালো ডেয়ো পিঁপড়ের অনুকৃতি, সেখানে নির্বোধ বুড়ো আঙুল সরু রেখা সমেত ডিম্বাকার ছাপ রাখে। আর একজন বিদ্দেসাগর, দারিদ্র্য ও ব্রাহ্মণ্যহেতু সদুর সঙ্গে যাঁর তুলনা শোনা গেছে বহুবার। অজ্ঞ মানুষ চেষ্টা

করেছে এই আদর্শটি তাকে ধরিয়ে দিতে, প্রবল দামোদরের ভুল-জলোচ্ছ্বাসই একমাত্র প্রতিবন্ধক। সদু এখানটায় ভয় পেত। সে এড়াত চাদর জড়ানো ওই প্রস্তর। যেন-বা নির্দেশ উঠে আসত সমগ্র শরীর মন্থন করে, সেখানে নিষেধ। ভুল হওয়া ও ভুলে যাওয়া চাঞ্চল্যে, দৌরাত্ম্যে এক-একটা দিন গড়িয়ে যায় যেন রবারের বল। গলু আর রণ রোজগেরে হয়ে যাওয়ায় খুচরো পয়সার ঝনঝনাৎ শব্দ কী রোমহর্ষক! ওই শব্দের জন্যে কী তীব্র প্রতীক্ষা! ওই শব্দ আলাদিনচিরাগ, সে সম্মোহিত।

চ!

চ।

সিনেমায় যাব না।

ঠিক আছে।

চ, কালীঘাট যাই।

বেশ।

মাংস ঘুগনি খাব।

খাব।

এক কাজ কর, রাস্তায় একটা চুয়ান্নি রাখি... যে শালা নেবে...

মজা হবে... চ... চ।

সুলতান আলম স্ট্রিট ও ট্রামরাস্তার সংযোগে যে বাঁকটি গড়ে উঠেছে, পেছনে চারু মার্কেট, পেছনে বরফকল,— সেখানে গলু একটা সিকি রেখে দেয়। রাস্তায় ওই সিকিটি পড়ে থাকে আলোকবৃত্ত, উজ্জ্বল চোখ। তিন জোড়া চোখ সামান্য দূরত্ব রেখে সেখানে ওই প্ররোচনায় নিবদ্ধ। বিভ্রান্ত ও লোভের ফাঁদ পেতে তিনজন শিকারি ধ্যানস্থ। এক-একটা মানুষ এগিয়ে আসে আর তারা মানুষটাকে বুঝে নিতে চায়, বাজি ধরে। এক-একটা মানুষ ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। সে, তাদের ভাবান্তর ঘটে, ওই ভাবান্তর কী অসহায়! লোকটা চারদিক সতর্ক দেখে আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনজোড়া হাত বেজে ওঠে। উল্লাস, করতালি, হো হো শব্দ। হো হো শব্দ তখন পিচরাস্তায়। ওই শব্দও উচ্ছ্বাসে চাকার ঘূর্ণন, তীব্রগতি, দরদর ঘাম।

ভাড়ার সাইকেল সারা দুপুর তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, লেকের ঘেরা রেলিং, ও ঢাকুরিয়ায়। ওদিকে ভাটিখানা, কলাবাগান, কুদঘাট ও আদিগঙ্গা। সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে তারা ওই গঙ্গা দেখে, পাঁকের স্রোত দেখে। কখনো আকস্মিক স্টেটবাস ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন মৃত্যুর উত্তেজনা, ঘাম। এক্ষেত্রেও যা ঘটে, ডোবায় ভাসানো ভেলারই পুনরাবৃত্তি তা। রোমকূপ আশ্রয় করে মৃত্যু, শিরশির স্রোত খেলে, সামান্য জমে ওঠে, বিকশিত হয় রক্তবিন্দু। ছড়ে-যাওয়া কনুই কিংবা গোড়ালিতে থুতু লাগানো হয়। আর পর-মুহূর্তে দুর্দান্ত চাকা ঘুরছে, যাতে রাস্তাঘাট দোকান সমেত বদলে যাচ্ছে সমগ্র তল্লাট। কতদূর যেতে পারে সে! কতদূর যাচ্ছে; গতি তখন চুম্বক, মাঠকোঠার ঘর ও তাবৎ স্মৃতি বাস্তবিক গুটিয়ে যাচ্ছে তাতে। অন্ন পড়ে থাকে, সদু বোঝে অন্ন সম্পর্কে তার আকর্ষণ, সেই শরীর-টান, কত কমে আসছে। কত সরে যাচ্ছে সে। এই বোঝায় কিছু একটা বিঁধে থাকে, রক্তক্ষরণ থাকে, আবার তা যেন অনিবার্য। অমোঘ টান আসছে রাস্তার। সাইকেলের চাকার।

গলিঘুঁজি, বাসরাস্তা, ট্রামরাস্তা পেরিয়ে তারা পুনর্বার কালুকাকুর সন্ধান করেছে। রহস্যময় একটি ঠিকানা ও ব্যক্তিত্বের সন্ধান বড়ো জরুরি ছিল। অভিজ্ঞতায় সেই একই নৈরাশ্য শিথিল, যেন-বা তারা দীর্ঘকাল এই অনুসন্ধান কাজে লেগে আছে। আর সাকুল্যে এই মেহনত তাদের বারবার বিপন্ন করে, যেন ওই স্বাচ্ছন্দ্য তাদের প্রাপ্য নয়, যেজন্যে কালুকাকু একটি প্রাচীন দালান ও সিঁড়ি সমেত লোপাট হয়ে গেছে। অন্ন একবার মাত্র এসেছিল, তার বর্ণনায় টানা দীর্ঘ কাঠের সিঁড়ি ছাড়া আর যা আছে তা ওই সিঁড়িরই ভুতুড়ে শব্দ। ওই শব্দের প্রতিধ্বনি থাকে, বৃদ্ধি পায়, যাতে পতন অনুভূতি। মনে হবে কেউ অনেকদূর উঠে হঠাৎ পিছলে পড়ে যাচ্ছে, গড়াচ্ছে। ওই পতনের শব্দের অনুভূতিময় বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল অন্ন। তাতে সংশয়, দালানটি কতখানি উঁচু, কতগুলো সিঁড়ি আছে, যে পড়ে যাচ্ছে তার কী হবে?

দীর্ঘ সিঁড়ি তখন ধোঁয়ায়, ফলে অন্তহীন, সদু এই সিঁড়ির ভীতি স্পর্শ পাচ্ছে।

অ্যাহন দ্যাশের মাথা...।

অন্ন বলেছিল, তা-ও যেন কতদিন আগে, যেজন্যে সদুর কল্পনা ছিল একটি সুবৃহৎ মাথার। এখন সে জানে অন্ন আদতে কী বলতে চেয়েছে, জানে অন্নর উদ্দেশ্য ছিল একটি সামরিক শোভাযাত্রা, বিস্ফোরণ ও দুর্লভ একটি কলম বোঝানো। যে-কলমটি ওই মাসিক বৃত্তির টাকা পাওয়ার সমস্ত রাস্তা সুগম করেছে, অন্ন পেনশন পাচ্ছে, প্লাস্টিক কারখানায় যেতে হয় না। আর এতসব কিছুর গভীরে, পশ্চাতে, থেকে যাচ্ছে ওই দুটি শব্দ : দেশ এবং দেশের মাথা।• দেশ শব্দটি কতই না বদলে যাচ্ছে, বদলে গেল, হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয় তার ক্রমিক বেড়ে ওঠার মধ্যে যেন-বা এই ব্যঞ্জনাটিও ধরা আছে। সাইকেল-চাকা থেকে সে তখন চলে যাচ্ছে একটি দুরন্ত গতির রূপকে, আর মুদ্রিত অক্ষরে। যেভাবে সে অনুভব করে, পুড়ে যায় জ্যৈষ্ঠে... বর্ষণে... ব্যাঙের, ঝিল্লির টানা শব্দেও কি দেশ থাকে? ওই শব্দ কী গভীর! তাতে যুক্ত আছে, থেকে যায় প্রত্যন্ত মানুষ যাকে সে দেখেনি। সেখানেও কী সম্পর্ক! দেশভাগ প্রসঙ্গে অন্ন যেমন কালু শেখের কথা বলত, কালুর বউর কথা : ঠাইরান ভাত দ্যান... কী সম্মানটাই না করত!

আর ছিল সম্পদরাজি, কৃষিপণ্য, দাপট।

বিপদে-আপদে মাইনষে বুক দিয়া করত...

বিরহের দুরন্ত টান ছিল অন্নর উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপণের বিশেষ রীতিতে, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার ছন্দে। শরীরের সামগ্রিকতায় শোকও ছিল। এতসব অনুভূতি কী অশ্ববেগসম্পন্ন! যেন প্রকৃতই তার শরীর থেকে সূর্য-মহিমায় নির্গত হয়েছে বর্ণালি অশ্ব : তেজ, ক্ষমতা, লোভ, মায়া, আরও কত কী! তার শরীর তখন উদ্ঘাটিত, অজস্র শিরা লাগাম মাত্র যা নিয়ন্ত্রণ করছে এমনকি দেশপ্রেম। অন্নর চেষ্টা থাকত পরিস্থিতিতে মহত্ত্ব আরোপের। কালু শেখ থেকে যে মহত্ত্ব দ্রুতগামী আশ্রয় করে কালু ঠাকুরপোকে, মানুষটি দেশের মাথা। সদুর মনে পড়ে যাচ্ছে মাথাটি, মাথার খুঁটিনাটি বর্ণনা :

কপাল গ্রাস করছে মরুস্রোত, ওই স্রোতের পেছনে নির্লোম বৃত্ত, সেখানে জাগ্রত শিরা, জট। শিরাটিতে কিছু একটা স্রোত ছিল, কম্পন, ওই বৃত্তাকার ঔজ্জ্বল্যকে যা আরও গুরুত্বপূর্ণ করেছে। কপালের নীচ থেকে শুরু হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, মামুলি একটা মুখ। ফলে একটি সূক্ষ্ম

বিভাজন রেখা নজর করা সম্ভব। ওপর দিকে আদিভৌতিক ওই স্নায়ুকুণ্ডলীর সঙ্গে তাবৎ দেশটি যুক্ত, যেন-বা সে-সবই যান্ত্রিক, রঙিন তারের সমষ্টি, রেডিও, টেলিগ্রাফ :

হ্যালো!

হ্যালো!

টরে...

টরে ট।

আজ সন্ধ্যার দিকে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত...

দেশ গঠনের জন্যে আমাদের প্রয়োজন... যুবসম্প্রদায়কে... হিন্দু মুসলমান... দাঙ্গা... আমরা ভারতবাসী...

তিনি এত কথা বলেননি, একবার মাত্র দেশগঠনের প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন, তাতেই প্রকাশিত সমগ্র দেশটি তিনি জানেন, বড়ো নিশ্চয়তা ছিল। সদু এতাবৎ গুরুগম্ভীর ভারী কথা যা শুনেছে, সবই ওই মুখনিঃসৃত মনে করে বিস্মিত। তার আদত বিস্ময় ছিল অন্যত্র। অভিজ্ঞতায় তার আন্তরিক অনুভূতি সবই স্থান নির্ভর, সামান্য ক্যাওড়াপাড়া-সংলগ্ন। আগে সে এই ক্যাওড়াপাড়া বলতে দেশ বুঝত, এখন দেশ শব্দটির ব্যাপ্তি জেনে বড়ো অসহায় সে। জানে না কী করে ওই ব্যাপ্তিতে পৌঁছোনো যায়। অন্ন কিংবা সরি, গলু, রণ, চনুর মা, ক্ষেমি কেউ জানত না। ক্ষেমি তো মরেই গেল, তার জানাও হল না। অথচ সে গোরা সৈন্য দেখেছিল, গাঁদীবাবা দেখেছিল।

কত দ্রুত বর্তমান হারায়, শামুকখোলায় গুটিয়ে নেয় নিজেকে। প্রাচীন সবুজ সময়-চিহ্ন সমেত ক্রমাগত কালো, অতীত। এই অন্ধকারে জালি আছে, বাহারি নকশা আছে, গোল ও চৌকো আলো কদাচিৎ ঝলসায় সেখানে, ফলে স্মৃতিও থাকে। এই স্মৃতি ইতিহাস না ইতিহাসের বিভ্রম? বাহুল্যবর্জিত একটি টানা কাহিনি, যাতে তুচ্ছ বস্তু অযৌক্তিক রাজকীয় গুরুত্ব ও সংবর্ধনা অর্জন করে। মহাপুরুষের জীবনীতে যেসব আপাততুচ্ছতা ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়, সেখানে একটি শহর, গাছ, কুকুর ও কবর কী গুরুত্বপূর্ণ! প্রাচীন সৌধ, স্থাপত্য সম্ভার ছাপার অক্ষরে ওই ভঙ্গুর সেতুটি নির্মাণ করে, কত কী যে তখন সংযুক্ত হয়! বীজ, বৃক্ষ, পত্রবল্লব, পুষ্প ও একটি পরিপক্ক ফল তখন বিমূর্ত, স্রোতবাহিত।

পূর্ণ দুপুর এখন শৈথিল্য, পেনসন মঞ্জুর হওয়ার স্বস্তি। কারখানা-সংলগ্ন ভোজপুরি গানের কলি ছিন্ন ধোঁয়া, তাতে ব্যক্ত হচ্ছে এই আকাঙ্ক্ষা, 'মেয়ে তুই কাঁদিস না শহর থেকে রেশমি চুড়ি আনব...।' এখন কমে হ্রাস পাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ, মন্থর দুপুর কোনো আহ্বান রাখে না : 'অ সদু! সদু!' এই আহ্বান ক্রমে হারাচ্ছে সেই তীব্রতা, তা আর ধ্বনি হয়ে উঠবে না। এখন তা কেবলই কার্যকারণ সূত্র, ওই সূত্রের আধিপত্য 'সদু' এই ধ্বনিতে যে বায়বীয় কম্পন ছিল তা এখন কুণ্ঠা। এখন তাকে ডাকতে গেলে অন্নর পক্ষে মজুত কারণ থাকা চাই, এই আহ্বান দাবি করে গুরুত্ব। দীর্ঘ বাক্যালাপ।

সদু!

বলো।

সদু।

কী!

নাহ্ অ্যামনেই...

কেন?

কী করোস...

কেন?

নাহ্।

কী।

কিছু না।

প্রতিদ্বন্দ্বী স্নেহ তখন অন্নকে চিত করে ফেলে, তার সাদা বুক পড়ে থাকে কর্তৃত্বহীন। অজস্র লাল-তিল দেখা যায়। শূন্য তাকে ঘায়েল করে, হামলে পড়ে চামড়ার কুঞ্চনে। সে ঘামতে থাকে শরীর নিঃশেষ করে।

ক্যাওড়াপাড়া ও সুলতান আলম স্ট্রিট বড়ো ওতপ্রোত, কোনো ছেদ কিংবা ফাঁক নেই। বড়ো প্রাচীন এই মিশ্রণ। তাতে সুলতান-অনুষঙ্গ দরিদ্র জনসমষ্টিতেও কি বর্তায়? কোনো নবাব বাদশা, জাফরির কাজ, কাঁসার পিকদানি, তৈলাক্ত অশ্ব ইত্যাদি এসে যায়, অথচ বিশ্বাস হয় না। সুড়ঙ্গ অন্ধকার, নোনা ইটে প্রকীর্ণ বটচারা ও বিশাল দরজার ঘুণই একমাত্র সত্য। ট্রামরাস্তা থেকে এই কানাগলি সংক্ষিপ্ত, কোনোক্রমে গড়ে উঠেছে, এমনকি এই গড়ে ওঠার কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। ফলে রেখাটি সরল নয়, বক্র নয়, জটিল এক যাত্রা মাত্র। সুলতান আলম স্ট্রিটের, ক্যাওড়াপাড়ার, কোনো ইতিহাস নেই।

যদিও এই গলি ও অন্তিম জল-জমির অভ্যন্তরে আলোড়ন ছিল। প্রাচীন ও দীর্ঘ আলোড়ন। ওই অভ্যন্তর ভাগ হিরণ্যগর্ভ। ঋজুরেখ বৃক্ষ ও পত্রপল্লবে এক বিপুল উত্থান ছিল। পৃথিবীর বৃত্তান্তটি সেখানেও কার্যকর, সেই প্রাচীন অগ্নিপিণ্ডে কত বিবর্তন... তরল, জলীয় শৈত্য। ...ভূত্বকে কুঞ্চন ও বিন্দুসমূহ। তাতে কি গোপন ছিল সূক্ষ্ম বীজে পূর্ণায়ত পাতা? পাতায় ছিন্ন আলোক, আংশিক ছায়া। বিচিত্র সেই বর্ণ-সম্ভারে সরল ও জটিল রেখাসমূহ, জ্যামিতিক আকার সমস্তই বিন্দুআশ্রিত জীর্ণ মায়া মাত্র। মালগাড়ির ঘর্ষণ আর ওজন বাবদ ছিন্নভিন্ন, অথচ এই বর্ণ, বিন্দু ও ধ্বনিতে আশ্লিষ্ট ছিল গ্রহটির গতি, নক্ষত্র পরিক্রমা। নিয়ত একটি ফল তাতে সঞ্চয় করে নিত রস, পুষ্টি ও লাবণ্য : বয়স কি সেই পরিপক্ব ফল, সেই অনুভব?

এখনও ঋতুক্রমে চক্রটি অনিবার্য শ্লথ ঘুরে যাচ্ছে বলে সামান্য পাতা খসে পড়ে শব্দহীন। বিবর্জিত সেই পাতা গভীর শুষ্ক, উড়েছিল বিহঙ্গ-ভঙ্গিমায়। অন্তর্লীন শুষ্কতায়, হলুদ বর্ণটির প্রকাশ, যেন তাতে অন্তিম চূর্ণতাও ধরা আছে, এমনকি তার আর্ত-মর্মর, যেন ওই বিনাশ পাতাটিতে লালিত। অথচ কী ক্রীড়াময় বাতাস অভিমুখে! বাতাস-গতিতে! সদ্য পাতার এই স্বতঃস্ফূর্ত বিহার, বিভ্রমে বন্দি। বর্জিত পাতাটি উড়তে থাকে। এরকম কত তুচ্ছ পাতা খসে গেছে।

সুলতান আলম স্ট্রিট ও ক্যাওড়াপাড়ার তুচ্ছ, পলকা গেরস্থালিতে হাঁকডাক ও উল্লাস। ব্রতকথা ও মাঙ্গলিক উদ্‌বাহু স্বস্তিকা চিহ্ন ধারাবাহিক। অথচ কোনো ইতিহাস নেই, বিস্মৃত সুলতানের ঘোড়া, রেকাব, জিন কিছুই নেই। আছে দলিল-দস্তাবেজ, মালিকানার হস্তান্তর। আর

বুড়ো আঙুলের ছাপটুকুই তাতে যথেষ্ট। দু-একটা প্রাচীন বৃক্ষ ও শেতলার থানটি এখনও অক্ষত, যদিও ফাটল আছে, সামান্য শ্যাওলা, পোষ্য অন্ধকার। প্রতি শনি-মঙ্গলবার এলোচুল ওড়ে, নিঁখুত গোল সিঁদুর টিপ একসময় নষ্ট হয়ে গেলে সাদা ফেনায় ভর আসে, ভর হয়। দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ ও শত্রুর বিনাশ সুনিশ্চিত করে মাঝবয়েসি এক সধবা নারী কত কিছু বাতলে দেয়। ওই নারীর প্রকৃত বিশ্বাস আছে, কারণ এতে তার অন্নবস্ত্র হয়ে যায়। 'ত্যাকন তোমার টেরাম গাড়ি কোতায়', এখনও কেউ বিস্ময় গোপন রাখতে পারে না, তার লোলচর্মে বর্তমান কোনো স্থিতি পায়নি, সে পশ্চাদ্‌গামী, তাতে সে আনন্দিত, নিরাপদ। আবার এত দীর্ঘকাল বেঁচেছে বলে, সে আর কাল সমার্থক:

টমি দেকেচো?

থালে আর দেকলে-টা কী?

এইসব গল্প, বৃত্তান্ত বড়ো নিষ্প্রভ। মরে আসছে। ক্যাওড়াপাড়ার জোট ভাঙা বর্তমানে এই গল্পের কোনো স্থান নেই, শ্রোতা নেই। বরং এই গল্পের বিপরীতে থাকে চটুল হাসি আর মাইকের চোঙ থেকে ফিল্মি গানের বজ্রনির্ঘোষ। একটি সাইকেল রিকশা জটিল তার আর ওই যন্ত্রাদি সমেত রাজমহিমায় বৃত্ত আঁকে, রিকশাটি চক্রাকারে ঘুরে যায় বলে মানুষজন গণ্ডিবদ্ধ, পতপত উড়ে যায় রঙিন টিকিট, তাতে মূর্ত অমরাবতী। ছোকরার দল শিস দিয়ে ওঠে, আহ্ কী গান! সুরে ইন্দ্রজাল : মেরা দিলনে পুকারে আজা...। চতুর্দিকে, শূন্যে, তখন চক্রাকারে নেমে আসছে রেশমজাল, সুখস্পর্শ। কোথাও আর ঝিল্লির দীর্ঘ স্থৈর্য নেই, শূন্যে সেই অনন্ত বুননকার্য আপাতত স্থগিত। টানা ওই শব্দে যে আহ্বান, যে শঙ্কা সবই উধাও। আবার এই তিরোভাব এত ক্রমিক, ক্ষয় এত মন্থর যে কেউ মনে রাখে না, মনে রাখেনি। প্রাচীন কিছু কী ছিল!

তখন মলিন কারখানা, কয়েকটি নারকেল গাছ, তুচ্ছ ডোবা ও গেরস্থালিতে প্রকীর্ণ আলোক শূন্যতার অবলম্বন। কী যেন জ্বলে যাচ্ছে ঊর্ধ্বে? শূন্যে মেলাচ্ছে মহার্ঘ কিছু। মাথার ওপর সেই শূন্যতা বড় বেশি নীল, নির্দয়, নির্দয়। নীলে দৃষ্টি চলে না, বিদ্যুৎচমকে শুধু নারকেল পাতার শির স্পষ্ট। ধোঁয়া ও মালিন্যের স্তর তীব্র রেখায়, গমনে, চিরে যায় এখনও...

গলু...উ....

কেউ চিৎকার করেছিল, বড়ো বিপন্ন সে।

তারপরই সমবেত পদশব্দ, একজন, দুজন... অজস্র স্রোত যেন, তারা ছুটছে। ক্রোধ এবং ঘেন্না এবং ক্রোধই তাদের লক্ষ্য। ক্রোধ যেন তীক্ষ্ণ তির, ক্ষিপ্র গতি, যেন ক্রোধই শরীর, শাসক। যুথবদ্ধ পা, ছোটার দুরন্ত গতির নিয়ামক। সাতটি অশ্ব-লাগাম সেই রক্তবর্ণ পুরুষের হাতে। সে গলুকে ছিঁড়ে ফেলবে, তার চুল সমেত মস্তিষ্কের চামড়াটি খুলে নেবে, সামান্য হাড়, সাদা ও অপরিণত সেই হাড়-কাঠামোটি বের করে আনবে চামড়ার প্রাসাদ ভেঙে। অবিশ্বাস ও এই আশঙ্কা কারখানার দেওয়ালে, পলেস্তারায় নির্বাচনি পোস্টার সমেত কিছুকাল সেঁটে দেওয়া হয়, কাঁচা লেইয়ের গন্ধে আকৃষ্ট কয়েকটা মাছি তুঁত-বিষে মৃত। গলু কেন ওখানে হঠাৎ ফেটে পড়ে সেসবই অজ্ঞাত থেকে গেছে, পোস্টার ও দেওয়াল অনুষঙ্গটি শুধু বিভিন্ন জনের বর্ণনায় অপরিহার্য বলে অনুমান এতে কিছু একটা ছিল। গোপন কোনো সম্পর্ক।

হয়তো গলু বড়ো বেশি স্বাধীন, মুক্ত হয়ে গিয়েছিল ক্ষেমির মৃত্যুতে, হয়তো তার ভালো-মন্দ বিচারে অলস পঙ্গুত্ব নেই। যেভাবে সে সটান বালিহাঁস টেনে আনে মাটিতে, সেভাবে বুঝেছিল কানাইদার দাপট-স্ফীতিতে একটি ছিদ্র থাকা একান্ত প্রয়োজন...। ক্যাওড়াপাড়া তার এতসব চিন্তার কোনো হদিশ পায়নি, বা পাড়াটি গলুকে খুব সহজভাবে নিয়েছিল বলে কখনও তদন্ত করেনি। ফলে জানত না কীভাবে গলু এই দুরন্ত গতি গোপন করে। ধ্বংসাত্মক ছুরিটি সে কখন, কোত্থেকে, কেন কিনেছিল? গলু বস্তুত কী ভেবেছিল? কী চায় সে?

তারা শুধু থ হল, আতঙ্কও। যখন গলুর হাতের মুঠো থেকে, তার শরীর থেকে নিঃসৃত হয় ওই বিদ্যুৎ-অংশ। উলঙ্গ সেই বক্ররেখা হাতল সমেত বিস্তৃত করে ছায়া। রেখাটি সপ্রাণ গলুকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, গলুর চেরা চোখ-দুটি তাতে স্থির। শরীর দাঁড়িয়ে গেছে একটি বিন্দুতে, এতখানি প্রস্তুত সে। সম্পূর্ণ ঘটনাটির স্থায়িত্ব কয়েক মুহূর্ত। গলুর কোনো পরিকল্পনার কথাও জানা যায় না, যেহেতু প্রতিপক্ষ পিছোতে থাকে ও একসময় ছুট লাগায়। ফলে অস্ত্রটি প্রকাশ করে ফেলায় গলু ব্যর্থ, শোচনীয় ব্যর্থ। সে নিশ্চয় ঠান্ডা মাথায় এই পরিণতিতে এগোয়নি, নিশ্চয়ই কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। আচমকা চড় খেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারায় মাত্র। তারপর অত্যুজ্জ্বল সেই ছুরি ও পোস্টারের কথা অনেক হয়েছে, আলস্যে এবং উৎকণ্ঠায়। চড় খাওয়ার ঘটনাটিও ক্রমে পল্লবিত, আজগুবি সব কারণ আবিষ্কৃত হয়। যদিও ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত সবাই ছুরিটির কথা বলে, পোস্টারটির কথা বলে। গলুর বয়স নেহাতই কম, তাতে আরেক প্রস্থ বিস্ময়। তারা ভাবতে থাকে গলুর হাতের ছুরিটি, ছুরিটির সূক্ষ্ম কারুকাজে কতখানি দ্বেষ ছিল, কতখানি ঘৃণা। বা, অস্ত্রটি তো নেহাতই ঝোঁক, নেশা, অসচেতন বীরত্ব মাত্র। গলুকে তারা কতটা গুরুত্ব দেবে? গলুর বিপরীতে, বিরুদ্ধে কিছু ছিল কি যা তারা জানে না? গোপন-হিংসা। যা ওই ছুরি। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র ছিল কি?

এরকম জিজ্ঞাসা সদুকেও আলোড়িত করে, গলু ও তার মধ্যে কতখানি দূরত্ব, কতটা শূন্যতা ছিল সেসবই উলঙ্গ এখন। অস্ত্রটি বিষয়ে সদুকে সে দু-একটা মামুলি কথা বলেছিল, তার বেশি কিছু নয়। হয়তো তার বেশি গলুর তখন কিছুই বলার নেই। অথচ নিশ্চিত অনুভব ছিল, গলু কিছু একটা অনুভব করেছিল, সে বুঝেছিল তার একটি উজ্জ্বল ছুরি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথাটা সে চেপে যায়, বা সদুকে একটি সীমা, একটি ছকে সে যেন-বা প্রতিষ্ঠিত দেখেছিল। সে জানত সদু এই-এই পারবে না, সদু এই... সদু এই নয়...

বিলম্বে হলেও গলুর খোঁজে ক্যাওড়াপাড়ায় পুলিশ আসে, তারা গলুকে না পেয়ে জেরা করার জন্যে শ্যামকে নিয়ে যেতে চায়। তখন, কানাইদাই ত্রাণকর্তা। সে বাহবা পায়। পরে সকলে সাব্যস্ত করে গলু গোঁয়ার, গলু মূর্খ, গলু সম্পর্কে এভাবে নানাবিধ আশঙ্কা গড়ে উঠতে থাকে :

ক-দিন পরে সিঁদ কাটবে।

ডাকাত।

ডাকাইত!

খুন করবে!

খুনি!

চোর!

ডাকাত!

অথচ গলু যে তখন কোথায় কেউ জানে না, পলকে সে যেন উড়ে গেছে! যেন একজোড়া ডানা ছিল তার। গোপন, নিজস্ব। কেবল অদৃশ্য ছুরিটি এই অঞ্চলে কী গভীর তৃষ্ণা রেখে যায়! শিশুরা ছুরিটির কথা বলাবলি করে। কল্পনায় তখন সেই ছুরি কী দীর্ঘ! ওই ছুরিটির যে দীর্ঘ ছায়া পড়েছিল মাটিতে, তা যেন অক্ষত আছে। ছায়াটা কী করে যেন অস্ত্রটি থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে, ক্যাওড়াপাড়ায় তা এখন আমূল বিদ্ধ।

ক্যাওড়াপাড়ার ছিটে-বেড়ার দেওয়াল ও ঝুপড়ি অন্ধকার আগলায়। দীর্ঘকাল তা অন্ধকারের অবলম্বন। টেলিগ্রাফ তারটি অন্ধকারেও জাজ্জ্বল্য, মসৃণ চলে গেছে, ডোবা নারকেল গাছ ছাড়িয়ে যেখানে গলুর দুরন্ত আত্মা হয়তো নিদ্রামগ্ন। চনুর দাদুর শ্লেষ্মা শুষে নেয় ফিচেল বাতাস ও ঝিল্লির ডাক। সেখানে এই টেলিগ্রাফ তারের অলৌকিক কাহিনি। বাতাসে ওই শব্দের প্রবেশ ধীর স্থৈর্যে, তাতে ওই বৃদ্ধের কফ, পিত্তি এবং বয়স ওতপ্রোত। সে জানায় এই পোস্টের কী অপার মহিমা, সমগ্র দেশটি কীভাবে টেলিগ্রাফ তারে আবদ্ধ, যেজন্য গলু ক্যাওড়াপাড়া থেকে হাওয়া হয়ে গেলেও আদতে সে গভীরভাবে যুক্ত আছে। নিয়মিত খবরাখবর পায়। যে লোকটা কলের গান বাজাত সে জাহাজি হয়ে যাওয়ায় ক্যাওড়াপাড়ার বারান্দায় আর ভিড় থাকে না।

এইসব ব্যক্তির অন্তর্ধানে সদুর মস্তিষ্কে খুলে যাচ্ছে প্রকৃত মানচিত্র, যেন সে তাদের অনুগামী, ক্রীতদাস ছায়া, ছায়ার বিস্মরণ নেই। টেলিপোস্টটির গুহ্যতত্ত্ব জানা থাকায় এখন যেন মহতী সংলাপ, অন্ধকারে ঋজু, অলৌকিক সেই পোস্ট চন্দ্র-স্পর্শ পায়। সুলতান আলম স্ট্রিটে মামুলি শব্দ থাকে। শব্দ ধরে বাখে সাঁকো, লিকলিকে বাঁশ। একটি পদক্ষেপ ফাঁস করে দেয় নাইট শিফট্, 'নিউ ইন্ডিয়া টুলস্'-এর দরজায় নীচু হয় কেউ। আরও শব্দ থাকে। শব্দ-সেতু। সাঁকো। ক্রমে গ্রহটির বুক ও পিঠ বদলে যায়। খর তাপ দগ্ধ করে তাদের, চনুর মা আর অন্নকে। মাঠকোঠায় চনুর মা ও অন্ন তখন ভিন্ন দৃশ্য রচনা করে, তাদের নাক স্ফুরিত, চোখে সেই পরিচিত উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য।

তখন তারা উল্লেখ করছে কত পাপের কথা। নিজ নিজ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আনছে। খননকার্য চলছে, তাতে স্মৃতি ধ্বংসস্তূপ। জন্মাবধি তারা কত না নৃশংস কাণ্ড দেখেছে : দেবতার অধঃপতন... ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত মৃত শিশু... লুণ্ঠন... দেশভাগ... লুণ্ঠন, মন্বন্তর... লুণ্ঠন, রায়ট... আর গুমখুন...।

অহিংসার কোনো স্মৃতি নেই তাদের।

আপনে তো মাইসামশাইর নামে মূর্ছা যান... জানেন না তো কী চীজ! যুদ্ধের বাজারে কী না করেছে... টাহা কী অ্যামনেই... অ্যাহনও মুখ দিয়া লালা পড়ে... আধপাগলা ছাওয়ালের লগে বিয়া দিয়া আমার বাপের কাছ থিকা টাহা নিছে... হেই ছাওয়াল... কী কমু সদুর মা দিদি অ্যাহনও বেছ্নায় মোতে...

আর চোখেমুখে হিংসা ও ঘৃণা যেভাবে পরস্পর মিশে যেতে থাকে তাতে চনু বড়ো ভয়

পায়। চনু নিজের জন্যে ভয় পায়, তার সরল অবোধ পিতা আর এই বিলাপী নারীর জন্যে ভয় পায়। তার মুখে আতঙ্কের সূক্ষ্ম ও জটিল রেখাসমূহ এমন ফুটে ওঠে যেন কোথাও ষড়যন্ত্র আছে গোপন, ভয়াবহ। বিশেষ যখন চনুর মা ফাঁস করে দেয় আরেকটি অভিসন্ধি : বুইড়ায় চায় আপনারে উঠাইতে... পাকা করব... ভাড়া বাড়াইব...

চনুর মার হাতে তখন একটি সবুজ পাতা বিস্তৃত, তাতে চুন-প্রলেপ, এসে যাচ্ছে জন্মকথা, সদুর জন্মবৃত্তান্ত। সে চনুর মার হাতের ওপর হয়েছে সুতরাং মায়া ছিল, মায়া আছে। যদিও জানাই তাদের সাধ্য নয় বৃদ্ধকে অতিক্রম করা, অগ্রাহ্য করা, ফলে অত আস্থা এবং বিশ্বাসেও বিরহ থাকে। ষড়যন্ত্র আরও প্রকট তখন।

ক্রমে তারা স্বভাব-ভঙ্গিমায় সবই ভুলে যেতে পারে। তদ্দিনে শ্যাম টিনের স্যুটকেস সমেত রিকশায় উঠে বসেছে, গলুর জন্যে সে একটা ঠিকানা রেখে গেছে। দীর্ঘকাল ঠিকানাটি প্রতীক্ষায় থাকে, একসময় সেই টুকরো কাগজও বিবর্ণ, তাতে সমস্ত রেখা ও চিহ্ন মিশে যেতে থাকে। যখন সরি উচ্চকণ্ঠে ডেকে ওঠে 'সদু...উ' বা 'মা, অ মা দ্যাকো আইসা।'

যেন সে পুনর্বার সংগ্রহ করেছে দুর্লভ লতাপাতা।

কিছুকাল সে বড়ো বাচাল থাকে, পরে বোঝা যায় ওই কিছুকাল অনন্ত। এরপর সরির প্রগল্‌ভ আচরণ, আশু মাতৃত্ব স্থায়িত্ব পাচ্ছে, সে সংসারধর্ম জেনে গেছে, তাতে কী লীলা!

আমার শাশুড়ি কয় কী...

তোমার জামাইর কথা আর কইয়ো না, বোঝলেন কাকিমা...

আমার ননদে না...

এইসব বাক্যালাপ সে তোরঙ্গ ঘেঁটে বের করে আনে সঙ্গে হয়তো-বা জরির কাজকরা শাড়িও থাকে। বড়ো আহ্লাদিত সে। তখন বয়স প্রাচীর ধসে গেছে, দুর্লঙ্ঘ্য স্রোত অন্ন, চনুর মা এবং সরিকে একটি সরলরেখায় এনে দেয়। তারা কত গল্প করে। অথচ সদু পারে না হানটারওয়ালি বৃত্তান্তটি সরির কাছে প্রকাশ করে দিতে। তার বিরুদ্ধে অন্নর অনেক নালিশ, গলুর প্রসঙ্গ আসে... জানা যায় সদুর যতখানি নিষ্ঠা ও শ্রম থাকা উচিত ছিল সেসব কিছুই নেই।

ল্যাহে না পড়ে না... আমার কপাল... হগলই কপাল...

সদু-সম্পর্কিত যাবতীয় খোঁজ-তালাশের অন্তে এই তথ্যটুকু প্রকাশিত পড়াশুনোয় তার মন নেই। সদুর পড়াশুনো হবে না, আর এতে সে প্রতিবাদও করে না, এমন ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝায় যেটুকু না হলে নয় তা ঠিকই হয়ে যাবে। ফলে অন্ন যেন-বা দূরবর্তী, সে দূরে সরে যায়, যাচ্ছে। কোথাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া থাকে। বড়ো মলিন দেখায় অন্নকে, সে নদীর গতিপথ বর্ণনা করে। উৎসের বিপরীতে নদীর অমোঘ যাত্রার কথা বলে, সে কী করবে, আর কী করতে পারে... সদুর ভবিষ্যৎ সে তমসাবৃত দেখে। অন্ন আতঙ্কিত, পরাস্ত, অন্তিম ছড়াটিতে সে এই পরাজয়কে মহিমা দেয়, তাতে স্বর-যোজনা করে :

নাও দিছি, বৈঠা দিছি,
বাইয়া ছাইয়া খাও॥

তা হা রা

রচনাকাল : ১৯৮৩-৮৪ নাগাদ। *মহানগর* মাসিকপত্রের গোড়ার দিকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

রোদ-জল নিবারক কংক্রিটের শেডটি একটু দূর থেকে টুপির মতো লাগছিল, আবার তা রঞ্জনের দেখার জন্যও বটে। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি টুপি; নির্মাতা, দাতা, ডানলপ কোম্পানি। রাস্তাঘাট সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত জিনিসই ডানলপের জোব্বার পকেটে থাকে। রঞ্জনের প্রতিদিনের ফিরে যাওয়ার কথা যেন-বা ওই টুপিতেই খোদাই করা ছিল। এই ফিরে যাওয়া গ্রীষ্মকালীন শহরের আগ্নেয় বিস্ফোরণ, পচা মৌসুমি ও দুর্লভ শীতের দিন। হয়তো সেদিন কোনো মহাপুরুষের মৃত্যু ঘটেছে, ভারত অলিম্পিক থেকে শিকার করে এনেছে সোনার হরিণ, বা পাঁচ বছরের জন্য আমলাদের মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছু মস্তান এম এল এ, অচিরেই তারা মন্ত্রিসভা গড়ে ফেলবে, শপথ নেবে। যে কোনো দিন সকালে মন্ত্রীর কুৎসিত মুখের ছবি যথেষ্ট কালি খেয়ে রঞ্জনের বিছানায় উড়ে আসবে, ঘুম-ঘোরে তার হাত আলিঙ্গন করবে দুর্গন্ধময় একটি সংবাদপত্র।

ছাপার অযোগ্য ভাষায় সে নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছিল, ধরে নেওয়া যেতে পারে রঞ্জনের নেশা হয়েছে। সে ভয়ংকর একঘেয়ে আগামী পাঁচটি বছরের কথা ভাবছিল, পর মুহূর্তে শুধু আজকের দিনটি, এপ্রিল শুষে নেওয়া, এপ্রিলের শেষ দিনটি কালচে রক্তের একটি দিনের কথা ভাবতে তার পুংলিঙ্গ কুঁচকে এল। এই দিনটিতেই যেন সে জন্মেছে, একটু-একটু খরচ করে ফুরিয়ে এনেছে। এপ্রিলের এই অন্তিম দিনে কোনো দুঃসাহস, স্নেহ, কোমলতা যেমন নেই, তেমনই নেই নিদারুণ রুক্ষতা, প্রচণ্ড আঘাত বা তীব্র অপমান। তবু শরীর জুড়ে চোঁয়াচ্ছিল অ্যাসিড, ভয়ংকর তিক্ততা, হাত-পা-ধড় সমেত ৫৬ কিলো মাংসের শরীর তখন শুধু বিস্ফোরক পদার্থে ঠাসা। নরম তামাকের সিগারেটে মন্থর ও দীর্ঘ টান কিছুই প্রশমিত করল না। বাস স্টপে জড়ো হওয়া প্রত্যেকটি মানুষই তার কাছে চলন্ত বারুদশালা রূপে দেখা দিল। অথচ ভিড়ের মানুষের মধ্যে ফেরার অধৈর্যভাব, বাজারদর ও রাজনীতির তর্ক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা ঘড়ি দেখছিল, নাক খুঁটছিল, অযথা এগোচ্ছিল-পেছোচ্ছিল আর এই শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র অনাস্থা প্রকাশ করছিল। তারা কেউ রঞ্জনের দিকে তাকায়নি, রঞ্জন তাদের মধ্যে কোনো পরিচিত মানুষ খুঁজে পায়নি। সে হোর্ডিং দেখল, দূর রাস্তায় কাঁপতে কাঁপতে আসা বাস দেখল। ধোঁয়া ও ঝাঁঝে চোখে জল এলে, সে-ই চোখের পর্দায় সামনের দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদ, স্তম্ভ প্রভৃতি ছায়া ফেলল। এরকম মুহূর্তে রঞ্জন ওই অস্পষ্ট *প্রাসাদের সোপান, অলিন্দ ও স্তম্ভের পাশ দিয়ে উনিশ শতকের মনীষীরা হঠাৎ সরে যাচ্ছে* দেখতে পেত।

নারী ও শিশুর কাছে ফিরে যাবে বলে, শিশু ও পুরুষের কাছে ফিরে যাবে বলে যে ভিড় বাস স্টপে জমে ছিল, সেই ভিড়ের সঙ্গে রঞ্জনের সম্পর্ক কতটুকু। মিশুকে রঞ্জনের সঙ্গে সরাসরি আলাপ থাকলে ভিড়ের দু-চারজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব অসম্ভব ছিল না। আলোকোজ্জ্বল, রাত্রিকালীন শহর, বাস স্টপে মানুষের জটলা, দ্রুতগামী বাস, এসবের বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন

নেই। শহরের বাস স্টপে মামুলি একটা মানুষ, একটু বেচাল সে। সেই মানুষই লেখক রঞ্জন। বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ বলয় তাকে জানে মধুর-বিষণ্ণতায় পূর্ণ বলে। রঞ্জন এসব নিয়ে বিশেষ ভাবেনি। যেমন সে সময় কাটানোর মজাদার পন্থা হিসাবে ওই বলয়ে রঞ্জন সম্পর্কে, গদ্যকার সম্পর্কে, প্রত্যাশাতে নিজের গভীর থেকে তেমন সাড়া দেয় না। এইসব অসুখ তার ছিল। রঞ্জনের জন্ম ১৯৪০ সালের কাছাকাছি; এখন ৮০ সালও যেতে বসেছে এর মধ্যে বিশেষ করে গত দশটি বছরে কোনো বাঁক, মোচড়, আলোড়ন নেই। তার আগের পাঁচটি বছরে উষ্ণতার ছোঁয়া ছিল কিছুটা। তারপর শুধু দুটি সারিতে ১০-১২টি বেঞ্চ। অনুচ্চ বেদির উপর বসানো চেয়ার, টেবিল, পেছনে ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষকতার প্রাচীন আদর্শ থেকে বঞ্চিত দুটি নগ্ন হাত গাঁট পাকানো দশটি আঙুলে মাখামাখি খড়ির গুঁড়ো।

হাড়, মাংস, রক্ত ও ঘাম বয়ে নিয়ে একটি বাস আসবে। স্টপে দাঁড়ানো মানুষের সঙ্গে রঞ্জনকেও কুপিয়ে, কুচিয়ে কয়েক তাল মাংসে ও হাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে দোতলা সেই যানটির পেটের ভেতর। মৌলালির মোড়ে এই বাস তাকে অন্ধকার থেকে ম্লান আলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে, ডানদিকে পীরের দরগা, ফুটপাতের মানুষ, কর্পোরেশনের ভাঙা গাড়ি। কোনো রকমে সে এইসব স্থায়ী দৃশ্য ছাড়িয়ে যাবে। একসময় তার পা সিঁড়ির আন্দাজ পাবে, বুকের মধ্যে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসকে বশীভূত করা তারপর নিতান্তই সহজ। আকণ্ঠ জল ঢেলে নেবে, সিগারেট ধরাবে এবং একসময় অন্ধকারকে আহ্বান করবে। পরের দিন, অনেক সময়ই সে দেখেছে অ্য পরের দিন নয়, আর একটি দিনও নয়, একটিই দিন।

বিছানায় রঞ্জনের হাড় ছড়িয়ে থাকে, একে-একে হাত-পা-ঘাড় জুড়ে শরীর তৈরি হয়ে যায়। সে জাগতে থাকে। জেগে ওঠার পর পুরোনো বাড়ির সিলিং রঞ্জনের বুকের ওপর নেমে আসে। কেউ তাকে চা তৈরি করে দেয় না, জানলা-পথে সে একটি বিড়ালকে অদৃশ্য হতে দেখে। কোথাও শিশুর হাসি বা কান্না নেই। গত রাতে পাণ্ডুলিপিটা যতদূর ভেবেছিল, ভাবতে পেরেছিল, প্রায়ই সকাল হয় আগেকার সেই পরিশ্রম খারিজ করে। লেখাটি আগাগোড়া বদলাতে হবে, রঞ্জনের আরও সংশয় হয়, এই যে সকাল হলেই সে তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভাবতে শুরু করে সে কি স্রেফ অভ্যাসে। ওই ব্যাচেলার ঘরে, মেঝের বিছানা, সামনে শূন্য কুঁজো, গত বছরের ক্যালেন্ডার, মেঝেতে জড়ো করা গেঞ্জি-জাঙিয়ায় রঞ্জনের দম-বন্ধ হয়ে আসে। ভয় হয় একদিন সে নেশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা না করে ফেলে।

রঞ্জন সম্পর্কে এই পর্যন্ত, বাস স্টপে আমরা যখন ঈষৎ মত্ত রঞ্জনকে দেখি তখন তার মধ্যে যদি কোনো জ্বালা, বিরক্তি, ভালোবাসা এবং মানুষজন সম্পর্কে আগ্রহ, নিজের গভীরে যদি সে তেমন করে কখনো ডুব দিয়ে থাকে, সেসবই একটি টানা গদ্যে কীভাবে রূপ পেতে পারে রঞ্জন ভাবছিল। এই গদ্যের এক অশরীরী সঙ্গ ছিল তাকে ঘিরে, গদ্যটা যেন রঞ্জন ও তার পারিপার্শ্বিক পালটে দিতে পারে। ফলে নানাভাবে তার বান্ধবদের কথা মনে হচ্ছিল। ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি বন্ধুরা রঞ্জনের এইসব স্খলিত বাক্য খুব যে একটা মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল তা নয়। বরং তারা ভাবত রঞ্জনের মধ্যে একটা সংকট কাজ করে যাচ্ছে। কে কী লিখছে, পড়ছে, ভাবছে সে সম্পর্কে শহুরে উদাসীনতার শিকার ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি বন্ধুরাও।

সহজপাঠ

নীল রঙের একটি ডবল ডেকার এখন রঞ্জনের গা ঘেঁষে, এতটা ঘেঁষে যে বাসের গায়ের বিজ্ঞাপনটি পড়তে রঞ্জনকে বেশ বেগ পেতে হল; মুখে দিলে গলে যায়/আহারে কী পুষ্টি।

'সহজ পাঠ থাকবে, এইটি আমাদের ট্রাডিশন, যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে ভাষা শিক্ষার আধুনিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা দরকার। সহজ পাঠের বানানের অসংগতি শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক। সহজ পাঠ শিশুর কল্পনাকে প্রস্ফুটিত করে, ভাষা শিক্ষা আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। সহজ পাঠের অলংকার শিশুবোধ্য নয়, এমনকি তার পক্ষে ছড়াগুলি থেকে সবসময় কোনো ছবি কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সন্ধ্যাকে ঘোমটা দেওয়া বধূ কল্পনা করা শহরের শিশুর পক্ষে ক্রমেই অকল্পনীয়...। এক বছরের শিশু যেভাবে কথা বলা শেখে সেটাই তার ভাষা শিক্ষার রীতি হওয়া উচিত, সেদিক থেকে ভাবলে বরং শিশুর কথা বলা, শেখা আমাদের মগ্ন হয়ে দেখে যাওয়া উচিত। বর্ণমালা আগে, না শব্দ-ছবি এসব আগে?

'আমি বলি চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ও কেবল বলে কিঁয়ো কিঁয়ো।'

এক্ষেত্রে শিশু বেড়ালছানাকে বর্ণমালা শেখাচ্ছে, নিজে শব্দের ভিতর থেকে বর্ণগুলিকে আলাদা করে চিনছে। আর বর্ণ শব্দের মধ্যে, কথার মধ্যে যে ঢেউ হয়ে থাকে শিশুর সঙ্গে সেই ঢেউয়ের, ছন্দের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে...।'

বাতাসে, শূন্যে, ভিড়ে ও নির্জনে কোয়ালিটির এই সহজ পাঠ-বিতর্ক চলছে শহরের উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে। শহর কিছুদিন বর্ণমালা আর শিশু ভোলানাথে থাকে। রঞ্জনের এই পরিবেশে মজা লেগেছিল। বর্ণমালা, শব্দ ও ভাষা থেকে গল্পখোর এই শহর হয়তো ভাষার শিল্পের দিকে যাত্রা করবে। এমন হওয়া অসংগত নয় যে, এ সুবাদে তর্ক ও মত গঠনের তাগিদে অনেককেই নতুন করে সহজ পাঠ, বর্ণ পরিচয়, ছড়া ও ছবির কিছু বই পড়ে ফেলতে হবে। পড়তে-পড়তে তারা হয়তো ভুলেও যেতে পারে তর্ক-বিতর্ক-মত। আর চকিতে এই ভাবনা হয়তো তাদের মুখ উজ্জ্বল করে তুলবে : আহা! যদি আবার নতুন করে শুরু করা যেত।

নতুনের খোঁজে

রঞ্জন কিছুদিন আত্মগোপন করেছিল, বন্ধুজন ধরে নেয় সে প্রবাসে গিয়েছে, রঞ্জন নিজের কাজ নিয়ে ডুবে আছে। হয়তো সে কাজটিতে কোনো ছেদ চায় না। যেমন সে নিজেই বলেছে, এই যে রোজ নিজেকে ভাবনার সূত্র থেকে ছিঁড়ে আনা, রোজ যেভাবে আবর্জনার স্রোত সব ভাসিয়ে দিচ্ছে, এতে দৈনন্দিন মৃত্যু আছে। ঠিক এভাবে না বললেও এই নাটকীয়তা তার কথায় থাকত। কয়েকজন মানুষ রঞ্জনকে ব্যক্তিগতভাবে জানে, চেনে। সেইসব মানুষের সঙ্গে দেখা না হওয়ার অর্থ রঞ্জনের জনসাধারণের অন্তর্গত হওয়া, সে ভেবেছিল এইভাবে কিছুদিন কাটানো যাক। আবার তা যেহেতু ঔপনিবেশিক এই শহরে একটি বোমা ফাটার ধোঁয়া ও বিস্ফোরণে ঘটেছিল, ফলে এতে রাজনীতির গন্ধ ছিল। বস্তি বিস্ফোরণের সেইসব দিনে রঞ্জন সম্ভবত ভেবেছিল; আমি তো কখনও বস্তিতে থাকিনি, দেখাই যাক না।

সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণার একটা পাসপোর্ট জুটিয়ে নিতে সে ভোলেনি। সেই সময়ের অত্যন্ত বিপজ্জনক দুনিয়ায় এটি ছিল তার অস্ত্র। স্টেনগান। আর সাইক্লো করা প্রশ্নোত্তরের শিডিউল স্টেনগানের অফুরন্ত কার্তুজ। অর্থাৎ পরিকল্পনা ত্রুটিবিহীন। রঞ্জনের প্রলাপ আচরণ যতটুকু, তা শুধু মতিঝিল বস্তিতে কিছুদিন বাসের সিদ্ধান্ত, সে ওই কিছুদিন মতিঝিলে পেচ্ছাপের ঝাঁঝ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করবে না, কাছে দূরের নিয়ন ঝলসানো রাস্তায় উঁকি দেবে না। আর এই সিদ্ধান্ত শুধু তার গত কয়েক বছরের অভ্যাস-নিপুণ রাত আর দিনগুলি থেকে নিষ্ক্রমণের একটা চেষ্টা। এতে স্পষ্টত কোনো আদর্শ ছিল না, তবে সবটাই বোমা, বোমা-বিস্ফোরণ, আর এক বয়কট ও মাও সে তুং— টেনসিল যুগে ঘটেছিল বলে শহরের দিনলিপির কোনো প্রভাব থাকতে পারে। পরে দেখা যাবে, রঞ্জন তার বন্ধু-বলয়ে এতে করে বেশ অপ্রস্তুত। কিন্তু এখন সে বৃত্তান্ত নয়, বরং আকস্মিক রঞ্জন ফিরে পেয়েছে তার চোখের উজ্জ্বল ধাতুখণ্ড দুটি। দুর্গন্ধ তার ঘ্রাণ শক্তির ওপর হামলা চালাচ্ছে, নীতিবোধের সাদা বস্ত্রখণ্ডটি ধর্ষণের কালচে রক্তে মাখামাখি। সে শিহরিত হল। খিদে, ঘুম, তৃষ্ণার শরীর ফিরে পেল কিছুদিনের জন্য। রাগ-অভিমান-ঘেন্নায় তার সংকোচন ও প্রসারণ দেখা গিয়েছে ওই নব্বই দিনে। মতিঝিল বস্তিটি রঞ্জনের পক্ষে ছিল স্যানাটোরিয়াম।

ঘটনাবহুল ও অনুভূতির নানা পর্যায়ের, উত্তেজনাময় সেসব দিনের বর্ণনা কয়েকশো পৃষ্ঠা গিলে ফেলতে পারে। এ শহরের বাসিন্দার কাছে বস্তির বর্ণনা তেমন জরুরি কিছু নয়, রসিক মানুষ এ গ্রহের অনেক বিষন্ন শহরের এই নরকে প্রায় সরাসরি প্রবেশ করেছেন ধ্রুপদি সাহিত্যের আশ্রয়ে। প্রবল তারুণ্য ও যুদ্ধকালীন, নিষ্প্রদীপ শহরের রোমাঞ্চটুকুই হয়তো সেখানে ছিল না শুধু। তা ছাড়া সমস্তই এক।

পরিকল্পনা মাফিক এই আত্মগোপন পর্ব আমরা ছোটো করে নেব, আর তিনটি মাসের দুরন্ত গতির যথার্থ বর্ণনা, না রঞ্জন নিজে দিতে সক্ষম, না তা আর কেউ ভাষায় চিত্রিত করতে পারবে। ভাষায় শুধু ওই তিন মাসের অভিজ্ঞতার কয়েকটি দাগই স্পষ্ট হতে পারে, যদিও হাত বদলে অভিজ্ঞতারও কিছু পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। এর মধ্যে আছে ভয়, দুঃখ, শোক, ভালবাসা, ঘৃণা, করুণা, মমতা ও ক্রোধ। আর চব্বিশটা ঘণ্টা কুকুরের জিভে এইসব শুষে নিচ্ছে। এই নরক থেকে যেমন তাদের মুক্তি নেই, তেমনই তাদের মৃত্যু নেই। ফ্যাকাশে গর্ভবতী নারীরা চোখের কালো তারায় বারবার ঘুরে আসে, উলঙ্গ শিশু ছেঁড়া কাপড়ে শুয়ে খলবল করে রোদ খেতে থাকে। এই রোদ খুব নির্দিষ্ট আকার নেয়, তিন-চারটি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও অর্ধবৃত্তে রোজই প্রতিফলিত। যেমন রোজই রেল কলোনির পাঁচিল থেকে উত্তর দিকটা আমাদের পৃথিবীরই অর্ধাংশ যেন-বা, আলোকহীন অর্ধাংশ।

গৌরী

রঞ্জন কোনোরকম ভুল করেনি, তার আচরণ ছিল ঝুঁকিহীন, টানা তিন মাস ক্লাস না করার জন্য জরুরি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট কিনে নিয়েছিল দশ টাকার বিনিময়ে। একশো টাকার লাগাছ ছাপা নোট মতিঝিলে 'গজ' নামে চলে. রঞ্জন সঙ্গে গজের পাততি আনেনি। মুদ্রা

চলাচল মোটামুটি একই রকম হলেও 'দয়লা' 'গঞ্জ' এসব ছিল। আবার তা চোলাইয়ের কারবার, চুরি-ছিনতাই থেকে চড়া সুদে ধার পর্যন্ত এক বিকল্প রাষ্ট্র। দিনের পর দিন রঞ্জনকে সঙ্গমরত মেয়ে পুরুষ দেখতে হয়েছে। তারা পেচ্ছাপ পায়খানা করছে দেখেতে হয়েছে। পাঁচ থেকে ছ-বছরের শিশুর পিঠ ফালা করে দিচ্ছে বাপ-মার অত্যাচার, সে এমনকি ওই বয়সের শিশুকে চোলাই মদ খাওয়ানো হচ্ছে দেখেছে। যেমন সে দেখেছিল গৌরী নামের কিশোরীকে, মেয়েটি যথার্থই হিন্দুর পুরাণের গৌরী, সে একটু অভিমানীও।

গৌরীর বয়স তখন বড়োজোর তেরো, বৃত্তি: শানুকে মদত দেওয়া। শানু হচ্ছে এমন এক বেপরোয়া যুবক যে সর্বদা সঙ্গে ছুরি রাখত। এই ছুরিটি সামান্য বাঁকানো, টেনে খুলতে হয়। খোলাটা আবার একবারে হবার নয়, সাত-আটবার আটকে গিয়ে খোলে। প্রতিবার আটকে যাওয়ার মুখে কৃক্কর শব্দ হত। শানু ওই কানপুরিয়া ছুরিটিকে চুম্বন করত। রঞ্জনের নিজের চোখে দেখা। গৌরী শিয়ালদা থেকে পার্ক সার্কাস রুটে চলাফেরা করত ঢিলে ভাবে, ঠোঁটে রং লাগায়নি কখনও। তবে নির্ভুল সাতটার অন্ধকারে তার পেছন-পেছন কোনো ছাত্র, সদ্যচাকরি পাওয়া যুবক বা আধবুড়ো ভদ্রলোক গেঁথে আনত সে। যে দিকটায় কখনও রোদের স্পর্শ থাকে না, সেই পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গৌরী বেআবরু হলেই শানু মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠত কৃক্কর শব্দে। গৌরী একবার গোয়েন্দা পুলিশ গেঁথে এনেছিল, সেবার ওই জোলো মাটি-ও পেচ্ছাপের গন্ধের মধ্যে অতিকায় শানুকে দেখা গেল না, কৃক্কর শব্দ হল না। শুধু হুঁশ হতে গৌরী দেখে তার হাতের মুঠোয় 'দয়লা'র পাততি। এই বস্তিতে বিস্ফোরণ হবে, অন্তঃশীল আগুন রঞ্জন দেখেছিল। এখানেই সে আদিম সরলতা দেখেছিল, ভালোবাসার উষ্ণ রক্ত আর যৌনব্যাধি। যে কোনো হতাশ, বিষণ্ণ মধ্যবিত্ত খাঁটি মানুষের খোঁজ করলে রঞ্জন তাকে বলবে, 'বস্তিতে থাকুন, কেমন লাগে দেখবেন'। রঞ্জন গভীরভাবে বুঝে গিয়েছিল যে মতিঝিল ওইসব ভদ্রজনের হাড়ে বরফ ঠেসে ধরবে। পোশাক খুলে ফেলে কোনো এক দিন যদি গোটা শহর পেট্রোল মবিল ঝাঁঝে সচল হয়, তাহলে ভদ্রমহোদয়গণ কী করবেন! এই বৃত্তান্ত বা 'মতিঝিল কথা' শিরোনামে একটি লাইনও রঞ্জন লিখবে না। এই জায়গায় সে তার ঠোঁট দুটি সেলাই করে নেবে। যেমন সে পার্থকে বলেছিল, রূপকে বলেছিল পার্থ এবং রূপের প্রশ্ন জেগেছিল ঘর-গেরস্থি এবং চাকরি-বাকরি নিয়ে। পার্থ, রূপ একমাত্র মদ গিললেই সেসব কথা প্রকাশ করত। রঞ্জন ওদের চুপ করতে বলেছিল। প্রজাতি হিসাবে তখন যে তাদের এই শহরে নির্বাসিত মতিঝিলের মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ জাগবে এবং তা যে অ্যাডভেঞ্চারের মতোই কিছু একটা, রঞ্জনের তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মতিঝিল তাদের কাছে এক অদম্য বাঁচা। বাঁচার এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা সে আর কোথাও দেখেনি, মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে তারা যেন স্রেফ আকাঙ্ক্ষার জোরেই বেঁচে আছে। গৌরী নামের মেয়েটি যে ওই ঘটনায় বেশ্যা হয়ে গিয়েছিল এমন নয়, সে এমনকি শানুকে ক্ষমাঘেন্না করতেও পারে। যখন জানতে পারল পুলিশের উর্দিটির ওই লিঙ্গ গৌরী হাত পেতে না নিলে দুজনের কপালেই তিন সাল শশুরাল, আর গৌরীকে সেক্ষেত্রে পেষাই করত এক পাল ষাঁড়— গৌরী তখন শানুকে মাফ করে দেয়। আর চোলাই ব্যবসা ধরে। মতিঝিলের নেতা শানু, দল: কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট সবরকম পার্টি। কলকাতা শহরে যত পার্টি আছে, সব পার্টিতে শানুর নাম

লেখানো থাকে। ভোটের দিন যে শানু সিপিএম পেটাল, ভোটের গুনতির দিন সেই শানুই মতিঝিলে পয়লা লাল ঝান্ডা তুলে দিল। মতিঝিলে মজুরের নিঃশব্দ পা শানুর কোনো ক্ষতি করেনি, অন্যদিকে সে নিজে কখনও স্ট্রাইক ভাঙতে বোমা ছোঁড়েনি। এই মতিঝিলে অল্প অল্প দাড়ি নিয়ে কিছু যুবার যাতায়াত রঞ্জন দেখেছে। তারা একটা স্কুল চালাতে শুরু করল, স্কুলটি পরে চোলাইয়ের ঠেক হয়ে যায়। পাঁচু নামে এক কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়। মতিঝিল এই পর্যন্ত। কারণ এ কাহিনি মতিঝিলের নয়, এটুকু শুধু রঞ্জনের নব্বইটি দিনের একাংশকে প্রতিফলিত করার জন্য।

আত্মপ্রকাশ

গ্রীষ্মের এক আলোকিত দুপুর শহরে ঝলমল করে উঠলে রঞ্জন ফিরে আসে, এই ফিরে আসা যেন কারাবাসের মৌনতা ভেঙে তার ঠোঁটে-জিভে শিস ধ্বনি জাগাবে। অত্যন্ত পরিচিত কিছু মানুষের সঙ্গ ছিন্ন করে দিনপাত যদি অন্য সঙ্গ গড়ে না তোলে, তাহলে তা যে কী ভয়ংকর হতে পারে তিন মাস রঞ্জনকে রক্তমাংসে সে-কথা বুঝতে হয়েছে। সে আরও দেখেছে আকছার রবীন্দ্রসদন-অকাদেমি করা সংস্কৃতিচক্রকে সে যতই পচা বলে পরিত্যাগ করে থাকুক, কৃত্রিমতা তার রক্তে প্রবিষ্ট। সে এসবের রীতিমতো খিদে অনুভব করছে। বস্তিবাসের দিনগুলোয় তার মধ্যে সংস্কারক মানুষকে জেগে উঠতে দেখেছে, আর কিছুদিন থাকলে রঞ্জন বস্তির ছেলেদের নিয়ে রিহার্সাল শুরু করে দিত; দইওয়ালা, ও দইওয়ালা! তারপর রাজা, রাজার মুক্তিদূত, চিঠি ও জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বস্তির পরিচয় ঘটত। কী হাস্যকর!

শীতের স্মৃতি জড়ানো শহর আবহাওয়ায় রঞ্জন ফিরে আসে। তিন মাসের রসদ জোগাড় করে তালতলায় ওয়ান রুম ফ্ল্যাটটিতে দরজা বন্ধ করে থাকলে হয়তো তার এরকমই অভিজ্ঞতা হত। জানলার কাছে টুলটি পেতে সেক্ষেত্রে তাকে কর্পোরেশন অফিস লাগোয়া ফুটপাতবাসীদের দিকে চারুলতার একাগ্রতায় বাইনাকুলার লাগিয়ে বসে থাকতে হত শুধু। হায় চারু! মাধবীর অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল, গৌরীর মুখের ভাবের সঙ্গে চারুর কোনো মিল আছে কি?

তিন মাস রঞ্জন শহরের অন্ধকার অংশটিতে ছিল, সংকীর্ণ, শ্বাসরুদ্ধ এক জ্যামিতিক নকশার মধ্যে। রঞ্জনের মতো মানুষ ও বস্তি মুখোমুখি হলে মধ্যবিত্তের একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে : মাস্টারসাব। রঞ্জনও মাস্টারমশাই হতে বসেছিল আর একটু হলে। ঘর ছেড়ে আসার সময় রঞ্জন যে কাউকে একটি কথাও বলে এল না, এর নানারকম অর্থ হতে পারে। রঞ্জন তিন মাস বস্তির বাইরে পা দেয়নি বলে ৪বিঘে জমিতে ৩০০ ঘর মানুষ এই আলোকজ্জ্বল শহরে হেঁটে-চলে বেড়াবে না সে-কথা বলা যায় না। হঠাৎ দেখা হলে তারা তাকে কিছু প্রশ্ন করতেই পারে, প্রশ্নোত্তরের সাইক্লো করা কাগজগুলি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইতে পারে। কয়েকদিন এইসব চিন্তার জট ছিল, আর নিজস্ব অভ্যাসে ফিরে আসার স্বস্তি। এবং আরও গাঢ় হতাশা।

দার্জিলিং গিয়েছিলাম।

তিন মাস। বলিস কী রে।

ধুশ, দার্জিলিঙেই হাত-পা ভেঙে

তাহলে শালা কী করছিলে? আবার...

নাহ্ মাইরি মরে গেলেও না...

তাহলে কি আর্মসের খোঁজে গিয়েছিলি?

আমার দৌড় তো জানিস।

সে কী রে তোর স্বভাব পর্যন্ত বদলে গিয়েছে, অ্যাঁ...তোর হল কী রে রঞ্জু! এত বিনয়!

চ, আজ একটু গেলা যাক।

চ, তবে মাল খেয়েও শালা যদি ভ্যানতারা করিস, দেখবি। আজ তোর অ্যাবসলিউট ফ্রিডম।

তোর দিন, যা যা করেছিস বলবি, নাস্তিকদেরও কনফেশান দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

চেয়ার টেনে নেওয়ার কথা ছিল পার্থর, রঞ্জন তখনও বসে, দেব ইশারা করল সর্ব দু-হাতে হিপের ময়লা ঝেড়ে অভ্যাসমাফিক চাঙা হয়ে নিল: চ।

একটি কাল্পনিক কাহিনি যা সত্যি হতে পারত

অজস্র গাড়ির হেডলাইট, হোর্ডিং-এর আলো আর পাতাল রেল খোঁড়াখুঁড়ির গর্ত টপকে রঞ্জনরা এক সময় নিউ সেন্ট্রালে এল। সাদা উর্দির মন বাহাদুরের সরল আপ্যায়ন ছিল তাদের সামনে, দেব হিসেব কষে ফেলেছে কার কাছে কত রেস্ত আছে, পার্থকে ধমকাল, প্রতি পেগ রামের সঙ্গে তার থামস আপের বায়না ছাড়তে না পারলে শুধু থামস আপই খেতে হবে। আর রঞ্জন প্রচণ্ড চাপের মুখে স্বীকার করেছে যে, তার গত তিন মাস কোনো পরিব্রাজকের তিনটি মাস নয়, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্তেজনাময় নব্বইটি দিন। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিছুই গোপন করবে না, তবে একটি শর্ত আরোপ করেছে শুধু; রঞ্জন নিজের মতো কথা বলে যাবে, কেউ যেন তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত না করে। মন বাহাদুরের আপ্যায়নের মুক্ত হাসিটি পাওয়া যায় এরপর। একটি টেবিল ঘিরে তারা বসে, পিঠ এবং পাছায় ফোমের স্পর্শ থাকায়, বসাটা হয়ে গেল আধ শোয়া, টেবিলের তলায় ছড়িয়ে গেল প্রত্যেকের পা। টেবিলে টোকা মেরে একটা তাল বাজাল দেব, তবে তা পাঁচ মিনিটও নয়, রঞ্জন সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে কিছুক্ষণ বসেছিল, সে দেবের দিকে হাতটি মেলে ধরে। দেব পকেট হাতড়াচ্ছে, সর্ব ততক্ষণে গ্যাস লাইটারের নীলচে আলোয় রঞ্জনের নাকের খাঁজ, ঠোঁট ও সিগারেট আলোকিত করে দেয়।

আচ্ছা, আগে বল তোরা কেউ এই তিন মাসে কি একবারও আমার খুপরিতে গিয়েছিলি? না, মানে, হ্যাঁ, না গেলেও তুই যে ছিলিস না...

যাসনি বেশ করেছিস, যাসনি যে সে তো আমি-ই জানি, যাকগে...

রঞ্জন একটু উদাস ও গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল, ঠেকটির ম্যুরালের কাজে তার চোখ কিছুক্ষণ গেঁথে রইল। চুমুক দিতে ভুলে গেল, তারপর হঠাৎ যেন সে আবার এই টেবিলের যোগসূত্র ফিরে পেয়েছে আকস্মিক। ঠোঁট জিভ ভিজিয়ে নিল, ঢোক গিলল।

নব্বই দিন, নব্বই রাত আমি খুপরি থেকে বেরোইনি— রঞ্জন।

[illegible] তাহা মিথ্যে। মারব পাছায় এক লাথি— দেব, পার্থ, সর্ব।

তাহলে এই পর্যন্তই— রঞ্জন।

সরি, ঠিক আছে, বলে যা— সর্ব।

নভেম্বরের পঁচিশ তারিখ নাগাদ আমরা এখানে শেষবারের মতো বসেছিলাম, ছাব্বিশ তারিখে আড্ডায় আসিনি, শিশিরের অফিসে গিয়েছিলাম জিজ্ঞেস করে জেনে নিস। সাতাশ তারিখেও আড্ডায় আসিনি মুদির দোকানে গিয়েছিলাম তিন মাসের রসদ কিনতে এবং ওই দিনই তোদের একটা চিঠি দিই, নিশ্চয়ই সেই চিঠির কথা কারও মনে নেই আর। অর্থাৎ নভেম্বরের আঠাশ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমার এই অনুপস্থিতি, অন্যভাবে আমার কাছে তোদের অনুপস্থিতি এবং নব্বই দিনের বৃত্তান্ত...ঠিক হ্যায়...।

এই অবধি আমার ভূমিকা, এবার বৃত্তান্তে যাওয়ার আগে তোদের মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার মতো সাধারণ মানুষের আচরণে বড়ো মাপের বা বেয়াড়া ধরনের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকলে তা নিয়ে হাসা চলবে না। অর্থাৎ এখুনি নয়। পরে যখন-তখন যেটুকু আওয়াজ খেতে হবে তা আমার প্রাপ্য বলেই ধরে নেব। কিন্তু এখন শালা যা বলব শুনে যাবে। আমি ওজন নিয়ে দেখেছি এই নব্বই দিনে কুড়ি পাউন্ডের মতো মাংস গলে গিয়েছে, শেষের দশ দিন প্রায় অনাহারে ছিলাম। নব্বই দিনে লেখা হয়েছে চল্লিশটি পৃষ্ঠা, চল্লিশ পৃষ্ঠার প্রলাপ, অমার্জিত শব্দ ও উদ্ভট চিন্তায় ঠাসা চল্লিশটি পৃষ্ঠা পড়লে তোরা আমাকে ঘেন্না করবি। শেষ দশ দিন কাটিয়েছি বিনিদ্র, কাজ বলতে ওই চল্লিশ পৃষ্ঠার বহ্নিউৎসব আর থেকে থেকে চা কিংবা কফি বানানো, বমি করা। এমন নয় যে আমি নব্বই দিন নিজেকে স্বেচ্ছানির্বাসন দিয়েছিলাম কিছু লেখার জন্য। তবে এটা বেশ বুঝেছি তিন মাস এভাবে কাটানোর খুব দরকার ছিল।

প্রায় কুড়ি জন নারী ও পুরুষের কথা, স্মৃতি ছিল আমাকে ঘিরে। আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো অক্ষম মানুষও দুনিয়ায় সুন্দর বেঁচে থাকতে পারে। আমার এই জিনিসটাই নেই, আমার ক্ষমতার সিকি ভাগ পুঁজি নিয়ে অনেকের দাপটে চতুর্দিকে ভূমিকম্প হচ্ছে। আবার ভাবিস না এটা আমার অভিযোগ বা ক্ষোভ। এ শুধু ঘটনার বর্ণনা, এভাবে এতোলবেতোল ভাবনায় আমি আসলে নিজেই নিজের বর্ণনা দেওয়ার ভূমিকাটা দেখতে পেলাম। যেভাবে সর্বাণীর কবজা থেকে বেরিয়ে কিছুদিন হাওয়া হয়েছিলাম সেভাবেই আর এক পলায়ন। আর ফল এই যে, বন্ধুদের চিনলাম খানিকটা, নিজেকেও। জানলা থেকে দিনের পর দিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলে পথচারীর ভঙ্গিমা দেখে তার মনের হদিশ পাওয়া সম্ভব বলে মনে হল। মাঝে মাঝে বীভৎস যৌনতাড়না অনুভব করেছি, শরীর জ্বলে যেত, পট্টিতে চলে যাব ভেবেছি। মনে হয়েছিল হায় কেন সর্বাণীর কবজায় চলে গেলাম না! কেন পার্থদের ওরকম চিঠি লিখলাম? চিঠি তো নাও পৌঁছোতে পারে তা হলে ওরা হঠাৎ এসে হামলে পড়তে পারে। দমকলের ঘণ্টা শুনলেই মনে হত আগুন এই ম্যানসন বাড়িরই কোথাও লেগেছে, গ্রিক সৈন্যের মতো পোশাকে জানলা গলে তারা এসে যাবে, আমার আধপোড়া মাংসের স্তূপ পিচ রাস্তায় নিয়ে যাবে। পরে এমন হল, মনে হচ্ছিল তিনটি মাস কেটে গেলেও আমি এই খুপরির বাইরে যেতে পারব না। আমি যেন ইচ্ছে করলেও কোনো কাজ করতে পারব না। কিছু করার ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ রহিত হয়ে এই খুপরিতে আমি মরতে থাকব। হয়তো-বা আমি তুষারহীন, দুর্যোগহীন একটি শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে নিজের জুতো জোড়া সেদ্ধ করব খিদে মেটাতে। ভুলে যাব কথা বলার ভাষা, যত দিন

যাচ্ছিল আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তোদের কথা মনে পড়ে গেলে মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পেতাম কিন্তু নাম মনে পড়ত না, মনে পড়ত না কার সঙ্গে সম্পর্ক কত গভীর। কেমন ঝাপসা সব, যেন আর এক জন্ম, আর এক জীবন।

পরিচিত মানুষজনের কথা ভাবতে গিয়ে, আমার খুপরিতে তাদের এক-একজনকে এইরকম স্বেচ্ছানির্বাসন দিয়ে দেখলাম সবাই একে একে উন্মাদ, খুনে, লম্পট হয়ে যাচ্ছে। সকাল বেলা যে মেয়েটা বাসন মেজে দিয়ে যায় সেই কমলার মা আমার দূত হতে পারত। কমলার মার সঙ্গে মাসে একবার কথা বলতাম, 'তোমার টাকাটা'। সকাল হলেই সেই কমলার মার জন্য আমার অপেক্ষা জ্বলে উঠত। তাকে যে আমি কোনোদিন লক্ষ করিনি, লক্ষ করিনি বলে জানতে পারিনি কমলার মার ভারী, চাপা ঠোঁটের গাম্ভীর্য, শরীররেখা এবং স্বভাবের মাধুর্য। কমলার মা কিছু একটা আঁচ করে থাকবে সেও আমাকে নজর করত। হঠাৎ-হঠাৎ সোজা তাকাত, একদিন জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'আমনার শরীল খারাব?' ঝটিতি ঘাড় নাড়লেও আমি যে তার অবিশ্বাস, সন্দেহ দূর করতে পারিনি বুঝলাম সে যখন একদিন আমার কপালে হাত দিল। হয়েছিল কী দরজা অভ্যাসমাফিক খুলেই আমি চাদরের তলায় ঢুকে গিয়েছিলাম, আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কমলার মা দরজা খোলা রেখে চলে যেতে পারে না, সে হয়তো বার কয়েক ডেকেও থাকবে, কমলার মা অন্তত তাই বলেছিল। তারপর ওই ঠান্ডা হাত, আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, কমলার মা ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। পরের দিন সকাল থেকে আজ পর্যন্ত কমলার মা আর আসেনি। এই ঘটনায় নিজের ভেতর থেকে এক গোপন ভয় আত্মপ্রকাশ করল আর তা দেখে আমার শরীরের সমস্ত হাড় গলে গেল। ভয়ংকর ভীতু এই জন্তুটির সঙ্গে তোদের সকলের এমন অমোঘ মিল খুঁজে পেলাম, আমাদের সন্ধ্যাকালীন আড্ডা রঙিন আলো জ্বেলে দ্বীপের মতো জেগে আছে দেখলাম। আমার প্রতিশ্রুত ভূখন্ড; টেবিল চেয়ার এবং আমরা কয়েকজন, এই যেমন এখন।'

রঞ্জনের দ্বীপান্তর

অ্যানার্কিস্টদের আন্দামানে কী হাল হয়েছিল রঞ্জন কিছু কিছু জানে। রঞ্জন অ্যানার্কিস্ট নয়, রাজনৈতিক অ্যানার্কিস্টরা বিদেশি সিংহের পিছু পিছু হাওয়া হয়ে গিয়েছে, সে, রঞ্জন এই শতাব্দীর সত্তর সালের, দশকের মোড়কেও সেভাবে নিজেকে কখনও আবিষ্কার করেনি। স্কুলের ছাত্রদের গত পনেরো-ষোলো বছর যাবৎ মোটামুটি একটিই পাঠক্রমের রেওয়াজ দেওয়া তার কাজ। এই কাজ নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছে বলে রঞ্জন রুটি, ডিম, মাছ, মাংস পাচ্ছে। মাঝে মাঝে মদ। সে ভাগ্যবান, বিবাহ করেনি বলেই দারিদ্র্য তীব্র হয়নি। নাহলে তাকেও গোলক মিত্রের মতো স্কুলের দারোয়ানের কাছে সুদে ধার করতে হত। আবার তার জীবিকার গতি ঘন্টায় ১০০ বা ১২০ কিমি নয়, পেশাকে কেন্দ্র করে বিষন্নতা থাকলেও ভয়ংকর টানাপোড়েন কিছু নেই। রঞ্জন দেখেছে তার মাথায় সরের মতো সর্দি জমছে, সেই গাঢ় হলুদ বোকামিতে রঞ্জন ডুবতে বসেছে। মৃত্যুর কথা দ্রুত সাইরেনে বেজে উঠেছিল, রঞ্জন তার কেশগুচ্ছের তলায়, ধুলোর মধ্যে মৃত্যুকে অনুভব করে থাকবে। নাকে পচা গন্ধ লাগত, মগজ থেকে ক্রমশ এই মৃত্যু একদিন তার বুক কোমর পুংলিঙ্গ থেকে ছড়িয়ে যাবে হাত পায়ের আঙুলে। সে শিউরে ওঠে, কাজ

চায়, কিছু একটায় তাকে ডুবে যেতে হবে। প্রতিদিন, আঠেরো ঘণ্টা এক অন্ধকার রাতের অপেক্ষায় থাকা বীভৎস ব্যাপার। আর তখনই তার মাথায় মতিঝিল পরিকল্পনা আসে, এখন ফিরে আসার পর স্রোতহীন জীবিকার কাছে তাকে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে তারই মতো শামুকখোলায় নরম ও স্বাদু মাংস ঢেকে বসে আছে যারা, তাদের কাছে এবং সে জানে তাদের কাছে রঞ্জন, রঞ্জনও পচা মাংসের শরীর। রঞ্জনের ব্যবহার থেকে ক্রমে হাসি শুকিয়ে যেতে লাগল। ভয় হল অচিরেই সে হয়তো সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে হাসির ক্ষমতা।

মৃত্যুভয়ের সঙ্গে যুক্ত হল আর এক বিভীষিকা, সে তীব্রভাবে রক্তাক্ত পথে আবার বাঁচায় ফিরে আসতে চাইল। পরবর্তী অংশ বাঁচার সেই রক্তাক্ত চেষ্টা, যাঁর বৈশিষ্ট্য সে নিজেই নির্ধারণ করল; অলক্ষ্যের গদ্যকারকে সে কোনো ব্যক্তিত্ব দিতে রাজি নয়—কারণ ওই ব্যক্তি অসুস্থ। তার অনুভব পর্যন্ত ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত— পাতি কেরানির মর্যাদাও তাকে দেওয়া যায় না।

আর এই গদ্য রঞ্জন ও তার বন্ধুদের কথা, তাহাদের কথা।

নায়ক সংবাদ

সর্বর সঙ্গে রঞ্জন। সর্ব-রঞ্জন বন্ধুত্বের বয়স ২৫ বছর। প্রথম আলাপ জমলে, দেখে ভালো লাগলেই, ঝড়ের গতিতে যে বয়সে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সেই বয়সে তারা মুখোমুখি হয়। তারপর ২-৪টি বড়োধরনের ভাঙচোর ঘটে গিয়েছে—প্রেম, রাজনীতি, জীবিকা এই তিনটে বাঁকেই প্রধানত ওলোটপালোট। তারপর বিক্ষুব্ধ আলোড়ন কেটে গিয়েছে সেও ৭-৮ বছর। এখন তাদের পা ফৌজি শৃঙ্খলায় চল্লিশের কোঠায় কদম তুলছে। আগের বন্ধুরা বিশেষ কেউ আর তেমন নেই, সেইসব বন্ধু এখন জনসাধারণ। যেমন সর্ব, রঞ্জন, পার্থ, দেব, পূর্ণরা অন্যদের কাছে জনসাধারণ।

রঞ্জন কিংবা পূর্ণকে চাকরি না থাকার দিন-মাস-বছরগুলোয় ফুটো পকেটে যেভাবে কাটাতে হয়েছে, সর্বর সেরকম কিছু ঘটেনি। সে একের পর এক ঘর জিতেছে, ছাত্রের খোপকাটা ঘরটি থেকে সে এক লাফে হাজারিয়া হয়েছিল। রঞ্জনের মনে আছে তার সেই বিচিত্র অনুভূতি, সর্বর হাজারিয়া হওয়ায় রঞ্জন কী ভীষণ ঈর্ষায় জ্বলেছিল। একই সঙ্গে ওই একটি ঘটনায় টের পেয়েছিল তারা বদলে গেল, সবকিছু এবার অন্যরকম হবে, একে একে তারা জীবিকায় শিকড় চালাবে। সর্বর জন্য তাদের গর্ব হয়েছিল। অবশ্য রঞ্জনদের সর্বর ওই নতুন পর্যায়ে আসতে শেষ করতে হয়েছিল একটি পীড়নমূলক পাঠক্রম—মাথা ঝোঁকানো, উমেদারি। এসবে সর্ব ছাড়া সকলের মুখ বেশ ঘষে দেওয়া হয়েছে। সর্বর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যত্রও আছে। মনে আছে ১৮-২০ বছর বয়সে তারা নারীসঙ্গ কামনা করেছিল, ২৫ বছর বয়সে এই কামনা তাদের পোড়াতে লাগল। আর সর্বর প্রেমিকা জুটে যায় ওই আঠেরোতেই, ১৮-২৫ বছর বয়সের মধ্যে আসে রুচি। কাম-প্রেম দ্বন্দ্ব, নারী ও প্রেমিকা, যৌনপুতুল-পুতলি ইত্যাদি ঘিরে যা কিছু ঝুটঝামেলা, কেউ তাতে নাগ গলায়নি। না সর্ব, না রুচি। তাদের মধ্যে একমাত্র সর্বকে রাজনীতির জন্য জেল-হাজত করতে হয়েছিল। তাও একটি সপ্তাহ।

তাজা বাতাস

শীতরাতেও গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত ছিল না, সাদা কাপড়ে ঢাকা নরম লেপের তলায় দুটো লাশ যেরকম অচেতন তাতে রাত একরকম উষ্ণ মৃত্যু। শেষ ট্রাম চলে যাওয়ার পর দ্রুতগতি লরি, পুলিশের গাড়ির শব্দ ছিল কিছুক্ষণ তারপর এই শব্দের শহর অবিশ্বাস্য, অলৌকিক পাথুরে স্তব্ধতা পেল। জোড়াগির্জার ওপাশ থেকে একবার একটি ভিখিরি মেয়ে হঠাৎ আঁতকে ওঠে, তারপর চিৎকার করে কাঁদে। আবার স্তব্ধ, শব্দহীন, ভরা রাত। মাতাল হেঁটে গিয়েছিল, হেঁচকির শব্দ, গান ও মাতালের বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত মধ্যরাত শুষে নিল।

সর্ব ও রুচি নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে মৃগাঙ্কশেখর কোনোরকমে আঁচ করতে পারলে নিজের খাটটিতে মৃত স্ত্রীর জন্য আধখানা ছেড়ে আধশোয়া মূর্তি গড়ে রাখত। নড়াচড়ার শব্দ হত না, নিশ্বাসপতনেরও না। পাথরে খোদাই হয়ে যেত সে, বা মমি। আরকের গন্ধও থাকত কি? রুচিকে এসব পশ্চাদ্‌গামী, রক্ষণশীলতার কথা সর্ব কখনও বলেনি, রুচির ধারণা যে, মৃগাঙ্ক বয়সের ধাক্কা সামলে বেশ তীব্র গতিতেই আছে, বাসে-ট্রামে লাফিয়ে ওঠে নামে, এখনও প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে, তার নিজের একটি জগৎ থাকা অসম্ভব নয়। সত্তরে এতকিছু এ শহরে অকল্পনীয়, যাদের আছে বলে বাইরে থেকে মনে হয়, তাদের সঙ্গে সাদা কিংবা কালো কুকুরও থাকে শিকল-বাঁধা, কুকুরই তাদের টেনে নিয়ে চলে।

কখন আসবে? রু-চি! রু...উচি...ই...। সর্ব ধুকধুক করে চলছিল ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে, ক্রমশ নির্জন দুপুরের দিকে, রুচি আসবে দুপুর দুটোয়। সর্বর হাতের চেটোয়, আঙুলে, এক ফোঁটা মাংসহীন সমতল বুকে আছড়ে পড়ে তার নিজেরই রক্তের উচ্ছ্বাস, এই প্রবল উচ্ছ্বাস একসময়, ঠিক দু-টোয় রুচির বুকে আছড়ে ভাঙবে। কথা বলবে, কিছু জিজ্ঞাসা থাকবে রুচির, ব্যাকুল আগ্রহে অস্থির। 'ব-লো, কথা বলছ না কেন? কেমন আছ? কতদিন দেখিনি'...এভাবে শুরু হতে পারে। শুরুটা এভাবেই যদি হয়-ও আজ সাময়িক ছেদ কীভাবে নামবে সর্বর জানা। নিশ্চিত এগিয়ে দিতে যাবে, সারপেনটাইন লেন ধরে, তাদের হাঁটা হবে অসম্ভব মন্থর এবং দুজন দুজনকে জড়িয়ে কয়েকবার টাল সামলাবে, ক্রিক রো-র মুখে দুরন্ত ট্যাক্সির বাঁক নেওয়ার ভয়ংকর ঝোঁকের হাত থেকে রুচিকে আগলাতে সর্ব তাকে টেনে নেবে প্রায় বুকের পাশে, যখন মৃদু ভৎর্সনা : কী হচ্ছে...আহ্‌! সর্ব আর ভাবতে চায় না, রুচি চলে আসুক, সমস্তই পুনরাবৃত্তি হলেও রুচি আসুক। সর্ব রুচির জন্যে জাগা, টানটান, রুচির আসার আগের দু-এক ঘন্টা দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের দোলার সঙ্গে সে নিজেকে ঝুলিয়ে রাখতে চায়। তার পক্ষে কিছু ভাবা, করা আর সম্ভব নয়, বারবার শুধু ঘড়ি দেখতে পায় সে। আর বড়োজোর রুচির নগ্ন দেহ কল্পনা করা, রুচিকে টুকরো টুকরো করে ভাবা—গলা, ঘাড়, স্তনের কিছুটা ওপরে বুকের সেই অংশ যেখানে ঢেউ স্পষ্ট নয়, হাত, আঙুল এমনকি পিঠ। সে কাঁধের কথাও ভেবেছিল, ভাবে। অবশ্য এসব কথা রুচি জানে না, তাকে বলা হয়নি, বলা যায় না। সর্ব ও রুচির মধ্যে এই এক গোপন অন্তরাল সর্ব টের পায়। রুচি শিউরে উঠবে, অথচ যাকে বলে প্রত্যাখান তা রুচির পক্ষে সম্ভব নয়, আর সম্ভব নয়।

রুচি যখন এল তখন ঠিক দুটো কি না, বা সে কতটা দেরি করল এসব প্রশ্ন অবান্তর কেননা ওই লালচে অগোছালো চুলের ভেতর নেহাতই ছোটো তার মাথা, চাপা নাক, তেরচা ও তীব্র চোখ, মুখের জমিতে আঁকা কালো তিল, প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটি ক্ষতচিহ্ন এবং ওপরের ঠোঁটে সেই অমোঘ ভাঁজ আর সে খুব কাছাকাছি বলে সেই গন্ধ, গন্ধে সর্বর নেশা হয়ে গেল, একেবারে আগের মতোই তীব্র নেশা। দুজনের দু-হাতই পাতা মেলে, দুজনের মুখ, নিশ্বাস ছুঁয়ে থাকে তাদের। এভাবেই রুচি আসার পর তাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারেই কোনো চেষ্টা ছিল না। এই অবস্থাটা অত্যন্ত আরামদায়ক। ঘুমের ভেতর পা-দুটি ঘষা, সুখ-তাপ জমে। রুচি কিছু বলতে চেষ্টা করে, সর্বর মূক আচরণ, শরীর ভাষা সম্ভব শব্দ গোপন করতে সক্ষম। সর্বর কথা বলতে ভালো লাগে না, সে কিছু পান করতে থাকে, তখন তাকে তৎপর ও ধূর্ত কুকুর মনে হয়। দরজায়, তুচ্ছ শব্দের মানে মৃগাঙ্কশেখরের ফিরে আসা। সে একদম চাইছে না মৃগাঙ্ক ফিরে আসুক। এমনকি সে চাইছে মৃগাঙ্কর সম্পূর্ণ বিলোপ মৃগাঙ্কর সঙ্গে তার তেমন খাস কথা, টান কিংবা মায়া, কোনো কিছুই নেই। 'কথা বলছ না কেন? অ্যাই, ডা-কা-ত...', 'মৃগাঙ্ক এখন ফিরলে আমি খুন করে ফেলব' 'নোংরা হয়ে যাচ্ছ'...। সর্বর ঘাড়ে, কোমরে, বগলে স্প্রিং লাগান আছে, স্প্রিং খুলে যাওয়ার মতোই সে ছিটকে যায় 'অ্যাই, কী বললাম, নিজে বাজে কথা বলবে আবার একটুতেই...।' রুচি সর্বকে কোলের সন্তান জ্ঞানে যত্ন করল, সর্ব পোষ মানল।

গত শীতে রবীন্দ্র-সন্ধ্যা চিড়িয়াখানা অভিমুখে হরিণ শিশুদের যাত্রা, কবিতা পাঠের আসর ও নানারকম একক প্রদর্শনীতে ভাটা লেগেছিল। কেবল সারপেনটাইন লেনের সিকি মাইল জুড়ে প্রণব দাসের ১০৫ ঘন্টা একনাগাড় সাইকেল চালানোকে কেন্দ্র করে ফূর্তি ছিল একই রকম। জানা গেল সামরিকবাহিনীতে চাকরি পাওয়ার আড়াই বছরের মাথায় এসে রজত শুভ্রাকে বিয়ে করে যায়। শুভ্রা এখন নিজের শরীর খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে একটি প্রাণ, তাকে বেশ ফ্যাকাশে দেখায়। অবশ্য, তা নিয়ে পরিবারের কেউ বিশেষ চিন্তিত নয়, কেননা এসময় রক্তাল্পতা খুবই স্বাভাবিক। শুভ্রা দস্তুর মতো সিঁদুর লাগায়, মাসে নিয়ম করে দুখানা নীল ইনল্যান্ড ফেলে আসে রক্তমুখ থ্যাবড়া বাক্সে। তালতলার মুখে এপাড়ার খুব শান্ত, নিরীহ গোছের এক তরুণ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর জানা যায় সে বিদ্রোহী ছিল। পার্ক স্ট্রিট পোস্টাপিসে রাজনৈতিক ডাকাতি ঘটেছে, রাজনৈতিক ডাকাতরা ছিল সংখ্যায় মাত্র তিনজন। অস্ত্র: পাইপগান। গত বছর যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট হয়েছে তাদের মার্কশিট শহরের কোনো সংস্থাই গ্রাহ্য না করায় একদল বিষণ্ণ যুবক জন্মেছে, কোথাও একটি কুর্সি সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

সারপেনটাইন লেন সোজা সার্কুলার রোডমুখো, সার্কুলার রোড যদি দুটো অর্ধবৃত্ত ধরা হয় তাহলে আপার আর লোয়ার সার্কুলার রোডের ভেতর যত গলিঘুঁজি লেন-বাইলেন আছে সবই খাস শহর। শহরের আদি ম্যাপটি থেকে অত্যন্ত সাম্প্রতিক ম্যাপেও এই খাস শহর উপস্থিত। খাস শহরের পুরোনো বাসিন্দার কাস্টিং লোহার বেঁকা-বেঁকা রেলিং বা লোহার ছাঁচে ফুলের ঝাড়, এরকম ডিজাইন দিয়ে, লাল রঙের রোয়াক রেখে পেতলের আংটা বসান ভারী লোহা

কাঠের পাল্লা সমেত একখানা তিনতলা বাড়ি তো থাকারই কথা। চাই কি সস্তার মোঘল স্থাপত্য, জাফরি স্তম্ভ, প্যানেল, লম্বা জানলায় রঙিন শার্সি সমেত একখানা বাড়ি তো অন্তত রায়টের সময় জল-দরে কিনে ফেলবে। ৫০ সালের পরে শহরে জমির ফাটকা উত্তরোত্তর জমেছে। সম্পত্তির সিলিংটিলিং তখন কোথায়! মৃগাঙ্কর বন্ধু নরেনদেরই তো কলকাতায় সতেরোখানা বাড়ি ছিল। তার মধ্যে তিনখানা বিডন স্ট্রিটে।

সারপেনটাইন লেনে তিন পুরুষের বাস, সেই হিসেবে একরকম শতবর্ষ উদযাপিত। একশো বছর কেটে গিয়েছে। এই একশো বছরে প্লেগ, সন্ত্রাস, অসহযোগ, বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষ...সমস্তই দোতালা বাড়ির ন-টি ঘরের, ছ-টি থামের, কার্নিশ ও চাতাল শব্দ-বর্ণ-গন্ধে ছুঁয়েছে। যেমন ছাতের কার্নিশ ও চাতালের, নর্দমার ঝাঁঝরির মুখে তিনটে ইঁদুর মরে পড়েছিল। পাশের বাড়ির এক মেকানিক খিদিরপুর বোমা মামলায় চালান গেল, একঘর গরিব মাস্টার দুর্ভিক্ষের মুখে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে এনে পাড়া ছাড়ল। ঘোড়াটা বারবার লাফ মেরে পেছনের জোড়া পায়ে চাট মারছিল। ফেনা তুলে-তুলে, একবার পেচ্ছাপ করে কিছুটা ঘাস খেয়ে ও এক নাদি হেগে, মুতে বিটকেল একটা গন্ধ রেখে গেল। পুরো একটা সন্ধে সারপেনটাইন লেনের বাঁকটা গিলে ফেলল সেই গন্ধ।

রুচিকে সর্বর এইভাবে মনে ছিল; সাতটা, মেট্রো। মেট্রো সিনেমা হলটি রইল সামান্য পেছনে আর স্তম্ভহীন ঝুল বারান্দার তলায় ঝকঝকে এসপ্লানেড, রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রুচি। মেট্রো সিনেমা হলটি রুচির পেছনে রচনা করবে গর্ভগৃহ। মেট্রো মন্দির হয়ে যাবে। তবু সর্বর সাতটায় মেট্রোচুম্বকে ছিটকে আসাটা অনুভবহীন, আনন্দহীন জীবিকার মতো।

রুচি অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা করবে। রুচিকে সর্বর এইভাবে মনে ছিল; সাতটা, মেট্রো। বাঙালির পক্ষে ঈর্ষণীয় দৈর্ঘ্যের এক যুবতী, গাঢ় রঙের কোনো শাড়ি লতিয়ে আছে সেই কোমল দৈর্ঘ্য জুড়ে, তার মুখ ঝলসে রঙিন বৈদ্যুতিক আলো। শরতের আকাশ যে তারকা ঘরে আঁকা ছিল সেই প্ল্যানেটরিয়ামে হরিণশিশু, মেদের কোমর, কোমরের খাঁজে ধরানো, বুক পর্যন্ত ঠেলে ওঠা ব্লাডারগুলো গড়িয়ে নামলে সর্ব মিনির খোলে নিজেকে ছুঁড়ে দেয়। আর তখনই মণিবন্ধে নজর যেতে রুচি, মেট্রো, সাতটা—এই তিনটে জিনিস তার অমোঘ ও আশু ভবিষ্যত না ভেবে, ভাবল রুচি অপেক্ষা করবে। ভাবতেই বিস্ময়, ন-দশ বছরের সংশয় এত দ্রুত ঝেড়ে ফেলা! রুচি যে কী করে পারল! এতদিনে সর্ব-রুচির, বিশেষত রুচির সংশয়-ভ্রূণ এত দ্রুত ঝেড়ে ফেলা! রুচি যে কী করে পারল! এতদিনে সর্ব-রুচির, বিশেষত রুচির সংশয়-ভ্রূণ আরও কত পরিণত হওয়ার কথা, চোখ-নাক-মুখে হাজির থেকে সেই সংশয় তো তাদের সঙ্গ দিয়েছে। এতদিনে সে তো নিজেই প্রায় একটা মানুষ, যে কি না হঠাৎ কাঁধে হাত রাখতে পারে, ঘুম-ঘুম হালে যার সঙ্গে যৌনমিলন ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। আজ সাতটায় রুচির মেট্রোর তলায় নিজস্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কোনো উত্তেজনা, আগত শরতের কোনো উষ্ণ ভাব, কিছুই নেই। বরং যেন বা তারা বরফ মূর্তি : 'দ্যাখো আমাদের দশ বছরে, বাঁচার অভ্যাসের যা কিছু মিলজুল ছিল সে-ই স্বস্তি

নতুন করে কে আর কোথায় পাব...ত্রিভুজ উপাদানও তো কিছু নেই'। 'থাক', 'এরপরও আমরা ভালোবাসি।' এমন এক মহতী, শান্ত বিচ্ছেদ সর্ব-রুচির কল্পনায় ছিল, ঠিক ছিল সে অবস্থাতেও তারা আগ্রহ তীব্র হলে, আকুল হয়ে ছুটে যাবে। দু-এক রাত, দিন, থেকে যেতে পারে, শরীর নগ্ন হতে পারে, শুধু এই যে দুঃখ-দুঃখ ভাব রাখলে চলবে না। আর যদি অন্য, ভিন্ন মানব, মানবী তাদের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাহলেও এই ভবিষ্যৎ-দৃশ্য কিছু বদলে যাবে না। তবে গর্ভে, অঙ্কে বিন্যস্ত, সমস্ত নির্মাণ কৌশলে পূর্ণ এই নাটকটি অভিনীত হয়নি। তেমন কিছু ঘটেনি। রুচি ও সর্বর খাট, বিছানা, ঘরে, রেস্তোরাঁয়, রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির বা মফস্‌সল ভ্রমণপথে অনেকের আসা-যাওয়া, হানা, সবই ছিল। তবু কিছু ঘটেনি। বরং যেমন হয়ে থাকে, দু-পাঁচজন বন্ধুর বলয়ে তারা বেশ সুরক্ষিতই থেকে গিয়েছে। রুচি ইলিশ ভাপানো বা পটলের খোলে চিংড়ির পুর দিয়ে উপাদেয় ডিশ সাজায়, রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়, হাসির গল্পের মজুত খালি করে শেষ পর্যন্ত কেচ্ছায় ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তখন দুজনই খুব ক্লান্ত, চট করে ঘুম আসে না।

তবু কিছুই বদলাবে না, বদলে যাবে না।

এ পর্যন্ত তেমন ঘটনা কিছুই ঘটেনি। নাহলে নিঃশব্দ রক্তপাতে কিছু অভিজ্ঞতা হত। শহর জুড়ে আলোড়ন, সেও ঘটে গিয়েছে প্রায় দশ বছর আগে, সামাজিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ থেকে বলা সম্ভব এজাতীয় ঝঞ্ঝা তিন-চার দশক অন্তরই ঘটা সম্ভব। আর সেই মরু-ঝড়ের মুখে নাগরিকগণ বেদুইন, আলখাল্লার মধ্যে তাদের শরীর, জেগে থাকে ভীত, শিকারি চোখ শুধু। সর্বর দুটি আঙুলের ফাঁকে জ্বলে যাচ্ছিল মিনারের মতো সিগারেট।

রোচনার অসুখ

সর্বর ফিরতে রাত হলে মৃগাঙ্কশেখর পায়চারি করত দুটি দেওয়ালের সংকীর্ণ পরিসরে, বলেছিল 'তোমার মা বেঁচে গিয়েছেন।' একথা বলার সময় মৃগাঙ্কশেখরের মুখে দু-চারটে আঁচড় থাকতই, সেইসব আঁচড় তার ভেতরের, সময়-সময় মুখে ভেসে ওঠে। যে-যাই বলুক, সর্ব এখন যে-কলকাতায়, এই কলকাতায় গলি-বাড়ি-আলসে-হোর্ডিং-ধোঁয়া-জ্যাম ও শব্দ বিস্ফোরণ পূর্বাপর এক না থাকলেও, ভিন্ন এক বিস্ফোরণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিস্‌সার জন্ম দিচ্ছে। কে যে পঞ্চমবাহিনীতে নেই? আবার মিত্রশক্তি সম্পর্কে সংশয়ও থাকে। বিস্ফোরণটা বস্তির এবং বেশ পুরোনো গলির কিছু পাড়ারই। সে জেনে যায় প্রেসিডেন্সি কলেজটি আশ্রয় করে খবরের কাগজই তাতে গ্ল্যামার আরোপ করতে চাইছে, আসলে কলাবাগান এবং ভবানী দত্ত লেনই কলেজটির পাশে জমায়েত। সর্বাগ্রে অজয়ের কথা যে মনে পড়েছিল তার কারণও তাই, আর সে আশ্চর্য, এখন এই বিস্ফোরণের দিক থেকে ভাবতেই নামটা তার মনে পড়ে গেল অ-জ-য়।

সর্ব, বম্বে থেকে আবার একটা চিঠি এসেছে...কানপুর...

মাদ্রাজ...ইন্টারভিউর ছুতোয় অন্তত দক্ষিণ ভারতটা ঘুরে আসতে পারো তো...

বোধহয় এটাই ছিল সর্বকে কলকাতার বাইরে পাঠানোর শেষ চেষ্টা ও প্রস্তাব। সর্ব যাবে না। শেষের দিকটায় মৃগাঙ্কশেখরের মুখে একপ্রকার তৃপ্তি দেখা যেত, সর্ব 'না' শব্দটিতে টিকে

গেলে, টিকে যেতে পারল বলে। তার বাবা হয়তো আরও ভেবেছে, ভেবেছে সর্ব ওই 'না' শব্দটিতে বেশ সুচিন্তিতভাবে পৌঁছেছে। ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে, ব্যক্তিত্বে দ্বিধা, টানাপোড়েনটুকু অলক্ষ্যে থেকে যাওয়া সংগত। বাইরে শুধু ফলাফল দেখা যাবে। আর এটা বেশ একটা খেলা, সর্ব জানে খেলাই। নাহলে সে যে বাইরে যেতে পারল না, দিন কয়েকের জন্যও, সে তো স্রেফ একটা অস্থিরতার কারণে। পরিচিত শহরের ভিন্নরূপে সে একটা ধন্দে পড়ে গিয়েছে। আবার কাদাপাড়া থেকে গড়ের মাঠ পর্যন্ত এই শহরে তার যে রুটটি ছিল—সে-পথে কারখানার দেওয়ালগুলোর রঙের সঙ্গেও তার পরিচয়, কোথায় একটা ছাতিম গাছ আছে, কোথায় কোন সময় কীরকম মুখের স্কেচ থাকবে সেসব তার জানা। সে জানত রাজাবাজারের মোড়ে সকাল সন্ধ্যায় শব্দ ও আওয়াজের কীরকম তারতম্য। ভোর তিনটের আহিরীটোলা, রাত দুটোর বউবাজার, সান্ধ্যকালীন বস্তি, ধোঁয়া এসব নিয়ে শহর তার মগজে ঢুকে গিয়েছে। বর্ষায় কোথায় কতটা জল জমে, ট্রামের তার থেকে জলের ফোঁটা খসে পড়লে তার শব্দ ও ওজন কতখানি হতে পারে, কোন দিকে বৃষ্টির জল কালচে, অ্যাসিড-অ্যাসিড— এসবই তো তার জানা। যেমন সে জানত শহরের কোন কোন প্রান্তে পুকুর ডোবা টিকে আছে, শহরতলির কোথায় এখনও মেঠো রাস্তায় ঠান্ডা ভাবটা জড়িয়ে থাকে।

বাংলা-বিহার সীমান্তে পাঁচ বছর জাহাজ শিল্প অধ্যয়নে, তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশল শেখার দিনগুলোয় যে বিষণ্ণতা তাকে ঘিরে থাকত, স্নান, আহার ও নিদ্রায় রোজকার বেনিয়ম, অত্যন্ত স্থূলভাবে, শরীরী বাঁচায় যে একটা হুল্লোড়, ভবিষ্যতের লোভ ও একই বয়সের অনেকের ওরকম ঢেউ তোলা বালি মাটি অল্প ফিকে হলুদ টানা লম্বা বাড়িতে থেকে যাওয়ার যূথবদ্ধতা, সামরিক বাজনার আলস্য—এসবের ভেতর কিছু একটা ছিল না। সেই না-থাকা মহার্ঘ বস্তুটির সঙ্গে সর্ব এই শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে।

অ-জ-য়-ই যে তাতে আর কোনো সন্দেহ না থাকায় রাস্তা খুলে গেল, পদ্মপুকুর থেকে দশ নম্বর দোতলা বাস। শহরের এক-এক অংশে থাকা মানুষ এক-একটা রুটের সঙ্গে কেমন বাঁধা হয়ে যায়, রূপ যেখানেই থাকুক তাকে এইট বি খুঁজতে হত। যেমন সর্বকে দশ নম্বর। সে এখন জানে একটি, দুটি, তিনটি বাঁক। প্রথম বাঁকটির পর দ্বিতীয় বাঁকের দূরত্ব নগণ্য, এর মধ্যে প্রশস্ত পার্ক, পেছনে হাসপাতাল ও সাহেবি স্কুল, আবার এগুলোর পেছনে বস্তি, পেছনে রেললাইন, কবরখানা, ধোপার মাঠ, কারখানা বস্তি, কারখানা, পুকুর, ভেড়ি এবং তারপরই চষা মাঠ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাঁকের মাঝখানের দূরত্বই সবচেয়ে বড়ো, এর মধ্যে পাম অ্যাভিনিউ বলে একটা জায়গা আছে সেখানে দু-একজন উনিশ-শতকী মানুষ এখনও টিকে আছে। তারা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিল। আশ্চর্য এজন্য বর্তমান শতকটিতেও তারা পূর্বের স্বপ্ন ও বিশ্বাস ধরে রাখতে পারছে—বর্তমান যতই অসহ্য, কঠিন, বীভৎস হোক সেসবের ব্যাখ্যা এবং তার মধ্যেও প্রাচীন মমতা, বিশ্বাস, বা নিজের বাঁচাটা যে সেখানেও ভূত-বাঁচা নয় এতে তারা নিঃসন্দিগ্ধ। যেমন তাদের সন্দেহ হয় না নিজেদের অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও আদর্শের আতশকাচটিকে। ওরা কি রোজই কাচগুলো সাফ করে নেয়? পাম অ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে যেতে যেতে সর্বর মনে হল ওরা যে বেঁচে আছেই

কী করে জানল সে। স্কুলের ভালো ছাত্রের তালিকায় নাম থাকা ও সহবত শেখা ছিল বলে এবং কিছুটা সাংগঠনিক ক্ষমতা তার মধ্যে সহজাত থাকায়, তাকেই যেতে হয়েছিল সেই দুজনকে আনতে। তারপর, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর পর সে বার দুয়েক গিয়েছিল, 'তোমার আবৃত্তি শুনলে', 'তোমার গলায় গুরুদেবের কবিতা...'। ক্লাস টেনেই 'গুরুদেব' শব্দটিতে সেই যে চমকে উঠেছিল, মস্তিষ্কের ভেতর থেকে, স্তর-স্তর মাংসের ভেতর থেকে তা আজও প্রতিধ্বনিত হয়। প্রথম বারের সেই চমকে ওঠায় শব্দ ছিল। এক বর্ণের একটি শব্দ 'উ!' আবার সর্বর মনে আছে 'উ' শব্দটির অর্থ। আবৃত্তি করার আগে সর্ব করজোড়ে বলেছিল 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের...' সে ওইটুকুই জানত, গুরুদেব জানত না।

মাঝে মাঝে এসো কেমন
তোমার মুখটি বড়ো নিষ্পাপ।

ভদ্রলোককে দেখতে কেমন ছিল? একটু কৃশ? কৃশ তরুবর। নিজে বললে তার এরকমই বলার কথা, কৃশ তরুবর। হাসা বারণ, সে বলবে 'কী দেখছ' (পাতলা ঠোঁট দুটো এখানটায় ধীরে ফাঁক হতে থাকলে ছুঁচলো ঝকঝকে দাঁত দেখা যাবে, অন্যজনের ক্ষেত্রে হাসলে মাড়ি দেখা যেত, আর সেটা তার সর্দি বসা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ ও নানাবিধ নম্র ভদ্রতার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। সর্বর মনে হয়েছিল, বলে, 'দেখুন আপনার মাড়ি দেখা যায় হাসলে', ভাগ্যিস বলেনি)। আর একবার এদের একজনের বাড়িতে গিয়েছিল, একেবারে অযথাই গিয়েছিল। পার্ক সার্কাস ময়দানে খেলা ছিল, খেলা সেরে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো নিয়ে সে কলিং বেলে তর্জনীর চাপ দেয়।

পাম অ্যাভিনিউ এমনিতে ছায়া-ছায়া, এই এখনও যেমন, সেখানে তলতা বাঁশের গেট, গেটের ওপর বাগানবিলাস ফুল, ফুলের আচ্ছাদন। সর্ব বলত 'কাগজ-ফুল'।

গেট থেকে দ্বিতল বাড়িটির সেগুনকাঠের দরজার মাঝে সুরকি ও মাটি সমান অনুপাতে মেশানো রাস্তাটিতে কাগজ ফুল, কাগজ ফুল। কলিং বেলের শব্দটি বেশ নীচু পর্দায় এবং সুরে বাজত, এ থেকে সর্ব এখন বুঝতে পারে ওরা শব্দ সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিল, তার আরও মনে পড়ে যায় রাস্তাটিতে গাড়িগুলো যতদূর সম্ভব শব্দ না করে ঢুকত। এসবই যে আবার ওদের সম্মানে, সে-কথাও সর্ব জেনে যায়।

দরজা খোলার কোনো শব্দ ছিল না, দরজার একটি পাল্লা অনেকখানি সরে যাওয়ায় লম্বা একটা ফাঁক দেখা গেল। সর্ব সেই লম্বাটে ফ্রেমে ঢুকে পড়তে দ্বিধা করেনি, কারণ একটু ম্লান হলেও আপ্যায়নের হাসিটুকু ছিলই। তবে তাতে যে ম্লান ভাবও ছিল সেকথা জানতে পারে অনেক পরে। তখন সে বোতাম টেপা, দরজা খোলা, হাসি এসবই আবার হুবহু ভাবতে চেষ্টা করেছিল। 'এ-সো', সর্ব পেছনে ভদ্রলোকের ধবধবে সাদা পাজামা, রক্তহীন ফর্সা পা পিছলে সিঁড়ির রেলিং ছুঁয়ে ওঠে, সিঁড়িগুলো প্রশস্ত নয়। বেশ খাড়া এবং দু-বার বেঁকেছে, ঘোরানো সিঁড়ির একটা নকশা ছিল তাতে, বা স্টেজে, স্টুডিওতে যেরকম সিঁড়ি অনেক সময় দেখা যায়। আবার তা এত নিঁখুত, মানানসই ঘরগুলোর সঙ্গে, যে কোথাও নিশ্চিত এরকম বাড়ি, এরকম সিঁড়ি ছিল, একেবারে দেখে-দেখে, ভেবে-ভেবে বানানো, টুকলি। একটা গন্ধও ছিল,

সে-গন্ধ ফুলের নয়, চড়া কোনো সেন্টের নয়, কাঠ ও বেতের আসবাব থেকে ওই বাড়ির চারটি প্রাণীর শরীর থেকে যেন গন্ধটা ঘামে-শ্বাসে বেরিয়ে আসতে থাকে।

যে তার পায়ে ধুলো, সে খেলে ফিরছে, সে মাত্র এর আগে একবার এসেছিল, তার বয়স মাত্র পনেরো—এসব কিছু নেই। বারবার ভদ্রলোকের বসার ভঙ্গি বদলে যেতে থাকে। আর সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ফাঁকা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটিতে গোটাকয়েক বেতের চেয়ার, শ্বাস বন্ধ করে জমে থাকা বইয়ের আলমারি, মৃত একটি গাছের ডাল বাঁ কোণে, বিশাল কলমে আঁকা প্রখ্যাত শিল্পীর কিছু আঁচড়। এর মধ্যে 'রোচনা অসুস্থ' একটি সংবাদ, সেই সংবাদ ঘিরে নানা বয়সের কিছু গম্ভীর মুখও। বোঝাই যাচ্ছিল রোচনা আছে ডান দিকে, হলুদ পর্দার ওপাশে, যেদিকে তার চোখ, ফোলা চোখ, জোলো চোখ, চোখের তলায় বেখাপ্পা রকমের লম্বা নাক। ভদ্রলোক চুলগুলো সরাতে ডান হাত তুলতে যায়, ঢোলা পাঞ্জাবির হাতার ভেতর ভয়ংকর রোগা ভয়ংকর সাদা হাত। এত রোগা সেই হাত যে হাড়ের ওপর চামড়াটিও নেই, এত ফর্সা যে তা হাড়। আবার তা নাড়ানো যায় না শুধু কাঁধের পাশে একটা কম্পন দেখা দিতেই দু-তিনজন আঁতকে ছুটে এল 'ও ঘরে যাবেন? চলুন।' ডান হাতে পক্ষাঘাত, রোচনার জন্ডিস মিলে, এইসব জানাজানিতে সর্ব যখন তাকে পারিবারিক বিষণ্ণতায় গলে যেতে দেখে অবাক, তখনই সে জানতে পারল ভদ্রলোক যেভাবে রোচনার দিকে যেতে যেতে গলে যাচ্ছে, এরাও, এইসব সুজনরাও, তেমনি গলে যাচ্ছে তার কথা ভেবে 'এত টেনশন!' 'যদি ওঁর কিছু হয়!'

'ওঁর সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগ শেষ হয়ে যাবে!' সর্বর পায়ে ধুলো, হকি খেলে সে খিদে খুঁচিয়ে তুলছে এতটাই যে ভেতরে আগুন, খেলার শ্রম-আনন্দ-খিদের মিলনে তার ক্লান্ত লাগছিল, সে স্টিক ঠুকে যাচ্ছিল, মেঝের দিকে তাকিয়েছিল আর স্টিক ঠুকে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল ওদের উৎকণ্ঠা, দীর্ঘশ্বাস ও নীরবতা যত গভীর হচ্ছে স্টিকের শব্দও ততই বাড়ছে। মাথা তুলতেই দেখে তারা সবাই সর্বর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখগুলো পাথর, মৃত। অথচ ভৎর্সনা নেই, আছে সম্পূর্ণ অ-পরিচয়।

মানুষটার নাম সে স্মরণ করতে পারে; হীরেন ব্রহ্ম। দুজনের একজন সে, আর একজনের কথা আসবে তারই অনুষঙ্গ হিসেবে। যেমন হীরেন ব্রহ্ম নিজে আসে রবি ঠাকুরের প্রসঙ্গে। শহর ও গ্রামে বিস্তৃত বাংলাদেশটিতে পক্ষাঘাতে ডান হাত হারানো অতীব সাদা এবং কৃশ এই ব্যক্তির পর আর কেউ থাকবে না। একটি যুগ শেষ হয়ে যাবে। নিত্য নতুন দিক থেকে ঠাকুরবাড়ির গোপন অনুভবের কথা, শান্তিনিকেতন গড়ার বিষয়ে গুরুদেব যথার্থ কী ভেবেছিলেন, কী করে এই এক ব্যক্তি, কবি, গীতিকার, সুরকারে পুরো একটা দেশ সংহত হয়ে নির্যাস হয়ে প্রকাশিত তার দৈনন্দিন সূক্ষ্ম, ছোটো ঘটনাগুলি আর জানা যাবে না। অথচ তা তো একটি খনি, অশেষ অসীম। এই অসীম, দিগন্তে, শূন্যে, চরাচরে মিলিয়ে যাবে যখন ওই হাসি আর থাকবে না ('আমার বিস্ময়' হয়), যখন আর হাসির সঙ্গে মাড়ি দেখা যাবে না, যখন পক্ষাঘাতে জড় হাতটি আগুন পুড়িয়ে দেবে।

খড়গপুর আই আই টি-র শেষ দিনগুলোয় সর্ব বীভৎস একটা স্বপ্ন দেখত প্রায়ই। তারপর

এমন হল সে ক্লাস করতে-করতে, হাঁটতে-হাঁটতে, গল্পগুজব করতে-করতে, স্বপ্নটিকে নানাভাবে চোখের সামনে ঘটতে দেখত, সেই স্বপ্নে রক্ত এবং ফেনা ছিল :

হীরেন ব্রহ্মার মুখটি সম্ভবত খাড়া নাকের কারণেই আরও বেশি লম্বাটে দেখাচ্ছে, সে ঝুঁকে আছে টেবিলের ওপর। আর সাদা কাগজে কালির আঁচড়ে শেষ যোগাযোগটুকু সারতে সে মদ্যপ তীব্রতায় শব্দ ঢেলে যাচ্ছে, ফলে ভাষায়. শব্দে একটা সংকরদোষ এবং হিংস্রতা ঘটছে। 'অকরুণ', 'অসীম', 'চলিষ্ণু' এইসব শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না, 'হাল' না লিখে, লিখে ফেলছে 'বাল', আর 'আত্মহনন' ও 'আত্মহত্যা' খোঁজার সময় না থাকায় লিখছে 'তাই শেষ অব্দি নিজেকেই খুন কল্লাম...।'

পাঁচ বছর আগের কসবা আর নেই ঠিক এরকম ভাবনা যেমন সর্বর ওপর ভর করতে পারে না, তেমনি নির্মীয়মাণ সেতুটির কারণে, লাইনের ওপরে নগর গৃহ-নির্মাণ দফতরের উদ্যোগে, একটি জলের ট্যাঙ্ক ও দু-একটা ব্যাঙ্ক কিছু অভিনবত্ব আনবেই। রিক্সার ভিড়, রাস্তার গর্ত, কাঁচা নর্দমা, ডান বাঁয়ে অজস্র গলি, ন্যাড়া ছাত, বস্তি ও ডানহাতি মসজিদ নকসার বাড়িটা পাঁচিলের বটগাছ ছোট ও চ্যাপটা ভাঙা ইটে গড়া দুটি স্তম্ভে কসবা কসবা-ই। অজয়দের বাড়িতে কড়া নাড়ার নিয়মটা তার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ফলে পরপর জোরে জোরে ঝাঁকাতে কিছু অসুবিধে নেই।

'কাকে চাই? কোত্থেকে আসছেন? দাদা জানত আপনি আসবেন? কী করে এলেন, আসুন, মা দেখে যাও।'

এসব স্বর ও বাক্যের মাঝে মাঝে সর্বকে বলতে হয়েছে 'আমি সর্বজিৎ' 'এক ক্লাসে পড়তাম' 'অজয় আছে'? 'বাড়ি চিনতে অসুবিধা হয়নি' 'নর্দমা আর বটগাছ আর ফাঁকা বাড়ির ছবিটা তো মনে গাঁথা হয়ে আছে।'

অ-জ-য়।

সে বেশ উত্তেজিত, আশা করেছিল ঢুকেই শুনবে 'আরি! তুই!' অজয়দের গলির মুখে ভাঙা স্তম্ভ দুটি তোরণ, তাতে একটা দুর্গ এবং একটা রাজকীয়তা ছিল, বাঘমারির বাঁহাতি গলির মুখেও সেই স্তম্ভ, একই রকম স্তম্ভ, নারকেলডাঙা মেন রোডের রেল ব্রিজের কাছাকাছি উদ্‌বাস্তুদের বসতির প্রবেশপথেও ওই স্তম্ভ ছিল, সেখানে ভাঙা পুরোনো বা রাজকীয় বাড়িও ছিল, সোমেশ্বররা ঢাকা থেকে সরাসরি ওখানেই এসে উঠেছিল...আর কোথায়? শহরের আর কোথায় সর্ব ওই স্তম্ভ দেখেছে? চ্যাপ্টা, ছোটো-ছোটো ইট, লালচে রঙটা একটু বেশি এবং ক্রমশ গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা সংকীর্ণ, কাঁচা নর্দমা দু-পাশে, আবার নর্দমা দু-হাত ছেড়ে গাঁ-গঞ্জের মানুষ সবজির একটা বাজার বসিয়েছে। এসবের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সর্ব অজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা টের পেতে থাকে। আগে সে এ-তল্লাটের গলি, স্যাঁতসেঁতে ভাব, মালগাড়ির ধোঁয়া ও শব্দের সঙ্গে অজয়কে জুড়ে নিত। যেমন ক্লাস নাইনে অজয় স্কুল বদলে তীর্থপতিতে চলে আসে। তারা জানত ওটা অগা স্কুল, পড়াশুনো হয় না। কিন্তু অজয়কে ট্রান্সফার নিতে হল কেন? অজয় কি ফেল করেছিল? না কি তীর্থপতিতে সে ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ জোটাতে পারে

তাই, ঠিক মনে নেই। তবে অজয়ের যে আরও অগা একটা স্কুলেই পড়ার কথা তা ওদের বাড়িতে গিয়ে আসবাব, লোকজন, ঘর, সিলিং এবং বাইরের দোকান, রাস্তা, নর্দমা দেখেই সর্বর মনে হয়েছিল।

অজয় তো নেই বাবা! তুমি এখন কী করচো...বাহ্! বাহ্! সোনার টুকরো ছেলে, এই বয়সে... কোথায় চাগরি পাচ্ছ... চাগরি পাবে? চাগরির যা বাজার... দেশসুদ্ধু বেকার মাতার ঠিগ নেই ছেলেপুলেরা কী করবে বলো...ওপরের দিগে চাগরি পাওয়া যায়, তা যা বলচ, তবে তা আর ক-টা বাপ-মা পাচ্ছে বলো, না হলে ছেলে শিক্ষিত হোগ, বড় চাগরি করুগ, জীবনে উন্নতি করুগ কে না চায়...

অজয়ের মার কথাগুলো সর্ব গিলে যাচ্ছিল আর সে ভয়ংকর সজাগ। তার ধারণার সঙ্গে অজয় মিলে যাক সর্ব এটাই চাইছে, মহিলার কথার ভেতর থেকে 'মাতার ঠিগ নেই' 'দেশসুদ্ধু বেকার' এই দুটো সে তুলে নেয় এবং ভাবতে থাকে উনি যখন বলছেন দেশসুদ্ধু বেকার সম্ভবত তখন শুধুই বেকারত্বটি বোঝাতে চাইছেন না, সমস্যা-জর্জর একটি দেশ উনি টের পান, নিজে সন্তান ও পরিবার-সহ তারই অঙ্গ, দেশকে কসবা রথতলা থেকে ছড়িয়ে যেতে দেখছেন, ভাবছেন। বোমা বিস্ফোরণ দেখছেন আর ভাবছেন, খুন দেখে আঁতকে, শিউরে, আভূমি কাঁপতে-কাঁপতে ভাবছেন...হয়তো তুলনা খুঁজছেন সেলাই নিয়ে বসে। আচ্ছা অজয়ের মার বয়স এখন কত হতে পারে? মৃগাঙ্কশেখর নয় মৃগাঙ্কশেখরের স্ত্রীও নয় এদের সবার থেকে অজয়ের মা ছোটো। সর্বর কাছে তথ্য আছে : মহিলা যখন চোদ্দো বছরের কিশোরী তখনই তাকে পিঁড়িতে বসানো হয়েছিল আর ঠিক এক বছর পরে অজয় আসে। সর্বর বাবার ঘরে দিদির ছবিটা ডিমের আকারে বাঁধানো আছে, অন্নপ্রাশনের ছবি, সেই ছবির মুখে বাবার তীক্ষ্ণতা এবং মার লালিত্য মিশে এক অপরূপ সৌন্দর্য। দিদি সর্বর থেকে দশ বছরের বড়ো, বিয়ের সময় সর্বর মার বয়স ছিল ষোলো। ফলে বোঝাই যাচ্ছে টেরোরিস্ট আন্দোলনের কোনো স্মৃতি তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়নি। অজয়ের মা নিরক্ষর হওয়ায় অন্যভাবেও ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। তবে, সাহেব, বোমা, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন এসব বাতাসে উড়ে বেড়ায় বলে তুলনার একটা চেষ্টা এসেই যেতে পারে। কিন্তু অজয় কী...সে কি রাজনীতি করছে? ডান? বাম? কোন ধরনের বাম? বাম যে করবেই তার গ্যারান্টি তো শৈশব চরিত্র। কিন্তু তা কি খুব নির্ভরযোগ্য? সর্বর যা খেলার নেশা ছিল, যে নৈপুণ্য সে দেখাতে পারত, যতগুলো মেডেল জিতেছিল তাতে তার খেলোয়াড় হওয়ার কথা, প্রথম শ্রেণির একজন খেলোয়াড়। কিন্তু হল কি? কিংবা এই কী অজয়ের মা? যদিও বাড়ির ছবিটা একই রকম আছে, সেই বাঁদিকে চাপাগলি, গলির শেষে মুখোমুখি দুটো খাটা পায়খানা, মাঝখানে অজয়দের মলিন সাদা রঙের বাড়িটি। দরজায় খিল দেওয়া থাকত না, ছ-ফুট লম্বা মানুষের মাথা দরজার ফ্রেমে ঠুকে যাবেই, দরজা খুললেই ওদের পরিবারের বছর পাঁচেক যাবৎ ব্যবহৃত জুতোর স্তূপ থাকত বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে, আর ঠিক তার ওপরেই তক্তা বসানো দেওয়াল আলমারি, সেখানে পাঠ্যপুস্তক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ব্র্যাডশ, বঙ্কিমচন্দ্রের দু-চারখানা উপন্যাস ও পোকায় কাটা থমাস পেইনের একটি বই, চারুচন্দ্রের ইংরেজি-বাংলা অভিধান এবং লম্বা সাইজের

গোটাকতক খাতা এবং এক-দেড় মাসের আনন্দবাজার কাগজ। এই জায়গাটা দেড়হাত একটি গলি যা ঘিরে ওপরে টালি দেওয়া খান চারেক খুপরি ঘর, সামনের বাড়ির ছায়া-অন্ধকারেই ঘরগুলো ঢাকা, বিকেলের দিকে একটু ম্লান আলো পাওয়া যেত, তখন অজয়ের কাকারা ফিরত। ওর মা বেড়াল-মার মতো সন্তানদের কোলের কাছে টেনে দুপুরে শুয়ে থাকত (অজয়ের মার স্তনদুটিতে এমন স্ফীতি ছিল যে ব্লাউজের ভিতর ধরতে চাইত না)। বিকেলে সে-ই তোবড়ানো সেই বিশাল কেটলিতে জল ফোটাচ্ছে, তখন ওই চারটি ঘরে তারা তেরো জন মানুষ থাকত। তেরোজন মানুষের অসুখবিসুখ, সুখ-দুঃখ, মন খারাপ, খিদে-তেষ্টা, অভাব-অভিযোগ থেকে স্নান-পায়খানা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে সে সবই মহিলার দায়িত্ব। বা অজয়ের মা তার শরীরের মাংসে কোষে এই তেরোজনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত, তেরোজন এমনভাবে নড়েচড়ে যে তারা সবাই মিলে একটাই শরীর কিন্তু অনেকগুলো মুণ্ডু, অনেকগুলো হাত-পা, এক আজব জন্তু।

অজয় কী করে বিদ্রোহী হয়!

এরকম পরিবারে!

মাতৃতান্ত্রিকতায়...

আবার মহিলার ওই সামান্য কথাগুলি কাটাছেঁড়া করে সর্ব তার একটা পক্ষপাত দেখতে পায়। এই পক্ষপাত মৃগাঙ্কশেখর থেকে আলাদা, মৃগাঙ্ক ইতিহাসের গতি সত্তরের অস্পষ্ট, ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখতে পায় বলে বিশ্বাস করে, অজয়ের মা বর্তমানের মধ্যেই সবটুকু দেখছে মনে হয় 'সত্যি কী হচ্ছে বলোদিদি, বি এ এম এ পাশ দিয়ে সব যদি ঠুঁটো হয়ে বসে থাকে...অজুকে তো আর পড়াতেও পারলুম না...অজুর কেমন মাথা ছিল লেখাপড়ায় তুমি তো জান...।'

ও কী করছে এখন?

কী আর করবে বাবা!

নাহ্ চাকরির কথা বলছি না...

খোঁজখবর...

নাহ...

সর্বর পক্ষে আর কীভাবে প্রশ্নটাকে স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ করে তোলা সম্ভব? বিশেষত যে মহিলা গত তিরিশ বছর যাবৎ দৈনন্দিন হিসেব, সেলাই, ঋণশোধ, রক্তাল্পতা, হাসি ও দমবন্ধ ক্রোধকে বুকের নীচে, ঠিক তার স্ফীত স্তনের তলায় চেপে রেখে, চামড়ার ক্রমাগত শুষ্কতা জমতে দিয়ে অজয়কে ঘিরে দূর মাস্তুলে সৌভাগ্য জাহাজ দেখেছিল সে, খিদিরপুর ডক, কলকাতা বন্দরই হোক না কেন, আটার বস্তা চালের বস্তা নামছে কুলির পিঠে। সংকীর্ণ বারান্দাটুকু বারান্দাই সেখানে বহু পুরোনো একটা গোল টেবিল, টেবিলে চারটে পা, সিংহ-পা, ওপরটা খাঁজ কাটা, ওরকমই একটা চেয়ারও আছে, তাতে আধশোয়া হওয়া যায়, ভেতরটা বেত দিয়ে বোনা। সেই বুনুনির ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকা জমেছে, তেল ও কালি জমেছে, ধুলোও; তেল-কালি-ধুলো ডানদিকের দেওয়াল ঢাকা আলমারির কাচেও। এসবের মধ্যেই কোথাও

না কোথাও অজয় আছে। সেই অজয়, পনেরো বছরের অজয়, যাকে স্কুলের বন্ধুর সামনে কাকার হাতে চড় খেতে হয়েছিল এবং এজন্য যার মনে কোনো খেদ জমেনি।

কসবা পেরিয়ে সর্ব লেভেল ক্রসিং বরাবর, লোকটাও। শুধু তাই না, খাড়া করে পোতা লাইনের দুটো পাতের ভেতর দিয়ে গলার সময় দেখতে পেল লোকটা অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে। সে ভাবছিল চেনে নাকি, কখনও দেখেছে কি? ওরকম গোল মুখ? সম্পূর্ণ কামানো মুখ? ধুতির ওপর টেরিকটের দাদু শার্ট, কদমছাঁট চুল ও গোল কঠিন মুখ? সর্ব লাইন পেরিয়ে যাচ্ছে, পেছনে নিউকাট জুতোর শব্দ; সর্ব আবার লেভেল ক্রসিং বরাবর। কসবা এখন ওপারে, এপারে বালিগঞ্জ, সে বালিগঞ্জে পৌঁছে গেল। রোমাঞ্চ হচ্ছিল না তা নয়, আবার এই যে তার একটু ছমছমে লাগছে সর্ব সেটাকে পাত্তা দিতে চায় না। হয়তো দেখবে লোকটা সংস্কৃতের মাষ্টারমশাই, ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট কিংবা ব্যাঙ্কের অফিসার। আসলে হয় সর্ব ভয় পাচ্ছে, না হলে তার মাথার ভেতর দেওয়ালের স্লোগানগুলো এমনভাবে ঢুকে গেছে যে সে ভাবতে শুরু করেছে সত্যি সত্যি শীতপ্রসাদ আক্রান্ত, কাল ভোরে হয়তো আনন্দবাজার কাগজেরই ষাট পয়েন্ট বোল্ড হেডলাইনে লেখা থাকবে : প্রবল রক্তক্ষয়ী...অবসান! আর এসব ক্ষেত্রে কিছু লোকজন, সম্পূর্ণ ফালতু একটা লোকও শহিদ হয়ে যেতে পারে। সে কি শহিদ হতে যাচ্ছে? লোকটা গুলি ছুঁড়বে না তো...হল্ট, হল্ট ... মাথার ওপর হাত তোল...

এসব দিবাস্বপ্ন হতেই পারত, হতেই পারত যে পুরো ব্যাপারটা ফালতু কিন্তু তা না হয়ে সর্বকে বিস্মিত করে সত্যিই বলা হল: হাত তোল ওপরে শালা...। কথাটা কি তাকেই বলা হল, সে কেন হাত তুলতে যাবে, একদিকে এসব যেমন সঙ্গত প্রশ্ন, অন্যদিকে আমাদের নায়ক খুব সাধারণ, খুবই সাধারণ। সে ভয় পেতে পারে, ঘাবড়ে যাওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। মুহূর্তে পূর্বাপর তাকে অনেক কিছু ভেবে নিতে হচ্ছে : ছুটব, যদি গুলি ছোঁড়ে...লোকটা একা নাকি আরও লোক আছে... রাজনৈতিক দলের জঙ্গি ক্যাডার নয় তাহলে বয়সটা কিছু কম হত... পুলিশের লোক? খোচর? সর্ব কি ছুটবে? কিন্তু আমি তো কোনো রাজনৈতিক দলের ক্যাডার নই, এখন তো সঙ্গে কিছুই নেই...জাহাজ নির্মাণশিল্প...জাহাজ...কার নাম করব...এক ওই হীরেন ব্রহ্ম ছাড়া কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি; প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তো চিনি না...পুলিশ হলে তারা কি হীরেন ব্রহ্মকে গুরুত্ব দেবে...চিনতে পারবে...ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে এক মেসো আছে না...এখন মেসোর নামটাও মনে আসছে না... লোকটা কি অনেকক্ষণ ফলো করছিল? কোত্থেকে? ভয় পেলে ওরা পেয়ে বসবে বরং আমাকে নিজের রাইটগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে...

বুঝলাম কিন্তু কসবায় গেসলে কেন?

অজয়ের কাছে।

অজয় তোর বাপ...

বন্ধু!

ঝাড়ার বন্ধু?

নাহ্? ছেলেবেলার, আমি ঝান্ডাফান্ডা করি না...

গোপাল আমার! পোঁদে এক লাথি ঝাড়লে...

বিলিভ মি, আই নো নাথিং অ্যাবাউট...

হোয়াট?

নাথিং...

আই হ্যাভ জাস্ট কমপ্লিটেড মাই স্টাডিজ...

আই অ্যাম আ ন্যাভাল আর্কিটেক্ট...অজয়...

হ্যাঁ অজয়, ওকে কি সাবমেরিন বানানো শেখাতে এসেছিলে...ওঝা শ্লা বন্ধ কর...

'সাবমেরিন, টর্পেডো'...এসব কী হচ্ছে! জেরা করছিল যে লোকটা তার পরনে ধুতি এবং আদ্দির পাঞ্জাবি, ঘষা কালো রং, ছুঁচলো মুখ। সর্বর লোকটার পে-স্কেলের কথা মনে হল। সে তার বাড়িটাও দেখতে পেল সুরেশ সরকার রোডে ট্যাস পাড়ার ব্যারাকবাড়িই হবে, ওর বউর কম করে পাঁচটা বাচ্চা আছে। সকালে বড়ো ছেলেটাকে জিলিপি কিনতে পাঠায়, যেদিন ইলিশ মাছ কিংবা মাংস হয় সেটা রবিবার বা নবমী পুজোর দিন। আর এই ঘষা এস আই-টি সারাজীবনে এক ওই ব্যারাকপুরের ট্রেনিং পিরিয়ড ছাড়া কখনও রিভলভারের ট্রিগার টেপেনি। এপর্যন্ত বড়জোর চারটে পকেটমার, চোলাই মদের দু-চারজন কারবারি, দু-তিনটে চোর ধরেছে। ধরা মাত্র যারা ওর হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদেছে 'স্যার আপনি বাপ-মা...মর জায়েগা, বাল বাচ্চা হ্যায়, ইয়ে পঁচাশ রুপিয়া আপকে লিয়ে...।' ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা মামলা থেকে লোকটা পয়সা কামায়, বেশ্যার কাছ থেকে কমিশন খায় এবং নিশ্চয় ছেলেকে বিদ্যাসাগরের গল্প বলে থাকে। দু-কামরার একটা বাড়ি বানাবে বলে লোকটা হয়তো বেলঘরিয়া কি বারুইপুরে দু-কাঠা চার ছটাক জমিও কিনে রেখেছিল...এরকমই চলে যেত, লিভারের গণ্ডগোলে মুখের দাগ হয়তো আরও গভীর হত বড়োজোর... কী শেখাতে এসেছিলি সাবমেরিন বানানো, তোকে কে রিক্রুট করেছিল, পয়লা গুরু কে? অজয় কোথায়? পাঁচটা নকশালের নাম বল ছেড়ে দিচ্ছি...শ্লা আরকিটেক্ট...আরকিটেকচার-ফেকচার... পোঁদে ঢুকিয়ে দেব...

সাব্যস্ত হয়েছে এই বাহিনী, এই লোকটা, যার নাম মধু চক্রবর্তী, এই এরা গলিঘুঁজি মাঠ-ময়দানে মজুর বস্তি আর স্কুল-কলেজ আর পত্রিকা অফিসগুলো ঘিরে ফেলে গুলি ছুঁড়ে যাবে, আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসবে...এখন শহর জ্যামে আটকে থাকলে যেভাবে ট্রাফিক পুলিশ গাড়ির কাছে ছুটে যায়, পোদ্দার বিল্ডিং-এ আগুন লাগলে যেভাবে দমকলবাহিনী সিঁড়ি পাইপ বেয়ে আগুনের ভেতর ঢুকে যায়, আবার ঢুকেই এক পরত মাংস পুড়িয়ে জানলা দিয়ে নীচে নামার চেষ্টায়, অন্ধের মতো চেষ্টায় আত্মহত্যা করে ফেলে, লোকটাও কি সেরকম আগুনের মধ্যে...টর্পেডো, সাবমেরিন এসব কি যুবশক্তির হাতে এসে গিয়েছে, আসার সম্ভাবনা আছে? না কি ভয়, ভ...অয়, আগুনের ভেতর ঢুকে যাওয়ার ভয়, চাকরি ছাড়তে পারছে না বলে ভয়, দু-চারটে ছেলেকে ধরে পিটিয়ে দিচ্ছে, আধমরা করছে ভয়ে, আবার তাদের পেটাচ্ছে বলে ভয়, ভয়ে লোকটা মুতে ফেলবে...সেই লোকই খুন করবে, করছে, খুন করতে করতে লোকটা এতটাই খুনি হয়ে যাবে, এমন দক্ষতা অর্জন করবে, কিলার হয়ে উঠবে যে পুরুষোত্তম

উপাধি পেতে পারে। সে হয়তো তখন এ বিষয়ে প্রজেক্ট সাবমিট করতে সমর্থ হবে, তখন তাকে একটি রাউন্ড চেয়ার দেওয়া হবে। আই পি এস-এ এসব আগে ছিল, এখন আর নেই, এখন পুরো ফোর্সটিকে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলা যায়, একভাগের জন্ম ব্যারাকপুরে পি টি করতে-করতে, আর এক ভাগ আসে ইতিহাস দর্শন কিংবা ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণির এম এ করে। দ্বিতীয়দের সঙ্গে সবরকম বিষয় নিয়ে দুটো কথা বলা সম্ভব, তারা ঝকঝকে। মৃগাঙ্কর পক্ষে এমন একটি ফোন নম্বর পাওয়া খুব কঠিন ছিল না— 'হ্যালো, টু ফোর থ্রি থ্রি ফোর এইট, হ্যালো কে খাঁদু, আরে শোন সবুকে...।'

সর্বর সঙ্গে শহর-অভ্যুত্থানের সম্পর্ক এই পর্যন্ত, এই পাণ্ডুলিপিতেও রঞ্জন তার দাপট এই পর্যন্তই মেনে নেয়, কেননা রঞ্জন তাজা মানুষ, ঘটনার, উত্থান-পতনের মানুষ, পট-পরিবর্তনের মানুষ খুঁজছিল।

সুতরাং বিদায়। সর্ব। বিদায়।

সংবাদপত্রে কলকাতা ৭০

যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যেকার রাজনৈতিক সংঘর্ষ এখন সারা কলকাতাকে দূষিত বাতাসের মতো আচ্ছন্ন করেছে। উত্তর কলকাতায় তা সব থেকে তীব্র। গত বুধবার সতেরো বছরের এক তরুণ এই আত্মক্ষয়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের বলি হয়েছেন। উত্তর কলকাতার ফড়িয়াপুকুর লেনের এই খণ্ডযুদ্ধ চলে টানা তিন ঘণ্টা, বোমার আঘাতে উক্ত তরুণের একটি চোখ ও খুলির একটা দিক উড়ে যায়...

প্রতিক্রিয়া

শহরে খুব ঠান্ডা একধরনের সতর্কতা লক্ষ করা যাচ্ছে। উত্তর ও মধ্য কলকাতাকে যাদের পক্ষে এড়িয়ে থাকা সম্ভব তারা ভুলেও ওদিক মাড়াচ্ছেন না। কোনো সান্ধ্য আইন জারি করা হয়নি, তবু সন্ধ্যার পর রাস্তায় মানুষের চলাচল ভয়ংকর কম।

নকল ডাকাতি

মঙ্গলবার দুপুরে বহুবাজার এলাকায় এক নামকরা গহনার দোকানে সশস্ত্র ডাকাত পড়ার খবর রাইটার্স বিল্ডিং ও লালবাজারে উদ্‌বেগ জাগায়। খবর আসে দুর্বৃত্তরা গয়নাগাটি লুট করে বোমা ফাটিয়ে জিপে করে উধাও হয়েছে। ...তদন্ত করে জানা যায় পাঁচটি পটকা ফেটেছে ঠিকই তবে তা ফাটানো হয়েছে একটি বাংলা ছায়াছবির শুটিং-এর অঙ্গ হিসেবে। স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী পি কে সেন-কে পুলিশ কমিশনার জানান ব্যাপারটা নকল ডাকাতি।

প্রতিক্রিয়া : শূন্য

সিবা গ্লাস কারখানা কর্মীদের ধর্মঘট

বরাহনগরের সিবা গ্লাস কারখানার প্রায় পাঁচশ শ্রমিক বুধবার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য

লাগাতার ধর্মঘট শুরু করেছেন। শ্রমিকদের দাবি : বেতনহার সংশোধন, ওভার টাইম দ্বিগুণ বাড়ানো এবং আইন অনুযায়ী কারখানা চালানো।

প্রতিক্রিয়া : শূন্য

পণপ্রথার শিকার

মালতী ঘোষালের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এখন শহর তোলপাড়। গত শনিবার মালতীকে বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে মৃত পাওয়া যায়। সম্ভবত শ্বাসরোধই মালতীর মৃত্যুর কারণ। মালতীর স্বামী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মালতীর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কারণ বর্বর পণপ্রথা বলে প: বঙ্গ মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

প্রতিক্রিয়া : শূন্য

বাসে বোমা-সহ যুবক গ্রেফতার

প্রতিক্রিয়া : সন্দেহ। যাত্রীরা পরস্পরকে সন্দেহ করছে। ব্যাগ মাত্র-ই বিস্ফোরকের প্রতীক।

ভোটারের ছবি

জাল ভোট বন্ধ করার জন্য ভবিষ্যতে প: বঙ্গে নির্বাচন বাইরের লোক দিয়ে করানো হবে। ভোটদাতাদের ছবিও তোলা হবে।

প্রতিক্রিয়া : শূন্য

'গো স্লো' হলে ফরাক্কা ফৌজের হাতে যাবে

কেন্দ্রীয় সরকার ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষকে সম্প্রতি এক জরুরি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, এই প্রকল্পের শ্রমিক কর্মীরা যদি 'গো স্লো' পদ্ধতি গ্রহণের পথে আবার পা বাড়ান তাহলে প্রকল্পের কাজ সামরিকবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

প্রতিক্রিয়া : শূন্য

কলকাতায় টেলিভিশন

প্রতিক্রিয়া : হুররে।

কলকাতার আকাশে ধূমকেতু

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর প্রতিক্রিয়া : কলকাতার আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। ভোরের আকাশে, সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং বৈশিষ্ট্যে অভিনব জ্যোতির্লোকের একক বস্তু ধূমকেতুকে বেশ সহজেই প্রত্যক্ষ করলাম। নির্মেঘ কলকাতার আকাশে যে ধূমকেতুটিকে আমরা লক্ষ করছি ভূপৃষ্ঠে সেটির অবস্থান প্রায় ৩০ ডিগ্রি উপরে। মহাকাশে ধূমকেতুর সংখ্যা কম নয় কিন্তু খালি চোখে ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করা জ্যোতির্বিজ্ঞানে সৌভাগ্যের কথা। সাধারণভাবে এক এক দশকে মাত্র একটিই সেরকম ধূমকেতু আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি...

শহরের ভাস্কর্য : রামকিঙ্কর সাক্ষাৎকার

ধর্ম একটি মালায় গেঁথে রেখেছিল : স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। দুস্তর দীর্ঘ বছর, বছরের পর বছর পেরিয়ে তাদের বিরহ, বিচ্ছেদ ও দ্বীপান্তর হল। স্থাপত্য জড়িয়ে ধরল কিছু আকাশছোঁয়া মকান, চিত্রকলা চলে গেল কাঁচা টাকার মালিকের দেওয়ালে, ফাঁসির হুকুমে। আর, এর মধ্যে ভাস্কর্য হয়ে গেল স্ট্রিট-বয়। চওড়া ও সরু রাস্তায়, পার্ক এবং অ্যাভেনিউতে কিছু একটা চিন্তায়, বিস্ময়ে, শোকে, বিস্ফোরক পাথর হয়ে গেল ভাস্কর্য। শহরের ম্যানসন বাড়িরই মুখ চেনা প্রতিবেশির একাকিত্ব সে, আবার শহর তাকে ঘিরেই...

'পাথর, সুরকি, সিমেন্ট বালি দিয়েই বেশিরভাগ কাজ করেছি, তবে দু-চারখানা যে ধাতু দিয়ে গড়িনি তা নয়, দ্যাখো মত অনেক বদলাতে পারে কিন্তু মূর্তি হুটহাট বদলে যায় না, আর এটা হুজুগের ব্যাপার নয়। ভাবতে হয়, ধ্যান করতে হয়, আমার জীবনে, মানে পুরো জীবনটা মাটির পুতুল গড়ে কেটে যেতে পারত, যেতও, সে তো শুধু গুরুদেবের জন্যেই উনি ভালোবাসলেন বলেই হল। তাও কী আর হল বল, যাকগে, তবে আমার ব্যাপারটা খানিকটা গাছের মতো গুরুদেব আমার শেকড় ওপড়াতে চাননি, উনি সে মানুষই নয়, কিন্তু দেখেছি অনেক, তোমরা কলকাতায় আনলে আমাকে, ধরো একটা দ্বীপেই এলাম। হাসছ তো, আরে আমার কাছে কলকাতা নেই, জান তো হাঁড়িয়া-দিশি-ধেনো, সাঁওতাল-শাল আর লালমাটি আর আকাশ, তুমি জান সাঁওতালরা হিঁদুদের মতো প্রকৃতিকে দেবতা ভাবে না, তাদের কাছে জঙ্গল জঙ্গলই...'

'কলকাতা কেমন লাগছে অনেকদিন বাদে এলেন, সেই একবার এসেছিলেন যুব উৎসবের ফিতে কাটতে আর ওইই...'

'দ্যাখো শ্যামল তোমাদের গাড়িতে করে ঘোরাচ্ছ তাই নাহলে এই যে মোড়ে-মোড়ে ট্রাম-ট্যাক্সি-বাস জমাট, ঠাসা এখানে কোথাও আমি স্পেস দেখতে পাচ্ছি না, একটা শহর আমি স্বপ্নে দেখি, সেখানকার রাস্তাগুলো চওড়া, পেভমেন্টে ছাতা, গাছও থাকতে পারে ছাতার তলায়, গাছের নীচে মানুষের ঢিলে আড্ডা আবার যারা হাঁটছে তাদেরও কষ্টটা নেই বেশ দিব্যি হাঁটতে পারছে। এই রাস্তাগুলো সব শুরু ও শেষ হচ্ছে কোনো না কোনো মূর্তির কাছে। আর মূর্তি মানেই রথী মহারথী নয়, তুমি একটা জিরাফও বানাতে পারো, জিরাফের লম্বা গলাটাকে যদি বাড়িয়ে দেও তাহলে দারুণ মজা হতে পারে...তবে তোমাদের শহরে বাপু পাথর চলবে না, কংক্রিটও নয়, এখানকার জলবায়ুতে কংক্রিট চটপট ফেটে যাবে, কালো হয়ে আসবে, এই যে বাতিল ইঞ্জিন-মডগার্ড, বনেট এই সব আর স্পেয়ার স্পার্টস জুড়ে মূর্তি বানালে একটা সত্যি বেরিয়ে আসবে...

'আপনি এ কাজে হাত দিলে...'

'তোমাদের মাথার গোলমাল আছে, এটা কোনো স্ট্রিট-বয় বানাবে, এই ধর একটা ভিখিরির ছেলে, বস্তির ছেলে...'

'বস্তির ছেলে কেন?'

'আরে কলকাতার কাছে ও প্রার্থী আবার শহরটা ওকে গুনতির ভেতর ধরে না, তবু শহর বলে গাড়ি-বারান্দা কিংবা সাহেবের মূর্তির তলায় ও শুয়েছে। খুঁজছে। খুঁজতে-খুঁজতে তোমাদের

এই শহরের ভূগোল ওর মুখস্থ, দেখতে-দেখতে ওর চোখ এমন তৈরি হয়ে যায় চামড়া দেখে লোক চিনতে পারে, তারপর যে ছিল প্রার্থী, সে এক সময় আক্রমণকারী হয়ে যায়, শহরের নিয়ম কানুন জেনে ফেলে, এখানেও কোথায় স্পেস আছে সে তো তোমাদের থেকে ও-ই বেশি জানে, বিশাল মূর্তি গড়লে কোথায় বানাতে হবে, কোথায় একটু মাঠ আর খোলা আকাশ আছে সেটা ও জানে না তুমি জানো?

'ভাস্কর্যের নিয়ম কানুন জানা চাই তো?'

'তুমি একটা গাধা, মাফ কোরো ভাই, এই আমি বড্ড ছোটোলোক...'

'রামকিঙ্করদা আপনি আমাকে গাধা বললে আমি সম্মানিত বোধ করি...'

'বোঝো ঠ্যালা, গলে যাই আর কী, আরে শালা গাধা বললেও রাগবি না...'

আপনি বলছিলেন...

'হ্যাঁ ইয়ে...কলকাতা, কলকাতায় কী মূর্তি গড়লে ভাই না নেতাজি, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, নাহ্ রামকৃষ্ণের কোনো মূর্তি নেই কলকাতায় তাই না?'

না, রামকৃষ্ণ নেই।

'রামকৃষ্ণের ভঙ্গিটা, মানে ওঁর তো একটাই ছবি সস্তার ক্যালেন্ডারে ছাপা হয়, সেটা কিন্তু বেশ, তবে শহরে বোধহয় মানায় না। বেশি উদাসী, তুমি জানো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্যে মানে দিল্লির অর্ডার পেয়ে আমি যক্ষ-যক্ষিণী গড়েছি?'

হ্যাঁ আমি সেই বিশাল মূর্তি দেখেছি।

'বিশাল কি হে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তো প্রকাণ্ড দৈত্য, তার কাছে আমার গড়া মূর্তি ছোটো পুতুল, তবে পুতুলই, পুতুলই তো গড়ি, লাগে বেশ। মজা লাগে না রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্যে যক্ষিণী হাঃ হাঃ হাঃ; তাও আবার দিল্লির মতো শহরে। অবশ্য কলকাতার লোক ভারতবর্ষে আর কোনো শহরই দেখতে পায় না—সেদিক থেকে গাঁইয়া মানুষের কাছে তবু কলকাতা মিথ আছে—তোমাদের এর পরই ভাবতে হয় প্যারিস...'

কলকাতায় ভাস্কর্য নিয়ে কথা হচ্ছিল ইয়ে...

'কলকাতায় ভাস্কর্য নিয়ে কথা হতে পারে না, ভাস্কর্য দেখতে চোখ লাগে, ধৈর্য লাগে, অনেকটা সময় দাবি করে ভাস্কর্য। সামনে-পেছনে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়, দেখতে হয় কাছ থেকে দূর থেকে। এভাবে শহরের বেকার যুবক বা মুলকি ঠেলাওয়ালা গ্রীষ্মের দুপুর কাটাতে দেখতে পারে, তার আবার...লোকের চোখে পড়ে পাথর, শুধু পাথর, আর পাথরে পার্সোন্যালিটি দিতে হবে, কীরকম বুঝছ, ভিড়ের শহর, গতির শহরে এটা চ্যালেঞ্জ, এরকম কাজের পেছনে যদি ফড়ে থাকে তো দফা গয়া। মূর্তি গড়ার পেছনের ইতিহাস কী কদর্য তোমার তো জানা আছে : মন্ত্রিসভা, টেন্ডার, মাতব্বরি। দশফুট মূর্তি চাই, বরাদ্দ দেড় লাখ টাকা, সেই টাকাটাও একবারে না পেতে পারো, পাবে কিস্তিতে-কিস্তিতে, আবার ভাস্করকে টাকা দেওয়া হল যে মন্ত্রিসভার আমলে তারা ওটা বুকে লেবেল এঁটে ঝুলিয়ে দেবে, পরবর্তী মন্ত্রিসভা যে এ নিয়ে তদন্ত কমিশন বসাবে না গ্যারান্টি কী? এর থেকে জমিদারি ভালো ছিল...আরে শালা আমি

রামকিঙ্কর স্কাইস্ক্যাপারকে ধুলো করে দিতে পারি, বি-শা-ল মূর্তি বানাব...কত বড়ো পৃথিবী! মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে, পূর্ণিমা আছে, গাছ আছে, পাহাড় আছে, প্রান্তর আছে—এসব কোথায়? আমি তো মূর্তি গড়ি এই পৃথিবীতে কোনো শহর কিংবা গ্রামে নয়, আমার ফ্রিডম আছে ওই যেমনি চাঁদ আছে সূর্য আছে প্রান্তর আছে, সমুদ্র...মানুষ। বিয়ে থা করিনি, পৃথিবীতে বিয়ে থা নেই, শহর-গ্রামে আছে, এখানেই আমার শিল্প, সেটা তো এই কালো বেঁটে মানুষটারই অন্তরাত্মা...না কি বলো...এরকম সকলের আছে, যে মূর্তি দেখবে, দেখবে আমার মতোই গড়ার চোখে, সে আর আমি একই মানুষ।'

কয়েক বছর আগে আইজেনস্টাইনের ফিল্ম অক্টোবর-এর আদলে কলকাতার সাহেবসুবো মূর্তির গলায় দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। একেবারে সঠিক, কাঁটায় কাঁটায় হিসেব করলে সেটা ১৯৭০ সাল। ওই সময়ে একটা টালমাটাল স্রোত ছিল, জোয়ার, শহরের অলি-গলি বড়ো রাস্তায় সশব্দ ধোঁয়া এবং আগুন। মূর্তি উপড়ে নেওয়া হলে শহর ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের বাইরে পা দেবে, সরকার-প্রশাসন ও চিন্তাশীল নাগরিকগণ এরকম ভেবে থাকতে পারেন। ওদিকে সশব্দ ধোঁয়া ও আগুনের যে কাহিনি তা ছিল বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুর, গান্ধি এসবের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ। এই পোড়া শহরে ছন্নছাড়া যুবকের দল মনীষীদের তাৎপর্য, প্রাসঙ্গিকতা, এইসব জানতে চেয়েছিল উষ্ণ রক্তের মূল্যে, এরকম ধরে নেওয়া যায়। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে শহরে হিমবাহ নেমে এল, সমস্ত বোমা ও বিস্ফোরক তাতে ভিজে যায়। আর ওই অবসরে ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করতে দেশপ্রেম, জাতীয়তা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের চার-পাঁচটি মূর্তি গড়া হল : নেতাজি, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম। বা ওইসব মূর্তি এমনভাবে বসানো হল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে যে শহরে একলা মানুষের দু-মাইল যাত্রায়ও এরকম কোনো না কোনো মূর্তিকে দেখে নিতে হবেই। কলকাতার প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করের প্রবন্ধের একটি ছোটো প্যারা এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা জরুরি :

'নগরের কেন্দ্রস্থলে কোনও দেশনায়ক বা বিখ্যাত ব্যক্তির মূর্তি স্থাপনায় ব্যক্তিগত চেহারার হুবহু অনুরূপ সৃষ্টিতে সীমিত হলে এইসব ভাস্কর্য প্রাণহীন, ব্যক্তিত্বহীন...নিপুণ ভাস্কর প্রখ্যাত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি রচনায় গঠনের বৈচিত্র্যে ও কৌশলে তার মুখ্য আদর্শটুকু বজায় রেখে এক বিরাট পুরুষের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করে থাকেন...।'

উনিশ শতক এক বিরাট পুরুষ। নারী নয়! প্রায় সমস্ত মূর্তিই উনিশ শতকের বা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিশ শতকের তিনটি দশক পর্যন্ত ছড়ানো দেশপ্রেমের : গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ... নেতাজি, ক্ষুদিরাম, গিরিশ ঘোষ, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখার্জি, সুরেন ব্যানার্জি...

দু-দিন শ্যামলের নাওয়াখাওয়ার ঠিক নেই, রামকিঙ্কর মদ খেতে পারেন আকণ্ঠ, কিন্তু আসলে মদ না খেলেও মাতাল হয়েই আছেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের কলকাতায় এই বয়সে যা ছুটছেন সেটা ঈর্ষণীয়। ভাস্কর্য অনেকটা কুলিমজুরের কাজ, হাতে কড়া পড়ল না, পেশি শক্ত হল না, মুখের চামড়া পুড়ে বাদামি হল না তো কীসের ভাস্কর। শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট সর্বত্রই ভিড় দানা বেঁধে গেল :

দাদা ওনার নাম কী।

আর্টিস্ট ?

ফিল্মস্টার?

খেলোয়াড়?

নাহ্ উনি প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর, পাথরে কংক্রিটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, কলকাতায় দুদিনের জন্যে এসেছেন, থাকেন শান্তিনিকেতনে...

শ্যামল গলগল করে আরও অনেক তথ্য, রামকিঙ্কর মহিমা, সেই ভিড়ের উদ্দেশে বলে যাচ্ছিল; ভিড় ক্রমশ অনাগ্রহী, তারা 'অ', 'আচ্ছা', 'হুঁ' এইসব ধ্বনিতে ভিড় ভেঙে ফেলল। তবু দু-চারজন যারা থেকে যায় ভাস্কর্য সম্পর্কে তাদের যে বিশেষ কিছু আকর্ষণ ছিল এমন নয়। তবে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, অ্যামবাসাডার এসব যে লোকের সঙ্গে ঘুরছে তিনি যে একজন মহৎ ব্যক্তি তাতে তাদের কোনো সংশয় নেই।

রবীন্দ্রসদনে শীত-সন্ধ্যা সব সময় উৎসব, গ্রীষ্মে বর্ষায় উৎসব স্রোত কম, তবে ঠা-ঠা দুপুরে শহরের এই এলাকাটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথার ওপর বসানো কালো পরিটির দখলে, বাঁয়ে অসুস্থ, জীর্ণ শহরে শুয়ে আছে পি জি-তে, রবীন্দ্রসদনে ঢোকার মুখে রামকিঙ্করের পাজামা ও চটি একবার জড়িয়ে গিয়েছিল সেই অবকাশে কালো মানুষটি চশমার ফাঁক দিয়ে পি জি হাসপাতাল দেখলেন, তারপরই সোজা রবীন্দ্রনাথের মূর্তির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সে মাত্র কয়েক সেকেন্ড, পিছিয়ে গেলেন দু-চার পা, কোণ থেকে দেখলেন, কাঁচা-পাকা ঘন চুল ঘেঁটে নিলেন আর এই প্রক্রিয়ায় তাঁর ভুরু কুঁচকে চোখ একটু ঘন, তীব্র এবং ছোটো হয়ে এল। হঠাৎ বেশ স্তব্ধতার পর রামকিঙ্করের গলা শোনা গেল :

'ভল্যুম বাড়িয়েছে যদ্দূর পারে...কেন সমস্ত স্পেস কি গুরুদেবের জোব্বার ভেতর ঢোকাতে চায়? কী রে বাবা!'

'জোব্বাটা দ্যাখো, একেবারে কম্বল, শীতকালে কাজটা করা হয়েছিল? কম্বল...হাঃ হাঃ হাঃ'

কলকাতা সম্পর্কে আমাদের গর্ব রবীন্দ্রনাথের শহর...

'বেশ বলেছ রবীন্দ্রনাথের শহর...'

এরকম শহরে, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি কীরকম হওয়া উচিত?

'হুঁ... সে আলাদা করতে হবে।'

কীরকম?

'আ-লা-দা? হুঁ, একেবারে আলাদা। এই কি হাইট? মূর্তি অনুযায়ী হাইট কম, ভল্যুম দ্যাখো ওদিকে, আর দাড়ি, দাড়ি দেখলেই বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে, আমি করেছিলাম। আর মাথাটা?'

বড়ো হয়েছে?

'আলবাত, ওই চুল, চুলের ট্রিটমেন্টও ঠিক হয়নি। চুলের ওপর গুরুদেবের একটা অদ্ভুত মায়া ছিল। একচুল-এদিক ওদিক হবার জো নেই। হ্যাঁ ঠিক। বেঁটে হয়েছে

মূর্তিটা। ভিজুয়ালি যা দেখছি, উইদাউট মেজারমেন্ট ক-মাত্রা হচ্ছে? ৬ মাত্রা, আমাদের নিয়ম মতন হয়নি। আরও ফুট দুয়েকের মতো লম্বা হবে। অবশ্য হাইট বাড়িয়ে দিলেই যে ভালো হত তা নয়। ট্রিটমেন্টের ওপর নির্ভর করছে।'

ভাস্করের নিজের মন বকে চলার মধ্যে হঠাৎ-ই শ্যামল তার নাকটি গলিয়ে দেয়। আচ্ছা গান্ধীজির মূর্তি দেখে আপনি বললেন স্মার্ট লোকটাকে পাচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তেমনি কী পাচ্ছেন না?

'পার্সনালিটি, সেইটেই আগে, তার ওপর কিছু নেই।'

নাক?

'দাঁড়াও প্রোফাইলটা দেখি। না হয়নি। ইকুইলিয়ান নাক। ভাঁজটাও নেই। ডান হাতের কাপড়ের ফোল্ডগুলো হয়নি। ভুঁড়িটা বেশি হয়ে গেছে। ভুঁড়ি ছিল, সামান্য। তবে আরও ভিতরে হবে।'

হাতটা দেখেছেন?

'হাত। হ্যাঁ। আজানুলম্বিত বাহু। কোথায়? সোজা করলে হাঁটু পেরিয়ে যাবে। হয়নি, ভুল হয়েছে।'

কালো রঙে সাদা পোশাক, আর দারুণ জ্যৈষ্ঠ। শিল্পীর কোঁকড়া চুল আর বাউলে ভঙ্গি, ঘামছিলেন... শ্যামল এরকম বাক্যবন্ধে রামকিঙ্করকে ধরতে চেয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস, রামকিঙ্করের জন্মমাস, এই ঋতু তার শরীর-মন জুড়ে খ্যাপা হয়ে থাকে, অনেক বড়ো কাজ এই ঋতুতেই গড়া। প্রায় নব্বইভাগ বাঙালির প্রিয় ঋতু শীত, শ্যামলের বর্ণনায় যেন এরকম একটা আবিষ্কারও ছিল যে এই উন্মাদ ভাস্করের নাড়ির যোগ গ্রীষ্মের সঙ্গে। এই ব্যক্তির কাজে, খুব চলতি অর্থে যেটাকে রাবীন্দ্রিকতা বলা হয়, সেসবের প্রভাব কম। যদিও তিনি সকল বাঙালির সকল গর্ব ও অনুভব, সমস্ত কিছুর আশ্রয়দাতা, ত্রাতা রবীন্দ্রনাথের ঈর্ষণীয় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

সত্তর বছরের যুবক রামকিঙ্কর কলকাতা চষে ফেলেছেন, রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্রভারতী, শ্যামবাজার, পার্ক স্ট্রিট, রেড রোড, গোল পার্ক, হেদুয়া। আর হাসছেন, হাসছেন ভেতরে, জলপ্রপাত, তারই খানিকটা ঘূর্ণি, সাদা ফেনা ও জল শব্দে, গ্রীষ্ম তার ভেতরে বিশ্রামরত।

শিল্পীর ইতিহাস-চেতনা এতদূর মুক্ত যে তা জাতির দাসত্বের বাইরে, ঝুটা দেশপ্রেমের জিগির তাঁর কাছে জরুরি নয়। যেজন্য তাপস দত্তের গড়া ক্ষুদিরামের মূর্তি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগলেও বলে ফেলতে পারেন ('ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ডিফাইং ডেথ') ক্ষুদিরাম মানে বোমা, উনি গড়লে হাতে শিকল পরানো থাকত না, হাতে বোমা থাকত। আবার তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব সাহেবসুবোর মূর্তি সরানো শিল্পবোধের পরিচায়ক নয়। যেটা শিল্প সেটা থেকে যাবে। সিংহ কি শুধু ব্রিটিশের? থাক না...সবই থাক... মূর্তি সম্পর্কে যেটা ভাবার...এই যে পুরো উনিশ শতককে মানে রেঁনেশা আর দেশপ্রেমকে মোট ২১টি মূর্তিতে শহরে বসানো হল তার মধ্যে প্রাণের বড়ো অভাব। এখন 'পাথরে যদি প্রাণ না থাকল তাহলে তো শুধুই পাথর! তাহলে কি এই কলকাতায় আমরা খান কুড়ি পাথরের চাঁই পেলাম?

কেন? প্রত্যেক যুগ দেখার, ভাবার একটা চোখ দেয় সেই চোখটাই নেই। যদি কারও নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ না থাকে, যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেম ও সংঘর্ষ আছে, তাহলে কী করে সে রবীন্দ্রনাথ গড়বে? সেক্ষেত্রে, বারবার শুধু ভল্যুম বেড়ে যাবে, হাত ছোটো হয়ে আসবে, দাড়ি বেড়ে যাবে বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত...এই এক আশ্চর্য ব্যক্তির বিশিষ্টতাটুকু বেদ-ঐতিহ্যে গুলে নেওয়া। মহাকাব্যের সেই যুগ, উন্মত্ত আবেগ ক্রোধ, শুদ্ধতা, বালক দর্শনের ওপর দিয়ে স্টিম ইঞ্জিন চলে গিয়েছে দীর্ঘকাল আগে।

দুর্ঘটনা

ঝকঝকে একটি টয়োটা গাড়ি রাস্তার মাঝ বরাবর দাঁড় করানো, সম্পূর্ণ ফাঁকা সেই গাড়ির পেট থেকে এইমাত্র লাফ দিয়ে একজন নেমেছে। গাড়ির মালিক সে নয়, তবে এই গাড়িটি সে বেশ কয়েক বছর চালাচ্ছে বোঝা যায়। দেখতে দেখতে মানুষের স্রোত একটি বৃত্ত রচনা করে ফেলল, সেই বৃত্তের অধিকৃত জায়গার মধ্যেই কোথাও একপাটি চটি, রক্তের ছিটে এসব ছিল। রঞ্জন ওই কৌতূহলী জনতার মেজাজে নিজেকে ছেড়ে দিল, তার তখন কোথাও যাওয়ার ছিল না। মাস শেষের শূন্য পকেট, সে বেশ শুকনো হয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে সে অনেকের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলছে : কী দেখবেন দাদা! দুজন কনস্টেবল ও একজন এস আই তখন বাহারি গাড়িটির তলা থেকে রক্তে চোব্যানো একটি মাংসপিণ্ড বের করে আনছে, বুক এবং ফাটা প্যান্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা পা দেখে অনুমান এই রক্ত ও মাংসপিণ্ডের অধিকারী ছিলেন এক যুবক। রঞ্জনের কেন যেন হঠাৎ মনে হল ওই যুবক পূর্ণ, সে পূর্ণকে চিনত, গোয়ারতুমির জন্য চাকরি গিয়েছিল পূর্ণর।

> 'হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল মশাই, একদম টের পাইনি, গরিব মানুষ হলে বুঝতে পারি ইনকামের ধান্দা..., ভদ্রলোকের ছেলে; কী করে বুঝব? বলুন আমার কী দোষ? কত রকমভাবে তো আত্মহত্যা করা যায়! এ কী বলুন দেখি!'

রঞ্জন জানে পূর্ণর ন-মাসের একটি বাচ্চা আছে, বউ চাকরিবাকরি করে না, একবছর স্রেফ ধারের ওপর চলছিল। পূর্ণর ঈর্ষণীয় বইয়ের সংগ্রহ এখনও কলেজ স্ট্রিট রেলিঙে মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে, তাকে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁচজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতোই তবুও রঞ্জনের রাগ হল। ওই রক্তের ডেলাটি ঘিরে বীভৎস রাগ। শুনতে পেল সে পূর্ণকে বলছে 'শুয়োরের বাচ্চা!' রঞ্জন কি এখন এই রক্তের ডেলাটি নিয়ে নীরার কাছে যাবে?

আহ্!

ভগবান!

কী ভয়ানক!

শেষ!

শেষ হয়ে গেছে?

মদ খেয়েছিল?

আত্মহত্যা?

ভিড়ের মানুষ রক্তের ডেলা, টয়োটা গাড়ি সব যেন একটি পথ নাটিকার অংশ। ড্রাইভার তেমন ভড়কে যায়নি কিছু, যা থেকে মনে হয় এরকমভাবে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া তার জীবনে প্রথম নয়। এস আই যেভাবে নোট নিচ্ছিল, লাইসেন্স দেখল, মৃত ব্যক্তির হিপ পকেটে হাত দিল তাতে ওই এস আই তরুণ হলেও এরকম দু-তিনটে কেস ইতিমধ্যে সামলেছে মনে হয়। শুধু রঞ্জন, একমাত্র রঞ্জন ব্যতিক্রম, তার অপরাধ সে মৃত ব্যক্তিকে চেনে, পূর্ণর মৃত্যু অতিক্রম করেও বেঁচে আছে সেই চেনা-টা। নীরা। আমি তোমার কাছে যেতে পারব না। এরকম গুঞ্জন ছিল তার বুকে আর ততক্ষণে অপরিচিত ব্যক্তির লাশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে। এসপ্লানেডে জ্যাম কমাতে ট্রাফিক পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল।

পূর্ণটা একটা ইডিয়ট।

শালা ন-মাসের একটা মেয়ে আছে।

শ্যামল সেন জীবিকার কারণে শহরে রামকিঙ্করের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর পর সঞ্চয়িতার পচা কেচ্ছা, পুঁজির রক্ত, থুতু ও লালায় কিছু অনুসন্ধান চালাতে বাধ্য হয়েছিল। রঞ্জন শ্যামলের কাছেই পরে পূর্ণর বিবরণ পেল।

শহরের পুবে আবাসন দফতরের ফ্ল্যাটে এক যুবক নিঃশব্দে পায়চারি করছিল। ফ্ল্যাটটির গায়ে একটি সেতু আছে, যুবক সেতুটির দিকে ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। দরজা নাড়ার সামান্য শব্দ যুবকের বুকে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, বাড়িতে স্ত্রী-কন্যা নেই। সকালে এই ফ্ল্যাটটিতে আগুন লেগেছিল, যুবক পূর্ণ স্ত্রী-কন্যাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে খিল তুলে দিয়েছে। দেওয়ালের ইট থেকে বেরিয়ে আসছিল তাপ, বিদ্যুতের লাইন, জলের লাইন সমস্তই কেটে দেওয়া হয়েছে। আজ সে একবারও বাইরে বেরোয়নি, জল তার গলা ভেজায়নি। তার মুখ থেকে এক পরত ছাল তুলে নেওয়া হয়েছে যেন, সে কাগজ হয়ে গিয়েছে।

পূর্ণ কাবলিওয়ালা থেকে শুরু করে কার কাছে যে ধার করেনি! শহরের সমস্ত মানুষ, বাড়ি, দোকান এবং অফিস যেন তার কাছে টাকা পায়। যা হাল দেখলাম তাতে বাঁচা মুশকিল, চুরি ডাকাতি করা ছাড়া উপায় নেই, বাঁচতে হলে ওকে খুন পর্যন্ত করতে হবে। সঞ্চয়িতায় শুনেছি ইয়ারলি ফোরটি এইট পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দেয়, পূর্ণ কিছু লোভী লোকের কাছে সঞ্চয়িতার এজেন্ট হিসাবে অ্যাপিয়ার করেছিল, ওই রেটে ইন্টারেস্টও দিয়ে যাচ্ছিল, সঞ্চয়িতা নিয়ে কাগজে হইচই হতেই ফেঁসে গিয়েছে, বাজারে ওর ঋণ এখন চৌত্রিশ হাজার নগদ টাকা তা ছাড়া...।

তা ছাড়া! তা ছাড়া কী?

ও ফিল্ম করার কথা ভাবছিল...

ফিল্ম!

আর্ট ফিল্ম...

পূর্ণ কিছু যোগাযোগ করেছিল, সমরেশের বিজন-বিভূঁই নামাবে ঠিক করে, একটু পলিটিক্যাল করে নেবে আর তা ছাড়া কাহিনিতে সেক্সের একটা বাড়তি ব্যাপার আছে, ভায়োলেন্স, আছে, পূর্ণ নিশ্চিত ছিল, বার্লিনে সোনার হরিণ...

ভল্লুক।

সে যাই হোক সম্মান ফিরে পাওয়ার এই রাস্তাটি সঞ্চয়িতার সাম্প্রতিক কেচ্ছায় একেবারে নো এনট্রি হয়ে গেল। না হলে, নীরা তিতি ও পূর্ণর ফ্যামিলি একদিন... একদিন তারা শোকের গুহা থেকে বেরিয়ে আসত, পূর্ণর মুখে হাসি থাকত। সাফল্য হাসি ঝলমল করে উঠত, পূর্ণ এই শহরে একটি অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছিল। শহর রূপকথা হয়ে যেত পূর্ণর কাছে। রঞ্জন পূর্ণ সম্পর্কে তীব্র আকর্ষণ বোধ করল, নাটকীয়, দ্রুত পট পরিবর্তন সে একটি মারকাটারি স্ক্রিপ্টের সম্ভাবনা সর্বর পরে পূর্ণর মধ্যেই দেখতে পেল। যেমন সে আজকাল সশস্ত্র ডাকাতের ফ্ল্যাট আক্রমণের মধ্যে ডস্টয়ভস্কি-কে দেখে। হায় ডস্টয়ভস্কি আপনার অমর পাণ্ডুলিপিটি আমাকে অস্তিত্বহীন করে দিল।

সর্ব, রঞ্জন, পূর্ণ ও অজয়রা

একটি ঔপনিবেশিক শহরের পুরোনো গলিঘুঁজি, ধোঁয়া ও ধুলোয় তাদের রাত ও দিন অতিবাহিত। পশ্চাৎপট কারও স্পষ্ট নয়, তবে পারিবারিক ইতিহাসে গড়পড়তা মধ্যবিত্ততা ছাড়া আর কিছু নেই। জীবিকা বিষয়ে কথাবার্তায় তারা ফুরিয়ে আসে আর ঘুরে ফিরেই এসে পড়ে জীবিকার কথায়। বা, বড়োজোর এই শহরে যখন যা জমজমাট তখন তাই তাদের কথা বলার বিষয়। বইটই, ফিল্ম, নাটক, উপন্যাস, ফুটবল, ক্রিকেট, রাজনীতি, বন্যা থেকে সাইক্লোন কোনোটিই অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছু স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে না।

মহিলা নারী মেয়েছেলে যেভাবেই হোক বিপরীত লিঙ্গ সম্পকে যা কথাবার্তা হয় তার পরেও এমন দুর্বল মুহূর্ত থাকে যখন তারা মা কিংবা প্রেমিকার জন্য তৃষ্ণাবোধ করে। সর্বর বীরত্বহীন গ্রেফতারের পর রাষ্ট্রপতি, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্রের একটি জমাট প্রহসন শুরু করা যেত। রঞ্জন সে-রাস্তা মাড়াল না, সে যেন বা চাইছিল তার বাক্যগুলি সশস্ত্র হোক, লেখাটি থেকে ঝরে যাক সমস্ত প্যানপ্যানানি।

পূর্ণ, সর্ব, অজয় ও শ্যামল রঞ্জনের কাছে আলাদা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। রাজু এবং মিনতি নামের নার্সটিকে রঞ্জন চিনত। জলাভূমির এক শহরে রাজু ও মিনতির জন্ম, তাদের আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্য পূর্ণদের মিছিলে একটি সমাবেশের ব্যাপকতা ছাড়া যেন আর কিছুই নয়। রঞ্জনের জন্ম ১৯৪১ সালের ৪ মার্চ, ৬৩ সালে স্নাতক, ৬৪ সালে স্কুল শিক্ষক। ৬৫ সালের মধ্যে দু-চারটি গল্প লিখে ফেলে, তারপর মাঝে-মাঝে দু-তিন বছরের ছেদ বাদ দিলে বছরে অন্তত একটি করে গল্প সে প্রসব করেছে। একসময় লিখে শুধু আনন্দ পেত, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁচার সমস্ত অনুভূতি। তিনবার, তিনটি পর্যায়ে তার সঙ্গে নারীর নিবিড় সম্পর্ক হয়েছে। এর মধ্যে একজন বেশ্যা, রঞ্জন তাকেও মনে রেখেছে। তৃতীয় সম্পর্কটি তার আস্তানায় প্রেমের বহ্নি জ্বেলে দিলে রঞ্জন তালতলার ঘরটি থেকে তিন মাসের জন্য হাওয়া

হয়ে যায়। তিন মাস ওই ঘরে তালা ঝুলেছিল, পরে তালা খুলতে এলে সে মিতার ১১টি চিঠি পায়। একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ১১টি চিঠি খেয়ে ফেলল।

মনোজগৎ নামে ঘোলাটে, তীব্র, জটিল ও ভয়ংকর যে জগৎটি আছে এই পাণ্ডুলিপি সযত্নে তার প্ররোচনা এড়িয়ে যাবে এই ছিল রঞ্জনের চিন্তা। ঘুম, আহার, অফিস কাছারির অভ্যাসের বর্ণনা, ভালোবাসাবাসি, শরীর সোহাগের বর্ণনা— বা কোনোরকম বর্ণনার মরুতে যাত্রা করবে না এও ছিল নির্ধারিত।

মুক্তমনা নারীর খোঁজে

তাদের চোখ ঘুরেছে এ-মুখ সে-মুখে, ট্রাম ও বাসের জানালায়, ফ্রেমে কলেজ ক্যাম্পাস ও রবীন্দ্রসদনের রাজকীয় সিঁড়ির পাশে। জড়তাহীন সাহসী একটি মেয়েকে তারা খুঁজছিল— এরকম বিশ্বাস করতে শুরু করে। অজয়, পার্থ, দেব, পূর্ণ, রঞ্জন এবং সর্ব। ছাত্রাবস্থায় এস এফ ও পরে কোঅর্ডিনেশন কমিটি বা ওয়েবকুটার মধ্যে ঝান্ডার লাল শোণিত প্রবাহিত করে প্রতিমাসের ঋতুস্রাবের মতোই অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাপনের একটি সমান্তরাল রেখা ধরে চলা পছন্দ ছিল না। অন্যতর কিছু ভাবা গিয়েছিল কি? অন্যতর কোনো জীবন? অন্য কিছু? তাদের মধ্যে একমাত্র সর্বর মাথায় উষ্ণীষ ছিল, আকস্মিক ঘটনার উষ্ণীষ: রুচি।

তবু সমস্যা ছিল, রুচি গতি ভালোবাসত। সর্বর প্রতি তার বিদ্যুৎ-টান এবং এই ভালবাসার প্রান্ত আছে, প্রান্তে সর্ব প্রান্তে রুচি, আবার তারা এ-ওর কেন্দ্র-ও বটে। সর্বকে ঘিরে চক্র দেওয়া, সর্বর দিক থেকে রুচিকে ঘিরে চক্র। বেশ ধরা যাক তুমি কোনো মুক্তমনা মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলে, তারপর? তুমি ঠিক কী পেতে চাইছ 'মুক্ত' শব্দে?

তারপর-তারপর, এই হল কাহিনির ধাপ। তারপর কী, তারপর কী না জানা থাকলে, না সৃষ্টি করতে পারলে কাহিনি বদ্ধ জলায় আটকে পড়ে, তারা বুড়ো হয়ে যায়। তবু যে খেলা কিছুটা চলল, চলছে তার কারণ এরকম নারীর খোঁজ কেউ তীব্রভাবে করে না। তীব্রভাবে, রুচির মতো তীব্রভাবে ভালোবেসে ফেললে অন্ধ-ঘোরে পড়ে যেতে হয়। তখন কল্পনার সেই মুক্তমনা নারী আর কারও দিকে হাতটি প্রসারিত করলে তোমার হৃদয়ে ধস নামবে। আসলে সম্পর্কের দিকে তোমার গতি নয়, গতি সঙ্গলিপ্সার দিকে। অনেক সঙ্গ-মুহূর্ত মৌমাছির মতো যত্ন করে সঞ্চয় করলে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাষায় কুলোচ্ছে না আমাকে 'যোনি' শব্দটা ব্যবহার করতে হবে, 'স্তন' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু এইসব মাংসের টুকরোকে ঢালাই কারখানার মজুর, জোড়াগির্জার পাশের ফুটপাতের মানুষরা অন্য কিছু শব্দে চিহ্নিত করে। সেসব আমরা জানি শালা কিন্তু বলার সময় বলব 'যোনি', 'স্তন'। ওরা আরও দুটো সুন্দর শব্দ ব্যবহার করে 'আউরত' আর 'আদমি'।

রঞ্জন একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তারপর তিনটি সিগারেট পুড়িয়ে ফেলার পর এই পৃষ্ঠাটি ডেলা পাকিয়ে এক কোণে ছুঁড়ে দিল। সে ঠিক পারছে না, যে কথাটা বলতে চায় বলতে পারছে না। এইসব চরিত্রের ওঠাবসা-চলা অর্থাৎ ঘটনার মধ্যে যা থাকে না সেই কথাটি কোনো ঘটনার আশ্রয়ে বলা সম্ভব নয়। প্রকৃত যা তাকে ভাষার শরীরে ধরা যাচ্ছে না, যাবে

না। কারণ, সেইসব টুকরো আলোড়ন কিছু নয়, কথা কিছু নয়। কথাকলঙ্ক। কোনটা জাহাজ কোনটা নোঙর বোঝার জো নেই। নারী-পুরুষে শরীরের টানটা ঠিক আছে, কিন্তু এই শরীর রবীন্দ্রসংগীতে ঢেকে দিলে কি প্রেমে পৌঁছে যাবে? এই ভিখিরির শহরে, বেশ্যার শহরে, তেলচিটে পর্দার আড়ালে মাই টেপা জুয়ো ঘোর ও মস্তানের ফাঁক করা ঠ্যাঙের মধ্যে কোথাও সুন্দর, জ্যান্ত কিছু আছে বলে আমি জানি না।

রঞ্জন কি এই অংশটিও কেটে ফেলবে ছুরি দিয়ে?

বীণা দাশগুপ্ত

এই অংশ ঝলসে উঠবে শহরের বেপাড়ায়, যেখানে মুভিমস্তানদের জন্য একটি সুরক্ষিত ফ্ল্যাট আছে : নন্দরানির ফ্ল্যাট। নেই-নেই করেও রঞ্জনের মধ্যে একটু লেখক-লেখক ভাব আছেই, ফলে তাকে বেপাড়ায় এনে ফেলতে অসুবিধে কিছু ছিল না। উত্তরের এই সরু গলির নকশায়, কালো পাথর ইটের ওপর পাতা ট্রাম লাইন, যাত্রা জগৎ আর পিছনে শহরের একমাত্র নদী: গঙ্গা।

রঞ্জন সোনাগাছিতে প্রথম আসে বন্ধুদের সঙ্গে, তারপর যতবার এসেছে সে একাই ছিল, কেবল মাঝখানে একবার দল বেঁধে আসা ছাড়া। শ্যামল একবার সোনাগাছি কভার করে সাতদিনের রুটি জোগাড় করেছিল এবং প্রথম যৌনমিলনের অভিজ্ঞতার খরচা তুলেছিল। সর্ব কখনও সোনাগাছি গিয়েছিল কিনা, অন্তত রঞ্জনের সঙ্গে, সে স্মৃতি ঝাপসা। মানুষজন সম্পর্কে, মানুষ, চরিত্র ও কাহিনির এক প্রবাহমানতার খোঁজে ক্লান্ত রঞ্জনের সোনাগাছি স্মৃতি আবার জেগে উঠল বীণার জন্য। এর তার কথা ভাবতে ভাবতে, এ শহরে তার পরিচিতের দুনিয়া প্রায় শেষ করে এনে রঞ্জনকে বীণার কথা ভাবতে হল।

বীণা দাশগুপ্ত রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, বীণা দাশগুপ্তের রক্ত ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছিল। রঞ্জন তখনও জানত না মেয়েটির নাম বীণা, সে একটু ইতস্তত করছিল, মেয়েটিকে দেখছিল। এবং যখন সে মেয়েটির সামনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়, টাকাপয়সার কথা বলে, তখন পাকা খদ্দেরের মতোই চেষ্টা ছিল বীণার শরীর মেপে নেওয়ার। সম্ভবত সে মেয়েটির ঘাড়ের পিছনে তাকিয়েছিল, চামড়া দেখছিল, বয়স অনুমানের একটা চেষ্টা ছিল।

মেয়েটি সামনে বিকারহীন হাঁটতে থাকে, সোনাগাছিতে গলিঘুঁজির জটিল নকশা ধরে তারা হাঁটতে থাকে। পেচ্ছাপের গন্ধ, দেওয়ালে চুনের গন্ধ, দিশি মদের গন্ধ, কনডোমের গন্ধ পেরিয়ে, গন্ধের পর গন্ধের স্তর ভেঙে-ভেঙে যখন তারা উনিশশতকী একটি পোড়ো বাড়ির দরজায়, তখনও প্রথমেই কলতলা আর পেচ্ছাপের তীব্র ঝাঁঝ।

মেয়েটি সিঁড়ি ভাঙতে থাকে আর যতবার ওই খাড়া, রেলিংহীন সিঁড়ির প্রান্তে ফালি বারান্দা ঘেরা দেশলাই খোপ, ততবার পেচ্ছাপের গন্ধ, প্রতিবার সিঁড়ি ঘুরে যাওয়ার মুখে নারীদেহ, সিঁড়ির এক-একটি ধাপে তাদের পাছা, তলপেট, সাদা উরু, স্তন-মুখ, রক্ত ঠোঁট যোনি বলে ভুল হল। বীণা এক-একটি লাশ পেরিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াচ্ছিল, সঙ্গে -সঙ্গে পেচ্ছাপের গন্ধ, বীণা কথা বলছিল :

'আমি যকোন সবে লাইনে এলুম, আমার বয়েস একন চল্লিশ, আমি একেনে আছি তেইশ বছর, সব ব্যাটাছেলে আমার কাচে এক, আমার রাত নেই, দিন নেই, আমাকে ভিক্কে ঝি-গিরি করতে হবেনি, একুনও দশ বছর খদ্দের বসাতে পারব, আমি বুক দেকাই বুকে হাত দিতে দিইনা, হোল নাইটের খদ্দেরকে বলি যতবার খুশি বসো কিন্তু চটপট, রাতে ঘুম চাই, মাংস খাই, ওষুদ খাই, ঘা হবে না, তোমাদের কুনো ভয় নেই কো ভয় করার কিছু নেই...।'

স্বপ্নে লকআউট

এই মুহূর্তে শহরে অন্তত পনেরোটি কারখানার গেটে তালা ঝুলছে। কারখানার গেটে যখন তালা ঝোলে, তখন মজুরদের কাছে 'তালা' এই শব্দটি কী ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে কল্পনা করা অসম্ভব। শহরে একটি সুতোকল ছিল বলে, সেখানে তালা ঝুলছিল বলে দেড়হাজার মজুর-মানুষকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বাঁচতে হচ্ছিল। ঝনঝন কৌটোর শব্দ ছিল শহর গর্জনে, সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া এক মজুরের সঙ্গে রঞ্জনের দেখা হয়ে যায়। তার চোখে কোনো পল্লব নেই, সাদা জমিতে দু-টুকরো লাল আগুন। রঞ্জন তাকায় : কতদিন?

দু-বছর।

আন্দোলন?

বামফ্রন্ট।

সেন্ট্রাল?

স্টেট।

আন্দোলন করুন, ধর্না দিন, ঘেরাও করুন, ভেঙে ফেলুন...

মজুরটি ঘাড় কাত করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কানের নীচ থেকে থুতনি পর্যন্ত একটি হাড় জেগে উঠল, ছুরির মতো গঠন সেই হাড়ের, মজুরটি রঞ্জনের মুখে থুতু ছুড়ল। বাসগুমটিতে হঠাৎ এই দৃশ্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল, কয়েকজন ছুটে এসে মজুরটির ওপর হামলে পড়ল, পুলিশ এল, বাঁশি বাজছে, রঞ্জনের মাথা, কান ফাটিয়ে বাঁশি বাজছিল...দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে যেতে রঞ্জন আঁতকে উঠেছিল। তখন তার শহরে সুতোকল নেই, লকআউট নেই, মজুর নেই। মাঝরাতের কলকাতায়, গাঢ় ঘুমে হামলা চালিয়েছে স্বপ্ন, স্বপ্ন সশস্ত্র স্বপ্ন। শহর তখন বরফ। স্তব্ধ।

রূপকথা

সর্ব, পূর্ণ, শ্যামল, মৃগাঙ্ক ও রুচি-রা খুব যে কিছু বদলে গিয়েছে এমন নয়। আগাগোড়া পাণ্ডুলিপির কারাবাসে ফুরিয়ে এসেছে রঞ্জনের রাত। এখন সে বুঝতে পারছে কিছু নোট তৈরি করা গেল মাত্র, যেমন আর্টিস্টের স্ক্র্যাপবুক। এক যে ছিল শহরের গল্প কোনোভাবেই রঞ্জনের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট শুরুই হয়নি। কল্পনার ঘাটতি একটা কারণ হতে পারে। কারণ অজস্র। সে কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবে? বাস্তব-ই কি কম লেজে খেলাল?

সর্ব-রুচি মিলে এ কাহিনি হয়ে উঠতে পারত যথেষ্ট রোম্যান্টিক, সর্ব হয়তো শেষটায় বিপ্লবী হয়ে গেল, কল্পনা করুন চার অধ্যায়-এর শেষ দৃশ্য শম্ভু মিত্রের কোলে তৃপ্তির মাথা, গুলির শব্দ...

বা, বা এইসব মানুষজনকে জড়িয়ে, মজুর মধ্যবিত্ত জড়িয়ে পরিচ্ছেদের টুকরোয় পোরা গল্পে ইতিহাস গড়ে তোলা...রঞ্জন ব্যর্থ। সে এখন বিশ্বাস করছে এ গদ্যের পরিণতি বলে কিছু নেই, শেষ বলে কিছু নেই।

কী লেখালি মা। কালগ্রাসী।

ক থা ক ল ঙ্ক

শেষ রাতে, ডিসেম্বরের শীতেও তাকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, একটু কুঁচকে গেল সে, তবু ভালো লাগছিল।

মুদ্রণ সৌন্দর্য

রচনাকাল : ১৯৯১; 'জনমন জনমত' সাময়িকপত্রের শারদ প্রকাশে ওই বছরে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থরূপ পায়নি স্বতন্ত্রভাবে। এই সংকলনের আরও দুটি রচনার মতোই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল 'মুদ্রণসৌন্দর্য'।

আ— এই বর্ণটি আমি প্রথম উচ্চারণ করি এবং অচিরেই 'আ আ' হয়ে উঠে 'আ আম্ হয়তো আর সব শিশুর মতো 'আম্‌মা-মা' দিয়ে আমার কথা বলা শুরু হবে ভেবেছিল সবাই। আচমকা কোথা থেকে একটি ই-কার ছুটে এসে সব তালগোল পাকিয়ে দেয়। ভেস্তে গেল যাবতীয় কল্পনা, প্রত্যাশা ইত্যাদি এবং উচ্চারণ করে ফেলি 'আম মি-আমি'। পরে মার মুখে শুনেছি পাড়ার এক বৃদ্ধা বলেছিলেন 'এ ছেলে স্বার্থপর না হয়ে যায় না', কে একজন তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন 'এ সাক্ষাৎ অবতার'। আজ ভোরে গঙ্গাস্নান সেরে 'ওম, ওম শান্তি শান্তি, ওম শান্তি' আওড়াতে আওড়াতে অস্পষ্ট ছায়ার মতো এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের অবয়ব গলিটির জটিল মানচিত্রের মধ্যে দ্রবীভূত হতে দেখে, ওই গম্ভীর ধ্বনি শুনি।

'আ' বর্ণটি থেকে 'আমি' পর্যন্ত এই কাহিনি।

মনমে হি গঙ্গা মনমে হি যমুনা

মনমে হি সিনান করে

ধ্বনিবিন্দুতে বিশ্বছায়া, ভাষায় নিখিল—ভুবনালিঙ্গন অন্তরের অভিজ্ঞতার ভাষা —ব্যক্তিগত—শিল্প—ভাষায় নৈরাজ্য—আক্রমণ—দুর্বোধ্যতা।

ধ্বনি সংগীত হয়ে যাচ্ছে—সুরসপ্তক 'আ' ধ্বনিটাকে বিভিন্ন লয় ও তালে বিস্তারিত করছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে, এরপর ভাষার যুক্তিশৃঙ্খলায় কিছু স্পর্শ করতে পারছি না—কথা হারিয়ে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে, নীরবতাই এখন অন্ধের যষ্ঠি।

ওম শান্তি, শান্তি, শান্তি...

ছাদ, কার্নিশ, ঝুল বারান্দা, পিলার, বাঁধানো লাল রক, নিমগাছ আর শনির সামনে পেতে রাখা বিশাল থালাটি 'শান্তি' শব্দে কেঁপে উঠেছিল। এক ঠোঙা জিলিপি খেতে খেতে ধর্মের ষাঁড় লেজটিকে ডানার মতো উপরে তুলে ছুটতে শুরু করল, কিশোরীর বুক খামচে কঁকিয়ে উঠল কোলের শিশু। আরও কত ঘটনা যে ঘটে সরল বক্র রেখায় গড়ে তোলা বৃত্ত ও ত্রিভুজের আমাদের এই পাড়ায়, ইটের দেওয়াল দিয়ে গঠিত আরও বহু বিচিত্র জ্যামিতিক নকশায়, যেখানে অতলান্তিক সমুদ্র থেকে বারবার ছুটে আসে পেটের দায়ে নাবিক হওয়া কেরানির একমাত্র ছেলে ভোম্বল। 'আহ্! বাঁচলাম' শ্বাস ফেলে লোমশ বুকে হাত বোলায় ভোম্বল। এবং এইসব টুকরো খুবই স্বাতন্ত্র্যময়, অন্য কারো সঙ্গে তারা মিলেমিশে হারিয়ে যাওয়ার নয়, যদিও অভিজ্ঞ, বহুদর্শীরা বলেন, আদতে এই টুকরোগুলি একটিই ঘটনা এবং তা হল বেঁচে থাকার এক মরিয়া চেষ্টা। এমনকি শান্তিধ্বনিও তাই, তা যেন চেষ্টায় চেষ্টায় নির্জীব নিরাশ প্রাণের উপর অনর্থক এই সঞ্জীবনী জল সিঞ্চন, এই মন্ত্রের শক্তি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ আর কেউ বিশ্বাসও করে না কিন্তু অভ্যাস রয়ে গেছে, শান্তির অভ্যাস।

কী শুনছিস?

ইস্-স।

আহা...

ইস্-স।

প্রাণের স্পন্দন নয়, নৈঃশব্দ্যের কম্পন শুনতে পাবে এইরকম আশা করে ঠায় বসেছিল কর্মহীন, জন্মবেকার এক পুরুষ। তার মাথাটা গেছে, সে এখন আবোল-তাবোল বকে। স্নেহপ্রবণ মানুষজন তবু রেহাই দেয়নি তাকে, নানারকম প্রশ্ন করা হয় আধপাগল মানুষটিকে এবং যাতে সে নিঃসঙ্গ বোধ না করে সেইজন্য সমষ্টি তাকে ঘিরে থাকে; শুশ্রূষার এই নির্দয় অত্যাচারে মাঝেমধ্যে খেপে যায় মানুষটা। ইট ছোড়ে, থুতু ছেটায়, ষাঁড়ের লেজ মুচড়ে দেয়। গলির সমাজের সঙ্গে সে কোনোভাবেই সংলগ্ন নয়, ব্যক্তি পরিচয় পেতে, পাওয়ার চেষ্টায় উন্মাদ হয়েছে সে এরকম একটি গল্প প্রচলিত আছে এখানে। যুবকের গোপনীয়তা প্রেম দেখে বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে ওঠে।

পাওয়া গেছে একজন।

কে?

ক্রেতা।

বেচবেটা কী?

হা হা...

যাচ্চলে!

টাইম, সময়। সময় বেচব।

উত্তর কলকাতার এই পাড়াটিতে সাংকেতিক ভাষা এবং ফিলজফির ছড়াছড়ি দেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই প্রবাসী বাঙালিটি যথেষ্ট করিতকর্মা, আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই তিনি সংকেতধর্মী ভাষা নিয়ে গবেষণার জন্য সময় ও টাকার বন্দোবস্ত করে ফেলবেন। গলির মোড়ে চায়ের দোকানের বেঞ্চে সময় বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা অচিরেই বাড়ি বিক্রির দালালির হিসেবে বদলে গেল। জানা যাচ্ছে, জনৈক ঠিকাদার এ পাড়ায় সব থেকে পুরোনো বাড়িটি কিনে নিতে চান। হেঁয়ালি ভাষার প্রতি এই টান রহস্য রচনার এই প্রবৃত্তি নাকি মৃত্যুর লক্ষণ—অধ্যাপক বলেছিলেন।

ক্ষয়ের এই স্তূপের উপর বসে আছি, ঋতু যায়, ঋতু আসে; আসে যায়। গলিটির ঘেয়ো দেওয়ালে মাও সে তুঙ, ইন্দিরা, রাজীব, পরিবেশ চেতনা, শহরের তিনশো বছর পূর্তি উৎসবের কথা, ছবি এইসব কারা আঁকে, মোছে, পুনরায় আঁকে, যদিও, না দেওয়ালের না এখানকার মানুষের—কারো কিছু বদলায় না। শব্দ, ধ্বনি, সংগীত গ্রাস করে গলির মধ্যে প্রবিষ্ট অজস্র রবারের নলের মতো আরও অজস্র গলি এবং কানাগলি থেকে উৎসারিত নৈঃশব্দ্য। সে সব খেয়ে ফেলে। এটা ভালো বোঝা যায় ধ্বনিগুলি যখন প্রতিধ্বনিত হয়। তখন দেখি বাক্যের কর্তা বা ক্রিয়াপদটি কেমন দূরে সরে যাচ্ছে, শব্দ লোপ, বর্ণলোপ ঘটে চলেছে এবং গলির জিভ সক্ সক্ করছে, কই বলো আরও বলো আরও আরও।

এবং দ্যাখো কেমন খেয়ে ফেলি।

দুই

গতকাল কে একজন আত্মহত্যা করেছে, প্রথমে শোনা গেল এক বৃদ্ধের নাম। ওড়িশাবাসী জনৈক বামুন ঠাকুর যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করল বুড়োরা আত্মহত্যা করে না, বাঁচার এমন পুরোনো অভ্যাস কী করে ছাড়বে। স্ত্রী না পুরুষ এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, ক্রমে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থিতিয়ে গেল, থেমে গেল জল্পনা কল্পনা; ততক্ষণে বেশ নিদিষ্টভাবেই জানা গিয়েছে কুসুম নামের উঠতি মেয়েটা এই কাণ্ড করেছে। বিতর্ক, আলোচনা, কথা এবার কুসুমকে নিয়েই হবে, কেমন গাইত সে 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না', সা পা টিপে গলা মেলাত, বুকের কাছে বই চেপে ধরে স্কুলে যেত, একবার সে হারিয়ে গিয়েছিল, তখন চার বছর বয়স। না এসব নয়, দাবি উঠল কাল রাতে শুধু নয়, আজ সকালেও তাকে দেখা গিয়েছে, তাহলে কী করে সে গতকাল আত্মহত্যা করে। বাস্তববাদীরা এইসব সংশয় এক মুখ ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিল, 'ওরকম মনে হয়, দৃষ্টির ভুল, মনের ভুল।' নাবিক ভোম্বল কিংবা কর্পোরেশন ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই বললেন 'বহিঃপ্রেরণা ছাড়া এখন কি বাঁচাও যায় না?' সবাই থ। এরকম শক্ত কথার মানে তারা জানে না, বেঁচে থাকার মতো এত সহজ একটা কাজও যে মেয়ে পারল না, তার সম্পর্কে কী বলবে, কী বলা যায়। ভয়ে বিস্ময়ে সকলে মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। ওনার আছে তো? বহিঃপ্রেরণা?

বকবক বকবক।

শরীরের সমস্ত ছিদ্র এমনকি চুলের গোড়া থেকে ধোঁয়ার মতো নির্গত হচ্ছে শব্দ। আনন্দ বেদনা, নৈরাশ্য-যন্ত্রণা, বিষাদ, সংশয়, উৎসাহ, উদ্দীপনা সমস্তই শুধু কথা। চলমান এই কথারা কথার কায়াদের মধ্যে পড়ে আছি লক্ষ্যহীন, গতিহীন। আলোর জাফরি, গলির বাতাস পথের হু হু শুষ্ক ধুলো টায়ারের শব্দ, কলহ, শিশুর হাসি, তামার তার পোড়ানোর নীল আলো আর রবারপোড়া গন্ধের মধ্যে একবার মাত্র বিপ্লব ঝলসে উঠেছিল, এই গলির তিন জন মেধাবী ছাত্র ও ফুটপাতের এক ফলওয়ালাকে রক্তে ভাসিয়ে ক্ষণস্থায়ী সেই বিপ্লব নিরুদ্দেশ হয়েছে। আত্মঘাতী কুসুমের লাশটি যেমন এখানকার এক চিলেকোঠায় থাকলেও সে নিজে আর এক বিন্দু এখানে নেই, স্থানদাসত্ব ত্যাগ করে চলে গেছে সে, প্রেরণাহীন এই বাস্তবে অজস্র চরিত্রের মধ্যে সেইরকম নিরুদ্দিষ্ট হতে থাকি। আমি নয়, এখানে যে হাঁটে চলে, ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ-হুঁ করে যায় তা আমার বিশ্বস্ত ছায়া মাত্র।

তিন

কী করে এখানে এলে, বলো কী ভাবে? স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম এই দুটি প্রশ্ন এবং আরও আরও শব্দ। বাছা তোমার আর আমার মধ্যে রক্ত নদী, আতঙ্ক নদী, ওই নদীর শান্ত নীল জলে, লাল জলে তোমার অপেক্ষায় আছে মৃত্যু। এবং আমি নিরন্তর জবাব দিয়ে যাচ্ছি, তুমি তো সবই জান, বয়সে, বুড়ো হয়ে মরব আমি, তার আগে নয়। আর তখন এই পাড়ার পার্কে একটা ফুটবল দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল একদল তরুণ, আমি তাদের পেশি দেখতে পাচ্ছি, ঘামের

দানা তাদের কপালে, চেষ্টা করলে দানাগুলি গুনে ফেলা যায়। তাদের শরীর আন্দোলিত হচ্ছিল, এক প্রমত্ত নৃত্য যেন। দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করছে তারা। লাথি মারছে মাটিতে থুতু ছেটাচ্ছে। দরিদ্র এই পাড়াটির দরিদ্র এক যুবকের বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্যে দর্শনের থেকে চিন্তার থেকে বড়ো ছিল দারিদ্র্যের অভিশাপ। পাড়াটি তা জানে বলেই দরজায় টোকা মেরে ফিসফিস করে, 'কিছু হল, পেলি কিছু।' আর সামান্য একটা চাকরির জন্য আমি তখন দাঁতে করে জুতো বইতে রাজি, বাঁচার এমনই অদম্য কামনা, বাঁচতেই হবে, যে করে হোক। চোয়াল শক্ত করে নিঃশব্দে কথা বলি, কথাগুলিকে কাগজে বসাই, সাজাই আর খামে পুরে পাঠিয়ে দিই ছাপাখানার মালিকদের কাছে।

তোমার লেখায় রস নেই।

গল্প নেই।

গতি নেই।

বৈচিত্র্য নেই।

নেই, নেই, নেই যেন শব্দগুলি নির্বাক, তারা শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে, নিষ্পলক ভূতের দৃষ্টি পেয়েছে তারা, ভয়ংকর শুষ্ক, যেন আত্মাহুতির সমস্ত আয়োজন সেরে ফেলেছে। মায়ামেদুর পাড়াটি তিন সপ্তাহ হল ছেড়ে দিয়েছি, ঘুরে বেড়াই, বন্ধুদের বাড়িতে রাত কাটাই, আর ভাবি লিখতে পারি না কেন, কেন লিখতে পারি না...

বৈরী পরিবেশের মুখে পড়ে উদোম সদ্যোজাত শিশুর জীবন সংশয়ের ইতিহাস আমরা বহন করে চলি, ওই বৈরিতা কোনোদিন ফুরোবার নয়। কদর্য তো কী হয়েছে? হলই বা হিংস্র তাতে হাত গুটিয়ে নেওয়ার কী আছে, তুমি তো জান এই কুৎসিত হিংস্রতাকে ধ্বংস করতে হবে। এত বড়ো দায়িত্বের কথা, পাহাড় উৎখাতের কথা আমরা যখন বলাবলি করতাম, বিশ্বাস করতাম, রোগা দুর্বল তরুণদের বীর বলে মনে করতাম বস্তুত তখন বিদ্রোহীর জন্মই হয়নি। কল্পনা, গুজব, আশাবাদের প্রমত্ত প্রলাপে এমন এক সংঘশক্তির মূর্তি গড়ে নিয়েছিলাম যা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বা মহাকালের আদ্যাশক্তির নামান্তর। আশ্চর্য ধর্মে কিন্তু আমাদের মতি ছিল না, ধর্মের নাম শুনলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠতাম : আফিম! আফিম! বন্দুক, জেলখানা, আইন আর টাকা নেপথ্যে ছিল, তারই জিত হল এবং এরকমই যে হবে, বেলতলা লেনে গোটা তিনেক শহিদবেদি ছাড়া আর যে কিছুই হবে না, পাড়ার নিরানব্বই ভাগ লোক সেকথা বলে এসেছে। কী দূরদৃষ্টি তাদের।

অ্যালবামের ছবির মতো সিপিয়া রঙের সেই দৃশ্যগুলি ভাবছিলাম, অনুভূতির কথা ভাবছিলাম, আচ্ছা সেই উগ্রদিনে তো কখনোই মনে হয়নি একদিন এইরকম একাবোকা হয়ে যাব। আবার *এইটুকু ভেবেই একাবোকা শব্দটির তলায় দাগ কাটতে থাকি। কেন একাবোকা? সে কি শুধু এইজন্য যে একা মানুষের কোনো হিস্যা থাকে না ক্ষমতায়? ক্ষমতার কোনো না কোনো কেন্দ্রের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করতে পারে না বলেই কি?*

তুমি কি সন্ত হতে চাও?

আমি লিখতে চাই।

তো লেখ না কেন, কে বাধা দিচ্ছে।

কেউ না, নিজেই নিজের বাধা।

পচা হেঁয়ালি ছেড়ে খোলসা করে বল।

লিখতে পারছি না, লেখা কেবলই মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে।

লেখার ক্ষমতা নেই বলছ?

ঠিক ধরেছ, কেমন নিঃস্ব রিক্ত মনে হচ্ছে।

চেষ্টা করো, অনুশীলন করো।

তাতে বড়োজোর হাতের লেখা সুন্দর হয়, কারিগরি শেখা যায়।

তুমি কী চাও?

নিজের সঙ্গে এই তর্ক, এই আলোচনা এতদূর গড়ায় যে একসময় টের পাই আমার নাম, আমার ছবি, আমার সামাজিক পরিচিতিকে একটা শক্তপোক্ত প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই কি আমি ব্যাকুল, উদ্‌বিগ্ন অন্যভাবে সসম্মানে ক্ষমতায় থাবা বসানোর জন্যই কি লিখতে চাইছি, জ্বলছি? এবং হুবহু এক উদ্দেশ্যই কি গোপনে বুকে বয়ে বেড়াইনি দলবদ্ধ বিপ্লবের দিনে?

মাকে বড়ো জ্বালাতাম আমি আর বাবার উপর ছিল অন্ধক্রোধ। ইজেরের দড়ি বাঁধা, বারোমেসে সর্দির ছেলেবেলায় কতবার কাঁদতে দেখেছি মাকে। স্বদেশির দলে নাম লিখিয়ে আমার জন্মের ছ-মাস আগে মারা যান ভদ্রলোক। চার-পাঁচটি সন্তানসহ মাকে দারিদ্র্যস্রোতে বিসর্জন দিয়ে স্মৃতি হয়ে যাওয়া সেই মানুষটি সম্পর্কে আমি বলতাম 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!' তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি অর্ধেক দামে পুরোনো বই কিনে পড়তে হত, এমনকি সব বই কেনাও হত না। নেবুতলা লেনে তিনতলা বাড়িতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উঠে এসেছিলাম আমরা, কলকাতা ছেড়ে তখন পালিয়ে যাওয়ার হিড়িক। নামমাত্র ভাড়ায় তিনটি ঘর পাওয়া গিয়েছিল। এইসব ইতিহাস মা বলেছিল। আর আমি বলতাম, 'ওরা থাকুক। এই পচা শহর ছেড়ে আমরা পালাই চলো।' আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা বিড়বিড় করত, 'কোথায় যাবি? কোথায় পালাবি?' দাদা-দিদিরা দারিদ্র্য সইয়ে নিতে পেরেছিল, ওরা কাড়াকাড়ি করে খেত, একটু মাথা চাড়া দিতেই দু-পয়সা রোজগারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা স্বপ্ন দেখে না, আজও না। কেমন শক্ত শক্ত কাঠ কাঠ হয়ে উঠেছিল শৈশবেই। আমার দিদির মুখে একবিন্দু লাবণ্য ছিল না। ওর চোখ দুটি সর্বদা ভিজে থাকে, কী করুণ দৃষ্টি! আমি এখন দিদির মুখের দিকে তাকাতে পারি না। মার মৃত্যুর পর অবশ্য সকলেই চেয়ে এসেছে আমি যেন নিরুদিষ্ট হই, চলে যাই ওদের জানাশোনা পৃথিবীর বাইরে। হিংসে নয়, নির্দয়তা নয়, আমার আনমনা ভাবের জন্য, বিপ্লবী দলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আমাকে ঘিরে ওদের অনেক প্রশ্ন ছিল, সংশয় ছিল, হয়তো একটা প্রচ্ছন্ন আশাও (ছেলেটা ইতিহাসের কোলে মূর্তি হয়ে বসবে) ছিল। এই পাড়াটিতে, এই বাড়িতে কোনো দিন সেই আশার ডানা দেখা যাবে না এটুকু বাস্তববোধও ছিল। দিদি তো কতবার বলেছে, 'চলে যা তুই চলে যা, একটা পেট ঠিক চলে যাবে।' যৌথ পরিবারের বত্রিশ রকম মানুষের মধ্যে অভাব ও কলহের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল বলেই হয়তো কেবলই একা হতে চাইতাম আমিও, তবু শরীরের

আশ্রয়, ছেঁড়া বিছানার নিশ্চয়তা আর কোথাও ছিল না বলে ওইখানেই ন্যাকড়ার পুঁটলির মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে ভাবতাম, স্বপ্ন দেখতাম, একগাদা মানুষের শ্বাসে গরম, তাদের কোলাহল থিকথিকে মাংসপিণ্ডের মধ্যে আমি পড়ে থাকব না। সাতাশ বছর বয়সেও ভেবেছি একথা, ত্রিশেও, তবে ধার কমছিল, অত ঘন ঘন আর হানা দেয় না কল্পনার সেই মুক্ত জীবন, যার কোনো সুস্পষ্ট অবয়ব ছিল না। সেই দুর্লঙ্ঘ্য টান হ্রাস পেতে পেতে আজ একেবারে মুছে গেছে, নেই হয়ে গেছে। আর স্বপ্ন নেই।

'আমরা কি স্বপ্নে বেঁচে থাকি? স্বপ্নের জন্য, স্বপ্ন দেখব বলে বাঁচি?'

ভ্রমর জিজ্ঞেস করেছিল, এ অনেক পরের কথা। ভ্রমর কে, কোত্থেকে এল, এসব থাক এখন। স্বপ্নের গুরুত্ব, প্রভাব অপরিসীম। একমাত্র সত্য সে। বাস্তব হল নেড়া পিচের রাস্তা, ঘেয়ো দেওয়াল, যেখানে কুকুর প্রস্রাব করে যায়। ভ্রমরের প্রেমে মুগ্ধ হওয়ার মুখে ঠিক তখন সে এমন প্রবলভাবে হাসতে লাগল যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভ্রমর-আমি কথা বলছি এর মধ্যে স্বপ্ন কোথায়? অথচ ভ্রমর এমন অলৌকিক হাসি এনে ফেলে যেন এই দৃশ্যটিতে স্বপ্নগন্ধ আছে। আমি প্রেমভয়ে আতঙ্কিত, ডিম্বাকৃতি মুখের ভ্রমরকে চোখে দেখলে সুখ হয়, ওর দাঁত ঠোঁট ভুরু পৃথক পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, মনে মনে উচ্চারণ করেছি 'সুন্দর' এই শব্দ। কিন্তু আমার দাদা, দিদি, বৌদি নেবুতলা লেনের দুঃসাহসী সাধারণ মানুষের মতো প্রেমাভিযানের কথা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রেম বাস্তবে বড়ো বেশি ডালপালা, বড়ো বেশি ফুলফল, ছাতানাতা থেকে মহার্ঘ বস্তুর এমন ভিড় নির্মাণ করে, বা সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক শোষকের মতো নিংড়ে নিতে পারে আয়ু, চিন্তা ও অনুভব।

স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে আরও হাজারো স্বপ্নের এক বিচিত্র ঢেউয়ে খড়কুটোর মতো ভাসছি, নড়ছি, পড়ে যাচ্ছি মুখ থুবড়ে, আবার উঠছি। জখমি মানুষই শুধু ক্ষতের কথা বুঝতে পারে, বাকিদের কাছে তা তথ্য ছাড়া কিছু নয়। তথ্যহীন গদ্যপদ্য লেখা যায় কি? একেবারে ক্ষতের মতো? মতোও নয় লেখাটি বাস্তবিক ক্ষত, এইরকম রচনাসৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর জন্মের রহস্যকে যুক্ত করে ফেলে ভাবি কারণবহির্ভূত, জন্মের ইতিহাসহীন সেই সৃষ্টি কোথাও আছে, একদিন সে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু কথাটা কাউকে বলতে পারি না, পেট ফুলে ওঠে, আঁকপাঁক করতে থাকি বলার জন্য, আর ঠিক তখনই লক্ষ করি আমার কান পচে যাচ্ছে হাবিজাবি কথায়। প্রবল উৎসাহে যারা সেসব বলে চলেছে তারা সবকিছু মেলাতে পারে, তাদের বক্তব্যে দুয়ে দুয়ে যে চার হয় এই সূত্র সর্বদা স্বীকৃত আমি হাতড়াতে থাকি বিকল্প কোনো সূত্রের জন্য এবং সেই অন্বেষণ ব্যাপ্ত বিষাদের কোনো বিন্দুতে এমন মজে যায়, এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে বাঁচবার, ওঠাবার আর শক্তি থাকে না।

চার

সিসের হরফের মধ্যে বসে আছি। ভেজা কাগজে হরফ দেগে বসে যাচ্ছে, একের পর এক কাগজ তুলে দেওয়া হচ্ছে আমার হাতে। সেইসব কাগজে আ-কার, ই-কার, র-ফলা ফুটকি,

ষ-এর পেটে ছুরির মতো একটি রেখা ঠিকঠাক বিদ্ধ হয়েছে কি না বিস্ফারিত চোখে তা দেখে যাচ্ছি। এইখানে সরু গলির ভ্যাপসা গন্ধের অনেক তারতম্য ঘটে থাকে সময়সূচি অনুসারে, গন্ধ সময় নির্দেশক হয়ে ওঠে। মান্ধাতার আমলের ছাপাখানার এই ঘুপচি ঘর পর্যন্ত, জানলাহীন এই অন্ধকূপ পর্যন্ত ছুটে আসে ওই গন্ধ সময়। সময় বইছে, বয়ে যাচ্ছে টের পাই। ভ্রম সংশোধনের জন্য টেবিলে ঘাড় গুঁজে থেকে বিজ্ঞাপনের কপি অনুবাদ করে ভদ্র জীবিকার প্রান্ত ছুঁয়ে বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টায় ঘাড় টনটন করছে। লেখকদের মুদ্রাদোষ সম্পর্কে আরও জেনে ফেলছি, জানতে জানতে এমন হয়েছে, আমি এখন বলে দিতে পারি গ্রাম, শহর, প্রেম, হিংসা, যৌনতা ও রাজনীতি এইভাবে বিষয়-বিভক্ত লেখকরা কে কোন শব্দ বেশি ব্যবহার করেন, কে লিখবেন দীর্ঘ অনুচ্ছেদ, আর কার লেখা সংলাপপ্রধান। প্রত্যেকে তাঁর জোরের জমি আঁকড়ে থাকেন, তাঁদের প্রতিটি নতুন লেখা সেই এক ছাপ মারা। প্রুফ কাটতে কাটতে দিব্য এক বিশারদ হয়ে উঠছি।

ছোটো প্রেসটির মালিক, সহ-সম্পাদক, পাঠক কেউ এ নিয়ে চিন্তিত নয়। তাদের কাছে তা রোজগার আর অলস অবসর যাপনেই সমাপ্ত। আর পাঁচটা কাজে, চিন্তায়, বিনোদনে তারা দিব্য মত্ত থাকে। সিসের হরফগুলি ভেজা কাগজ থেকে দৃষ্টিপথ ধরে সটান আমার মাথায় ঢুকে পড়ছে, বিষক্রিয়া ঘটছে। জীবিকা-দূষণে বিষিয়ে যাব আমি। বিষিয়ে যাচ্ছি। হরফ-দূষণে।

কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে? বাজারে আলু বিক্রি করতে বসে যাও না কেন? এক কবি পরামর্শ দিয়েছিলেন, ক্যানিং থেকে মাছ এনে বিক্রি করো, রোজ কম করে একশোটা টাকা থাকবে, এখন তো কুড়ি টাকাও আয় করো না।

অনেকবার ভেবেছি তাই করব, আলু-মাছ যাহোক কিছু বেচব। শব্দের ভিড়, হরফের কালি, বিষাক্ত পোকার এই জঙ্গল থেকে পালাব, দূরে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব। কত মানুষ তো হরফহীন বেঁচে আছে। আর কী দুঃসাহসী তারা। স্বাভাবিক জীবনের গৌরবহীন, দুরূহ, রোমাঞ্চকর কত কাজ তারা অবহেলায় সেরে ফেলে। আমি তাদের মতো হব, তোমাদের মতো হব, অলস পাঠক হব; তখন বইয়ের পৃষ্ঠা সাইনবোর্ডের মতো হয়ে যাবে। অহংকার এবং এক অদৃশ্য শক্তি আমার গলা টিপে ধরে। একজন অবতার এবং একজন স্বার্থপর ঘাতকের মতো আমার দু-পাশে দাঁড়িয়ে যায়, আগ্নেয়াস্ত্রের নল ছোঁয়ায় আমার পাঁজরে। গ্রাম্য মানুষের সংস্কারে যে পাঁজরটিকে, খাঁচাটিকে আমি ভালোবাসি আত্মার একমাত্র আশ্রয় বলে।

না, যাই। নিমতলা ঘাটে, বন্দরে, স্টেশনে, ভিড়ে, রেস্তোরাঁয়। নিমতলায় আসাটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল, বারোটার পর কেমন আনচান করতে থাকে, যাব-না যাব-না করেও ঠিক কখন রোগা বা মোটা একটা বই খুলে জেটিতে পা ঝুলিয়ে বসে পড়েছি দেখি। ধোঁয়ার গন্ধ, পোড়া কাঠ আর পচা ফুল লতাপাতার গন্ধ আমার হাত ধরে আছে, পায়ের তলায় শূন্যের সংক্ষিপ্ত স্তর পেরিয়ে শব্দস্রোত বয়ে যাচ্ছে, বাতাস ভাসিয়ে নিতে চাইছে উড়িয়ে দিতে চাইছে আমাকে। জামার ভেতর ঢুকে বেলুন করে তুলছে। এখানে একখানি বই পড়া সংঘর্ষের মতো। এই সংঘর্ষ ভালোবাসি আমি। বাতাস পড়তে দেবে না, জল না, শব বাহকেরা না। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে ও কী কর! কেন ছাইপাঁশ পড়।

ছুঁড়ে ফেল। জলে ফেলে দাও।

আগুনে ফেলে দাও।

মৃতের সঙ্গে পুড়ে যাক।

গঙ্গার ঘাট, জীর্ণ শিবমন্দির, রেললাইনের গা ঘেঁষা গরিবের, ভবঘুরের বসত, চিতার ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়া, গাঁজার কলকের ধোঁয়া আর ধুলোর ঝড়ের মোড়কে ঢাকা চারপাশ এক মলিন উপহারের মতো রয়েছে, শুধু হাত বাড়ানোর অপেক্ষা।

হাতের মধ্যে ধরা বইটির ঠিক যে জায়গায় আমি ছিলাম বারুদমাখা দেশলাই কাঠিটি টানা মাত্র সেখানে পৌঁছে গেলাম ধাতব শব্দে, চমকে উঠি, শব্দের বুলেট যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। শেষতক পড়ে থাকবে গুটিকয় ছিদ্র বা ছিদ্রেছিদ্রে রচিত এক বিশাল গহ্বর। শব্দের আর্তনাদ যেন কোনো মানুষের নয়। কসাইখানায় শেষ মুহূর্তে চিৎকার করে উঠছে অসহায় কোনো জন্তু। তার চোখ অগ্নিময়, জ্বলন্ত, আগুনের সেই টুকরো দুটি এমন আহাম্মক, এমন উন্মাদ যে কোনো বস্তু নয়, দৃশ্য নয় বিদ্ধ করতে চাইছে শব্দকেই, আত্মঘাতী সে। দেখতে চাইছে শব্দের জন্ম, বিস্তার ও মৃত্যু...

আমি এভাবে লিখতাম না, এইরকম বর্ণনার ঝোঁক, আবেগ আতিশয্যের বদলে সেখানে অনেক বেশি থাকত আমি, আমি, আমি...পাঁচশো পৃষ্ঠার বইটিকে অনায়াসে দুশোয় নিয়ে আসা যেত। তবুও অনেকদিন পর, তেষ্টা মিটছে, ভালো লাগছে, মাতৃভাষায় লেখা বলে যেন বেশি ভালো লাগছে। কলেজ স্ট্রিটে নয়, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের পুরোনো ইংরেজি বইয়ের দোকানের এক কোণে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বইটি। কোনোদিন এই বইয়ের লেখকের নাম শুনিনি, আর কোনো বই লিখেছেন কি না তাও জানি না, দোকানে দাঁড়িয়েই পাতা ওলটাচ্ছিলাম। লেখক অনামী হওয়ায়, আমার কাছে তাঁর নাম দুর্বোধ্য, হাতের টানে আঁকা এক স্বাক্ষর, অর্থহীন একটি চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। আর পাতা উলটে আনমনে আজকের চেষ্টা কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। সাদা নিষ্কলঙ্ক পাতায় একটি শব্দ এঁকে ফেলতে, লিখে ফেলতে কী ভয়ংকর উৎকণ্ঠা! ভাষা ব্যবহারের পটুত্ব নয়, শব্দের, ভাষার দুনিয়ায় তার বিশাল সংগ্রহশালায় এই গ্রন্থকারের প্রবেশের দ্বিধা ও উদ্‌বেগ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল আমাকে। বইটির জন্য কষ্ট হচ্ছে, এরকম যন্ত্রণা, শেষের দিকে লেখাটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেল, মানুষ ভয় ও সংকোচ কাটিয়ে, সংশয়মুক্ত হয়ে নোংরা রক্ত ও জলের থলে ফাটিয়ে পাঁচশো পৃষ্ঠার মধ্যে একতাল মাংসপিণ্ডের ধুকধুক শুরু হল, একজন লেখক জন্মালেন।

হায়! হায়!

পাঁচ

বইটির সব থেকে দুরূহ বিন্দুতে পৌঁছে আমার অবলুপ্তি ঘটেছে, যেসব সমস্যা, অভিমান ও ক্রোধের বিচিত্র বর্ণের পোশাকে আমি ঢাকা পড়ে যাই তারা এখানে নেই, এই বিন্দুটি পর্যন্ত তারা আমার অনুগামী হতে পারেনি। বইটি এমন এক সত্য হয়ে উঠেছে, এতখানি বাস্তব যে

ন্যাকড়াকানি, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, অর্ধদগ্ধ মানবশরীর, পূর্ণযৌবনা রমণীর আদুল হয়ে গঙ্গাস্নান, কুয়াশার অস্পষ্টতায় বিন্দু বিন্দু হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

শব্দের বিন্যাসে নিউজ প্রিন্টের পাতায় কাহিনি, প্লট এসব কিছুই ছিল না, বর্ণনার প্রলাপও এই বিন্দুটিতে এসে একেবারে নেই হয়ে গিয়েছে, হালকা মেঘের মতো যেটুকু-বা কাহিনি তাও পৃষ্ঠার বাইরে চলে যায়। অসম্পূর্ণতার এক মহিমা প্রদর্শিত হচ্ছে, কল্পনা ও অনুভব তাকে উত্তেজিত করছে এবং সে এই একটি পুস্তক থেকে আরও একাধিক পুস্তক অজস্র পুস্তকের সম্ভাবনায় এমনকি নিজের মৃত্যু সম্ভাবনা, মৃত্যুর মৃত্যু পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত। বস্তুত গ্রন্থের সম্ভাবনার জন্য, বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্যই কাহিনির পাতলা সুতোটি খুইয়েও গ্রন্থকার নির্বিকার, যেন তিনি সার বুঝছেন, এই গ্রন্থবীজ, এই উৎস থেকে জন্ম নেবে আরও কত গ্রন্থ। কত মৃত্যুচিহ্ন!

কিছুতেই এই বিন্দুটি আমি অতিক্রম করতে পারি না, যেন বিস্তর মদ গিলে থেবড়ে বসে পড়েছি, এই এক সম্ভাবনার কথা শুনে যাচ্ছি উপনিষদের মন্ত্রের মতো; আর প্রতিবারই তা নতুন, এক নয় বহু, অথচ ভিড় নয়, বহুর প্রতিটি এক অনন্য। গ্রন্থবীজ হাতে ধরে আছি, সারা শরীরে গ্রন্থবীজের শিহরন। পাতা মেলছে, অঙ্কুরিত হচ্ছে।

নিমতলা ঘাটে পাঠক হিসাবে চিরন্তন এক পর্যবেক্ষক ও অচেনা, অজানা একজন মানুষ হিসাবে বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমি। সরকারি লাল বাড়ির কেরানি, একশো ভাগ গেরস্ত আমার এক বন্ধু যার কাছে হাত পাতলে সংকটের মুহূর্তে আমি পাঁচ-দশ টাকা ধার পেয়ে যাই, একবার সেই বন্ধুকে বলেছিলাম জানিস নিমতলার ডাক্তারও ঘুস খায়?

কী এমন আশ্চর্যের কথা শোনালি, ধ্যাত।

খুন...

খুন?

হ্যাঁ।

ডাক্তার খুন করে?

না, খুনিদের কাছে ঘুস খায়।

আঠারো থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বয়েসের বহু নারী ও পুরুষের লাশ আমি ওই ঘাটে দেখেছি। তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না, মৃত্যুর কোনো বয়স নেই, মৃত্যুর সময় বলে কিছু নেই। বন্ধু বলল, 'দেখিস না, এইজন্যই তো মৃত্যু নিয়ে এত ফিলজফি'...। 'সময় নয়, বয়স নয়, সাংকেতিক লিপি' আমি তোতলাতে থাকি 'অনেকের হাতে বুকে সাংকেতিক লিপি খোদাই করে দেওয়া হয়েছে।'

এই বন্ধুটির সারল্য আর বিশ্বাসপ্রবণতার ওপর খুব আস্থা ছিল আমার, তাকেও সন্দিগ্ধ দেখে, কাঠ কাঠ যুক্তিবাদী দেখে বড়ো হতাশ লাগছিল। সে বলল 'দ্যাখ, তুই আর পারছিস না, অনেক কষ্ট তো করলি, নিজের শরীর মনের ওপর মায়া হয় না তোর? একটা ছোটোমোটো চাকরি নে এইবার?' সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা সারি সারি লাশ, মরি বামুন এসে মুখ থেকে, বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিচ্ছে সেই থান এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছে শরীরের

অনাবৃত অংশ, সেই অংশে দেগে দেওয়া দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি ও চিহ্ন। মৃতেরা নিহতেরা কি কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ? তান্ত্রিক? বৌদ্ধ? নাকি এক জাতিদাঙ্গায় এদের মৃত্যু হয়েছে? মৃত্যুর আগে এঁকে দেওয়া হয়েছে ওই মৃত্যুলিপি, প্রতিশোধ মন্ত্র? আবার এমনও হতে পারে এইসব মানুষ জীবিত অবস্থায় যে জীবনদৃষ্টি অর্জন করেছিল প্রত্যেকের বুকে কপালে বাণীর মতো ফুটে উঠেছে সেই সত্য। হয়তো একটিই সত্য, হয়তো অজস্র। গভীর রাতে কখনও নিমতলায় যাইনি, কোনোদিন না, ভয় হয়, ওই অন্ধকারে, আগুনে, নিকষ কালো জলের সান্নিধ্যে গেলে আমি বাঁচব না। তবে বিকেলে দূরাগত রাতপাখি ডানার ছায়া ফেললে ওই মৃত্যুমন্দির বা গহ্বরে আমি বহুদিন প্রতিধ্বনি শুনেছি প্রাণ ব্রহ্ম..প্রাণব্রহ্ম..

আর মনে মনে ভেবেছি কবে এই ভূতের হাত থেকে, এই বিকটের হাত থেকে ব্রহ্মের হাত থেকে ছাড়া পাব? কবে এই নিমতলা ঘাটে সুরসমৃদ্ধ ভজনগীত ছাড়া বাকি সব ঝিমিয়ে পড়বে।

ছয়

নিরাপদ নই। অভ্যাস ও নিয়মের গাণিতিক শৃঙ্খলা টাকাকড়ি, নিজেকে পাঁচজনের কাছে কিছুটা প্রয়োজনীয়, কিছুটা ব্যবহার্য করে তোলার যে নিরাপত্তা এখন তা আমি গভীরভাবে চাইছি। একদা কী ঘৃণা ছিল। কী ঘেন্না করতাম এই সামাজিক করুণা, ব্যবসায় এই অংশীদারিত্ব। নিজের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে, নিজের সঙ্গে যুঝতে গেলেই টের পাওয়া যায় আমি এক নই, দুজন আমি। একজন বাঁচতে ব্যাকুল, দরকার হলে সে খুন পর্যন্ত করবে, দাসের দাস হবে, আর একজন কানের ফুটোয় কেবল গরম সিসে ঢেলে যাবে, 'হাত কচলিও না। এ তুচ্ছ, এ ঘৃণ্য, এসবে আকৃষ্ট হয়ো না, কেন বোঝ না তুমি এত সামান্য নও।' দ্বিতীয় জনকে আমি চিনি না, সেই কি ব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, একগাল হাসি মুখের ভিতরে—দাঁতের ফাঁকে, জিভে, মাড়িতে জড়িয়ে একাকার, হাসি গেঁজে উঠছে, ফেনা ফেটে যাচ্ছে, একসময় বমি করার মতো উগরে দিই। দেখি জীবাত্মা জীর্ণ খাবারের কুচি, পিত্তের মধ্যে পড়ে আছে, রাস্তার কুকুর চেটে খাচ্ছে এবং খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দুরারোগ্য ও সংক্রামক ব্যাধিতে বেঁকে যাচ্ছে সেই কুকুর।

মির্জাপুর স্ট্রিটে একটি জীর্ণ বাড়িতে আছি, এখানে আমার প্রায় কর্ত্রী হয়ে উঠেছে এক বৃদ্ধ পরিচারিকা। সে নিঃশব্দে আসে, গ্রাম-দেশের সুর তার কথায়। শব্দদের আগলে রাখে ওই সুর, তাদের কর্কশ হতে দেয় না। কোনো আন্তরিকতা ছাড়াই সকলে তাকে মাসি বলে ডাকে। পুরোনো পাড়া, বন্ধুবান্ধব, জীবিকাকে কেন্দ্র করে আলাপ পরিচয়ে এত যে মানুষ আদতে সেসব এক চিত্রকরের আঁকা জনসমাবেশের ছবি মাত্র, ছবিটির উপরে নিছক কারিগরি দেখাতেই হয়তো পাতলা কুয়াশার একটি আস্তর সৃষ্টি করা হয়েছে, ফলে ব্যক্তি হিসাবে ভিড়ের মানুষরা কেউই মূর্ত নয়, স্পষ্ট নয়। মেসবাড়িতে, রাস্তায়, ছাপাখানার গলিতে পুরোনো পাড়ায়, নিমতলা ঘাটে সর্বত্র রয়েছে চলমান এই চিত্র, সমবেত এক জীবন। ওই ভিড়টির এক কোণে পুঁটলির মতো পড়ে থেকেও পৃথকভাবে ছবিটিকে দেখার, নিজেকে ছবিটির ফ্রেমের বাইরে এক নির্লিপ্ত-নিরীহ

দর্শক ভাবার যে আশ্চর্য দৃষ্টি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি, যে গভীর বোকামিতে দ হয়ে থাকি, সেই বোকামির কথা ভাবছিলাম, মানুষজনের কথা ভাবছিলাম।

ও কীসের দাগ মাসি?

কিছু লয়।

কী বলছ!

কিছু লয় বাপ।

সিঁথি থেকে ডানদিকের ভুরু পর্যন্ত দাগটি অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন সন্দেহ নেই। এই দাগের ব্যাপারে এক পবিত্র গোপনীয়তা আছে হয়তো, আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল মাসি না কাউকে কোনো দিন বলব না। কেরানি-ব্যবসায়ী বেকার-ছাত্র বোর্ডারের দল, যারা তাদের জীবনের তুমুল নাটকীয়তা ঢেকে রেখেছে নিরীহ সাদামাটা আচরণের মধ্যে, প্রেম অর্থ ক্ষমতা বিদ্যার পায়ে নিজেদের মুণ্ডু ধরে দিয়েছে, সেই তারা কেন যে এই তুচ্ছ, সামান্য বিষয়ে এত কৌতূহলী, মাসির গোপন কথা জানতে এত লোভী হয়ে ওঠে এইটি এক ধাঁধা, এক আজগুবি। আর ওরা যত এগোয়, যত গোল করে শিকারি নৃত্যের মতো ঘিরে ধরে, মাসি ততোই পিছোতে থাকে, ধাক্কা খায় ওদের পায়ে, হাতে, আবার পিছোয়, এগোয় এবং বিড়বিড় করে চলে, 'কিছু লয়, কিছু লয় বাপ।' বোর্ডাররা নিজেরাই বলত— কেউ মেরেছিল? দাঙ্গার সময়? যৌবনে দাগা দিয়েছিলে কাউকে? মাতাল স্বামী? খুন হতে হতে বেঁচে গেছ? আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল? বাঁচতে গিয়ে...

সত্যি কত গল্প হতে পারে, কত সম্ভাবনা এই দাগটির, মাসি যেহেতু 'কিছু লয়'—এই মন্ত্রই জপে যায়, মেসটিতে অবসর বিনোদনের জন্য এই দাগ-রহস্য অনন্ত, অক্ষত হয়ে ওঠে, বনধের দিনে, ছাব্বিশ জানুয়ারি, রবিবার এবং প্রধানমন্ত্রী খুন বা গদিচ্যুত হয়েছে বলে শোকপালন কিংবা বিক্ষোভ আন্দোলনজনিত ছুটির দিনে জানা যায় আরও আরও সম্ভাবনার কথা। গল্পের পর গল্প। এখন আমি শূন্যে, মাটিতে, সর্বত্র ওই দাগটি দেখতে পাই। পৃথিবীর যেন ত্বক আছে, মানুষের মতো, সেই ত্বকে এই এক কাটা দাগ জ্বলজ্বল করছে। আরও আশ্চর্য সে দাগটিকে গোপন করতে চায় রঙের জৌলুস আর শব্দের এক সুবিশাল বৈচিত্র্যে, সংগীত থেকে কোলাহলে অস্ফুট ধ্বনি থেকে বিকট শব্দের প্রতিধ্বনিতে, মোহময় নিসর্গ বিস্তারে।

ছায়াপুরীতে আছি, এই নগরে বড়ো বড়ো হরফ ঝুলে পড়েছে বাড়ির দেওয়াল থেকে টেলিগ্রাফ পোস্টের মাথায় বসানো বাক্সে হরফ, হরফ চলন্ত বাসের মুখে ফেস্টুন বয়ে নিয়ে যায়। দীর্ঘ শোকমিছিল, আর্তনাদের মিছিল চলছে। হরফ তাদের হাতেও। তীব্র গর্জন করে উঠছে শব্দরা আর সেই উন্মত্ত কোলাহলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে কলকাতার ভিখিরি, দুর্দশার প্রতীক, ক্ষুধার প্রতিমূর্তি এই ভিখিরির ছবি বিদেশে চালান গিয়েছে, পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার মুখ, যোজনা অফিস কিছু ভাবার আগে, অর্থনীতির অঙ্ক কষার আগে, চোখ বুজে একবার ভেবে নেয় এই মুখটি। ছায়ানগরে বাকি সব ছায়াদের মধ্যে মিশে যেতে, হারিয়ে যেতে অপারগ এই ভিক্ষুকের থেকে বড়ো হয়ে ওঠে ভাঙা এনামেলের থালাটি। থালাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক, থালাটিকে সে প্রতি ঘণ্টায় কতবার স্পর্শ করে, সরায়, তাকায় ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের বৃত্তটির দিকে,

সেসব দেখব বলে হাতিবাগানের মোড়ে ঠায় দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। মানুষের স্রোত ভাসিয়ে দিচ্ছে, ভিক্ষুকটিকে চোখের আড়াল করে দিচ্ছে।

ভিখিরির মতো।

ভিখিরি হয়ে গেছি।

এর থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ভালো...

আমি কতবার বলেছি, কতবার বলেছে অন্যরা, তবু শোনামাত্র বাধ্য হই তার দিকে তাকাতে, আমাদের দৃষ্টি তখন ভয়তাড়িত, ত্রাসে কাঁপে আবার সম্ভ্রমে নত হয়। ভিখিরি ও ভবঘুরের দলে ভিড়ে পড়ব একথা জীবনে অন্তত একবার গুরুত্ব সহকারে ভেঁবেছে, এরকম অসংখ্য মানুষকে আমি চিনি, অসংখ্যের মধ্যে আমিও আছি। সাহস হয়নি। দুর্দশা গোপন রাখা, রক্তমাখা ছুরিটি খুনির যত্ন ও কৌশলে একেবারে হাওয়া করে দেওয়া যায় কীভাবে, অনেক বেশি ভেবেছি সেইসব পদ্ধতি ও তাকে মহান করে তোলে যে তত্ত্ব, হরফের মধ্যে, বর্ণমালার মধ্যে আতশকাচের সাহায্যে তা খুঁজে গিয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে প্রকৃতই শ্রান্ত এখন, এই শ্রান্তির কথা, অবসাদের কথা পাছে উপযুক্ত কাজ পায়নি এমন এক যুবকের হতাশা বলে মনে করে কেউ, সেই ভয়ে সেই লজ্জা ও কুণ্ঠায় মুখ খুলিনি।

দেওয়ালে ছায়া দেখে প্রভুভক্ত কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বেচারা নিজের ভুল বুঝতে পারা মাত্র দেখল একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে কালো গাড়িটিতে উঠে খুনিরা পালাচ্ছে। রক্তের স্রোতের মধ্যে পড়ে আছে প্রভু। এরকম খুন, বা খুনের মতোই, দুঃস্বপ্নের চেয়ে ভয়াবহ, অবিশ্বাস্য ঘটনা, ধাওয়া করছে মস্তিষ্কে হুলো বিড়ালের মতো— স্বপ্নে এইটি অনুভব করছি। শিরায়-শিরায় আঙুলের ডগায় চুলে নখে ছড়িয়ে পড়ছে সেই বিষ, সেই অমৃত। অনন্ত সময় বা যা আমি মহাকাল বলে জেনে এসেছি, সেই বিপুল অনন্ত আমার প্রতিদিনের ক্ষত ও ক্ষরণের ওপর নিয়মিত স্নেহসিঞ্চন করত। খুন হয়েছে সে, বউবাজারে নর্দমার পাশে তার মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। আরও আরও ভয়ংকর সব কাণ্ড ঘটে চলেছে, সত্যিই ঘটছে, আমার একটাই ভয়, উন্মাদ জেনেও উন্মাদ হলেও লোকে কেবলই তা গোপন করে, গোপন করতে করতে, গোপন করার চেষ্টায় নিরন্তর যুক্ত থেকে সে নিজেকে একতাল মাংসহাড়ের একটি স্তূপ মনে করে; সেই স্তূপটির ফাঁকফোকরে, গর্ত ও ঘুপচিতে এক বদ্ধ উন্মাদকে হাতকড়ি দিয়ে লুকিয়ে রেখে, ম্লান হেসে সকলের সঙ্গে করমর্দন করছি, বলছি গভীরতা, হ্যাঁ তা আছে বই কী এবং অন্যরাও কেউ কখনও বলেনি 'দ্যাখ শালা'। কেউ অর্থাৎ প্রত্যেকে, যে কেউ; কেউ অর্থাৎ কেউ না। বিশেষ নির্বিশেষের একজন, বা না-বিশেষ না-নির্বিশেষ। সমস্ত মুখ যেন সামান্য বর্ণনা শুনে লালবাজারের শিল্পীর আঁকা অজ্ঞাতপরিচয় এক আততায়ীর মুখের ছবি, ছবিটিতে মুখের চিহ্ন নেই, সেখানে বৃত্তাকার কিছু আছে, শূন্যে ভেসে যাচ্ছে, ছুটে আসছে এই বৃত্তগুলি। সেই শূন্যের প্রশংসায় গদগদ হয়ে পড়ি, সে আক্রমণ করলে, নিন্দা করলে ভয়ে হাত পা ঢুকে যায় পেটের মধ্যে, শূন্য আমাকে চাবকে জাগাচ্ছে এবং আমি তার সঙ্গে মনে মনে কথা বলি, কথা বলতে বলতে এইসব কথা বলতে বলতে ভাবতে ভাবতে চারদিকে তাকাই, অসংলগ্ন এই প্রলাপই আমি। দেহ নয়, আত্মা নয়, কিছু শব্দ মাত্র, ধীরে সেই শব্দের গহ্বরে, অনন্ত অন্ধকারে

তলিয়ে যাচ্ছি, আমার বুক পর্যন্ত শব্দের দেওয়াল এবং তা কেবলই উঠছে, এইমাত্র বুক ছাড়িয়ে গেল, কিস্‌সু ভাবতে পারছি না, কিস্‌সু না, লোভী ক্ষমতালিপ্সু গাড়ল, তুমি গ্রন্থকার হবে, এই তোমার ভবিতব্য। এঁটো শব্দ, নোংরা শব্দ, শব্দের পোকা ঘেঁটে ঘেঁটে মরবে...

সাত

বলো, বলো। তোমার কথাই শুনতে চাই।

বড়ো আহ্লাদিত হয়েছিলাম। তাদের চোখের কোণ চিকচিক করছিল, মণি ঘুরে যাচ্ছিল অর্ধবৃত্তাকারে। দুশো মজা হবে এখন, সেই মজার অপেক্ষায় কৌতুকের জন্য অধীর চার-পাঁচ জনের সভায় মুখ খোলা দূরের কথা, ভয়ে সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল, পেটের মধ্যে বুকের মধ্যে গজগজ হাজারো কথার ওজনে ন্যুব্জ আমি ক্রমশ শূন্য হয়ে যেতে থাকি। বাচনরীতি, উচ্চারণ-কুশলতা, শ্রোতার মনস্তত্ত্ব আন্দাজের অলৌকিক ক্ষমতা, বাক্যের পর বাক্যে কোনো চিন্তার মূর্তিনির্মাণ, এ আমার সাধ্যাতীত। যে কথাই পেটে আসে, বুকের মধ্যে যত শব্দ আছে পাঁজর ছুঁয়ে, সবই বড়ো তুচ্ছ, বড়ো সামান্য মনে হচ্ছে, সেসবে শিশুর প্রশ্ন ও বিস্ময় নেই, জ্ঞানীর স্থৈর্য ও গম্ভীরতা নেই, কেবল অস্থিরতা, ধ্বংস, অবিশ্বাস, সংশয়, বিষাদ...।

লোকজন বড়ো বেশি বই পড়ে ফেলেছে, আস্ত এক-একটি পাঠাগার ঢুকে পড়েছে তাদের স্মৃতির মধ্যে, ব্যবহারজীবীর কুশলতায় সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা কেতাবগুলি তারা মুহূর্তে টেনে আনতে পারে, একগাল হেসে বলতে পারে, 'দ্যাখো এই জায়গাটা, কী লিখেছে এইখানে?' কেতাবের মুদ্রিত পৃষ্ঠার সামনে নিজেদের নজর স্থির করামাত্র পৃষ্ঠার ছবি উঠে যায় তাদের স্মৃতিতে। স্মৃতি থেকে বই-বলা মানুষজন জন্মাতে থাকে, পিলপিল করে বেড়ে চলে তারা। এখন যে চারজন আমাকে ঘিরে, বসে, বা যে চারজনের মধ্যে বসে আমি কথা বলার অধিকার পেয়ে স্তম্ভিত, জানি না, ঠিক কীভাবে এই অধিকার ব্যবহার করাটা আমার পক্ষে সমুচিত কবে, সেই তারা নিঃশব্দ সময়ের প্রহারে উত্যক্ত, পীড়িত বোধ করছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। নীরবে মার খাচ্ছে যেন।

অভিজ্ঞতার কথা বলো।

তোমার অভিজ্ঞতা...

তাহলে তো বলতে হয় বইয়ের স্তূপে আগুন লাগানোর সেই অন্ধ উৎসবের কথা; বলতে হয় মৃতের মাথা ধড় থেকে আলাদা করার সেই বিচিত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা, সেখানে যেমন আজগুবিকে বাস্তবে এনে ফেলা হয়েছিল, যে সশস্ত্র যুবকের দল সময়ের পিছনে ধাওয়া করে নিজেদের বিচারবুদ্ধিমতো ইতিহাস সংশোধন, বদল ও পুনর্লিখনের চেষ্টা করলে তাদের ধাওয়া করে পুলিশ, সেনা, সমাজের মাথা এবং সংবাদপত্রের লোকজন। ঢুকে পড়তে হয় অতীত সময়ে, সেইসব গলি, জীর্ণ বাড়ি এবং দলিল দস্তাবেজের মধ্যে। অতীতে চলে গিয়ে তারা যে মহাসংঘর্ষ শুরু করেছিল, বাবুঘাটের গঙ্গা.এবং বরানগরে তার রক্তবৃষ্টি দেখা গিয়েছে।

রক্ত ঝরছে ঝরছিল শ শ বছর আগে...

বজ্রব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল বিদ্যার সাগর চাদরটি টেনে নিয়ে, বিপ্লবপ্রমত্ত যুবকের দলকে বললেন অ চ ল অচল অ ধ ম অধম; বললেন, আমি তোমাদের বর্ণমালা চিনিয়েছি বাছা। আর তারা চিৎকার করে উঠল, 'সেইজন্যেই তোমাকে আগে শেষ করব।' বিদ্যাসাগরের মাথা ঘোড়ায় টানা ট্রামের সামনে ছিটকে পড়ে গেল, পুলিশের দল ধবধবে সাদা তোয়ালের মধ্যে মাথাটি তুলে নিল। যুবকরা পেটো ছুড়ল। ইয়ং বেঙ্গল ক্লাবের আধবুড়ো এক মেম্বার বিদ্যাসাগরের রক্তাক্ত ধড়টি নিয়ে সটকে পড়ার মতলবে ছিল।

অ্যাই শালা, ক্যা করতা হ্যায়...

ছাপব স্যার, সমগ্র ছাপব।

গুলির শব্দ পার্ক স্ট্রিটে পিটার ক্যাট রেস্তোরাঁর দরজা ফুটো করে দরজার কাচে মাকড়সার জাল এঁকে দিল। আলো, শব্দ ইত্যাদির চেয়ে দ্রুত গতিতে তিনশো বছরের কলকাতায় ফিরে এল তারা। মালে টইটম্বুর পুলিশ অফিসার ও বিপ্লবী গলা জড়িয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে কাচের দরজা ঠেলে, দুজনের বুক ভিজে যাচ্ছে চোখের জলে 'কী ভুল করেছি, ছ্যা ছ্যা।' এ বলছে 'তুমি আমাকে খুন করো' ও বলছে 'না, না, আমাকে খুন করো, আমার বাঁচা ফালতু, একেবারে ফালতু।' আজগুবি অদ্ভুত সময়ের বিপর্যয় আমাদের বাস্তবতা। যদিও সাল তারিখের ব্যাপারে, রাজনৈতিক ইস্যু ও নেতাদের নামের ব্যাপারে, জাতীয় আয় এবং কল্পিত দারিদ্র্যসীমারেখার প্রশ্নে আমরা ভয়ংকর খুঁতখুঁতে। শিল্পেও আমরা আজগুবিকে, অযুক্তি ও উন্মাদ কল্পনাকে স্থান দিই না অথচ আমাদের জীবনযাপন, বেঁচে থাকার মধ্যেই কী ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা, হাস্যকর তুচ্ছতা ও মহাউদ্ভট সব উপাদান নটরাজ মূর্তিতে অধিষ্ঠিত। সেইটিতে হেজে গিয়েছি। আটপৌরে জীবনের, ধান চালের হিসাবের, প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে বেরিয়ে আসার এক মরিয়া আকাঙ্ক্ষায় দু-হাতে কলুষ লাগিয়ে চলেছি ভবিষ্যতের কেতাবটিতে, সাদা ক্যানভাসে এবং সেলুলয়েডের ফিতেয়; তাকে পরিণত করছি ভয়ংকর রকম একটি ব্যবহার্য পদার্থে, যেহেতু আমরা বাঁচব এভাবেই, তাতে কোনো নড়চড় হবে না, তাই ব্যাখ্যা ও যুক্তির জন্য, এই বাঁচাকেও মহান করে তোলার জন্য বেছে নিয়েছি শিল্পকে, যার একমাত্র কাজ বাস্তবের গু-মুত সাফ করা। এই ধোবিখানায় উৎপাদনের কোনো শেষ নেই...

ধোবিখানা!

বাহ্! বাহ্!

এই বছর, এই একানব্বই সালের আঠাশ জানুয়ারি অবজার্ভার পত্রিকায় একটি ভ্রমসংশোধন প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের ১৭৯১ সালের পঁচিশ ডিসেম্বরের সংস্করণটিতে মোজার্টের মৃত্যুসংবাদে বলা হয়েছিল মোজার্ট মারা গিয়েছেন গত ১৫ ডিসেম্বর। দুশো বছর পরে অবজার্ভার স্বীকার করল, বড়ো ভুল হয়েছিল, মহান ওই সংগীতশিল্পী মারা যান ১৭৯১ সালের ৫ ডিসেম্বর। দুশো, পাঁচশো হাজার বছর ধরে সংশোধন, সংশোধনের সংশোধনে কেটে যেতে পারে। নির্ভুল, নিখুঁতের পথ শেষহীন, দীর্ঘ জীবনের পর জীবন পেরিয়ে, সহস্রাব্দের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে...

আট

বালকের রক্তাক্ত জিভটি থালায় সাজিয়ে বৃত্তবন্দি মানুষদের দেখাচ্ছিল। কেউ বিশ্বাস করছে না সত্যি সত্যি জিভটি কাটা হয়েছে বলে, তারা জানে এ হল ভেলকি, যদিও ভেলকির জন্য, অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্য ভিড়ের মানুষ এক অখণ্ড খিদে বহন করে চলেছে। আর যখন এই ভেলকি তাদের অসহায়তা, তাদের শোক দুর্দশার নরম জমিতে, দগদগে ক্ষতে খুঁটি গেড়ে দেয়, যখন বলে 'বোবার বোল, অন্ধের দৃষ্টি, খঞ্জের গতি রয়েছে এই মন্ত্রপুত জলে' তখন বোবা অন্ধ খোঁড়ারা, তাদের আত্মীয়রা ভেলকিবাজের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটতে থাকে। ভেলকির কথা আর স্মরণে থাকে না। দুর্দশা থেকে আমাদের উদ্ধার করো, আমাদের দৃষ্টি দাও, গতি দাও।

উদ্ধারকর্তা এবং পঙ্গু মানুষ ছাড়া কিছুই কি নেই? আবার পঙ্গুই উদ্ধারকর্তা, উদ্ধারকর্তা পঙ্গু।

আত্মপ্রেম, আত্মগ্রাসী এই প্রেমে নিমজ্জিত থেকে ক্রমশ নিজেকে পঙ্গু বলে চিনে নিতে হচ্ছে। একটু একটু করে জানতে পারছি আমার মানসিক পঙ্গুত্বের কথা, খোলসের পর খোলস ঝরে যাচ্ছে আর অসহায়তার গভীরে প্রবেশ করছি। স্বপ্নের দৃশ্যে ভাষণ দেওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে কী অপদস্থই না হলাম। এখনও সেই হো হো হাসি কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবে এতটা না হলেও এর আভাস অনেকবারই পেয়েছি। সাহিত্য, রাজনীতি কিংবা একা মানুষের অনুভূত চিন্তার কথা বলতে গিয়ে বহুবার আমি লেজেগোবরে হয়ে পালাবার পথ পাইনি। যদিও জানি আমার ভাবনায় কিছু অভিনবত্ব, কিছু গভীরতা ছিল, এমনকি সেইটির উপর বসে থেকে দিনের পর দিন তা দিয়ে গেলে একটি জন্ম অনিবার্য ছিল। তাহলে কি আমার জিভ নেই? যেটুকু জিভ আমি পেয়েছি, কথা বলার যেটুকু শক্তি আছে, তা কি এক মস্ত প্রতারণা? না কি কিছুই গভীর নয়, এঁদো পচা জলের গর্ত, অন্ধকূপ ও খানাখন্দের মতো শূন্যগ্রাসী, শূন্যতা সন্ধানী বহু খোদল আমি বহন করে চলেছি। বাস্তবের সঙ্গে টোক্কর লাগামাত্র সে বলে উঠছে, 'ও কিছু নয়', বলেছে ফালতু। 'ফালতু' সরাতে সরাতে সিগারেটের শূন্য প্যাকেট, চকোলেট মোড়া ফয়েল, শূন্য দেশলাইয়ের খোল, রাংতা, পোড়া সিগারেট, বাসের টিকিট, ডাকের খাম ফেলতে ফেলতে, ছড়াতে ছড়াতে ফালতু হতে হতে আর ফালতু হওয়ার অমোঘ ভবিতব্যের নির্দেশে চষে ফেলেছি কলকাতা।

বালকেও জানে...

সবাই জানে হে

তারা হইহই করে উঠল, চোখের কোণের সূক্ষ্ম কৌতুক এখন ঠোঁটের লাগাম ছেঁড়া হাসি, হো হো শব্দ। এখন টিপ্পনি কেটে উঠল বৈঠকি চালে:

ভোলা সে কি কথার কথা, মন যার মনে গাঁথা

শুকাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িত লতা॥

কথার ধোকড় নই, চুটকির সঞ্চয় রসালাপের ভাঁড়ার শূন্য অথচ বুকের মধ্যে সমুদ্রগর্জন, তার স্রোতাঘাতে ধ্বস্ত হতে হতে, ভেঙে পড়তে পড়তে আমি নিস্তার চাই আর সেই চারজন

হাসতে থাকে হো হো। এইটি স্বপ্ন যার মধ্যে বাস্তবের টুকরোটাকরা ঢুকে পড়ে বিশ্বাসের চূড়োয় তুলে দিয়েছিল আমাকে, ভাবছিলাম মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সভায়, অজস্র অচেনা লোককে প্রাণের কথা বলার চেষ্টায় আমি কেবলই নিজেকে উপহাসের একটি বেদিতে, ভাঁড়ের হাড়িকাঠে তুলে দিয়ে কেমন জড়ভরত হয়ে গিয়েছি, দেখছি সার সার বন্দুক। বক্তা আমিকে তাক করে অগ্নি উদ্‌গীরণ করছে।

স্বপ্নেও নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। কৃশ এক তরুণ আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল, কীসব বলে চলল সে। দেখি কোলাহল স্তিমিত এখন। হলঘরটি ফাঁকা, সেই চারজন নেই, অজস্র নেই, এমনকি তরুণটিকেও দেখতে পাচ্ছি না, কে একজন আমার হাতটি উষ্ণভাবে ধরে বলছে, অনুরোধ করছি দয়া করে নিজেকে শান্ত করুন, প্রকাশের ব্যগ্রতা কমান, বমি সামলে নিন, প্রস্তুত হোন, অপেক্ষা করুন, জন্মাতে দিন, ধাত্রী হোন...

নয়

নিমতলা ঘাটের নোংরা জলে পচা ফুল লতাপাতার সঙ্গে একদিন আমার পায়ের কাছে এসে ঠেকল কেরানিবৃত্তির নিয়োগপত্র, এক মহার্ঘ উপহার। ঠিক তার দিন কতক আগে রাগ, বিরক্তি ঘেন্নায় আমি ভারসাম্য হারাতে বসেছি। ভেবেছি, একটা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে এইরকম আধপাগল স্বভাব, স্পর্শাতুর অভিমানকে ছেঁড়া জুতো জ্ঞানে ছুঁড়ে ফেলতে না পারলে আমি বাঁচব না। আর বাঁচতে আমাকে হবেই, সর্বাগ্রে বাঁচা...

নিমতলা ঘাটে সৌভাগ্য ভেসে আসেনি তবু আমার এরকমই মনে হয়েছিল। আসলে যা ঘটেছিল তা হল ভাদ্দুরে গরমের এক দুপুরে একটি টেবিল নিয়ে একা বসেছিলাম আর চারদিকে মানুষের গুঞ্জন, তাদের হাত নাড়া, মুখ নাড়া দেখছিলাম, সেসব অর্থহীন ভাঁড়ামি ভেবে থু থু করছিলাম। ১৯৭৯ সালের সেই গ্রীষ্মে বিকেল তিনটের সময় আমার অজান্তে, অদৃশ্য একটা ফাঁস ছুটে আসছিল। ওই ফাঁসটির গলা চিনতে কোনো ভুল হয়নি। আর আমি তাকে চিনতে পারি এক দশক পরে। এই ফাঁসটি সেই মহার্ঘ উপহার। এই পুরস্কারকে দণ্ড বলে জেনেছি আরও পরে। অথচ, বলার সময়, লেখার সময়, আগে পরের যে গোলমাল ঘটেছে তা লিখনপদ্ধতির অনিবার্য দূষণ। কালানুক্রমিক নয় এই রচনা। এখানে অতীতের আদি-মধ্য-অন্ত নেই, অতীত এখানে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেয়, তার আর কোনো বিভাজন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্ভব নয়, এ এক অখণ্ড অতীত। অনুভূতির তীব্রতার যেসব রকমফেরে আমি আন্দোলিত হতাম, আশায় ঝকঝকে, হতাশায় ম্লান প্রায় যেন মুছে যেতাম, রাগ চড়ত মাথায়, পাগল হয়ে যেতাম ভালোবাসায়, ঠিক এক দশক আগে এক ভাদ্দরের দুপুরে শুরু হয়েছিল অনুভূতির মালাবদল। টান টান খাড়া জীবন, 'হ্যাঁ' এবং 'না' এই দুটি খণ্ডে (সাদা-কালো ছবির যুগে জন্মেছি তো) বিভক্ত ছিল আমার পৃথিবী: সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত ওই দুটি খণ্ডের মধ্যে সাময়িক সেতু হত, কখনো-বা দুয়ের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ ঘটত কি না, তা, এখনকার মতো শান্ত আলস্যে কালের দু-পাটি দাঁতের মধ্যে উদাস নির্বিকারভাবে পড়ে

থাকা তখন অসম্ভব ছিল। তখন ছিল জঙ্গিদিবস। প্রতিক্রিয়াপ্রবণ অস্থির সময়। এখানে, ওই দিনরাত্রি রাত্রিদিনের জন্য আমি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারি, হায়!

প্রখর দুপুরটি গরম শ্বাস গিলে মধ্য কলকাতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রীষ্ম খ্যাপা ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড় নাচাচ্ছে আর সেই খ্যাপা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দু-চারজন ঢুকে পড়ছে পুরু দেওয়াল, চওড়া থামের এই গণ-আড্ডাস্থলটিতে। প্রবীণতম বেয়ারা রামুদা একটি টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'ডাকছে'।

রামুদার আঙুলটি সেদিন লক্ষ করিনি, সামান্য মনোযোগী হলে পরবর্তী ঘটনাবলি হয়ে উঠত একটি পথনির্দেশ। দূরের টেবিলে তিনটি পাকা মাথা একটি বৃত্ত রচনা করে রেখেছে, পাকা মাথার সেই বৃত্তটি আমাকে ডেকেছে, পাশের টেবিলের দুই যুবক দেখেছিল নীল খদ্দরের পাঞ্জাবি রামুদাকে কিছু বললেন এবং রামুদা সেই বার্তাটি বয়ে আনল আমার কাছে। এখন তারা কৌতূহলে বিস্ময়ে আমাকেই দেখে, শুধু দেখতেই থাকে। নীল পাঞ্জাবি এবং পাকা মাথাটিকে আমি চিনি, আমি ওই প্রতিপত্তিশালী মানুষটির আস্তাবলের ঘোড়া নই এবং ওঁর ঘোড়াগুলির হ্রেষা, লেজ ও খুর আমার পরিচিত। কেন উনি আমাকে ডাকবেন, কেন?

'আপনি কি এখনও বেকার?' এই কথাটি এমনভাবে বললেন যেন ওর পাঞ্জাবির বুক পকেটে নাম না-লেখা চাকরির একটি চিঠি রয়েছে। আমি হ্যাঁ বললেই উনি সেই চিঠির শূন্যস্থানে কিছু লিখে আমার হাতে তুলে দিতে দিতে কোনো একটা ঠিকানা বা আর একটি পথনির্দেশ দেবেন। একটি কাল্পনিক রেখা টেনে শত্রু-মিত্র বিভাজনের কাজটি অনেক আগেই সেরে ফেলা হয়েছিল। নীল পাঞ্জাবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বৈরিতার, যুদ্ধের, এ নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। চাকরি বেশ বড়োসড়ো এমন একটা উৎসব যার আয়ু জীবনব্যাপী। মৃত্যু তা নয়। মৃত্যুর উৎসবের কথা কখনও শুনিনি, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, প্রশ্নটির প্রতিধ্বনি শুনছি 'আপনি কি এখনও বেকার?'

বেকারত্ব এ শহরে এতটাই স্বাভাবিক ঘটনা যে নেহাত অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা না দিলে বেকারত্বকে বেশ সহজভাবেই নেওয়া হয়। প্রুফ রিডিং, বিভিন্ন কাগজে পুস্তক-সমালোচনা, টুকটাক অনুবাদের কাজ এবং ছাত্র পড়িয়ে আমার একরকম চলে যাচ্ছিল। মনে মনে হিসেব করছি এই লোকটিকে উদার, মহানুভব হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত হবে কি না। আর পরক্ষণে মনে হচ্ছে, দেখাই যাক না কী বলেন, আমি তো সবটা শুনেও প্রত্যাখ্যান করতে পারি। এই সংশয় থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছি না। কখনও চাকরির জন্য দরখাস্ত করিনি, বেকার ভাবিনি নিজেকে, অথচ এখন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মতো গুরুতর শাস্তি হালকা করে নিতে কবুল করলাম, 'হ্যাঁ আমি এখনও বেকার।' কথাটা যেরকম সম্মানের সঙ্গে, একটু কেটে কেটে বলতে পারলে মর্যাদা রক্ষা হয়, আমি ঠিক সেইভাবে *নিষ্কম্প উচ্চারণে বলতে পারিনি। বড়ো সংকটে পড়েছিলাম, নড়বড়ে হয়ে পড়ছিল আমার শরীর, কাঠামো, একটু যেন ঝুঁকে পড়েছিলাম পাকা মাথাটির দিকে।*

বিশাল লম্বা ধাঁচের একটি টেবিলের সামনে বসে পড়লাম ঠিক তার পরের দিন, তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা এবং শুরু হয়ে গেল ত্রিশ দিনের মাসমাইনের নিরাপত্তা-বৃত্তান্ত। এই

পরিস্থিতির বর্ণনাযোগ্য একটিমাত্র বাক্য আছে : সাদা পাত্রে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার ঘিলু, তিনি দেখলেন সেই তালটি স্পন্দিত হচ্ছে এবং টেবিল থেকে একটি কাঁটা তুলে নিয়ে ফুটিয়ে দিলেন একেবারে মাঝখানটিতে।

দৃশ্যটি যতই নিষ্করুণ হোক আমি এই ঘটনায় সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম, বাঁচার প্রেরণায় মেতে উঠলাম, মেসে ফিরে সমস্ত জানলা হাট করে খুলে দিলাম, রেডিওর নব ঘুরিয়ে দিলাম, বালতি বালতি জল ঢেলে স্নান করলাম, সেতারের শব্দে ভেসে যেতে লাগল দোতলার ছোট্ট ঘরটি, তা হয়ে উঠল এক প্রমোদতরণি, বোর্ডাররা ছুটে এল হাঁ-হাঁ করে, সবাই ব্যাকুল জানতে —আমার কী হয়েছে। ঘটনাটি কী। 'কিছু না, কিছু না, ধ্যার বাবা, বলছি তো কিছু না' বলতে বলতে সবাইকে ঠেলেঠুলে রাস্তায় নেমে আসি।

দশ

বীভৎস, বিধ্বংসী যুদ্ধের পর নির্জন প্রান্তরে সহায়সম্বলহীন পদাতিক সেনার জীবন তাহলে এতদিনে শেষ হল, আমি শাপমুক্ত হলাম। এবং এই একঘেয়ে কষ্ট, মরিয়া অভিযান, অন্তর অবধি শুকিয়ে আসার মধ্যে কল্পনার কণাটুকু নেই। ১৯৭০ সাল এ শহরের মানুষের কাছে রক্তচিহ্নিত, বিপ্লবের কাল। কলকাতার অজস্র পাঠাগার, বইয়ের দোকান, পুরস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় ভরে গেছে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ, বিপ্লবের সারাৎসার, বিপ্লবকালীন বিভিন্ন ঘটনার, ব্যথার সেই কালপঞ্জি থেকে ইতিহাসের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কারের চেষ্টা, এমনকি আন্দামানে দণ্ডিত স্বদেশি যুগের বিপ্লবীদের স্মৃতিকথাও রয়েছে পুস্তকের এই ভিড়ে।

সত্তর-বাহাত্তর সালে মৃত্যুর পরোয়ানার পিছনে একঝাঁক বুলেটের শিস্ ধ্বনি শুনতে শুনতে দম বন্ধ করে একদল যুবক কলকাতার রাজপথ, অলিগলিতে ছুটছে এই দৃশ্য কে না দেখেছে। তাদের সবাইকে যেমন আমি চিনতাম না, তেমনি তারাও অনেকেই জানত না যে এই মহান আক্রমণ ও পলায়নে, আত্মঘাতী যুদ্ধ ও পরিবর্তনের এই বিপ্লবী স্রোতে আমিও ছিলাম। চিত্র পরিচালকদের কেউ কেউ পর্দা জুড়ে দেখিয়েছেন সেই বিপ্লবী ছুট, সাউন্ডট্রাকে ধরে রেখেছেন হাপরের শব্দ হুম্ হুম্। বাস্তব ইতিহাসের খাদ্য হওয়ার আগেই সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে, সাহিত্য সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার আগেই এভাবে পর্দায় চলে আসায়, ঘটনাটি কেমন ধারাবাহিক, ছেদহীন হয়ে ওঠে। যেন ম্যাকনামারাকে ধিক্কার জানাতে যে মিছিল হয়েছিল, সেই মিছিলটি পুলিশের ভ্যানে বোমা নিক্ষেপ, পুলিশের তাড়া, ছাত্রদের দৌড়, রিভলভার গর্জন, দৌড় একেবারে সটান চলে এসেছে সাদা পর্দায়। বাস্তবের এই চোলাই নিয়ে আজ আর কিছুই বলার নেই, এই প্রসঙ্গ আর আমাকে উত্তেজিত করে না, এক বর্ণ ভাবি না এ নিয়ে। সময়ের বিপর্যয় নিয়ে এক রহস্যে জড়িয়ে যেতে থাকি, রেশম সুতোর মতো সেই রহস্যের সহস্র বাহু আছে, নরম নেশায় ডুবে যেতে থাকি। নিরাসক্ত অথচ শ্লেষের হাসি এড়াতে পারি না, যেন ত্রিকালদর্শী হয়েছি, বেদনা, যন্ত্রণার মুহূর্তেও হেসে ফেলেছি। দেখতে পাচ্ছি হু হু করে ছুটে আসছে ভবিষ্যৎ, বর্তমানকে ঠেলেঠুলে জায়গা করে

নিচ্ছে, তাকে অতীত করছে, ইতিহাসের নথি করে তুলছে এবং পরমুহূর্তে নথিটিকে অবধি আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েও বলছে এতে নতুন কিছু নেই। নকশালপন্থী বিপ্লবকে আশ্রয় করে আমি একটি মহাকাব্য ফেঁদে বসলে সেটি সম্পর্কেও সঠিকভাবেই কেউ-না-কেউ বলত, সেই এক পুনরাবৃত্তি। বইয়ের দোকান, পাঠাগার এবং পুস্তক-তালিকায় এই সিরিজের আর একটি বই যুক্ত না হওয়ার কারণ আমার ব্যর্থতা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আমার রচনাগুলি সমাদৃত হলে, পাঠক-সমর্থন পেলে, জ্ঞানীগুণীর প্রশ্রয় পেলে আমি যে একজন গ্রন্থকার হয়ে যেতাম, লেখক হয়ে যেতাম সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ব্যর্থতা, আমার রক্ষাকবচ, সেই আমাকে বাঁচিয়েছে একজন সম্ভাব্য লেখকের হাত থেকে। আর নীল পাঞ্জাবি, সেই পাকা মাথাটি, আমার শত্রুপক্ষ, তার কাছেও কৃতজ্ঞ। প্রকৃতই শত্রুর থেকে শ্রেষ্ঠ মিত্র কেউ হতে পারে না।

যাকে ক্লিশে বলা হয়, শত্রু-মিত্র সংক্রান্ত এই বাক্যটি একেবারে তাই, মজা হল এক-একটি ক্লিশের কত না স্তর দেখতে পাই। আগুনের তাত ও ধোঁয়া-মেঘ হ্রাস পাচ্ছিল। চাকরিটি পাওয়ার পর মনে হল অতীত বিদ্রোহের গর্ভেই হয়তো দাসত্বের বীজ লুকিয়ে ছিল, সময়ে তা অঙ্কুরিত হয়েছে। পরিচিত লোকজন এখন আমাকে দেখলে এড়িয়ে যায় না, তাদের চোখ বিস্ফারিত হয় না। বরং স্বস্তি হয়। তারা খুশি। আস্ত একটা চাকরি এর থেকে দুর্লভ কী আছে। পিঠে হাত রেখে তারা বলে যায়— তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে— বেশ সুস্থিত লাগছে। কর্মব্যস্ত, অসীম চাঞ্চল্যপূর্ণ শহরের জীবনপ্রবাহের ফাইল, ক্রমিক সংখ্যা, দশটা পাঁচটার অঙ্গীভূত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। সামান্য সাধারণ মানুষ একজন। যার স্মৃতি সামান্য নয়, নগণ্য নয়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের স্মৃতি। ভাবি, সেই ইতিহাস, স্মৃতির ওই মজুত সত্য না কি তার বিরুদ্ধে প্রায় দিন যেসব প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে তারা সত্য। এই ধন্ধ, এই সমস্যার কিনারা করে উঠতে পারি না, খোঁড়াতে থাকি, কেবল খোঁড়াই

তুমি গল্প বানাতে পার না।

আমি তা চাই না।

অক্ষমতা চেপে রাখা যায় না।

গল্প বানানোয় আমি ওস্তাদ একথা বলেছি কি?

তা বলনি ঠিকই। তাহলে লেখ কেন?

পাঠক শিকার করতেই যদি ব্যর্থ হও, যদি প্রতিটি বয়স্কের মধ্যে সুপ্ত শিশুটিকে প্রত্যক্ষ করে তার অন্তহীন রাক্ষুসে কৌতূহল মেটাতে ঘটনার বর্ণময় কার্পেটে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে রচনা করতে না-ই পার তাহলে কেন নিজেকে ধ্বংস করছ বিমল, অযথা গোপন অহংকার বয়ে বেড়াও কেন, কারো কোনো কাজে লাগ না, সমাজের কাজে, রাজনীতির কাজে সংসারের কাজে...

বন্ধু আমাকে ফেরাতে খুবই আগ্রহী, সে বিশ্বাস করে না মানুষের সহজ ভালো লাগা, মন্দ লাগার পরিকল্পনাই সব, উপন্যাস নির্মাণেরও একটা রীতি আছে বিমল, আর তুমি যে তা একেবারে জান না এমন নয়। প্রেরণাহীন সেই রচনাটির জন্য আট ঘণ্টা মজদুরির পথে তিনটি

মাস লেগে থাকলে আমি তা উৎপাদনও করতে পারি—বন্ধুর বিশ্বাস। আমি কিছুটা অন্তত নিজেকে জানি, হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, পাগল, তুমি পাগল হলে উদয়ন, হয় নাকি ধ্যাত...।

দৃষ্টিভঙ্গি নেই অথচ দৃষ্টি আছে, উদ্দেশ্যচ্যুত কাজ আছে, পরিমিত ব্যস্ততা আছে আর এইসবে আমি ক্রমেই আত্মস্থ হতে থাকি। কিছুই স্পষ্ট নয়, দিন রাত, রাত দিন কুয়াশাবৃত্ত। অফিস থেকে বেরিয়ে আসামাত্র, চৌরঙ্গির ভিড়ে পরিচয়হীন, এ শহরে সফরে আসা বিদেশির মতো এটা সেটা অবাক হয়ে দেখি, কোথাও বা দাঁড়িয়ে পড়ি দু-দণ্ড। ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখছি দেখছি দেখছি...

পা থেকে মাথা পর্যন্ত হয়ে উঠছি এক নিরুদ্‌বেগ, রাক্ষুসে দর্শক।

এগারো

আজ খুশিতে আছি।

হদ্দ গরিবের ছেলে, খাওয়াপরার নিশ্চয়তায় আনন্দে গলতে শুরু করেছি; শরীরের নিরাপত্তা, বেঁচে থাকার নিরাপত্তা এত তৃপ্তি দিয়েছে যে জীবনের তিতকুটে স্বাদ, এবং বিষ আমি আর এখন বিন্দুমাত্র অনুভব করি না। হায়! এই দাসের, গোলামের গোলাম এই আমির কী হবে! মহান্‌(!) রচনার খিদমত করেছি তখন, পকেটে যখন বড়ো বড়ো ফুটো ছিল। ওই ছিদ্রের তাড়নায় প্রহারে সর্বদা জ্বলতাম, প্রমাণের একটা দায় ছিল, যেভাবে হোক দেখিয়ে দিতে হবে এই আমি ফ্যালনা নয়। আবার চাইতাম আমাকে গ্রহণ করা হোক, গণনা করা হোক প্রকৃতই বিশেষ হিসেবে। অতীত খুবই জানা সিলেবাস, কয়েকবার পড়ে ফেলা একটি বই। সুনীলের, শ্যামলের, উদয়ন, বাসুদেব সব্বার এই এক প্রকার, আত্মপ্রকাশ। বিমলেরও। যতই কারিগরির জাদু ভেলকি, মোহাবিষ্ট করার মতো চমক ও কারুকাজ থাকুক না কেন। সূক্ষ্ম জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচা, বাঁচানো এক কঠিন কাজ। কী করে একটি রচনার সৎপ্রেরণা শনাক্ত করা যায়?

প্রেরণার খোঁজে থাকি, তাকে উৎস ভাবি আর খুঁজতে থাকি কোথায় সে। প্রেমে, সংঘর্ষে তিক্ততায়...

গোষ্ঠীবিদ্রোহের দিনে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ তথা সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসাবে খাটিয়ে মানুষের মাথায় চড়ার উন্মত্ত আবেগের দিনে যে আক্রোশপুঞ্জ বয়ে বেড়াতাম কী ধ্বংসাত্মক ছিল সেই শক্তি। সেই শক্তি সেই প্রয়াস খুঁজে নিতে পেরেছিল দু-চারজন ভক্ত, দু-চারজন মুগ্ধ পাঠক, এখন সময়ের ব্যবধানে বাসস্টপে, বইমেলায়, আর্টফিল্মের শো, চিত্র প্রদর্শনী বা একদিন যেমন মাধব মালঞ্চী কইন্যা দেখতে গিয়ে বিরতির সময় একজন হাতের কব্জি চেপে ধরল শক্ত করে। যেন সে কোনো, পলাতক আসামিকে ধরেছে, নষ্ট করছ নিজেকে। আশ্চর্য সেই হাত-ধরা মুহূর্ত, কখনও ভাবিনি, কখনও জানতাম না এরকম একটি সূত্র আমি প্রশ্নকর্তাকে বলি: দল থেকে ঝরে পড়লেই একা হওয়া যায় না, সাহিত্য আমার কাছে ছিল একা হওয়ার সাধনা...

তাতে কতদুর এগোলে?

কিছুটা। এখন লাঠি ছাড়াই চলতে পারি।

জন্মগ্রহণের আকস্মিকতা নয় শুধু, ব্যর্থ বিপ্লব, অন্ধ ভ্রমণ এবং মহামূল্যবান চাকরিটি পেয়ে যাওয়া, বার দুই-তিন প্রেমে ভেসেও বিবাহ এবং পরিবার বন্ধনের এই দেশে অবিবাহিত থাকা ইত্যাদি আকস্মিকতার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বলে মনে হয়েছে, নিজের অজান্তে যেন ভাগ্যবাদী হয়ে পড়ছিলাম। সমস্তই ঘটেছে অন্যান্য ঘটনার প্রভাবে, অন্যান্যরা আরও অন্যান্যের প্রভাবে, অজস্রের মধ্যে এভাবে ডুবসাঁতারে অনেক পিছনে চলে যাওয়া সম্ভব আমার জন্মেরও আগে। বাস-ট্রামের লোকজন, বাজারের থলে বহনকারী, ছেলেমেয়ের হাত ধরে হন হন করে হেঁটে যাওয়া মানুষ, ভিখিরির গান ও মাতালের প্রলাপের এক ব্যাপক বিশৃঙ্খল শব্দ-বিস্ফোরণ ও খণ্ডিত অজস্র ছবির অরণ্যে তার নির্দয় নৈরাজ্যের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে ভ্রমরভুরু সেই মেয়েটি একদিন 'শুনছ শুনছ' বলে অস্থির করে তোলে। বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে নয়, পুরোনো নাম দেওয়াই এখনকার প্রবণতা, যে জন্য, সে ভ্রমর, হয়তো ভেবেছিল ধেড়ে লোকটাকে নিয়ে একটু মজা করবে তাকে নেড়েচেড়ে দেখবে, হয়তো কিছু ভালো লাগছিল না বলে নিজেকে খুশি করার ছক সাজাতেই ভ্রমর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সত্যিই এতটা নিরাসক্ত?'

এই প্রশ্ন, এই সংলাপের নিশ্চিতভাবেই একটা পরিবেশ ছিল এবং যেমন হতে বাধ্য সব কিছুরই ইতিহাস থাকে। আমি এক্ষুনি মনে করতে পারব না। ঠিক কোথায় ভ্রমর কথাটা জানতে চেয়েছে, পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনের সামনে? না কি বেহালার মোড়ে? সেদিন কি বৃষ্টি ছিল? আর কবে, কখন ভ্রমরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তারপর কতবার দেখা হয়েছে এইসব ঘটনাপঞ্জি আমার আশঙ্কা ভ্রমরকে স্পষ্ট করার বদলে ম্লান ও বৈশিষ্ট্যহীন করবে, ঘটনাপঞ্জি ভ্রমরের মতো এক আস্ত যুবতীর হাত, পা, ঠোঁট ছিঁড়ে খাবে।

আচ্ছা করে হলুদ মাখানো হল তাকে, চোখের পাতা, নাসাপুট, ঠোঁট, কান চুলের প্রতিটি গোড়ায় হলুদ প্রবিষ্ট এখন, তারা হাসছিল হিহি করে, দোল খেয়ে ভেঙে পড়ছিল এ ওর গায়ে আর মাঝখানে ভ্রমর বা এক যুবতী। রহস্যের প্রতি দুর্বলতা পুষে রাখে যারা ভ্রমর তাদের একজন। 'বেঁচে থাকার দুঃসাহসিক অভিযান' এইরকম থিয়েটারি কথা বলে শৌখিন ভ্রমর। গায়েহলুদের দিন ভ্রমর তার বিয়ে নাকচ করে দিতে পেরেছিল, 'চব্বিশ ঘণ্টা কার্তিকের মতো ওই লোকটার সঙ্গে থাকতে হবে, ওরে বাবা আমি মরে যাব।' খুব অশান্তি হয়েছিল কিন্তু ভ্রমর টলেনি।

আকস্মিকতা দু-হাত ভরে দিয়েছে ভ্রমরকে, বিয়ে ভেঙে দেওয়া ভ্রমর সেইদিনই মফস্‌সল কলেজে মাস্টারি পেয়ে যায়, আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল সে, ঝুঁকি নেওয়ার নেশা ওইদিন আরও পাকাপোক্ত হল। এইসব গল্প ও বৃত্তান্ত আমাকে বলেছিল কিন্তু এই বৃত্তান্তগুলিকে তারিফ করার আগ্রহ আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। কলেজের মাস্টারির সঙ্গে অভিযান ও দুঃসাহসিকতাকে কিছুতেই মেলাতে পারিনি।

আরও কত পর্দা উঠলে যথার্থ নাটকটি দেখতে পাব, যথার্থ চরিত্র, তাদের খুঁতহীন অঙ্গ -সঞ্চালন, এই বিশুদ্ধের কোনো ধারণা নেই আমার, শুধু মরণশীলের অনুভূতিতে প্রচ্ছন্ন ভয়

নিঃশব্দে এগিয়ে আসে বুঝতে পারি। মৃত্যু ঘাড় মটকে থেঁতলে দিয়ে যাবে একদিন, তার আগে কি নাটকটি দেখতে পাব? অমৃতসমান কথা শুনতে পাব কি?

অথচ কী হাস্যকর লাগে প্রত্যেকের অভিনয়, বড়োবাবুর, ক্যাশিয়ারের, ওড়িশি নর্তকীর, সদালাপী অধ্যাপকের। ক্ষমতার পাল্লার দিকে বাজ দৃষ্টি রাখা রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম হওয়ার চেষ্টা। নেহাতই এক আমোদপ্রিয় দর্শকের ভূমিকা আমার, দীর্ঘদিন ওই ভূমিকায় থেকে পাগল হয়ে যেতে পারে যে কেউ, মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ছিঁড়ে ফেলতে পারে পর্দা, চটাস চটাস করে চড় বসিয়ে দিতে পারে অভিনেত্রীর গোলাপি গালে। সে অন্য নাটক, অন্যরকম রিহার্সাল দরকার সেজন্য, সেই অন্যরকম থিয়েটারের সম্ভাবনাও আখড়া খুঁজে নিয়েছে, এরা যদি শনিবার নাটক করে তবে অন্যরা করবে পরের বৃহস্পতিবার।

ভ্রমর।

কী?

তুমি নাটক কর না কেন?

ভ্রমর গায়ে মাখে না, সে খলখল করে হাসতে থাকে, তার গোটা শরীরে হাসি বাদ্যযন্ত্রের মতো বাজছে, 'তুমি কেন ফুটবল খেল না? কেন? কী?' কেন তুমি ভ্রমর, তুমি কেন বিমল, কেন কেন এইভাবে আমরা কথা বলতাম? কোনও মানে নেই, না কথার, কথা না-বলার চেষ্টায় আশ্চর্য ভ্রমর আমি কিংবা ভ্রমর ও অন্য কেউ।

অন্ধ নই তবু কত কিছু দেখি না, চোর আমার চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে যায়, এক যুবক অনর্গল বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে, একরাশ মিথ্যে বমি করে চলে, ওই ছোকরা একদিন সার্থক ঔপন্যাসিক হবে, আমি তার মিথ্যে কথা ধরতে পারি না, প্রাজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ একটি টাক মাথা মুখস্থ পড়া বলে যায়, আমি শুনি না, দেখি না, যেমন ভ্রমরকে বলি না, 'তুমি সময় কাটাতে চাও মজা করে সেটা ঠিক আছে কিন্তু প্রেমের কথা বল কেন।' আবার একথাও বলিনি কখনও, আহা বেশ করছ যা করছ বেশ করছ, এ ছাড়া উপায় কী আর কী—! না দেখায়, না বলায় আমাকে সকলেই খুব ভালোবাসে, যাদের চিনি তারা, যাদের চিনি না তারাও। এই থেকে একটা সিদ্ধান্ত এসে যেত, মানুষের ভালোবাসা পেতে হলে যত পার ঠকে যাও, যত পার, রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাও, দেখবে ওরা তোমাকে দেখামাত্র বুকে জড়িয়ে ধরবে।

বারো

আলাপচারিতা উদ্ভাবনী শক্তির অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে, কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংব্যাপী পোকায় কাটা বইয়ের স্থায়ী মিছিলটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বই ঘাঁটছি, ছাপা বাঁধাই এসব দেখছি, হাত বোলাচ্ছি উইয়ে কাটা পাতায়, চমৎকার শব্দ পেয়ে সেখানেই স্থির হয়ে পোকার মতো বসে পড়ছে আমার চোখ, ট্রামের তার ছিঁড়ে গেল কি জ্যোতি বসুর কুশপুতুল দাহ করা হল কিছুই দেখছি না। শুনছি না, এইরকম গাঢ় সম্পর্কে বাহ্যচেতনা চলে যেতে পারে কি না ভাবছি হয়তো এমন সময় সেখানে এক প্রশ্নকর্তা 'রেয়ার

বুক খুঁজছেন বুঝি।' প্রশ্নকর্তাটির মুখ চেনা, কোনোদিন কথা হয়নি। তাঁকে দেখেছি বাসস্টপে, কবিদের আড্ডায় বিদেশি চলচ্চিত্রের শো এবং হয়তো মিছিলেও। এইসব বলে দেয় মানুষটি সমাজ ব্যাপারে সজাগ, সংস্কৃতিপ্রেমী, জীবনযাপন তাঁর কাছে আহার-নিদ্রা-মৈথুনে নিঃশেষিত নয়, অর্থাৎ এর প্রতি অন্যদৃষ্টিতে তাকাতে হবে। 'পেলেন কিছু' বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখে তিনি আমাকে সুযোগ দেন।

খুঁজিনি তো।

আমি দু-চারটে এমন রেয়ার বই পেয়েছি...

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে কিছুটা উৎসাহ নিংড়ে এনে কথা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি 'তাই নাকি, আচ্ছা রেয়ার বই খোঁজেন কেন? আপনি কি সংগ্রাহক? বাংলা ভাষায় এখনও তো বই ছাপা হয়?'

হয় না?

অ্যাঁ!

সব চোথা।

প্রসঙ্গটি ধীরে ধীরে আমাদের টেনে নিয়ে গেল কলাবাগানের দিকে গলির একটি চায়ের দোকানে, সেখানে বেঞ্চের ওপর বসে, আমোদ ও কৌতুকস্পৃহার যে খাঁ খাঁ থলেটি আমি বুকের মধ্যে বহন করি তার মুখ খুলে দিলাম আর পুস্তকপ্রেমী থলেটিতে রাশি রাশি শব্দ ঢালতে লাগলেন, ঢালতে ঢালতে তিনি উত্তেজিত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ হতে হতে একসময় কেমন নিঃস্ব হয়ে গেলেন, চুপসে গেলেন, 'এ দেশের কিস্‌সু হবে না ম'শয়।

কত হাজার কোটিবার কথাটি শুনেছি, তবু প্রতিবার তার আঘাতের ক্ষমতা একই থেকে যায়, প্রতিবার কথাটি নতুন শক্তি সংগ্রহ করে কাঁটাচাবুকের মতো বাতাস ফালা করে পিঠে মুখে নেমে আসে। ভবিষ্যৎ শূন্য, সেখানে কিছুই অপেক্ষা করে নেই। এমনও কি হতে পারে যে এখন নেই, যে আসছে, আসবে— সেই ভবিষ্যতই আরাধ্য উলঙ্গ নারীমূর্তি, সে-ই খাঁটি সত্যি। কিন্তু তা আমাদের বেঁচে থাকার যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে, আর এক দল নবাগতের যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নিয়ে নিজের মুখটি দেখাবে, যেহেতু এই সময়-দৌড়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই থেকে যেতে পারে তাই আমাদের দিনলিপিতে এই উদ্‌বেগ আতঙ্কের স্থান নেই। তা বাস্তব নয়, এক দূরকল্পনা মাত্র, এমন এক দুঃস্বপ্ন যা ভর করে দুর্বল মানুষের কাঁধে, সেইসব মানুষ যারা অবলুপ্ত প্রাণীদের মতোই পরিস্থিতি এবং এখনকার আবহমণ্ডলের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না, সেইজন্য তারা মুছে যাবে, মৃত্যুর আগেই তাদের মৃত্যু হবে। এই ঘটনাটি আমাদের প্রযুক্তিপ্রবল সময়ে তাদের বিমর্ষ করছে, মৃত্যুপথযাত্রীদের সামনে তাই এক ধু ধু প্রান্তর, নিরন্তর রক্ত বমন।

কিছুই হবে না? সব চোথা? পুস্তকপ্রেমীর পরিত্যক্ত আবর্জনা আমার মাথায় কিলবিল করছিল, লোকটি হাত নেড়ে চলে গেছে কখন। এখন এই বোঝা, পোকাদের এই স্তূপ আমি কোথায় নামাই, চেষ্টা করি নিজেকে শান্ত করতে কিন্তু কিছুতেই শক্তপোক্ত কোনো ভিত খুঁজে পাই না বলে শান্ত হতে পারি না।

মেছুয়া বাজারে একদিন হরপ্রসাদ স্যার অবিকল আগের মতোই আমার পিঠে হাত রেখে একটু চাপ দিলেন, পিছন ফিরেই 'স্যার' বলে আমিও বিস্ময় ও সম্ভ্রমের স্রোতে নুয়ে পায়ে হাত দিতে গেলে হরপ্রসাদ স্যার তীক্ষ্ণ স্বরে প্রায় ভর্ৎসনা করে উঠলেন 'একদম না, খবরদার পায়ে হাত দিবি নে, বড়ো রোগা হয়ে গেছিস, দাড়ি রেখেছিস কেন।' আরও কী কী প্রশ্ন করলেন, ওহো একটা মনে আছে, 'এরকম বায়ুভূত, নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াস কেন, হয়েছে কী?' এইরকম আন্তরিকতা তার অন্তহীন, তলহীন স্রোতে আমার সে কী আনন্দ অবগাহন, শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। স্যার বলে চলেছেন 'একদিন আয় না, তোর সঙ্গে কথা আছে, আসিস কিন্তু।' ঘাড় নাড়তে থাকি 'হ্যাঁ স্যার যাব, এক রবিবার চলে যাব।' স্যার দিনক্ষণ স্থির করে ফেলতে ব্যগ্র, শেষে বললেন 'ঠিক আছে, তোর সুবিধেমতোই আয়, অনেক কথা অনেক কথা আছে, দুপুরে আমার ওখানেই খাবি। সারাদিন থাকবি।'

তারপর দুটি সপ্তাহ কেটে গেল, কেন যাচ্ছি না, কে যেন পায়ে দড়ি বেঁধে রেখেছে। ভয় হচ্ছে হরপ্রসাদ স্যারের যে উজ্জ্বল ছবিটা আমার সংগ্রহে রয়েছে এতদিনের ব্যবধানে এক দীর্ঘ আলাপ যদি সব উলটে দেয়, ভেঙে দেয়। এই ভয়ে পা সরছে না। মহামারীর মতো এক পরিবর্তন এসেছে, বদলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে ইমারত থেকে খুড়কুটো; সাঁতার-কুশলীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভেসে থাকতে। তারপর কিছু নেই, কেবল ভেসে থাকা, বদল স্রোত তাদের বয়ে নিয়ে যাবে আরও আরও স্রোত পেরিয়ে প্রবল, বিস্ফোরক এক বদলের মুখে ফেলে দেবে। যেন সেইজন্যই বেঁচে থাকা, ওই গর্জন, ওই আলোর ঝলসানি, উগ্র রং মাংস ছিঁড়ে খাবে বলেই যেন এত সাজগোজ, হাসি ও করমর্দন।

এ বছর (১৯৯১) জানুয়ারি মাসের চারটি দিন, বাহাত্তর ঘণ্টাকে চারটি বাক্যে বন্দি করা সম্ভব :

৬ রবিবার : রাত দেড়টায় এমন এক প্রশান্তি এল...

৭ সোমবার : ভ্রমরকে সহ্য করতে পারছি।

৮ মঙ্গলবার : ভি আই পি রোডে টেম্পো থেঁতলে দিয়েছে এক যুবতীকে।

৯ বুধবার : 'আমি' এই শব্দ তার অর্থ মুছে যাচ্ছে, সহ্য করতে পারছি না বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

নিষ্ক্রিয়তার চরমে নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা ওত পেতে আছে দেখি। হাত-পা ছুঁড়ে পাঁচ রকম কাজে জড়িয়েও সেই চরমকে পাশ কাটানো যাবে না, এ নিয়ে ভাবি না, এই চোরাপথে কতজন মাথা ঠুকে মরেছে, আমি শান্তিতে মরার স্বপ্ন দেখি, স্থির বসে থেকে, জড় পদার্থের ধর্মে মিশে যাব ভেবেও সব কিছু, সমস্ত স্থিরতা তছনছ করে এক অনিবার্য ছুট দেখতে হয়; অমোঘ গতি, পদার্থবিদ নই, পণ্ডিত নই, বুঝতে পারি না কী এই গতি? কীভাবে সে বেঁচে আছে মাটিতে, আকাশে, মহাকাশে, আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বে!

তেরো

প্রায়শই ডুব মারছি, অফিসে যাব বলে বেরিয়ে দশ-পনেরো মিনিট বাসের অপেক্ষায় থেকে মনে মনে হিসাব করতে শুরু করি ক্যাজুয়াল, মেডিকেল, স্পেশ্যাল, আর্নড লিভের মধ্যে কিছু পড়ে আছে কি না, উইদাউট পে হয়ে যাওয়াটা হল বিপদসীমা, ওই পর্যন্ত পৌঁছে আর মনের কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয় না। অফিস কামাই করার অদ্ভুত স্বাধীনতার স্বাদ থেকে কিছুদিনের জন্য অন্তত নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয় তখন, যতক্ষণ না আবার ওই ছুটিগুলি জমছে। আমার অফিসের লোকগুলি খুব সুন্দর, খুব ভালো। তারা আমার কুশলসংবাদ নেয়, সতর্ক করে দেয় কাজের ভুল সম্পর্কে, বলে দেয় কীভাবে চললে চাকরিটি বজায় রাখা যাবে, কোন কোন যোজনায় টাকা জমানো সব থেকে লাভজনক ইত্যাদি, ইত্যাদি। অফিসের লোকদের হৃদয় আছে। আমি বিয়ে করিনি বলে, একা থাকি বলে এবং কিঞ্চিৎ কম ধান্দা করি বলেও তারা আমাকে পছন্দ করে। অফিসের লোকরা কি সর্বত্র, এরকমই হয়ে থাকে! বেসরকারি এই অফিসের লোকগুলি বেশি সহৃদয় নয় তো? যে যে কারণে আমি অফিসবাবুদের, অফিসের লোকদের কাছে উদ্‌বৃত্ত ভালোবাসা পেয়ে থাকি সেই কারণগুলিকে একটি ধর্মে শনাক্ত করা সম্ভব। আর তা হল অনুপস্থিতি।

কী করে সময় কাটাও?

কাটাই না।

মানে?

আমি তো কুলোতেই পারি না।

যাত্তেরিকা!

সত্যি! সবসময় দেখি পেছনে পড়ে আছি।

লাগেজ ভ্যান?

একরকম তাই, আমাকে কোনো চেষ্টাই করতে হয় না।

আমাদের যে কাজ করতে হয়, অনেকের ধারণা সেটা খুব সম্মানজনক কাজ, এই কাজের সূত্রে সমাজের মাথাদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। করিতকর্মা লোকজন যত্নের সঙ্গে ওইসব যোগাযোগ চাষবাস করে, টিভি-তে মুখ দেখায়, বই ছাপায়, পুরস্কার পাওয়ার জন্য ছক করতে থাকে, বিদেশে উড়ে যায়, এতসব বিচিত্র ফলের সম্ভাবনা থাকায় কাজটিকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা হয়; অন্যান্য অফিসগুলিও আমাদের পাত্তাটাত্তা দিয়ে থাকে। সব মিলে বেশ একটা খুশি খুশি গদগদ ভাব লক্ষ করা যায়, বড়লোকের সুখী বউদের মতো (এই ব্যাপারে আমি খুব সিওর নই, তা ছাড়া নারীবাদীরা এরকম কথা শুনলে ছ্যা ছ্যা করবে)। এই গদগদে চ্যাটচ্যাটে আঠার পাতলা একটা আস্তর জমতে থাকে মুখে, ক্রমে তা পুরু হতে হতে অফিসবাবুদের নাক মুখ বদলে দেয়। আমি এই কাজ প্রত্যক্ষ করে একদিকে যেমন নির্মল বিনোদনের আনন্দ পাই তেমনি একটু একটু ভয়ও করে, কী জানি বাবা, আমি আবার ফেঁসে যাব না তো! অনুপস্থিতি রক্ষাকবচ স্পর্শ করি তখন। আমি এই জীবনের কেউ নই। এই অবস্থায় চাকরিটি বজায় রাখতে

হলে আমাকে দুটো কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে হবে, বানান ঠিক রাখা এবং অফিসবাবুদের জীবনযাপন সম্পর্কে, তাদের সমবেত জীবনের নিয়মকানুন, আচার, লোভ, হিংসা, আত্মপ্রচার ও হ্যাংলামি সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটে থাকা। বানানের ব্যাপারে আমি একটু দুর্বল। দুর্বলতা সবাই মাফ করে দেয়। ব্যাকরণ শেখার আগ্রহ নেই। একটা ধেড়ে লোক ব্যাকরণ সূত্রগুলি মুখস্থ করছে—ভাবতেও পারি না। অথচ বানান ঘেঁটেই আমার রুজি। তাই একটা রফা করতে হয়েছে। কর্কশ, রিক্ত, অসন্তুষ্ট ও একদা অগ্নিবর্ষী জিভটিকে বস্তুত কেটে ফেলেছি। হাবিজাবি বলি, অর্থহীন কথা বলি, হ্যা হ্যা করে হাসি, যাতে বাঁচার নিরাপত্তাটুকু থাকে (চাকরি গেলে খাবটা কী) এইভাবে দিব্যি চলে যাচ্ছে। মোলায়েমভাবে চলে যাচ্ছে, এক দানা খিঁচ নেই কোথাও।

এই মোলায়েম বাঁচাকে সুনিশ্চিত করতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, শুধু জিভ নয় আরও অনেক অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে। বহু অঙ্গের সমষ্টি এই দ্বিপদ জীবটির আর কোনো অঙ্গই বেঁচে নেই—এমন সন্দেহ প্রকাশও অমূলক হবে না। দৃশ্যটি কল্পনা করলে শিউরে উঠতে হয়, আমার জিভ পড়ে আছে রক্তের স্রোতে, পড়ে আছে কাটা দুটো হাত... আর একথা আমি এখন লিখছি! এই যন্ত্রণাময় মৃত্যুর কথা! নিজের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, নিজের প্রতি সুবিচারের জন্যই সহ্য করেছি এই যন্ত্রণা। আর এখন অযথা আঁকিবুকি কাটতে কাটতে নিষ্কলঙ্ক সাদা পাতায় কালি ছেটাতে ছেটাতে গুমখুনের বিশদ বিবরণ প্রতিটি অনুষঙ্গ-সহ ঝলসে উঠছে স্মৃতিতে, ছিন্নমস্তার রক্তপান দেখি, তার হাতে ধরা খুলিপাত্রটি দেখি।

তুই কি ভাবিস, কলেজের মাস্টারদের...

শিক্ষাদান...

ধ্যাত! সেখানে কলেজ কমিটি, রাজনীতি, এইসব নেই?

কেউ যদি না জড়ায়, গবেষণা নিয়ে থাকে।

গবেষককেও তো প্রশংসাপত্র পেতে হবে, নামজাদা জার্নালে লেখা ছাপাতে হবে, সেমিনারে বলির পাঁঠার মতো দাঁড়াতে হবে, সেসবেরও কলকবজা, মেশিন আছে।

যা কিছু সামাজিক সেখানেই অন্ধ ক্ষমতা, সেখানেই কলকবজা, এই ভড়ং মেনে নিতে হয়, এই নামাবলি আদর করে গায়ে জড়াতে হয়। লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হয়েও কেউকেটাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন করে থাকে, চৌকশ চল্লিশের এলেমদার এহেন এক বন্ধুর সঙ্গে অলিম্পিয়া বারে বসে মদ গিলছিলাম। এই লোকটির নাম অপ্রাসঙ্গিক, এর যুক্তি ও বিচার মৌলিক নয়, এ একটা টাইপ, ব্যক্তি নয় সে কিছুতেই, এরকম বিবেচনার কথা আমি অনেক শুনেছি, এরা খুব কেজো হয়ে থাকে। আদর্শ তত্ত্ব এবং পাতি মিথ্যাচারের এই মিশ্রণ ভূরিভূরি পাওয়া যায়। তো ফিঙ্গার-চিপসের অর্ডার দিয়ে বিয়ারের তৃতীয় বোতলটি শেষ করছি যখন সেই সময় সমস্ত হিসাব উলটে দিয়ে সম্পাদকটি কুকুরশাবকের মতো কেঁউ কেঁউ করে উঠল। যাচ্চলে শালা রীতিমতো ফোঁপাচ্ছে দেখি, ওর মুখটা তখন আমূল দুধের কৌটোর বাচ্চার মুখের এক বৃহৎ সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

অ্যাই।

ভাল্লাগে না, বিশ্বাস কর, কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

তা'লে ছেড়ে দে।

রীতা।

রীতা কী, কেন, আরে হলটা কী!

আমি শেষ হয়ে গেছি।

চোদ্দ

খ্যাতি ভয়াবহ।

অথচ দ্যাখো খ্যাতির জন্য কাঙালপনা...

খ্যাতিমানের দিকে মানুষ এমনভাবে তাকায়।

মুগ্ধ।

হ্যাঁ, কিন্তু এমন একটা ছবি গড়ে নেয়।

যা সে নয়।

অথচ তার হাঁটাচলা মুদ্রায় সেই ছবিটিকেই...

বিশ্বস্ত করে তুলতে হবে।

অন্যের জীবনে বাঁচতে হবে।

এইরকম সংলাপ রীতার সঙ্গে হয়েছিল। ভোম্বলমার্কা সম্পাদক যখন কেঁদে ভাসাচ্ছে রীতার টুকরো টুকরো কথা মনে করছি তখন, রীতাকে ভাবছি। সত্যি কী বলে রীতা এই মাংসের তালটাকে বিয়ে করেছিল। এই রচনাটিতে রীতা বা ভোম্বলবাবুর (একটা নাম তো লাগেই) প্রসঙ্গ নেহাতই এক প্রক্ষেপণ মনে হলে আমি নাচার। এখানে হয়তো কোনো কিছুরই দৃঢ় ভিত্তি নেই, সমস্তই ভেসে যাচ্ছে। যেমন ভাসতে ভাসতে অলিম্পিয়ায় মদ খেতে ঢুকে এখন অভিনেত্রী রীতার খপ্পরে পড়লাম, সে চারপাশে কোথাও নেই। আবার বাতাসে কিছুই হারায় না, দ্বিতীয় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বারুদের গন্ধও নাকে লাগতে পারে। এই বাতাসে মিশে আছে রীতার প্রথাবিরুদ্ধ জীবনযাপন, প্রেম উন্মাদনা ও একের পর এক সঙ্গী বদলেও সঙ্গীর জন্য প্রেমিকের জন্য আকণ্ঠ অতৃপ্তি, অন্বেষণ, বিচ্ছেদের পর বিচ্ছেদে ঝুঁকির দিকে তীব্র টান, নেশারুর মতো বিপদে ঝাঁপ দেওয়া আরও কত কী! অভিনেত্রী সে, কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। ভাবে চমক, ভাবে সমস্তই পেশার জন্য। যেন পেশার বেদিতে নিজের নরম মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে সাজিয়ে দিচ্ছে। সেই মেয়ে, যে বলেছিল, অভিনয়ে আমি চেষ্টা করি নিজেকে অবিষ্কার করতে, কে আমি, সেটাই খুঁজি। হ্যা হ্যা করে হেসে রীতার এই কথা প্রসঙ্গে যাচ্ছেতাই রকমের যৌন রসিকতা করেছিল তার মন্দ প্রেমিকরা।

পনেরো

অনামা সময়সন্ততিরা আরও আরও জন্মের, রূপান্তরের কামনায় অধীর। তারা থরথর করে কাঁপছে, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। এক শীতের সকালে আমার কিছুই করার ছিল না, হাত-পা নিশপিশ করছে। তিন দফা চা, গুটিকয় সিগারেট, আস্ত একখানা খবরের কাগজ শেষ করেও বাথরুম যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছি না। এমনটা সচরাচর হয় না বলে সামনে, টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজটিকে সন্দেহের চোখে দেখছি, স্পর্শ করছি নিজের হাত-পা বুক। অনেকটা জায়গা জুড়ে আমি আছি, শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে, তাকে ছুঁয়ে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম এই থাকার কথা। আর প্রতিধ্বনি হচ্ছে 'আছি' এই শব্দটির।

আছি, আছি, আছি...

দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে সিলিং ছুঁয়ে ঘরের একপাশে দু-দেওয়ালে রচিত সমকোণ, লম্ব, চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজের চতুর্ভুজে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে একটা ছি ছি শুনতে পেলাম। সময় বস্তুকে ধিক্কার দিচ্ছে। এই ক্ষেত্র, এই বস্তুসকল। এখন ফাটা আয়নায় সাবান ফেনায় ঢাকা নিজের গাল দেখছি, যেখানে মসৃণ পথ খুঁজে নিচ্ছে রেজর, আয়নায় সেই ক্ষুরধার ছোট্ট যন্ত্রটি দেখছি, গাল ফোলাচ্ছি, মুখ বিকৃত করছি। আয়নায় কোনো ত্রুটি ছিল, বা গোলমাল ছিল আমার দেখায় কিংবা অজানা অকল্পনীয় কোনো যোগসাজস বা ষড়যন্ত্রে আমি বদলাতে থাকলাম, আমার মুখ স্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যহীন হতে থাকল, দাড়ি কামানো বন্ধ করে আয়নার এই কারসাজি ভয়ে, বিস্ময়ে থ হয়ে দেখতে লাগলাম। নিজের মুখ আমি আর চিনতে পারছি না, সম্পূর্ণ অপরিচিত কারো মুখ আয়নার কেন্দ্রে রয়েছে। মানুষেরই মুখ কিন্তু বিশেষ নয়, কারো নয় এই মুখ। আবার এই মুখ যে কারো হতে পারে, যে কেউ হয়ে উঠতে পারে।

গতকাল বেতন পেয়েছি, চাকুরেদের জীবনে প্রতি মাসের গুরুত্বপূর্ণ দিন, গতকাল মদ খেয়ে ফূর্তি করেছি, আরও কিছু সুখের জন্য নিষিদ্ধ পাড়ায় যাওয়া যেত, আমার বেতনে কপট আনন্দময়ীদেরও একটা বখরা আছে, চরিত্রবানরা এই ঋণশোধ না করে মহান থেকে যায়। হু হু করে কত কথা ধেয়ে আসছে। আনন্দময়ী নামে প্রকৃতই এক বেশ্যা আছে সোনাগাছিতে, বাংলা মদ খেয়ে দেহতত্ত্বের গান গায় সে। কোথায় শিখেছিল কে জানে! একদিন তার বিশাল গতর ছুঁয়ে থেকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সবার মুখ চিনতে পার আনন্দ?

কার কথা বলছ গো!

সবার?

দরকারটা কি অত ভেন্ন করার?

এই আনন্দের কাছে ঋণ। বিদ্রোহের যুগে, তরুণ বয়সে আমরা আরও আরও ঋণের কথা বলতাম, কৃষকের কাছে ঋণ, শ্রমিকের কাছে ঋণ...। আদর্শের ধ্বজার নীচে সমবেত হয়ে সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে, অপরাধবোধের ভিতের উপরই পুঁতেছিলাম সমাজ বদলের ধ্বজা? এখন এই বদলের কথা সকলের মুখে মুখে, থুথুতে, ঠোটের কষে, ফেনায়। আমি আর

ঋণের কথা ভাবি না। জীবিত, মৃত, জীবন্মৃত সকলের কাছে ঋণী। ঋণ জন্মের, প্রতিটি নিঃশ্বাসের। এত বিপুল, এমনই দিগন্তগ্রাসী, যে তা আর ধারণার সীমার মধ্যে বন্দি নয়। সমস্ত সীমা ও পরিধি ভেসে গিয়েছে ওই প্রবল স্রোতে, মিশেছে আকাশমাটিতে। অপরাধীর শৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে এবং এক করুণ সাংগীতিকতায় আমার স্বেচ্ছানিমজ্জন অনুভব করছি।

অনন্তপ্রবাহ এখন ব্যর্থ ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করতে। আনন্দের স্তনের কাছে মাথাটি কাত করে রাখার মতোই নিজেকে দেখি ওই প্রবাহে। আর শান্ত হতে থাকি, পান করি শান্ত রস।

ষোলো

প্রস্তুতির কথা গোপন রেখেছিলাম, গোপনীয়তা রক্ষা করা এখন খুব সহজও বটে। সময়ের কোনো এলোমেলো ফাঁকফোকর নেই যে লোকজন খুঁজে নিয়ে গলগল করে কথা বলতে হবে। কথার টান, নেশায়, যেখানে-সেখানে সর্বস্ব উগরে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার তাড়নাও আর নেই। পত্রিকা, শিল্পটিল্প নিয়ে পাঁচজনের কারবারে, রাজনৈতিক ইস্যুতে সমর্থন ও বিরোধিতার ঘন আশ্লেষ বিস্তর ঝরেছে। শুকনো পাতার স্তূপ, তাদের ততোধিক শুষ্ক শিরা পড়ে আছে পায়ের কাছে। বুকে, হাতে পায়ে তারই কিছু গুঁড়ো। লোমে জড়িয়ে আছে সেইসব পাতা, ছাতানাতা ও জীর্ণতা।

কিন্তু কী করে এমন হল, কী সেই প্রক্রিয়া। দৃষ্টির অগোচর, বাস্তব অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত, কুয়াশাবৃত, এমনকি হয়তো এক অনস্তিত্বের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি হাত। কারণ জানার মোহ, সংস্কার, তৃষ্ণা সব, সব কিছু শুকিয়ে আসছে। জ্বালার রূপান্তর ঘটছে, অশান্তি অতৃপ্তি হয়েছে। লোভের গতি নিরাসক্তির দিকে। এবং এই পর্যটনে আমার পা টলছে শিশুর মতো, এই প্রথম জানতে পারছি, হায় এতদিন, এত বছর খেয়ে ফেলেও হাঁটতে পর্যন্ত শিখলাম না।

ভ্রমরকে সব কথা বলা যায়, সময় কাটানোর এক মারাত্মক খেলা আছে দুবলা মেয়েটার, সামান্য স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে, অ্যাজমার টানের তোয়াক্কা না করে দুর্গম পাহাড় অভিযানে নাম লেখায়। দিনের পর দিন কষ্ট করে, রক্ত ঝরিয়ে কোনো না কোনো হিমবাহ পর্যন্ত পৌঁছে আবার খাড়া ঢাল ধরে, খাদের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে, দু-পাশে মৃত্যুর প্রসারিত দুটি হাতের, আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসে ভ্রমর। এবং তারও সপ্তাহ খানেক পর কালো কফি নিয়ে আমরা মুখোমুখি। বলল, এবার সত্যিই মরছিলাম। যেন কিছুটা মরেছেও, যেন সত্যিই দেখে এসেছে, হাত দিয়ে ছুঁয়েছে, জিভের ডগায় খানিক স্বাদ পেয়েছে মৃত্যুর।

ভ্রমর। ভ্রমর!

বড়ো বোকা বোকা, অর্থহীন লাগছে ক-দিন যাবত, এমন একটা ছটফটানি এমন এক গতিতরঙ্গ পেয়ে বসেছে যে কিছু একটা না করলে নিস্তার নেই। আর আমার শব্দকোষে প্রিয়তম ক্রিয়াপদ একটাই, মনের মতো কারো সঙ্গে কথা বলা। না, কথা বলা নয়, কথাও নয়। ক্রিয়াপদ, বিশেষ্য এসব নয়, যেমন নয় প্রেম, নিজের কাছ থেকে পালাতে একপ্রকার প্রতারণাকে

মাধুর্যময় করে তোলার জন্য ভ্রমরের কথা ভাবছি এমন নয়, আমি তাকে একথা বলেওছি আমি খেলনা নই, ভ্রমর তুমিও নও।

তাহলে আমরা কি খেলুড়ে, খেলোয়াড়? লীলাখেলা চলছে দুনিয়া জুড়ে?

তুমি কি চৈতন্য হলে!

আশ্চর্যরকম হাসছিল। কেঁপে কেঁপে। হাসির শব্দ কেঁপে কেঁপে উঠছিল, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল ভ্রমর, সব মিলে স্পন্দন ও শব্দের ঐকতান। দৃশ্যটিতে মজে গিয়ে আমি চিন্তাসূত্র হারিয়ে ফেলি। ভাষা আর চিন্তা মহাদেশ-সরণের মতো ক্রমশ ফাঁক হচ্ছে দেখি, ক্রমেই তারা সরে যাচ্ছে পরস্পরের কাছ থেকে, এতটাই যেন কোনোদিন তাদের মধ্যে মিত্রতা ছিল না, দুজনেরই এত বেশি স্বাতন্ত্র্য এত বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তারা, বিপরীতধর্মী যে একে অপরের কথা কোনোদিন বোঝেনি, কোনোদিন বুঝবে না। তবু আমি 'চৈতন্য' শব্দটি তুলে নিলাম, 'দ্যাখো ভ্রমর মানুষের কীরকম নাম রেখেছি না, চৈতন্য...।'

তুমি রেখেছ?

আহ্...

আমি?

আমরা। বুড়োবুড়ি।

ভাবলেই হল। ভাবলেই প্রাচীন হব?

বড়ো তর্ক কর।

এইরকম কথা হয় ভ্রমরের সঙ্গে। আজ এক দুরন্ত অন্তর্লীন গতির টানে মরতে মরতে আমি ভ্রমরের কথা ভাবছি। এখন ওকে সামনে পেলে যেন বেঁচে যাব! এই যে নিজেকে তৈজসপত্রের মতো, কাঠকুটোর মতো মনে হচ্ছে, আমি তা সহ্য করতে পারছি না। একথা ভুলতে পারলে বাঁচি।

জামা-প্যান্ট পরে জুতোর ফিতে বাঁধতে বসে যাই।

সতেরো

কত দ্রুত কাঁচা বয়সের প্রখরতা, তরঙ্গায়িত যৌবন সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে, সেই হালকা পা ফেলা, নৃত্যের চলন আর নেই। পা যা স্পর্শ করত, গর্বে যেখানে পা রাখতাম, পা ফেলতাম সেই ক্ষেত্রটি ঘূর্ণায়মান, প্রতিমুহূর্তে তা সরে যাচ্ছে। অকালবার্ধক্য নাকি গরিব দেশের এক নির্দয় উপহার, এখানে সব কিছু নিমেষে পুড়ে যায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসে জীবনের থেকে বড়ো হয়ে ওঠে মৃত্যু। আমাদের এই দেশ, এই শহরটি রূপকথার মৃত্যু-উপত্যকা। আমি আর তরুণ-তরুণীর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। তাদের হাসি, বাতাসে ওড়া চুল, শরীরের সুন্দর গর্ব—এইসবের সামনে পড়ে গেলে গোপনে সরিয়ে নিই দৃষ্টি। জীবনবাদীরা এই তারুণ্যকে ডেকে তাদের দু-হাতে, মাথায়, পকেটে, বুকে যেখানে যত পারে বিপ্লব-বিশ্বাস ঠেসে দেয়, বাবা মাস্টারমশাইরা এদের চাকরির রাস্তা উজ্জ্বল করতে বিপ্লব ও অচলায়তন সমাজের সঙ্গে রফার বিভিন্ন

কলাকৌশল বাতলাতে থাকে। ক্ষুদিরামের বোমাযুগ থেকে এই চলছে, এই চলবে। মেছুয়াবাজার কিংবা ছকু খানসামা লেন সর্বত্র এই মিছিল। চলছে! চলবে! মিছিলটি থেকে, বর্ণাঢ্য সেই শোভাযাত্রা থেকে উজ্জ্বল একটি মুখ একদিন ছিটকে পড়ে। এ যায় ও আসে। স্রোত নির্বিকার, জনস্রোত, কালস্রোত ব্যক্তির কথা মনে রাখে না। এই তরুণটির কথা মনে রাখে না।

তার নাম আমি, তার নাম সুব্রত, সে অশোক, বা এই সমস্ত নাম নিংড়ে সে অশোকতরু...

বিবাহ, সন্তানপালন, এই ভয়ংকর মাগগিগণ্ডার বাজারে সুশৃঙ্খলভাবে সংসার চালিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে, কোনো এক স্বর্গ কল্পনায়, উচ্চাশায়, অসীম সাহসে বেঁচে থাকে যে। মধ্যবিত্ত অশোকতরুর ভুবনে সেরকম মানুষ একজনও নেই। মনে আছে একদিন অশোকতরু, ভ্রমর এবং আমি রাত জেগে বকবক বকবক করছিলাম। পাগলের মতো ভাবছিলাম এই তিন জন এবং একজন চিত্রকর, একজন গায়ক ও ভবঘুরে এক কবিকে নিয়ে ধীরে আমাদের এক জগৎ গড়ে উঠবে, গড়ে উঠছে। অশোক বলেছিল, সৌরজগৎ। খুব হেসেছিলাম আমরা, আবার আনন্দও হয়েছিল, প্রত্যেকে বিশ্বাস করেছি। সেই উদ্ভট সৃষ্টি। প্রবল বিস্ফোরণ ছাড়াই ধোঁয়া ধুলো জীর্ণতার এই শহরে পরম শান্ত কোনো প্রক্রিয়ায় এরকম এক আশ্চর্য বলয় গড়ে উঠছে।

নোনাধরা এই দেওয়ালে, বাথরুমের মাকড়সা জালে, টেবিলে স্তূপীকৃত ছাই, কাগজ, একটি দুটি পদ্য, বিমূর্ত চিত্রে রচিত ছিল তার সাক্ষ্য। সামান্য, তুচ্ছ থেকে কাল্পনিক এক শীর্ষারোহণের অভিযান, অভিযানের চিন্তায় মজে আমরা বলতাম, আমরা স্পষ্ট টের পেতাম এখনও ঘুমিয়ে আছি, সব কিছু রয়েছে এক অনন্ত শয়ানে।

আমি টের পাই।

অনুভব করি।

বুঝি অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো।

কুয়াশা।

বড়ো দ্রুত ঘটনা ঘটে চলেছিল, প্রবল ঝাঁকুনি রয়েছে, এই প্রথম টের পাচ্ছি বস্তুতই শিকড় আছে আমার, আমাদের। কেননা সশব্দে উৎপাটিত হচ্ছিল শিকড়। আমরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছি, জখম হচ্ছি। ভাষা আর আজগুবি চিন্তার, অযৌক্তিক কল্পনার সেই ডামাডোল, সেই নৈরাজ্যকে শিল্পের আতুরঘর ভেবে রীতিমতো উত্তেজিত আমরা। চারপাশ, কলকাতা, তার গোষ্ঠী-সংস্কৃতি ব্যবসা (গোষ্ঠীপতিরা এক-একজন সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁরা দাসখত দেওয়া প্রকৃত, প্রশ্নহীন ভক্তকে কলাটা, মুলোটা, বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্র, আনন্দ পাইয়ে দেন; গোষ্ঠীপতিরা যথার্থই ভক্তের ভগবান) প্রচারপত্র ইত্যাদি যেমনকার তেমন আছে। ওই কলকাতায় আমরা ভূতের মতো পর্যটন করি, সেখানকার চিহ্নগুলি পড়ার, বোঝার আগ্রহ আর নেই। আমাদের কাছে তা এখন একটি দোকান মাত্র যেখানে খাবারদাবার কেনার জন্য, রসদ সংগ্রহের জন্য আমাদের যেতেই হয়। অফিস করার জন্য, ছাত্র পড়াতে, বা ছবি বেচতে কিছু-না-কিছু বেচাকেনা করতে। আমরা তখন নিজেদের খুব আগলে রাখি, কারো সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলি না, সম্পর্ক সম্ভাবনা নিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। যে যার নিজের নিজের গর্তে ফিরে আসি, সপ্তাহে একদিন দু-দিন একজোট হয়ে নরক গুলজার করি। রীতিমতো যে যা ভেবেছি, বুঝেছি, সেসব বলে হালকা হই। কখনো-

বা মদ্যপান করি। তখন খুব উত্তেজিত কথা হয়, কদর্য ঝগড়া করি, নোংরা কথা বলি, গভীর কিছু বলার জন্য আঁকপাঁক করি, গান গাই, কাঁদি, ধিক্কার দিই... পরিণামে হুঁশ ফেরে, 'গভীরতা' শব্দটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে পাশে লিখে রাখি : ঢপ্। মানে বুজরুকির বাপ।

'সব থেকে সরল কাজ কী বল দেখি' অশোকতরু একদিন এই প্রশ্নটি করে মৃদু হাসতে থাকে, ভ্রমর, কবি, চিত্রকর সকলেই অপেক্ষা করে আছি। আমরা চুপ করে রইলাম, এর হাজারো জবাব হতে পারে কিন্তু প্রশ্নকর্তা হাতের মুঠোয় যে জবাবটা লুকিয়ে রেখেছে সেইটিই সদুত্তর, সে-ই উত্যক্ত করতে লাগল, আমরা জড় পদার্থের মতো বসে থাকি, অভিনয়নৈপুণ্যে আমাদের জোড়াজোড়া চোখ জিজ্ঞাসু থেকে যায় এবং অশোকতরু মুখ খুললে একটি মাত্র শব্দ নির্গত হল 'আশা'।

ধ্যাত!

আশা কি কাজ নাকি?

অশোকতরু এবার শব্দটিকে টেনে লম্বা করে প্রায় একটা বাক্যের চেহারা দেয় 'কিন্তু মানুষকে আশার বাণী শোনানো।' আমরা রে রে করে উঠলাম, কবীর-নানক-তুলসিদাস থেকে কেউ বাদ গেল না। ঝড় থামতে অশোকতরু প্রায় বক্তৃতার মতো, ক্লাস নেওয়ার মতো এক সুরে, গলার ওঠানামায় বলে যায় :

এ কোন আশা! তবুও মানুষ, মানুষের জয়, মানুষের জন্য...

আমাদের বেহুঁশ করে দিতে পেরেছিল অশোকতরুর বক্তৃতা, মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করছিল একটি ধ্বনির অজস্র অজস্র হতে থাকা 'মানুষ মানুষ মানুষ...'

আঠারো

ভ্রমর বেপাত্তা হয়েছে। উচ্ছ্বাস আর গভীর হতাশার মধ্যে পারদের মতো ওঠে নামে। তলিয়ে যাওয়ার দিনগুলি বাড়তে বাড়তে প্রতিটি দিন স্বতন্ত্র, সময়ের বিচ্ছিন্ন একক হিসেবে, খণ্ড হিসেবে হাজির হল। এ প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার সামিল। যেন শিবিরে একের পর এক লাশ আসছে। ভ্রমর এই দিনগুলি রাতগুলির কথা ভুলতে পারে না তখন, আবার তাদের শনাক্তও করতে পারে না, কেবলই জমতে থাকে সেইসব লাশ, পচন ধরে, দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সারা দিন গুটিকয় কথা বলে মাত্র, পরিচিত লোক, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে পারলে বাঁচে। এই দুঃসহ অবস্থা, বিস্ফোরকে ঠাসা এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ খুঁজে নিতে সে হঠাৎ দূরপাল্লার এক ট্রেনে চড়ে বসে। ভ্রমর না থাকলে আমাদের সংঘ জমে না, চিত্রকর তখন ব্যবসার দিকে ঝোঁকে , অশোকতরু তরোয়াল হাতে সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত থাকে, নামজাদা লেখকদের সে তখন জেরা করতে ছোটে, তাদের অপদস্থ করার এক মহান কর্তব্য ঘাড়ে তুলে নেয়, দিনকতক এরকম চলছে। সংঘ এখন গভীর সুপ্তিতে রয়েছে, হয়তো আবার একদিন সে পাতা মেলবে, এই আশা থেকে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার অস্তিত্ব নেই, নেই অনস্তিত্বও। এইরকমই যেন সব কিছু...ভাষায় তা হবে না, ভাষায় সে নেই। ইশারা ইঙ্গিত, আভাসে, আকস্মিক টানে ওই সুপ্ত,

ওই জীবন, জীবনমৃত্যুর, হাড়মাংসের শান্ত বিস্তৃত নিসর্গে সংগীতের মতো কিছু এমন আক্রমণ করে বসে ভাষার ওপর, ভাষার নিয়মকানুন এমন মর্মান্তিক, নিষ্করুণভাবে তছনছ করে দেয়, যে দেখি বোবা হয়ে থেবড়ে বসে আছি, ভাবনা নেই, কিচ্ছু নেই যেন।

...অশোকতরু আমার হাত ধরে টেনে তুলেছিল।

শিল্পের সত্য ও সৌন্দর্যের শক্তি কি তোমার থেকে কম?

যদি এরকম কিছু থাকে...

হ্যাঁ। ধরে নাও না আছে।

তাহলে, নিশ্চয়ই...

তুমি তো তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধের জন্য, তাকে রক্ষা করার জন্য...কী দরকার! মনে হয় না এর থেকে ভাঁড়ামি বাতুলতা...

প্রচারক হয়ে পড়ছি?

অলীক বীরত্বে মেতে উঠছি।

অশোকতরু তবু যেন হাত কামড়াচ্ছে প্রমাণের নেশা তাকে গ্রাস করেছে, ভয়ংকর কষ্ট পাচ্ছে সে। তার ক্ষত শরীরের কোথাও নেই, যদিও আমি নিশ্চিত রক্ত ঝরে চলেছে, 'দ্যাখো অশোক, তুমি তো পুরস্কারে বিশ্বাস...', 'না করি না' কথাটা সে লুফে নেয় এবং দুটো বাড়তি কথাও বলল, 'এই মালটি সম্পর্কে বিশ্বাস-ফিশ্বাসের কথা তোলার মানে হয় না। এ হল গে ঘোড়ার ঘাস, কুকুরের মুখের হাড়'। একটা ছাড় অবশ্য সে দিতে রাজি, 'পুরস্কার সংরক্ষিত থাকা উচিত হদ্দ গরিব লেখকের জন্য'। তাতে শিল্পের থেকে ব্যক্তিকে বড়ো করে দেখানো হয় বলেই তো আমরা এভাবে কথা বলি, চলি, কথায় কথায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলব যেন নিজেদের। অশোকতরু একসময় অভিযোগ করল, নিষ্ক্রিয়তার দিকে আমরা চলেছি, মৃত্যুর দিকে, পছন্দসই মৃত্যুর দিকে। যেন শুধু ওইটুকু নির্বাচনের, রচনার স্বাধীনতা পেয়েছি, বাকি সবই ভুয়ো, মিথ্যে। 'তুমি আর একটিও শব্দকলঙ্ক রচনা কোরো না, সাদা কাগজে আর অক্ষর খোদাই করতে যেও না' অশোকতরু নয় নিজেই বলে চলেছি, বোঝাচ্ছি নিজেকে...

মুদ্রণ সৌন্দর্যের দ্বিতীয় পাঠ বা পরবর্তী অংশ, যার নাম হতে পারে

ছা য়া মূ র্তি রা

অন্তিম গানের শেষে অস্পষ্ট, মৃদুতর রেশ থেকে এক শুরুর কথা ভাবা যায়, যা শেষের শুরু, বা, শুরুর শুরু, যা কোনোদিন ফুরোবে না।

সূক্ষ্ম শ্রমের বিস্ফোরণ, কল্পনার আবাদ করব ভাবি। বন্ধুরা কী গভীর প্রীতিতে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আছে। তর্ক করছে। রাজনীতির, সভ্যতার পথনির্দেশনামা টেবিলে ছড়িয়ে রেখে যেখানে-সেখানে দাগ কাটছে তারা। আমি তাদের মুখে অনন্ত ভাঁজ দেখি, তাদের উরু যেন লাফাচ্ছে।

কলিঙ্গে রক্তবর্ষণের আগে সম্রাট অশোকের তেজি ঘোড়ারাও সম্ভবত এইরকম লাফাচ্ছিল। এমনই স্ফুরিত হয়েছে সামরিক অশ্বের নাসারন্ধ্র।

জরা ও মৃত্যু নিরোধক টীকা আবিষ্কৃত হল বলে। আর মাত্র ক-টা দিন। প্রলাপ বকছে উদোম জ্বরে। প্রযুক্তি আমাদের এমন স্মৃতি দেবে গর্ভে অবস্থানের, গুহাজীবনের কথাও আমরা অনর্গল বলে যেতে পারব, একবারও তোতলাতে হবে না

বেঁচে থাকা সেইসব দিনের জন্য, আশ্চর্য এক সুসময়ের জন্য। এখন পৃথিবী পুড়ছে, ঘাসজমি, ধানজমি জ্বলছে দাউদাউ। একমাত্র রক্ষণশীলরাই আতঙ্কিত এই আগুনে। যেন পুড়ছে তাদেরই চামড়া। একে চলা বলে না, অনন্ত স্থবিরতা অনন্ত যৌবন। গোঁড়া মানুষরা ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে লোকে তখন চাকরিবাকরি, ঘরকন্না ও ক্ষমতা নিয়ে ব্যস্ত। ডুবে আছে তারা। ভেসে যাচ্ছে। আর আমি কিনা শৈশবের অব্যক্ত অস্পষ্ট আনন্দের মোহে পড়ে আছি।

মোহ ছিল গভীরের কেন্দ্রের, একটা গহ্বরের। সূর্যসংসারের ভারসাম্যের কথা ভাবতাম, এখানে ব্যক্তি কোথায়?

'ভেসে যাওয়া' সকলেই বলে একথা।

'কোথায়?' এই প্রশ্ন ভাসানের ঢেউ ছাড়া কিছু নয়, সেও ভেসে যাবে গোপনে। মনে মনে বিড়বিড় করি, ঠোঁট কাঁপে, আমরা প্রকাশ করি না তবু। উচ্চারণ করি না 'বিনাশ' এই শব্দ।

এতখানি মায়া।

ডালপালাহীন, নিষ্পত্র, বেঢপ গাছটি রয়েছে প্রদর্শনীর মহার্ঘ বস্তুর মতো, তার গোড়া কংক্রিট বাঁধানো, আছে আকাশচাটা বাড়ি, তার, অ্যান্টেনা, পোস্ট। এইসবের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে দুরন্ত গতিতে পাগলাঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ছুটে যাচ্ছে দমকলের রক্ত গাড়ি। কোথাও কি আগুন লেগেছে? রক্ত কাঁপছে সেই শব্দ, ঘণ্টার শব্দ মারণাস্ত্রের মতো। ছুটছে দুরন্ত শিশু। 'কী করছ' গভীর আতঙ্কের মুখচাপা দিতে মরিয়া লোকজন হাসতে চেষ্টা করে। কোনো কিছুই গোপন নয়। আগুনের কথা, ভাঙনের কথা। সকলেই জানে। পবিত্র ষড়যন্ত্র আর ধর্মান্ধ মানুষের অন্ধবিশ্বাসে তারা ঢোক গিলে পরস্পরকে বলবে, 'কিছু নয়, ও কিছু নয়'। এবং আস্থা ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর এঁকে দিতে পিঠে হাত রাখে, 'কিছু করছ কি'? বা অতীতের উল্লেখ থাকে তাদের মমতাময় জিজ্ঞাসায়, 'ও, তোমার সেই কাজটার কী হল?' আমার, তোমার পেটের মধ্যে, আমাদের শরীরকে বোতলের মতো ব্যবহার করে ঘাপটি মেরে এই এতটুকু হয়ে আছে কর্মনাশা এক দৈত্য। বড়ো ভয় তাকে। সব কিছু নিশ্চিহ্ন করবে, ছাতানাতায় রূপান্তরিত করার প্রবল আদিম শক্তি তার একান্ত অনুগত। আত্মরক্ষার জন্য হাতের কাছে যে কাজ পাই আমরা আঁকড়ে ধরি, ঝাঁপ দিই জলে, আগুনে।

অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎগ্রাসী এই কর্মপ্রবাহ...ঢেউ টপকে টপকে তার উৎস, উৎসেরও উৎসে শুরুতে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? যেখানে ছিল নেই, আছে নেই, এমনকি নেইও নেই। হাবিজাবি কাজের আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। আমরা হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, বক্তার দিকে ছিল একগুচ্ছ তর্জনী। তুমি আমি যে কেউ বক্তা, শ্রোতা, তর্জনী আমাদেরই।

পাগল! সাধক! সন্ত! উন্মাদ! উন্মাদ!

বোকাচোদা।

ওকে যেন চাকায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, চাকা ঘুরছে পিছনে, থেঁতলে যেতে যেতে পিষ্ট হতে হতে ভাবছে একসময় চাকাটি হাওয়া হয়ে যাবে, ন্যাড়া টিলার ওপর গ্রাম-গ্রাম সবুজ এক পরিমণ্ডলে সে নিজেকে দেখতে পাবে, দুঃস্বপ্ন থেকে আচমকা জেগে উঠে হাঁটিতে থাকবে নদীর দিকে। যেখানে সার্ভিস দিতে রেডি প্রকৃতি-সেবাদাসী, যে বলবে না, 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।'

যে কুটোটি পর্যন্ত নড়ায় না, ক্রিয়াপদের ব্যবহার নিজের জীবনে যে প্রায় মুছে ফেলেছে, এমন একজনের কথা আমরা কল্পনা করেছি। সাহিত্যের চরিত্র নয় সেই ব্যক্তি, বাস্তব আর কল্পনার অর্ন্তবর্তী দুটি ঢেউয়ের ফাঁকে সে আছে। এই আমাদের শৈশব, তখন 'ভ্যাবলা' নামে ডাকা হত আমাদের। আচমকা বিস্মৃতিগর্ভে পা দিয়ে ফেলতাম, কোনো একটা দিকে তাকিয়ে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে ডেকে, ধাক্কা দিয়েও সাড়া জাগত না। সেই নিরুদ্দেশযাত্রা। তার শিহরন আমাদের শরীর থেকে পালকের মতো ঝরে পড়েছে। স্মৃতি, সংস্কার জুড়ে বসেছে। থ্যাবড়া গাড়ি এসে যন্ত্রচালিত জাঁতা দিয়ে সরিয়ে নিয়েছে পালকস্তূপ। এমনও হতে পারে। জঞ্জালগাড়িতে একবার ন্যাকড়ার পুঁটলিতে মৃত শিশু দেখেছি। এখন আমরা যুদ্ধ করছি, চোখেমুখে কথা বলছি, মিথ্যে গিলছি, মিথ্যে উগরে দিচ্ছি, ক্ষমতা বুঝছি, আল-বাল কত কি করছি, আর কিছুতেই ভুলতে পারিছ না সন্তসদৃশ এক ভালমানুষির রূপকথা যা এই দেশে ডুবো পাহাড়ের মতো জেগে থাকে। ভুলতে পারি না পুঁটলিটির কথা।

যতি চিহ্নহীন দিবাস্বপ্ন ভেসে আসে:

বহুজনের, অসংখ্য অগণন মানুষের ভিড়ে, তাদের ছায়ায় মিশে থাকা একজন 'আমি' দাঁতে দাঁত দিয়ে আছি 'স্থবির হয়ে আছি'; খুবই ভঙ্গুর সাময়িক এই স্থবিরতা। আলো, বাতাস, ঠান্ডা, গরম সহজেই বদলে দিতে পারে, সেইসবে সাড়া দিতে উন্মুখ নমনীয় এক ধাতু 'আমি', সবসময় কারা যেন নাম ধরে ডাকছে আমাকে, দরজা হাট করে খুলে, হঠাৎ হঠাৎ অন্দর খুলে বেরিয়ে পড়ছি চিৎকার করছি—কে? কে?

আর্ত চিৎকারে দিবাস্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়। যতিচিহ্ন আমাকে ফাঁস পরাতে থাকে, গতি নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত তারা। কেউ নয় কোথাও কিন্তু কেউ নেই।

আত্মার দোসরদের প্রতি অবিশ্বাস গভীর এক ক্ষত, অন্তহীন রক্তক্ষরণের সেই ক্ষতমুখে আমি হাত রেখে উষ্ণ স্পন্দন অনুভব করি। আমাদের মধ্যে দূরত্ব এক অগ্নিকুণ্ড গহ্বর। আমাদের মধ্যে আছে চাপচাপ রক্ত... স্বপ্ন।

পুনরাবৃত্তি।

স্বপ্নও পুনরাবৃত্তিমূলক হয়ে ওঠায় আতঙ্কে পেটের ভিতরে চলে যাবে জিভ। আমারই দু-পাটি দাঁত চিবিয়ে খাবে আমার ঠোঁট। বোতলবন্দি দৈত্য ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে আমাকে। পৌরাণিক দৈত্য, রূপকথার ওই ভয়াবহ শক্তি, সেই প্রবল হাড়, করোটি, মৃত্যু...এই মৃত্যু আমি, হন্তারক আমি, আণবিক বিস্ফোরণের অধীর অপেক্ষায় আছি। সবুজ

পাতা সবুজ শির, নমনীয়, ভঙ্গুর কাচ ব্যাপ্ত জীবনের প্রান্তরে। বহন করে চলেছি ঘাতককে, কোথায় প্রাণ, কোথায় প্রাণ...। রাস্তা গলি, রাস্তা গলি, রোজগার, খরচ রোজগার, খরচ দিন, রাত, আলো অন্ধকার, রাস্তা রোজগার—এইসব খরচের খাতায় খরচ হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি কোষ, মুহূর্ত। দাঙ্গায় নিহত লাশ। দমকলের গাড়ির তলায় পিষে গিয়েছি।

হন্যমান! হন্যমান!

আত্মপ্রেমের বিষে নীল হয়ে যেতে যেতে, পুড়ে যেতে যেতে ভেবেছি সময়ে শান্ত হব, আগুন নিভবে ঠিক। অপেক্ষা করতে হবে, মেয়াদ পূর্ণ হলে দণ্ডিত শুদ্ধ হবে, মুক্তি পাবে। শুদ্ধি, মুক্তি, দণ্ড—এইসব নাস্তিকের বিশ্বে কী করে স্থান পেল! তাদের তো এখানে বেঁচে থাকার কথা নয়। নিশ্ছিদ্র যুক্তিবাদী, কোথায় হে তুমি আমার হাত ধরো। বন্ধুরা যেন উড়ে এসেছিল, লতায়-পাতায় গড়ে ওঠা সেই সম্পর্কের কত না পর্দা, অণু-অণু হয়ে আছি পরস্পরের মধ্যে। কী করে এই বৃহৎ দেওয়ালচিত্র থেকে, মন্দিরে খোদাই ভাস্কর্যের সারি থেকে একজনকে, এক একজনকে পৃথক করব। আবার তা দৃঢ়সংবদ্ধ নয়, স্থান কাল বিচ্ছেদও আছে। কে কোথায় ছিটকে গিয়েছি, মুখ থুবড়ে পড়েছি। সাফল্য-ব্যর্থতায়। দু-টুকরো হয়েছি। রাজনীতি আর সাহিত্য, সংসার আর শূন্যতায়, ভোগ ও বঞ্চনায়, ক্ষমতা ও অসহায়তায়, এক আর একে, দ্বি-খণ্ডের দ্বি-খণ্ডীকরণে। খণ্ড খণ্ড খণ্ড...বালি উঠছে, বালি হতে থাকি।

স্থিতাবস্থার সমর্থক হিসাবে নিজেদের চিনে নিতে ঢের সময় লেগেছিল। অন্ধ। চক্ষুষ্মান অন্ধ, দেহী কিন্তু পঙ্গু। অথচ অন্ধখঞ্জের দিব্যদৃষ্টিহীন, মহিমাহীন দাসের দাস, জীবন যার সহজ নয়, প্রকৃত জ্ঞানীর উজ্জ্বল সাহস যার নেই। বিপ্লববৃত্তান্ত শুধু সত্তরের দেওয়াল থেকে নয় মুছে গিয়েছে আমাদের জীবন থেকেও। জ্যামিতিক নানা আকারের ছাদ, শহরের ম্লান আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে টব, ফুল ও বনসাই মুখে নিয়ে, সেই আকাশছাদ থেকে ক্বচিৎ ছেঁড়াছেঁড়া মেঘে, বিদ্যুৎ চমকে কারো পাশমুখ ঝলসে ওঠে, সে তখন অতীতে চলে যায় উলটো সময় স্রোতে। ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকেও কি সময় যেতে পারে, যায়? প্রগল্‌ভ সাহিত্যের কথা আমরা বলতাম, যেখানে ভাষা ঘটনার জ্বালানি মাত্র, ভাষার এই বহ্ন্যুৎসবে আমাদের চামড়া পর্যন্ত পুড়ে যেত। পরের দিনই সম্ভব ছিল সব ভুলে যাওয়া, বাঁচনমন্ত্র এই বিস্মৃতি। বাঁচতে হবে, প্রথমে বাঁচা, শেষেও বাঁচা। যেন অমরত্ব রয়েছে আমাদের কোষে মরণশীলের চামড়ায়। সব কিছুকে, আগুনকেও আপোশ করতে হবে বাঁচার সঙ্গে। অন্ধ দৈত্যকেও নত করতে হবে মাথা।

শুষে নিচ্ছে চিন্তা, অনুভব, কল্পনাও। বধ্যভূমির সাদা দেওয়াল সামনে, 'এই কি শেষ?' জিজ্ঞেস করছে একটি শিশু, যুদ্ধের আগুনে বোমায় ঝলসে যাওয়া, ধুলো ওড়া দিগন্তবিস্তৃত মাঠের একপ্রান্ত থেকে সে ছুটে আসছে, মুখ থুবড়ে পড়ছে, আবার উঠে পড়ে প্রশ্নটি মুখে নিয়ে ছুটছে সে : এই কি। এই। কি। শেষ। শেষ।

শিশুর মতোই আমরা ফুরোতে দেখেছি, একটু একটু করে পুড়ে যেতে দেখেছি, আর নেই, চিন্তার শক্তি নেই। পুনরাবৃত্তির ঘোর ক্লান্তি উঠে আসছে ধোঁয়ার মতো (এই লেখাটির মতো)।

অনুর্বর।

ন্যাড়া মাঠ।

কম্পিউটার বিব্ বিব্।

দাও ফিরে সে...কী অসম্ভব এখন! পিশাচ হাসি উড়ে আসে ঝড়ের মতো।

নদীতীর, ঝাউ আদিবাসী রমণীর পায়ে চুমো খেতে যায় কল্যাণ দে, সুমন্ত সেন-রা, আর দৈত্য হয়ে ফিরে আসে, যোজনা অফিসের ঠান্ডা ঘরে বসে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্ত্রীর বক্তৃতা লেখে মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে, চমৎকার ইংরিজিতে।

জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার মাঝখানে সবুজ পাথরের গোল টেবিল ছিল একটি, টেবিলটি সেজে উঠেছিল মুরগির ঠ্যাং হুইস্কির গ্লাস ও দামি সিগারেটের প্যাকেটে। আলোচনাচক্রের এই দৃশ্যটি চলনশীল, মুহূর্তে তা শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে, মুহূর্তেই তা শূন্য থেকে, বাতাসকণায়, ভাসমান দানার মতো জুড়ে জুড়ে ফিরে পেতে পারে নিজেকে, হয়ে উঠতে পারে আলোচনাচক্রের সেই মহার্ঘ, মূর্ত টেবিল।

দে-সেন-মুখার্জিদের চেনার উপায় নেই, সবুজ পাথরের টেবিলটিই এক নিঃশব্দ ঘোষণা: এখানে তারা আছে, এখানে রক্ত ছুটছে মাথায়।

আমরা কি মরছি? ভিন্ন এক দুর্ভিক্ষে? এতখানি স্বাস্থ্য, চার দশকের সঞ্চিত বিত্ত, নিরাপত্তার দলিল ও কাগজ কি কিছুই নয়? এই যে চামড়ার থলের মতো আমরা। একে কি সংকট বলে? মামুলি, ছাতানাতা সমস্যা সামাল দিতে না পেরে পিঠ বাঁচাতে বড়ো বড়ো গোল গোল কথা বলছি, এমনও তো হতে পারে, না কি?

কী ঠাণ্ডা! কী অপরিসীম সহনশীলতা!

স্রোত টেনে নিচ্ছে, এই হালকা ভেসে যাওয়ার ঘুমপাড়ানি নেশা থেকে যে কোনোদিন জাগবে না, নিদ্রালস ভ্রমণে যন্ত্রের নৈপুণ্যে সব কাজ যে ঠিকঠাক করে যেতে পারে তারও সংকট! হয় নাকি!

এ কোন বিলাস যা মানুষের চা-ই চাই, মার্জিত জীবনের একখণ্ড হীরক, মরুপুষ্প নয়।

যুক্তি হাতুড়ি পিটিয়ে শৃঙ্খল গড়ে যাচ্ছে মহাপ্রেরণায়। ক্লান্তিহীন, নিরলস চেষ্টা। এর শেষ বলে কিছু নেই। বিশৃঙ্খল ঘটনাবলিকে কার্যকারণ সম্পর্কে চিহ্নিত করার দুর্মর বাসনার মৃত্যু নেই। এই গল্পক্রমের সিঁড়ি ভেঙে ঘটনা ও তার কারণ টপকে টপকে, দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কোথাও কি যাওয়া যায়? এরকম নিমযাত্রার কথা কে কবে শুনেছে?

আমাদের টান ছিল সামনের দিকে, ভবিষ্যতমুখী সেই যাত্রা এক লাগাতার অতিক্রমণ, 'বিপ্লব' শব্দে আমরা তাকে চিহ্নিত করেছিলাম, পাশে তির এঁকে দেওয়া হয়েছিল, সকলের জন্য এই এক পথনির্দেশ। জেলখানা হাসপাতাল হবে, সমস্ত থানা হবে শিশুনিকেতন এবং এইভাবে গড়ে উঠবে নতুন এক বিশ্ব। শুধু কবিতা নয় কল্পনা নয়, ক্ষমতার ষাঁড় নিধনে যে বিস্ফোরণ ও ধোঁয়া ছিল আমরা তাকে অগ্রাহ্য করেছি। সেখানেও ঘাপটি মেরে থাকা ধর্মের ষাঁড়-কে দেখিনি। রাজনৈতিক আদর্শকে দর্শনের বেদি ছেড়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছি।

এখন পতাকা মাটিতে গড়াচ্ছে, ছেঁড়া চপ্পল, কলম, নোটবই, রক্তমাখা রুমাল পড়ে আছে, বাতাস তাদের নিয়ে খেলছে, বড়োদের চপ্পলে পা গলাচ্ছে একটি শিশু, কাগজকুড়ুনি নোটবইটি তুলে নিতে ধনুক হল।

অহংকার এবং ঘৃণা এরপর দীর্ঘদিন বেঁচে থেকেছে, পথপ্রদর্শকের পিতাসুলভ অহংকার...

হালকা সবুজ রঙের উলকি বুক ও বাহু থেকে তুলতে নিঃশব্দে রক্ত ঝরেছে। কেউ কাউকে সে কথা বলিনি। আর রোজই একটু একটু রক্ত ঝরেছে বলে প্রাত্যহিকতায় তা ডুবে যেতে পারে, এতখানি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে মনে মনে ভেবেছি, 'আহ্ মুক্তি'।

এই হাওয়া বদলকে মনে করেছি পুনর্বিবেচনা, ভেবেছি বিপ্লব সম্পর্কে গূঢ় প্রশ্ন আছে আমাদের, ভুলের পাহাড় দেখেছি, বিপ্লবগর্ভে ওত পেতে থাকা ক্ষমতালোভী কীটের কথা অনেকে বলেছে।

আমরা কীট নই।

ষড়যন্ত্র করিনি কখনও, অথচ দ্যাখো সেই আমরা লাশ হয়ে গেলাম, আমাদের রক্তে পিচ অবধি ভিজে গেল। ইতিহাসের মানুষ, নিজেদের সম্পর্কে একথা ভাবার গর্ব কত দ্রুত থেঁতলে গেল। তারপর তো ইতিহাসের ন্যাড়াপোড়া। তার মৃত্যুতে শোকযাপন করেনি কেউ, গভীর অসুখ থেকে ওঠা অশক্ত, দুর্বল দেহে, ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে আর এক রোগশয্যার কিনারে পৌঁছে বিস্তর খুশি হয়ে পড়ি, তাকেই প্রকৃত সুখ জেনে ওষুধের শিশি ও ফল সাজাতে থাকি ব্যস্ত হাতে। আবার এক ব্যাধি তার মানে আবার নিরাময়...

ভাস্কর, সিদ্ধার্থ, বিনয়, সত্যেন, খুকু এবং আরও অনেকে ম্লান সন্ধ্যায় গল্প করতাম, ন্যাড়া ছাদে কী বিপুল উত্তেজনা এবং সমস্তই শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে, বিপ্লবাশিষ্ট ওই স্বপ্নবাস্তবে তুষের আগুন। পোড়ো, পোড়াও। দেখা গেল গল্পের জীবনে খাওয়াপরার জীবনসংগ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, প্রেম এমন একমেটে যৌন, এমন বেসুরো বিলাপ হয়ে উঠছে যে কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল।

আয়, এগুলো পুড়িয়ে ফেলি।

অক্ষর পুড়ছে, আমরা গোল হয়ে দেখে যাচ্ছি তাদের বেঁকে যাওয়া কালো হয়ে ওঠা, শুনছি যন্ত্রণার মৃদু শব্দ।

কোনোদিন সম্পূর্ণ হবে না সে, মরা ডালে ফেঁসে ঝুলে আছে, অসম্পূর্ণতা শব্দটি বেছে নেওয়া হয়েছে, তাকে পরিণতি দিতে। এমন এক অবস্থা এমন এক পরিস্থিতি বোঝাবে এই শব্দ যেখানে সম্পূর্ণের সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ।

শুরুর অংশটি অংশই, সেখানেই তার শেষ বা তারপর খুলে যেতে পারে হাজার রাস্তা।

বাক্যবন্ধে, শব্দের মোড়কে তার বন্ধনীর মধ্যে সময় রয়েছে ভাবি, ভাবি স্পন্দিত হচ্ছে সময়। আমাদেরই শ্বাস, প্রাচীনের, প্রাচীনের প্রাচীনের।

সাদা পৃষ্ঠায় কলঙ্ক লেপনের দানবীয় কামনা এবং এই বিশ্বাস—কী যেন গড়ে উঠবে, চমৎকার কথা হবে, আমরা ধারাস্নানে শীতল করব শরীর, আমাদের অশান্ত মনের ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়বে। রক্তের মধ্যে দানা দানা হয়ে আছে এই অভিমান তার

মোহনাগতি। ভঙ্গুর অসহায়তায় ভেসে যাব, আত্মসমর্পণের দলিল রচিত হবে, একদিন কুটিকুটি করে ছেঁড়া হবে বলে এখন কাগজে এসব দাগ কাটা; ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে।

আহা! শালিকছানাটা...

ডানার শব্দ, ঝটপটানি, কার্নিশ ছাড়িয়ে টেলিগ্রাফ পোস্ট ছাড়িয়ে রেলিঙে শুকোতে দেওয়া ডুরে শাড়ি ছুঁয়ে ফালি আকাশের দিকে ওই, ওই উড়ে গেল।

আমার ছেলেবেলা নয়, কার যেন, তোমার?

এক হাজার, দু হাজার, দশ হাজার শব্দ, দশ-বিশ রকমের রং, আকার, ব্যাস শেষ। আর নেই। ফতুর ফকির। একতারা সম্বল করেছে এই গভীর দৈন্য উপলব্ধি করে।

শোষক ভাষার কথা ভাবি, মানুষের সৃষ্টির নেশা এই ভাষা বাপ ঠাকুরদা পিতামহ ঠানদি, শৈশবের আধো বুলি থেকে দুরন্ত যৌবনের স্পষ্ট উচ্চারণে আমরা সৃষ্টি করেছি। এ আমাদের সন্তান, মন্ত্র ও আর্তনাদে। পিতৃঘাতী মাতৃঘাতী সে। জন্মশত্রু এক। কত দূরে নিয়ে এল, অরুণ্য, গুহা, নির্ঝর ফেলে এলাম, পড়ে রইল গ্রাম, এখন এই শহর এরপর কী? আর কত দূরে টেনে নেবে সে?

অ আ

দু-চোখে আঁকা ছিল এই দুটি স্বরবর্ণ, এমনও হয়েছে যেন তারাই মণি, ভাষাদৃষ্টি পেয়েছি আমি। জন্মের পরমুহূর্তে ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় গ্রহের মতো সজীব চোখ দুটি ফতুর হয়ে যায়, সেইখানে গুহাচিত্রের আদলে ফুটে ওঠে বর্ণমালা, শব্দকোষ, সাংকেতিক লিপি।

'আ' এই বর্ণটিই নাকি আমি প্রথম উচ্চারণ করেছিলাম, যা মাত্র তিন বছর বয়সে আরও একটি দুটি বর্ণ খুঁজে নিয়ে জীবনগীতের মতো হয়ে ওঠে।

আমি আমি আমি

যেখানে যতদূরে দু-চোখ যায়, যা দেখেছি, যা দেখিনি, কি বাস্তব কি স্বপ্ন সর্বত্র সর্বনাশা আত্মপ্রেমীর এই প্রতিধ্বনি। গুহায় ছিলাম, পাথর ঠুকে আগুন জ্বেলেছি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে যেতে বেঁচেছি, অজস্র আমির ঘাতক আবার তাদের রক্ষাকর্তা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ অতিক্রম করে বেঁচে আছি বয়সহীন, সময়হীন। কোনোদিন মরব না যেন, যযাতি যৌবন কোনোদিন ফুরোবে না, ফুরোবে দিন, ফুরোবে সময়। শুকনো পাতার মতো, মুঠো মুঠো ধুলোবালির মতো উড়ে যাবে সেই অনন্ত, সাধারণ মানুষ যাকে সময় বলে। আমাদের জন্ম যেন জন্মের জন্মের জন্ম...তার কোনো সাল তারিখ নেই, কুয়াশার চাদরে, ধোঁয়া ধোঁয়া বাতাস আর হিমে তা হারিয়ে গিয়েছে। হারিয়ে কোথায় যায়? আর এ কেমন হারিয়ে যাওয়া যাতে অবলুপ্তি নেই, বিনাশ নেই। স্মৃতি, চিহ্ন, ফলকে, স্তোত্রে সে-ই তো সবচেয়ে বেশি করে আছে। শতাব্দী পেরোনো গাছের মতো।

ওরা কোথাও থাকে না। জন্ম উদ্‌বাস্তু ওরা।

কেন? কেন?

আমাদের মতো নয়, শিকড় নেই যে...

মরুপ্রান্তরের এই সংলাপ ছুটে বেড়াচ্ছে গভীর অতৃপ্তিতে, কাচের ঘর, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রেনের চলন্ত কামরা কোথায় না যেতে পারে এই ধ্বনি। কীর্তিনাশা আগুনশিখা প্রান্তর আঁচড়ে উঠে আসছে এ দেশের ঋতুরাজ, সে গ্রীষ্ম। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা তার ঠিকানা, মুখে আঁকা আছে ঠিকানা, সেইরকম তামা রং, মাটির সেই ফাট। সব কিছু এক। তবে একজন নয়, তারা বহু, অসংখ্য, যেন আয়নাঘরে প্রতিফলিত একের অজস্র মূর্তি। রুখু মাটি, পাথুরে ও বেলেমাটি গড়ে দিয়েছে তাদের নাক-মুখ-চোখ, নদিয়ার পুতুল যেন। মৃন্ময় মানুষরা কী অবহেলায়, কী গভীর বিশ্বাসে আমাদের মুখের উপর দৃষ্টি বিছিয়ে দেয়, উত্তুরে বা দোখনে টানে, আঞ্চলিক ভাষায় আমাদের ভবিষ্যৎ বলে দেয় মহাজ্ঞানীর মতো : বুঝবে বুঝবে, একদিন বুঝবে।

বড়ো রহস্য করে কথা বলে তারা, সন্তের মতো। ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে, কত শব্দ শোনেইনি। 'সারা জীবনে মাত্র শ-দুয়েক শব্দ ব্যবহার করেছিল আমার বাবা' একজন তো বলেই ফেলল। আর কী হাসি!

হুটহাট অফিসে ঢুকে পড়ে তারা, ঝোলা থেকে বের করে গোটানো পট, প্রেম ও প্রতিহিংসার লোককাহিনি সুরে আউড়ে যায়, নিজের বাহুর মতো একতারাটি থেকে নিংড়ে নেয় বৃষ্টির শব্দ, কলকাতায় বাণিজ্য করতে আসা গ্রাম, চলমান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বাণী তাদের বুকে মুদ্রিত আছে, প্রচারকরা সেকথা বলে না, জামা সরিয়ে নেয় না, ফতুয়ার বোতাম খোলে না : এই দ্যাখো।

ঠগ ও জোচ্চররা দলে জুটেছে, সাহেবের দেশে গিয়েছে, কেউ কেউ গাঁজা আর ধেনো ছেড়ে বাঁক নিয়েছে নেশার অন্যপথে।

মরব না কোনোদিন।

অফুরন্ত জন্ম আমাদের।

ঘাসের মতো।

জলের মতো।

খিদে, অভাব আর দৈনন্দিনের অসহায় গ্রাম নয় সে। নারকেল পাতা চুঁইয়ে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও টপ টপ করে এখানে জল পড়ে, পাথরে খোদাই একটিই চিত্র সারাজীবন ধরে দেখার মতো দর্শক, একখানি পুথি সারাজীবন পড়ার মতো পাঠক আছে এই খড়ের গাদা আর পচা ডোবার ভূখণ্ডে। পরিবর্তনের, বদলের ভয় নয়, এইসব ভালোবাসে বলেই শিশুর মতো আঁকড়ে আছে। যতদিন এই মানুষ বাঁচবে ততদিন মুছে যাবে না গ্রাম। সে বলেছিল 'বুঝবে, বুঝবে, একদিন বুঝবে', কেউ কেউ সন্দেহ করেছে তাকে, ভেবেছে : সে কি ঠগ? মৃত গ্রামের নিরন্ন ধান্দাবাজ মানুষ!

গ্রাম/শহর, শহর/গ্রাম, নারী/পুরুষ, পুরুষ/নারী...আর কিছু নেই। মানুষের, পৃথিবীর। নারীপুরুষ-গ্রামশহরে পৃথিবীর শেষ। নক্ষত্রের আয়ু ক্ষয় হয় শুধু এই পৃথিবীর ডোবায় পুকুরে নিজের মুখ দেখবে বলে, নিজেকে চিনে নেবে বলে। আমরাই তো আঙুল তুলি শূন্যে—

ওই দ্যাখো স্বাতী!

অরণ্য, প্রস্রবণ, পর্বত ও হিমবাহ; দেশ-দেশান্তর খুঁজে ফেরা রক্তপ্রবাহ সমুদ্রের মতো। আবিষ্কারের হার্মাদ শিহরনে, মৃত্যু নেশায় নোনা জল গিলে চলেছি আজও।

বালিতে পায়ের ছাপ, দাগ—চাকার, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, সিগারেটের টুকরো, হাওয়াই চপ্পলের ফিতে, টুপি, খুঁজলে আরও কত কিছু পাওয়া যাবে, জাহাজডুবির কথা মনে হবে।

ন্যাড়া ছাদের সিমেন্ট ও বালুকণা থেকে গরম ভাপ উঠছে, আমরা সুস্থির হয়ে বসতে পারছি না।

এখন সময় আছে।

পরেও থাকবে।

ভেবে দ্যাখো।

কিচ্ছু ভাবার নেই।

কিচ্ছু না?

কিচ্ছু না।

ছাদের দেওয়াল থেকে বালি খসে পড়ছিল। আর অনেক বালি খসে গেলে এই বাড়ি ছাদ ভেঙে পড়বে, আমরা কেউ তখন থাকব না।

আমরা আরও অনেক কথা বলেছিলাম, মধ্যরাত পর্যন্ত। ছাদ ঠান্ডা হয়ে আসে, বাতাসও এবং আমরা। তার আঙুল গ্রন্থিমোচনের জন্য ঘুরছিল ফিরছিল তারই লম্বা চুলে, ঘন চুলের প্রত্যেকটিকে সে আলাদা করে ছুঁতে চাইছে, প্রত্যেকটিকে, তাদের প্রাণ ঢেলে আদর করছে। 'আমি নয়' ফিসফিস করে উঠি, সে বলে 'আমি নয়' আমরা সেই রাতেই জানতে পারি এই টান বহু দূরের, সামান্য মানব-মানবী আমরা ভেসে যাচ্ছি আকাশ আলোয়। ভালোবাসার এই গল্পটি এইমাত্র মনে পড়ল।

খননকারীর দল ফিরে গিয়েছে নিশ্চিত আরামের দিকে, গৃহে, দলছুট দু-একজন বেহেড মাতাল হয়ে আগুন বমন করছে, তাদের মেরুদণ্ড ছোঁয়া সূর্যাস্তে মৃত্যুর আভাস ছিল।

কিছু ঘটেনি, অনেকদিন কিছু ঘটেনি, দিনগুলি শূন্য, শুষ্ক হয়েছে, গাছের পাতার মতো ঝরে যাচ্ছে শুধু। কী অসীম তিক্ততা! গভীর অতৃপ্তি! ন্যাড়া ছাদের নারীপুরুষ এখন কত দূরে?

শরীর খোলস হয়েছে যেন। চোখ : দাস। মন: ব্যাধি। উন্মাদ হওয়াই কি মানুষের পরিণতি?

দল, ব্যক্তি, সমাজপিতা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, অধিকর্তা, অফিসার এবং সম্পাদক সকলের শ্রীবৃদ্ধি হোক, স্তাবকে পরিপূর্ণ হোক তাদের বৈঠকখানা, অফিসঘর। পিঁপড়ের সারির মতো স্তাবকই তাদের একমাত্র পুরস্কার। কষ্ট হয়, আহা বেচারারা! মোটা দাগের গল্প আর গোদা কথার জন্য কী পরিশ্রমটাই না করে! অসীম দে এসেছিলেন কফি হাউসে, তেত্রিশজন শিল্পীকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কী মানুষ! তাঁর গাম্ভীর্য লোহা এই ধাতুটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমাদের এই দেশে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কোনো শেষ নেই, পৃথিবীতে লাল দেশগুলির বিপর্যয় ও পতনের উল্লেখ করে অনেকেই এই জীর্ণ মানচিত্রের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকাচ্ছে। বলছে : খেতে পাই না পাই আমাদের স্বাধীনতা...

বৃষ্টিভেজা মাটি, কত দাগ, চিহ্ন, ক্ষত সেখানে। আমরা জানি না কীভাবে তা পড়তে হবে। স্রষ্টা পাঠক নই। কথা জলের মতো। শব্দরা নিস্তরঙ্গ জল। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যায়। অ-বাক্ যা সে তাকে ছুঁতে পারে না। ভাষা মানসগোচর হওয়ামাত্র বিকার কি অনিবার্য? খ্যাতি এক বিকার-লক্ষণ, হয়তো আরও অনেক লক্ষণাদি আছে।

তুই সাধু হ।

সব ছাড়।

সমাজ।

সংসার।

দারিদ্র্য মহান।

মৃত্যু মহান।

সাহিত্যে এখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তেজস্ক্রিয় অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, আঁকা হচ্ছে সমাজছবি। সকলেই স্বীকার করে অবিচার, শোষণ ও নির্দয়তা আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সাহিত্য কীটনাশক। দরিদ্ররা জানে না সে-কথা। তারার আলোর থেকে বহুগুণ ঝকঝকে এখন পৃথিবীর পিঠ, আলো অস্ত্রের মতো ধারালো, এখানে একদানা শস্য পড়ে থাকলে তাকেও বৃহৎ দেখাত, নবগ্রহের একটি মনে হত। অবিশ্বাসীদের দলে ছায়ামিছিল বেড়েই চলেছে। তারা চিৎকার করে উঠছে, আর্তনাদ করছে : না নেই, এখানে কিছুই নেই।

নবজীবন অসম্ভব—এই কথাটা খোদাই করবে বলে ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে এসেছে।

রাগ, জ্বালা এসব নয়, সেও ছিল একদিন, ধুলো, বাতাস ও জলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সময় মুছে দিয়েছে তার দাগ। আছে শুধু পরিত্যক্ত হ্রদ একটি, রহস্যময় এক ক্ষত। বাস্তববাদীরা একে কদর্য ন্যাকামি ভাবেন। কর্মবিশ্বাসী তাঁরা। বলেন, 'কই দেখি!'

প্রকাশ বড়ো ভয়ংকর বড়ো বিপদের কথা, উচ্চারণমাত্র, এঁকে ফেলামাত্র, ভূমিষ্ঠ হলেই দূষিত; শেয়ালকুকুরে ছিঁড়ে খাবে তাকে, তুমি শুধু বয়ে চল, এই আগুন নিয়ে চিতায় ওঠো, তখন সব দিব্য চিত্র হবে।

সল্টলেকে ঢোকার মুখে ন্যাড়া মাঠটিতে সার্কাসের মৃত হাতিকে কবর দেওয়া হয়েছে, এই নিয়ে কাগজে খুব লেখালিখি চলছে (কয়েক বছর আগের কথা, কিন্তু তা এইমাত্র এমনভাবে মনে পড়ল যেন আজই ঘটেছে)। তখন সিংহগর্জন শোনা গিয়েছিল কি? সার্কাসের সিংহের, যে আর অরণ্য পাবে না ফিরে, সিংহ অরণ্যকে পাবে না, অরণ্য পাবে না সিংহ, কে কাকে পাবে না আর!

পাবে না আর।

পাবে না আর।

নিজের ভাষা, একেবারে নিজের ভাষা, বর্ণমালা, শব্দ ব্যবহাররীতি শৈশবে ছিল, তারপর নেই হয়ে যায়, কত খুঁজছি তাকে, খুঁজে চলেছি, খুঁজতে খুঁজতে মরু, খুঁজতে খুঁজতে সিমেন্টের দেওয়াল, জলজীব এই শুষ্কতায় মারা যেতে বসেছি, দেখছি আমার লাশ, মরুতে, সময়-মরুতে পড়ে আছে।

এতখানি নিরাশ হয়ো না, নৈরাশ্য এক ব্যাধি, পৃথিবীতে এখনও আছে মায়ামোহ, আছে সম্ভাবনা যে কোনো মুহূর্তে তাল ঠুকে শুরু হয়ে যেতে পারে চটকদার, জমাট গল্প, নাটকীয় সব ঘটনা ঘটতে পারে, ঘটনা ঘটতে পারে...

ছবির মতো, দৃশ্যের মতো আমাদের ভাবনা সব যেন চিত্রেই প্রকাশ পায়, সংগীত সেখানে রশ্মি।

বাঁচা, মরা...

দৃশ্য।

সংগীত।

সুর সে কি তুলি, শূন্যে ছবি আঁকা, (স্পর্শের কথা মনে হয়, রঙের কথা হয়, ভেবে ফেলি অনন্তস্পন্দন এক হৃৎদপিণ্ডের কথা, আর একটিও শব্দ আঁকা উচিত নয়, অথচ, মহাজীবনের প্রবল শব্দ ধেয়ে আসছে, সেই তাকে আঁকা, তার পচা লাশ ফুলে উঠবে, বিবর্ণ কাগজে কোনোদিন স্পন্দিত হয়নি সে।) বিশ্ব রচনার অন্ধ তাড়নায়, অস্থির প্রহারে জর্জরিত সামান্য মানুষ, কত অজস্র মানুষ হাতে তুলে নিয়েছিল বীণা, তুলি।

কার্তিকের ধান কেটে নেওয়া মাঠে চাঁদের ফোয়ারার মধ্যে চিতপাত পড়ে থেকেছি গোটা একটা রাত। বালুরঘাটে এমন একজন মানুষ ছিল না যাকে আমি চিনি, যে আমাকে চেনে। জ্যোৎস্নাসুন্দরীর সঙ্গে এক রাত, এখন এইরকম ভাবি। বালুরঘাটের মাঠে, হু হু বাতাস, চাঁদের বরফ, মেঠো গন্ধ, পোকার শব্দ-ই সব এখন। বারবার দুর্ভিক্ষে মৃত কৃষকের মুখ, বারবার বাঁচার চেষ্টায় তার রক্তাক্ত বুক আজ যন্ত্রণায় ইতিহাসে স্থায়ী আশ্রয় পেয়েছে ভাবি। আজ আর মাথায় রক্ত ওঠে না। অস্ত্র এক চূড়ান্ত নিষ্প্রয়োজন। ঝিমিয়ে পড়ছি, স্তিমিত হচ্ছি, ধীরে নিভে যাব, ধীরে ধীরে...

রক্তোচ্ছ্বাসের সেই মাঠ, সেই মানুষ বঙ্গদেশে আজও আছে ভিন্ন নামগোত্রচিহ্নে, মশালবাহক তারা, ধরে নেওয়া হয়। কেউ সে-কথা বিশ্বাস করে, কেউ করে না, যারা এসব কিছুই ভাবে না, শুধু চাকরি করে, চাকরির পোশাকে রমণ করে, নিদ্রা যায়, অভ্যাস ও সংস্কারে শিক্ষিত মানুষের ভুল গর্বে সত্যমিথ্যা নিয়ে কপট উদ্‌বেগ প্রকাশ করে, আমি এখন সেই তৃতীয় পক্ষে তৃতীয়ের ভান ও মুদ্রায় মিশে আছি। জীবন্মৃত। রাজনীতি চাকরি, সাহিত্য চাকরি, জীবন চাকরি। খণ্ড খণ্ড করেছি নিজেকে, ব্যয় করে চলেছি। জীবন ব্যয়। মাঠের বৃত্তান্তটি ভালো করে বুঝে নিতে চাই কী কী ভেবেছিলাম সেই রাতে, বস্তুত কী ঘটেছিল। স্মৃতি-সুদে বেঁচে থাকা, সেখানে তো আর সত্যিই চলে যেতে পারব না।

বা লু র ঘা ট

সুর, যেন কবিতা, জপতে থাকি বালুরঘাট, বালুরঘাট...

বড়ো ক্লান্ত ছিলাম প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার সেই দুর্দান্ত দিনে। দুঃসময়, অবিশ্বাস ও ধ্বংসের সময়—এইভাবে দেগে দেওয়া হয়েছিল। তখন অতীত ভবিষ্যৎ-বর্তমান একাকার, একটি বিন্দু যেন, ইতিহাসের মানুষ হওয়ার ভীষ্মপণ দু-তিনটি শতককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সরলরেখায়। বেঁচে উঠেছিল বিদ্যাসাগর, রামমোহন, প্রত্যহ খুন হচ্ছেন তাঁরা। আবার বেঁচে উঠছেন প্রতিদিন। ইতিহাসের মানুষ অস্ত্র ধরছে ইতিহাসের মানুষের গলায়।

এমনই এক অস্ত্রধারী আমি, ঘাতক আমি। বেঁচে আছি আজও। রোজ রক্ত ধুয়ে ফেলি। আঙুলের ডগায় হাতের তালুতে বিন্দু বিন্দু ঘামের মতো রক্ত জমে রোজ। ভুল! ভুল! চিৎকার করি গোপনে। আদর্শের বারুদে ঠাসা নির্দয় মনের ওপর সময় ধারাবর্ষণ করে চলে। আর যন্ত্রণায় তাতেই বেঁকে যায় হাত, আঙুলের গাঁট।

দেহ ঝরে, তার আগেই কি আমাদের ঝরে যায় মন!

বঙ্গোপসাগরে ধুয়েছি এই গোটা শরীর, তাকে সময়সমুদ্র ভেবে বলেছি, 'ক্ষমা করো, দলবদ্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণের দায় আমি একা বইব কেন, বলো?'

অন্যায়, ভুল ও নির্দয়তার বোঝায় এত ভারী হয়েছি, এমন ফুলে উঠেছি যে সহজ চলাফেরা মুছে গিয়েছে। পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার হার্মাদ কামনায় কত কোমল হৃদয়ের কাছে জ্বলন্ত মশাল ধরেছি। ব্যক্তিকে টেনে হিঁচড়ে এনেছি সমাজের বেদির সামনে, বলেছি : একে দ্যাখো এর জন্য নিজের হাতে কেটে ফ্যালো নিজেরই মাথা।

বালুরঘাট।

চিত হয়ে পড়েছিলাম ধানকাটা মাঠে। উপরে, উঁচুতে তাকাতে পারছিলাম না, চোখ জ্বলছিল, উচ্চতা কাকে বলে আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছিল, দেখিয়ে দিচ্ছিল একটি-দুটি তারা। গভীরতার দরুন নীল সেই উচ্চতায় তারা-রা বেগুনি, আকাশ সমুদ্র মনে হয়। আমার কোনো সাড় নেই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই, দেহ নেই। জ্যোৎস্নাসুন্দরীর সঙ্গে সেই রাত একটি যুগের মতো, গভীর নেশায় এমনভাবে কেটে যায়, আমাকে সে সম্পূর্ণ খুলে ফেলেছে ভাবি, কী সব সরিয়ে ফেলছে, মুছে দিচ্ছে কত চিহ্ন, শিহরনে-শিহরনে কেটে যায় রাত।

পরের দিন আমি নিজেকে চিনতে পারিনি, বালুরঘাটের অপরিচয়ে সেইদিন থেকে হারিয়ে যাই, বেঁচে যে আছি সে কেবল ওই অপরিচয় কিছুমাত্র রয়ে গেছে বলে।

স্বা ধী ন তা র প্রো টি ন

রাস্তাঘাট, বাস-ট্রাম, বাজার ও অফিসে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কথা হয় : মধ্যবিত্ত বাঁচতে পারবে না।

মধ্যবিত্ত বাঁচতে পারবে না।

মধ্যবিত্ত বাঁচবে না আর ।

সত্যিই কি তাই? কেরানি-মাস্টার-উকিল-সেলসম্যান-ক্যানভ্যাসার-মুহুরি-ম্যানেজার-এজেন্ট সবাই মরে যাবে? গাঢ় অন্ধকার মুখে নিয়ে বৈশাখ আকাশ নেমে এসেছে, আমাদের ছাদের অ্যান্টেনা ছুঁয়ে, গার্হস্থ্যের খোপগুলি অন্ধকারে ভাসাতে ভাসাতে নেমে যাচ্ছে সে।

মৃত্যুচুম্বন।

লোকসফলতা আর সাধনা দুই বিপরীত মেরু। পরস্পরকে চেনে না তারা। আগুন ও দাহ্য পদার্থের মতো কাছাকাছি এলেই জ্বলে ওঠে পুড়ে যায়, সাধনাকে আগ্নেয় পাকস্থলী শুষ্ক, ছিবড়ে করে ফেলে দেয় ডাস্টবিনে।

মিসেস দাশগুপ্ত তাঁর স্বামীকে মাঝরাতে ডেকে বলেন, 'তুমি একটা ঢ্যাঁড়োশ, কিছুই বাগাতে পাল্লে না, তোমার পাল্লায় পড়ে আমার জীবন...'

মিস্টার বসু তাঁর ঝিমিয়ে পড়া বউটাকে খোঁচাতে থাকেন, 'দুজনের রোজগার চাই বুঝলে।'

পাচ্ছ কোথায়?

পটের বিবি হয়ে ঘরে বসে থাকলে...

রাস্তায় যাই?

যাও, যাও।

তবুও কোথায় যেন রয়ে গেছে গভীর প্রেমের গল্প, পূর্ণ জীবন; উৎসারিত মাধুর্য। আদি মানব-মানবী তারা। যেমন দূর থেকে, কাছ থেকে, কত দেখেছি সুনন্দা-রতনকে। ওইরকম আরও এক যুগলের কথা শুনেছি মার মুখে—তাদের নাম উল্লেখ করার সময় প্রতিবার মার চোখে আশ্চর্য আলো এসে যেত। প্রেমিক-প্রেমিকাকে এই দেখার যেন শেষ নেই, হাজার বছর জীর্ণ করতে পারেনি সেই মানবশরীর।

সেই তাদের আমি দেখেছি দেশলাই বাক্সের মধ্যে। পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, সমস্ত জীবনের আস্থা তাদের পায়ের তলার মাটি আর আজ তাদের দৃষ্টি কী ঘোলাটে, চোখের সাদা জমি গ্রাস করছে ওই ঘোলা রং। মুখে আলো ফেললেও কেউ কাউকে দেখছে না। কিছুই দেখবার নেই যেন, এমনকি তারা যেন দর্শক নয়, দর্শনীয় নয়—

বড়ো-ছোটো-মাঝারি মধ্যবিত্ত, এল আই সি-র প্রিমিয়াম ব্যাঙ্কের ঋণ মেটাতে হিমসিম ফ্ল্যাটের মধ্যবিত্ত ভিড় করে আছে।

ভিড় আমার দিকে পিঠ ফিরিয়েছে। আমি ভিড়ের দিকে। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। যারা লোপাট হয়েছে আমরা তাদের বংশধর নই। সেরকম কেউ বাস্তবে ছিল না কখনও, ওসব গল্প কথা। আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি ঘিরে রূপকথা সৃষ্টি করা মানুষের এক গভীর দুর্বলতা, আমরা দুর্বলতার সন্তান নই, আধখানা শতাব্দীর স্বাধীনতা-প্রোটিনপুষ্ট। রুদ্ধশ্বাস প্রগতিপ্রিয়, আমরা কোনোদিন থামব না, থামিনি কখনও, প্রেম ও অহিংসা পড়ে আছে দ্যাখো ধু ধু মাঠে, ধুলো হয়ে যাচ্ছে। আদর্শ মানবকে খুঁজতে খুঁজতে হাজার হাজার বছর অপব্যয়ে রক্তহীন নিঃস্ব হয়েছি। ধুলো জমছে, মাকড়সার জাল ঢেকে দিচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষের মুখ। এখন তাদের দিকে তাকাতে পারি না। রাগ আর ঘেন্না, ঘেন্না আর রাগে গ্যাসবেলুন হয়ে উড়ছি। দেশ মানচিত্র ছাড়া কিছু নয়। সেখানে পুতুলের মতো মানুষ রয়েছে, কাম আর কামাইয়ে ডুবে আছে, জীবন নিঃশেষ করে গড়ে তোলা বিচিত্র সব ভাবমূর্তি ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। তার দীর্ঘ ছায়া ছোটো-বড়ো-মাঝারি মধ্যবিত্তদের গিলছে উগরে দিচ্ছে। প্রকল্প এবং যোজনা কষে ফেলেছে সমস্ত অঙ্ক। পরিকল্পনার জাতক তারা, নিশ্চিন্তে পেরিয়ে যাচ্ছে জেব্রাক্রশিং। কিস্তিবন্দি ব্যবস্থায় কিনে ফেলছে বাড়ি গাড়ি বা কোনোদিন তাদের সন্তান এতসব সুখ কিনতে পারবে বলে ছুটতে হচ্ছে, মরণছুট। শিক্ষা চাকরির জন্য, জ্ঞানার্জন চাকরির জন্য, জীবনধারণ সেও ওই চাকরির জন্য। উন্মত্ত বাতাস চাকরির ক্ষেত্রটিকে এলোমেলো করে দেয়, রাজনৈতিক যোগাযোগ, তাঁবেদারি ও মোসাহেবির সুতোয় সেই পুতুলনাচ সফল কিংবা ব্যর্থ হচ্ছে। দুই প্রকার মানুষ

আছে যেন, সাফল্য ও ব্যর্থতা ছাড়া এই বুড়ি পৃথিবীতে আর সব কোন কালে মুছে গেছে। ওই দুটি শ্রেণির ভিড়ে চাপা পড়েছে সব কিছু। ভাবমূর্তি, মধ্যবিত্তের ভাবমূর্তি এই অন্ধকার মন্থন করে গড়ে উঠেছে। যদিও তাদের স্বতন্ত্র মনে হয়, পৃথক মনে হয়, আপাতদৃষ্টে ভাবমূর্তির ধারণাটি গোষ্ঠীবদ্ধ নয়, দল নয়, ব্যক্তি সে। এই কথাটা ব্যবসার স্লোগানের মতো রয়েছে, দোকানের সাইনবোর্ড যেন। কত পুরোনো কথা টেনে আনে তারা, নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় নামাবলি চাপিয়ে বসে থাকে, 'সিনেমা' শব্দটির বদলে ব্যবহার করে একটি পুরোনো শব্দ 'বায়োস্কোপ'; খপরের কাগজ, গপ্পো, মেয়েছেলে— কলকাত্তিয়া এই শব্দকোষের দিকে বীভৎস মজায় হাতটি এগিয়ে দেয়। এইসব ভাঁড়ার লুট করে, সব কিছু নিঃস্ব করে দিয়ে ভদ্র সন্তানরা একদিন চলে যাবে। বাংলা ইংরেজি বৈঠকিভাষা ফর্দাফাঁই করে নিজেদের এমন প্রতিষ্ঠা দেবে, অবহেলায় ছুঁড়ে দেওয়া তাদের এক-একটি মন্তব্য ঠিকমতো বুঝতে মোটাসোটা কেতাব লিখতে হবে। কীটের আহার্য পুরোনো কেতাবের পৃষ্ঠা থেকে জন্মেছে এইসব ভঙ্গুর মানুষ, বৈঠকখানা সংস্কৃতি যারা একবিংশ শতকে ঠেলে নিয়ে যাবে, নিরন্তর সেই চেষ্টায় মহাফেজখানার বিবর্ণ পৃষ্ঠা হয়েছে তারা। হয়েছে লিকলিকে রেশমকীট। মধ্যবিত্ত হয় এইভাবে বেঁচে থাকবে, পালিয়ে পলায়নকে মহান করে তোলার জীবননাশী চেষ্টায়, না হলে দলে ভিড়ে ছিঁচকে হবে, ইস্কুল মাস্টারের সন্তান এই পরিচয়, তার চিহ্ন মুছে ফেলতে মদ গিলে মুখ ফোলাবে, জয়ঢাকের মতো পেট হবে, ক্ষমতার বঁড়শিতে বাঁধা পালিত পশুর মতো গর্জন করবে, লেজ নাড়বে, তীব্র আর্তনাদে কেঁপে উঠবে পাতালকালী।

আস্তানা, তল্পিতল্পা কিংবা কোনো পুঁজি নেই যার, যে রয়েছে খাদানে বয়লারের তাপ হলকার মতো এসে যার গালে চুমো খাচ্ছে, মানিকতলা বা বেলগাছিয়ার ফুটপাতে সামান্য জিনিস ফেরি করতে বসেছে যে, পড়ে আছে হাসপাতালের মেঝেতে, কিংবা নামগোত্রহীন রাস্তায় অসুস্থ মানুষটির হয়তো তাও জোটেনি, পায়নি দেহধারণের জন্য গতর খাটানোর কোনো কাজ— এক গভীর সমুদ্রের মতো দিকদিশাহীন অসীম সেই জলস্রোত জনতা। অতীত ও বর্তমানহীন আমরা মধ্যবিত্তের সন্তান ভাবমূর্তি, ছায়ামূর্তি খুঁজে নিই, ভূত হয়ে বেঁচে থাকি মঞ্চে, টিভিপর্দা, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা, যোজনা অফিস এবং পোকায় কাটা বইয়ের দুটি লাইনের মধ্যে ধরে দিই নিজেদের মুণ্ডু। সেখানে শুষ্ক বালি ছাড়া আর কিছু নেই।

খাঁ খাঁ সেই মরুতে তারা কোথায় জল পাবে!

শহর সংস্করণ

রচনাকাল : ১৯৮৪; ওই বছরেই মাসিকপত্র 'চতুরঙ্গ'য়
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল।

রাত দশটার পর যখন দোলানো পাল্লা ঠেলে তাকে ঢুকতে হল, বা দোলানো পাল্লার ওপাশের অন্ধকুঠরি থেকে তার ডাক এল, তখন সেই স্যাঁতসেঁতে ঘরটিতে, কাগজ আর ফাইলের গন্ধের মধ্যে যেতে তার শরীর একান্তই রাজি নয়, শরীর গুলিয়ে উঠছিল।

অমল এই অফিসটিতে টিকে আছে তা-ও প্রায় চার বছর হতে চলল, এই চারটি বছরে ঈর্ষা, নীচতা আর হৃদয়হীন সামরিক আচরণসমূহ যেভাবে সে দেখেছে, তাতে নিজের সম্পর্কে যুদ্ধবন্দির অনুভব ছাড়া অন্য কিছু মহৎ ব্যাপার যা সামান্য সামান্য আঁচ করেছে সেসবই ধোঁয়ার অস্পষ্টতা আর কাগজের গন্ধের মধ্যে হারিয়ে যায় বারবার। আজ, অমল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, একবারে বা হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি ঘটেনি, বরং, সে অত্যন্ত গোপনে এবং সম্পূর্ণ একা-একাই তিল তিল করে গড়ে তুলেছে সিদ্ধান্তটি। তবু, একাকিত্বের জন্যই হয়তো একটু দ্বিধায় তালগোল অসহায়তাই গুলিয়ে উঠছিল শরীর জুড়ে।

সে যাই হোক, এরপর যে অস্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ সেসবের মধ্যে প্রবেশ করার আগে, একথা স্পষ্ট বলে নেওয়া ভালো, যে, এই ঘটনাপঞ্জি বস্তুত ক নামের একটি শহরে ১৯৮০ সাল জুড়ে ঘটে চলেছিল, শহরের সমস্ত মানুষই এ-বিষয়ে একমত, যে, সত্তর-পরবর্তী দশকটিকে তাদের বেশ অদ্ভুত মনে হয়েছে, এমনকি তার অতিস্বাভাবিকতাও তারা ঠিক হজম করতে পারছিল না, কেমন অচেনা মনে হচ্ছিল, ভয় করছিল। আমরা যেখান থেকে শুরু করছি তা একটু পিছিয়ে গিয়েই, কারণ আমাদের সৌভাগ্য, যে, এই বাজারেও আমাদের একজন নায়ক আছে। আমরা এই নায়কের জীবনের একটি বাঁক থেকে শুরু করতে যাচ্ছি বলেই এই পিছিয়ে আসা, তবে হাবিজাবি বিষয়ে সময় খরচ না করে চেষ্টা করা যেতে পারে ওইটুকু পুষিয়ে নেওয়ার।

পৃথিবীর অনেক শহর দেখেছেন এমন মানুষকেও বলতে শোনা গিয়েছে যে 'ক শহরের আশ্চর্য নিজস্বতা আছে।' যদিও 'আশ্চর্য নিজস্বতা' টি খুব কমই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভৌগোলিক এবং আচারগত দিকটি বাদ দিয়ে অন্য কোনোভাবে 'আশ্চর্য' শব্দটির বর্ণনা তাঁরা দিতে পারেননি। তবে হামেশাই বলে থাকেন এখানকার মানুষের মন আর সংস্কৃতি-অনুরাগ সম্পর্কে কিছু কথা। আবার সেইসব মানুষই চরম বিরক্তি আর গভীর ঘৃণা প্রকাশ করে ফেলেন বর্ষা ঋতু যখন উঠে আসে শহরের সমস্ত হাইড্র্যান্ট ছাপিয়ে, বা যখন রূপকথার গল্পের মতোই জ্যাম নামের এক অশরীরী আত্মা প্রতিদিনি শহরের কোথাও-না-কোথাও স্তব্ধ করে দেয় সমস্ত স্পন্দন ও গতি।

জীবনদায়ী ওষুধের জোগানও এখানে অব্যাহত নয়, যেমন নেই সুস্থ সবল মানুষের রোজগারের রাস্তা; মোট কথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান---সমস্ত দিক থেকেই শহরটির পরিচয় নেতিবাচক। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতরগুলির একই ঘরের দুটি টেবিলের মধ্যে একটি ফাইল চালাচালি করতে লেগে যেতে পারে কয়েক বছর। শহরটি আশ্চর্য এ-কারণে যে, এইসব

পার্থিব বিষয় নিয়ে এখানকার মানুষজন এমন মজা আর রঙ্গরস করতে পারে যার তুলনা অসম্ভব।

ফলে একটি বিস্ময় ঘন হয়ে উঠতে পারে, আর তা হল, প্রথমত এতকিছু সত্ত্বেও শহরটি থেমে নেই কেন, মরে যায়নি কেন, বরং তার সাজসজ্জা আর উন্নয়ন সম্পর্কে প্রতিবছরই কোনো-না-কোনো নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। হতে পারে তারা একজন সুদক্ষ শেরিফ পেয়েছে, কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন : অতি বৃদ্ধ, প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই মেয়র হতে পারেন পালাক্রমে এবং শেরিফ হওয়ার জন্য শহর-বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। শেরিফের অফিসটি হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে। তাহলে কি এ-বিষয়ে আইনের কোনো মন্ত্রপূত ব্যাপার আছে? আইন এবং শৃঙ্খলার?

শেষ পর্যন্ত জনজীবনেই এসব গল্পের বেশ কিছু উত্তর হয়তো পাওয়া যেতে পারে, যদিও, সে-ব্যাপারটাও কেমন ঠান্ডা আর অস্তিত্বহীন কিছু বলেই মনে হতে পারে। কেননা তাহলে তো শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ আর চিৎকারের পাশাপাশি সুশৃঙ্খল দায়িত্ববোধ থাকত। নিঃশব্দে বেঁচে থাকার কল্পনা একান্তই কাব্যিক, বাস্তবে মানুষের হাঁটাচলা, কাজ, সম্মতি-অসম্মতি থাকে, যা থেকে জন্ম নিতে পারে কিছু ঘটনা। এখানে সরকারি দফতরগুলিই ঘটনার হ্যান্ড-আউট জুগিয়ে যায় রোজ সন্ধ্যাবেলা। আর সে-সমস্ত ঘটনাই পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান আর অন্তর্দ্বন্দ্বের। বড়ো জোর তার সঙ্গে দফতরগুলি নিয়মিত চেষ্টা করে যায় আশা-উদ্রেককারী একটি মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়ার। অর্থাৎ ঘটনা যা-কিছু সেসবই কাগজ-কলমের বিষয় এবং প্রতিটি বিষয়ই সরকারি দফতরের এক্তিয়ারে, যেমন এখানে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে পরিবেশ মন্ত্রক এবং মানসিক জটিলতা বিভাগ।

সর্বদা পিছন দিকে ফেরানো শহরের মুখটি সম্পর্কে বিশিষ্ট নাগরিকগণও সচেতন নন, বরং বক্তৃতার যে কোনো সুযোগ তাঁদের মধ্যেও জন্ম দেয় অতীত চর্চার একটি তীব্র ঝোঁক এবং সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত এরকম হতে বাধ্য 'অতীতকে আত্মস্থ করতে না পারলে আমরা এক পা-ও এগিয়ে যেতে পারব না।' এই সিদ্ধান্তটির পর তারা সভা-সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। আর ফিরে পাওয়া যায় দৈনন্দিন জীবন, অতীতের পচা শব। বাহ্যত সে জীবন্মৃত নয়, অজস্র মানুষের শ্রম-বিশ্রাম-বিনোদনের এক প্রাত্যহিক জীবনস্পন্দন শহরটিকে সচল রাখে। কিছুদিন আগে এই শহরের গলিঘুঁজি আর গড়ের মাঠে গুলি করে মারা হয়েছে একদল বিদ্রোহীকে, সম্ভবত তারা একটি ইশতেহারে একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল—'ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদা আর ঠাকুমার গল্পের মধ্যে বন্দি এই জীবনের থেকে জঘন্য কিছু হয় না, আমরা জন্মেছি, আমাদের নিজেদের জীবন আছে, এবার থেকে আমরা নিজেদের জীবনেই বাঁচতে চাই, অতীতের দলিল, চিঠি আর প্রবন্ধের কপি করতে করতে সরকারি দফতরের মতো একদিন অবসরের ফুলের মালা গলায় দেওয়াটা আমরা ঘেন্না করি।' ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব নয়, তারা থাকতেও পারেনি। ভালোবাসা, স্নেহ আর বিচারপ্রবণতাই শহরের বিদ্রোহীদের একাংশকেও হাত ধরে টেনে নিল স্বাভাবিক জীবনের দিকে। এ-কাহিনি গড়ে ওঠে এমনই এক ঈষৎ উষ্ণ স্বাভাবিকতায় যা তাপ বিকিরণ করতে করতে ক্রমশ শীতল হতে শুরু করেছিল।

দুই

অমল কমপক্ষে পাঁচটি দফতরে হানা দিয়েছিল, বকের মতো বসেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার তার একথাও মনে হয়েছিল যে রাইটার্সের প্রেস কর্নারের গদিতে সে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে। বিশাল গদিটি তার পাছা হয়ে যাচ্ছে, সে বোধহয় আর উঠতে পারবে না।

সুবিধে মাত্র এইটুকু যে, অফিসগুলোকে গুটিয়ে আনা হয়েছে ছোট্ট একটি পাড়ায় এবং রাইটার্সে বসে প্রায় সব দফতরকেই পাওয়া যায় হাতের কাছে। অবশ্য অন্য একটি বিপদ আছে, শহরের টেলিফোন বস্তুত ব্যবহার করা যায় ইন্টারকম হিসাবে। অর্থাৎ অফিসগুলো মানবশরীরের মতোই প্রতিটি ইন্দ্রিয় আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ সেরে ফেলতে পারে। কিন্তু দুজন মানুষ পরস্পরকে জরুরি সংবাদ আদান-প্রদান করতে গেলে ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সার্ভিস কমিশনের সূত্রে জানা গেল মাত্র ৫৪৬টি কেরানির চাকরির জন্য শহরের এক-দশমাংশ মানুষ আবেদন করেছে। এটি একটি ঘটনা, অন্তত দফতরটির কাছে। পাঁচ কোটি মানুষ এত স্বতন্ত্রভাবে দরখাস্ত জমা দিয়েছে, দফতরের নিয়ম অনুসারে এত নিস্পৃহভাবে চাকরির জন্য আবেদন করেছে যে, হয়তো সেই পাঁচ কোটিই এখানে দরখাস্ত করার পরের দিনই অন্য কোনো দফতরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে আরও পাঁচ কোটি দরখাস্ত। ফলে এর ঘটনাগত দিকটি সবটাই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সার্ভিস কমিশন নামক একটি দফতরের আওতায়।

কিছুক্ষণ আগে অমলকে হেঁটে যেতে হয়েছিল সার সার টাইপরাইটারের মাঝখানের ফালিটি দিয়ে, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অমল সেই প্রায়ান্ধকার, স্তূপীকৃত কাগজপত্রের কুঠরিটিতে প্রবেশের আগে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি অর্জনের চেষ্টা করেছিল। আর একবার তাকে ভেবে নিতে হল নিজের ভালো-মন্দ, এও ভাবতে হল মাঝখানে সিঁথিকাটা, বাইফোকাল চশমাসমেত কাটা থুতনির মানুষটির সঙ্গে খুব রূঢ় আচরণ করা ঠিক হবে না। অথচ কৃত্রিমভাবে হলেও এ জিনিসের নিষ্পত্তি একমাত্র তিক্ত ঝগড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

এ-সো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আচ্ছা, তুমি চোখের সামনে সাদা কাগজটা কি দেখতে পাও? মানে আটটা পাতা কী দিয়ে ভরাট করবে?

এই পর্যন্ত বলে প্রৌঢ় মানুষটি কেমন তলিয়ে গেলেন, চশমা খুলে রাখলেন কাচ বসানো টেবিলটিতে, টেবিলটির কাচের তলায় অজস্র চোখের মতো স্থির হয়ে রয়েছে নানা প্রতিষ্ঠানের কার্ড, পিকচার পোস্টকার্ড, দু-একজন নামকরা শিল্পীর স্কেচের প্রিন্ট, যার মধ্যে ছিল একটি পেঁচার ছবি। অমল জানে যা বলবার এখন উনিই বলবেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কথাবার্তা কোন পথে গড়াবে। অমল ভদ্রলোকের সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনল। একমুখ ধোঁয়া পাশ ফিরে ছেড়ে সে পেঁচার স্কেচটি দেখতে লাগল। স্কেচটিতে পেঁচার অস্তিত্ব ঘন হয়ে এসেছে দুটি মাত্র চোখে, তারপর যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে।

লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই—সংবাদের ক্ষেত্রে আকাল এসেছে?

হ্যাঁ, তা এসেছে।

আমাদের মতো ছোটো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নানা জায়গায় রিপোর্টার পাঠিয়ে নতুন নতুন খবর খোঁজা প্রায় অসম্ভব।

হুঁ।

তোমাকে বলেছিলাম ব্যাঙ্ক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টটা একটু...

হ্যাঁ, করে দিয়েছি, এই দেখুন, চাকরি না-পাওয়া সাড়ে চার কোটির মধ্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো মাত্র আর দশ হাজার বেকার কোথাও-না-কোথাও চাকরি পেয়ে যাবে, চার কোটি চল্লিশ হাজারের একদিন দরখাস্ত করবার বয়সও পেরিয়ে যাবে, যদি এর মধ্যে দু-কোটি ব্যবসা-ট্যাবসা বা ছোটোখাটো কাজ খুঁজেও পায় বাকি দু-কোটি চল্লিশ হাজার তলিয়ে যাবে দারিদ্র্য-মৃত্যু আর হতাশার গহ্বরে। আর এসবের মধ্য থেকে জন্মাবে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন স্মাগলার, পঁচিশ জন খুনে, আরও পঁচাত্তর জন হয়ে পড়বে রাজনৈতিক দলের মস্তান।

হ্যাঁ দেখেছি, দেখে অবাক লেগেছে, আমি তো তোমাকে জ্যোতিষীগিরি করতে বলিনি, ঘটনাটি সবিস্তারে লিখতে বলেছি—

যেমন?

ধরো, পাঁচ কোটি দরখাস্ত পূরণে ভুলচুকের ছবিটা কেমন, এর মধ্যে কতজন হরিজন আছে, কী প্রসেসে দরখাস্তগুলো স্ক্রুটিনি করা হচ্ছে, এ-কাজে সর্বমোট খরচ কত পড়তে পারে—এইসব আর কী!

তাহলে আরও দু-দিন সময় লাগবে।

কাল যে কাগজটি বেরোবে তাতে তিন কলম জায়গা কোন ঘটনা দিয়ে ভরা হবে?

দেখুন, আমার পক্ষে সে-সমস্যা নিয়ে ভাবা সম্ভব নয়।

চেষ্টা করো ভাবতে।

দেখুন...

না না, তোমাকে কাগজের অফিসের গোটা জিনিসটাই বুঝে নিতে হবে, সংবাদপত্র প্রায় একটা যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপার, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এক্ষেত্রে যুদ্ধটা স্থায়ী। শোনো, আজ তোমার আগেকার স্টোরিটা দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু রেশনের ব্যাপারে ওই তথ্যগুলো এতদিনে পুরোনো হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, কিন্তু কোনো কাগজই তো এ-বিষয়ে লেখেনি, তুমি বরং আর একটা ইনস্টলমেন্টে বিষয়টা কারেন্ট করে তুলো।

না, সমস্যাটা হল রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, বাস্তবে কেউ রেশন পাচ্ছে না।

আপাতত তুমি এ-দুটো কাজ করে ফেলো, পরে দেখা যাবে কী করা যায়। মনে রেখো এই আকালের কথাটা, এখন কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়।

এর পরও তারা বেশ কিছুক্ষণ ওই খুপরিটিতে মুখোমুখি বসেছিল। সম্পাদক এতদূর কথা বলে ফেলেছেন যে আর কিছুই বলার নেই। অমল ঘরটিতে প্রবেশের আগে যে প্রস্তুতি নিয়েছিল তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ার ফলে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এখন যেমন সেসব আর নেই, তেমনি সুকোমল গাঙ্গুলি যেভাবে কথা বলছিলেন তাতে অমলের

মৃদু আশা হচ্ছিল হয়তো এই অফিসে তাকে নিয়ে ছোটো একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

বেরিয়ে আসার পর অমলকে প্রথমেই পড়তে হল সুহাসবাবুর পাল্লায়, ইশারায় চেয়ারটা দেখিয়ে সুহাসবাবু কপিন কালিতে মুদ্রিত একফালি কাগজ পাশের ঝুড়িটিতে ফেলে দিলেন। 'কাল আসছ?' প্রশ্নটা করলেন ঘাড় গুঁজে, নিউজপ্রিন্টের চারটি ফালি কাগজ পিন দিয়ে গাঁথতে গাঁথতে, হঠাৎ বেশ দায়িত্বশীল আর স্নেহময় হয়ে উঠলেন, 'চট করে ছেড়ো না, অন্তত আর একটা ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত, বুঝতেই পারছ আমাদের জীবনের জল-বাতাস হল প্রতিষ্ঠান।' অমল ততক্ষণে একটি বই, কিছু কাগজ আর মাল্টি কালার্ড পেনটি পুরে ফেলেছে ঝোলার মধ্যে, 'হুঁ' ধ্বনিটি সে উচ্চারণ করল বিদায়সূচকভাবে।

অফিসটিতে গাড়ির সংখ্যা এমনিতেই বেশি নয়, তদুপরি একজন রিটেইনারকে গাড়ি দেওয়া হবে একথা ভাবাই যায় না। ফলে রাত এগারোটায় এসপ্ল্যানেড থেকে কেশব সেন স্ট্রিট পর্যন্ত তাকে হেঁটেই ফিরতে হবে, তার আশ্চর্য লাগছিল অসম্ভব ব্যস্ততার, কোলাহলের একটি শহর কী করে মেনে নিল রাত দশটার মধ্যে যানবাহনের হাওয়া হয়ে যাওয়াটা। যদি এ নিয়ে মানুষজন বিক্ষুব্ধ হত, অফিসকাছারির কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিত, টিয়ার গ্যাস আর পথ অবরোধ ঘটত তাহলে রাত দশটায় বাস তুলে নেওয়ার একটি আইন এবং আইনের প্রস্তাবের তলায় আমলাদের স্বাক্ষরের মতো একটি কাগুজে ব্যাপার ঘটনা হয়ে উঠতে পারত। সেসব কিছুই ঘটেনি, আইনটি পাশ হওয়ার পরের দিন সাড়ে ন-টার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাড়ায় দু-চারজন মাতালের হাত-পা-ভেঙেছে শুধু। মানুষ চেষ্টা করেছে অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেই আড্ডাকে পুরে ফেলতে, চেষ্টা করেছে যোগাযোগের অন্যান্য উপায় টেলিফোন আর চিঠিপত্রকে একটু বেশি ব্যবহার করতে। আবার যেহেতু প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠি পাওয়া এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে চিঠি লেখা ছাড়া অন্য ধরনের লেখাজোখার অভ্যাস তারা দীর্ঘকাল হারিয়ে ফেলেছে, ফলে রবিবার দিনটিতে পার্ক, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হলে ভিড় খুবই কমে এসেছে, রবিবার তাদের হাত পাকাতে হচ্ছে চিঠি লেখায়। কিংবা যেতে হচ্ছে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে, মফস্সল থেকে মফস্সলে। আর কাজের ছ-টি দিনে শ্রমজীবী এবং অফিসজীবী মানুষদের মধ্যে গলা ভেজানোর অভ্যাস যাদের আছে, তারা রোদ থাকতে থাকতেই ছুটে যাচ্ছে শুঁড়িখানায়। সিনেমা হলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে রাতের শো, বদলে চালু করেছে দুপুরের একটি শো, কোনো কোনো হলে এখন নিয়মিত সকালেও ছবি দেখানো হচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য ভিডিও নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসেই সেরে নিতে পারছে বিনোদনের অভ্যাস।

বর্ষা ঋতুই চলছিল সম্ভবত, তবে বর্ষা মানে রাস্তায় জল ভেঙে চলা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি তো নেই। এমন নিষ্পত্র শহর পৃথিবীতে আর একটি আছে কিনা সন্দেহ। রাস্তায় বেরিয়ে আসার পরও গুমোট কমেনি, অমল দেখেছে আসলে বর্ষা যেমন দু-চার দিনের ব্যাপার, এ শহরে শীতও তেমনি বড়োজোর একটি সপ্তাহ। শীতকাল যথার্থ একটি সপ্তাহে এসে যাওয়ার অনেক আগে এবং পরেও, গুচ্ছ গুচ্ছ মেয়েরা হেঁটে যায় রঙের ঢেউ তুলে। তাদের বয়স যৌবনকাল ছুঁয়েই হয়তো, কিন্তু তাও যেন ওই ক্ষণস্থায়ী শীতকাল। ঘাম আর

অবসাদের সুদীর্ঘ গ্রীষ্মকালই যেখানে জীবনের নিরানব্বই ভাগ, সেখানে এই ভ্যাপসা ভাবটি নিয়ে ভাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং এই গ্রীষ্মকে দেশীয় বাস্তবতা বলেই গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে।

সুকোমল গাঙ্গুলি কি কোনো কিছুর ইঙ্গিত দিতে চাইছিলেন, অমলের অফিস কি জেনে গেল যে অমল এখন পৌঁছে গিয়েছে একটি সিদ্ধান্তের কাছে। ভদ্রলোক কেন বললেন দায়িত্বের কথা, প্রতিষ্ঠানের সংবাদ-সংকটের কথা, এমনভাবেই বা বললেন কেন যাতে বোঝায় অমল এই প্রতিষ্ঠানের একটি জরুরি অঙ্গ। এইসব তাকে ভাবতে হচ্ছিল, যেমন ভাবতে হচ্ছিল গাঙ্গুলিদার উপমাটির কথা। যুদ্ধের কথা। ভদ্রলোক কথায় কথায় বড়ো বেশি উপমা ব্যবহার করেন। এক এক দিন লম্বা বক্তৃতা শুরু করে দেন, এমনভাবে, এমন তাড়াহুড়োয়, যেন জীবনের শেষ কথাগুলো বলে ওই সম্পাদকের চেয়ারটিতেই ঢলে পড়বেন।

তিন

যথেষ্ট দূর থেকেই উর্মিলার মুখ দেখা সম্ভব, প্রথমে অবশ্য মুখটি দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু পাল্লাখোলা একটি জানলা। পরে মনে হয় জানলায় কেউ আছে, চুল উড়ছে, উড়ন্ত চুলের মধ্যে মুখের একটি আদল লুকিয়ে আছে। জানলা, চুল—এইসব মিলে একটি পাখির বাসায় যেমন দুটি চোখ, সেইরকম মনে হতে পারে। তবে তা নির্ভর করছে মাঝরাতে ফিরে আসা, পরিশ্রান্ত একজন মানুষের অনুভব আর কল্পনাশক্তির ওপর, আর মেজাজমর্জির ওপর। বাড়িটি ঠিক সেই আমলের, যখন স্পেস ব্যবহৃত হত ভিন্নভাবে, ধনীর দালান যখন বাড়তি ছাদ ছড়িয়ে দিত বাড়ির সামনের দিকে, পথচারী মানুষও যাতে দু-দণ্ড বসে যেতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকত। হয়তো এ-বাড়ির একদিন পশ্চিমা দারোয়ান ছিল। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছিল।

'সুভদ্রার কনফার্মেশন এখনও হয়নি, এখন, জানি তোমার ভালো লাগছে না, তবু।' অমলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, রাতও অনেক হয়েছে, অথচ তারা দরজায় খিল তুলে সামান্য একটি ফালিকে ঘর করে তুলতে পারছে না। একজন মোহিত দাশ এখনও ফেরেনি, এক এক দিন ওভারটাইম সেরে ফিরতে মোহিত একটা-দেড়টা করে ফেলে। এখন শুলেই ঘুম, তা ছাড়া তখন দরজা খুলতে সংকোচও হয়। একটু নিভৃতির জন্য তাদের আজও জেগে থাকতে হচ্ছে। কীসের যেন অপেক্ষা, জানে যে একদিন পারবে, একদিন যথেষ্ট নিভৃতি পাওয়া যাবে। উর্মিলা চুপ করে থাকেনি বেশিক্ষণ, সে আবার বলল, 'তুমি তো এসবই করতে চেয়েছিলে, এখন ধৈর্য রাখতেই হবে, বরং বাড়ি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—।' অমল উর্মিলাকে চুপ করতে বলল, বলল 'শুনতে পাবে।' উর্মিলা বেশ স্থিরভাবেই বলল 'কেউ জেগে নেই।' সে রাতে উর্মিলা শেষ যে-কথাটি বলল তা হল : 'এত কিছু করার সামর্থ্য আমাদের নেই। তখন মাস্টারিটা নিলে না লেখাজোকা করবে বলে, তারপর সেসব গেল, এখন আবার—দেখো নিজের ব্যাপারে এরকম কিছু ঠিক করতে গেলে পাঁচজন মানুষের কথা তোমাকে ভাবতেই হবে।'

আমি কি তাদের মেরে ফেলতে চাইছি।

তা নয়।

তা ছাড়া, এখনও কাজটা ছাড়িনি, ভেবে যাচ্ছি।

ভাবতে কে বারণ করেছে!

তুমি বারণ করার কে?

মানে? কী বলতে চাও?

আমারও তো ঘাড়ের ওপর একটা মাথা আছে; কী জ্বালা!

এ তাদের স্বাভাবিক কথাবার্তা, এর মধ্যে কলহের নামগন্ধ নেই। 'নবযুগ' অফিসে অমল যতখানি মানিয়ে নেয় এই ফালিটিতে ফিরে এসে সে ততটাই ভেঙে পড়ে, কথার পর কথা বলে এক চূড়ান্ত অব্যবস্থা সৃষ্টি করে, কেমন যেন শিশু হয়ে যায়। বিয়ের অনেক আগেই উর্মিলা গ্রহণ করেছিল অমলকে সামলানোর কাজটি। এখন তা অনেকটাই অভ্যাস হয়ে এসেছে। আগের মতো উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা আর নেই, সে এখন প্রতিবারই কেবল যুক্তি দেখায়। যেমন আজ অমলকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দিল একটি পরিবারের কথা। অমল যদি হঠাৎ তার চার বছরের বিরক্তি আর বিতৃষ্ণাকে একটি ঘটনায় প্রাণ দিতে চেষ্টা করে তাহলে তা হবে এই পরিবারটির পক্ষে মৃত্যুবাণ।

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে', 'সত্যি, আর কতক্ষণ জেগে থাকা যায়', 'মোহিতের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই', 'সুভদ্রার কনফার্মেশনটা হয়ে গেলেই বাড়ি বদলাব', 'অত সহজ নয়।'

ইচ্ছে করলেই যে চার বছরের পুরোনো এই দম্পতিটি নিজস্ব, প্রশস্ত একটি ঘর পাবে না, সেকথা অমলও জানে। অচিরেই সে পিতা হবে এবং তার সন্তানের জন্মের পর থেকে এই পরিবারের ইতিহাস একটু বদলে যাক, অমল আর উর্মিলার এ এক গভীর বাসনা। এখনও পর্যন্ত তারা শুধু কল্পনায় একটি প্রশস্ত নতুন ঘরের ছবি দেখে। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল, সংকীর্ণ পরিসর, আবছা অন্ধকার আর নোনাঘামের গন্ধের এই ঘরটি তাদের মন থেকে একে একে মুছে দিয়েছে রঙের সমারোহ। কল্পনার ঘরটি তাদের উপহার দেবে এক সজীব নতুনত্ব, সেখান থেকে তারা জীবনকে দেখতে পাবে, অনুভব করবে আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যে, সবকিছু ঝলমল করে উঠবে।

দুর্দশা থেকে সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুধু নয়, কারণ সত্যি শহরের ক-জন মানুষই বা এরকম কল্পনা পুষে রাখতে পারে, এ আসলে এক দিনপঞ্জি, যেখানে কল্পনার অবকাশ থাকারই কথা। যে-মানুষটির জন্য প্রতিরাতে অমলদের জেগে থাকতে হয়, সেই মোহিত যদি জানত যে হাড়ভাঙা খাটনির গল্প ছাড়া তার জীবনে কোনোদিনই ভিন্ন কোনো গল্পের আকস্মিক অবতরণ নেই, তাহলে সে কি সিলিং-এ দড়ি বাঁধত না, দড়িতে ফাঁস লাগাত না? তারা জানে উজ্জ্বলতম দিন বলে বাস্তবে কিছু নেই, কিন্তু একান্ত গোপনে, প্রায় এক গুপ্ত রাজনৈতিক দলের বিশ্বস্ততায়, বহন করে চলে অনুরাগে গড়ে তোলা একটি কোমল স্বপ্ন। এই স্বপ্নটিতে সুখ লেগে আছে, অসম্ভব স্পর্শাতুর সেই স্বপ্ন প্রায় তাদের অস্তিত্বের সমার্থক। যেন তারা নেহাত দায়ে পড়ে নিজেদের দু-টুকরো করেছে, খোলসটি তারা উপহার দিয়েছে একঘেয়ে বাস্তবতাকে আর অন্তর্বস্তু সরিয়ে নিয়েছে, লুকিয়ে ফেলেছে।

পরের দিনটি ছিল রবিবার, অমলের জীবিকায় রবিবার একটি ছুটির দিন হিসাবে আজও অনুপস্থিত। নীচে নেমে অন্ধকার, ঠান্ডা, শ্যাওলার বদ্ধ ঘরটিতে ঢোকার জন্য তাকে পাকা একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অসম্ভব রোগা আর ফ্যাকাশে একজন মানুষ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর সে ঢোকার সুযোগ পেল। ওই অন্ধকারে নিজের শরীরও স্পষ্ট দেখা যায় না। আন্দাজে মাথায় জল ঢালতে হয়। ওপর থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল 'পারব না, আমি আর পারব না, অনেক সহ্য করেছি আর করব না।' এ-জিনিসটা প্রলাপের মতো প্রায়ই বাড়িটির সিঁড়ি থেকে কার্নিশে প্রতিধ্বনিত হয়, সবাই জানে একটু বাদেই এই চিৎকার থেমে যাবে।

কিছুদিন আগে নিয়ম জারি করে সংবাদ ছেঁটে দেওয়া হচ্ছিল এবং তার ফলে কাগজগুলো যে বিপুল সাদা অংশ উদ্‌বৃত্ত পেল, সে সবই ভরিয়ে দেওয়া হল নানারকম বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনগুলো ছিল এরকম : দয়া করে আপনার দু-লাখ টাকা নিয়ে যান একটি এক টাকার টিকিট কেটে/পূর্ব কলকাতায় আপনার জন্য আমরা ফ্ল্যাট বানিয়েছি, এখন আপনি এলেই হয়/পরিবার-পরিকল্পনার জন্য আপনাকে আজ থেকে কিছুই করতে হবে না, স্বামী-স্ত্রীর একজন চলে আসুন সরকারি হাসপাতালে/আজ থেকে কালোবাজারি, জাতপাত, অশিক্ষা, অসাম্য ও ক্রীতদাসপ্রথা নির্মূল করা হল।

প্রতিটি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার নাগরিকদের ছিল, কিন্তু শহরের কোনো আদালতেই কেউ মামলা রুজু করেননি। অথচ, কিছুদিন আগে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের সাঁজোয়া বাহিনী কাগজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে অন্তত একবছর অমল প্রায় প্রতিদিন সরবরাহ করেছে আগ্নেয়াস্ত্রের সংবাদ। শহরটি যখন ব্রিটিশ সিংহের অধীনে ছিল সে সময়কার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অমল দেখেনি। তার জন্ম স্বাধীনতার পরে কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে সে আগ্নেয়াস্ত্রের এক পরিমণ্ডল, রাজপথে গুলির শব্দ, সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন সে দেখেছে তখন শহরটি কী গভীর ভয় ও সন্দেহে আড়ষ্ট হয়ে যায়; সন্দেহ, ভয় আর আগ্নেয় বিস্ফোরণ ক্ষণস্থায়ী শীতকালের মতোই দ্রুত মিলিয়ে গেল, এসে পড়ে প্রকৃত হিমযুগ। এই হিমযুগে প্রবেশ করার পর সে বুঝতে পেরেছিল অতীতে মূর্খের মতো বন্দুক-বোমার খবর সরবরাহ করে কী ভয়ংকর ক্ষতিকে সে ডেকে এনেছে। সংবাদগুলোও তখন যেন ধেয়ে আসছিল তার দিকে, কী সরল স্বতঃস্ফূর্ততায়, সে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ পায়নি। অমল আজও বুঝতে পারেনি যে, ওই তথ্যগুলো তার হাতে তুলে দিচ্ছিল একটি কঙ্কাল-হাত, তাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল মৃত্যু! নিজের জীবনে অনুপস্থিত সাহসকে সে অতিনাটকীয়ভাবে পেশ করে চলেছিল খবরের কাগজে। বোকার মতো অনুভব করছিল রোমাঞ্চ, সাহস আর ভয়। হয়ে উঠছিল একজন ভুল যোদ্ধা। অতি সামান্য, মামুলি রিটেইনারের এই রূপান্তর তখন তার চালচলনেও কেমন এক অস্বাভাবিকতা এনেছিল, মনে আছে সেই ব্যস্ত দিনগুলিতে সুভদ্রা, উর্মিলা, বিধুবালা কী ভীতিপ্রদ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত অমলের মুখের দিকে। তাকে অনুরোধ করত ঘুমোতে, বলত যেন সবসময় পকেটে অফিসের চিঠি রাখে, সামান্য শরীর খারাপ হলে তারা জোর করত যাতে অমল সেদিন না বেরোয়। অমল লক্ষ করেছিল, জোর করে, চেষ্টা করে তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে

তুলতে চাইত চোখে-মুখে। সামান্য কারণে, অকারণে অমলের শরীরে হাত রাখত, হয় তারা বিদ্রোহীদের ঘাতক ভেবেছিল অথবা অমল সম্পর্কে তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল যে অমল কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে।

চার

ক শহরটির জনসংখ্যার মধ্যে একটি আশ্চর্য ব্যাপার আছে—ছুটির দিন শহরটি জনসংখ্যার দিক থেকে বেশ হালকা হয়ে আসে। একমাত্র ছুটিছাটার দিনেই বোঝা যায়, না এ শহরে, পায়রা আছে, লুকোনো জমি আর ফাঁকা জায়গাগুলোও আত্মপ্রকাশ করে ছুটির দিনেই। তেমনি জানা যায় কিছু হতভাগ্য মানুষের কথা যাদের কোনো ছুটি নেই, যাদের কাজ না করার অর্থই হল সেই দিনটিতে ভুখা থাকা। শহরে একটি রাজনৈতিক দল আছে, তারা শুধু বন্‌ধ বা ধর্মঘটের দিনই স্মরণ করে এইসব মজুরদের, কারিগরদের। তারা তখন মানুষ নয়—ধর্মঘট আর বন্‌ধ বিরোধিতার যুক্তিমাত্র। কাজের দিনে শহরটি ভেসে, উপচে যায় মানুষের স্রোতে। ফলে ছুটির দিনের ফাঁকাভাব সব সময়ই ব্যতিক্রম, ভূতুড়ে। মৃত্যুর কথা মনে হয়। বাস-ট্রাম কমে আসে।

এন মজুমদারের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করতে অমলকে কোনো বেগ পেতে হয়নি, একটি টেলিফোন ডাইরেক্টরিই এজন্য যথেষ্ট ছিল। বেকবাগান বস্তির পাশেই কিছুটা জায়গা সাফ করে নেওয়া হয়েছে, সেই অংশটির চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা ঝকঝকে। শহরমাত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের একসঙ্গে থাকার সাধারণ লক্ষণটি এখানে যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে উপস্থিত। টেলিফোন ডাইরেক্টরির তালিকাভুক্ত মানুষদের অনেকেই এখানে থাকেন।

একটি জিপ ধুঁকছিল, ড্রাইভার সিটে বসে ঝিমোচ্ছে। ঝিমুনির কারণ রাতজাগা অতি পরিশ্রম নয়, বরং অতিরিক্ত মদ্যপান হতে পারে। সে যাই হোক, অমল লাল সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল তিনতলায়, এবার তাকে থমকে যেতে হল একটি কোলাপসিবল গেটের সামনে, গেটটি ভিতর থেকে তালাবন্ধ। রবিবার সকাল এগারোটায় এই অতি নিরাপত্তাবোধ তাকে স্তম্ভিত করে দিল। শ্রীযুক্ত মজুমদার কি কোনো বিপদের আশঙ্কা করছেন! ডানদিকের দেওয়ালে ছিল একটি সাদা বোতাম, অমল সেখানে আঙুল ছোঁয়াতেই বাড়িটি ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল একপাল কুকুর।

সেই চিৎকার কোলাপসিবলের দরজার ওপর দু-জোড়া পা তুলে দিলে অমলকে তিনটি ধাপ নীচে নেমে যেতে হল। *সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ-জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হল যাতে এন* মজুমদারের চোখে তাকে বেশ সপ্রতিভ লাগে। চেষ্টা করছিল ভাবতে যে সে নিজেও কুকুরপ্রেমী, অমল ভয়ে ভয়ে দু-একবার হাত বাড়াবার চেষ্টা করল।

'দেখুন, আসলে হয়েছে কী, শহরে তো আর চাষ হয় না, ফলে সবটাই নির্ভর করছে প্রকিওরমেন্টের ওপর... আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।'

এন মজুমদারের বসার ঘরটি কিছু পুরাকীর্তির নকল, লোকশিল্পের উদাহরণ, ফুড ডিস্ট্রিবিউশন, প্রকিওরমেন্ট, কাল্টিভেশন, ফুড ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতির বইয়ে নিখুঁতভাবে সজ্জিত। ভদ্রলোক একনাগাড়ে থাকছিলেন না, বারবারই কী এক রহস্যজনক কারণে তাঁকে উঠে যেতে হচ্ছিল।

ফলে কথাবার্তা হচ্ছিল ভীষণ টুকরো-টুকরোভাবে। 'থার্ডওয়ার্ল্ড', 'ইরোশন', 'গ্রিন রেভোলিউশন', 'রাইট টু ফুড', 'ফুড ফর ওয়ার্ক', 'পলিটিক্স অব ফুড', 'ফুড ফর পিপল' 'পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম', 'আন-ইভন ডিস্ট্রিবিউশন' ও 'পার্মানেন্ট ফেমিন'—এত সব আইডিয়া বেরিয়ে এল শ্রীযুক্ত মজুমদারের মুখ থেকে। এবং শেষে একটি অনুরোধ 'অনুগ্রহ করে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন... বুঝতেই পারছেন, আমি আর ফুড ডিপার্টমেন্টে নেই বললাম তো।'

এবার কোথায় যাচ্ছেন?

পরিবেশ দফতরে।

ফুড থেকে এনভায়ার্নমেন্টে?

এনভায়ার্নমেন্ট থেকে স্টিলেও যেতে পারি...

আচ্ছা... সকালের দিকটায় থাকেন তো, আমি ফোনেই আপনাকে শুনিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

যদি লাইন পান।

এমন সময় দুটি চায়ের কাপ এসে যাওয়ায় অমলের ওঠা হল না; এন. মজুমদারকে তার আর কিছুই জিজ্ঞেস করার নেই, তবু আগামী দশ মিনিট বোবা হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। ফলে, সে বিষয়টিকে দফতরের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, ভাবল এবার তো দুজন মানুষ তাদের জীবিকাগত অস্তিত্ব ভুলে একটু অন্তরঙ্গ, ঢিলেঢালা কথাও বলতে পারে। তা ছাড়া, অমল তো একটু ভয়ই পেয়েছে—সত্যি যদি দুর্ভিক্ষ হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে, সে যেন সত্যি ভিতরে ভিতরে আঁতকে উঠছে এমনভাবেই বলে ফেলল, 'কয়েক বছরের মধ্যে যদি রেশনিং ব্যবস্থা ধসে পড়ে তাহলে তো মানুষ শুকিয়ে মারা যাবে।' এন. মজুমদার বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং মৃদু হেসে বললেন, 'সে আশঙ্কা একেবারেই নেই, গত দুর্ভিক্ষে যা ঘটেছিল এবারও তা-ই ঘটবে। আমাদের শহর থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ, যেভাবেই হোক শহরের রেশনিং ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হবে। তবে হ্যাঁ, গ্রামের মানুষ শহরে এসে মুখ থুবড়ে মরতে পারে।' 'কী ভয়ংকর!' এই মন্তব্যটি অমলের অজান্তেই উঠে আসে। যার পর মজুমদার বললেন, 'এর আগের বারের ঘটনার কথা ভাবলে কোনটা বেশি ভয়ংকর বলা কঠিন, খবরের কাগজে অবশ্য মৃত্যুর সংখ্যা দিয়েই তা ঠিক করা হয়।'

ভয়ংকর আর নেতিবাচক একটি ঘটনা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে গড়ে উঠছে, রহস্য গল্পের মতো তা সম্পূর্ণ ছক অনুযায়ী হয়তো এগোবে না, কারণ অজস্র ও বিপুল সংখ্যক মানুষের যোগদানই শেষ পর্যন্ত ঘটনাটির রূপে কিছু পরিবর্তন আনলেও আনতে পারে। যদিও একটি দুর্ভিক্ষ থেকে আর একটি দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত আসতে ক শহরের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, তবু দুর্ভিক্ষের প্রশ্নে শহরটিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। অতীতেও কিছু কিছু মানুষ আঁচ করতে পেরেছিল এরকম কিছু একটা ঘটতে চলেছে, অমল সে কাহিনি বাবার মুখেই শুনেছিল। অথচ তারা কেউই এবিষয়ে মানুষজনকে সতর্ক করে দেয়নি, রহস্যজনক ভয় আর সময়ের শুভ দিকটিকে কল্পনা করে, তাকে দেবতা ভেবে, আশা করেছিল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর প্রলয় তাদের ছোঁবে না। তারা ঠিক বেঁচে যাবে। আসলে তা ছিল শর্তহীন আত্মসমর্পণ। অন্যদিকে,

ব্যাপক বিনাশের আশঙ্কা যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করা যাচ্ছিল না, ফলে বৃত্তান্তটি হয়ে পড়েছিল দুর্দশার এক রূপকথা। এরকম অগোছালো আবহাওয়ায়, সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে বিশ্বাস, আস্থা এসব টিকিয়ে রাখা কঠিন। সত্যের এই নাটকীয়তার দিকটি বড়ো করুণ, আবার তাকে অনুসরণ করা, বোঝার চেষ্টা করতে করতে বিপদ হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

এন মজুমদারের আশ্বাস অমলকে খুব একটা ছুঁতে পারল না। শহরটি নিরাপদ জেনে সে তেমন কোনো স্বস্তি বোধ করছে না, বরং আরও বেশি ভৌতিক লাগছে সবকিছু। শহরটিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মনে হল, মানচিত্রের যেখানেই তাকে রাখা হোক না কেন, দেখা যাবে শহরটির বাইরে, চতুর্দিকে ছুটে যাচ্ছে নীল আগুন। এই আগুনই আবার আকর্ষণ করছে, টেনে আনছে মানচিত্রের অপরাপর অংশকে। অথচ সে নিজে কী অপরিসীম স্বাভাবিক, প্রতিদিনের মতো বিশ্বাস্য, প্রশস্ত রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গভীর ঔদার্য। শহরটি ঝকঝকে করে তোলার অন্তত এক হাজারটি পরিকল্পনা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দফতরে, টানানো হয়েছে একটি হোর্ডিং, তাতে দেখা যাচ্ছে শহরটির বুকের পাশে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে দুটি ডানা। ফলে দুর্ভিক্ষ এত অলীক ভয় হয়ে ওঠে যে, ধারণা হতে পারে, এ ধরনের বিপদের আশঙ্কা যারা প্রকাশ করেছে তারা মানসিক রোগগ্রস্ত।

ফিরে এসে অমল সুকোমল গাঙ্গুলিকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করল, পোস্টঅফিসের ফোন যেন আরও একটু স্বতন্ত্র, প্রায় পনেরো মিনিট চেষ্টা করার পর সবে লাইনটা পেয়েছে, এমন সময় অপরিচিত মানুষের কথাবার্তায় তাকে ঢুকে পড়তে হয়। সে এবং সুকোমল গাঙ্গুলি কথা বলছে, আবার অন্য দুজন মানুষ কথা বলছে, এই দুটি জিনিস পরস্পরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'সময়কে মেনে নেওয়া ছাড়া কী-ই বা উপায়...', 'তুমি মজুমদারকে পেলে', 'সত্যি আমরা সংশয়াকুল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি', 'পেয়েছি, তবে...' 'নাহলে ভাবুন পত্রিকাটা এভাবে উঠে যায়?', 'আজই লিখে ফ্যালো, কাল বারোটার মধ্যে এসো', 'সময়ের ভূমিকা নিয়ে...', 'সমস্যা হল', 'খুবই কঠিন সময়ের...' 'লেখাটা তো লিখে ফ্যালো, পরে না হয়', 'আমার কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, পঞ্চান্ন চলছে, আর পারব না নতুন করে', 'সুকোমলদা, শুনুন, রেশনিং ব্যবস্থার পয়েন্ট নয়, ফেমিনের আশঙ্কা করা হচ্ছে, শুনছেন, হ্যালো' লাইন কেটে গেল কিন্তু অপরিচিত দুজন মানুষের সময় নিয়ে কথাবার্তা তখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, যদিও অমল ফোন রেখে দেয়।

বেকবাগান পোস্টঅফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর কিছুক্ষণ কেটে যায় কোন দিকে যাবে সেই ভাবনায়। চট করে মনস্থির করতে পারছিল না, যেভাবে হোক তাকে আজকের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে। যদিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কাজটা কী, সুকোমল গাঙ্গুলি এমন একটি লেখা পেলেই সন্তুষ্ট হবে যা বর্ণনামূলক, আঁটোসাঁটো, একটা কিছু বক্তব্যও থাকা দরকার, তবে বক্তব্যটি বর্ণনার মধ্যে যেন আত্মগোপন করে থাকে। আর এক্ষেত্রে বক্তব্যটি তো অমলের মস্তিষ্কেও নেই, বক্তব্য এমন চতুরভাবে আত্মগোপন করেছে যে আজকের দিনটির মধ্যে তাকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। ফলে অনুপুঙ্খ বর্ণনা, খাদ্য দফতরের কয়েকটি পরিভাষা

এবং খাদ্যসংগ্রহের সমস্যাগত দিকটি এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে বোঝা যায়, খাদ্য সমস্যা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। তবে তা এন. মজুমদার-কথিত দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি নয়। বরং ৩৫-৩৬ বছর আগে যে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তারপর থেকে এই ৭৮ সাল পর্যন্ত, প্রতি বছরই খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন কাগজে নিয়মিত লেখা বেরিয়েছে। এমনকি এই সমস্ত লেখাকে সংহত করে নিয়ে এলে দেখা যাবে মোট আর মূল লেখা আসলে চারটি/পাঁচটি। বাকি লেখাগুলো যেন প্রতিদিন উপস্থিত, স্থায়ী দুর্ভিক্ষের হালকা ছায়ামাত্র। অমলকে ঠিক এরকমই একটি ছায়ার ছায়া রচনা করতে হবে।

পাঁচ

ধৈর্য নামক গুণটির উপাসনা আর নিজের শরীরে অস্ত্রাঘাত করে যাওয়া সমতুল্য কি না, এ বিষয়ে অমলের সংশয় ছিল। কখনও মনে হত না তা নয়, তখন অতি ধীর প্রায় অদৃশ্য একটি প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে, সে দেখতে পেত। আবার যখন ধৈর্য খুনির মতোই স্থির আর ঠান্ডা মনে হত তখন সে কোনো প্রক্রিয়ার অস্তিত্বই অনুভব করত না। বরং মনে হত সে ক্রমাগত নিজেকে ভুল বুঝিয়ে চলেছে, ভয় পাচ্ছে ভূমিকা গ্রহণ করতে; নিজের চিন্তাকে স্পষ্ট করতে তার ভয় হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি গল্প ছিল, গল্পটি প্রায় দিনই যে কোনো অংশ আর অনুচ্ছেদ থেকে গঁড়ে উঠত, ভেঙে যেত, আবার শেষ থেকে শুরু বা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা চলে যেত সপরিবার। গল্পটির কেন্দ্রবিন্দু অমলের চাকরি ছেড়ে দেওয়া নয়, সুভদ্রার কনফার্মেশন, ঊর্মিলার এমএ পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এই দুটি ঘটনা শেষ পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবেই উতরে যাবে এবং অমল সেদিনই এস. গাঙ্গুলিকে একটি চিঠি লিখে জানাবে, 'আমি দুঃখিত, শরীর-মন আর সায় দিচ্ছে না, আপনি আমাকে মার্জনা করুন, নব সমাচারের রিটেইনার হিসাবেই জানাচ্ছি, এই চিঠিটিকে আমার ইস্তফাপত্র বলেই গণ্য করবেন।'

'নবযুগ'এর জন্য হাড়ভাঙা খাটনি আর নামমাত্র মজুরির দিন এইভাবে শেষ হবে। ওই অন্তিম সময় এগিয়ে আসছে ধীরে, অমলের একটি ভুলে সেই উজ্জ্বল দিনটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হতে পারে। হয়তো, সুভদ্রা কনফার্মেশন পেল না, ঊর্মিলার এমএ-র রেজাল্ট আশানুরূপ হল না—যত বিস্ময়করই হোক না কেন, এরকম দুর্ঘটনা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তা কী করে ভাববে! কারণ দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার গতি সুভদ্রা বা ঊর্মিলার হাতে নেই, বরং তা দুটি দফতরের অধীন, দুটি সরকারি বিভাগই তার নিয়ন্তা।

তবু এর মধ্যে আশার গল্পটি এত যত্নের সঙ্গে পরিবারটি লালন করে চলেছিল, যেন তা ঊর্মিলার গর্ভে যে সন্তান এসেছে প্রায় সেরকমই একটি সত্য। এই সন্তানসম্ভাবনার সঙ্গে গল্পটির মিলের কোনো অন্ত নেই, ভালোবাসার সঙ্গে যেমন শঙ্কা থাকে, যেমন তারা দুজনই গোপনে ভাবত—শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হোক, উদ্‌বিগ্ন হত শিশুটির সর্বশরীর এবং ইন্দ্রিয় কল্পনা করে, বিকলাঙ্গ শিশু খুব কম মানুষেরই হয়, তবু এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখা সম্ভব হত না।

এক অপরাহ্ণবেলায় ঊর্মিলার স্ফীত উদরটিতে ঊর্মিলারই হাত সরে সরে যাচ্ছিল। সে যেমন কিছুদিন আগে বলেছিল, আজও সেরকম ভাবেই বলল, 'এখন না—সবসময় টের পাওয়া যায়।'

খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখা অর্ধেক সংসার, আধখানা বেঞ্চি, জোড়া স্তূপীকৃত বিছানা, দু-তিনটি ছবি আর ক্যালেন্ডারে গিলে ফেলা দেওয়াল—এইসবের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বেশ পুরোনো আর মলিন হয়ে যাওয়া একটি দম্পতি হঠাৎ অনুভব করল ভালোবাসা। ভালোবাসা থেকে তারা সুখের কল্পনায় অতি সহজে স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। এইসব মুহূর্তে তাদের সমস্ত কথাই হ্যাঁ-বাচ্যে, যে শহর নেতির এক বীভৎস বর্ণনামাত্র, সেই শহরের বাসিন্দা হয়েও যেরকম দুঃসাহস আর অতিকল্পনায় তারা এনে ফেলেছিল একের পর এক স্বপ্নের কথা, আলোচনা করছিল খোলামেলা একটি বাসস্থান সম্পর্কে, তাতে হাঠৎ ছেদ পড়লে অমল সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে।

নাদু মিত্তির প্রায় তখনই ওপর থেকে ডাকতে থাকে, 'অমল আছ নাকি, অমল, একবার আসবে একটু।' ঊর্মিলা বেশ বিরক্ত বোধ করছে বোঝা গেল। 'যাচ্ছি মেশোমশাই' শুনে সে বলে ফেলল, 'চোদ্দো পুরুষের মেশোমশাই, একবার ঢুকলে তো সেই রাত বারোটা।' অমল একটু হেসেই ফেলে, বলতে চায়, আহা মানুষটা বড়ো নিঃসঙ্গ। শূন্যে প্রাসাদ বানায় প্রতিদিন, আর প্রতিদিন এক-একটি প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপ হয়ে যায়, সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে রোজই তাকে টেনে বের করে নিতে হয় নিজের রক্তাক্ত শরীর।

অমল সবে চটিতে পা গলিয়েছে এমন সময় বিধুবালা আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এক কাপ চা নিয়ে ঢুকল, 'খাবি কিছু?' সম্ভবত কিছুক্ষণ আগের সুখ-কথা বিধুবালা শুনে থাকবে, তার মুখটি বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সাদা চুলগুলি উষ্ণীষ মনে হচ্ছিল। 'তোমার অর্শ কেমন আছে, দ্যাখো কী যে হয়েছে, আজও ভুলে গেলাম', বলেই সে হাসতে হাসতে মার হাতে পাইলেক্সের ফাইলটি তুলে দিল। বিধুবালা অমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ওপরে যাচ্ছিস তো, কড়াভাবে বলে দিবি ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া সত্ত্বেও কারেন্ট নেই কেন, টাকাটা জমা দিয়েছে, নাকি খেয়ে ফেলেছে?' 'তোমার কি মনে হয় বললেই লাইন আসবে?' অমল হাসছিল, তাকে কেমন হাসিতে পেয়েছে, যেন অবিশ্বাস্য আর মজার সব ব্যাপার ঘটে চলেছে একের পর এক, এবং অমল তাতে কৌতুক বোধ করছে।

বহু প্রজন্ম ধরে ক শহরে বসবাস করছে, সাম্রাজ্যবাদকে সশরীরে দেখেছে শুধু নয়, তার সঙ্গে ব্যবসা করেছে, আছে আলস্য আর বিনোদনের জাঁকজমকপূর্ণ সুবৃহৎ কাহিনি, যদিও পরে ওই বংশটিতে ভাঙন ধরেছে, সাদাদের দেশে গিয়েছিল বলে তাদের কোনো কোনো শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর পুরোনোপন্থীরা গভীর এবং ব্যাপক ক্ষয়ের স্তূপের উপর বসে এখন বুঝতে পারছে কী ভুল-ই করেছে। কিন্তু ভালোবাসে শুধু অতীতচারণ করতে। নাদু মিত্তির হুবহু এরকমই এক ছকে-বাঁধা চরিত্র হতে পারতেন। ছকে-বাঁধা মানুষ সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করা কঠিন, তদুপরি ক শহরের এ-বিষয়ে এমন দুর্বলতা আছে যে অতীত ঘিরে গাদা গাদা বই তারা প্রসব করেছে। সেসব বই কর্পূরের মতো উড়ে যায়, একটি-দুটি

বিজ্ঞাপনই সমস্ত কপি নিঃশেষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। বিনোদনবিলাস, সাম্রাজ্যবাদের বর্ণনা, সন্ত্রাসবাদের রোমাঞ্চ আর শিল্পকলা থেকে জ্ঞানচর্চা—সবকিছুকে জড়িয়ে নেওয়ার রেওয়াজ আজও প্রবল। 'সেকালের পোশাক', 'ক শহরের অতীত আচার', 'ক শহরের ফিটন গাড়ির বিবরণ' ও 'সেকালের বাবুদের সহিস' হল এরকমই কয়েকটি পুস্তক। এইসব পুস্তকের তথ্য আর ধ্যানধারণাকে সমাজ-ইতিহাসচর্চা বলে চালানো হয়। এরকম প্রেক্ষাপটে নাদু মিত্তির বাস করেন অমলদের মাথার উপর। অবশ্য নাদু মিত্তির সম্পর্কে অমলের ধারণা অন্যরকম। তা যথাসময়ে উপস্থিত করা হবে।

ওপরে যেতে হলে অমলকে প্রথমে নীচে নেমে যেতে হবে। মাঝখানে প্রশস্ত একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র রেখে থামসমেত বারান্দা চলে গিয়েছে তিন দিকে, অন্য দিকটিতে অমলদের সিঁড়ি। মূল বাড়িটি গড়ে উঠতে পারত অনেক কম জায়গা নিয়ে, কিন্তু তা করা হয়নি। ববং জায়গা আর ঘরগুলোর মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বেশ খোলামেলা ছন্দ। যেজন্য, শুধু ঘবের কাঠামো মনে হয় না বাড়িটিকে, ঘরের থেকে অনেক বড়ো হয়ে ওঠে খোলামেলা জায়গা। আর তা যেমন আছে বাড়িটির মধ্যে, তেমনি বাইরের দিক থেকেও অনেকটা স্পেস বলযের মতো ঘিরে রেখেছে কার্নিশ, থাম, অলিন্দ আর দেওয়াল ফাটানো অশ্বত্থেব চাবা। এরকম তিন-চারটি চারা বহুবার চেষ্টা করেও নির্মূল করা যায়নি। বর্ষা ঋতু তাদের ঠিক বাঁচিয়ে দেয়।

এই চিঠিটা এসেছে কর্পোরেশন থেকে।

হুঁ।

জবাবটা তুমি একটু দেখে দাও, বাবা।

ঠিকই তো আছে।

বেশ, তাহলে কালই পোস্ট করে দেব, আসলে হয়েছে কী— ইন্সপেক্টার আমাকে বলল বাড়িটার এরিয়া, ঘরের সংখ্যা, ভাড়া এইসব কেটেছেঁটে দেখাতে, ঘুষ চাইছিল আর কী! পল্টু খুব বোঝাল—বাবা দিয়ে দাও, কিন্তু আমি দেখলাম ওই লোকটাকে পয়সা দেওয়ার থেকে দু-টাকা বেশি ট্যাক্স দেওয়াই ঠিক। সে টাকাটা তো কলকাতার কাজেই লাগবে, না-কি?

হ্যাঁ, কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে।

তা-ও ভেবেছি—ধরো রেশনের চাল খাবে না কেন, শহরসুদ্ধ লোক তো তাই-ই খাচ্ছে, আর ইয়ে—বাইরের ঘরে আমি একটা দোকান খুলব।

দোকান?

হ্যাঁ।

ঘরে বসে না থেকে, পুরোনো কাগজ বেচা-কেনা করব।

বৃদ্ধ উৎসাহের আতিশয্যে ঘরের ভিতর থেকে বেশ বড়ো একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এলেন, স্তূপীকৃত বস্তা দেখালেন আর একটি লিস্ট বের করে পড়ে শোনালেন সম্ভাব্য ক্রেতা-বিক্রেতাদের নাম-ঠিকানা। অমলের অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ যেন আশ্চর্য সারল্য ফিরে পেয়েছেন, যেন এইবার তাঁর বহুদিনের এক স্বপ্ন সফল হবে, এ যেন এক উচ্চাশা তাঁর কাছে এবং তিনি একান্ত সংগোপনে এতদিন ধরে গড়ে তুলছিলেন এই একটি স্বপ্ন। পরে শিশি-বোতল-কাচভাঙা,

লোহা-সিসে-তামা ইত্যাদির কেনা-বেচা করবেন বলে কাগজকুড়োনো ছেলেদের সঙ্গেও নাকি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভেবো না যে আবার খোয়াব দেখতে শুরু করেছি।

ছি ছি, তা কেন ভাবব, আমি আপনার বয়সের কথা ভাবছিলাম।

বয়সটা অমল মনের কাছে, অসুস্থ তো নই। আমি হিসেব কষে দেখেছি ঠিকমতো চালাতে পারলে মাসে চারশো টাকা অনায়াসে রোজগার করা যাবে। কোনোদিন কিছু করিনি বলে আজও কিছু করব না, এর কোনো মানে নেই।

নাদু মিত্তির ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কোনো ব্যবসার পরিকল্পনা করতে চাইল না কেন? এই প্রশ্নটি অমলকে অনুসরণ করছিল সিঁড়ির ধাপে ধাপে, দোতলায় এসে উঠোনের ওপর টানানো ছেঁড়া, ভাঙা আর বেঁকে যাওয়া লোহার জালটিতে জমা-হওয়া ছাতানাতার দিকে অমলের চোখ গেল। আর তার হঠাৎই মনে হল—শুধু চারশো টাকা নয়, নাদু মিত্তির, পঁয়ষট্টি বছরের একজন মানুষ, ফিরে পেতে চাইছেন আত্মবিশ্বাস। উদ্‌বাস্তু হয়ে আসা একটি বাঙাল পরিবার এ শহরে অতি কষ্টে বেঁচে থেকেও নিজেদের উন্নত করার যে চেষ্টাটি চালিয়ে গিয়েছে, নাদু মিত্তির সেই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একা একা অনেক ভেবেছে। হয়তো সে এই ছেঁড়া জালটির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকে শুধু তা-ই ভেবেছে, অমলকে একজন মানুষ ভেবেছে, ভেবেছে অমল ভাগ্যতাড়িত নয়। আর তখনই কানে এসেছে পল্টুর শিসধ্বনি, নাদু মিত্তির তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে, সামান্য কথা কাটাকাটিতে চিৎকার করে ফেলেছে, 'দরকার হলে বাড়ি বেচে দিয়ে বস্তিতে উঠে যাব, তোর মা ঠোঙা বানাবে, তবু আমি উত্তর কলকাতার নাদু মিত্তির এই পরিচয় দিয়ে ভিক্ষে করতে পারব না।' বা সময়-সময় বলে ফেলেছে, 'দেখ, জুটমিলে কুলির কাজে লাগব ঠিক করেছিলাম একসময়, তাহলে তো তুই আমাকে বাবা বলে পরিচয় দিতিস না' এইরকম হাজার-এক কথা, হাজার রকমভাবে নাদু মিত্তিরের পরিচয় বদলে ফেলার এক মরিয়া চেষ্টা আজও কাজ করে চলেছে এবং তাতে অতীতের কোনো স্মৃতিভারাতুর কোমল দুঃখ নেই। বরং আছে পঁয়ষট্টি বছরের একটি জীবনের প্রতিটি দিন ভেবেচেন্তে খরচ করার তীব্রতা।

ঘরে ঢুকতেই অমলকে বিমলবাবুর মুখোমুখি হতে হল, মানুষটি নিজের পছন্দ-অপছন্দ লুকিয়ে ফেলতে জানেন না। পৃথিবী তাঁর কাছে সংকুচিত হয়ে এসেছে এতখানি যে সবকিছুই নানা আবেগের ঢেউয়ে জড়ানো ব্যক্তিগত, ছোটো একটি পৃথিবী। এই পৃথিবীতে নাদু মিত্তিরের জন্য সঞ্চিত আছে অযৌক্তিক ঈর্ষা, যেন নাদু মিত্তিরের অতীত সৌভাগ্যের পুঁজি লুটে নেওয়া হয়েছিল বিমলবাবুর কাছ থেকেই।

অর্থাৎ বিমলবাবু নাদু মিত্তিরকে এখনও তাঁর অতীতেই দেখতে পান, নাদু মিত্তিরের অতীতের প্রতি বিমলবাবুর ঈর্ষা আছে। তিনি ইলেকট্রিক বিল সম্পর্কে জানতে চাইলেন, অমল সে-বিষয়ে কোনো কথা বলেনি শুনে মন্তব্য করলেন, অমলের ভালোমানুষিটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। টাকা-পয়সা দিয়ে অন্ধকারে থাকার কোনো মানে হয় না। ফুটো ছাত আর স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। তবে ঊর্মিলার এই অবস্থায় ঠান্ডা লাগলে আর

রক্ষা থাকবে না—একথাও বলতে ভুললেন না। এক নিশ্বাসে এইসব অভিযোগ সেরেই ভদ্রলোক জপ করতে বসে গেলেন, অমল তার বাবাকে তখন অকারণেই লক্ষ করে যেতে লাগল, মনে হল বাহ্, আজও তো বেশ ব্রাহ্মণের মতো দেখতে।

ছয়

ভুয়ো রেশন কার্ড থেকে যদি এরকম কোনো সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ক শহরে এমন অজস্র মানুষ আছে যাদের অস্তিত্ব সরকারি দফতরের গণনার মধ্যে নেই, তাহলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। অমলের যুক্তি ছিল মোটামুটি এরকম : যদি দেখা যায় একজন মানুষের দুটি ঠিকানায় দুটি আলাদা নামে কার্ড রয়েছে এবং সে দুটি জায়গা থেকেই রেশন তুলছে, তাহলে সেই মানুষটিকে ভুয়ো, বা মানুষটির কোনো অস্তিত্ব নেই—একথা বলা চলে না। অন্যদিকে, ক শহরে যারা কাজের স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে তারা তো বেশিরভাগই আসছে শহরের বাইরে থেকে, সস্তার হোটেল তাদের নামে কার্ড রাখতে সক্ষম হলেও দেখা যেত মোট ভুয়ো কার্ডেব সংখ্যা অনেক কমে এসেছে, শহরের বাইরে রেশন এতই অনিয়মিত এবং উঠে যাওয়ার মুখে যে, তা নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। এ জিনিসটা ঠিক যে এভাবে ঘটছে তা নয়, বাড়তি খাবারের চাহিদা বুঝে রেশন-দোকানদাররাই বাড়তি দামে চাল, গম, চিনি, তেল ছাড়ছে—এ প্রায় একটি সমান্তরাল খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা।

আমি এমন ঘটনাও দেখেছি যে, গ্রাম থেকে গরিব চাষি পরিবার এসে উঠেছে শহরেব কোনো বাড়ির সিঁড়িঘরে। বাড়িটির টুকটাক কাজ তারা করে দিচ্ছে আর তাদের নামে কার্ড বের করার পর আশ্রয়দাতা চিনি এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে নিচ্ছে, চাষি পরিবারটি তুলছে শুধু চাল আর গম।

বুঝলুম, কিন্তু তুমি কি এগুলোকেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বলতে চাইছ?

অতদূর না-হলেও খাদ্যসমস্যা আর খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থাব মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে বেশ হতাশার ছবি ফুটে ওঠে।

খোলা বাজারের ভূমিকা কতখানি?

আমার মনে হয়, যদি আমবা সত্যিই সমস্যাটিকে ধরতে চাই তাহলে চাষ থেকে খাদ্যবণ্টন পর্যন্ত গোটা জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা দরকার—এর থেকে সাপ ব্যাঙ যা-ই বেরোক না কেন।

অমল এত কথা বলবে নিজেও ভাবেনি। আসলে এ-প্রসঙ্গে তার মধ্যে কাজ করে চলেছিল গভীর ভয়। একজন এন. মজুমদার বিশেষজ্ঞের আলগাভাবটুকু বজায় রেখেই অমলের রক্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল একটুকরো ভয়। তারপর অমলের ভাবনা চলেছে মূলত ওই ভীতির তাড়নায়। অন্যদিকে রবিবার থলে হাতে রেশনের দোকানে লাইন দেওয়া থেকে দোকানদারের হাতঝটকা, হাতসাফাইয়ে প্রতিটি কার্ডহোল্ডারের কাছ থেকে সামান্য সামান্য মাল কেটে নেওয়ার মতো নিরীহ ঘটনার মধ্যেও যে লুকিয়ে থাকতে পারে অবয়বহীন মন্থর এক দুর্ভিক্ষ—তা যেন সে আজ এই প্রথম আবিষ্কার করল। যেমন তার মনে পড়ে গেল বাল্যকালের কথা,

'স্বাধীনতা' পত্রিকার এক-একটি কপি বিক্রি হয়েছিল দশ টাকা দামে, যেমন এখন যেকোনো দৈনিক কাগজ বিক্রি হতে পারে ওই দামে যদি ক্রিকেটে দিগ্‌বিজয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয় রংচঙে ছাপায়। তবু, এই বাইশ বছরে খাদ্যসমস্যা সংবাদপত্রের ১০-১৫ সেমি জায়গাও নেয়নি এমন একটিও দিন নেই। বাল্যকালে 'স্বাধীনতা' কাগজটির সমস্ত স্পেসই অবশ্য গ্রাস করেছিল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা।

'সময় অনেক বদলে গিয়েছে'—বললেন সিনিয়র রিপোর্টার টি পি বসু, আর একটি টেবিল ঘিরে বসে থাকা পাঁচজন মানুষ যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলেন হারিয়ে-যাওয়া একটি দুর্লভ চাবি। এস গাঙ্গুলি কমনীয় চেহারাটি হেলিয়ে দিলেন পিছনে, ফোমবসানো চেয়ারটি তাঁর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কাত হল একটু। সামান্য শব্দ শোনা গেল এই মুদ্রাটির দরুন।

এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে—

আপনি কি পরিকল্পনার কথা বলছেন?

না, তবে ঠিক না-ও বলতে পারি না।

তাহলে?

আমি স্বাধীনতার কথা বলতে চাইছি।

পাঁচজন মানুষ অতঃপর হারিয়ে যেতে লাগল ক শহরের স্বাধীনতা-উপাখ্যানে। এখন তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে ততটা কথা বলছে না, বরং অনেক বেশি একনিষ্ঠ তারা, শহরটি কীভাবে ক্রমশ পুরোনো রীতিনীতি কেতা ঝেড়ে ফেলছে, ক শহরের পুরোনো প্রশাসন সম্রাজ্ঞীর পা-চাটা ছিল। কর্তৃত্ব বদলে যাওয়ার একত্রিশ বছর পরে পুরোনো প্রশাসনের অনেকেই অবসর গ্রহণ করেছে। নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও ঘটেছে লক্ষণীয় অদলবদল, প্রথম দশ-পনেরো বছর এসব করতেই কেটে গিয়েছে। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই, স্বাধীনতার পয়েন্টটি এমনকি কমিউনিস্টদের পক্ষেও আজ আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি কর্তৃত্বকে কিছুতেই আর সেভাবে প্রতিপক্ষ হিসাবে খাড়া করা সম্ভব নয়, যেমন নৈতিকতার দিক থেকে একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র পারে না শুধু গাঢ় কালিতে হতাশা আর দুর্দশার বিবরণ ছেপে যেতে, সমষ্টির জীবনে ভয়ের বীজ বপন করতে।

শেষ পর্যন্ত ভুয়ো রেশনকার্ড উদ্ধার-অভিযানের কাজটি অমলকে দেওয়া হলে সে নিজেকে খাদ্য দফতরের একজন সৎ ইনসপেক্টররূপেই দেখতে পেল। অনুভব করল স্বাধীনতা, সময় ইত্যাদি ধারণা। অমল এখন কোনো একজন বিশেষ মানুষ নয়, দফতরের পর দফতর ঘুরে সমস্যার পর সমস্যা বদলে সে নিজেই হয়ে উঠছে একজন পূর্ণবয়স্ক বেকার থেকে সুবিচারপ্রার্থী একজন নাগরিক, একটি রেশনকার্ড তার নিজের নামে ইস্যু করা আছে, তবু এখন সে নিজেও নামপরিচয়হীন ক শহরে এক ভুয়ো অস্তিত্ব, ভুয়ো রেশনকার্ড, যে খুঁজে বেড়াবে আরও অনেক ভুয়ো মানুষকে।

বিশাল হলঘরটিতে ঢুকে, নীল উর্দি-পরা এক ছোকরাকে চা দেওয়ার জন্য ইশারা করে, অমল একটু একা বসতে চেয়েছিল। স্থানসংকুলান না-হওয়াতে অন্যসব টেবিল থেকে একজন

প্রেসের লোক, বিজ্ঞাপন বিভাগের শ্রীযুক্ত দাস, আর বিনোদনের পাতার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত অমলের টেবিলটিতে উঠে এল। এর মধ্যে প্রেসের মানুষটিরই দেখা গেল কথা বলার বিশেষ আগ্রহ নেই। একই অফিসের চারজন কর্মী, যারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত, কী করে তারা নিঃশব্দে চা খেয়ে যেতে পারে, চা খাওয়ার সময়টুকু ধরে কীভাবেই বা থেকে যেতে পারে নিজ নিজ ভাবনায়। বিশেষ ক শহরটি সর্বদাই যেন কিছু প্রকাশ করতে চায়, কথা বলার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে, এ-শহরের অধিকাংশ মানুষই এড়িয়ে যেতে পারে না শহরের এই গাঢ় প্রভাব। ক এমনই হরবোলা, এমনই কিচিরমিচির, ভ্যাজভ্যাজ, ভ্যারভ্যার। যেজন্য, অমলের মাঝে মাঝে মনে হয়েছে অফিসকাছারির মানুষ থেকে পথচারী মানুষ পর্যন্ত সকলের বুকেই 'কথা' নামের ছোটো একটি ছাপ লুকিয়ে আছে আর এই সুপ্ত রহস্যটি তারা সবাই জানে বলে অপরিচিত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েও স্ট্যাম্পটি পড়ে ফেলতে পারে। বিপুল এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহারে কেমন হলুদ হয়ে এসেছে শব্দটি।

'বুঝলেন অমলবাবু', দাশ কিংবা দাশগুপ্ত কেউ একজন বললেন, কিন্তু অমলের উদ্দেশে কথাটি তিনি শুরু করতে পারলেন না সেভাবে, কারণ অপরজন ততক্ষণে বলে ফেলেছেন, 'বিজ্ঞাপনের দুনিয়া মেয়েরা দখল করে নিচ্ছে, ক-দিন বাদেই আমাদের যেতে হবে মেশিনঘরে। যা ইংরেজির তোড়, আমরা তো আর সাহেবি ইস্কুলে পড়িনি।' মেশিনঘরের মানুষটি বসে ছিলেন উর্দি পরেই, তাঁর উর্দিতে লেগে আছে কালির ছাপ, যা শ্রমের চিহ্ন। মানুষটি না-হেসে পারলেন না, 'ওখানে ভ্যাকান্সি নেই দাদা, নতুন মেশিনে আর বেশি লোকের দরকার নেই, ক-দিন পরে বোতাম টিপলেই দেখবেন কাগজ বেরিয়ে আসছে।'

এরকমভাবে গড়ে উঠতে পারে নিটোল একটি আলোচনা, এমনকি চারজন মানুষ আলোচনা করতে করতে বেজায় উত্তেজিত হয়ে যেতে পারেন।

তবু দাশ, দাশগুপ্ত, প্রেসের লোকটি এবং অমল কিছুক্ষণ পরেই এসব ভুলে যাবে। হয়তো এই প্রসঙ্গ থেকে ততক্ষণে তারা সরে যাবে রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে, আলোচনা করবে বিভিন্ন দল সম্পর্কে। আর শেষে সমস্বরে সবাই গেয়ে উঠবে একটি কলি, তা থেকে জানা যাবে রাজনীতি সম্পর্কে তাদের কোনো আস্থা নেই। বরং তারা সর্বদা অনুভব করে সংশয়, সংকট আর বিপুল বিচ্ছিন্নতা।

অচিরেই সেই বিচ্ছিন্নতা এল শরীরীভাবে, একে একে সবাই উঠে গেলে অমলকে ভাবতে হল 'চাকরিটা ছাড়তেই হবে'। যেমন সে অনুভব করল, ব্যাপক ঘটনাহীনতাই তাকে ঠেলে দিচ্ছে এক-একটি সমস্যার দিকে। না হলে খাদ্যসমস্যা বিষয়ে একের পর এক নিবন্ধ লেখার দায় তার ওপর বর্তাত না। প্রেস অত্যাধুনিক যন্ত্রে সেজে উঠেছে পরিকল্পনামাফিক, পরিকল্পনামাফিকই সমস্ত দফতরের বিজ্ঞাপন বিভাগে বেড়েছে মেয়েদের উপস্থিতি, যেমন এখন মেয়েরা সাংবাদিকতাও করছে। যদিও মেয়েদের এই ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে মেয়েদের নিজস্ব চেষ্টা যতটুকু আছে তার থেকে বহুগুণ বেশি রয়েছে 'সময়' নামক শব্দটি। অথচ মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়া কত পুরোনো ব্যাপার, এ-জিনিসের বয়স কবে অতিক্রম করে গিয়েছে একটি শতক। তবু যে কেন দাশ বা দাশগুপ্ত এ-প্রসঙ্গে সময়ের উল্লেখ করে সমসাময়িকতার

কথা বোঝাতে চায় সে এক রহস্য। আবার এস গাঙ্গুলি তাকে চিত্রিত করে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বর্ণনায়, যদিও সুকোমল গাঙ্গুলি চাইছিলেন ভুয়ো কার্ডের বিষয়টি দুর্নীতির দিক থেকে উদঘাটন করতে, তবু তিনি এক তীব্র টান অনুভব করলেন সময়ের, পরক্ষণে সময় হয়ে গেল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা। সুকোমল গাঙ্গুলির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় কৌতুককর ক্রশ কানেকশনটি কেমন এক অন্তর্বাস্তব বলেই বোধ হচ্ছে। শহরের সমস্ত মানুষেরই আছে সময় সম্পর্কে এক বিচিত্র এবং উত্তেজক ধারণার প্রবাহ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎহীন এই ঘোলা প্রবাহটি ক শহরের সহস্র পশ্চাৎপদতা আর কয়েকটি বিরল অগ্রগতিকে এনে ফেলেছে একটিই বন্ধনীর মধ্যে।

সাত

ভদ্রলোককে অমল কিছুতেই চিনতে পারল না, একেবারে সামনে এসে অগত্যা বলতে হল 'আমিই অমল চক্রবর্তী, আপনাকে ঠিক—', মাঝবয়েসি ভদ্রলোক যে একটু সংকোচ বোধ করছেন। অমল তাঁকে অনুরোধ করল ভিতরে আসতে। আর তার একটু পরেই গোটা ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন্দ্রই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছে। অমলদের বাড়ির একটি মস্ত সুবিধে হল তার অবস্থান। শহরটির কেন্দ্রে মাত্র ষাট টাকা ভাড়ায় দুটি খুপরি পেয়ে যাওয়া কল্পনা করা যায় না। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি চিরকুট ছিল, তাতে ইন্দ্র অমলকে অনুরোধ করেছে সে যেন বাড়িটি ছাড়ার আগে ভদ্রলোককে এই দুটি ঘরের অধিকার দিয়ে যায়। নাদু মিত্তিরকে রাজি করানো না গেলে, ইন্দ্রের প্রস্তাব : তুই ঘর ছাড়বি না। ইন্দ্র জানে যে একজন অমলকে পাঁচ হাজার টাকা সেলামি দিতে চেয়েছিল। দুজন প্রার্থীর অবস্থাই যথেষ্ট খারাপ, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। ইতিমধ্যে বিধুবালা, বিমলবাবু-সহ পরিবারের সবাই রায় দিয়েছে, বাড়ি ছাড়া চলবে না। বরং কষ্ট করে থেকেও, যদি কোথাও মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা করা যায়, সেটাই দেখতে হবে। 'বাড়ি করা'—বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট কেনার কথাটা উচ্চারণ করতে তাদের সংকোচ ছিল, বা ওভাবে বললেই গোটা জিনিসটা তাদের পরিস্থিতিতে অলীক মনে হত, সেজন্য 'মাথা গোঁজা'র কথা বলা হচ্ছে।

যেকোনো কারণেই হোক, ভদ্রলোক নিজের নাম প্রকাশ করেননি, অমলও জিজ্ঞেস করতে পারেনি—আপনার পরিচয়? বরং .ক শহরে একটি বাসস্থানের জন্য ভদ্রলোক কতটা ভেঙে পড়েছেন, একটু পরেই শুনতে হল সেই করুণ, একঘেয়ে গল্প।

এখন তাঁরা যেখানে আছেন তা এককথায় চার দেওয়ালে ঘেরা একটি ঘর মাত্র। প্রাতঃকৃত্যের কোনো সুবন্দোবস্ত দূরের কথা, নগর-স্বাস্থ্য দফতরের সাধারণের জন্য বানানো একটি বাথরুমেই সবাইকে ছুটতে হচ্ছে, পাশে ঘিঞ্জি বাজার থাকায়, ঘরটি সাধারণের চোখে সবসময়ই উন্মুক্ত। এই বাড়িটিতেও জলকল কমন জেনে তিনি হতাশ হলেন না, বরং বললেন ওই নিভৃতির কথা।

মেজ ছেলে এবার মাধ্যমিক দেবে।

পড়াশুনো করার জায়গা পাচ্ছে না?

জায়গার কথা নয়, সে-সমস্যা তো আছেই।

তবে?

দিনরাত মাইক, হইচই, খিস্তি—

ও।

মেয়েরা কাপড় বদলাতে গেলে, ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিতে হয়।

বুঝেছি।

দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে হয়।

হুঁ।

ওই একখানা ঘরে রান্না, অসুখ, ঘুম, খাওয়াদাওয়া, লোকজন—

বুঝতে পেরেছি। আপনি ইন্দ্রকে বলবেন, বাড়ি যদি কখনো ছাড়ি আপনাকে ওর মারফত জানাব।

ভদ্রলোক অমলের একটি হাত তুলে নিয়েছিলেন নিজের দুটি হাতের মধ্যে। গোটা একটা জীবনে এর থেকে বেশি কোনো কামনা তাঁর যেন সত্যিই নেই। অমলের ওই কথাটুকুতে অবশ্য কী করে সে-কামনা পূর্ণ আশা তিনি দেখতে পেলেন সে এক বিস্ময়। হতে পারে, সমস্যাটি তাঁকে, তাঁর পরিবারসমেত, এতখানি অসহায় করে দিয়েছে, এত একা হয়ে গিয়েছেন যে তিনি অমলের মধ্যে প্রকৃত সমবেদনা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, বা চেয়েছেন। তাঁর এই অবস্থায় বড়ো বেশি প্রয়োজন এই শহরে এমন কিছু মানুষ খুঁজে বের করা, যারা হৃদ্‌য়বান, যাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে।

ক শহরের বিবরণ নামে কোনো কিছু রচনা করা নিতান্ত কঠিন, শহরটির বিবরণ এক তো হতে পারে নিসর্গের দিক থেকে, আর আছে এক ধরনের ইতিহাসবাদ। যথার্থই বিবরণ রচনা করতে বসলেও এক মহাবিপদ, শহরটির দশ কোটি মানুষকে একটি বিবরণের আলখাল্লায় টেনে আনা যায় না, তবে এই ঠিকানা বদলের ব্যাপারটি এক নিয়মিত ঘটনা, সর্বদাই যার প্রস্তুতি চলেছে। শহরটির এ কোনো নিজস্বতা নয় নিশ্চয়ই, কারণ সমস্ত বড় শহরেই মানুষের এরকম ওঠানামা, আশা-নিরাশার কাহিনি থাকে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় সেই আদিম আবেগটি, সবরকম অবস্থাতেই তারা আশা করতে জানে। আশার শরীর যদিও স্পষ্ট নয়, অনেক সময় তা শুধু যে পঙ্গু তা-ই নয়, বরং এক ধরনের পালিয়ে যাওয়া, আশার একটি রেশমগুটিতে আত্মগোপন করা। 'অমল, ভদ্রলোকের ঠিকানাটা রাখলি?' বিমলবাবু যে পাশেই শুয়ে ছিলেন সিগারেট ধরানোর আগে সে খেয়াল করেনি। এখন ত্রস্তভাবে সিগারেট লুকোতে লুকোতে, কাশতে কাশতে তাকে বলতে হল, 'ইন্দ্রকে জানালেই হবে।' সম্ভবত বিমলবাবু তাতে স্বস্তি পেলেন। যদিও বিধুবালা এবং সুভদ্রা বলল অন্য কথা, 'একেবারে আমাদের মতো, বাবা মা আর দুই ভাই-বোন।' 'ভদ্রলোক কী করেন?'—উর্মিলা। 'যাহ্, জিজ্ঞেস করা হয়নি। মনে তো হয় ছোটোখাটো কোনো কাজ করেন।' বলেই অমল উঠে পড়ল।

ইন্দ্র সমাদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা তার মনে পড়ে গেল। আগন্তুক ভদ্রলোক সম্পর্কে জানার জন্য ততটা নয়, বরং উর্মিলার দিন এসে যাচ্ছে, তার কিছু প্রস্তুতি দরকার। ইন্দ্র সমাদ্দার অমলকে সাহায্য করবে, এমন একটা কথা অনেকদিন আগেই হয়েছিল। এখন

সব ঠিকঠাক করে ফেলা দরকার। অমলকে একবার ভেবে নিতে হল সে কোথায় ইন্দ্রকে এখন পেতে পারে।

কয়েকটা জিনিসের দিকে নজর দিলেই চলবে : আহার, নিদ্রা, মানসিক শান্তি। বলেছিল ইন্দ্র। ছেলেবেলার বন্ধু বলেই সে অমলকে আলাদাভাবে পুষ্টিকর খাদ্য, আলোবাতাসে স্নান করে নিয়মিত—এমন ঘর, এসব কিছু বলেনি। হালকা কিন্তু ভালো বইয়ের কথা ইন্দ্র বলতে ভোলেনি। এসব আজকাল সবাই জানে, কিন্তু যে জিনিসটা অমলকে ভাবিয়েছিল তা হল ক শহরে এই যত্ন আর সতর্কতার বিষয়টি কতখানি নতুন। কেন এক শ্রেণির মানুষ হঠাৎ জন্মের ব্যাপারে এতখানি সম্পৃক্তবোধ করছে। কিছুদিন আগেও যা ছিল নেহাতই এক প্রাকৃতিক ব্যাপার, সেই বিষয়ে স্বচ্ছল মানুষজনের এতখানি সচেতনতা অন্য কিছুর আভাস বহন করে কি না। এরকমভাবে সে আর ইন্দ্র আজ জড়িয়ে গেল কথায়, 'আসলে চিকিৎসাশাস্ত্রও বেশ বদলেছে।' 'মানে আগে এসব জানা ছিল না?' 'না, তা নয়, প্র্যাকটিসের দিক থেকে বলছি, তখনকার ডাক্তাররা সামাজিক দিক থেকে ভয়ংকর গোঁড়া ছিল।' 'রাখ তো, কথায় কথায় এই গোঁড়া আর আধুনিকের ভুয়ো লড়াই দেখাস না।' 'চটে যাচ্ছিস?' 'বোর লাগে শুনতে, যাই বলি না কেন, শেষ পর্যন্ত এই এক কথা—',

'পরিবার কল্যাণ' বিভাগে মানুষের যে ভিড় আর ব্যস্ততা তার মধ্যে আড্ডা হওয়া কঠিন, নীল-স্ট্যাম্প-মারা লম্বা ফালি কাগজে 'রিপিট অল' লিখতে লিখতে ইন্দ্রও হারিয়ে ফেলেছিল কথার সূত্র। সাদা উর্দি পরনে একজন মানুষ তারস্বরে চিৎকার করে ডেকে যাচ্ছিল ক শহরের জননীদের, 'শেফালি দাশ, বেগম আখতার, লাবণ্য মাইতি, রেখা পাল, সুলেখা বোস, কল্যাণী মহাপাত্র, বিজয়া রায়, বন্দনা ব্যানার্জি, আলপনা দেবনাথ, অসীমা পাল, শিবানী পোদ্দার, লক্ষ্মী মণ্ডল—।' এই ডাক কখনো পরপর, কখনো-বা পাঁচ-দশ মিনিটের ছেদসহযোগে এমনভাবেই উচ্চারিত হচ্ছিল যেন তা কোনোদিন ফুরোবার নয়। চোখের কোল টেনে দেখা, একবার স্টেথো বসানো, বা ইউরিন অথবা ব্লাড রিপোর্টে চোখ বুলিয়েই দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপির মতোই ডাক্তারি হাতের লেখায় কিছু আঁচড় টানা চলতে থাকবে ঘণ্টা দুয়েক। নামডাকা শুরু হবে আবার তার পরের দিন, পরের পরের দিন, আগামী প্রতিটি দিন শুধু ওই নামডাকা।

ইন্দ্রের মতে, নার্সিংহোম হল ভুয়ো মানসম্মান আর আরামবোধের জায়গা, হাসপাতালই যন্ত্রপাতিতে সব থেকে আধুনিক এবং তৎপর। তদুপরি সে নিজে এখানে রয়েছে, এইসব মিলে একটি সরকারি হাসপাতালের রেজিস্টারে উর্মিলার নাম টুকে নিল সে। আর অমল এবার কল্পনায় নয়, বাস্তবেই দেখতে পেল ক শহরের লক্ষ লক্ষ জননীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রেমিকা।

তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।

হাসপাতালের দুর্নীতি সম্পর্কে?

দূর।

তবে, ক্লাস ফোর স্টাফের গুন্ডামি?

আরে না, না।

চল, খেতে খেতে শুনব।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল থেকে দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে পার্কসার্কাস ময়দানের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের কলেজের গেট থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে গুচ্ছ গুচ্ছ মেয়ে, এ দৃশ্য কত পুরোনো। ইন্দ্রর গলায় তখন স্টেথোটি ঝুলত, বাংলা চলচ্চিত্রের একজন ডাক্তার নায়কের মতোই তাকে লাগত, প্রতিদিন দাড়ি কামিয়ে আফটারশেভ সুগন্ধি ঘষে নিত গালে। ইন্দ্র চার-পাঁচটি প্রণয়-উপাখ্যান পেরিয়ে এসে আজও অবিবাহিত যুবক।

আগেকার সেই চাচার রেস্তোরাঁতেই তারা বসেছে, এখানে পুরুষেরও অধিকাব আছে কেবিন দখলের। যেমন আছে বিচিত্র মানুষের একসঙ্গে বসে আহ্মর করা, চা-পান আর তৃষ্ণা নিবারণ। জলের গ্লাসটি শেষ করে ইন্দ্রই প্রথম তাড়া লাগাল, 'বল।' 'বলছি', অমল হাত তুলে একটু সময় চেয়ে নিল যেন, তারপর বয়কে বলল, 'টোস্ট দুটো, ওমলেট আর চা।' এইটুকু বলে ফেলে সে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে, একবাব নড়েচড়ে বসে যেন প্রসঙ্গ তৈরি করে নিল।

'তুই তো হাসপাতালের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও বসেছিস আগে?' 'হুঁ।' 'এমনিতে সাধাবণ গরিব মানুষই হাসপাতালে আসে।' 'যা বলতে চাস ঝটপট বল তো।' 'খেতে না পেলে অ্যানিমিয়া হয়?' 'অ্যানিমিয়া নানা কারণে হতে পারে, খেতে না পেলেও হতে পাবে। তুই কি উর্মিলার জন্য ভাবছিস? প্রসূতির অ্যানিমিয়া হওয়ার ঝোঁক একটু থাকেই, সেজন্য আয়রন টনিক দেওয়া হয়। তুই দেখছি ভযেই মরলি, দুনিয়াসুদ্ধু লোকের বাচ্চা হচ্ছে, আব তুই'— 'না না, সেকথা নয়। ধর, ৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত একটি মেয়ের সন্তান হল—' 'হতেই পারে, অনেকেরই হয়েছে, না হলে শহবেব জনসংখ্যায় লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিত পরে', 'শহরে ঠিক ওভাবে—' 'মরেনি এই তো, কিন্তু মর্বিডিটি ছিল আজও আছে মর্বিডিটি। যতগুলো মেয়ে এসেছিল আজ তার আশিভাগেরই লো-প্রেসার, অ্যানিমিয়া, ব্রঙ্কো নিউমোনিযা, প্লাস্টিক প্লুরিসি, কেজিয়াস টিবি, এনলার্জড লিভাব, সার্কুলেটরি ডিস্টার্বেন্স এটসেট্রা এটসেট্রা.. প্রত্যেকটিই সরাসরিভাবে অনাহার-অপুষ্টির সঙ্গে যুক্ত, আলো-বাতাসের অভাবেব সঙ্গে যুক্ত।'

আট

শহরের সমস্ত পথ দিয়ে, গলগল করে রক্ত ছুটে আসার মতোই ছুটে চলেছিল লাল রঙেব বাস। দু-একবার তা ট্রাফিক কনস্টেবলকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে গেল একজন ট্রাফিক কনস্টেবল। পরক্ষণেই সে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে পড়ে টুকে নিল ডব্লিউ বি টি চার সাত আট তিন দুই পাঁচ বা এরকমই একটি নম্বর।

কাজের দিন বলে, বা ভিন্ন কোনো ব্যস্ততায়, যেভাবে যানবাহন আর মানুষ মুখে রক্ত তুলে ছুটে চলেছিল, তাতে মনে হতে পারে শহরটি বিপুল। বা শহরটি ক্রমশই ফুলে যাচ্ছে, নিজের কঠিন খোলার মধ্যে টেনে নিচ্ছে বিপুল দূরত্ব। দূরত্ব শহরের বলয়ের মধ্যে এনে ফেললে, সে আর শহরবহির্ভূত থাকে না, বরং সে স্ফীত করে তোলে ক শহরটিকেই। ভয় থেকে, অদ্ভুত সব কল্পনা ডানা মেলে দিচ্ছিল। মানুষের এই উপর্যুপরি স্রোত বহন করে চলেছে গোপন কোনো দুর্দশার বিবরণ, তারা পালিয়ে যাচ্ছে। এইসব হতভাগ্য মানুষ দূরত্বের কথা জানে না,

জানে না শহরটি অতিক্রম করে গেলে চতুর্দিকে আছে শুধু শস্যক্ষেত্র, জ্বালানি কাঠের বন, মিষ্টি জলের একটি স্রোত আর বন্যপ্রাণী। বহুদিন যাবৎ শহরের রেলপথ ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু মালগাড়ির ওয়াগনের জন্য। ভাগলপুরের গোরু, বিহার-ইউপির গম আর মেদিনীপুরের হলুদ ধান বহন করতেই রেলপথ চব্বিশ ঘণ্টা বেজায় ব্যস্ত।

এভাবেই একজন পথচারী দৌড়ে যাচ্ছিল, তবে তার দৌড়টা ছিল এমন যে বাসের জানলা থেকে অমলের হঠাৎ মনে হল মানুষটা মরিয়া হয়ে পালাচ্ছে। ঘটনাস্থল শহরের কোনো কুলীন অঞ্চল নয়, শহর যেখানে এখনও থেকে গিয়েছে মান্ধাতার আমলেই, এঁদো, ঘিঞ্জি, নালা-নর্দমার মতো গলি এসে পড়েছে যেখানে কালো-ইট-বসানো ট্রাম লাইনের ওপর, এ সেই, অতিপুরাতন চিতপুর। নামটি উচ্চারণ করামাত্র অসির ঝনঝন, বীরত্বের কুচ্ছিত চিৎকার, প্রেমের দীর্ঘ ন্যাকা সংলাপ আর খোদ শয়তানে আঁচড়ানো সবুজ ঠুলিতে এক চোখ ঢাকা ক্রূর ভিলেনের মুখ সহসা ভেসে ওঠে।

বাস থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য, ঘটনার গন্ধ পেয়ে দীর্ঘকাল উপবাসী মানুষের মতোই, বিকারের ঘোরে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মানুষটি মরেনি জেনে কেউ কেউ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকার আশ্বাসও সেই সঙ্গে পেয়ে গেল তারা। দু-চারজন আরও নির্দিষ্টভাবে জানতে আগ্রহী— যথা, অঙ্গহানি ঘটল কি না, কোথাও লেগেছে কি না। পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হল কারণ অনুসন্ধান, এই অনুসন্ধানের ফলাফল এত বিচিত্র আর বহুমুখী যে তা থেকে কিছুই আন্দাজ করা সম্ভব নয়। যেমন জানা গেল—মানুষটি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল, পরক্ষণেই শুনতে হল অন্য কথা, বাসটিই আচমকা ঘাড়ে এসে পড়ে। আবার শোনা গেল— এসব কিছুই নয়, লোকটা চেষ্টা করছিল একটি প্রাইভেট গাড়ির সামনে এমন পরিকল্পিতভাবে আছাড় খেতে, যাতে রক্তপাত ঘটে কিন্তু তেমন স্থায়ী ক্ষতি কিছু না হয়; অর্থাৎ সে একটি পথ-দুর্ঘটনার শিকার হতে চাইছিল। উদ্দেশ্য দুরকম: এক, প্রাইভেট গাড়ির চালককে অসুবিধায় ফেলে কিছু উপার্জন করে নেওয়া, দুই, আত্মহত্যার মামলায় আসামী হয়ে চালান যাওয়া। দ্বিতীয় জিনিসটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে কিছুদিনের জন্য তার খাওয়ার সমস্যা মিটে যায়।

তখন বাসযাত্রীরা এক যূথবদ্ধ সংলাপে ফেঁসে গেল প্রায়। তারা সময়ের কথা বলল, অভাব আর সমস্যা বিষয়ে কথা বলল, শয়তানের ছাপমারা কিছু ক্রূর মুখ আবিষ্কার করে ফেলল তারা, সমালোচনা করল, অভিশাপও উঠে আসছিল। পিছনের পাইপ থেকে পাংশু ধোঁয়ার কিছুটা বাসের খোলে যখন ঢুকে পড়ল, ঠিক সেই সময় একজন বলল, 'এ আর কী হয়েছে!' যদিও বক্তার মুখে তেমন উৎকণ্ঠা কিছু নেই, সে যেন এক নির্লিপ্ত দর্শকমাত্র, এ শহরে ক্ষণকালের একজন ট্যুরিস্ট, বা সে সুনিশ্চিত জানে বিপদ যত ভয়ংকর আর বিপুলই হোক-না-কেন, সে ঠিক বেঁচে যাবে। আবার শুধু যে বেঁচে যাবে তা-ই নয়, চূড়ান্ত মৃত্যু আর ধ্বংসের সবটুকু সে-ই দেখবে, যেন সে একজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক, বিনাশের এক মহৎ উপন্যাস রচনার জন্যই তার জন্ম হয়েছে।

মাত্র দু-তিনটি স্টপে যাত্রা-বদল হতে হতে কথাবার্তার এই যূথবদ্ধতা ঝরে গেল, পঞ্চম স্টপটির পরে আর মনেই হচ্ছিল না যে একজন মানুষের মৃত্যুর মতো একটি ঘটনা কোনোক্রমে

এড়ানো গিয়েছে। ক শহরের পুরোনো অঞ্চলটি থেকে থিয়েটার রোড পর্যন্ত আসতে অমলকে আর একবার বাস বদল করতে হয়েছে। আর নিখুঁতভাবে এই পরিক্রমায় শহরটি শুধু যে নিসর্গের দিক থেকে আমূল বদলে গেল তা-ই নয়, ভাষাগতভাবেও এসে পড়ে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন। সাদা চামড়ার মানুষের নামধামের সঙ্গে এখানকার পথঘাটের সম্পর্ক যতটা না এই পরিবর্তনের কারণ, তার থেকে অনেক বেশি জোরালো কারণ হল মুহুর্মুহু রাস্তার নামের বদল। নামবদলের ব্যাপারটি এখন এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে তাতে করে মনে হয় শহরটি রাতারাতি ভুলে যেতে চাইছে সমগ্র অতীত, বেরিয়ে আসতে চাইছে ইতিহাসের শহরের নির্দিষ্টতা থেকে, বেঁচে উঠতে চাইছে স্ব-মহিমায়।

বাস্তবে যদিও মানুষজনের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী, প্রতিদিন অতীতের বিভিন্ন ঘটনাকে নতুন-নতুনভাবে মূল্যায়নের চেষ্টায় শহরের মহাফেজখানাটি হয়ে পড়েছিল প্রায় একটি অতিব্যস্ত রেস্তোরাঁ, সেখানে ছাত্র অধ্যাপক গবেষক এবং বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রের কেরানিরা সমবেত হয়ে কেবল চিৎকার করছিল : বোর্ড অব ট্রেড কমার্শিয়াল ১৮৭৬, মিসেলেনি ১৭৭৪, সিটি হাউস রেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ১৮৯৯, লটারি কমিটি রিপোর্ট, হাইকোর্ট পেপার্স, সিক্রেট পেপার্স অ্যাবাউট সিটি পিপল ১৮৪০, সিটি ফরমেশন, প্ল্যানিং ১৭৩০...

নয়

শুয়ে-বসে-গড়িয়ে কেটে যাওয়ার দিন অমলের জীবনে খুব কমই এসেছে। এর ফলে, গড়ানোর দিন ক্বচিৎ এসে গেলে যে সুখটুকু সে পায়, তার আকস্মিকতা সয়ে এলে, প্রায় কিছুই করার না থাকলে অমল ভেবে ফেলে, 'গেল, পুরো দিনটাই নষ্ট হল।'

প্রতিবেশীর অস্তিত্ব আজ বড়ো বেশি টের পেতে হচ্ছে। পাতলা, ভাঙা দরজাটি মোহিত দাশের থেকে অমলকে এমন কিছু ব্যবধানে নিয়ে যায়নি যাতে সে একা হতে পারে। জানলা গলে চলে যাওয়া যায় রাস্তার চাপাকলে ন্যাংটো শিশুদের শরীরের কাছাকাছি, ঝকঝকে রোদের দিকে। সেখানে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ির জন্য একটি জলাধার আজও টিকে আছে। রাস্তার দিকে তাকানো ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কেবল ওই চাপাকলের শিশুরা ছাড়া, জলের ফুলঝুরিটুকু ছাড়া। কারণ, একটি স্থির, অনড়, কালো রঙের রাস্তা বড়ো একঘেয়ে, এবং তার থেকেও ভয়ংকর ক্রমাগত মানুষের পা-তোলা আর পা-ফেলা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মানুষের হেঁটে যাওয়াটা কেমন ভৌতিক ছুটে চলা মনে হয়, বিশেষ যদি পায়ের দিকেই লক্ষ করা যায়। জানলাটি থেকে কেশব সেন স্ট্রিট এতখানি শ্রুতিগোচর যে পথচারীদের চোদ্দো-পনেরো ধরনের ভাষার সবটুকু কানে আসা সম্ভব।

দেখো, ভালোবাসা আগে ছিল না।

মানে?

আমাদের বাপ-ঠাকুরদা স্রেফ বিয়ে করতে জানত।

এই একটি অংশ, তাদের সমগ্র কথাবার্তা থেকে সামান্য একটি অংশ, জানলার নীচে ফেলে রেখে গেল এক প্রেমিকযুগল। আর তার কাছাকাছি এসে একজন কারিগর তার সঙ্গীকে বলে,

'কিছুই তো চাইনি, একটু সুখ, সামান্য শান্তি আর পেট ভরে খেতে চেয়েছিলাম।' তারাও চলে গেল। মাঝবয়সী দুজন পুরুষের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'কেমন লাগল বলো, শহরটা তো ঘুরে দেখলে।' এভাবে একজন ভ্রমণবিলাসী, বনেদি নাগরিক, মজুর আর প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই পিতা-মাতা-সন্তানরাও চলেছিল কথা বলতে বলতে। যদিও এইসব কথাবার্তার আলাদা আর ছিটকে-আসা অংশগুলি ছিল কেমন যেন অদ্ভুত, যেন সেসবে মূর্ত কিছু নেই। নির্ঘাত তাদের সামগ্রিক কথাবার্তার মধ্যে অংশগুলি প্রতিষ্ঠিত করলে অত্যন্ত মূর্ত, বিষয়ী কথাবার্তাই গড়ে উঠবে, তবু সেসবের মধ্যেও যে কিছুটা আশ্চর্য আত্মগোপন করে থাকে, অমল তা-ই লক্ষ করেছিল। ভাবছিল।

আজ হঠাৎই সে দেড়খানা ঘরের এই ভেজা পরিসরটুকু নিজের জন্য পেয়েছে, যদিও জানে সাময়িক মাইকের চোং থেমে থাকলেও একটু পরেই শুরু হবে, 'আম্‌মি তোমায় বড়ো ভালোবাসি...'। ভীষণদর্শনা এক কালীমূর্তির কাছে গিয়েছে অমলদের গোটা পরিবারটি, তবু শব্দ-বিস্ফোরণ আর চিৎকার ছুটে এসে দখল করে নেবে এই ভাঙা বাড়িটি, ইটগুলো কাঁপতে থাকবে, রাস্তায় পটকা ফাটানো হবে, আরও কত কী যে ঘটতে পারে! ক শহরটি যেন উদ্ভ্রান্তের মতো ভেসে যাবে আগুন-আলো, শব্দঝংকার আর বীভৎস কোলাহলের এক উৎসবে। বেশি রাতে কোনো মাতালের চিৎকারও শোনা যেতে পারে, সে স্খলিত কণ্ঠে শহরের দেবীর নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার চেষ্টা করবে : বোম কালী কলকাত্তাওয়ালি... অনুরূপ ঘটনা একই তীব্রতায় গোটা শহর জুড়ে ঘটে চলেছে এমন নয়, আমহার্স্ট স্ট্রিট আর কেশব সেন স্ট্রিটের সঙ্গমক্ষেত্রটিই এ-বিষয়ে সবচেয়ে যত্নবান। শহরের প্রখ্যাত কবি, পুলিশের বড়োকর্তা আর একজন স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক আসবেন এই দেবী আরাধনার সামাজিক তাৎপর্য বিষয়ে দু-চার কথা বলতে, পুলিশের বড়োকর্তাটি ছাড়া আর সবাই নাস্তিক, তবু জিনিসটা এভাবেই ঘটবে। সুভদ্রা-ঊর্মিলা-বিধুবালা-বিমলবাবুরা গিয়েছেন মূলত ওই নক্ষত্রলোকের টানে, বিধুবালা বিশ্বাসই করতে পারেনি এঁদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়া সম্ভব, খুবই উত্তেজনায় ভুগছিল, যেজন্য চটি পরতে অবধি ভুলে যায়।

কাঠের সিঁড়িতে ভারী শরীরের শব্দ, বাড়িটিতে সেই শব্দ গমগম করে উঠলে, অমল মোহিত দাশের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। তাহলে সে এতক্ষণ ভুল ভেবেছিল, পাশের ঘরটিতে আসলে এতক্ষণ বিড়ালের তাণ্ডব চলছিল। মোহিত দাশ উঠে আসতে বড়ো সময় নিচ্ছে, সে অমলের ঘরের ভিতর দিয়েই এগিয়ে যাবে নিজের দরজাটির দিকে। পাতলা কাঠের পার্টিশানের ওপাশে একজন অবিবাহিত মানুষ থাকায় ঊর্মিলা প্রতিটি ঘন মুহূর্ত শব্দহীনভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে চেয়েছে, যেন মোহিত দাশের চোখ-কান মাঝরাতেও জেগে থাকত অদৃশ্য ছিদ্রের কাছে। ঊর্মিলা কোনোদিন ততখানি সহজ হতে পারেনি, যদিও এখন তারা এগিয়ে চলেছে একটি মানবশিশু উপহার হিসাবে গ্রহণ করবে বলে। বিধুবালা অন্তত ডজন খানেক কাঁথায় ফুটিয়ে তুলেছে ময়ূর, হাতি আর 'দাদুভাই চালভাজা খাই'-গোছের কিছু শব্দ। অমল আর ঊর্মিলা কল্পনার ঢেউ ভেঙেছে। তারপর অপেক্ষা করছে, কল্পনা করছে, ভয় পাচ্ছে।

মোহিত দাশ কোনোদিন এইসব অনুভব করেছে কি না সে জানে না। তবে অমলরা সকলে

মিলে কোনো পারিবারিক আনন্দ বা গল্পের মুহূর্তে হেসে উঠলে, আনন্দিত হলে, মোহিত বড়ো বিস্ময় বোধ করত, সে দেখেছে। অমলের সামনে এখন মোহিতের বিশাল ছায়া, ছায়া একটু নড়তেই, অমল দেখল মোহিতের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, ডান দিক গোল হয়ে ভিজে আছে রক্তে। তার শরীরে ধুলোও ছিল, যেমন ছিল গাঢ় হতাশা। এইসব মুহূর্তে শরীর দ্রুত ছুটে যায়, যেমন অমল নিজের অজান্তেই আগে তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল এবং তারপর বলে ফেলল, 'কী হয়েছে, মোহিতদা!'

পরবর্তী ঘটনা সম্পূর্ণরূপে নাটকীয়তাবর্জিত। মোহিত দাশের মাথায় চোট লেগেছে একদিন আগে, এবং পায়ের তলা থেকে একটি রড সরে যাওয়ায় মোহিতকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়েছিল লেদ মেশিনের ওপর। ড্রেস করানোর কথা সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু এই উৎসব-উল্লাসের মধ্যে কমপাউন্ডার হারিয়ে গিয়েছে বলে, সম্ভবত আজ আর ওই কাঁচা ঘা-টির কোনো পরিচর্যা সম্ভব নয়। একা মানুষ মোহিত দাশ এভাবে পাড়াটির উৎসব থেকেও সরে এসেছে অনেক দূরে, সামনে আছে এক বিপুল রাত। এই রাতটিও তাকে অতিক্রম করতে হবে গভীর ক্ষতের অস্তিত্ব সর্বক্ষণ অনুভব করে। হয়তো সারারাত রক্ত চোঁয়াবে।

'আপনি কত জায়গায় যান, কতরকম মানুষ দেখেন—' বলেছিল সেই আঘাত-পাওয়া মানুষটি। আর এমনভাবে বলল, যার মানে, অমল শুধু এই বাহাত্তর নম্বর বাড়িটি নয়, নিজের পরিবারটুকুই নয়, তার থেকে অনেক বড়ো এক ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে আছে, দু-বারের ওই 'ক-ত' শব্দটি সে উচ্চারণ করেছিল প্রায় এইরকম এক বিস্ময়ে।

শহর ছেড়ে খুব একটা কখনো কোথাও যাইনি।

শহরটা কি কম!

সে তো প্রায় একরকমই।

আর মানুষ?

মানুষ কোথায়? কোনো-না-কোনো অফিসকাছারি থেকেই আমাকে খবর জোগাড় করতে হয়।

বাজে কথা।

মোহিত দাশ প্রথমটায় বেশ অবাক হয়েছিল, অমলের ওইভাবে হঠাৎ উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশের ঘটনাটিকে সে নিছক প্রতিবেশীসুলভ আচরণ বলে মেনে নিতে পারেনি। এই সামান্য ঘটনাটিতে সে ভিজে যেতে থাকে—যেন হঠাৎ সে অমলের অন্তর দেখতে পেল আর অবাক হয়ে গেল। আর তারই ফল যেমন এইসব কথাবার্তা, তেমনি সে চট করে নিজের ঘরটিতে ঢুকতে পারছিল না। অমল এখন একা এবং কোনো কাজে লিপ্ত নেই, সেও একা ফিরে এসেছে, এইরকম অবস্থায় ছেদ টানা একটু কঠিন। আবার সে যেমন-যেমন ভেবেছিল কথাবার্তা মোটেই সেভাবে এগোচ্ছে না, অমলের কথা অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না, মোহিত দাশের ধারণা হয় অমল এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারে না অমল কী এড়িয়ে যাচ্ছে আর কেনই-বা এড়িয়ে যাচ্ছে। আর যদি সে মোহিত দাশকে এড়িয়েই যেতে চায় তাহলে ওভাবে সে ভালোবাসা প্রকাশ করেছিল কেন?

'এককথায় বলা খুব কঠিন, মোহিতদা', অমল এরকম একটি সিদ্ধান্তের দিকে মোহিতকে টানতে চেষ্টা করল। আর তখনই হুড়মুড় করে তিন-চারজনের কণ্ঠস্বর আর পায়ের শব্দ উঠে এল কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে। মোহিত দাশ শুধু বলল, 'যা-ই।'

দশ

কফি হাউসের টেবিলগুলো সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়েছে, এমনকি সেই প্রশস্ত কাঠের চেয়ারগুলোও প্রায় নেই বললেই চলে, বদলে সিন্থেটিক তারে বোনা হালকা চেয়ারে ভরে গিয়েছে বিশাল হলঘরটি। এসব দিকে অমল নজর দিয়েছিল অনেক পরে, বরং সবুজ-কাচ বসানো টেবিলটির অ্যাশট্রের মুখ যেভাবে আগুনের কুণ্ডের মতো জ্বলছিল, সে প্রথমটায় সেই অ্যাশট্রেটির দিকেই তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

একটু আগেই কেউ অ্যাশট্রেটিতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে চলে গেছে। টেবিলে পরিত্যক্ত কফির কাপ এখনও, ওয়েটার তুলে নিয়ে যাওয়ারও সময় পায়নি। ইতিমধ্যে অমল এসে যায়। বহুদিন পরে সে এখানে এল, শহরের বয়স্ক মানুষের নব্বইভাগই যেখানে এলে স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়ে। কলেজ জীবনের দু-একটা গল্প করা তখন এত অবধারিত যে প্রায় কেউই তার বাইরে যেতে পারে না। ওয়েটারের মুখের ভাঁজ ও কিছু সাদা চুলের মধ্যে খুঁজতে থাকে স্মৃতি। হয়তো-বা বলেও ফেলে, 'তুমি কতদিন আছ?' 'কী নাম বললে', 'দাঁড়াও দাঁড়াও', 'রামু, রা-মু, আরে কী বদলে গেছ'...। রামুর পক্ষে স্তম্ভিত হওয়াই অস্বাভাবিক, কারণ প্রতিদিন তাকে কেউ-না-কেউ বলছে, 'আরে, রা-মু।' ফলে সে নিজের বয়স সম্পর্কে হাসতে-হাসতেই সজাগ।

বাঁ দিকের দরজায় তার চোখ নিবদ্ধ, প্রায় জাল পেতে রেখেছে সে, দীপক যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বড়োজোর একটু দেরি করতে পারে। অমলের সংশয় অন্যত্র। যদি ওদের এডিটর, যিনি মালিকও বটে, প্রস্তাবটিতে নেতিবাচক কিছু বলে থাকেন, হয়তো বললেন, 'এমনিতেই আমরা ওভার-স্টাফড, তার ওপর..'। এইসব ভাবতে ভাবতে একটি সুখের চাকরি, আরামদায়ক একটি প্রতিষ্ঠান অমলের মাথার মধ্যে রঙের ঢেউ এনে ফেলল। সে অনুভব করল এক ভয়ংকর অনস্তিত্ব, যেন ওরকম কোনো সিদ্ধান্তের অর্থ দাঁড়াবে এই যে দীপক এসে দেখবে টেবিলটি শূন্য, অ্যাশট্রের মুখ থেকে উঠে আসছে ধোঁয়া।

দীপক এক তো খুবই আশাবাদী, তার ওপর অমলের প্রায় ত্রিশ উতরেও একটি পাকা চাকরি না-পাওয়া, না-থাকার ঘটনাটিতে কিছুটা বিব্রত বোধ করে। সত্যি, অমলের থেকে অনেক অযোগ্য লোক চাকরিবাকরি করে খাচ্ছে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অর্বাচীন হলে মানুষের খিদেতেষ্টা, দায়দায়িত্ব থাকে না—একথা অমলের, দীপক তখন তাকে পরামর্শ দেবে এ-শহরে কিছু করে খেতে গেলে ইংরেজিটা মোক্ষম অস্ত্র, তুই যে একদম ইংরেজি জানিস না। শেষে তারা বেশ খানিকটা দুঃখ আর বিরক্তি জড়ো করার পর এরকম প্রস্তাব উঠতে পারে— 'চ, একটু বসি', অর্থাৎ পান করি চল।

দীপক এল যথাসময়েই, তার মুখে ছিল সেই দুর্লভ হাসি যা শুভ সংবাদের ইঙ্গিত বহন করে। তবু অমল আশ্বস্ত বোধ করেনি, দীপক বসামাত্র সে জিজ্ঞেস করে ফেলল 'বল।'

দাঁড়া, একটু জিরোই।

কফি বলি?

বল।

দীপক ফোলিও ব্যাগ থেকে ঝকঝকে একটি বই বের করল, বলল 'পাওয়া যাচ্ছিল না, অবশ্য এখন যা দাম করেছে, এদিকে পেপার ব্যাক।'

কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হুঁ।

তোকে অপছন্দ করে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়।

হয়নি তো?

ধ্যাত।

তবে?

দেখ, এটা তোর নবযুগ নয়, ওয়ান অব দ্য বিগেস্ট মিডিয়া।

তো!

কথাটা বড়োকর্তার কানে তুলেছি, একবাক্যে ইয়েস বলেছেন।

ফাইন।

না, সেটা বলা যাচ্ছে না, দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে উনি সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন।

তাহলে?

আবার তোর নামটা তখন উচ্চারণ করতে হবে।

দীপক অতি জটিল একটি প্রক্রিয়া বর্ণনা করে চলেছিল অস্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে। বোঝা সম্ভব যে, বড়োকর্তার কাছ থেকে একটি চাকরি বাগানোর দীপকের এই প্রয়াস—পরিকল্পনা, একের পর এক চাল, সব মিলে যে দুরূহ খেলা, তাতে রোমাঞ্চ বোধ করছে। হঠাৎই সে বলে বসল, 'কোনো তৈরি স্টোরি আছে হাতে?' 'আছে', বলেই অমল জানতে চাইল, 'কিন্তু অন্য কাগজে লিখলে এখানে আমার অসুবিধা হতে পারে, অযথা...।' দীপকের দুটি ভুরু আস্তে আস্তে জুড়ে যায়, 'আর লেখা ছাপালে যদি চাকরির রাস্তা আরও পরিষ্কার হয়ে আসে, এমনও তো হতে পারে নবযুগ-ও তোকে আর একটু গুরুত্বের সঙ্গে নিল।' 'দাঁড়া', বলে অমল সিগারেট আনতে নীচে গেল।

ফেমিন সম্পর্কে একটা কাজ...

ফে-মি-ন!

হ্যাঁ।

কোথাকার?

সরি, ফেমিন না ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম।

তাই বল।

অমল যে রেশনিং সিস্টেমকে ফেমিন বলে উল্লেখ করল তাতে দীপক প্রথমে স্তম্ভিত হলেও পরে বুঝেছিল অমল আসলে খুবই অব্যবস্থিত আছে। আর এই দুজন মানুষের মধ্যে সম্পর্কের

একটি অদ্ভুত ধরন কাজ করে চলেছে, প্রথম আলাপের দিনটি যথেষ্ট মজার। সফট্ স্টোরি লেখার ব্যাপারে অমলের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেমন একবার সে শহরের বৈদ্যুতিক তারে কাকের বাসার মোট সংখ্যা খুঁজে বের করেছিল। তারপর এ-ও জানা গেল অধিকাংশ শর্ট-সার্কিটের কারণ হল এই কাকের বাসা এবং বৈদ্যুতিক তারে কাকের বাসা বানানোর প্রবণতা এত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল যে যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপ শহরে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে ক শহরটি। ফলে কাগজের অফিস থেকে, জনসমাগমের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ-ধরনের সংবাদ নিয়ে নানারকম জল্পনাকল্পনা থাকত, যে-কোনো মানুষ এ-ধরনের টপিকে কিছু-না-কিছু সংযোজন করতে পারত বলে অমল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অমলের সঙ্গে দীপকের সম্পর্কে এই পূর্ব-ইতিহাস রচনা করেছিল সম্ভ্রম। আবার মানুষ খুব চট করেই সরে যেতে পারে প্রতিভার দিকে; সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আর কিছুটা শ্রমের নৈপুণ্য মিলে গুটিকয় তথ্যকে অমল যেভাবে একটি তীক্ষ্ণ নকশায় পৌঁছে দিত, দীপক ধরে নিয়েছিল এর মধ্যে প্রতিভা আছে। সাংবাদিকের প্রতিভা হাঃ।

অমলের দিক থেকে আত্মতুষ্টির ঝোঁক যে একেবারেই ছিল না, একথা বললে ভুল বলা হবে। যোগ্যতা অনুসারে খাদ্য আর আরাম যে সে পাচ্ছে না, পায়নি, তার ফলে উত্তেজনা থেকে অভিমান সমস্তই অল্পবিস্তর ছিল। তবে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যোগ্যতা প্রমাণ করার রুদ্ধশ্বাস চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাকে হতাশ আর ক্লান্ত হতে হয়েছে। অন্যদিকে নিজেরই এক-একটি কাজ, প্রতিদিনের নতুন নতুন কাজে এতদূর সরে গিয়েছে, মলিন হয়েছে যে তার নিজের কাছেই সেসব তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির গহ্বরে। ধীরে ধীরে এসে যাচ্ছিল মন্থর প্রত্যাখ্যান, একটু গুটিয়ে যাওয়া। আবার বাহাত্তর নম্বর কে এস স্ট্রিটের অন্ধকার দেড়খানা ঘর সবসময় তার বুকের মধ্যে জেগে থাকায়, অমল চাইছিল একটু ব্যবসা করে নিতে। নিজের আর্থিক অবস্থার একটু পরিবর্তনই ছিল তার কাছে একমাত্র আশু কর্তব্য। নবযুগ পত্রিকাটি ছাড়তে পারলে সে একরকম স্বাধীনতায় পৌঁছে যাবে, এই ছিল অমলের অনুভব। এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এ-জিনিসটা অমলের কাছে প্রায় সংগ্রাম হয়ে উঠছিল। উর্মিলার সঙ্গে শুধু নয়, ইন্দ্র বা দীপকের সঙ্গেও এ-নিয়ে কথাবার্তায় অমল আবেগ-সংক্ষোভের ঢেউয়ে উঠত, পড়ত।

দীপকের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি হল যে অমলই ওর অফিসে যাবে, বি চৌধুরীর সঙ্গে অমলের আগে থেকেই আলাপ ছিল, তদুপরি শ্রীযুক্ত চৌধুরী অমলের কাজকর্ম সম্পর্কে শুধু ওয়াকিবহাল নন, একটু আশাবাদীও। যদিও শ্রী চৌধুরী নিজে আজ পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব পাঠাননি অমলের কাছে। আসলে এ-জিনিসটা এখন ক শহর সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলেছে। উল্টো দিক থেকে সরাসরি ও মানবিক যোগাযোগের একটি ঝোঁক এসেছে। অর্থাৎ, অমলের হাসি, অমলের চোখ, অমলের ব্যবহার কিছুদিন লক্ষ করা হবে, কয়েকটি মাস বা বছর তার মন্ত্র হবে 'লেগে থাকো'।

না, না, সেসব ফেজ তুই পার করে দিয়েছিস।

বলছিস।

ন্যাকামি করিস না।

তাহলে পরশু?

হুঁ।

নীচে থাকিস।

ঠিক আছে।

দুজনই একসঙ্গে পকেটে হাত দিয়েছিল, যেমন রেওয়াজ, দীপকের উপার্জন বেশি বলেই সে অমলকে বিল মেটাতে দিল না। প্রতিবার তা-ই হয়, আর প্রতিবারই অমল স্বপ্ন দেখে একদিন সে ক শহরে বিল মেটানোর একটি অভিযান চালাবে, মুহুর্মুহু হাত তুলবে—'ট্যা-ক-সি।'

এগারো

'বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিস'—বেশ জোরেই বলেছিল বিধুবালা, ঘরের অন্য তিনজনকেও কথাটি আনমনা থাকতে দিল না। তার হাতে দুধের গ্লাস, এই একগ্লাস দুধ সম্পর্কেই বিধুবালা যে উক্তিটি করেছে সন্দেহ নেই। দারিদ্র্যকে বিধুবালা এভাবে এত প্রচ্ছন্ন করে তুলতে চাইল যে অমলের পক্ষে তারপর বলা অসম্ভব—উর্মিলার গর্ভের খুদে মানুষটির প্রতিদিন গড়ে ওঠার জন্য এই গ্লাসটি কতখানি প্রয়োজনীয়। বা, সে এই কথাটি এমনিতেও বলতে পারত না, তাঁদের দেশীয় আসরে সন্তান-আগমনের ঘটনাটি বয়স্কদের কাছে সলজ্জ থাকতে শেখায়, অমল সেই শিক্ষা বা রীতির বাইরে যেতে পারত না। বরং বিধুবালাকেই সমস্ত দিক সামলাতে হবে, এই সামলানোরই একটি প্রকাশ বিধুবালার 'বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিস' কথাটি। এ একটি মাতৃতান্ত্রিক মুহূর্ত। অমল আশৈশব এরকম অনেক মুহূর্ত উপহার পেয়েছে, তার অভ্যাস হয়ে গিযেছে, যে কারণে সে বিধুবালাকে আলাদাভাবে খুব কমই অনুভব করেছে। সুভদ্রার টুকটাক করে দেওয়া কাজ, নিজের মাথায় উর্মিলার আঙুল, বিমলবাবুর উৎকণ্ঠা আর আশা, অমলেব ক্ষেত্রে যেন এক আরাম-ছায়া।

সে প্রথমে উর্মিলাকে বলে সম্ভাব্য অফিস-বদল ও সৌভাগ্যের কথা। উর্মিলাই হয়তো সুভদ্রাকে বলে থাকবে, পরে তিনজন নারী আর বৃদ্ধ মানুষটি এ-বিষয়ে ঠিক কী-কী কথা বলেছে, অমল জানে না। তবে রাত আড়াইটে পর্যন্ত জেগে স্টোরিটা লেখার পর আজ সকালে যখন উর্মিলা-সুভদ্রাকে পড়ে শোনায়, তখন দেড়খানা ঘর উৎকর্ণ হয়ে ছিল। যেন তারা ভয়ে আর বিস্ময়ে শুনে চলেছে নিজেদের সম্পর্কে অবধারিত এক ভবিষ্যৎ গণনারই বিবরণ। অমল আজ বেরিয়ে যাওয়ার পর তাদের কান অসম্ভব সংবেদনশীল হয়ে যাবে, সিঁড়িতে সামান্য পদশব্দ রচনা করবে গভীর এক ছলনা, তারা আশা করবে সাফল্য নয় সুদিনের। অমলের ক্ষেত্রে এই সুদিন, এখনও, বারবারই সাফল্যের অবয়বে হানা দিয়ে যায়, যেন সাফল্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছে দেবে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। অমলের একটি মূর্তি খোদাই করা হয়ে যাবে আপাতউদাসী ক শহরে, যে-শহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু আলগা এক অভ্যাস। সে এখানকার রাস্তাঘাট চেনে, নিজের প্রয়োজনের কথা অপরের কাছে পৌঁছে

দেওয়ার মতো ভাষা তার করায়ত্ত, এবং সে ততখানি অপরিচয়ে ডুবে নেই যাতে পথ-দুর্ঘটনার শিকার হলে বা ভুলক্রমে আইনগত বা প্রশাসনগত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সর্বোপরি, শহরটির কয়েকটি জায়গায় একবার গিয়ে হাজির হলেই, দশজনের আড্ডার মধ্যে থাকার যে অযৌক্তিক নিরাপত্তা সেসবও অমলের আছে। মোট কথা, বাহ্যত অমলের বেশ স্বাধীন-স্বাধীন লাগে। এখানে, সে, একদিন রাজসিংহাসন পাবে, তখন তার হাঁটা হয়ে উঠবে গাম্ভীর্যপূর্ণ, বিবেচনায় থাকবে ঠান্ডা নিরপেক্ষতা, যদিও অনামী-অখ্যাত পাড়া-বেপাড়ার মানুষজনের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কটি এমন স্বাভাবিকতায় ছেয়ে থাকবে যে অমলকে ঘিরে বিস্ময় কোনো দিনই ফুরোবে না।

এইসব সাধারণ লক্ষণ সঙ্গে নিয়েই অমল চলে যায় কাচের দেওয়াল দিয়ে গড়ে তোলা বিশাল অফিসটিতে। দীপক নীচে আসেনি তখনও, অমল সম্ভবত একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়েছে। কাচের দেওয়ালগুলির মধ্যে বিভিন্ন আকার আর আয়তনের স্পেসকে নিয়ে আসা হয়েছে একটি বাতানুকূল যন্ত্রের অধীনে। লিফট থেকে নেমে-আসা মানুষ আর লিফটে উঠে-যাওয়া মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত হাসি বিনিময় করে যাচ্ছিল, তারা কথা বলছিল বেশ মৃদুভাবে, সকলের চোখেমুখে বিরাজ করছে এমন আশ্চর্য প্রীতি যে মোহাবিষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অমল প্রায় ভুলে যাচ্ছিল যে বাতানুকূল পরিবেশটুকু কত সংক্ষিপ্ত, শহরের কত কম জায়গা, কত কম মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে। বরং তার হঠাৎ মনে হল 'হেডকোয়ার্টার' শব্দটি, বা, শব্দটির কাছাকাছি কোনো ধারণায় সে পৌঁছে যেতে থাকে নিঃসাড়ে।

সুসজ্জিত একটি চেয়ারের সঙ্গে কথা বলার যে ভৌতিক অভ্যাস এ-শহরের আছে, এতদিনে অমলের তাতে সড়োগড়ো হয়ে যাওয়ার কথা। বি চৌধুরী একটু কাত হয়ে অমলের লেখাটা পড়ে যাচ্ছিলেন, মাথাটি সেই আগেকার মতোই ছোটো এবং নিখুঁত বৃত্তই থেকে গিয়েছে, হাত দুটিও সেই আগের মতোই—দুটি সরু ডাল। কিন্তু বুকের একটু নিচ থেকে যে স্ফীতি শুরু হয়েছে তা যেন কোনোভাবেই চৌধুরীর নিজস্ব নয়, সুসজ্জিত এই চেয়ারটিই বরং তার ওই অংশটি নিজস্ব করে ফেলেছে। অবিশ্বাস্য এক মানবশরীর গড়ে উঠেছে, যা রোগা বা মোটা নয়, শরীরের মধ্যভাগে অতিরিক্ত মাংসের ওজন-সহ এক কিম্ভূত জীব। খানিকটা মাংস ছিটকে এসে লেগেছে গালে, যার ফলে চোখে প্রায় কোনো ভাবই লক্ষ করা যায় না, বুজে-আসা দুটি গর্ত থেকে উঠে আসছে দুটি কালো পোকা।

বি চৌধুরী লেখাটা প্রায় শেষ করে, লেখা এবং চেয়ারটিতে ডুবে থেকে যখন বললেন, 'আভাসেই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে' তখন অমল, বলা যায়, একটু বিপন্নই বোধ করছিল। অতি দ্রুত তাকে ভেবে ফেলতে হল একটু হাসা উচিত কি না, লেখাটির বিষয়ে অতিসতর্কতা শেষ পর্যন্ত যে পলায়নী ভাব এনেছে সেটা স্বীকার করাই সংগত হবে। নাকি সে বলবে—এর থেকে বেশি স্পষ্ট হতে গেলে কিছুটা ঝুঁকি এসে পড়ে। বি চৌধুরী পিন-আপ-করা কাগজের পৃষ্ঠাগুলিতে এমনভাবে হাত বোলাচ্ছিলেন, নাড়ছিলেন, যে মনে হল ওই পৃষ্ঠা কটি খুব জীবন্ত যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বই অমলকে দ্বিধায় ছুঁড়ে দিল, এমন একটি ইস্যুর সামনে অমল কোনোরকম হ্যাংলামো প্রকাশ করতে পারে না, খুব একটা আড়ষ্ট হতে পারে না।

আসলে, দীপকই বলল তাড়াতাড়ি করে দিতে।

না, না, সেটা ঠিকই করেছেন, তবে, মনে হচ্ছে এ-বিষয়ে আপনার কাছে আরও তথ্য আছে।

হ্যাঁ।

তাহলে আপনার উচিত ছিল লেখাটির মধ্যে সব তথ্যই পেশ করা।

ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটা, যদি প্রকিওরমেন্ট থেকে ধরি...

হ্যাঁ, এই সংকটের রূপটাই আরও স্পষ্ট করা দরকার।

আ-চ্ছা।

সাংবাদিক কখনো শুধু সংশয় বা আন্দাজ থেকে কিছু লেখেন না। যা-ই লিখুন না কেন, একটা সিদ্ধান্তে আপনাকে পৌঁছোতেই হবে। আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, ভয়ংকব একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে, স্টকও খুব খারাপ।

হ্যাঁ, ঠিকই।

তাহলে তো ফেমিনের ফুট স্টেপ ছাড়া...

আসলে আমি একটু দ্বিধায়...

না, না, ওসব কোনো কাজের কথা নয়, মিডিয়ার যুগ এটা, আপনাকে নির্ভীক হতে হবে।

কিছুক্ষণ শুধু কাগজ ওলটানোর শব্দ, একবার বোতাম টেপা হল, 'দু-কাপ চা দিও সুকুমার, একটায় দুধ-চিনি দেবে।' এসবের মধ্যে মনে হল বি চৌধুরীর শেষ শব্দটি—'নির্ভীক'। সংবাদপত্রটির মাথাব ওপরও সে প্রতিদিন ওই শব্দটি ছাপা হতে দেখে আসছে, এখন কেমন প্রহেলিকা মনে হচ্ছে। বি চৌধুরী হয়তো প্রতিদিনই একটু একটু করে নির্ভীক হযেছেন, প্রতিদিন তাঁর শরীরেও ঠিক সেভাবেই এসেছে এক অলক্ষ্য, অদ্ভুত স্ফীতি। সমস্ত সংশয় থেকে তিনি সরে এসেছেন এক দুস্তর ব্যবধানে, যেখানে শুধু সিদ্ধান্তরা হিম হযে বসে থাকে, সেখান থেকে শুরু হয়ে যায় মিডিয়ার যুগ।

'আপনি থাকেন কোথায়'—এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ অভাবিত, নামজাদা কোনো প্রতিষ্ঠানের মাথা এরকম প্রশ্ন করলে দুটি প্রতিক্রিয়া সম্ভব। এক—প্রতিষ্ঠানটি যাকে এই প্রশ্ন করছে সেই ব্যক্তির সামনে রয়েছে দরজা খুলে যাওয়ার একটি গল্প, দুই—মাথাটি সেই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে পড়ে, হয়ে গিয়েছে একজন ব্যক্তি। 'একটু টাচ রাখবেন' বলা তো যায় না 'আমাদের ছুঁয়ে থাকুন', 'যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন', তাই বলতে হয় 'টাচ' শব্দটি, আর এই পরিভাষায় ঘুচে যেতে পারে সমস্ত বিভ্রান্তি, চোখের সামনে তখন একটি রাস্তা দেখা সম্ভব। রাস্তাটি লুকিয়ে আছে বাতানুকূল সেই বিশাল বাড়িটির কাচের দেওয়ালেব মধ্যেই, কাচের-দেওয়াল বলে ভ্রম হতে পারে এখানে সবই খোলামেলা, খুব স্বচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু বি চৌধুরী জানেন সেইসব বুদ্ধিমান মানুষের অস্তিত্ব যারা ইঙ্গিতের অর্থ বোঝেন।

বারো

আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্টঅফিসের এম ও পিওনের ফিরে আসতে আসতে বেলা একটা বেজে গেল। ডেসপ্যাচ ক্লার্ক-এর কাছ থেকে শুধু এইটুকু জানা গেল যে বিপরীত ঢেউটি সম্পর্কে তারা আগে তেমন কিছু আঁচ করতে পারেনি। তবে মানিঅর্ডারের সংখ্যা থেকে ডেসপ্যাচ ক্লার্কেরও ধারণা হয়েছে ক শহরে প্রতিদিন যত নবজাতকের জন্ম হচ্ছে, শহরটি থেকে প্রতিদিন দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা হয়তো তার থেকে কিছু কম নয়। আর আগে প্রতিদিনই বিহার, ইউ পি, উড়িষ্যায় মানিঅর্ডার করা হত শহরের প্রতিদিনের উপার্জনের এক-পঞ্চমাংশ টাকা। দফতরটি এ-কাজের যোগ্যতাও অর্জন করেছিল ধীরে, এখন উলটো কাজটি করতে তাদের জিভ বেরিয়ে আসছে আরও; দু-হাজার পিওনের জন্য বিজ্ঞাপন ইস্যু করা হয়েছে।

ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ভদ্রলোক যথেষ্ট বিনয়ী আর নিজের কাজের ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা প্রায় ধার্মিক মানুষের অর্চনার মতো। পর পর তিনটি জাবদা খাতায়, এম আর ডি চিহ্নিত পৃষ্ঠায় ক্রমাগত টুকে চলেছেন মানিঅর্ডারের বিবরণ। এম আর ডি ছাড়াও বহু অ্যাব্রিভিয়েশন রয়েছে, সেসব অমলের নজর এড়িয়ে গেল। স্ট্যাম্প-ক্লার্ক জানালেন, 'এরকম দু-চারজন মানুষ আজও বেঁচে আছে বলে সরকারি অফিসগুলো চলছে মশাই।' স্ট্যাম্প-ক্লার্কটি যে কী পরিমাণে আড্ডাবাজ তা বোঝা গেল পরবর্তী বাক্যটিতে—'জানেন, ওঁর ছেলের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অফিস করেছেন। আমরা তো বলি, মশাই, আপনি তো মৃত্যুর পরও অফিস ছাড়বেন না, দেখব ভূত হয়ে এসে টেনে নিয়েছেন ডেসপ্যাচের খাতা...।' এই পর্যন্ত বলে স্ট্যাম্প-ক্লার্কটি নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন।

ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক, স্ট্যাম্প-ক্লার্ক এবং পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথ' বলে জানা গেল, এম ও পিওনটি এই একটি এরিয়া:তেই রয়েছে গত দশ বছর যাবৎ, 'এটা খুব একটা নরম্যাল ব্যাপার নয়, তবে বুঝতেই পারছেন, এখন পার্টিবাজির যুগ—লোকটা খুবই ভালো, কিন্তু তাতে কী, নিয়ম মানলে বিট দূরের কথা, দশ বছরে ওব অন্তত তিনটে পোস্টঅফিসে বদলি হওয়ার কথা।'

অমলকে অফিসের ভেতরে এনে বসানো হয়েছে, সৌজন্যের কোনো অন্ত নেই, দু-কাপ চা আর চার-পাঁচটি সিগারেট দেওয়া হয়েছে তাকে। দু-একবার সে প্রাচীন কাঠের টেবিলে হাত রেখে একটু জুত করে বসার চেষ্টা করেছিল, প্রতিবারই তুঁতে-মাখানো আঠা এমন বিশ্রীভাবে লেগে যায় যে সে এই অফিসটিতে আর কোথাও হাত রাখতে স্বস্তি বোধ করছে না। বরং ভেবে ফেলেছে এখানে তো আঠার কোনো দফতর দেখছি না, তাহলে আঠাটা আসছে কোত্থেকে? 'মিহিরবাবুও ঠিক এমনিধারা মানুষ ছিলেন, যেদিন রিটায়ার করলেন, ব্যাস, সেদিনই হার্ট ফেল', স্ট্যাম্প-ক্লার্কটির থামার কোনো লক্ষণ নেই। এবং বেশ বোঝা যাচ্ছিল শুধু এই একটিমাত্র পয়েন্টকে ঘিরেই, তার সংগ্রহে আছে সহস্র খণ্ড কাহিনি।

এম ও পিওন ফিরে আসার আগেই অমল তার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলতে পারে—যেমন তার নাম কোনো একজন মণ্ডল, সে গ্র্যাজুয়েট, চাকরিটা পেয়েছে শিডিউলড কাস্ট কোটা থেকে। মণ্ডলের পরিবার বড়ো। ৬ নম্বর বিটে দোকান আর ব্যবসার একটা ঘাঁটি

থাকায়, সেখান থেকে বছরে অন্তত হাজারখানেক টাকা বকশিশ পাওয়া যায়। বেচারা বার কয়েক ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় বসেছে কিন্তু কোনোবারই সুবিধে করে উঠতে পারেনি। ইউনিয়ন আর পার্টির জোরে মণ্ডল আঁকড়ে রাখতে পেরেছে ৬ নম্বর বিট।

মণ্ডল যখন এল, ততক্ষণে পাড়ার এই পোস্টঅফিসটি পেয়ে গিয়েছে ফাঁকা দুপুর, ডেসপ্যাচ-ক্লার্কটি ছাড়া কেউই আর সিটে নেই, তারা একবার ক্যানটিন, একবার রিক্রিয়েশন ক্লাব—এই করে যাচ্ছিল। পোস্টমাস্টারও খুলে ফেলেছে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। ডেসপ্যাচ-ক্লার্কই আঙুল তুলে দেখাল 'ওই এসে গেছে, মণ্ডল...।' মণ্ডল মুখটি না-ঘুরিয়ে সোজা চলে গেল ক্যাশে, অমল তাকে অনুসরণ করে। ত্রিশভাগ মানিঅর্ডার ফেরত যাবে, প্রাপকরা অনুপস্থিত—এই কারণে। অনুপস্থিতির কারণ মৃত্যু, ব্যাধি আর শহরত্যাগ। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ত্রিশভাগ মানুষ হয়ে পড়েছেন ঠিকানাহীন।

এতদিনে আপনি তো ৬ নম্বর বিটের...

মুখস্থ, বলুন না কী বলবেন!

বলছি, দেশ ছাড়ার ঘটনাটা কত দিনের?

খুব বেশি দিনের না হলেও, চলছিলই, এই ধরুন না একজন, দুজন করে গেল, চিঠি লিখল এইরকম ধারা, আবার জনাকতক গেল, তারপর তো সব পড়ি-কি-মরি করে ছুটেছে।

কেন?

এখানে একজন মিস্তিরি কাজ যদি পায়ও তো বড়োজোর দশ টাকা রোজ, তা এক কিলো চালের দামই হল পাঁচ টাকা। ওখানে মিস্তিরির রোজ হল দেড়শো টাকা।

এদের আত্মীয়স্বজনের কি হাল ফিরে গেছে তাহলে?

পাগল হয়েছেন, যা পাঠাচ্ছে তাতে চলে কখনো, ধুঁকতে শুরু করেছে সব।

কেন?

ওখানে একে তো আক্কারা, তার ওপর হোটেল-নাচ-ফুর্তি...

তবে যে এত মানি অর্ডার...

হ্যাঁ আসছে, সে যারা পাঠাচ্ছে, পেটে গামছা বেঁধে পাঠাচ্ছে, এই তো, মাস ছয়েক আগে টেলারিং মিস্তিরি যদু সিং আরব থেকে ফিরল, প্যাঁকাটি হয়ে গেছে। বরং এখানে থাকতে একবেলা সবাই মিলে খেতে পেত। ওখানে ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে। যদু সিং ফিরে যাওয়ার সময় প্যান্টুলুন অব্দি খুলে বেচেছে।

ফিরেও গেছে।

তবে আর বলছি কী!

এখানেও তো জিনিসের দাম আগুন।

তা আর বলতে, বুঝলেন ওদের বউ-ছেলের শুকনো মুখ দেখে বকশিশ পর্যন্ত নিতে পারি না, সব ধুঁকছে। ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছি আমাকে বদলি করে দিতে, এ-জিনিস চোখে দেখা যায় না।

মণ্ডলের কথায় এত সব ভয়ের চিহ্ন ছড়িয়ে থাকলেও, সে ভয়কে নির্দিষ্ট করতে অপারগ,

কার্যকারণ বিষয়ে মণ্ডলের কোনো মনোযোগ নেই, বরং তার চোখ দুর্দশার চিত্রই বেশি দেখেছে। সে কেবল পারে ওই দুর্দশার বর্ণনা দিতে। মণ্ডলের বর্ণনা থেকে মূল যেসব বিষয় জানা গেল, তা হল এরকম : কারিগর মানুষই দেশত্যাগীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ক শহরে এদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক পুরুষ যাবৎ বেঁচে থাকলেও অনেকের সঙ্গেই গ্রামের সম্পর্ক ছিল, যদিও সে সম্পর্ক বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ক শহরে তারা দলবদ্ধভাবে এক-একটি অঞ্চলে বসবাস করত। দাঙ্গার সময় যেমন শহরের এক-একটি অংশ মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, দেশত্যাগের বন্যাতেও ঘটতে চলেছে সেই এক বৃত্তান্ত। দেশত্যাগের ফলে যে-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে হয় দেশত্যাগীরা বাঁচবে অথবা তাদের পরিজনেরা। কিন্তু মৃত্যুর এই হিসাব তারা কেউই বুঝছে না। সকলে মিলে বাঁচার চেষ্টাটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়।

তেরো

দারিদ্র্য এখন তাদের গল্পে কথায় একটু একটু করে স্মৃতিকথা হয়ে উঠতে চাইছে, যদিও তারা জীবনযাপনের দিক থেকে ততখানি বদলে যায়নি। এ কোনো পতিত জমির ধূসর বিবরণ নয়। পরিবর্তন যতটুকু তা প্রধানত একটি শিশুকে ঘিরে, হাসি আর কান্নার এই স্পন্দনটুকুর জন্য পর্যাপ্ত রোদ না থাকলেও, তার উলঙ্গ শরীর অলিভের তেলে সিক্ত করা হচ্ছিল, ফলের রসে পাতলা নরম ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে, শিশুটি পবিবারের সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে নানারকম ধ্বনি উচ্চারণের চেষ্টা করে যেত।

আর এই নতুনত্বটুকুর বিন্যাসে কেটে গিয়েছে দেড়টি বছর। দেড়টি বছরে সব থেকে বেশি বিস্ময় বোধ করেছে বিধুবালা, জীবনে এই প্রথম, যখন তার পক্ষে আর কখনো নতুন করে মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব নয়, তখন জানতে পারল—শিশুপালন একটি বিদ্যা। বিধুবালার এই বিস্ময় পরিবারটিতে নানারকম মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে অভিমান, মৃদু কলহ এবং দুঃখ থেকে বিরক্তি পর্যন্ত সব কিছুই ছিল। তবে, একটি শিশুকে ঘিরে একের পর এক নানা উপকরণ আর পদ্ধতির দিক থেকে পরিবারটিতে নতুনের যে-ঢেউ এসে পড়ছিল তা এত ধীর আর সহনশীল যে, পরিবারটির সামগ্রিকতায় সেও কেমন মানিয়ে যেতে থাকে। বিশদে প্রবেশ না-করেও বলা দরকার যে, তবু এই নতুনত্বটুকু সৃষ্টি করে চলেছিল এক অলক্ষ্য দূরত্ব। এবং পরে ওই দূরত্বটুকুও মেনে নেওয়া হয়, যেজন্য পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এ-জিনিসের মৃদু প্রকাশ থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

নিম্নবিত্ত পটভূমি এবং বটতলার গল্প পরিবারটিতে মজুত থাকায়, সৌভাগ্য, দৈব ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বলতা এখন অনেকের কাছে জোরালো বিশ্বাসরূপে ফিরে আসছিল। অমলের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। ব্যক্তিগতভাবে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অবমাননার ছোটো-বড়ো-মাঝারি গুটিকয় টিলা এবং যেমন সে টুবাইর জন্মের আগেই জেনেছিল টুবাই আসছে, ভেবেছিল টুবাই আসার সংবর্ধনায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটা দরকার এবং সেজন্য চেষ্টা করেছিল, ফলে সমস্ত জিনিসটা প্রায় একটি হিসাবের খাতা হয়ে ওঠায় আবেগ মার খেয়েছিল। অমল বদলে যাচ্ছিল অন্যরকমভাবে, অন্তত সে তা-ই অনুভব করল।

নতুন অফিসে যোগ দিয়ে কাজকর্ম করার তরতাজা ভাব বজায় ছিল মাত্র এক বছর। আর এই দুটি অফিসের মধ্যে মোটা দাগের পার্থক্যটি টের পেতে পেতে কেটে গিয়েছিল ছ-টি মাস। নবযুগে থাকার সময় ভিড়ের বাস, পায়ে হাঁটা, ফুটপাতের দোকানের চা, আলুরদম, ঘুগনি— ঘাম, ক্লান্তি আর হতাশা। আবার সেই অতি পরিশ্রমের জীবনে যেমন জিভ শুকিয়ে আসত, অবসর, একটু আরাম, একটু ধীরেসুস্থে ভাবার সুযোগের জন্য ছিল অমল নামের একজন মানুষের প্রাণান্তকর চেষ্টা; এখন সেই চেষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। যদিও তখন কেমন এক আলোকরশ্মির দিকে ছুটে চলার আগ্রহ আর তৃষ্ণা ছিল। মনে হত এক যুদ্ধবন্দির কথা, যে বেঁচে আছে সুস্পষ্ট এক মুক্তির প্রতীক্ষায়। অথচ সে ভুলতে পারে না ওই ঘাম আর ক্লান্তির দিনে অমল নিজে একটি বিষয় নির্বাচন করত, পরিশ্রমের দিনপঞ্জির মধ্যেও তাকে ভাবতে হত এক-একটি সমস্যার তলদেশ পর্যন্ত, হয়তো অমলের ভাবনার অনেকটাই লেখায় অনুপস্থিত থাকত, তবু ভাবনায় ভাবনায় সে শহরের জীবনপ্রবাহে ডুবত ভাসত। শরীর আর মনের এই পরিশ্রমের সঙ্গে সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান ঘিরে দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষে জীবনের একটি আভাস অন্তত ছিল। নতুন অফিস অচিরেই তাকে বুঝিয়ে দেয় 'ডিউটি' শব্দটি। অমল এখন একটি কাজের মেশিন, এমনকি টেলিপ্রিন্টাবটিও তাব থেকে ঢের প্রয়োজনীয়, যেজন্য একজন সাংবাদিকের হঠাৎ অন্তর্ধান টের পেতে পেতে একটি সপ্তাহ কেটে গিয়েছে কতবার, আর একটি টেলিপ্রিন্টার বিগড়ে গেলে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে নিউজ এজেন্সি আর মেকানিকের সঙ্গে যোগাযোগেব চেষ্টা ফোনে বেজে উঠতে দেখেছে। যন্ত্র-বিরোধিতাব প্রশ্ন নয়, যন্ত্র তো এখন নিসর্গের মতোই সহনীয়, স্বাভাবিক, এমনকি মাঝে মাঝে চিরায়তও মনে হয়েছে। মূল বিপত্তি যদি কিছু থেকে থাকে তা হল নির্দেশানুসারে কাজ। গত দেড়-দু বছরে অমল দেখেছে তার কলিগরা সুযোগ পেলেই আকণ্ঠ মদ খায় অথবা জঙ্গলের দিকে চালিয়ে দেয দ্রুতগতির জিপ।

যাই হোক, এই পর্যায়ে কাহিনিব শুরু মধ্যরাতে। মহাত্মা গান্ধী রোড আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের ক্রশিং-এ অফিসের গাড়ি অমলকে নামিয়ে দিয়েছে। বিশেষ কোনো কারণ না থাকলেও অমলের একটু ভারাক্রান্ত লাগছিল। আবার অর্থহীন, অবয়বহীন এক ধরনের সুখের অনুভূতিও ছিল। পরিচিত মানুষের মুখ মনে পড়ে যাচ্ছিল শ্লথ হাঁটার মধ্যে। হাঁটা-পথে বাড়ির সঙ্গে তার দূরত্ব এত কমে এসেছে, ইদানীং সে এত কম ক্লান্ত হয়, যে সব মিলে শরীরেরও ফুরিয়ে আসছে বিশ্রামের প্রয়োজন। ফলে, প্রতিদিন কাজকর্ম সেরে প্রবাসী মানুষের মতোই ক শহরে যারা রাতে বাড়িমুখো হয় তাদের সঙ্গে অমলের ফিরে চলায় কোনো মিল নেই। কোনো তাড়াহুড়ো, উৎকণ্ঠা নেই তার।

গাড়িবারান্দা থেকে খোলামেলা ফুটপাত পর্যন্ত তখন নেমে আসছে নাঙা আর ছিন্ন ঘুম। মজুররা ফুটপাতে খাটিয়া নিয়ে এসেছে বা বিছিয়ে দিয়েছে চট, মানুষ পা থেকে মাথা পর্যন্ত নোংরা চাদরে ঢেকে, পড়ে আছে মৃতের মতো। পরবর্তী দিনটি যে আসবেই তাতে কোনো সংশয় নেই তাদের। আর পরের দিনটির অস্তিত্বের মতোই এদের মনে জমা আছে আরও কিছু সত্য। প্রতিদিনের ঘুম আর প্রতিদিনের জেগে ওঠার মধ্যে যেমন লক্ষ করা যায় জীবন-মৃত্যুরই এক নিরাপরাধ অভ্যাস, চর্চা। কেউই এর বাইরে সরে থাকতে পারে না, তবু এই প্রদর্শনীর

মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই। এতখানি সরলতা, এই শুয়ে পড়ে থাকা, চোখ কচলানো আর জেগে ওঠা বেশ কুচ্ছিত ব্যাপার। পৃথিবীর অনেক শহরে এভাবে মানুষের লাশ পড়েছিল দুটি বিশ্বযুদ্ধের আমলে, ক শহরে সে-দৃশ্য হয়তো ছিল না কিন্তু মন্বন্তর ছিল। মন্বন্তর আজও আছে অমল বিশ্বাস করে। শুধু সেই ভয়াবহ হত্যাকারী কয়েকটি লক্ষণে নিজেকে আর প্রকাশ করে না, বরং শহরের কংক্রিট, আলো, গাড়ির রং আর চ্যাপ্টা আকার, রাস্তার শিকলের মধ্যে সে এতখানি আত্মগোপন করেছে, এনেছে এত মন্থর মৃত্যু আর ক্ষয়, আক্রমণ করেছে মানুষের মস্তিষ্কে যে তারা ঘটনাটি সংখ্যা দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে বোঝার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আবার এই হারিয়ে যাওয়াই তাদের সকল স্বস্তির মূল বুঝতে পেরে ইতিহাসের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপন করা হয়। তখন শহরটির যাত্রা শুরু হয় একটি প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে, গঙ্গার ঘাটে এসে ভেড়ে পাটবোঝাই নৌকা, সেখান থেকে চটকলের চিমনির ধোঁয়া পর্যন্ত পৌঁছোনোই এই ইতিহাসের গতি। এই স্টোরি বা হি-স্টোরি এত বিপুল এবং প্রতিটি তুচ্ছ আর সূক্ষ্ম জিনিসের প্রতি এত নিষ্ঠার সঙ্গে তাকানো হয় যে পুঙ্খানুপুঙ্খের নিবিষ্টতা যে নির্বোধ একনিষ্ঠতা গড়ে তোলে, তাতে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

বেঁচে থাকা খুব কঠিন।

আজীবন বেকার থেকে গেলাম।

প্রায় অমলের কানে কানে বলে গেল যেন, তারপরই হাসল, ততক্ষণে অমলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে সে জানতে পারল না, এর পরেও হাসে কী করে। এইসব মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছে ইতিহাস, অমল এই দুঃখদুর্দশার শহরে আজ আর ততখানি হতভাগ্য নয়, সে অন্তত প্রাণে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা পেয়ে গেছে চৌত্রিশ বছর বয়সে। এখন তার সামনে রয়েছে জীবনের বাকি অর্ধাংশ।

চোদ্দো

ক শহরে বেকার মানুষের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে ইতিমধ্যে যথেষ্ট বলা হয়েছে, তবে তা এপর্যন্ত শুধু লক্ষণ হিসাবেই হাজির হয়েছে, যা শেষপর্যন্ত প্রখর রোদের এই শহরে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক গুরুত্বও ততটা পায় না। বরং, শহরের এ এক পরিচিত গন্ধ শুধু, দারিদ্র্যের এই অতিপরিচিত, নোনা আর মানুষ-মানুষ গন্ধের স্বাভাবিকতা, বিষয়টিকে প্রায় সময়ই ভুলিয়ে দেয়। অবকাশ থাকে অন্যান্য দিকে তাকানোর। চোখের সামনে আঠাশ বছরের পল্টুর নড়াচড়া, তার শরীরের ছায়া, কণ্ঠস্বর, সিঁড়িতে পল্টুর পায়ের শব্দ নাদু মিত্তিরের কাছে এক প্রখর ভয়ের ব্যাপার। পল্টুর ঠাকুমা, অতিশয় ফর্সা আর কোঁচকানো চামড়ার এক বৃদ্ধা তা অনুভব করেন না, বরং পল্টুর অস্তিত্ব তাঁকে মৃত্যুজয়ের বিশ্বাস জোগায়। তিনি বলেন, 'একমাত্তর সলতে', যেন নাদু মিত্তিরের জীবনপ্রদীপ বৃদ্ধার আগেই নিভে যেতে পারে তিনি জানেন। তবু ভয় পাচ্ছেন না, কারণ পল্টু আছে, যার মানে মিত্তিররা আছে। শুধু মাঝে মাঝে তিনি উত্তেজক স্বপ্নের মধ্য থেকে ধরা-গলায় কথা বলে ওঠেন, 'এবারে পল্টুর বে দোবো।' ঠিক এই কথাটি শুনে এক সোমবার সকাল ন-টায় অমলের ঘুম ভাঙল।

আগের দিন রবিবার হলেও, অমলের কাছে তা ছুটির দিন ছিল না। সন্ধ্যায় সে আর সুভদ্রা গিয়েছিল রবীন্দ্রসদনে গানের অনুষ্ঠান শুনতে। অমল এমন কিছু সংগীতপ্রেমী নয়, তবে সাহিত্যিক কলিগের অনুরোধ এড়াতে পারেনি। বিশেষ শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এত ভদ্র, বিনয়ী আর রুচিমান যে মিষ্টি হেসে, মৃদু স্বরে, তিনি কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করলে অফিসে এমন একজনও নেই যিনি 'না' বলতে পারেন। একথা ঠিক যে এই আসরে তাঁর স্ত্রী শ্রীদেবীরও গাওয়ার কথা ছিল এবং পরের দিনের কাগজে অনুষ্ঠানটির সমালোচনায় শ্রীদেবী সম্পর্কে অন্তত দশটি বাক্য থাকবে। চেষ্টা করা হবে ওই দশটি বাক্যের প্রশস্তিকে একটু ভারসাম্য দেওয়ার, যেজন্য কণ্ঠস্বর আর গায়কির প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে দুটি একটি উচ্চারণ-দোষের কথা বলা হবে। একথা সত্য, শ্রীদেবী বেশ ভালোই গান, তবে ক শহরে শ্রীদেবীর থেকে ভালো গাইতে পারেন এমন অনেক শিল্পীকেই এই সংবাদ পত্রটির পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয়েছে এক ধরনের ঠান্ডা নীরবতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রটির এই নীরবতাকে ঘিরে ছিল অসংগঠিত ক্ষোভ, গত দেড় বছরে একজন মামুলি কর্মচারী হয়েও অমলকে এ-ধরনের অনেক বিদ্রূপ, শ্লেষ আর তিক্ততা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। সহ্য করতে করতে এখন তা অভ্যাসে চলে এসেছে। তবে গতকাল শ্রীদেবী যেভাবে হেসে হেসে, ভেঙে ভেঙে পড়ছিলেন, তাঁর শাড়ির চড়া রং, সুসজ্জিত হলঘরটির সাউন্ডবক্স, মাইক্রোফোন, পুরু দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে সুরের স্রোত আছড়ে পড়া এবং আবার শ্রীদেবীর শরীরের নুয়ে আসা, ঘাম—এসব রচনা করেছিল এক ভয়াবহ কৃত্রিমতা।

রাতে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে দু-চার কথা হয়েছিল ফিরে আসার পর। উর্মিলা টুবাইয়ের আবদার আর দুরন্তপনা সামলাতে প্রথম রাতেই বেশ নিস্তেজ হয়ে আসে। উর্মিলা অচিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। অমল জানলার পাশে বসেছিল অনেকক্ষণ, গোটা কয়েক সিগারেট শেষ করার পর, চোখের সামনে কোলাহলের একটি শহরের পাথর হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে বড়ো একা লাগছিল। ঠিক কত রাতে সে টুবাইর পাশে সন্তর্পণে শুয়ে পড়েছিল জানে না। শুধু জানে এইটুকু, ঘুম গাঢ় হল একেবারে ভোর রাতে।

বেলা ন-টায় ঘুম ভাঙার পর ধীরে ধীরে জেগে উঠতে কেটে যায় আরও একটি ঘণ্টা। এভাবে একটি নবীন দিন তার সামনে উপস্থিত হলে, খুব বেশি তা টের পাওয়া সম্ভব নয়। চা-সিগারেটে ডুবে থাকতে থাকতেই অমল মাছ সাঁতলানোর গন্ধ পেল, বুঝতে পারল তার পেটের কথা বিবেচনা করেই স্রেফ হলুদ-ঝোল হচ্ছে, মঙ্গলার মাকে হয়তো বিধুবালা বলে থাকবে 'জিওল মাছ আনিস'। টুবাই একবার 'আ-বাবা আ-বাব...আ... বাববা' বলতে বলতে উঠে এল অমলের বুকে, তার বুকের রোমরাজির ঝোপের মধ্যে কী যেন হাতড়াচ্ছে শিশুটি। শিশুটিই সম্বন্ধ গড়ে তুলছে, সে পারছেও, স্নেহের এই চলমান উষ্ণতা, এই স্পন্দনই তার শক্তি।

আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে অমল বসে থাকবে বিশাল একটি টেবিলের একপ্রান্তে, টেবিলটিতে কয়েকটি রিসিভার, ডাইরেক্টরি, চার-পাঁচটি সংবাদপত্র আর লালচে নিউজপ্রিন্টের প্যাড থাকবে। সে মুখ তুললে, বা ঘোরালেই দেখতে পাবে টেবিলের নীচে অদৃশ্য শরীরের নিম্নাংশসমেত

কয়েকজন মানুষ। নানাভাবে ছাঁটা চুল, রোগা আর মোটা মানুষরা, চশমাসমেত আর চশমাহীন চোখগুলি দেখা যাবে। ওইটুকু না-দেখা গেলে, তাদের হাসিমশকরা আর বুদ্ধিদীপ্ত কথাগুলি না-থাকলে, ঘরটি কী ভয়ানক রহস্যময় হয়ে উঠত! অর্থহীন মনে হত। অমল আর তারা একই আচরণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে করে যাবে। কয়েকবার ডায়াল করা, কয়েক কাপ চা খাওয়া, দু-একটি টপিক আবিষ্কারের চেষ্টা আর আলোচনা, গাড়ির জন্য একটি চিরকুট সংগ্রহ করা, তারপর ইচ্ছে করে ঢিলেমি, বেরোব-বেরোব করেও কিছুক্ষণ সময় কাটানো এবং তারপর বেরিয়ে যাওয়া। বেশ বোঝা যায় বাইরে খুব কমই আকর্ষণ থাকে, বরং এই হলঘরটিতে আছে একপ্রকার স্বস্তি, এখানে তারা হেলান দিতে পারে, রাজনীতি সম্পর্কে বকবক করতে পারে, এমনকি আদিরসের কথায় কিছুক্ষণ মজে থাকাও অসম্ভব নয়। প্রতিদিনের এই এক কর্মসূচি, অফিসের বাতানুকূলতার মধ্যে আছে এমন এক উষ্ণতা, আশ্রয়, যা তাদের প্রীতি বিতরণ করে। রিসিভার, টেবিল, চেয়ার আর কাছের দরজাটি সব কিছুর মধ্যেই আছে অনিশ্চয়তা প্রতিরোধের এক তীব্র ক্ষমতা। এই প্রতিরোধ মূলত আর্থিক হলেও তার একটি মানসিক দিকও স্পষ্ট, সমগ্র একটি দিন, সূর্যালোক ও অন্ধকার অতিক্রম করা এই গ্রহটির একটি দিন তাদের মনে ভয়াবহ ও বিশাল একটি ছায়া ফেলতে অসমর্থ হয়, বরং দিঙ্‌মণ্ডলব্যাপী আলো আর অন্ধকারের এ অবগাহন, শহরের এনামেল শীর্ষের ধাতব ঔজ্জ্বল্য খুনির স্তব্ধতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে না, তারা একটি আড়াল পেয়ে যায়।

স্নান করতে যাওয়ার মুখেই হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল—যাহ্, ঊর্মিলাকে বলা হয়নি। অমল অবশ্য কোনো দাবি হিসাবে ব্যাপারটা উপস্থিত করেনি, বরং একটু সাংসারিকভাবেই বলেছিল, 'এতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া ধরুন, আমরা আজ আছি কাল নেই, তখন কিছু সেলামি নিয়ে ফ্ল্যাটের মতো করে নিতে আপনার সুবিধেই হবে। জায়গা তো আর কম নেই।' নাদু মিত্তির অমলের প্রতিটি কথা একান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল; শুধু তা-ই নয়, উলটে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার আর কোনো সাজেশান আছে?' অমলের ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় মানুষটির মুখে উড়ে আসে সেই মধুর হাসি, 'তুমি তো জান এই কবরে আমি আর কিচ্ছুটি করতে চাই না, তোমাদের অসুবিধেটা বুঝতে পারছি না এমন নয়, তবে আমি তো ধরেও রাখতে চাইছি না বরং যে টাকাটা আমাকে দিতে চাইছ, দ্যাখো না তাতে ছিমছাম একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় কি না! বাড়িটার কত বয়স হল জান?' এই পর্যন্ত বলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার কোনো তাড়া নেই তো?' অমল ততক্ষণে বেশ সংকোচ বোধ করছে, বৃদ্ধের নাটকীয়তা একগুঁয়েমি সবই এমন মানিয়ে গিয়েছিল তার স্থৈর্যের সঙ্গে যে ওই অকৃত্রিমতা তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিল, 'না, না।' 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাই' শুনে বিস্ময় বা কৌতূহল কিছু হল না, শুধু অপেক্ষা করতে হল তাকে।

'ত্রিতল, প্রকোষ্ঠ...দীর্ঘ বাতায়ন, বুলেভার্ড, স্টাডি, ডাইনিং স্পেস...।' 'অট্টালিকার হস্তান্তর...বাবু শ্রী উদয়নারায়ণ সিংহ কেনেন মি. চিফোর্ডের নিকট হইতে ১৪,০০০ টাকায়। উদয়নারায়ণ সিং ১৮৮০ সালে ম্যালেরিয়ায় মারা যান। তাঁহার পুত্র ভগবৎনারায়ণ সিং উক্ত অট্টালিকা ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন ইন্দু মিত্তিরকে। ইতিপূর্বে অট্টালিকাটির হস্তান্তর ঘটিয়াছিল এইরূপ : মি

স্টেপল্‌ বিক্রয় করেন মি. হার্জনকে, হার্জন বিক্রয় করেন মি. ডালহৌসিকে, তারপর যথাক্রমে ম্যাকডোনাল্ড, রিচার্ড, কলিন্স, জোন্স এবং মি. চিফোর্ড...।'

একের পর এক সাহেবের হাত বদলে, বাতায়ন-বুলেভার্ড-স্টাডি আর ডাইনিং স্পেস ধূলিসাৎ করে যে-অট্টালিকা এখন স্রেফ একটি পুরোনো, ভাঙা বাড়ি, নাদু মিস্তির সেই বাড়ির মালিক। বাড়িটির বয়স অনুমান এতদিনে দুরূহ হতে হতে একটিমাত্র শব্দে আশ্রয় নিয়েছে। যদিও 'প্রাচীন' শব্দটির প্রতি নাদু মিস্তিরের কোনো মোহ নেই, তবু বাড়িটির সংস্কার কল্পনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নাদু মিস্তির যে প্রাচীনত্বের মূল্য সম্পর্কে সজাগ আর যত্নবান এমন নয়, বরং সে যেন কিছুটা প্রতিশোধও নিতে চাইছে। আবার প্রতিশোধই বা কেন। এখানে একজন মানুষ জন্মেছিল, সেই মানুষটি ক শহরের প্রাচীনত্বের উপাদানে মোহিত হয়নি, মানুষটির সামনে চকচকে শহরও ছিল এক মৃত্যুর প্রান্তর, অতঃপর ভিন্ন এক বিস্মৃতির মধ্যে একজন মানুষের গল্পের অস্পষ্ট রেখাই তাকে আকর্ষণ করে থাকবে। কিন্তু ততদিনে বয়স হয়ে গিয়েছে এ যেমন সত্যি, তেমনি অতীতের অট্টালিকাও তাকে সংযত করেছিল কিছু গড়ার গর্ব থেকে।

বলা বাহুল্য, অতীতের দলিল, নাদু মিস্তিরের টুকরো কথা এসব কোনো কিছুরই কোনো আবেদন ছিল না অমলের কাছে। বরং তাকে ভাবতে হয়েছিল তাহলে সত্যি এবার কিছু করতে হবে। এই স্যাঁতসেঁতে স্নানঘরটির মৃত্যুকূপ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। নাদু মিস্তিরের আচরণেও সে মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিল, মানুষটা নিশ্চয়ই মৃত্যুর অপেক্ষা করছে শুধু। এবং জানে পন্টুর হার্মাদ ব্যক্তিত্ব এই বাড়িটিতে মদ-গাঁজা বা সস্তার মেয়েদের আস্তানা গড়ে তুলবে একদিন। শুধু এর মধ্যে ভদ্রলোকের দাঁড়িপাল্লার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। ঘটনাটিকে সে সহজেই ভীমরতি বলে ধরে নিয়েছিল। যেমন কল্পনা করতে পেরেছিল শহরের পুরবিভাগ থেকে রাক্ষুসে যন্ত্র এসে বাড়িটিতে কামড় বসাচ্ছে, ভেঙে ফেলছে দেওয়াল, উপড়ে নিচ্ছে জানলা। নিলামের খদ্দেররা বসে আছে বার্মাটিকের অপেক্ষায়।

পনেরো

নবযুগ পত্রিকার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনাটি অমলের কল্পনা অনুসারে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত কোনো তিক্ততাই সৃষ্টি হয়নি। বরং, সে এস গাঙ্গুলির মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সেখানে ফুল আর আলোর মধ্যে এমন সৌহার্দ্য ছিল যে ভুল হচ্ছিল তারা আজও একটিই পরিবারের অন্তর্গত। প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে পরিবারের উপমা বেশ ভয়ংকর, যদিও অমল একথা মানে যে, এই দুটি প্রতিষ্ঠানের গঠনগত মিল আছে কিছু। পার্থক্য শুধু এইটুকু, একটি স্বাভাবিক, অপরটি কৃত্রিম—প্রাকৃতিক বনের সঙ্গে বনসৃজনের যে পার্থক্য, প্রায় এরকম একটি আলোচনাই চলছিল বলে সে আন্তরিকভাবে কথাটা বলেও ফেলে। যার পর সামাজিক বনসৃজন থেকে অরণ্যবাসী মানুষের কিছু আন্দোলনের কথাও এসে গেল সেই বিবাহবাসরে।

দক্ষিণ কলকাতার একটি পুরোনো পাড়ার ঘেরা ছাদ, লালচে চেয়ারপাতা একটি হলঘর, আর কংক্রিটের স্তর দিয়ে ঘেরা দু-চারটি ঘরে ছিল পারস্যের কার্পেটের নকল একটি দুটি কার্পেট, মখমলের তাকিয়া, গাদা গাদা ফুল, চড়া সেন্ট, শহরের সমস্ত বিউটি পার্লারের হাতের

ছোঁয়ায় গড়ে তোলা কিছু খোঁপা, কোল্ড ড্রিংকস, সিন্থেটিক স্ট্র, হাসি, দাঁত, ঠোঁট, জিভ, স্তনের ঊর্ধাংশ, মেয়েদের পিঠ আর কোমরের বিস্ময়কর মসৃণতা, পুরুষের লোমশ বুকে দু-তিনটি সোনার বোতাম আর আশ্চর্যরকম দরাজ হাসি এবং অনুষ্ঠানটির পক্ষে একান্ত জরুরি সুবিশাল ভোজ্যসামগ্রী—এইসবের মধ্য দিয়ে সাদা উর্দির বালক বালক চেহারার কিছু মানুষ দ্রুত নিঃশব্দে ছুটে চলেছিল, তাদের উর্দির হাতায় সেলাই করা ছিল 'কিউ' অক্ষরটি, এই আদ্যক্ষর স্মরণ করিয়ে দেয় নামজাদা একটি কেটারিং প্রতিষ্ঠানের কথা।

ক শহরের এক-একটি অংশে আজকাল যেকোনো মুহূর্তে নেমে আসে অন্ধকারের ডানা, অন্ধকারের সমুদ্রে শহরটি তখন কয়েকটি আলোকবিন্দুর মতোই ভাসতে থাকে, দুলতে থাকে। কংক্রিট আর ধাতুতে প্রতিফলিত সূর্যালোক এবং পরে মৃত আকাশ থেকে শহরের ইট, কাঠ, লোহালক্কর, পিচের রাস্তা আর পলিথিনে সূর্যের পতন কে আর লক্ষ করেছে! বরং সমবেত কৃত্রিম আলোর মধ্যে গোটা শহরটির স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা ছিল বিশ্বাসের মতো। নিষ্প্রদীপ হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র নিসর্গ জুড়ে এসেছে এক ভীতিপ্রদ প্রহেলিকা, যেন-বা নক্ষত্ররা শহরের সামান্য উঁচুতে উড়ছে, কার্নিশ আর জানলায় উঁকি দিচ্ছে একটি-দুটি নক্ষত্র।

চতুর্দিকে অন্ধকার স্রোত থাকায় নীচে আলোর প্রতিফলন আশা করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল যে নক্ষত্ররা এই অন্ধকার স্রোতে অবগাহন করবে, উৎসবের মধ্যে প্রায় এইরকম কিছু অলৌকিকতা থাকা সম্ভব। ফুলের স্তূপের মধ্যে এস গাঙ্গুলির মেয়েটির শুষ্ক মাংস লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেন এরকমই কোনো অভিপ্রায় থেকে। কমলা রঙের তরল কোল্ড ড্রিংকস উঠে আসছিল জিভ আর গলায়, এমন সময় সুকোমল গাঙ্গুলি অমলকে টেনে নিয়ে গেলেন জেনারেটারের শব্দ থেকে কিছুটা দূরে।

সুজনকে তুমি আগে দেখেছ?

আলাপ হয়েছিল...ম্যানেজমেন্ট...

হ্যাঁ, তবে আমার ইচ্ছে ওকে নিউজ পেপার ওয়ার্ল্ডে...

রীতা বলছিল বেশি ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চায় না।

এইরকম কিছু স্বগতোক্তির মতোই এস গাঙ্গুলি আউড়ে যাচ্ছিলেন, উৎসবটি যেন তেমন কিছু নয়, ওরা দুজনও কিছু নয়, সমাজবিদ্যার ডিগ্রি সংগ্রহের পর যুবক সু বুঝেছিল ওই বিষয়ে সে খুব একটা এগোতে পারবে না, তখন সে প্রশাসন বিদ্যাচর্চা শুরু করে, এরপর সমস্যা হল প্রশাসকদের ক শহরটি অর্থ আর আরাম জুগিয়ে থাকলেও, ক্ষমতা স্তম্ভের মতো দেওয়া হলেও, সংস্কৃতি বড়ো কম আছে। তা ছাড়া, এই বিষয়টি যথেষ্ট নবীন বলে তার সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত কম, উলটে প্রশাসনের প্রতি শহরটির মুদ্রা হল শুধুই ভয় আর করুণার। একটি খবরের কাগজ সু-কে উপহার দিতে সক্ষম মসৃণ এক সামাজিক গতিশীলতা, অন্যদিকে দেশপ্রেমের যুগে গড়ে ওঠা এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নবীন সু-র মতো হিসাবনিকাশে দড়, চটপটে ছেলে খুঁজছিলই। বিবাহ সম্পন্ন হতেই যেজন্য এস গাঙ্গুলি সমগ্র জিনিসটাকে প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে ভাবতে চাইছিল। অবশ্য গাঙ্গুলির জায়গায় অন্য কেউ হলে এইসব অভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে অমলের সঙ্গে আলাপ চালাত না। আবার এ-বিষয়ে অমলের মন্তব্য করা অশোভন শুধু নয়,

অধিকারবহির্ভূত ব্যাপার, ফলে তাকে শুধু শুনে যেতে হচ্ছিল। অর্থাৎ অমল যেন একটি বিবাহ উৎসবের মধ্যে থেকে, হাজার কোলাহল সত্ত্বেও, সানাই শুনে যাচ্ছে। এইসব কথায় সানাইয়ের শিল্পমাধুর্য নেই, তবু যে তার সানাইয়ের কথাটাই মনে হল তার কারণ ওই রোগা মেয়েটির সঙ্গে একজন স্মার্ট যুবকের এই মিলন ঘটল কেবল এই সুরটির জন্যই। না হলে রীতার তো সংশয় ছিলই যে সু শেষ পর্যন্ত হাওয়া হবে।

কী ভাবছ?

কিছু না।

তোমার মাথা থেকে ফেমিন নিশ্চয়ই বিদেয় হয়েছে।

ফেমিন?

হ্যাঁ।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।

অমল এস গাঙ্গুলির সঙ্গে এমন আন্তরিকভাবে হেসে উঠল, হো হো শব্দ বেরিয়ে এল দুজনের কণ্ঠনালী থেকে, যেন কাঁচা বয়সের কোনো অসম্ভব মজার ঘটনা স্মরণ করে তারা শৈশব ফিরে পেয়েছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম...' এই বাক্যটি সুকোমল গাঙ্গুলি শেষ করেন না, চলে যান অন্য প্রসঙ্গে, 'আমি দেখছি একটু ক্রিয়েটিভ ওয়েতে ভাবার চেষ্টা করলে কেমন নেশা এসে যায়, মনে হয় যেন দারুণ কোনো জিনিস ধরতে পেরেছি, আসলে ততক্ষণে রিয়েলিটি থেকে তুমি এত দূরে সরে যাবে, এত বেশি ভাবপ্রবণতা এসে যাবে, কল্পনা করা যায় না...এই ধরো না এখানে এত খাবার জিনিস, রাস্তায় তাকালেই দেখবে ভিখিরিরা ওত পেতে বসে আছে, শেষ রাতে নষ্ট খাবার বিলোতে গেলেই তেতাল্লিশ সাল চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠবে, এখন এই ঘটনাটাকে তুমি কীভাবে দেখবে, এরকম প্রতিটি পয়েন্টে যদি সচেতন থাক তাহলে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের ডিফিটিজম এসে যাবে, যাই হোক, ছাড়ো এসব...'

যেন অতি পুরাতন একজন রাজন্যব্যক্তি, হৃদয়হীন কোনো অভিজাত ব্যক্তির সামনে অমল দাঁড়িয়ে আছে বছরের পর বছর। তেতাল্লিশ সালেও নিশ্চয়ই এরকম বিবাহ হয়েছে, হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা, অতিথি নিয়ন্ত্রণবিধি মানলে কী লাভ, রেশন কম দেওয়া ছাড়া।' 'দূর! কে রেশন তুলতে যাবে, এ জাস্ট একটা নিয়ম আর কী, বোগাস!' ঠিক এই সময় বরযাত্রীদের একাংশের চলে যাওয়ার সময় হল বলে গাঙ্গুলি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, ছাতের কার্নিশ থেকে অমল তখন দেখছিল, বিদ্যুৎ ফিরে আসার পর ঝলমলে শহরটিকে। কিন্তু দ্রুত তার চোখ সরে যায় মেঘের বিশাল ক্যানভাসে, মেঘটি আকাশে ছিল না, ছিল একটি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এ, বিজ্ঞাপনটির মেঘ টেনে নিচ্ছে তখন অতি ক্ষুদ্র হয়ে আসা একটি মানবশরীর, খালি গায়ে মেঘে আর মইয়ে ভর দিয়ে, মানুষটি মেঘে মিশে যাচ্ছিল প্রায়। অত উঁচুতে, হোর্ডিং-এর কাছাকাছি মেঘ আঁকতে আঁকতে সে নিজে যতটা না ভীত তার থেকে অনেক গভীর আর ব্যাপক ভয় সে রচনা করে রেখেছে অমলের জন্য।

ষোলো

টুবাইয়ের সর্দির ধাত হয়ে যাচ্ছে, ঘনঘন সর্দিকাশিতে ভোগে; ভবিষ্যতে ওর স্বাস্থ্য নিয়ে ঝঞ্ঝাট হবে। ইন্দ্র প্রায় এইরকম একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, বিধুবালার হাতে ঝোলভাত খেয়ে কেটে পড়েছে। তারপর সুভদ্রা আর ঊর্মিলা দুজনেই অফিস সেরে ফিরে এলে, এ নিয়ে একপ্রস্থ কথা হয়েছে। অমলের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত সেই আলোচনায় বিধুবালা একা হয়ে যায়। এমনকি বিমলবাবু পর্যন্ত জানিয়েছেন : আগে অমল একা রোজগার করত, এখন তিনজন চাকরি করছে। একটি পরিবারে তিনজন চাকরি করছে আর একটি শিশু-সহ তিনজন মানুষকে যদি প্রতিপালন করতে হয় তাহলে তা আর্থিক দিক থেকে প্রায় কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। এরকম অবস্থায় একজন যদি অফিস থেকে লোন নিয়ে, থাকার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে, বা একজনের উপার্জন বছর দশেকের জন্য যদি পরিবারটিতে না আসে তাহলে এমন কিছু অসুবিধে হয় না। অন্যদিকে, সত্যি, একটি খোলামেলা বাসস্থান পেলে টুবাইয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

প্রতিটি বাক্য এক-একটি যুক্তি এবং কোথাও কোনো ছিদ্র নেই, সব শুনে অমল বলে, 'বুঝলে মা, এই তাহলে আমাদের শেষ সমস্যা, কী বল!'

অমল কথাটা এমনভাবে বলেনি যাতে কোনো শ্লেষ আবিষ্কার করা সম্ভব। বরং এ যেন একটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তি, এ পরিবারে অমলই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে আদিকাণ্ডের এই বিলোপ স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। আর বিধুবালার সঙ্গেই যেহেতু শৈশবের দিনগুলির অভিজ্ঞতা সমান সমান ভাগ করে নেওয়া সম্ভব, তাই সে বিধুবালাকে জড়িয়ে নিল। কিন্তু তাতে প্রস্তাবটি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আর সর্দির ধাতের প্রশ্নে বিধুবালার আবার অমলের ছেলেবেলার গল্প বলার চেষ্টা, প্রম'ণ করতে চাওয়া যে, কই, তাহলে তো অমল বাঁচত না। অমলকে এভাবে দৃষ্টান্ত করে তোলার চেষ্টা অন্যদের প্রভাবিত করতে পারেনি, তারা বলেছিল 'তাই বলে সামর্থ্য থাকতেও ছেলেটাকে—তা ছাড়া অনেক কষ্ট করেছি...', বা 'দাদারও একটা নিজের ঘর দরকার', ঊর্মিলা বলেছিল 'খামোকা এভাবে... কেন?' অমলের মন্তব্য এসবের একটা সুষ্ঠু সমাধানই ঘোষণা করল যেন, তারা পাঁচজন প্রবেশ করল একটি পরিবারের ইতিহাসে।

এই ইতিহাসের আদিকাণ্ডে চরিত্র মাত্র একটিই আর তা হল দারিদ্র্য। দেশভাগ হওয়ার বেশ কিছু পরই চরিত্রটি আদিকাণ্ড দখল করে নেয়, অমল যে দারিদ্র্যকে আদিকাণ্ড বলল তার কারণ শুধু এই নয় যে, এর মধ্যে নিহিত ছিল বেঁচে থাকার ঝাঁঝালো, শরীরী চেষ্টা। মিসেস গান্ধী এবং মৃণাল সেন-ও শব্দটির পিছনে কাঠি করেছিলেন। মৃণাল য-ফলা এবং 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান' এই লাইনটিকে ফাঁসি কাঠে ঝোলান। মিসেস গান্ধী আর তাঁর পুত্র চাইলেন পুরো মালটাই ঝেঁটিয়ে সাফ করতে।

অন্যদিকে অমল অনুভব করেছে প্রত্যেকের জীবনের কোনো একটি প্রধান স্রোত থাকে, অমলের ক্ষেত্রে ওই প্রধান স্রোতটির উৎসই দারিদ্র্য, আবার এই উৎস সে নিজে যে কোনো দুর্দান্ত অভিযান চালিয়ে আবিষ্কার করেছিল তাও নয়, বরং এ-জিনিসটা তার কাছে উত্তরাধিকার।

যদিও সম্পত্তির সঙ্গে এই উত্তরাধিকারের সুস্পষ্ট বিরোধ আছে, দলিলের জোরে সেই উৎসের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব নয়, নিজের শরীর-মন দিয়ে সবটা বুঝে নিতে হয়েছিল। বিধুবালার প্রশ্নেও অমলের একটি আবিষ্কার-বৃত্তান্ত থেকে গিয়েছে, ওই বৃত্তান্তে বিধুবালা হয়ে যায় এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অভিযানের এক বিশ্বস্ত সঙ্গী। কত বার বিধুবালা অমলের ক্ষত ধুইয়ে দিয়েছে, শ্রান্ত হয়ে সে বসে থেকেছে খাঁখাঁ প্রান্তরে, এই গল্পটির কোথাও অমল বিধুবালাকে খুঁজে পায়নি। যেন অমলের জন্মের পিছনে নরনারীর কোনো মিলন-ইতিহাস নেই, বা থাকলেও সে ইতিহাস এত প্রাচীন এবং প্রমাণহীন যে রূপকথা সৃষ্টি হতে পারে।

ইন্দ্র বলছিল গতকালের কাগজে...

সল্টলেকের বিজ্ঞাপন...

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

লটারি হবে প্রথমে।

বেশ উত্তেজনা আছে।

বিধুবালা প্রশ্ন করে বসে, 'সেটা কোথায়?' অমল হাসতে থাকে, 'কাদাপাড়া ছাড়িযে।' এতে বিধুবালার কোনোই সুবিধে হল না, সে এই কলকাতায় সল্টলেককে শনাক্ত করতে একেবারেই অক্ষম, বরং সে চিতপুর, ভবানীপুর, পাইকপাড়া, চেতলা আর বরানগরের কথা জানে। জানে পোস্তা, কুমোরটুলি, কালীঘাট, শখের বাজাব, হাতিবাগান, ধর্মতলা, শিয়ালদা, তালতলা ইত্যাদি নামের এক অতি পুরাতন শহর। এ যেন তাব কাছে প্রায় এক বিস্ময়, সল্টলেক যেখানে হচ্ছে সেই স্থানটি ইতিপূর্বে কলকাতায় যেন কোনোদিন ছিলই না, আধুনিকতা একটি স্থান অর্থাৎ জমি সৃষ্টি করেছে, হয়তো ওই জমি বসানোর জন্য তারা কলকাতাকে একটু ফাঁক কবে নিয়েছে, তারপর সেই ফাঁকটিতে স্থাপন করেছে সল্টলেক। বিধুবালা এসবে কেমন দর্শক-অস্তিত্ব পেয়ে যায়, 'কত কী যে দেখব!' আর তখনই তাকে শোনানো হয় 'আপনি তো এক পা বাইরে বেরোন না, কলকাতা বদলে গেছে, সল্টলেক কি আজ হয়েছে না-কি।'

বিধুবালা খুব একটা তলিয়ে না-ভেবেই দর্শক হতে চাইছে আব অমলকে ভাবতে হচ্ছে নিজের প্রধান স্রোতটির কথা, সে তো ক্রমেই শুকিয়ে আসছে, এখনই তা শুধু একটি খাত। অর্থাৎ একদিন, এখানে স্রোত ছিল। সে ভয় পাচ্ছে কারণ হয় তাকে এরপব গোটা জীবন বেঁচে থাকতে হবে ওই 'একদিন, এখানে'র ধারণা ও গল্পে, নতুবা এই খাত ভরে ফেলে, একদিন, এখানে গড়ে উঠবে নতুন এক নগর বা উপনগর। এই গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে যে অমল যাবে না, সেকথা অমলের থেকে বেশি আর কে জানে, যে কারণে সেও বলে ফেলল, 'হ্যাঁ শহরটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে, এখন শিয়ালদায় গেলে তুমি চিনতেই পারবে না।' আর, সত্যি উড়াল পুলটি যে যুক্তি হতে পারে সে কোনোদিন ভাবেনি।

মানুষও বদলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, তা যাচ্ছে।

মানুষের অদলবদলের বিষয়ে বিধুবালা টানা, দ্রুত কিছু কথা বলে গেল। প্রায় দশ মিনিট, দশ মিনিটের সেই বর্ণনার সমস্তটাই ফরিদপুরের বাঙাল ভাষায় বলার জন্য এখানে তার

পুনরুক্তি ক শহরের প্রধানতম ভাষা থেকে বিচ্যুতি ঘটাবে এবং বাস্তবতার বানানো আবহাওয়াও সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কায় বিধুবালার কথার হুবহু অনুবাদ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

বদলে যাচ্ছে না ছাই। ভালো কিছু হচ্ছে কি, আবার উচ্ছন্নে যে গেছে তাও বলতে পারব না। বরং আমার তো মনে হয় কেমন যেন থমকে গেছে, ভয় পেয়েছে তবু প্রকাশ করবে না, সবাই সবাইয়ের কাছ থেকে ভয় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, যেজন্য সত্যিকারের রাগ, সত্যিকারের হাসি, এসব নেই, কেমন যেন সিঁটকে যাচ্ছে, বুঝি না বাবা। কম লন্ডভন্ড, প্রলয় তো দেখিনি, গুলি, বন্দুক, মন্বন্তর, মহামারী দেখে বড়ো হয়েছি, আর যে কিছু দেখার আছে তা-ও মনে হয় না—কেমন একটা দম্ভও দেখি আজকাল কীসের রে, কীসের অত দম্ভ বলতে পারিস।

সতেরো

ম্যাটাডোর দুটিতে মালপত্র তুলে দেওয়ার ব্যাপারে নাদু মিস্তির আর তার ছেলেও বেশ সাহায্য করেছে। আর মালপত্তর তোলার পর হঠাৎ অমল কিছুটা অবকাশ পেয়ে যায়, যখন তার কিছুই করার নেই, যখন সে ভাবছিল : এবার কী করা?

এরপর সে অর্থে ঘটনা তেমন কিছু নেই, অমলের ভাসমান অবস্থার সঙ্গে নিরাপত্তার অভাবের একটি সম্পর্ক ছিল, এতদিনে সেসব ঘুচল। এখন যা সম্ভব তার সবটাই আভ্যন্তর চিত্র, যে আভ্যন্তর থেকে কোনোদিন হয়তো আবার একটি নিষ্ক্রমণও ঘটতে পারে। যেহেতু ওই ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, তাই সামনে যা ছিল তা প্রশস্ত অবসর। আর, একজন মানুষ, একটি পরিবার নিজেদের চেষ্টায়, তাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বকে অন্তত কিছুটা সমস্যামুক্ত করতে পেরেছে, তা তো একরকম সাফল্যই। হয়তো একদিন, তবু আমাদের এই সাধারণ মানুষটি অনুভব করল : না, এ কোনো সাফল্য নয়, এসবে তার ভূমিকা খুবই নগণ্য। ততদিনে হয়তো ক শহরটি তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে অভুক্ত মানুষদের পাঁচিল ডিঙিয়ে শহরের অন্যপ্রান্তে। পরিবারটি হয়েছে সুস্থিত, নিয়মানুগ আর শান্ত। কোনো কোলাহল নেই। অবসর আছে। দ্বিতীয় অংশটি বাহ্যত এই অবসরের কাহিনি, যখন ঘটনা জন্মগ্রহণ করছে অমলের মস্তিষ্কে।

দ্বিতীয় ভাগ

১৯৮২ সালের ১৫ অগস্ট উইয়ের ঢিপি ভেঙে তারা মুক্ত হয়েছিল। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক কলকাতা থেকে, পরিবারটি হালকাভাবে, চাকায় ভর দিয়ে, উড়ে, বা গড়িয়ে চলেছিল লবণহ্রদের এক কলকাতার দিকে।

ছ-জনের ছোট্ট ইউনিটটি চলেছে ফুরফুরে আবহাওয়ায়। গত দু-দিন বৃষ্টি এতটাই ধামসে গিয়েছে যে আজ সত্যি এক মনোরম সকাল। হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যাওয়া। নরম রোদ, বালক-বালিকার প্যারেড, ড্রাম আর বিউগলের শব্দ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, এসব রচনা করে রেখেছে এক উৎসব।

ঊর্মিলা সুভদ্রাকে বলল, 'টুবাইয়ের কিছুই মনে থাকবে না।' অর্থাৎ টুবাইয়ের শৈশবের ভূগোল হয়ে যাবে লবণহ্রদে গড়ে-ওঠা একটি আনকোরা শহর। কিন্তু শরীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও যেমন সম্বন্ধ থেকে যায়, যেমন ঊর্মিলা ভুলতে পারে না তার পিতৃবিয়োগ, তেমনি ঊর্মিলা, সুভদ্রা বা অমল কে এস স্ট্রিটের একটি সংকীর্ণ গলি, ভয়ংকর কালীপুজো কোনোদিন ভুলতে পারবে কি?

ম্যাটাডোর সেখানে আর এগোতে পারছিল না, নারকেলডাঙা নর্থ রোডের সেই মুখে ডানহাতি সার সার লোহালক্কড়ের কারখানা, টিলা বা ঢিপির মতো বস্তি আর কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ পেরিয়ে, একটি রেলব্রিজ পেরিয়ে পাওয়া যাবে অলৌকিক প্রশস্ত পথ। বাড়ি বদলের মধ্যে নিবিড় স্বপ্ন কিছু ছিল, পরিবর্তনের সূচক বলে ঘটনাটিকে ধরে নেওয়া সম্ভব ছিল, যেহেতু সেই পরিবর্তনে প্রায় কোনো আকস্মিকতা নেই, তাই উৎসবের মেজাজটি বেশ আরোপিত। কেননা, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, লটারি, লোনের দরখাস্ত ইত্যাদি ঘিরে একটি দফতরে এত বার যেতে হয়েছে, এত কথা ভাবতে হয়েছে, সইসাবুদের এত দীর্ঘ পর্ব ছিল, যে তাদের মধ্যে সংশয় থাকা স্বাভাবিক যে জিনিসটি আকস্মিক নয়, তারা তা সযত্নে গড়ে তোলেনি তিল তিল করে। সবটাই অফিসি এবং কাগুজে কাণ্ড। ফলে কোনো রোমাঞ্চ নেই। একথা ঠিক— অর্থ, উৎসাহ আর শ্রম কিছুটা শুষে নিতে পেরেছিল নতুন ইট-সিমেন্ট-কংক্রিট, শেষ পর্যন্ত যা তাদের উপহার দিচ্ছে একটি জ্যামিতিক নকশা। তবু এর পিছনে অফিস আর দফতরের ভূমিকাই মুখ্য, এমনকি দফতরের ব্লু প্রিন্টে তারা হয়তো কবেই এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে, একটি ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে।

দুটি ম্যাটাডোরে মালপত্রসমেত পরিবারটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। প্রথমটিতে যদি খাট, বিছানা, সোফা, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল থেকে থাকে, তো দ্বিতীয়টিতে আছে গ্যাস, ফ্রিজ, কুকার, হাঁড়িকুড়ি, ট্রাঙ্ক, ওয়াড্রব। এইসব মালপত্র লক্ষ করলে একটি বিবর্তন ধরা পড়ে। খুব সাদামাটা গ্রাম্য জীবনযাপনের কিছু চিহ্ন (মাদুর, দু-পুরুষের ট্র্যাঙ্ক, তালপাতার পাখা ইত্যাদি) আজও তারা বহন করে চলেছে। গ্যাস এবং ফ্রিজ এসেছে মাত্র এক সপ্তাহ আগে। এখন সল্টলেকে তাদের জীবন এই যন্ত্র দুটির সাহায্যে বেশ সহজ হয়ে উঠবে। সাদা থেকে গাঢ় বাদামি রঙে

আরশোলার ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্র হবে না তাদের পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটি। বিধুবালা এ প্রসঙ্গে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল, 'দু-মিনিটে রান্না হয়ে যাবে, তারপর করবটা কী!! সারাটা দিন!'

ছ-টি প্রাণীকে ঘিরে, কথা, গল্প আর অনুভূতিমালা যদি এরপরও কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা দেওয়াল-তোলা কিছু জ্যামিতিক পরিসরেই আছে। বিশেষত, বিধুবালা আর বিমলবাবুর প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত তো কেটে যাবে এখানেই, যদিও অনুমান করে নেওয়া যায় যে বিমলবাবুর সান্ধ্যভ্রমণ আছে। আর, এখানে পরিসর আছে বলেই, তারা প্রত্যেকে আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, ভাষা আর ভাবনার অবসরের মধ্যে যে গভীর স্বাধীনতা বা তার ফাঁকা জমি, সেসবই এখন তাদের নাগালের মধ্যে এসেছে। এইসব কারণে ফ্ল্যাটটি ধরা যাক একটি শিবির, গৃহহীনরা এখানে এসেছে। শিবিরের বর্ণনার কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারত একটি মানচিত্র। যার পর ফ্ল্যাটটি সম্পর্কে বর্ণনার একঘেয়েমির হাত থেকেও নিস্তার পাওয়া যেত, যদিও এই আস্তানাটি অমলদের ক্ষেত্রে স্থায়ী বলে, তাদের কোনো নিস্তার নেই। সে যাই হোক, মানচিত্রটি ভাষায় বিবৃত করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়াবে :

সিঁড়ির ডানহাতি দরজা, দরজার বাঁহাতি পর পর দুটি ঘর, মাঝখানে পরিসর রেখে দরজার উলটো দিকে বাথরুম, বাথরুমের পাশে কিচেন। বাঁহাতি দ্বিতীয় ঘরটি থেকে বেরিয়েছে লম্বা ধাঁচের আর-একটি ঘর। প্রথম ঘরটি থেকে ওইরকম কোনো ঘর না বেরোলেও এক চিলতে ব্যালকনি সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে।

মাঝখানে প্রবেশপথ রেখে চারতলা বাড়িটিকে দুটি টুকরো করা হয়েছে। চারতলা পর্যন্ত দুটি টুকরোর দুটি দিক মিলিয়ে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা চার-চার আটটি। এখানকার পাঁচ হাজার ফ্ল্যাটের ভিতরটি হুবহু অমলদের ফ্ল্যাটের মতো, এও কম আশ্চর্য নয়। ম্যাটাডোর, বিশাল ঝকঝকে রাস্তায়, কৃত্রিম বনের (যেখানে কয়েকটি হরিণ চরছিল) পাশ কাটিয়ে, বাড়িটির সামনে থামলে, প্রথমেই যা নজরে আসে তা হল এখানে দীর্ঘ, টানা দেওয়াল নেই। বাড়িটিতে যে-কটি পরিবারের আসার কথা, তাদের অনেকেই এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হওয়া, আরোহীদের নেমে আসা আর মাল নামানো শুরু হওয়ার পরও, পিচের রাস্তাটিতে কোনো কৌতূহলী মুখ দেখা গেল না, এমনকি একটি শিশুও নয়।

দুই

দু-চার মাসের মধ্যে অমল অনুভব করল আর্থিক-ভারসাম্যে পৌঁছে যাওয়া তার পরিচিত বন্ধুজনের মতোই, ঘটনার আকাল তাকেও তাড়া করছে। এবারের ঘটনাহীনতা সংবাদপত্রের বিষয় নয়, ততটা দেশকালের বিষয়ও নয়, বরং তা অনেকখানিই ব্যক্তিজীবনের বিষয়। কফি হাউসের একটি কোনায় অবশ্য জড়ো হচ্ছিল কয়েকজন মানুষ, তারা বলছিল, বিপ্লবীদের পুনরুজ্জীবন ঘটতে চলেছে এই মর্মে একটি সংবাদ উড়ে এসেছে। তারা বলছে, 'শুধুই ভেবে ভেবে যেমন কাজ ভন্ডুল করে দেওয়া যেতে পারে, তেমনি প্রতিমুহূর্তে কাজের দৃষ্টান্ত দিয়েও কোনো লাভ নেই', 'শহরের রাজনীতি আর সাহিত্য নিয়ে এত ভুল গর্ব আছে যে বলার নয়', 'এখানকার বিদ্রোহীরা বাস্তবতা থেকে আগেই পালিয়েছে, গণতন্ত্রী আর শিল্পীরা মহান

করে তুলতে চায় প্রতিদিনের কদর্য জীবনকে', 'মৃতের জীবন ছাড়া কিছুই নেই এ শহরে'...

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে সমালোচনার ধার সবসময়ই অনেক বেশি থাকে, গভীরতা থাক বা না থাক। এর-তার নাম ধরে নিন্দেমন্দ আড্ডাও বেশিদিন ভালো লাগে না বলে একটু বড়ো পরিপ্রেক্ষিত টানতেই থাকে। অমল এই আড্ডায় তবু যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না, তার কারণ সে কিছু সদর্থক কথা শুনতে আর ভাবতেই আগ্রহ বোধ করছিল। অনেকটা অবসর পেয়ে তার কিছু করতে ইচ্ছে করছে। আর তখন অনুভব করল ওই ঘটনাহীনতা।

বিপ্লবীদের পুনরুজ্জীবনের ঘটনা মফস্সলসহ গ্রামের দিকে ঘটছে বলেই প্রথম প্রথম শোনা গেল, পরে তা শহরমুখী হতে শুরু করে। যদিও অতীতের মতো এবার তারা শহর আক্রমণের কথা ভাবেনি। সম্ভবত তারা শহরের জীর্ণতায় শিউরে উঠেছিল, বিপুল রক্তপাতের সামনে এমন জীর্ণ একটি শহরকে স্বপ্ন হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের পর শহরটি তাদের কাছে একটি বোঝা হয়ে উঠতে পারে, যেজন্য অতীতচারিতা থেকে বিপ্লবীদের সরে আসতে হচ্ছে।

এইসব গুজব, কল্পনা আর অতিকল্পনার সঙ্গে অমলের কোনো সম্পর্ক নেই, তা ছাড়া, শহরটিতে অনাহার, বঞ্চনা গভীরভাবে থাকায় সর্বদাই বিপ্লবের প্রস্তাব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এরকম অনেক কিছুরই এক প্রাসঙ্গিকতা আছে, ফলে শহরের যেকোনো মানুষের বুক হয়ে উঠতে পারে একটি সাদা পর্দা যেখানে এইসব ছবির প্রতিফলন ঘটতেই পারে। তবে এতে পর্দাটির ভূমিকা যৎসামান্য।

নিজের দিক থেকে সে ভেবে দেখেছে— বাবা-মা-বোনকে নিয়ে পরিবারটির বেঁচে-থাকা সুনিশ্চিত করার জন্য তার কিছু ভূমিকা ছিল। একটি পর্যায় পর্যন্ত সে সেই ভূমিকা পালনও করে। তারপর উর্মিলা সুভদ্রা আর, ক শহরের কিছু পরিকল্পনা সব মিলে পৌঁছে যেতে পারে নিরাপত্তার আশ্রয়ে। তবু এই প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতায় অমল ঠিক সেভাবে কিছু সৃষ্টি করেনি। আর এখন তার সামনে, প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় স্বাধীনতা কালীমূর্তিতে সামনে এসে পড়েছে আর অমল এই অপরিচিত ভূখণ্ডে সূক্ষ্ম ভয়কে দেখতে পেল বেশ সক্রিয় অবস্থায়।

পরবর্তী ঘটনা-বিবরণে সেই ভয়ের কিছু কিছু ছবি নিশ্চিত থাকবে, তবু দু-চার কথায় তার সারমর্ম প্রকাশ করা যেতে পারে।

এক, আর বেশি টাকাকড়ির কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করছে না। দুই, অনেক দিনের কিছু কিছু স্মৃতির ভিত্তিতে যে দু-একটি বন্ধুত্ব প্রবাহিত ছিল, অমলের দিক থেকে তা ক্রমেই শুকিয়ে আসতে থাকে। পুরোনো স্কুলের একটি কর্দমাক্ত মাঠ, বাথরুমের দেওয়ালে দু-একটি অশ্লীল কথা, সিগারেট খেতে শেখা, গেজেট দেখা, প্রথম মদ খাওয়া আর নারীশরীর সম্পর্কে দু-চার কথার বিনিময়ে এই যে বন্ধুত্ব তা আসলে অমলেরই একটি বাহ্যিক আত্মচরিত মাত্র। এসব ক্ষেত্রে অন্যের উপস্থিতি মুছে ফেলে, ভাঙা স্কুলবাড়ি, রেস্তোরাঁ, মাঠ আর অফিস অনেক বেশি জেগে ওঠে। সে একা হয়ে যায়, যেমন ওই দু-চারজন বন্ধুও একা হয়ে যেতে পারে। পরস্পরের কাছে প্রকাশ না করলেও, তারা জানে যে এভাবে নিঃসঙ্গতাকে ছলনা করা হয়। অমল এখন এই ছলনার ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে দুঃসহভাবে সজাগ, এই যা পার্থক্য।

তিন হল তার পারিবারিক অবস্থান। যেহেতু তিন-নম্বর ব্যাপারটির মধ্যে এক আর দুই গাঢ়ভাবে মিশে আছে, তাই আলাদা করে তার উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই, একমাত্র 'ভালোবাসা' ছাড়া, এরকম একটি ধারণা আর বিশ্বাস তো ক শহরে খুবই প্রচলিত। মানুষ তার সন্তান আর স্ত্রীকে ভালোবাসে, বা স্বামী-স্ত্রী-সন্তান এবং আবার স্বামী-স্ত্রী-সন্তান পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে এক চিরায়ত ভালোবাসা— পরিবার তার কাঠামো মাত্র।

বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে করতে, ভালোবাসার এক টুকরো জমিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করতে করতে একদিন সে মরে যাবে, এবং অমল এমন একজন মানুষ যে মৃত্যু-অতিক্রান্ত কোনো জগতের ছবি কল্পনা করতে পারে না। যেমন সে মনে করে না তার এই ভালোবাসা এ পৃথিবীতে অত্যন্ত মৌলিক ব্যাপার।

বাইরে ছিল ঝড়বাদলের একটি দুর্দান্ত রাত, অমলের সামনে স্পষ্টই গ্রিলের জানলা, থেকে থেকে বিদ্যুৎ-চমকে জানলাটির ফ্রেম, গ্রিলের নকশা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠছিল কালো আকাশ; সে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে, আবার চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

ইলোপ করে বিয়ে করাটাও বিয়ে করাই, সে রাতে অমলের ঠিক পিছনেই ছিল ওই বিবাহশয্যা। তুলনামূলকভাবে আজ সারাদিন একটু বেশি ছুটোছুটি গিয়েছে, তারপর ছিল মৃত এক সুবিশাল অজগরের মতোই দীর্ঘ জ্যাম। ওই জ্যামের কবরে থাকার সময়েই প্রাথমিক অধৈর্য আর বিরক্তি সরিয়ে সে চেষ্টা করেছিল নিজের মনটিকে একটু সক্রিয় করে তুলতে। তার ফল তো হাতে হাতে পেয়েছে। এখন সে অন্ধকারে ডুবে আছে। জেগে আছে। অনুভব করছে বেঁচে থাকার অন্তিম প্রান্ত—সে বস্তুত অন্তিম প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে যেন। লবণহ্রদের এই বাড়িটি, তার স্ত্রী-পুত্র-মাতাপিতা আর সুভদ্রাকে ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে আসছে। আগামীকাল তার শরীরের ওপর থেকে চাদরটি সরানোমাত্র তারা আঁতকে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে অকর্মণ্য অমলের কী-ই বা এসে যায়।

সংহত, ভীত, বাচাল আর অন্যমনস্ক একজন মানুষকে, প্রতিদিন একটি একটি করে কোষের বিনাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সে জানে। জানে যে এইভাবে শরীর-মন অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন হতে হতে, গলে গিয়ে যে অস্বাভাবিক মৃত্যু, তাকে পৌঁছে যেতে হবে সেই মৃত্যু পর্যন্ত, বা প্রাকৃতিকতাই সেক্ষেত্রে অমলের নিয়ন্তা। তার জাগরণেও এখন যে ঝিমুনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এই যে ঘুমঘুম ভাব, এই অস্পষ্টতা, এসবই মৃত্যুদূত। রাত্রিকালীন আবহাওয়া কিছুক্ষণ পরেই ঝড়বাদল-মুক্ত হল, রাস্তার আলো জ্বলে উঠল বলে উঁচু জায়গাটি থেকে অমল অনেক রাস্তা দেখতে পেল, কয়েকটি বাঁক-সহ রাস্তার পর রাস্তা মিলে মোটা করে আঁকা একটি নকশাও স্পষ্ট এখন। ঝিমুনি ফিরে পেয়েছে অনেক বেশি জোর, অমল নিজে শুরুতে যতখানি সক্রিয় হতে চাইছিল, ভাবছিল কিছু একটা করার কথা, তা আর এখন নেই। সে দুটি পা ফাঁক করে বেশ মজবুতভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল, হয়তো একটি পা তুলেওছিল, এমন সময় ঝিমুনি তাকে চিত করে দিল। চোট লেগেছিল, কিন্তু অসাড় থাকার জন্য অনুভব করতে পারেনি। এখন বুঝল কিছু করার ভয় শুধু নয়, মরে যাচ্ছে আগ্রহ। এবং নিজের সম্পর্কে স্বস্তিকর অর্থ প্রয়োজন ছিল বলেই, সে 'মাঝারি' শব্দটি নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'সাধারণ' এই কথাটিকে খুবই

কাব্যিক বোধ হল। বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতাকে নিঃশেষিত করে ফেলেছে ভাবতে ভাবতে উর্মিলার দিকে এগিয়ে গেল। উর্মিলাকে স্পর্শ করল। উর্মিলা ঘুমোচ্ছে, টুবাই ঘুমোচ্ছে। এখন যদি উর্মিলা জেগে থাকত অমল কি খুব কথা বলত, উর্মিলার প্রশংসা করত?—'সত্যি, তুমি না থাকলে', 'উর্মিলা!', 'উর্মিলা!' বলে সে তখন কাকে ডাকত? এই যে মেয়েটি শুয়ে আছে, যার বুকের কাছে একটি শিশু, যা একটি চিত্র, সুন্দর, কিন্তু চিত্র তো বটেই...

তিন

কোনো একটি শহরের কয়েকজন সভ্য মানুষ একটি অনাবিষ্কৃত পাহাড়ি ঝরনার উদ্দেশে রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু করে। ধরে নেওয়া যাক ঝরনাটিতে বা তার উৎসে ছিল দুর্লভ একটি ধাতুর খনি, বা ওইরকম কিছু, এমন কিছু যার জন্য জীবনের ঝুঁকি প্রায় কিছুই নয়। তারপর, চলতে চলতে, তুষারপাত, ধস আর হিংস্র জন্তুর আক্রমণের মতো কিছু ভয়াবহ ঘটনা ছিল। ইতিমধ্যে তাদের রসদ ফুরিয়ে এসেছে, ভূ-বিদ্যাবিশারদ অভিযাত্রীটি আর চলতে পারছিলেন না, তিনি ভেঙে পড়েন, অন্যরা ক্ষুধায় জ্বলছে। এরকম কয়েকটি ঘটনায় তারা পরস্পরকে খেতে শুরু করে, এক সময় সম্পূর্ণ দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তু একজন, সব থেকে ধূর্ত, পরিশ্রমী এবং ততদিনে উন্মাদ, একজন মাত্র মানুষ বেঁচে আছে।

রোমাঞ্চকর অভিযানের এরকম কত ঘটনা গল্প-উপন্যাসই না মানুষ পড়েছে। আজও পড়ে চলেছে। এর মধ্যে ধূর্ত পশুর হিংস্রতা যেন ওত পেতে আছে। এ কি ধারাবাহিকতা থেকে সরে যাওয়ার এক তীব্র, ঝাঁঝালো নেশা নয়? যদিও ধারাবাহিকতা যে কী, কেন, এইসব প্রশ্নও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আবার আসলে, এ তো ভালো-মন্দের কথা নয়, মানুষের মধ্যে কোনো প্রাচীন বুনো ব্যাপার লুকিয়ে আছে—এরকম এক ধরনের চিরায়ত সত্যেরও কথা নয়।

তাহলে কী?

ডালনেস।

আর হিংসার ব্যাপারটা?

এক ধরনের পাগলামি।

সেদিনটি ছিল বড়োই মেঘলা, দূরের রাস্তা, চ্যাপটা গাড়ি আর দ্রুত সরে-যাওয়া মানুষজনের শরীরেও যেন মেঘ লেগেছিল। শীতকালীন সন্ধ্যায় অমল একটি রেস্তোরাঁর গোল টেবিলের পাশে বসে, মৃদু আলোয় ভুলে যেতে পেরেছিল মেঘাবৃত শহরটি। রেস্তোরাঁর মৃদু আলো রচনা করে রেখেছে স্বপ্নের পরিবেশ, তার কলিগের নিশ্চিত স্বাধীনতা আছে যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার। তবু তাকে ভাবতে হল এই বিষয়টি প্রধান, না কি মিতা সরখেলের জীবনেই হিংস্রতার একটি বেদনার্ত পর্যায় আছে, যেমন তাকে একথাও ভাবতে হয়েছে হঠাৎ কেন, মিতা কেন এইসব প্রসঙ্গ আনছে।

মিতাকে দেখতে বেশ, সে বসেছিল কোমল উদাসীনতায়, নীল আলো তাকে ফালা করে চলে গেছে। টেবিলের ওপর মিতার পশমের ব্যাগটি ছিল কিছুটা যেন পরিত্যক্ত অবস্থায়। মিতা

ব্যাগটির কথা শুধু ভুলে গেছে তাই নয়, রেস্তোরাঁর বেতের চেয়ারগুলির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন তন্ময়ভাবে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে সে। সূর্যাস্ত বা একটি পূর্ণিমার রাতের কথাই মনে হওয়া সম্ভব মিতার প্রায়-অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া লক্ষ করলে।

আমরা এখানে মাত্র চার বছর হল এসেছি।

এই প্রবাসে?

বলতে পারেন।

হুঁ।

হায়দ্রাবাদে গেছেন কখনো।

না। হায়দ্রাবাদ, না, অমল যায়নি। সে আশা করছিল এরপর মিতা ভিন্ন এক শহরের রূপকথা শোনাবে। জানা যাবে সেখানে দারিদ্র্য নেই, সচ্ছল ও একা মানুষরা ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রতীরের বাঁধানো রাস্তায়, যেখানে চুম্বনের দৃশ্যও মিশে যায় প্রাকৃতিকতায়, গোটা শহরটিতে আছে মাদকতা, ইন্দ্রিয়ময়তা। 'জানেন, তবু কী যে বিষণ্ণ লাগত!' মিতা সরখেল এরকম কোনো উপসংহার না টানলেও, অমলের মনে হচ্ছিল ওই শহরেও এক গভীর বিষণ্ণতা আছে। শহরমাত্রে এইরকম যেখানে পরিবার এবং বন্ধুজন একসময় জট খুলে, কাচপাত্রের মতো ভেঙে, গড়িয়ে, এত টুকরো টুকরো হয়ে যায় যে দূরের নক্ষত্ররাজির মতোই তাদের সংঘবদ্ধ দেখালেও, আসলে তা এক গভীর ব্যবধান।

কলকাতা বড়ো রক্ষণশীল।

জানেন, বাংলা শিখতে আমার কী কষ্ট হয়েছে!

সব থেকে অসুবিধে বান্ধবীদের প্রশ্নে—

অমলের কিছুই করার নেই, প্রায় কোনো ভূমিকা নেই, যা বলার মিতা সরখেলই বলবে। কিছুক্ষণ ভিন্নতার একটা মেজাজ তাকে আকর্ষণ করেছিল, এখন নানারকম মন্তব্য, বিচার, মতামত আর বর্ণনা শুনে যেতে হবে তাকে। মিতা ক শহরের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে খুবই অসুবিধেয় পড়েছিল, শহরটির নাগরিকরা তার সামনে নিজেদের মধ্যে দুরূহ বাংলায় কথা বলেছে, আর মিতার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে ইংরেজিতে। বাঙালি, আধুনিক মেয়েরাও তার খোলামেলা চলাফেরা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছে। যদিও এখন, এতদিনে সে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। এখন আর তেমন সঙ্গ-কামনা নেই, যেমন কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না। 'দাদা লাউডন স্ট্রিটে যাব, কত নম্বর?'

বড্ড বেশি ভিখিরি না?

হ্যাঁ, দারিদ্র্য প্রায় এখানকার নিসর্গ।

কুচ্ছিত, সহ্য করা যায় না।

হুঁ।

আমি সুকান্তর কবিতা পড়েছি।

আচ্ছা।

নাটক দেখেন?

অবশ্যই।

অমৃত বসু অসাধারণ না?

সর্বকালে কলকাতায় এরকম একজন না একজন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন।

তাই।

যেমন ধরুন গিরিশ ঘোষ।

হ্যাঁ, শুনেছি।

এরকম কথা হচ্ছিল, সংস্কৃতি-সমাজ-সংবাদপত্র, নানা মাধ্যমে মিতা আর অমল চেষ্টা করছিল পরস্পরকে সঙ্গ দেওয়ার। অমলের শুরুর দিককার সেই অপ্রস্তুত ভাবটা আর নেই। বরং অনেকক্ষণ কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা না-করে মিতা এই যে কেবল ক শহরটি নিয়েই থেমে থেমে কথা বলছে, কফিতে চুমুক দিচ্ছে, অমলের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাচ্ছে আর এক ধরনের ভালো লাগার প্রতিফলন ঘটতে দিচ্ছিল, সেসবের কেমন জাদুকরি প্রভাব ছিল।

এখানে একা থাকতে বেশ অসুবিধে হয়।

হায়দ্রাবাদে হত না?

না।

কেন?

মিতা কী একটা উত্তর দিয়ে চলল, তাতে অমল হায়দ্রাবাদের কোনো বর্ণনা পেল না, এমনকি তার সেখানে একা না-থাকার পেছনে শহরটির আদৌ কোনো ভূমিকা ছিল কি না, তা-ও বুঝতে পারল না। যদিও সে সময় মিতার কথা বলা, চুল সরিয়ে দেওয়া, টেবলসল্ট হাতে ঢেলে নেওয়া আর একটি সিগারেট ধরানোর মধ্যে এমন একটা ভঙ্গি ছিল যাতে বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয় না যে সেই শহরটি ছিল অন্যরকম। এবং মিতা শহরটিকে ভালোবাসে। এই গ্রহটিতে যে ওরকম একটি শহর আছে, গ্রহটির পক্ষে তা কম গর্বের বিষয় নয়। আবার মিতা যে গ্রহটিকে ভালোবাসে তা কেবল এই শহরটিকে ভালোবাসে বলেই। যেন এই স্থানিকতা, গোটা পৃথিবীর বিশালত্বে, আলো-অন্ধকারের অকল্পনীয় এক বিশাল ভূখণ্ডে যেন এইটুকুই জীবন, তারপর সব অনিশ্চিত।

ভয় করবে কেন?

এখন তো বেশ লাগে।

সম্ভবত অমল ক শহর সম্পর্কে মিতার অভিজ্ঞতা শুনতে চেয়েছিল। মিতা হাসছে, 'বাহ্ রে।'

চার

এখানে, কংক্রিটে সব কিছু কপি হয়েছে, যা কিছু বস্তুবাচ্য। তাদের ওজন ও অবয়বের নিখুঁত এক নকলের জগৎ। গুহা, কুটির, ছাতা আর জাহাজ। আছে দোতলা বাস এবং দেশলাই বাক্স এবং একটি উড়োজাহাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ইট, কাঠ, সিমেন্টই তাদের মূল ভাষা, প্রাণ ঢেলে এই ভাষায় তারা এক ব্যাপক নির্মাণকার্য চালিয়েছে। বিশ্রামের জন্য তারা

গড়ে তুলেছে একটি আরামঘর, সেখানে স্থাপন করেছে ঢেউ তোলা কংক্রিটের চেয়ার, প্রতিটি ঘরের মেঝের লেভেল আলাদা আলাদা; এতে করে শব্দ চলাচলে বাধা এসেছে, আছে গ্রিলের জানলায় সবুজ লতাগুল্ম। প্রতিটি বাড়িতে মানুষের সমবেত হওয়ার জন্য আছে বিশাল হলঘর, কদাচিৎ এই হলঘরে আলো জ্বালার প্রয়োজন হয়। শয়নগৃহের চওড়া দেওয়াল আর জানলার পর জানলায়, দোতলার ঘর, প্রতি রাতে ভেসে যেতে পারে নীল আলোর স্রোতে, ভাসেও, রাত্রিবাস ভাসে।

উপনগরীটির এই গৃহসৌন্দর্য, এত আশ্চর্য আকার এবং বস্তুর পিছনে যে ইতিহাসটি আছে তা কি গৃহহীনের? তারা কি সুদীর্ঘকাল আলো আর অন্ধকারের একটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে, আশ্রয় পায়নি, কোথাও বিশ্রাম করার সুযোগ ঘটেনি, রাতের পর রাত শুধু জেগে কাটিয়েছে? তারপর একবার লক্ষ্যে পৌঁছতেই মানুষ যা যা করতে পারে সেসবের এক দৃশ্যময়তা রচনা করেছে নিজেদের শয়নগৃহ দিয়ে। সেসব কেমন নিখুঁত মানবিক অভিব্যক্তি আর ব্যক্তিত্ব রচনা করে নিজেরা চলে গেছে সম্পূর্ণ আড়ালে আর শরীর-মনের সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে আস্বাদন করছে স্বস্তি। অথচ গুহা থেকে জাহাজ পর্যন্ত এই যে দৃশ্যের জগৎ, এই প্রত্যক্ষতা কে অস্বীকার করবে।

রঙিন পর্দা আর বেডকভার এমন কিছু নয়, বেতের চেয়ার কিছু নয়, যদিও উপনগরীটির পুরুষ এবং নারীরা তাদের আবেগ প্রবাহিত হতে দিচ্ছে ওইসব জিনিসের দিকে। তারা দ্রব্যময় হয়ে উঠছে। একা বা যখন দু-একজন অতিথি আসে, সবসময়ই ঘর-বারান্দা-সিঁড়ি আর বাথরুম সমেত তারা নক্ষত্র হয়ে ওঠে, বা উড়তে থাকে। চোখ নিমীলিত, আনন্দময় মিলনের এক অবগাহন সেরে উঠল যেন। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরে কী করে তারা খোকা-খুকি হয়ে যাচ্ছে? বস্তুত, তারা দুর্দান্ত খেলা শিখেছে। অথচ ওই বয়সের পুরুষেরা মৈথুনে উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও অন্য সময় তাদের বার্ধক্য ছাড়া কিছু নেই। শহরের নরনারীরা যে এতখানি বদলে যেতে পারে, এই উপনগরীটিতে না আসলে বোঝা যাবে না।

অতিসাধারণ একজন মানুষ, অমলের মতো মানুষ, অস্থির হয়ে ওঠে। সে আর উর্মিলা এখন চূড়ান্ত নিভৃতি নিয়ে কী করবে? এখন, এতদিনে, তারা নিঃশেষিত করে ফেলেছে নিভৃতির প্রয়োজন। একজনের কঠিন বা কালক্ষয়ী, শয্যাশায়ী ব্যাধিতেই একমাত্র এই নিভৃতি প্রাণ পেতে পারে। অন্যথায় তা মৃত। অথচ তাদের কোনো অসুখ হয়নি। বয়স হয়ে যাওয়া কি অসুখ? আর লবণহ্রদের যেসব নারী বয়স-হওয়াটা ঠেকিয়েছে, চনমনে শরীর ধরে রেখেছে বলে মনে হয়, তারা তো কাপড় আর গয়নার দোকানের ডামি।

মানুষ কি সবসময় গোমড়া হয়ে বসে থাকবে?

হাই তুলবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলবে শুধু?

এরকম সামান্য সামান্য যুক্তিতেই অমল নড়বড়ে হয়ে যায় তবু উর্মিলাকে বলতে পারে না, 'তাহলে তুমি কেন...।' কারণ সে তো সত্যি উর্মিলার হৃদয় দেখতে পায় না, তারা কেউ কারো হৃদয় দেখেনি কোনোদিন। কেউ কি কখনো দেখেছে?

বিধুবালা যে-ধরনের অতীতচারী তাতে অতীত সবসময়ই এক স্বর্ণযুগ। সে বলবে তখন হৃদয় ছিল। যেমন সে বলবে, ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র বিনাশ। তবু তার বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধে হয় না, অতি দ্রুত সে শিখে নিয়েছে ফ্রিজ আর গ্যাসের ব্যবহার, এখন তাকে দেখলে মনে হয় না একদিন সে উনুনে কাঠ ঠেসে ধরত, বা কাঁথা সেলাই করেছিল টুবাইয়ের জন্য। উনুন আর কাঁথার গল্প তাই ততখানি গুরুত্ব পাবে না, বরং বিধুবালার যত বেশি বয়স হয়েছে, যতই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, ভবিষ্যৎ ততটাই মুছে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তরেখায়। বিধুবালার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিধুবালার পৃথিবীটিও মৃত হয়ে যাবে।

মিতা সরখেলের সঙ্গে অমল নিজের একটি অদ্ভুত মিল আবিষ্কার করেছে। তার কাছেও এই শহরটি যেন এক অণু-পৃথিবী। এ যেন নবজাতকের দৃষ্টি, চোখ মেলে যতটুকু দেখতে পেল, দেখল, তা-ই সমগ্র হয়ে ওঠে। সে অর্থে অমল আর মিতারা আজও নবজাতক, হয়তো ঊর্মিলা, সুভদ্রারাও বাদ যাবে না, অমল নিশ্চিত নয়।

'তুমি কি আজ বেরোবে? আজ ছুটি? কখন? ওঠো। যাও। তখন থেকে গড়াচ্ছ! আবার আমাকে আটকানোর চেষ্টা...ভালো হবে না। এতবার চা দিতে পারব না। স্নান করে এসো। ওঠো। কী হল। ধ্যাত...'

এইসব আলস্য অমলের শরীর থেকে ধোঁয়ার মতো উঠে আসছে। ফ্ল্যাটটি তখন রোদে ঝলমল করছে। অমল ভাবছে বড়োজোর একটা ফোন করা যেতে পারে, হঠাৎ শরীরটা... পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট হবে। কারণ, সে তো জানে ওই অফিসটির অমলকে তেমন প্রয়োজন কিছু নেই, ওদিকে নিয়ম অনুসারেই সে চলেছে, প্রাপ্য ছুটির সংখ্যা তো কম নয়। ক শহর যে-বিষয়ে খুবই সজাগ তা হল নিয়ম, একমাত্র নিয়ম। আজ সে একা একা, উদ্দেশ্যহীন হাঁটবে ফুটপাত বদলে বদলে। অজস্র মানুষকে লক্ষ করবে, তাদের চরিত্র আর জীবন সম্পর্কে কল্পনা এবং অনুমানের চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠবে।

বোঝার চেষ্টা করবে এই উপনগরীটিই ক শহরের ভবিষ্যৎ নকশা কি না। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে যে ত্রিশ দফা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা আরও অনেক নিষ্প্রাণ লবণহ্রদ উপহার দেবে?

আপনি কখনো কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন?

না।

এস এফ?

না, সেভাবে করিনি, তবু মনে হয় করেছি।

আশ্চর্য।

শেষপর্যন্ত একটি এলোমেলো দিনে অমল থেকে যেতে পারেনি, সে দিনটিকে নিজের দিক থেকে সংগঠিত করে নিতে চেয়েছিল বলে, টুবাইয়ের গালে একটি সশব্দ চুম্বন করে সুখী পিতার মতোই অফিসে চলে আসে। অফিসে এসে টাইপরাইটারের আড়ালে বসাই তার পছন্দ, সম্প্রতি যেখানে মিতা সরখেলও একটি চেয়ার টেনে এনেছে।

'আশ্চর্যের কিছু নেই, এসব ব্যাপারে শহরটার এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যার বাইরে থাকা

একেবারে অসম্ভব। এখানে জন্মালে, বেড়ে উঠলে কিছুটা এসব আপসে পাওয়া যায়। তবে আবেগ-অনুভবের একটা পার্থক্য থাকতেই পারে। তা ছাড়া, আমি মনে মনে ওদের সমর্থক ছিলাম।'

প্রসঙ্গটি এভাবে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ বীরেশ্বরবাবু রিসিভার তুলে বিদঘুটেভাবে চিৎকার শুরু করলেন 'হ্যালো...হ্যালো'। ওই চিৎকার, বীরেশ্বরবাবুর বিপুল শরীর ভয়ংকর বিরক্তির জন্ম দেয়। তবু সহ্য করতেই হবে, কেন যে এরা ভদ্রলোকের বাড়িতে মাসের প্রথম দিন খামটি পাঠিয়ে বলে না যে, রিটায়ার করা পর্যন্ত আপনাকে কষ্ট করে অফিসে আসতে হবে না, বরং সারাজীবন যে প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন আপনি, সেই প্রতিষ্ঠান আপনার বার্ধক্যের দিনগুলিতে এটুকু করতে পারলে ধন্য হবে। শুধুমাত্র নিয়মের জন্য এই ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে প্রতিদিন। বীরেশ্বরবাবু অফিসে এসে ঘণ্টায় চারটে করে ফোন করেন। মাঝে মাঝে, লাইনের এপার থেকে বলে ওঠেন অদ্ভুত সব অসুখের নাম; বিনিয়োগ, বিমা ইত্যাদি বিষয়েই কথা চলে বেশি। জটিল আর পুরোনো নানান ব্যাধির বিবরণ শোনা যায়।

পাঁচ

সূর্য যখন প্রকৃতই মধ্যগগনে, তখন ক শহরে পথচারীরও কোনো ছায়া থাকে না। রোদ এই শহরে প্রচুর, প্রায় একমাত্র ঐশ্বর্য। তবু এইরকম খাড়া, নগ্ন সত্যের কোনো প্রভাব নেই। জীবন যাতে বেশ সড়োগড়ো হয়ে যায়, কোথাও কোনো খিঁচ না থাকে, সেজন্য অফিসকাছারি থেকে পিতামাতা-স্বামী-স্ত্রী-পুত্রকন্যা আর বন্ধুবান্ধব সব্বাই, কপটতাকে প্রায় জল করে ফেলেছে। এবং আশ্চর্যের কথা, কিছুতেই এই জল ঘোলা হয় না, কেউ তাকে অস্বীকার করে না। সেইরকমই দর্শক ব্যাপারটি। সকলেই দর্শক, তারা দেখে যাচ্ছে শুধু নয়, আবার চিৎকার করে প্রচার করে যাচ্ছে এই বাণিজ্যিক দার্শনিকতা। রাষ্ট্র, সংগঠিত সংস্কৃতি, সম্পর্ক—সবকিছুই যেন সিন-সিনারি। একটি নিষ্ক্রিয় ভ্রমণ ঘুমের বড়ির মতোই সুখদায়ী। অমল, যেন এক ছিন্নভিন্ন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতার পর, এখন এসে দাঁড়িয়েছে সুখের একটি ফোয়ারার কাছে।

বাতানুকূল, খাড়া অফিসটিতে একদিন সে যে প্রীতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছিল, তা যে আসলে একজন দরিদ্র মানুষের সচ্ছল এবং কাল্পনিক সুখের প্রাসাদে প্রবেশেরই ঘটনা শুধু নয়, যোগ্যতা অনুসারে উপার্জনের অতি সাধারণ এবং স্বাস্থ্যকর পরিমণ্ডল মনে মনে রচনা করে নেওয়া, এই সত্যটুকু ওই প্রচার অফিস অজস্র স্পেসকে বিভিন্ন খুপরি, দরজা, গলি, দরজা আর খুপরিতে এমনভাবে চালান করেছে যে সে আর নেই; ওই সরল সত্যটুকু নেই।

তার বদলে ছিল কয়েকজন কলিগ, দেখামাত্র মুচকি হাসতে হবে এমন গুটিকয় মুখ, বহুবার আলোচিত দু-চারটি বিবর্ণ বিষয় আর এক ধরনের বিষণ্ণতা। মাত্র দেড় বছরে, এখানে, একজন মানুষ, বিশ বছরের মেয়াদ খাটা কয়েদখানা টের পেতে পারে। অমলের ক্ষেত্রে যে ঠিক এরকম অনুভবই হয়েছিল তা বলা যায় না। অমলের একটি মুদ্রাদোষ আছে, সে থেকে থেকেই নাক চুলকে নেয়। এই পুরোনো মুদ্রাদোষটি গত দেড়-দু বছরে ভয়ংকর বেড়ে গিয়েছে। আগেকার শ্রম আর ক্লান্তির বিনিময়ে সে পেয়েছে প্রচ্ছন্ন অবসর। ফলে প্রকৃত অর্থে কাজ নেই

কিন্তু তার কাজের বাহানা এমন এক আঙ্গিক পেয়েছে, ব্যস্ত ব্যস্ত ভাব এসেছে, লিখতে হচ্ছে অর্থহীন বাক্য, পরস্পর সম্পর্কহীন তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে এবং গোটা জিনিসটাকে এমন এক অলীক সরলতায় উপস্থাপন করতে হচ্ছে যে সেসবের পৌনঃপুনিক ব্যবহার খুঁটিয়ে দেখলে, পাওয়া যাবে বড়োজোর হাজার খানেক শব্দ। এমনকি ভাষায়ও এসেছে ব্যাপক মুদ্রাদোষ।

প্রায়ই তার কলিগ থেকে সম্পাদক পর্যন্ত, কেউ না কেউ বলবেই 'আপনার স্টাইলটা (বলতে চাইছিল 'ডাইস-টা') দারুণ', 'নাম না থাকলেও বোঝা যায় আপনার লেখা', 'আচ্ছা, আগেকার লেখা তো এত ঝরঝরে হত না', 'এ যেন জলের মতো'।

জল যে কত বিধ্বংসী হতে পারে, অমল অনুভব করেনি। দৃশ্যত জল বড়োই নিরীহ, ঠান্ডা। বরং সে আগুন হলে বুঝতে পারত, আগুনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, যদিও ততটুকু দূরত্ব ছিল যাতে আগুন প্রতিহত করা যায়, আগুন অভ্যাস না হয়ে যায়।

বুঝলে অমল।

ব-লু-ন!

শহরে এখন বাড়ি করার ধুম পড়েছে।

হ্যাঁ, দেখছিলাম।

ব্যাঙ্কে চাকরি নাও আর বাড়ি বানাও, বুঝলে।

শুধু ব্যাঙ্ক কেন।

তা অবশ্য ঠিক, শুধু ব্যাঙ্ক কেন।

পরমুহূর্তে তারা সরে যেতে পরে বিষয়ান্তরে, একের পর এক নেতি দিয়ে ছোট্ট 'হ্যাঁ' শব্দটি গড়ে তোলে, তাতে এই জীবনের প্রতি ভয়ংকর একটি 'না' উপহার দেওয়া সম্ভব হয়, এমনও নয়। বরং নিজেদের শরীরের রক্তের মধ্যে, ধীরে, ডুবে যেতে থাকে, রক্তের উষ্ণতার মধ্যে বেঁচে থাকে। এই ইন্দ্রিয়ময়তারই প্রচারকেন্দ্র অফিসটি, যা নাতসি রেডিয়োর কোনো কুখ্যাত ঘোষকের কণ্ঠস্বর নয়, কারণ 'স্বাধীনতা' 'ভালোবাসা' ইত্যাদি শব্দও রোজ ছাপা হচ্ছে। নাতসি রেডিয়ো থেকে কি ওইসব শব্দ ছেঁটে ফেলা হয়েছিল? সম্ভবত না।

আচ্ছা, এই প্রচারের ব্যাপারটা...

কোন প্রচার বলুন তো।

ইয়ে, মানে প্রচার অ্যাজ সাচ...

ভ্যা...ভ্যা...ভ্যা...

আর এক দিন হয়তো কথাবার্তা বদলে গেল একটু—'হ্যাঁ মশাই, গণতন্ত্র তো একটা পরিভাষা, তাই নয় কি', 'সে তো বটেই', 'অবশ্য শব্দটা আমার কাছে কেমন ছবি হয়ে আসে', 'শুধু আপনার কাছে কেন, দুনিয়াসুদ্ধু লোকের কাছেই, আপনার কি আলাদা ছবি', 'হ্যাঁ হে, আমার ছবিতে দেখবে শুধু এক সাইজে নিয়ে আসা গাদা গাদা বেঁটে লোক', 'আপনি মশাই ফ্যাসিস্ট'।

এভাবে ইয়ার্কি, হালকা আর গভীর কথাবার্তার প্রতিটি দিনের, কোনো ঘটনাগত দিনপঞ্জি রচনা অসম্ভব। হয়তো কুড়ি-তিরিশ দিনের একটি অনুচ্ছেদ লেখা যেতে পারে। তাও আবার

বড়োজোর তিন-চার বার। কেননা, জীবনের দিক থেকে ভাবলে শহরটি ছিল অসম্ভব রকম বন্ধ্যা, ব্যক্তিরা হয়ে পড়েছিল সৃষ্টিবিহীন। আর ওই মরুভূমিতে, মুখস্থ কথার, অনুভবহীন প্রসারিত হাতের মধ্যে তবু যেন ফুটে যাচ্ছে অজস্র কমল, এইরকম তাদের বিশ্বাস। 'গণতন্ত্রে নায়কের কোনো স্থান নেই' তারা বলেছিল আর অমল ওই বাক্যটিকে তৎক্ষণাৎ জাপটে ধরে। ভাবে, এখানে আজও উষ্ণতা আছে। তারপর তাকে জেনে যেতেই হয় যে একজন নায়কের মৃত্যু হল ঈশ্বরের মৃত্যু। এবং এরকম একটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ পেতে পারে বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তর, কিন্তু সে প্রান্তরে জ্যান্ত মানুষ ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার নেই। তা নিছক আরাম বা সুখ নয়, অভিজ্ঞতার এক তরঙ্গমালা। দুর্ভিক্ষ নিয়ে অমলের ভয়ার্ত চিন্তা এখন আর নেই যেমন, তেমনি দুর্ভিক্ষ নিজে সরে গিয়ে পৃথিবী শস্যশালিনী করে তোলেনি। বরং উন্মুক্ত আকাশের নীচে, খোলা দিগন্তগ্রাসী প্রান্তর শুধুই মৃতের হাড়। এবং এই প্রান্তরটি, শহর লুকিয়ে ফেলেছে নাগরিকগণের টুপির তলায়।

ছয়

এভাবে, একবার সমস্ত চিত্রময়তা আর প্রমাণ বিলুপ্ত করে দুর্ভিক্ষ বিমূর্ত হয়ে যাওয়ার পরই প্রকৃত অর্থে অমল ভুলে যেতে পারে ক শহরের ওই গভীর ক্ষতটি, যেখানে যন্ত্রণার মধ্যে নত বিক্ষুব্ধ প্রাণ ছিল, ছিল অতিকোমল, অন্তহীন স্পন্দনের আঁকাবাঁকা ঢেউ।

মোহিত দাশ আজ ভোরের ট্রেন ধরেছে, সে উঠেছিল প্রায় মধ্যরাতে। মোহিতের মালপত্তর যত কমই হোক, সব একা সামলাতে হচ্ছে বলে পরিশ্রম কম নয়। মোহিতের ঘরে কয়েকখানা বইও ছিল। ইশতেহার আর রূপকথার গল্পের বই তো সবসময়ই থাকত। এ ছাড়া একজন মানুষের শোওয়া-বসা-খাওয়ার জন্য যতটুকু জিনিস না হলে চলে না সবই ছিল ভাঙা দেওয়ালের লম্বাটে ঘরটিতে। ঘরটি একটু বেয়াড়া রকম লম্বা বলে ওই ঘরে মোহিত এত বেশি স্পেস পেয়ে যেত যে, পায়চারির অভ্যাস গড়ে তুলতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত।

বিশাল এই বাড়িটির অতিবিশাল জীর্ণতা থেকে মোহিতের চলে যাওয়া অভ্যাসবশত কিছুটা করুণ রস সৃষ্টি করেছিল। মোহিত চলে গেল বলে মোহিত সম্পর্কে সকলেই দু-চার কথা বলছিল, বলবেও, এক ওই পল্টু ছাড়া। পল্টু আসলে বাড়িটিতে থাকেই না, একমাত্র খেতে আসা আর রাতের ঘুমেই পল্টুর কাছে বাড়িটির যতটুকু অস্তিত্ব। সে বাড়িটিকে ব্যবহার করে শুধু।

মোহিত বিন্দুমাত্র বিমর্ষ হয়নি, সে চলে গেছে একজন বিশ্বাসী মানুষের মতো, সম্পূর্ণ অ-নাটকীয়ভাবে, এমনকি নাদু মিস্তিরকে বলেছিল খুবই বাস্তবসম্মত একটি কারণ। কারখানা লক-আউট হয়ে গেছে, কবে খুলবে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, বহুদূরে একটি খনিতে একজন ঠিকাদারের সঙ্গে মোহিতের ভাব আছে। সে সেখানেই চলেছে।

মোহিত কেন যে তার গোপন কথা অমলকে বলে যায় সে এক বিস্ময়। আবার মোহিতের গোপন কথা জানার পর অমল আশ্চর্যরকম দায়িত্ব অনুভব করছে। ঠিক এরকম কোনো অনুভূতির অভিজ্ঞতা অমলের ইতিপূর্বে ছিল না। সে, বলা যায়, এমন অনুভূতির সন্ধানই জানত না।

হয়েছে কী, মানে, মন লাগছে না।

কিন্তু যেখানেই যান...

তবু, আমি শহরটাকে সহ্য করতে পারছি না। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, এমনকি ঘুমের মধ্যে, কেমন যেন গিলে ফেলছে আমাকে।

কমরেডদের সঙ্গে কথা বললেন?

না।

সে কী!

তাহলে বলি, একটা পার্টির দু-চারজন নয়, হাজার হাজার কর্মী আছে। আলাদা আলাদা ভাবে তারা নিজের নিজের মতো করে দলের মত, পথ এসবে বিশ্বাস করে।

হুঁ।

কিন্তু গোটা জিনিসটা যদি শেষ পর্যন্ত ওই হাজার হাজার থেকে আলাদা একটা শক্তি হয়ে ওঠে, মানে ধরুন, পার্টিটা হয়ে গেল মাথা, আর আমাদের মাথাগুলো কেটে ফেলা হল...

ভয়ংকর।

এখন, আমি কার সঙ্গে কথা বলব?

তাই বলে...

এখানে থাকলে রোজই আমাকে এইসব দেখতে হবে, নিজেকে মনে হবে হেরো, না হয় ঠকে-যাওয়া লোক, আমি মরে যাব। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস তো ভাঙেনি, মুখস্থ বুলি আউড়ে যাওয়ার অভ্যাসও হয়নি। বরং পঁয়তাল্লিশ বছর প্রত্যেক দিন, তিল তিল করে আমিই ছড়িয়ে গিয়েছিলাম অনেকের মধ্যে। মারধোর, অপমান, জেল...। এখন এই ছড়িয়ে-পড়ার গোলমালটা বুঝতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস ভাঙেনি। প্রোগ্রামের ব্যাপারে এখন সন্দেহের সঙ্গে ভয়ও এসেছে। প্রচার বড়ো সাংঘাতিক জিনিস, তা সে বুর্জোয়া কাগজই করুক কিংবা কমিউনিস্ট পার্টি। এতে যত্ন লাগে দাদা। যেভাবে, ধরুন, টুবাইকে আপনি জেনেশুনে মিথ্যে বলতে পারবেন? না জানলে চুপ করে যাবেন, ওর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি মনে হয়, না, বরং এ জিনিসটা টুবাইর ঠিক সময়ে নিজে নিজে বুঝে নেওয়াই ভালো, তাহলে এড়িয়ে যাবেন, এই ভালোবাসাটা...

মোহিত দাশের অবিবাহিত জীবন, সম্পূর্ণ একা একা বেঁচে থাকাই হয়তো তার মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে ভালোবাসার তীব্র আগুন। তবু মোহিত যখন একজন মানুষের হাতে নিজের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনের তাপ ঘন স্পর্শ রেখে যেতে চাইছে তখন তাকে প্রশ্ন করা একরকম বাধা দেওয়াই, অমল তা করতে পারে না।

আমি জানি না ঠিক কীভাবে বলা যায়, ধরুন, স্বপ্নের কথা, স্বপ্ন আর প্রোগ্রামের মধ্যে...

সম্পর্ক...

হ্যাঁ, সম্পর্ক, গোলমাল লাগে, বদমাইশি আছে, তবে সেটা তেমন কিছু নয়, আসল গণ্ডগোল ওই স্বপ্ন আর কর্মসূচির মধ্যে সোজা কোপ মারা হয়েছে, মানে...

ব্যবধান...

ব্যবধান কী বলছেন—দুটো আলাদা জগৎ...

আপনি একা কী...

কী করতে পারব আলাদা কথা...

মোহিত দাশ ওই আলাদা কথাটি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু ভাবেনি। সে ওই ব্যাপারে তেমন টানই অনুভব করছে না। সে শুধু ভাবছে, তার শরীর-মন-অস্তিত্ব দিয়ে ভেবে যাচ্ছে একটি ধ্বংসস্তূপের কথা। এই ভাবনায় রোমন্থন কিছু নেই, বরং তা তাকে দুর্দান্ত চঞ্চল করে তুলেছে। শোকসন্তপ্ত মানুষ আর উন্মাদ প্রেমিক মানুষের এক সমন্বয় ঘটেছিল মোহিত দাশের মধ্যে। সে চলে গেছে। ঘরটিতে এখনও তালা লাগানো হয়নি, সেখানকার বাতাসে মোহিতের বসবাসের গন্ধও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি, তবু এখন তা শুধু একটি ঘর, আলো, অন্ধকার আর গন্ধ।

তৃতীয় ভাগ

ক শহরের হাসপাতাল, সমস্ত হাসপাতাল তিনদিন বন্ধ হয়ে আছে। শহরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে, পক্ষে বিপক্ষে মানবতার এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল শহরের ওপর দিয়ে, যদিও ধর্মঘট মিটে যাওয়ায় সংবাদপত্রে সরকার পক্ষ আর আন্দোলনকারী ডাক্তাররা পরস্পরের প্রশংসা করে বিবৃতি দিলেন। ক শহরের বৃহৎ দুটি ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজো আর মহরমের মধ্যেই এই বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটায়, সকলে আরও খুশি। যদিও জীবনদায়ী ওষুধ এবং চিকিৎসার মূল্যবান যন্ত্র আর উপকরণের অভাব আগে যা ছিল ধর্মঘটের পরেও তাই আছে। সমগ্র জিনিসটির রিপোর্ট লিখতে মানবতাবাদই এমন ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করল যে, অফিসের এক প্রবীণ ব্যক্তি, যিনি মানবতা আর গণতন্ত্র বিষয়ে সারা জীবন লিখেছেন, ভেবেছেন, সে-ই বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাকে। এবং এমন একটি গোলমেলে বিষয়ের প্রতিবেদন রচনার যে বিমর্ষতা, তা অমলের ছুটির আনন্দ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়, সে টুবাইকে নিয়ে এক দিনও বেরোতে পারেনি, হাটখোলার ঠাকুর দেখতে যাবে বলে ঊর্মিলা বেশ সেজেছিল অথচ যাওয়া হয়নি। ঊর্মিলার কাছে এ-বিষয়ে ওই না-যাওয়াটাই মনে থাকবে, যেমন অমল বহুদিন ভুলতে পারবে না তার নিজের বিরক্তি।

'এই ফুরিয়ে যাওয়াটা—' কে যেন বলছিল। বলছিল যে আসলে একটা যুগ শেষ হয়ে গেছে। শহরটির স্বাধীনতা-উত্তর যে অধ্যায় তা বহু আগে ফুলে, ফেঁপে শেষ হয়ে গেছে। যে বলছিল অমল ঘাড় ফেরালেই তাকে দেখতে পেত, তবু সে চেষ্টা করল না, ধরে নিল কেউ একজন, কোনো রহস্যময় কারণে তার কলিগদের বিবেক হয়ে উঠেছে। এবং একটু পরেই হয়তো সে ব্যক্তি তাদের মুখপাত্র হয়ে উঠবে; নাহলে একজন যুক্তিবাদী সমালোচক। এইসব ভূমিকা কিছুক্ষণের, গোলা সময় থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার এই চেষ্টা মানুষের আয়ু পাবে বড়োজোর। যেমন মানুষের সত্য নিয়ে একটা বাতিক আছে, কিন্তু ক-জনই বা পারে জীবনের মাদকতা আর নেশার মধ্যেই তা আস্বাদন করতে।

'ভারতের দ্বিতীয় কুমেরু অভিযান এখনও গভীর জলে', 'চট ও চা শিল্পের সমস্যা খতিয়ে দেখতে কমিটি', 'ইরানে কোতল', (না কি 'কতল' হবে), 'এরশাদের ঘোষণা'; কপিন কালিতে মুদ্রিত এইসব কাগজ টেলিপ্রিন্টার ক্রমাগত উগরে দিচ্ছিল, দু-তিনজন মানুষ ঘটনার-ঘটনার-ঘটনার পিছনে ধাওয়া করতে করতে, সজাগ থাকার চেষ্টা করতে করতে, জিভ উলটে ওপরের ঠোঁট ঢেকে ফেলেছে প্রায়, চিৎকার করে উঠছে : গাঙ্গুলি! বোসদা! টেস্টটিউব বেবির স্টোরিটা কবিকে দে!

কেরানির গল্পে পৃথিবীর কোনো মানুষেরই আর উৎসাহ নেই। একজন সাংবাদিকের জীবনকাহিনি তো সেরকমই একঘেয়ে অথবা বানানো যুদ্ধের এক অলীক রোমাঞ্চ। তবু এত সব ঘটনার আগমনে এবং অন্তর্হিত হওয়ার মধ্যে সংখ্যাগত সমস্যাটি থাকায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রে বিন্যাসের পার্থক্য ঘটে, যে পার্থক্যের জন্য প্রতিদিন কাগজটি নতুন, বিস্ময় আর

উত্তেজনায় না হলেও ঘটনাবলির দিক থেকে তার সঙ্গে প্রকৃত অর্থে প্রতিটি দিনের কি কোনো সম্পর্ক আছে? আবার সংবাদপত্র ছাড়া বর্তমান কাল বলে কিছু নেই যেন। অমল এ-ধরনের ধন্দে জড়িয়ে পড়েনি, এ তার চাকরি, প্রতিটি দিনের আট-দশ ঘণ্টা মাত্র। দিনের বাকি অংশই বরং গুলিয়ে যায় খুব, আজকাল তো এই দুটি অংশ পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে বেশ ফ্যাসাদে ফেলে দিচ্ছে।

পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী মিছিলটা কাল দারুণ হয়েছিল।

মিতা সরখেলের হাত দুটি এখন দু-দিকে এতটাই বিস্তৃত যে মনে হচ্ছিল সে তার বুকটি তুলে ধরছে, কাকে যেন আলিঙ্গন করতে চাইছে। তার দিকে তাকালে ভালো লাগে, বেশ আনন্দ হয় বলে, অনেককেই মিতার দিকে ফিরতে দেখা গেল। যদিও তারা এইসব পারমাণবিক গুজবে বিশ্বাস করে না। অন্য কেউ এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তারা চটপট বলে ফেলত : এ হচ্ছে আমদানি-করা ইস্যু; ব্যাপারটা তো ছিল ক্ষমতার মহড়া আর একটু মানবতার ঝান্ডা আগে তুলে ধরার কৌশল।

মিতার কাছে অফিসের কেউই প্রায় সিনিক হতে চায় না, বা এমন কথা বলতে চায় না যাতে হেরো কিংবা খিটখিটে লোকের মেজাজ ধরা পড়ে। বরং তারা প্রাণশক্তিতে পূর্ণ, উচ্ছল যুবক এক এক জন। তাদের এমনকি কোনো একটি মহান আদর্শও আছে।

ভাবা যায় না গ্রহটাকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে!

আমাদের বাঁচার জন্য এই একটিমাত্র গ্রহ আছে!

ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, একটিমাত্র গ্রহ—

মিতা সরখেল বিড়বিড় করে চলেছে, তার কাছে গতকাল এটিই একমাত্র ঘটনা, যা সংঘটিত হয়েছে, যার পশ্চাদ্‌ভূমি আছে। মানুষের বেঁচে থাকা আছে। সে বেঁচে থাকাটাকে গভীরভাবে ভালোবেসে, ফলে সমসাময়িকে এই যুদ্ধ বিরোধিতায় মিতা লক্ষ করছে সংগ্রামের আশ্চর্য গীতিময়তা। যদিও শহরের দফতরগুলিকে কবজা করার উদ্দেশ্যে গঠিত দলটিকে মিতা একরকম ঘেন্নাই করে। তার কাছে দলটি কিছু নয়, এমনকি গতকালের মিছিলেই যাদের কাছে এই যুদ্ধ বিরোধিতা নিঃশেষিত, তারাও কিছু নয়। সে ভাবে, ভাবছে এক হিংস্র যুদ্ধের কথা, গ্রহটির আবহমণ্ডল দূষিত হয়ে যাওয়ার কথা, এক বিধ্বংসী মৃত্যুর কথা। সে শিউরে উঠছে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক শহরের একটি কঙ্কালের আশঙ্কায়। শ্রেণিহীন, সমাজহীন গ্রহব্যাপী মানুষের স্পন্দন তখন শুধু রক্তমাংসে তালগোল; জলে, কাদায়, আগুনে মাখামাখি এক ভূপৃষ্ঠ শুধু।

আপনি খুব আবেগপ্রবণ!

আফটার অল মেয়ে তো!

শহরের বিদ্যুৎ দফতরের কেন্দ্রীয় অফিসটির পিছনের রেস্তোরাঁয়, সে আর মিতা মুখোমুখি, তখন তাকে বলতেই হল : দেখুন, আমি কোনোদিনই গ্রহটির ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিয়ে ভাবিনি, ভিয়েতনামে যেদিন নাপাম বোমা ফেলা হল আমি সেদিন পরীক্ষার হলে নম্বর বুঝে বুঝে উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।

আমি তো তখন ইজেরও ছাড়িনি।

হুঁ।

তবু।

একগাদা বিষয়ে মাথা ঘামাতে...

কিন্তু...

হ্যাঁ, এটা বেশিরভাগের কাছেই টপিক মাত্র, কথা বলা আর মুভ করার একটা বিষয়। আপনাব কি মনে হয় না—সত্যি যদি মানুষেব কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন হিসাবে এটা দেখা দিত তাহলে...

সেটা কি একদিনে হবে?

আপনি রুটিন অনুসাবে চলতে বলছেন, আমার আর সেটা আসে না। আসলে আমাব ধারণা, দু-চারজন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, এবা ছাড়া এই আণবিক বোমার ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করে না। এতদিন বেঁচে আছে বলেই হয়তো, বাঁচার এমন একটা বিশ্বাস এসে গেছে . আপনার ছেলে যদি কোনোদিন আপনাকে প্রশ্ন করে যে বাবা তোমরা কী করেছিলে.. তখন আমি মিতা সরখেলের কথা বলব।

ডোন্ট বি সিলি।

সত্যি।

দুই

গাগু, একটা গল্প বলো না, ও গাগু.. গাগু...

রাজার গল্প?

হ্যাঁ।

বেশ, এক ছিল রাজা..

কোথায়?

এক দেশে।

দেশ কী গাগু?

দেশ নয়, শহর—

প্রশ্নোত্তরমালা সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ যাই হোক-না-কেন, এক সময় বিমলবাবুকে গল্পটি শুরু করতেই হয়, মানুষ আর রাক্ষসের গল্প। অনিবার্যভাবেই অসাধ্যসাধনের এক ভূতুড়ে উপাখ্যান শুরু হয়ে যায় এরপর।

'অফিসে যাও না কেন, গাগু', 'তোমার অফিস নেই', 'তোমার অফিস কী হল', 'ও গাগু বলো না', 'তুমি ঘুমোচ্ছ কেন', 'বলো না গাগু'...

বিমলবাবুর নিশ্চিত একটি ভূখণ্ড আছে, জল-জলা-প্রান্তর-বৃক্ষ-শেষহীন-আকাশ, যে-গল্পটি সে টুবাইকে বলতে শুরু করে ক্রমে গল্পটির সঙ্গে চলতে থাকে এবং এক সময় পৌঁছে গিয়েছে গল্পটির এই বিশ্বস্ত পটভূমিতে, যেন-বা সে ঘুমিয়ে পড়েছে গাছের ছায়ায়। আর তার ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে ওই শান্ত ভিজে বাতাসের স্পর্শে সময়ও ঘুমিয়ে পড়েছে; এত দীর্ঘ ঘুমে সাহস,

ভালোবাসা, সরলতা আর বিশ্বাসের অলৌকিক গল্পটিতেও লেগেছে ঠান্ডা মেঘ, তারা আর কোনোভাবেই অঙ্গসঞ্চালন করতে পারছে না, কেমন এক সমাপ্তি ছিল গোটা প্রেক্ষাপটে।

ছুটির দিন ক শহরের মানুষের পারিবারিক হয়ে যাওয়ার যে স্বস্তিকর এবং অতিপুরাতন অভ্যাসটি আছে, তার মধ্যে অদৃশ্য বিষণ্ণতাও উড়তে থাকে। সামান্য হইচই আর কাছাকাছি আসার চেষ্টার পর যে সমাহিত ভাবটি প্রায় ছুঁয়ে ফেলে তারা, তা যে দুঃখ, ঘুরে ঘুরে একটি সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া, অমল আজ এই সমাপ্তিটি চিত্রায়িত হয়ে আছে দেখল টুবাই আর তার দাদুর শায়িত শরীরে।

কী করে যেন এই সমাপ্তির আবার এক শুরু হয়ে উঠেছে টুবাই। তার মধ্যে সকলেই কিছু-না-কিছু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে, এমনকি অমলও কয়েকবার ভেবে ফেলেছে : টুবাই অন্যরকম হবে।

তারপর নিজের মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, টুবাই কল্পনায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অন্যরকম হয়েছে। কখনো মামুলি, কখনো-বা আত্মমগ্ন মানুষ, নিঃসঙ্গ, সম্পন্ন এবং পরমুহূর্তে এক বিষণ্ণ যুবক। মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার সবটুকুই তারা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম এই শিশুটির মধ্যে। তাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত, যদিও এইভাবে যে অবসরযাপন, ভবিষ্যৎ কল্পনা, তা কি মানুষের চিরকালীন দুর্বলতা? এর কোনোটি সম্পর্কেই তারা সজাগ নয়। শুধু হঠাৎ হঠাৎ অমল বলে ফেলেছে : এভাবে প্রোগ্রামিং কোরো না, খুব খারাপ, ব্যাড...।

টুবাইকে নিয়ে একটু ঝিলমিলে যাও।

দু-দিন কোথাও থেকে আসি চলো।

একটু ঘুরে আসি।

কাল টুবাইর জন্মদিন।

ঊর্মিলার সমস্ত প্রস্তাবে আজকাল টুবাই থাকবেই। যেন অমলের সঙ্গে তার সরাসরি কোনো কথা নেই, আবার কথা যে নেই সে সম্পর্কিত কোনো বিষণ্ণতা ঊর্মিলার মুখে কেন দেখা যায় না। অমল জানে, ওই বিষণ্ণতা আছে, আছে ঠিক চামড়ার নীচেই, বুকের উষ্ণ আর নরম ঢেউ দুটির তলায়, যে ঢেউ নিজেই প্রাণচঞ্চল বলে আজও তাদের দুজনকে ছুঁড়ে দিতে পারে আরামপ্রদ অন্ধকারে। তখন তারা শরীরের মাহাত্ম্যে কেমন বিস্মিত হয়ে যায়। অন্ধকার কেন জরুরি, কেউই সে ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি।

তিন

ক শহরের মধ্যে কাজ করে চলে উৎসবের এক গভীর ঝোঁক এবং শহরটি এ-বিষয়ে খুবই ঋতুনির্ভর। আর ঋতুর কথা বললে তো শুধুই শীতকাল, যেন-বা জীবন মাত্র ওইটুকু। বর্ষা কিংবা গ্রীষ্ম বিষয়ে শহরটির বেশ কিছু সংগীত (না-থেকেও আছেন মহান গুরুদেব) আছে, ওইসব সংগীতের কথা ও সুরে গ্রামের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাদের জীবনে সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া ওই গ্রাম, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু, সমস্তই একাকার হয়ে যায়। এ শহরের গ্রীষ্ম-বর্ষা একদিকে, অন্যদিকে শীতকাল। এরকম ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দেবে, কেউ কেউ বলে শীতকালীন আলস্য-

আরাম আর খুশির মেজাজই শহরটির মন, কেননা শহরের প্রধান উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয় এই শীতকালেই। অন্যদিকে গ্রীষ্ম আর বর্ষার দীর্ঘসূত্রী মেজাজ, অবসাদ আর নিঃসঙ্গতাই বা কেন মন বলে গ্রহণ করা হবে না, তার কোনো মীমাংসা হয়নি। বরং শীতকালে জোড় বাঁধার আগ্রহ, শরীরচালনা ও রোদে শরীর মেলে রাখার যে সুখ তা কীভাবে অস্বীকার করা যাবে।

বিশ্বাসী মানুষজন অবশ্য এরকম ব্যবচ্ছেদ কল্পনাই করতে পারে না, প্রতিটি ঋতুকে তারা একটি মালায় গেঁথে নিয়েছে, পর্বত সমুদ্রহীন এই শহরে চন্দ্র-সূর্য ছাড়া ঋতুমালাই একমাত্র প্রকৃতি, কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শহরটি বৃক্ষহীন। তা ছাড়া, শরীর থেকে যারা মনকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, কিংবা মন থেকে শরীরকে, কিছু কিছু নাগরিক তাদের ঘাতক বলে ধরে নিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আত্মঘাতীও বটে। একইভাবে আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তারা কোনোরকম দূরত্ব সহ্য করতে পারে না। আশার কথা, এরকম মানুষজনরা প্রায় সবাই ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। যারা তার বাইরে ছিল, সবাই এখন শহরের উন্মাদাগারে আশ্রয় নিয়েছে। মাঝে মাঝে, বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার পর, তাদের বীভৎস আর্তনাদ শোনা যেত। সম্প্রতি সেসবও আর নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মোটের ওপর সুখেই বেঁচে আছে।

গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ সংকট মারাত্মক হয়ে উঠলেও শহরের প্রায় প্রতিটি রাতই উৎসবের এক আলোকিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে : আজ? কোথায়? কী? কাল? সকাল? বিকাল? সন্ধ্যা? দুপুর? দুপরে কিছু নেই? কি-ছু নেই, স-ত্যি কিছু নেই? বিশ্বাস করি না...

ফলে ঋতুর প্রশ্নটি অন্তত উৎসবের দিক থেকে তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। যেকোনো কিছুই উৎসব হয়ে যেতে পারে, যেমন ফুটবল, সার্কাস, সাহিত্য, বিতর্ক, চলচ্চিত্র, পরিবেশচেতনা, ফুল ফোটানোর খেলা, কুটিরশিল্প, পুস্তক কিংবা সুলভ শৌচাগার। এভাবে আর কিছুদিন চললে ক শহরের মানুষজন তাদের প্রাত্যহিক, একঘেয়ে কাজে আর হাতই দিতে পারবে না, যদি না তাতে উৎসবের ফুল আর গন্ধ থাকে, যদি না প্রতিটি দিনের এরকম অজস্র কাজের স্থিরচিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, বা টি ভি আর রেডিওতে এ সম্পর্কে কিছু বলা না-হয়। গোটা জিনিসটার বিবরণ প্রকাশিত হলে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ মজা বা শ্লেষের সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু তা হবে বিষয়টিকে খুবই ওপর ওপর নেওয়া, আসলে পরিস্থিতিটি ছিল ভয়াবহ আর বেদনার্ত। ক্রমে আশঙ্কা করা হচ্ছিল 'কেমন আছেন?' বা 'হ্যালো' বলার পরই পরস্পর পরিচিত দুজন মানুষ যা নিয়ে কথা বলবে তা হল এইরকম কিছু। আবারও বলা দরকার, এ অত্যন্ত করুণ ঘটনা, এক ধরনের আত্মপরিচয়হীন অবস্থা, মানুষের অস্তিত্ব মুছে যাচ্ছিল। যেন মানুষরা বহুকাল আগেই মরে গিয়েছে, যেন সত্যি একটি মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী মড়কে শহরটি জনশূন্য হয়ে যায় কিন্তু তাদের ছায়ারা আজও বেঁচে আছে।

একই শহরের দুজনের মধ্যে বিয়ে হওয়াটা খুব বোরিং ব্যাপার।

সেদিক থেকে আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হয়।

কেন?

আপনি হায়দ্রাবাদের কাউকে বিয়ে করেননি, এক, দ্বিতীয়ত, কলকাতায় সেটল করতে

চাইছেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে এখানেই একটি স্থায়ী প্রণয় গড়ে উঠবে।

কলকাতায় আমার পাঁচ বছর হয়ে গেল।

তার জন্যে কি শহরটা আপনার কাছে বুড়ি হয়ে গেছে।

একরকম।

বিবাহের ব্যাপারে আপনি বেজায় খুঁতখুঁতে।

উঁ, হুঁ, না, আসলে মনস্থির করতে পারি না, সে যাক...

এভাবে তারা কথা বলে চলেছিল, একরকম উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা, ঠিক যেরকম কথার মধ্যে মানুষ কিছু কিছু নিভৃত মনের কথা একটু-আধটু গুঁজে দেয়। অন্য সময় তো কথার আঙ্গিকে বক্তৃতা করে যেতে হয়, অথবা শুনতে হয়। 'বড়ো বড়ো সত্যি কথা বা অনেকদিনের ভাবা কথাগুলো একবার বলে ফেললেই কেমন মরে যায়', 'যেজন্য মনে হয় সবাই প্রায় এক কথাই বলে চলেছে', 'তবু মনে হয়' খুব আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে', 'আপনি কি এইজন্যই রোজ রাস্তায় বেরিয়ে আসেন', বলতে পারেন, তবে বিশ্বাসটা ক্রমেই মরে আসছে', 'এরকম মানুষ আমরা সবাই খুঁজি', 'শহরের সবাই'।

'যেন ছায়ারা তাদের প্রভুদের অন্বেষণ করছে।'

চার

কয়েকদিন আগে অফিসে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। নিঃসন্তান পঞ্চান্ন বছরের সেই মহিলা সারাদিন ক শহরের উত্তর-দক্ষিণ, পুব আর পশ্চিমে ছুটে বেড়াচ্ছেন। দু-হাজার অনাথ শিশুর বাসস্থান, স্বাস্থ্য আর শিক্ষার সমস্যা তিনি হাতে নিয়েছেন। ভদ্রমহিলা অনর্গল কথা বলেন। যেহেতু অমল দারিদ্র্য নিবারণের অন্য কোনো উপায় সম্পর্কে সুনিশ্চিত নয়, ফলে মহিলার এই মানবিকতাকে সে সেলাম জানাতে বাধ্য। তবে ওই অনর্গল কথা তাকে খুবই ক্লান্ত করছিল। এমনকি একসময় মনে হয়েছিল, 'তা আমি কী করতে পারি, কয়েকটা টাকা দেওয়া ছাড়া আমি কী-ই বা করতে পারি, দয়া করে আর বর্ণনা দেবেন না, এই নিন পঞ্চাশটা টাকা...।'

আশ্রমটি নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন আছে।

এখন দু-হাজার শিশুর দায়িত্ব নিতে পেরেছি।

কয়েকটা শাখা খোলা হবে।

এরা সবাই আমাকে মা বলে জানে।

আসলে এদের বেশিরভাগই যাকে বলে বাস্টার্ড, দো আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইট, পিতৃপরিচয় কমপ্লিটলি ইরেলিভ্যান্ট...

আর অমল : হুঁ, হাঁ, উঁ, ইয়ে, ঠিক, আচ্ছা, বেশ, আমাকে এবার উঠতে হবে, সরি।

ভদ্রমহিলাকেই প্রথমে টেবিল থেকে ব্যাগটি তুলে নিতে হল, এক মুহূর্ত কাপড়টি নীচের দিকে টেনে চলে গেলেন কাচের দেওয়াল পেরিয়ে। কলিগদের মধ্যে পড়ে রইল প্রসঙ্গটি, দু-টুকরো করা হল তাকে : এক—অনাথ আশ্রম, অর্থাৎ ছায়া-মায়া-করুণা; দুই—বেজম্মা দু-হাজার শিশু।

অফিসটির মধ্যে এমন এক গোপন শৃঙ্খলা ছিল যার দ্বারা আপাত ঢিলেঢালা, সময় কাটানোর এই কাচের বাড়িটি মুহূর্তে হয়ে উঠতে পারে ঘড়ির কাঁটার ছন্দে বাঁধা একটি যন্ত্র। একটি চিরকুট উড়ে আসতে পারে : আপনারা অফিসের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন।

অমলের এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সত্যি সময় নষ্ট করা হচ্ছিল। কারণ, সে এখন বেশ বুঝতে পারে যে, কতগুলো ভুল ধারণায় থেকে যাওয়া সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছু নয়। সমাধানহীন এই সমস্যাটি সম্পর্কে তার কলিগদের কথাবার্তা, কতগুলো ভুল উপায় বাতলানো— এসব প্রমাণ করে এটি আদৌ তাদের সমস্যা নয়, আসলে তাদের কোনো সমস্যা নেই।

এক সময় দিনটি তাকে অফিসের বাইরে নিয়ে এল। সম্প্রতি অমল লক্ষ করেছে মনে মনে সে ভাবে যে ঠিক এমন নয়, প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় সে মনে মনে কথা বলে। তার এই মনে-মনে কথা বলারও একটি ইতিহাস আছে, অমল জানে। যেমন সে অফিসে বসেই টের পেল, সুবিশাল যে দারিদ্র্য মৃত শরীর নিয়ে এমন সুদৃশ্য কাচের দেওয়াল পেরিয়ে অফিসটিতে ঢুকে পড়ল তা তাকে ক্লান্ত করে, ক্লান্ত করে, শুধুই ক্লান্ত করে। এই ক্লান্তির কথা কাউকে বলা যায় না, বলা যায় না তার মস্তিষ্কে গ্রহটিকে বহন করার গোপন এবং সুবিশাল ব্যাপারটি। যদিও সে জানে, একজন অমল নয়, পৃথিবীর সমস্ত অমল বহন করে চলেছে এইভাবে গ্রহটিকে এবং তারা যে-বিস্ফোরণের ভয়ে আক্রান্ত তা হচ্ছে মস্তিষ্কের এই গ্রহটিরই অগ্ন্যুৎপাত, অন্য কিছু নয়। অথচ যারা মৃত, মহান সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের তুলনায় তার এই তুচ্ছ, সামান্য জীবন, এই বেঁচে থাকা অনেক, অনেক বেশি মহৎ ব্যাপার। এ তার অনুভব, স্থায়ী অনুভব নয়, তবে তা ঘুরেফিরে আসে, নষ্ট সময় যতই বয়ে যাক সে এসে বলে, 'আছি, বেঁচে আছি, সময়হীন বেঁচে আছি।'

উটের প্রিয় খাদ্য কাঁটাঘাস, যতবার সে কাঁটাঘাসে মুখ দেয় তার মুখ থেকে রক্ত ঝরে। তবু, তবু সে কাঁটাঘাসে মুখ দেবে, সে রক্তাক্ত হবে। এরকম নয়, মোটেই এরকম নয়। তবু কোথায় যেন একটু মিল আছে, মিলের আভাস আছে।

এই পর্বে শেষ ঘটনাটি : মিতা সরখেল।

তারা দুজনেই টের পেয়েছিল ধীরে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, মানব-মানবীর সম্পর্ক। অথচ তারা তা গড়ে তোলে না, বরং লাফিয়ে, ডিঙিয়ে, সরে সরে যেতে থাকে। শুধু অমল যে নিজেকে নিঃশেষিত মনে করছে যার কাছে প্রায় সবকিছুই এক পুনরাবৃত্তি আর মিতা যার এক কাল্পনিক বেঁচে-থাকা আছে, দুজন, দুজনের রক্ত দেখে। তারা যেন বনের শিষ্টপশু। অমলের আছে এক শেষ পরিণতির অস্পষ্ট, ভয়াবহ ধারণা, গোপন রক্তপাত। আর মিতা ক শহরেও এক নিজস্ব বাসভূমি গড়তে চেয়ে প্রকাশ্যে রক্তপাত ঘটিয়েছে। সেকেলে বাড়ি, ঘড়িঘর, ফুটপাত আর বাসগুমটির এই শহরে এরকম বাঁচার চিত্র এত অপ্রাসঙ্গিক, মিথ্যে যে বারবার অনাথ আশ্রমের কাহিনি তাকে নস্যাৎ করে দেয়। জোর বাতাস, বৃষ্টি ও নক্ষত্রের ছুটোছুটির মতো দারিদ্র্যের এক প্রলয় গ্রাস করে ফেলে শহরটিকে। অমল-মিতা ও অন্যান্যরা সেই প্রলয়ে এঁটো শালপাতার মতো ওড়ে।

পাঁচ

নিয়মমাফিক টুবাইয়ের পড়াশুনো শুরু হতে চলেছে, এতদিন সে বর্ণমালা—অক্ষর আর শব্দের যে খেলা-খেলা-পড়া চালিয়ে যাচ্ছিল আজ তা প্রাতিষ্ঠানিক হবে। ব্যাগ পিঠে বেঁধে স্কুলে (যুদ্ধে) যাওয়ার দিন, আপাতভাবে একটি মধুর দিন। অথচ তা একটিমাত্র দিন নয়, বছর নয়, ভয়ংকর এইদিন আসলে একটি সমগ্র জীবন। বাবা-মা-আন্টি-রেক্টর-ইনভিজিলেটর-এগজামিনার-গেজেট ও সার্টিফিকেটের বিপুলসংখ্যক মানুষ ভিড় করে আসছে এই জীবনটিতে এইসব মানুষ, থিকথিকে আরও সব মানুষ, প্রসব করবে আরও, আরও মানুষ। টুবাই তাদের ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

টুবাইয়ের জুতোর ফিতে বাঁধা হল, গলায় নেকটাই বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হল নীল রঙের একটি চাকতি, নামজাদা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমব্লেম। তার কাঁধে জলের বোতল, পিঠে রুক-স্যাকের মতোই স্কুলের ব্যাগও বাঁধা হল। গাঢ় নীল রঙের বাসে এবার তাকে তুলে দিয়ে আসবে ঊর্মিলা।

রেডি।

হুঁ।

বাবাকে টা-টা করে দাও।

টা-টা।

ঊর্মিলা হয়তো আশা করেছিল অমল দু-একটা কথা বলবে, একটুখানি ভালোলাগা প্রকাশ করবে। অথচ অমল নাটকীয়ভাবে বিষণ্ণ থেকে গেল, হতে পারে টুবাইকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে অমল যে সাদামাটা ভাবটি রাখতে চেয়েছিল, পাড়ার স্কুলের কথা দু-একবার মৃদুভাবে বলেছিল, এ তারই প্রতিক্রিয়া।

অমল আজ একটু বেলা করে বেরোবে, জানুয়ারির সকাল গ্রিলের নকশাসমেত উষ্ণ রোদে শুয়ে আছে অমলের বুকে। বন্য পশুর মতো যেন ওই রোদের, সকালের কেশর আছে, কিংবা নরম লোম। অমল নিজের বুকে হাত বোলাচ্ছিল। ফ্ল্যাটটিতে এখন কোনো শব্দ নেই, বিধুবালা আর বিমলবাবু আশ্চর্যজনকভাবে ফ্ল্যাটটিতে আত্মগোপন করেছে।

শহরের জাদুঘরের দ্বিশততম প্রতিষ্ঠা দিবস আজ। গতকালই সে জানতে পারে আজ অমলের কাজের দিনটি শুরু হবে সান্ধ্য ওই অনুষ্ঠানটি দিয়ে, বিরাশি বছরের একজন ভাষাতত্ত্ববিদ প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন, তারপর একটি স্লাইড় শো আছে, অতিকায় জন্তুদের ছবি, ভাষাতত্ত্ববিদের ছবি, নাটকের উৎস বিষয়ে একটি নাটক আর আদিম নৃত্যের ছবি প্রদর্শিত হবে।

জাদুঘর আর চিড়িয়াখানায় শহরের বাচ্চাকাচ্চা, বাপ-মা এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভিড় গত কুড়ি বছরে খুবই নগণ্য। বরং মফস্‌সল আর দূর-দূর থেকে প্রতিবাদ করতে শহরে-আসা, নিরন্ন মানুষরাই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জমায়েত হওয়ার আগে এই দুটি জায়গায় ঢুঁ মেরে যায়। এর মধ্যে কোনো কার্যকারণ নেই, আছে ক শহর সম্পর্কে অপার বিস্ময় এবং নিজেদের আনন্দিত করার একটি প্রখর ইন্দ্রিয়। আজকের অনুষ্ঠানে বিস্মিত আর আনন্দিত মানুষেরা থাকবে না। আর মিতা যেন-বা তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে বলেই বলেছিল, 'ঠিক, ছ-টা, মেট্রোর তলায়'—

না, না।

কেন?

মেট্রোর তলায় নয়—

টাইগার?

না।

কোথাও নয়, ক শহরের অফিসপাড়ার কোথাওই সন্ধ্যায় একটি মেয়ে অপেক্ষা করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে গজিয়ে ওঠে একটি ল্যাম্পপোস্ট, মুখের আধখানা থাকে আলোয়, বাকি আধখানা অন্ধকারে, তার ঠোঁটে বিবর্ণ রক্ত জমে ওঠে, চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যায়, অথচ সস্তার প্রসাধন আলোর দিকে ফেরানো গালটিকে ডালিম ফল করে তোলে। এবং তাকে পরিক্রমা করে যায় শিসধ্বনি, হঠাৎ একটি রিকশা এসে থেমে যেতে পারে ফুটপাত ঘেঁষে, যারপর সেই মেয়েটি ল্যাম্পপোস্ট-সমেত উধাও হয়ে যেতে পারে।

না, মেট্রো নয়, টাইগার নয়, কোথাও নয়, বরং অমল একবার অফিস ছুঁয়েই যাবে।

জাদুঘরটি মিতা সঞ্চয় করে রেখেছিল। আগে সে ক শহরের জাদুঘরে যায়নি, যেমন যায়নি পরির মূর্তি বসানো সাদা পাথরের গম্বুজ শহরের চিত্রশালাটিতে। এবং এমন সচেতনভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে যেন সে জানে না শহরের দু-শো বছরের ইতিহাস একটি প্রাসাদে প্রায় পটের মতো ধরে রাখা হয়েছে। এ তার ভয়, পৃথিবীর এই শহরটি যেন কোনো দিন তার কাছে ফুরিয়ে না যায়। যেন এইসব চিত্র, প্রদর্শনী কোনো বাহ্য জগৎ নয়, বরং আভ্যন্তরিক সময়ের এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ, সে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ছাড়া কিছুই আস্বাদন করতে পারে না, ফলে তালিকা নিঃশেষিত না করা মিতার একরকম নিরাপত্তাবোধ।

অনেকে কত সহজে দু-তিন শো বছরের কথা বলে ফেলে, কত অনায়াসে তাদের কথায় পৃথিবীর মৃত আর মহান কবিরা পাঁচ-দশ মিনিট হঠাৎ জেগে উঠেই কবরে চলে যান, কী আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তারা মানবসভ্যতা বিষয়ে কথা বলে, কত সব আদর্শের বিচার সেরে ফেলতে পারে পরিভাষার অমোঘ ব্যবহারে, যেন তারা একজীবনে এত বার আর এত ঘন ঘন পাঁচ-হাজার বছর আগে আর পিছনে নক্ষত্রের মতো ছুটে চলে, যে, মনে হয় সেইসব মানুষরা এ-গ্রহের কেউ নয়, বরং মহাকাশচারী, বরং মহা-মহাকাশ আর তারও পরের পরের আকাশের মানচিত্র তাদের পকেটে আছে। ভাষাতাত্ত্বিক ভদ্রলোক যে ঠিক এরকমই একজন মানুষ হবেন, অমল সে বিষয়ে নিশ্চিত নয়, অন্যদিকে সে নিশ্চিত নয় মিতা সরখেল হঠাৎ জাদুঘরে নিজেরই এক আত্মজীবনীর কথা বলবে কি না। মিতার এই আজকের আসার ব্যাপারটায় সে লক্ষ করেছিল কেমন একটা অসহায়ভাব ছিল, তার আগ্রহ সেই ছিদ্রপথেই প্রকাশ পায়। যেন-বা শহরে মিতা সরখেল একজন মাত্র মানুষকেই চেনে, ফলে আজ সন্ধ্যায় অমলকে না পেলে তাকে সম্পূর্ণ একা থাকতে হবে। এই কারণে সে একটু ভীতুও বটে। অমলের সংশয় হচ্ছিল মিতা যদি ওই হাজার বছরের প্রত্নস্পর্শে অন্যরকম হয়ে যায়, হঠাৎ যদি সে খুবই সরল, আরও সরল, প্রায় প্রাকৃতিক হয়ে যায়, তাহলে সে কী করবে?

এই পর্যন্ত ভেবে ফেলার পর, গাঢ় রোদে নিমজ্জিত থেকে অমল বেশ শরীর দিয়েই

বুঝতে পারল সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ে কথা বলার এক ভিন্ন ধরনের সুবিধার কথা। সেক্ষেত্রে এরকম দুজন মানুষ হাজারদুয়ারির দরজা গলে গলে এক ধরনের লুকোচুরি খেলা চালিয়ে যেতে পারে, পরস্পর কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করে যাচ্ছে অথচ তা না শুনলেও চলে, কেননা তারা পরস্পরের কথার দুটি একটি বাক্য শুনলেই জানতে পারে কী কথা হচ্ছে এবং সেইমতো মাথা নাড়া সম্ভব, এমনকি কথা বলতে বলতেও যে কেউ আত্মগোপন করতে পারে। কয়েক শত বছরের এই অবদানটুকু তাদের কাছে এক সম্পদ।

ক শহরের মানুষরা বিকলাঙ্গ নয়, পঙ্গু নয়। প্রথম দুটি বিশ্বযুদ্ধের কোনোটিই এ শহরে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়নি। তবে, স্বাধীনতা-উপাখ্যানের সামান্য আগে বা পরে যেসব নাগরিকের জন্ম হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্ম তাদের তুলনায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। স্বাধীনতার দুধেঘিয়ে মধ্যবিত্তের নাদুস হয়ে ওঠাটা সাংবিধানিক অধিকার। তাহলে কেন অমল অনুভব করেছে, একটি বিকলাঙ্গ বা পঙ্গুভাব? অমল-উর্মিলার মতো মানুষজন শহরের ব্যাপক দারিদ্র্য বিষয়ে কেমন ভয় পায়, তারা পালিয়ে বাঁচতে চায়, ভুলে যেতে চায়।

বুকের ওপর থেকে রোদ নেমে যাচ্ছিল, কেমন এক অলৌকিক নেমে যাওয়া। ক্রমে, একটু একটু করে, অগোচরে হ্রাস পাওয়া নয়; বরং সরসর করে তরল শরীরের এক জন্তুর মতোই রোদ নেমে গেল। এখন সে ফ্ল্যাটটিকে ত্যাগ করে কার্নিশে ঝুলে আছে। আরও পরে তাও থাকবে না। রোদ নেই অথচ আলো আছে, এরকম এক উজ্জ্বলবর্ণে আর কিছুটা ছায়ায় অমলদের ফ্ল্যাট তখন একপ্রকার শান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ভিতরে বুকসেল্‌ফ থেকে নীল কালো আর কমলা রঙের বইগুলিতে মুদ্রিত পেঙ্গুইন পাখিরা যেন এবার আত্মপ্রকাশ করবে, টেবিলে চায়ের কাপটি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সেখান থেকে পাতলা ধোঁয়া উঠবে, অমল ফ্যানের ব্লেডের দিকে তাকালেই পাখা ঘুরতে থাকবে, এবং অতিথি আসতে পারে। তারা এসে উর্মিলা আর টুবাইয়ের কথা জানতে চাইলে, সে হয়তো বলে ফেলবে : ওরা তো অনেকদিন চলে গেছে। বিধুবালা আর বিমলবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, সে দুঃখিত হবে, : গত সেপ্টেম্বরে মা চলে গেছেন, বাবা গেছেন আরও একবছর আগে। অতিথিরা তখন সান্ত্বনা জানানোর ভাষা খুঁজে পাবে না।

অতিথিরা নেই, অমল ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে কোনো স্বপ্ন দেখেনি। অবান্তর কথা ভেবেছিল। এবং বিবেচনা করেছিল যে, প্রত্যেক মানুষের কিছু-না-কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার থাকে। তারা সেসব কথা কেউ কাউকে বলে না। এইটুকু ক্ষমতা প্রতিভার তুল্য। যে কারণে ওই প্রতিভা থেকে চ্যুত হওয়া মাত্র তারা উন্মাদ হয়ে যায়, বিশেষ একটি কথা বা ধারণাই অবিরত ঘুরপাক খায় তখন। অন্যরা জানে কীভাবে ছড়িয়ে পড়তে হয়। বীজের মতো, দুর্ঘটনার রক্তের মতো, নোংরা কাগজের মতো ওই ছড়িয়ে পড়াই রাস্তার ভিড়, পার্কের বিশ্রাম, সিনেমা হলের বিনোদন, রাজনীতির আক্রোশ। অথচ তাই আবার এক সমাহিত, বর্ণাঢ্য জীবন, যেখানে বিমূর্তের স্থান আছে কি না অমলের সন্দেহ হয়। যদিও সেখানে জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত।

তুমি চা খেয়ে যাবে তো?

টোস্ট করব?

সবে তখন তিনটে বাজে, অমল চোখ খুলতেই দেখল উর্মিলার মুখ। অর্থাৎ উর্মিলা আজ ছুটি নিয়েছে, সে টুবাইকে সঙ্গে নিয়েই ফিরেছে এবং বেশ খুশি আছে, তার ভালো লাগছে এই দিনটি আজ।

জাদুঘরে টুবাইকে নিয়ে চলো না।

তারপর?

আমরা ফিরে আসব।

এভাবে টুবাইকে সামনে রেখে উর্মিলার এগিয়ে আসা প্রাচীনতম এক চিত্রের স্মৃতি টেনে আনল। চা টোস্ট খেতে খেতে অমলের জেগে ওঠা তখন সম্পূর্ণ হয়েছে, সে গুটিকয় সমস্যার কথা বলল, যার পর তাদের তিনজনের একসঙ্গে বেরিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব।

ছ-টা বাজতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি, এসময় এ-বাড়িতে তেমন ব্যস্ততা কিছু থাকে না। উর্মিলা এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা নানাভাবে ব্যালকনিতে দাঁড়াবে, মাঝে মাঝে সে আকাশের দিকে তাকাবে, এখানকার আকাশে তীব্র গতির প্লেন। উর্মিলা তাদের দু-একটির দিকে তাকায়, প্লেনের শব্দ তাকে এখানকার বৈকালিক শব্দের জগৎ থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যায়। তারপরই নীচে, একফালি সবুজে স্লিপ-খেয়ে-নামা শিশুদের সে নিষ্পলক চোখে দেখে, কখনো-বা হেসে ওঠে 'অ্যাই, অ্যাই, বুলটি...যাহ্ পারলি না তো।' হয়তো একটু পরেই সে আবার অ্যান্টেনার পর অ্যান্টেনা পেরিয়ে আকাশের দিকে তাকাবে, রেলিঙে বুক চেপে ধরবে, বা ভুলে যাবে যে সে কিছু একটা দেখছিল, কী যেন ভাবছিল।

এইভাবে, ক্রমে, প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়, যার পর ফ্ল্যাটটিতে ব্যস্ততার আগমন ঘটে। রান্নাঘর থেকে বহুদিনের অভ্যাসবশত কিছু নোংরা জানলা গলিয়ে ফেলতে গিয়ে, বিধুবালার হঠাৎ হুঁশ হয় যে ঠিক নীচেই একটি বস্তি আছে। সুভদ্রা হয়তো তখন বাথরুমে, সেখান থেকে খুব সরু গলায় একটি করুণ গান ভেসে আসছে। ওই গানটি এত করুণ, সুভদ্রার গলা এত মিহি, যে মনে হত বহুদূরে কে যেন কাঁদছে।

ফলে আগামী তিন ঘণ্টা এখানে চুপচাপ বসে থাকা, বা গড়ানো অমলের পক্ষে অসম্ভব, তাকে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে, করুণাময়ী থেকে এখুনি যে বাসটি ছাড়বে অমল তাতেই উঠে বসবে, তার নম্বর দেখারও কোনো দরকার নেই।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে, ঘাড়ে আর কানের তলায় ঠান্ডা হাত বুলিয়ে নেওয়ায়, একটু শীতলভাব শরীরে খেলে গেল। বিধুবালার, 'তোর আজ নাইট ডিউটি' যার উত্তরে অমল এখন একটু প্রীতভাবেই বলতে পারল, 'হুঁ'। আজ রাতে সে এ-বাড়িতে থাকবে না, গোটা বছরের হিসাবে নাইট ডিউটিও বাঁধা আছে। বছরে বেশ কিছু রাত অমল বাড়িতে থাকে না। বরং ঝলমলে সকালে, বছরে কয়েকবার সে প্রায় অতিথির মতো ফিরে এসে ঘণ্টা বাজায়।

জামা-জুতো পবার অবসরে অমল ধাপে ধাপে নিজের অবস্থা বুঝে নিতে চাইছে। এই বুঝে নেওয়ার কোনো শেষ নেই, অথচ গত কয়েক বছরে এরকম প্রতিবারের চেষ্টা তাকে

এক রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড় করায়। সেই দৃশ্যটি এভাবে কল্পনা করে নেওয়া যায়: অমল সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং তার সামনে হিংস্র জন্তু ধীর, সুনিশ্চিত থাবায় এগিয়ে আসছে, একটিমাত্র লাফ—

বলা বাহুল্য শহরে হিংস্র জন্তুর একটি সুরক্ষিত প্রদর্শনী আছে, সেখানে শিশুরা যায়, খাঁচার বাইরে থেকে তারা পশুদের উত্যক্ত করে। কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের পক্ষে মানুষকে আক্রমণের কোনোই আশঙ্কা নেই। ভয়ভীতির প্রশ্নে যেজন্য শহরের নাগরিকরা ছুটন্ত গাড়ি, গুপ্তঘাতক, মস্তান আর শহরের শান্তিরক্ষাবাহিনী আর দুরূহ এবং জটিলতম আইনি ধারাই দেখতে পায়।

শহরের নিরন্ন মানুষরা প্রতিদিন দুর্ভিক্ষের করাল রূপ দেখে। তবু যে কেন বিপ্লব রচনা করতে ব্যর্থ হয় সে জানে না। বারবার কেন কিছু পলাতকের জোটই চিৎকার করে : কাগুজে বাঘ দেখে ভয় পেয়ো না। তারপর তিনবার গুলি ছোঁড়া হয়, সামরিক কায়দায় একদল সৈন্য যন্ত্রের মতো, অভ্যাসজনিত পটুতায়, এই গুলি করার কাজটা সারে। তখন পতন ঘটে। বিপ্লবীদের শরীর মাটিতে আছড়ে পড়ে। এবং বারবার শোনা যায় বিপ্লবীদের পুনরুজ্জীবনের গল্প, যে গল্পটি ফুরোবার নয়। শহরের এ এক স্থায়ী ইতিহাসও বটে, যা ঘটামাত্র পত্রনবিশরা লেগে যায় সাল, তারিখ, স্থান আর নামধাম টুকে ফেলার কাজে। পক্ষে বিপক্ষে মতামত গড়ে, ভাঙে এবং গড়ে। এবং এভাবে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে...। 'বাবা, তুমি জাদুঘরে যাবে?', 'না রে'— এই দুটি কথা অনায়াসে হয়ে গেল, অমলের পিছনে রইল দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

শহরের নাগরিকগণ একটি ফাঁকা বাস-কে উপহারের চেয়ে বেশি কিছু, প্রায় দুর্লভ এক প্রাপ্তি মনে করে। সেই মুহূর্তে বাসে ওঠার কথা তারা ভাবে, তৎক্ষণাৎ জানে যে তাদের স্ব-স্ব শরীর হারিয়ে ফেলবে সমস্ত নিজস্বতা। খুঁজে পাবে না নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; তবু মানুষের শরীরের ওজন, আয়তন আর চাপে রচিত এই অন্ধকার কূপের মধ্যেই নাগরিকগণ অদ্ভুত সব ঘটনার সম্মুখীন হয়। যদিও এইসব ঘটনায় তারা প্রায়শ হারিয়ে ফেলে তাদের সচেতন ভূমিকা, মস্তিষ্ক ততখানি সক্রিয় না-থাকায়, দম বন্ধ করে একের পর এক স্টপ গুনে যাওয়ার চেষ্টার ফলে ঘটনাগুলি রেখে যায় কিছু কঙ্কাল মাত্র, কোনো অভিজ্ঞতা হয় না। অথচ পরস্পর পরস্পরকে প্রায়ই বলে থাকে, 'সেদিন এল ফোরটিন বি-তে'...। এসব থাকায়, নাগরিকদের অতিক্রম করে, তাদের তুচ্ছ করে, খুব দাপটের সঙ্গে ছুটে যায়, বা জ্যামে স্থবির হতে হতে শহরের রাজপথে রাজকীয় গাম্ভীর্যের স্থাপত্য হয়ে ওঠে এল-ফোরটিন বি, এস-ফাইভ, এল টোয়েন্টি, এল-নাইন, এস-সিক্স, থারটিফোর বি, সেভেনটি সেভেন, বেহালা বি বা দী বাগ মিনি এবং আরও, আরও অজস্র বাস। যেন শহরে ঘটে গিয়েছে একটি অভাবনীয় ঘটনা যার ফলে মানুষ খুব তুচ্ছ হয়ে পড়েছে, শহরের রাস্তাগুলিই হয়ে উঠেছে জ্যান্ত, শিরা, উপশিরা, ধমনী; যেখানে রক্তস্রোত শুধু বিভিন্ন আকার আর রঙের এই বাসগুলি। এভাবে আরও কিছু পরিবর্তন উদ্ভাবনের জন্য, মহান কয়েকটি সেতু, চমৎকার স্টেডিয়াম, ভূগর্ভ রেল আর আলোকোজ্জ্বল একটি টি ভি কেন্দ্র স্থাপনের জন্যই যেন সমস্ত আয়োজন। বিশেষত ক শহরের বাসযাত্রীদের, অর্থাৎ নাগরিকদের যখন বিভিন্ন রুটের বাসে কৌটোবদ্ধ-খাদ্যবস্তুর মতো হাল হয়, তখনই কেমন করে যেন এই সত্যটি দিনের সুস্পষ্ট আলো হয়ে যায় : এইসব মানুষজনের কোনো অস্তিত্ব নেই।

এবং এ জিনিসটি বস্তুময়তা নয়, বস্তু-অতিক্রান্ত প্রহেলিকাময় কোনো অলৌকিকের জগৎও নয়। প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যে সর্বগ্রাসী দিকটি বর্তমান, যেন তা-ও নয়। অত্যন্ত শরীরী ঘটনা।

শরীরে দারিদ্র্যের প্রাচীন ক্ষত।

অমল আবারও পৌঁছে গেল সেই ক্ষতটির কাছে, যা প্রায় এক উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রায় নিয়মানুগভাবেই বাসটি শেষ পর্যন্ত জ্যামে আটকায়, শুরুতে বাসটি ফাঁকা ছিল বলে, সে বসার জায়গা পেয়েছিল বলে, কিছুক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারে। তারপর ঘামতে শুরু করে, ঘড়ি দেখে, জানলা দিয়ে মুখ বের করে প্রেসিডেন্সি কলেজ পর্যন্ত দেখে এবং শুনতে পায়, 'উরিত্তারা', 'হয়েছে', 'মিছিল' ইত্যাদি শব্দ। এই তিনটি শব্দ খুবই গোলমেলে এবং নাগরিকগণের একটি আশ্চর্য মানসিকতারই প্রকাশ। তারা নিজেরা মিছিলের অংশগ্রহণকারী হলে (যা তারা প্রায়ই হয়ে থাকে), এইসব ধ্বনি উচ্চারণ করত না। তবু এই ধ্বনিগুলি সেক্ষেত্রেও বাসটিতে থাকত। ফলে এ যেন একটি সরকারি বাস আর জ্যাম এবং একটি মিছিলের গোপন কথাবার্তা, অমল শুনে ফেলেছে এই যা।

'তবু ভালো আজকাল বাসে আগুন দেওয়া হয় না', 'হ্যাঁ, 'ভাড়া বাড়লে ট্রাম পোড়ায় না', 'হ্যাঁ'...বাসট্রামমিছিল কথা বলে চলে ও তা ছাপিয়ে ধ্বনি উঠতে থাকে : জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ...জিনদা—আবাদ...। বেঁচে থাকার, বহু বহুদিন জীবিত থাকার, মৃত্যুকে ভয় করার এই ধ্বনি অসংখ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ও আবেগে, তাদের হাত-পা-ছোঁড়ায় অত্যন্ত মানবিক তখন, তারা জীবিত থাকবেই, জীবিতের একটি রক্তাক্ত ঝান্ডা উড়ছিল, তারা ঝান্ডা দোলাচ্ছিল, ফলে এক লহমায় মনে হয় যেন শহর ও রাস্তাপ্লাবী এই রক্তস্রোত সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

তাদের কিছু মূর্ত দাবিও ছিল, যেমন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। এবং তারা বহন করছিল কুশের পুতুল। এই কুশপুত্তলিকার সঙ্গে কোনো কিছুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যেজন্য তারা কাগজের টুকরোয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম লিখে পুতুলটির বুকে সেঁটে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শহরের সমস্ত দফতরের প্রধান বা পিতা বলেই তারা কুশের পুতুলটি তার নামে উৎসর্গ করেছে, ধিক্কার আর জয়ের স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে একটি নাট্যানুষ্ঠান কল্পনা করা যায়। শরীর ভেঙে, বেঁকে কষ্টের দৃশ্য রচনা করছিল, তারপর কষ্ট থেকে চলে যাচ্ছিল ক্রোধ আর বিজয়ের দিকে। যেন-বা দফতরটি এবং মন্ত্রী-মহোদয়ের বিরুদ্ধে একটি কল্পিত যুদ্ধ ঘটে চলেছিল। এবং বন্যজন্তু শিকারের মতোই তাদের এই মহড়া যখন কুশের পুতুলটিতে আগুন ধরিয়ে দেবে, তখন মানুষের আদিম বিজয়ই আর একবার ফিরে পাবে সমস্ত বিশ্বাস।

অমলের তেমন তাড়া না থাকায় ওই বহ্ন্যুৎসবের কাছাকাছি নেমে পড়ে, হাঁটার সঙ্গী হিসাবেই একটি সিগারেট ধরিয়ে নেয়, বেশ মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ অন্তর ধোঁয়া টানে, একটু একটু করে ছাড়তে থাকে। মেডিকেল কলেজের ফুটপাত আর সামনের রাস্তার মধ্যে বেশ কয়েকবার তাকে ফুটপাত বদল করতে হয়। হাসপাতালের লাগোয়া ফুটপাতটিতে একদিকে যেমন গু-মুত, নোংরা ছিল, ভিখিরির থালা, তেমনি ফাটা ফুটপাতে গর্ত করে একজন

ভেলকিওয়ালা তার মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল মাটির ভিতরে, ভেলকিওয়ালাকে ঘিরে ছিল বেশ কিছু মানুষের ভিড়—তারা যুগপৎ ভীত আর আশ্চর্য।

এইসব দেখতে দেখতে, সময় নষ্ট করতে করতে, অমল একসময় দেখল জাদুঘরের সময় হয়ে গেছে। তখন সে তার অফিসটির গেটে পৌঁছে গেছে। এবং ততক্ষণে নিজেরই ব্যক্তিগত স্রোতে নিজের এই সাঁতার তাকে অবসাদ ফিরিয়ে দিচ্ছিল ঢেউয়ে ঢেউয়ে, সে প্রস্তুত হচ্ছিল শহরটিকে গ্রহণ করার জন্য। অফিসটিকে বাস্তব ভাবল শুধু তাই নয়, মনে হল, আহা, অফিসটি যে আজও আছে, এ কম কল্যাণের কথা নয়। অত্যন্ত সুন্দর ব্যাপার যে মিতা সরখেল নামে একটি মেয়ে আছে, অবিশ্বাস্য সরল একটি মেয়ে, এবং মেয়েটি তার সঙ্গে অন্তত তিন-চার ঘণ্টা থাকবে। শেষে তারা পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে একসময় রাতের খাবার খাবে।

ব্যানার্জিকে নিয়ে যান।

দরকার নেই।

ফোটোগ্রাফার লাগবে তো, এ একটা ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার।

মিতা তো যাচ্ছে সঙ্গে, ও তুলে নেবে।

অলরাইট।

কালারে নেবে।

গ্র্যান্ড।

ঠিক আছে।

হুঁ, তাহলে একটু বেশি এক্সপোজ করতে বলবেন, মানে ধরুন, ডাইনোসোরের স্কেলিটন ফ্রেমের এক দিকে রেখে শেরিফকে ধরলেন, আবার...

মানে জাদুঘরের অ্যাটমোস্ফিয়ারে গণ্যমান্যদের ধরা, এই তো?

হুঁ। আর আজকের স্টোরি ছাড়া আগামী রোববারের ম্যাগাজিনের জন্যও আপনি একটা আর্টিকেল তৈরি করুন জাদুঘর সম্পর্কে।

ও কে।

কেন যে জাদুঘরটি এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল অমল বুঝতে পারে না। সে কি কেবল দুশো' বছরের কারণে। হঠাৎ কেন সম্পাদক জাদুঘরের পরিবেশে গণ্যমান্যদের ফোটোগ্রাফের ব্যাপারে এত আগ্রহী। সংবাদপত্রের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত আছে বলেই অমল জানে, সমস্ত বিষয়ে দফতরটির তেমন বাঁধাধরা নীতি থাকে না, তবে ওইটুকু না থাকা, বা এতে যে ঢিলে ভাবটি থাকে তা মূলনীতিরই অন্তর্গত। যেমন শহরের সামরিকবাহিনী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখামাত্র গুলিবর্ষণ করলে, দফতরটি সে বিষয়ে খুবই চেপেচুপে লিখবে, অন্যদিকে মেয়ে-পাচারের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য দফতরটি গোয়েন্দা সংস্থাকে নিযুক্ত করবে। একথা সত্য, দাসত্বের প্রশ্নটি দ্বিতীয় ঘটনাটিতেও আছে, কিন্তু তার থেকে বড়োকথা মেয়ে-পাচারের ঘটনার যৌনতা আর হিংসাত্মক দিকটি। অফিসটি এসব দিক থেকে কেমন যেন মানমন্দিরের মতো, ব্যারোমিটারের মতো। ফলে অমল অনুমান করল, জাদুঘর এবং ক শহরের মধ্যে কোনো গভীর সম্পর্ক লুকিয়ে আছে। সে মৃদু উত্তেজনা অনুভব করল। ভাবল : দেখা যাক।

ছয়

এন মজুমদার শুধু নয়, স্বয়ং শেরিফও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানটিতে। বিদেশি দূতাবাস সরবরাহ করেছে কয়েকজন লাল আর রূপালি চুলের মেয়েকে, অন্যদিকে শহরের সবকটি দফতরেরই প্রধানরা যথাযথ গাম্ভীর্যে উপস্থিত। সভ্যতাকে নানাভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ব্যাখ্যা করছেন কয়েকজন তাত্ত্বিক, একজন দ্রষ্টা ঔপন্যাসিকও, শহরটির আত্মাস্বরূপ ঘন কালো চুলের রোগা কবিটিও বাদ যাননি এই সম্মেলনে। রং-চঙে জামায় আর ইংরেজি ভাষার অনর্গল ফোয়ারার মধ্যে ডুবে ছিলেন প্রচার আর বিজ্ঞাপন দফতরের কয়েকটি মাথা, তাঁদের দাড়ি, গোঁফ আর চুলের বাহার যথেষ্ট দর্শনীয় ছিল। বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা কিছু ফেস্টুন আর পোস্টার, রাজকীয় স্থাপত্যের স্তম্ভ-খিলান-সহ গথিক কাঠামোটিকে যেন সরিয়ে দিতে পেরেছে, এবং ওইসব পোস্টার আর ফেস্টুনের অক্ষরগুলিতে একপ্রকার বিস্ফোরণ ঘটায় তারাই হয়ে উঠেছিল দেওয়াল, মেঝে, ছাত বা জাদুঘরের সেই বিশাল বাড়িটি :

২০০ বছর পূর্তি উৎসব স্বাগতম ১৯৮৩
আমরা একুশ শতকে প্রবেশ করতে চলেছি
কথা কও অনাদি অতীত
প্রস্তরযুগের প্রদর্শনীর উপর গুরুত্ব দিতে হবে
মমি বাঁচিয়ে রাখার আরক চাই

কাগজের অফিসটিকে মানমন্দির ভেবে অমল যে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি, পোস্টারগুলি তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। অর্থাৎ, ক শহরে একটি আন্দোলন ঘটানোর তোড়জোড় চলেছে, জাদুঘর আন্দোলন। অচিরেই হয়তো এমন পোস্টারও নজরে আসবে যার মর্মার্থ : জাদুঘরই জীবন।

যে যত প্রাচীন হবে, সে ততই নবীন হয়ে উঠবে। যেমন একবার বলা হয়েছিল : যে যত পড়বে সে তত মূর্খ হবে। জীবন সম্পর্কে যাবতীয় সত্য এবং অনুভব এরপর খোঁজা শুরু হবে অতীত জীবনে। যেন সময়ের তাৎপর্যও বদলে যাবে কোনো এক কবির বাণীর মতোই।

কংক্রিটের আন্দোলন, সেতু আর অট্টালিকা গঠন, উড়ন্ত রাস্তা আর চলন্ত ফুটপাত নির্মাণের স্রোতটি তো কবেই এসেছে, আজ শুধু স্পষ্টভাবে বলা হল যে ক শহরটির প্রতি ইঞ্চি জমি ব্যবহৃত হবে জাদুঘরের কাজে। দফতরটির হ্যান্ডবিল বিলি করতে করতে, থাম্‌স আপের ছিপি খুলতে খুলতে, সিগারেটের ডগায় নীল রঙের গ্যাসের আলো ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে, হাসতে হাসতে, করমর্দন করতে করতে, মেয়েদের ঠোঁট, বুক আর নিতম্বের দিকে তাকিয়ে, পুরুষের চ্যাপটা বুক আর থুতনি লক্ষ করে, তারা এইসব বলে চলেছিল।

কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

আমিও কি পারছি?

আশ্চর্য!

আমার মনে হয় বোঝার চেষ্টা না করাই ভালো।

হুঁ।

দেখে যান।

অ্যাবসার্ড।

'দেখুন যুগযুগ ধরে মানুষ অনেক কিছুই ভেবেছে, তবে আইডিয়ার থেকে পরিশ্রম জিনিসটা অনেক বড়ো। প্রতিদিনের খাটনি একটা মহৎ ব্যাপার। একদিন আমরা থাকব না, কিন্তু...', শেরিফের নিজস্ব চর্চার বিষয় কী সম্ভবত কেউই জানত না, তবু প্রারম্ভিক ভাষণ শুরু হওয়ার একটু আগে তিনি সুন্দরী এক নারীকে চাপাস্বরে হলেও এমনভাবে এইসব কথা বললেন যাতে সেখানে যে ছোটো বৃত্তটি ছিল তারা সবাই যেন শুনতে পায়। 'গড়ে তোলার ঝোঁক এখন বেশ বেড়েছে...' উনি হয়তো আরও কিছু বলতেন কিন্তু কে একজন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ দেখছেন না চল্লিশের মধ্যে সবাই বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।' হাসির দমক ওঠায় ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন তাঁর কথাটি সবাই ভুল ভাবেই নিচ্ছে, 'আমি তা মিন করিনি', তখন 'সরি', 'না ঠিক আপনার কথায় নয়...' আর ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রটি যেন তখনই প্রস্তুত হল, তিনি দু-একবার 'জীবন' ও 'সমষ্টি' শব্দটি ব্যবহার করে ক্রনিকালের একটি অভিনব তত্ত্ব হাজির করতে চাইলেন। সকলেই উৎসবের মেজাজে থাকায় একটু পরেই প্রসঙ্গটি বদলে গেল, কমিশনার বললেন 'শৃঙ্খলা' এই ধারণাটিকে ভাস্কর্যে রূপ দিতে অনুরোধ করেছিলাম আর সি চৌধুরীকে, বাই দা বাই, ওনাকে দেখছি না তো...'।

অ্যাবসার্ড!

আহা, ধৈর্য রাখুন।

একা দুশোটি প্রদীপ জ্বালা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট কষ্টের ব্যাপার, আর তা অনুমান করেই যেন সমবেত ভদ্রজনরা প্রসারিত করে দিলেন সাহায্যের হাত। এতক্ষণ মিতা সরখেল যতই 'অ্যাবসার্ড-অ্যাবসার্ড' করে থাকুক, দেখা গেল সে-ও একটি জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে টেবিলের এক প্রান্তে, প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টায় তার বেণীটি, হর্স টেইল, এমনভাবে ঝুঁকে পড়ল তারই বাহু আর কাঁধের একটি পাশে, যে উৎসবের ছোঁয়া লাগল তার শরীরে।

প্রারম্ভিক ভাষণ তাদের বেশ দুর্বোধ্য লেগেছিল, সম্ভবত পরিভাষার কারণেই; মিতা সরখেল বলল 'চলুন', 'একটু ঘুরে দেখি'। তারা লাল-নীল আলোর ঢেউয়ে, প্রায় ভাসতে ভাসতে, এক-একটি একজিবিটের সামনে এল, অতিকায় তৃণভোজীদের কঙ্কাল দেখল, দেখল স্তন্যপায়ীদের, জারের মধ্যে ছিল একটি আশ্চর্য শিশু, তার মাথার সংখ্যা পাঁচটি, বন্য মানুষের একটি ডামি রয়েছে, সে এই প্রথম আগুন জ্বালতে শিখেছে, অথচ এই শেখাটার মাহাত্ম্যের প্রায় কিছুই তখনও আন্দাজ করতে পারেনি, বরং আগুন দেখে প্রবল শরীরের মানুষটা ভয় পেয়েছে, অচল মুদ্রা আর মৃত মানুষের, পাথর আর জীবাশ্মের টুকরো বোর্ডে কখনো সাঁটা, কখনো বা মাউন্ট করে রাখা হয়েছে। লোহার অস্ত্র, পাথরের অলংকার ছেড়ে কবে চলে গিয়েছে সেসবের ব্যবহারকারীরা!

একতলা-দোতলা, একটি ঘর, তার পরের ঘর, একটির পর একটি হলঘর ঘুরে চলেছে অমল। মিতা সরখেল থেমে পড়ছে, অমল হারিয়ে যাচ্ছে, আবার তারা পরস্পরকে খুঁজে

পাচ্ছে। হিমযুগ পেরিয়ে যেতে আর ডায়নোসোরের বিশাল মূর্তি দেখতে পেল না, অতিকায় জন্তুরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তার আগেই, 'ভালো লাগছে না' অমল বলল, যেন-বা সে মিতার কাছে প্রার্থনা করছিল 'চলুন একটু চা খেয়ে আসি'! যখন মিতা সেই জারের শিশুটির কাছে, 'জাদুঘরে এই শিশুটি...', মিতা শেষ করতে পারে না, এবার অমল বলে ওঠে 'অ্যাবসার্ড'। এবং আবার তারা আর একটি ঘরের পিলারের কাছে চলে আসে, সেখানে ছিল প্রাচীন কয়েকটি মূর্তি, মূর্তিগুলির তলায় রাজবংশের নাম, সাল তারিখ—এইসব লেখা ছিল। দেব-দেবী, নরনারীর সেইসব মূর্তির সঙ্গে ছিল জন্তুজানোয়ারের মূর্তি। মানুষ বনে জঙ্গলে আগুন জ্বেলে কতবার যে এইসব জন্তুদের ঝলসে খেয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। বিশাল ঘোড়ার মূর্তিতে আসীন এই মূর্তিটি-ই হয়তো কবে একদিন ছিঁড়ে খেয়েছিল বুনো মোষ বা ঘোড়ার মাংস। আবার তারাই মুদ্রায় তুলে নিয়েছে ছুটন্ত ঘোড়ার ছাপ, সামনে যে বিপুল হাপরটি রয়েছে তা-ই গনগনে করেছিল ছুরির ফলাটি, অথচ আগুন-জ্বালতে-শেখা একজন মানুষ বিশাল বৃক্ষ, বৃষ্টিপাত, পাহাড় আর সমুদ্রের কাছে একটা জেলে ডিঙির থেকেও সামান্য ছিল সে। আর সেইরকম বিপন্ন।

মিতা বিড়বিড় করে চলেছে, অমল তার হাত ধরল; 'প্লিজ বক্তৃতা করবেন না।' অমলের চোখ দুটো জ্বলছিল, বেজায় বিরক্ত বোধ করছে সে, 'ননসেন্স' অমল বলেই ফেলল। 'দেখছেন দেখুন, এত বকবক করার কী আছে, আমি দেখেছি এ প্রায় ব্যাধির মতো, এরকম কোনো কিছুর মুখোমুখি হলেই যত সব পচা দার্শনিকতা, ইতিহাস ভিড় করে আসে, কেন বলুন তো? আপনি রিয়েলি কী ফিল করছেন এখন, ইতিহাস? দর্শন?'

না।

তাহলে?

কেমন যেন...

তাহলে বাজে বকছিলেন কেন?

কথা বলতে চাইছিলাম।

কেন?

কেমন ভয় করছিল।

'ভয়' শব্দটি উচ্চারণ করার পর যে নাটকীয়তা, অমল সহজেই তার বাইরে চলে যেতে পারল। কারণ মিতা সরখেলের চোখের দিকে তাকাতেই দেখল সাদা জমিতে প্রায় ছড়িয়ে পড়া মিতার কালো তারা দুটিও ভয়কে গোপন করতে পারছে না। ফাঁকা হলঘরে, তারা দুজনও মৃত জগতের এই অজস্র একজিবিটের মধ্যে যেন একজিবিটেরই পাকাপোক্ত জায়গা পেতে চলেছে। মিতা ভয় পাচ্ছে, সে অমলকেও ভয় পাচ্ছে, অমলের মধ্যেও হিংস্রতা আছে সে জানে। আবার সে দুর্বল বোধ করছে, আকর্ষণ অনুভব করছে, এই মৃতের জগৎটি ভয়াবহরকম নিঃসঙ্গ। যদিও অন্ধকারের বদলে এখানকার মসৃণ মেঝে, সিলিং আর দেওয়াল সর্বত্র শুধু আলোর বিচ্ছুরণ, কিন্তু ওই প্রখর, নগ্ন আলোয় কোনো কমনীয়তা নেই। নরম নয়। একটুও নরম নয়।

সেই তীব্র আলোকের মধ্যে অমলের সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছিল আর-এক জোড়া পায়ের শব্দ, তবু এই জাদুঘরের একটি অংশ এমন স্তব্ধতায় ডুবে ছিল, যে, মিতা সরখেলের পায়ের শব্দ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, শব্দের জোরও ছিল অস্বাভাবিক। মমির পর মমি পেরিয়ে তারা চলেছিল, হঠাৎ মিতা সরখেলের আর্তস্বর শোনা গেল। ঠোঁটের ওপর সাদা রুমাল চেপে ধরেছে সে, মানুষের ঠোঁটে যে এত রক্ত থাকতে পারে, যন্ত্রণায় এতখানি কুঁচকে যেতে পারে এবং আবার বিস্ফারিত হতে পারে তারা জানত না। সাদা রুমালটি তুলোর মতো কাজ করল, রুমালে রক্ত উঠে এল। আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদটির নির্জনতায় উষ্ণ ও উপচে-পড়া সেই রক্ত শীতকালীন আবহাওয়ায়, একটি সামুদ্রিক মেলা চলাকালীন ক শহরের দক্ষিণ ভূভাগ যে হাড়জমানো ঠান্ডা বছরে মাত্র তিনটি দিন বয়ে আনে, তার চেয়েও ভয়ংকর এক হাড়জমানো ঠান্ডায় প্রাসাদটিকে টেনে নিচ্ছে। এইরকম ফ্যাকাশে আর মৃত লাগছিল তাদের, তাদের অনুভব এতখানি অতিপ্রাকৃত হয়ে উঠছিল। 'এ কী! ইশ, কী করলেন, দাঁড়ান! দাঁড়ান। দেখি, ইশ, কী করলেন বলুন তো!' অমল কী করবে, সে কি মিতাকে, এখন যেমন অনুভব করছে স্নেহের ডানার তলায় নিয়ে আসবে। এবং মিতা বিড়বিড় করছিল, 'কিছু না, কিছু না, হঠাৎ কামড়ে ফেলেছি', আর ভয় পাচ্ছিল।

সে তারপর গল্পটি বলেছিল। যেন-বা কাচের অফিসটিতে অজস্র মৃত ঘণ্টার মধ্যে মিতা যে অমলকে খুঁজে নিয়েছিল তা শুধু এই গল্পটি বলার জন্য। ততক্ষণে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে অমল আর মিতা নেমে এসেছে জাদুঘরটির প্রথম দ্বারে, উৎসব বহু আগে শুরু হয়ে যাওয়ায়, জাদুঘরটি দুশো বছরের পূর্তি উৎসবের ফুল, সুগন্ধ, পানীয়, ভোজ্য আর জাঁকজমকের সজ্জার মোড়কে অসংখ্য মানুষের তাজা মাংস টেনে নিয়েছে তার গর্ভগৃহে। বাইরে চওড়া, থাক-থাক সিঁড়ি এখন শুধুই নির্জনতা আর বিস্মৃতি, যার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বহু ভাষাভাষী মানুষের স্রোত, শহরের পর শহর পেরিয়ে আসা মানুষ, চক্ষুষ্মান আর অন্ধ।

'আমিও, আশ্চর্য, শুধু দারিদ্র্য, দারিদ্র্য দেখেছি, সেও তো ভয়, ভয় আর হতাশা' অমলের ভিতর থেকে কেউ কথা বলছিল। কিন্তু কথা ঝরে পড়ার পরেও যেহেতু তারা বসে ছিল, চাপা আলোয় তাদের চামড়া, হাতের লোম চিকচিক করছে, বসে আছে এমন দুজন মানুষ যারা জানে না কোনোদিন আর কিছু দেখবে কি না, যেন-বা তারা গোটা জাদুঘরটি দেখে ফেলার পর, মিতা যেমন আগে ভাবত, ঠিক তাই ঘটেছে, এই শহর হয়ে গিয়েছে এক মৃতের শহর। তারা আর কিছুই দেখবে না অথচ বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকতে থাকতে, এই বিচ্ছিন্ন বেঁচে থাকা চলতে থাকবে শরীরের ছায়ার মতো। তারা বসলে, ছায়াটিও বসে পড়বে।

ছায়া গল্প শুনবে, 'বলেছি তো, যতবার, যতজন মানুষের কাছে এসেছি, কেমন হয়ে যেতাম শেষটায়', ছায়া বলে চলেছিল। এখন আর ভয় ভীতি নেই। পথচারী দু-চারজন যুবক অশ্লীল কথা বলে গেল তাদের, দু-চারজনের ঈর্ষা হল, তারা অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল 'ইস্‌স'। বিটের কনস্টেবল একবার সিঁড়ির দিকে তাকিয়েই নিজের হাতঘড়িটিতে চোখ ফেরাল। 'আমি আত্মরক্ষা করতে জানতাম না', মিতা সরখেলের কণ্ঠ এখন সম্পূর্ণ আবেগহীন, সে যেন শুধুই বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি ঘটনার। 'নিজের শরীরও ছুটে যেতে চায়, কাউকে দোষ দিচ্ছি না, আজ

ও...পরেই মনে হল' মিতা সরখেলের সরলতা ও বোকামির গল্প এই পর্যন্ত। অমল নিশ্চুপ, যদিও তাদের ঘিরে কোনো নীরবতা নেই; গর্জনশীল শহর রক্তেমাংসে আছড়ে পড়ছে সামনে, হেডলাইটের সতর্ক আলোর ফলা ঝলসে উঠছে।

আপনার কথা বলুন।

দেখুন মিতা, আপনার গল্পটি যদি ভালোবাসার গল্প হয়, তাহলে আমার গল্পটিকে বলা যেতে পারে প্রাণধারণের ভয়ংকর চেষ্টার গল্প।

আবার কবরের স্তব্ধতা। অমল বলেছিল, 'উঠবেন?' মিতা ততক্ষণে বেশ ঝলমলে হয়ে উঠেছে। সে অনেকটা সময় পেয়েছিল নিজেকে সারিয়ে ফেলার, এখন সে আবার জাদুঘরের উৎসবে যোগ দিতে সক্ষম। আর যেহেতু অমল মিতার হাত ধরে মৃদু চাপ দেয়নি, জাদুঘরের হলঘরে হঠাৎ উন্মত্ততায় মিতাকে চুম্বন করেনি, অথচ তারা বন্ধুর মতো কথা বলেছে, সে কারণে ভাবছিল একটি মারাত্মক হিংস্রতা সে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। আগেকার হতাশার দিনে, শরীরী মৃত্যু আর প্রাণপাত দারিদ্র্যের দিনে অমল কি পারত? সিঁড়ি থেকে উঠতেই দুজনে সবিস্ময়ে লক্ষ করল, উৎসব শেষ করে শহরের শেরিফ-বিচারক, কমিশনার, সম্পাদক, রাজ্যপাল আর মন্ত্রী-সহ গণ্যমান্যরা বেরিয়ে আসছেন সেই গর্ভগৃহ থেকে, জাদুঘরের বিপুল কাল যেন তাঁদের প্রদান করেছে নতুন জীবন। সেই জীবনসমেত একটি জীর্ণ শহরের তন্তুতে তন্তুতে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ট্রাফিক কনস্টেবল শোভাযাত্রাটিকে পথনির্দেশ দিচ্ছে, চলন্ত গাড়ির অজস্র চোখ নক্ষত্রের মতো গড়াতে গড়াতে ছুটে আসছে তাদের দিকে, এবং শহরের একমাত্র জাদুঘরটি ক্রমশ স্থানান্তরিত হচ্ছিল আলোর বিপরীত পিঠটিতে।

অন্ত্যভাষ

আখ্যানধর্মী, সংগ্রহভুক্ত এই গদ্য রচনাগুলির মধ্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তিনটি বই স্থান পেয়েছে। *কমুনিস* (১৯৭৫), *অকালবোধন ও অন্যান্য গল্প* (১৯৭৪) এবং *শৈশব* (১৯৮০)। *কমুনিস* তিনবার মুদ্রিত হয়, প্রতিবার ছাপা হয় ১১০০ কপি। দিল্লির রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন থেকে *কমুনিস*-এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। ১৯৯৯ সালে *শৈশব* আবার ছাপা হলেও, তিনটি বই-ই এখন দুষ্প্রাপ্য।

অকালবোধন ও অন্যানা গল্প বইটির গল্পগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যে। গ্রন্থভুক্ত বাদবাকি সমস্ত রচনাই ১৯৮০-৯৫ এই সময়কালের মধ্যে রচিত এবং প্রকাশিত। বর্তমান সংগ্রহে দু-একটি ক্ষেত্রে তথ্যগত, ভাষাগত ত্রুটি সংশোধন এবং বানান সংস্কারের বেশি কোনোরকম পরিমার্জনা করা হয়নি। *চতুরঙ্গ, মহানগর, বারোমাস, বীক্ষণ, সম্মুখ, উন্মেষ, শুকশারী, নান্দীমুখ, স্পন্দন* প্রভৃতি পত্রিকায় গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বন্ধু শ্যামল ধর-এর প্রবল উৎসাহের কারণেই এমন একটি সংস্করণ সম্ভব হল। 'তাহারা' এবং 'শহর সংস্করণ' লেখক বন্ধু পার্থ মুখোপাধ্যায়, অকালবোধনের অন্তর্গত গল্পগুলি অগ্রজ লেখক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে খুঁজে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার অশেষ ঋণ।

লেখকের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিষয়ানুক্রমিক বিবরণ

গল্প-সংকলন

১। অকালবোধন ও অন্যান্য গল্প

কলকাতা : রায় এন্ড চৌধুরী, ১৯৭৪ (অগস্ট)।

[১২] + ১০০ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি,সাত টাকা।

প্রচ্ছদ : অতনু চট্টোপাধ্যায়।

উৎসর্গ : বহবমপুব জেলে যাকে পিটিয়ে হত্যা কবা হয়েছে সেই তিমির এবং অন্যান্য শহীদদের উদ্দেশে।

[সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায সম্পা এই গ্রন্থে মোট বাবোটি গল্প ছিল, বর্তমান গ্রন্থে তা সংকলিত। রচনাকাল : ১৯৭২-৭৪]

২। বাদার গল্প

কলকাতা : বর্ণনা, ১৩৮৪ (১৯৭৭)।

[৮] + ৭৪পৃ ; ২২ × ১৪ সেমি,সাত টাকা।

প্রচ্ছদ : সুমন্ত চট্টোপাধ্যায।

উৎসর্গ : শহীদ কবি সবোজ দত্তকে।

[সাতটি গল্প : 'ভূ , টঙ', 'বাদাব গল্প ১', 'বাদাব গল্প ২', 'বাদাব গল্প ৩', 'ভাসানিজাল ও বমানাথ আবি', 'সম্পত্তিবানদেব বিকদ্ধে ছিক মাঝি'— এখানে সংকলিত। পবে লেখকেব 'গল্প ৩৩' (২০০৪) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। বচনাকাল · ১৯৭৬-৭৭]

৩। অংশগ্রহণ

কলকাতা : বাক্‌শিল্প, ১৩৯৬ (পৌষ)/১৯৯০ (জানু)।

[৬] + ১৫৪ পৃ.; ২২ ২ × ১৪.২ সেমি;ত্রিশ টাকা।

প্রচ্ছদ : ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত।

উৎসর্গ : অজিত চৌধুবী বন্ধুবরেষু [সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি।]

[গল্পগুলি 'অংশগ্রহণ' এবং 'ফানুস' দুটি অংশে বিভক্ত—প্রথমাংশে 'অংশগ্রহণ', 'কথামালা', 'সমুদ্রস্নান', 'সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ', 'গুহাচিত্র', 'শূন্যপুরাণ', 'আত্মজীবনীর খসড়া'—সাতটি এবং দ্বিতীয়াংশে 'ফানুস', 'জলযাত্রা', 'তিন বুড়ি', 'কলকাতায় পরীরা, 'মালতীর ভয় পাওয়ার রোমহর্ষক বৃত্তান্ত'—পাঁচটি, মোট বারোটি গল্প রয়েছে। রচনাকাল : ১৯৭৭-১৯৮৬]

৪। গল্প ৩৩

কলকাতা : আখ্যান, ২০০৪ (বইমেলা)।
[৮] + ৩৭৬ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; ২০০ টাকা।
প্রচ্ছদ : সুনীল দে। প্রচ্ছদলিপি : নির্মলেন্দু মণ্ডল।
উৎসর্গ : যোগীয়াকে [লেখকের সন্তান]

[পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ 'বাদার গল্প' এবং 'অংশগ্রহণ'এর অধিকাংশ গল্প ('অংশগ্রহণ' গল্পটি ছাড়া) এই গ্রন্থে সংকলিত। এ ছাড়া 'সম্মোহন', 'মুদ্রাদোষ', 'কামসূত্র', 'আত্মবসন্তব', 'ঋতু পরিবর্তন', 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা', 'অসৎ সংসর্গে জ্ঞানবান ভূত', 'গন্ধকালী'—আটটি নতুন গল্পও সংকলিত হয়। বইটি 'বেঙ্গল পিয়ারলেস হাউজিং ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড'এর 'আংশিক আর্থিক সহায়তা'য় প্রস্তুত।]

৫। আশমানি কথা : উচ্ছেদের ৫ কহন

কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৭ (জানু.)।
১৮০ পৃ.; ২১.৩ × ১৪ সেমি; ১৭৫ টাকা।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : blackmalat
উৎসর্গ : প্রিয় সম্পাদক অশোক সেন-কে/তিন দশক যাবৎ আপনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন, ধরিয়ে দিয়েছেন বহু ত্রুটি; এই বইটি আপনাকে উৎসর্গ করছি ঋণস্বীকার এবং শ্রদ্ধা জানাতেই।

[বইটির উৎসর্গপত্রের পরের পৃষ্ঠায় কবি সমর সেনের কবিতার উদ্ধৃতি : 'মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাৎরার মতো রাত্রি'।
পাঁচটি গল্প : 'এবং পাখি কহিল, কে? তুই কে?', 'স্বপ্নের বুলডোজার', 'নরবলি', 'হালালের পরম্পরা', 'আশমানিকথা' এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। রচনাকাল : ২০০৫-০৬]

উপন্যাস

১। কমুনিস : ১ম পর্ব

কলকাতা : বর্ণপরিচয় প্রকাশনী, ১৩৮২ (১লা আষাঢ়)।
[৪] + ১৫৪ পৃ.: ১৮.৬ × ১২.৯ সেমি; ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

[লেখকের জবানি : "ছাড়পত্র' (অধুনালুপ্ত) এবং 'সম্মুখ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৯৭৩-৭৪) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১ম পর্বের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও আমার ধারণায় এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের আয়োজন। দিলীপ চৌধুরী'র সক্রিয় উদ্যম ছাড়া যা কোন মতেই সফল হত না। সত্তরের মানসিকতার এক ফোঁটাও যদি অবিকৃতভাবে উপস্থিত করে থাকতে পারি তাহলে শ্রম সফল হয়েছে মনে করব। অবশ্যই এই বিশাল বিচিত্র পটভূমি এবং বীরোচিত চরিত্র সৃষ্টির যে কাজ তা আমার সাধ্যের বাইরে।"]

তদেব; দ্বিতীয় মুদ্রণ।

কলকাতা : বর্ণনা, ১৩৮৩ (ভাদ্র)।

[৪] + ১৫৪ পৃ.; ১৮ × ১২ সেমি; পাঁচ টাকা।

প্রচ্ছদ : সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়।

[দ্বিতীয় মুদ্রণের সময় প্রথম সংস্করণের ওই জবানি মুদ্রিত হয়নি। বইটির তৃতীয় সংস্করণ-ও প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তৃতীয় সংস্করণ থেকেই '১ম পর্ব' কথাটি বর্জিত হয়]

২। **শৈশব**

কলকাতা : ধ্রুপদী, ১৯৮০ (ফাল্গুন ১৩৮৬)।

১৪৮ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; বারো টাকা।

প্রচ্ছদ : গৌতম চৌধুরী।

উৎসর্গ : অন্নপূর্ণাকে [লেখকের গর্ভধারিণী]

তদেব; দ্বিতীয় মুদ্রণ।

কলকাতা : ব-দ্বীপ, ১৯৯৯।

[৪] + ১২৪ পৃ.; ২১.৫ × ১৪ সেমি; পঞ্চাশ টাকা।

প্রচ্ছদ : নন্দলাল বসু। লেখকের মুখাবয়বের ড্রইং কৃষ্ণেন্দু চাকী-কৃত।

[উৎসর্গপত্রে 'অন্নপূর্ণাকে' শব্দের নীচে 'দাঙ্গা-দেশভাগ-বিনাশ অতিক্রান্ত জীবনের প্রতিবিম্ব' কথাটুকু মুদ্রিত থাকতে দেখা যায়, যা আগের মুদ্রণে ছিল না। এ ছাড়া 'শংকর বসু' ছদ্মনামের পরিবর্তে লেখকের নিজস্ব নামেই প্রকাশিত হয়।]

৩। **বামন অবতার**

কলকাতা : কথাবার্তা, ২০০২ (জানু.)।

১৫২ পৃ.; ২১.৩ × ১৪.১ সেমি; ৭০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল।

উৎসর্গ : বইটির পাণ্ডুলিপি প্রথম যিনি পড়েছেন/বন্ধু দীপেশ চক্রবর্তীকে।

[বামন অবতার, চোথাপুরাণ, ঘুমের আয়োজন, অক্ষরগ্রাস—চারটি স্বতন্ত্র শীর্ষকে বিভক্ত সমগ্র রচনা।]

৪। **সটীক জাদুনগর**

কলকাতা : চর্চাপদ, ২০০৮ (জুন)।

৪০০ পৃ.; ২১ × ১৪.৩ সেমি; ৩৫০ টাকা।

প্রচ্ছদের ফটোগ্রাফ : সবুজ মুখোপাধ্যায়।

সটীক জাদুনগর চিত্র : শেখর রায়।

উৎসর্গ : শ্রদ্ধেয় রণজিৎ গুহ-কে।

['বামন অবতার', 'সটীক জাদুনগর' এবং 'শোকবার্তার কয়েকটি লাইন'—উপন্যাসত্রয় একত্রে।]

জার্নাল/প্রতিবেদনমূলক রচনা-সংকলন

১। এক যে ছিল গ্রাম

কলকাতা : সিনেট হল পাবলিশার্স, ১৯৮৪ (জানু.)।
১১০ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; বারো টাকা।
উৎসর্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

[রচনাক্রম : গ্রাম্য কথকতা—১, গ্রাম্য কথকতা—২, গ্রামের পর গ্রাম, জেলেদের কথা, পরিবহন, ধান চালের হাট, চিকিৎসা, ডিসেম্বরের ঝড় একাশি, এক যে ছিল গ্রাম।
লেখকের জবানি : "গল্প-রিপোর্টাজ নিবন্ধের এই সংকলনটি গড়ে উঠেছে ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে। যতটুকু পিছনে ফেরা হয়েছে সে সবই আবার সমসাময়িকে ফিরে আসার জন্যই। এই সময়ে গ্রামের সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা পঞ্চায়েত বর্তমান সংস্করণে নানা কারণে যুক্ত করা যায়নি, ভুল-চুক হয়ত আর-ও আছে। অসন্তোষেরও শেষ নেই।"]

২। অন্য কলকাতা

কলকাতা : বাউলমন প্রকাশন, ১৩৯২ (১৫ মাঘ)।
[৪] + ১২৪ পৃ.; ২১ × ১৪ সেমি; ১৫ টাকা।
প্রচ্ছদ : পুণ্যব্রত পত্রী। আলোকচিত্র : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[সংকলিত নিবন্ধ : ফুটপাথের কলকাতা, অন্য কলকাতা, অন্য কলকাতা/২, শিশু মজুরের বর্ণমালা, শিশুর রুটী লুকান আছে শহরের আবর্জনায়, ফুটপাথে দশ-বছর, মুলুক মজঃফরপুর, ঝুপড়ির বাসিন্দা, হাড়কাটা লেন, পান গুমটিতে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বস্তিবাসীর স্বর্গ : সি আই টি কোয়ার্টার্স, এককালের বাগানবাড়ি আজকের পোড়োবাড়ি, বারো ঘর এক উঠোন, জবর-দখলের বাড়ি, একশো বছরের মেস বাড়ি, বস্তি বদল: বড়বাগান, বড়বাগান বস্তিতে পরিবর্তন ২, কলকাতার ট্যানারি, কলকাতার শিল্পাঞ্চল : দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, হতাশা, কাগজকলের শতবার্ষিকী ও মজদুর সমাচার ১, ২ ও ৩, তামাম হিন্দুস্তানকে আমরা কুর্তা-কামিজ পরিয়ে রেখেছি, কলকাতার সেফিল্ড বেলিলিয়াস রোড ধুঁকছে ১ ও ২, মোহিনী মিলে লক-আউট ১ ও ২।
লেখকের জবানি : "সংকলনভুক্ত রিপোর্টাজগুলি 'আজকাল' পত্রিকায় এপ্রিল থেকে জুন ১৯৮০ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। রিপোর্টাজ সম্বন্ধে বলার কথা এই যে এতে বানানো-সাজানো কিছু নেই। ফুটপাথ থেকে বস্তি, বস্তি থেকে পোড়ো, জবর দখলের জীর্ণ বাড়ি এবং সামান্য দু চার জন বস্তিবাসী যাঁরা লটারি পাওয়ার মত সি আই টি কোয়ার্টার্সে মাথা গুঁজতে পেরেছেন, এই পর্যন্ত রিপোর্টাজের বিচরণ ক্ষেত্র। প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের তুঙ্গে অবস্থিত এই শহরের বিপুল সংখ্যক হাভাতে-হাঘরে মানুষের কয়েকজনের বাঁচা-কাহিনী। যে কাহিনী তাঁরা নিজেরা, নিজেদের রক্তে কলম ডুবিয়ে লিখলে শিলালিপি হয়ে যেত।"]

৩। বাংলার মুখ

কলকাতা : ক্রিয়াভিসন, ১৯৯৮ (জানু.)।
২৭৬ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; ১৭৫ টাকা।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত চৌধুরী।
উৎসর্গ : চিত্তপ্রসাদ স্মরণে।

[সূচি : বাংলার মুখ, মশাল বাহকরা, প্রান্তিক বৃত্তান্ত, কথকতা।
লেখকের জবানি : "গ্রামাঞ্চলে টো-টো করতে আমাকে বাধ্য করেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। মাঝে মাঝে পরিক্রমা যতিচিহ্ন আক্রান্ত হয়েছে—তবে পূর্ণচ্ছেদ কখনওই নয়। আমার সহকর্মী আনন্দবাজার পত্রিকার সুমন চট্টোপাধ্যায়, রজত রায় এবং সানন্দা-র অনিরুদ্ধ ধর-এর সক্রিয় সমর্থনে কাজটা সহজ ও সম্ভবপর হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্ররোচক এবং সংগঠক, চিত্র পরিচালক ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়। গ্রহণ, বর্জন যৎসামান্য, এই আশঙ্কায় যাতে প্রতিবেদনে নিহিত দিনলিপি-চরিত্র বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হয়। লিখন কুশলতার থেকে গ্রামজীবনের এই মহাকাব্যের অজস্র জীবন-চরিতের গুরুত্ব ঢের ঢের বেশি।"
পুস্তক পরিচিতি (অংশবিশেষ) : "চরিত্র অজস্র, বিচরণভূমি বাংলার গ্রাম। জীবন-বৃত্তান্ত তাদেরই। শ্রম ও আন্তরিকতায় গড়ে তোলা গ্রাম জীবনের নির্ভরযোগ্য ও নাটকীয় দিনলিপি বাংলার মুখ। আদিবাসী তরুণী থেকে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ কৃষক কে নেই এই মহামিছিলে। লাঠিয়াল, বাঁশপাতা দিয়ে নাড়ি কাটা দাই মা, খোলবন্দি ক্রীতদাস, ঘোড়া ডাকাত ও বর্গীর মধ্যযুগীয় গ্রাম আজকের দ্রুত-বদলে-যাওয়া, একুশ শতকের বাংলাতেও দিব্যি টিকে আছে। রূপান্তর পর্বে তারা যেমন নেই হয়ে যায়নি, তেমনই আছেন জঙ্গল সাঁওতাল নামের জ্বলন্ত এক প্রতিবাদ।..."]

তদেব; পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ।
কলকাতা : ছাতিম বুক্‌স, ২০০৬ [পরিবেশনা : প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী]।
[৮] + ৩১৬ পৃ.; ২২.১ × ১৪ সেমি; ২৯৫ টাকা।
প্রচ্ছদ : সর্বজিৎ সরকার। ছবি : জয়দীপ মুখার্জী।
উৎসর্গ : চিত্তপ্রসাদ স্মরণে।

[সূচি : বাংলার মুখ, মশাল বাহকেরা (২য় সং-এ এ-কার এসেছে), প্রান্তিক বৃত্তান্ত, তারাশঙ্করের রাঢ়বঙ্গ, জার্নাল '৯৯—'০৫, কথকতা, নিধিরাম।
নতুন তিনটি অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) শুধু যুক্তই হয়নি, স্বতন্ত্রভাবে প্রতি অংশের অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদেরও শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এই সংস্করণে, স্বতন্ত্র রচনা হিসাবে যা লিখিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। এই সংস্করণে কোনো অলংকরণ নেই।]

৪। **জার্নাল সত্তর**
কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৬/২০০০।
১০৪পৃ.; ২১.৫ × ১৩.৫ সেমি; ৪০ টাকা।
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।
উৎসর্গ : তিমির বরণ সিংহের স্মৃতিতে/বহরমপুর জেলে যাকে হত্যা করা হয়েছিল।

[পরিচ্ছেদ পর্যায়ক্রম : জার্নাল সত্তর, ধাপার মাঠ, বেলেঘাটায় ভারতমাতা, যশোদা বৃত্তান্ত।
লেখকের জবানি : "নকশালবাড়ি আন্দোলন বিপুল এক সামুদ্রিক ঝড় তুল্য। কৃশ এই গ্রন্থটি মোটেই সেই উত্তাল সময়ের ইতিহাস নয়। বরং নগণ্য এক সৈনিকের স্মৃতিচারণ। শহরের একটি

অঞ্চল ও সময় কীভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিল তার প্রতিটি রেখা, ভঙ্গি বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও সাহস যদি এই বয়ানে অন্তত কিছুটা স্পষ্টতা অর্জন করে থাকে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।...”]

৫। **প্রান্তজনের কথা**

কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪০৯ (২০০৩)।
[৪] + ১৬৮ পৃ.; ২১.৭ × ১৪.৪ সেমি; ৬৫ টাকা।
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।
উৎসর্গ : প্রিয় বন্ধু বিনয়কে/ভীম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হল রথী,/চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি।

[রচনাক্রম : ছাপা হরফে কুন্দ-র শৈশব (অক্টোবর, ২০০৬), চামারচরিত (অক্টোবর, ১৯৮৬) রাঢ়বঙ্গের লেঠেলগ্রাম (আগস্ট, ১৯৯৯), নষ্ট মেয়ের কথা (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮), সাত তারার হোটেল (১ এপ্রিল, ১৯৯৩), অন্যপথের পাঁচালি (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০), ঢোলিরাম, মধুমতী ও অন্যান্য মাদারি (১৩ আগস্ট, ১৯৮৯), তাহাদের কথা (রচনা : ১৯৮১), এক যে ছিল গ্রাম (রচনা : ১৯৮১)।]

৬। **বাবু বিবি এবং তাহারা**

কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১০ (২০০৪)।
২৪৮ পৃ.; ২১.৭ × ১৪.২ সেমি; ১০০ টাকা।
প্রচ্ছদ : অনুপ রায়।
উৎসর্গ : বিনয় ঘোষ বন্ধুবরেষু।

[সূচি : (ক, *পথের গান* : (১) জাতীয় সড়ক, (২) রাত বাড়ছে : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব।
(খ) *বাবু বিবি* : (১) বাবু নন্দলাল বসুর দিনলিপি (১৮৮৪-১৯০২), (২) অলিগলিতে উনিশ শতক, (৩) বাবু বিদায়ের উপাখ্যান, (৪) গোপাল কী করে রবার্ট হল, (৫) অথ বাংরেজ কথা, (৬) মরা মনে ধেই ধেই নাচ চার চারটে দিন, (৭) গাই, আপোসের জয়গান, (৮) পুঁটিরামের ডালপুরি।
(গ) *তাহারা* : (১) অন্য কলকাতা (রচনাটি 'অন্য কলকাতা' বইয়ের 'অন্য কলকাতা : ২'এর পুনর্মুদ্রণ।) (২) কাঠুরের সতর্কতা, (৩) চম্বল আজও অভিশপ্ত : ডাকুও ঝান্ডাধারী, (৪) ডাকু হরিবাবা [চম্বলের ডাকাতদের নিয়ে লিখিত], (৫) ঘরে থেকেও বাইরের, (৬) ক্যাডার বনাম কমিউনিস্ট, (৭) নিহত বটতলা, (৮) মায়ের ছায়ায়।
লেখকের জবানি : “পত্র-পত্রিকায় যা লেখা হয় তার কতটুকুই-বা বইয়ে দেওয়ার যোগ্য। দ্রুত লেখা, দ্রুত বিষয় বদল অনেক ত্রুটি-চিহ্ন এঁকে দিতে থাকে এ-ধরনের লেখায়। আমার শুধু একটাই সাফাই দেওয়ার আছে—সামাজিক-ইতিহাস চর্চা এখন জীবনের বহু দিক ছুঁতে আগ্রহী। পাঠকও আগের থেকে এসব জিনিস সম্পর্কে যথেষ্টই কৌতূহলী এখন। দু-তরফেরই কিছুটা কাজে লাগতে পারে এমন বহু তথ্য 'বাবু বিবি ও তাহারা'য় আছে। বইটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির সময়কাল : ১৯৮৭-১৯৯৫। নন্দলাল বসুর দিনলিপি লেখার ও ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় বাগবাজারের বসু পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।”]

৭। **দূষণ : ত্রিবেণী থেকে কলকাতা**
কলকাতা : পিপলস ফোরাম, (?)।
৩২ পৃ.; ২১.৫ × ১৩.৫ সেমি; ২ টাকা
[মলাটহীন এই পুস্তিকায় প্রকাশকাল অনুল্লেখিত]

৮। **কেশপুর কথা**
কলকাতা : সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১।
১৬৪ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; ৮০ টাকা।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত চৌধুরী।
মানচিত্র : নীলরতন মাইতি।
উৎসর্গ : রাজনৈতিক দাঙ্গায় নিহত গ্রামবাসীদের স্মরণে।
[রচনাক্রম : 'সন্ত্রাসের পক্ষে বিপক্ষে', 'অবরোধ আবার', 'পাট্টা দাস', 'ধেয়ে এল জোতদার', 'হাতিয়ার পঞ্চায়েত', 'হিংসাই মন্ত্র', 'জলযন্ত্র', 'উন্নয়নের জাদুদণ্ড', 'বর্গাদারের বারমাস্যা', 'গরিবের বাড়াবাড়ি বনাম ক্ষেতমজুরের ইজ্জত', 'বন্দিগ্রামের নিশান'।
মূলপাঠ শুরুর আগে বইটির আলোচ্য প্রসঙ্গের পটভূমি, লেখকের কৈফিয়ত এবং লিখনরীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় তিনটি অনুচ্ছেদে জানানো হয়েছিল:
'কেশপুর' মেদিনীপুর জেলার ছোট একটা বৃত্তের মধ্যে বন্দি হয়ে নেই। ভাল-মন্দে মেশানো সে এক বদল, গ্রামাঞ্চলে রাজনীতি একটা চড়ায় আটকে যাওয়ার বৃত্তান্তও বটে। গ্রামের এমন একটি চলনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। কেশপুর উপসর্গ, হুগলি-মেদিনীপুর-সংলগ্ন বাঁকুড়াতেও রক্তাক্ত শরীরে হাজির। কেশপুর কথা এই অশান্ত বলয় ঘিরেই গড়ে উঠেছে।
সত্যি কথাটা অনেক সময়ই খুব নাটকীয় শোনায়, কারও কাছে তা কপটও মনে হতে পারে। নির্বিশেষ বা বিশেষ, সেই ব্যক্তিদের প্রতি তবু সশ্রদ্ধ থেকেই বলছি—এতখানি অবিশ্বাস, এতটা স্বপ্নভঙ্গ কী এমন জরুরি ছিল? আবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির কথাও মনে পড়েছে, সর্বনাশের আড়ালেই হয়তো আছে এক বৃহত্তর মঙ্গল। যার আগমন আঁকাবাঁকা পথেই ঘটে। বন্ধুরা আমাকে অচ্ছুত ভাবতে প্যারেন বইটিতে চোখ বুলিয়ে। যেমন কেউ কেউ বলেছেনও আনন্দবাজার পত্রিকায় মেদিনীপুরের রণক্ষেত্র সম্পর্কে লেখার পর। আমার যদি কোনও দায়বদ্ধতা থেকে থাকে সেটা তো আসলে সমষ্টির মঙ্গলকে ঘিরেই। সেই আশা আর স্বপ্নই তো 'বাংলার মুখ' বইটির প্রাণবস্তু। কিন্তু তারপর? সৃষ্টি বীজের বদলে কেন এই ধ্বংসের অনল? তার খতিয়ান, বিবরণও তো সমান জরুরি।
সাংবাদিক নিজের ভূমিকা যথার্থভাবে পালনের চেষ্টা করলে তাঁর শুধু নিন্দাই প্রাপ্য। পুষ্পস্তবক তাঁর জন্য নয়।
সমাজ গবেষকরা যাকে ক্ষেত্র সমীক্ষা বলেন সেরকম আদৌ নয়। তবে বইটি গড়ে উঠেছে অজস্র মানুষের সঙ্গে কথা বলে। আমার ভূমিকা মুখ্যত দূতিয়ালির। বইটির লিখনরীতি যেজন্য কোলাজধর্মী। পাঠকের জানা দরকার কবে এইসব কথা হয়েছে, তার সময়ক্রম এরকম: মেদিনীপুর—২০০০ সালের অগস্ট মাসের ৮ থেকে ১৬ তারিখ। হুগলি—২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ থেকে ৮ তারিখ।]

প্রবন্ধ-সংকলন

১। **লোচন দাস নামে এক কারিগর**

কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., ২০০২।
[১০] + ১৬২পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; ৮০ টাকা
উৎসর্গ : বন্ধু অরূপ মল্লিককে।

[সূচি : স্বপ্নে ধাতুরিয়া, প্রতিবিম্বিত চক্ষু; চণ্ডিকার উদরে বৃশ্চিক; খেলার প্রতিভা : রূপকথার পুনর্নির্মাণ; মল্লিনাথের সঙ্গে তক্কাতক্কি; লোচনদাস নামে এক কারিগর; ঢোঁড়াইয়ের খোঁজে; নবীনচন্দ্রের উষ্মা; কুন্দনন্দিনীর অভিযোগ; স্বাতন্ত্র্যের মুদ্রাদোষ, লেখালিখির যুক্তি তক্কো আর গপ্পো; উৎসমুখী এক বিপজ্জনক যাত্রা; মিতভাষণের গদ্য : কাফকা।]

২। **কমলকুমার, কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস**

কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০৫।
৩৬০ পৃ.; ২১.৫ × ১৪ সেমি; ১৫০ টাকা।
প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ
উৎসর্গ : বিশাখাকে (লেখকের সহধর্মিণী)

[সূচি : একক প্রদর্শনী; কলকাতায় এক আগন্তুক; বাগ্‌বিতণ্ডা; মায়া; অন্তঃপ্রেরণা; কালের রাখাল; আধুনিক রূপকথা; পিছুটান; স্মৃতির স্বরলিপি; কথার জট; কমলকুমার বনাম কমলকুমার; অন্তরের দেশ ও দেশান্তর।
জীবনপঞ্জি ছাড়াও কবি সুব্রত চক্রবর্তীকে লেখা কমলকুমারের চিঠির এবং পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত। বইটি উক্ত প্রকাশনের 'ইতিহাস গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত নবম সংখ্যক প্রকাশ। সম্পাদক : ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ।]

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। **আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের গল্পসংগ্রহ**

কলকাতা : বুক্‌স অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালস, ১৩৮৪ (১৯৭৮)।
২৪০ পৃ.; ২২ × ১৪ সেমি; পনেরো টাকা।
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী।

[সংকলন ও সম্পাদনা ছাড়াও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত একুশটি গল্পের মধ্যে পাকিস্তানের রশীদ জাহানের 'ইফতারী' এবং ভারতের প্রেমচন্দের 'কফন' গল্পটিও অনুবাদ করেন। দ্বিতীয়টি যুগ্মভাবে, সদাশিব দ্বিবেদীর সঙ্গে। লেখকদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যও দেওয়া হয়েছিল।]

২। **উন্নয়ন বিতর্ক**

কলকাতা : চর্চাপদ, ২০০৮।
২৬৪ পৃ.; ২২ × ১১.৩ সেমি; ২৫০ টাকা।
প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন।
[সম্পাদনায় আরও তিনজন—প্রাবৃট দাসমহাপাত্র, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও দেবাশিস বিশ্বাস যুক্ত ছিলেন। বারোজন লেখকের মোট তেরোটি প্রবন্ধ সংকলিত।]

'হাসির গল্প' ছাড়াও 'পাড়াপড়শির গল্প' (বুকমার্ক, কলকাতা) নামে আরেকটি সম্পাদিত গ্রন্থের কথা জানা যায় মাত্র। দীর্ঘদিন আগে প্রকাশিত দুটি বইয়ের-ই কোনো কপি লেখকের কাছে নেই, অন্যত্রও দুর্লভ হওয়ায় বিশদে কোনো তথ্য দেওয়া সম্ভব হল না।

৩। **প্রবন্ধ সংগ্রহ : কমলকুমার মজুমদার**
কলকাতা চর্চাপদ, ২০০৯
৩৫০ পৃ.; ২২ X ১১.৩ সেমি; ৪০০ টাকা।
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
[অন্যতম সম্পাদক প্রশান্ত মাজী, সম্পাদনা সহায়ক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখবন্ধ উদয় নারায়ণ সিংহ রচিত।]

অনূদিত গ্রন্থ

কমুনিস (হিন্দি)। অনুবাদ : কাঞ্চনকুমার।
দিল্লি: রাধাকৃষ্ণ, ১৯৮০।
১৫২ পৃ.; ১৮.৫ X ১২.৫ সেমি; ২১ টাকা।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত (অনূদিত)

1. An Anthology of Bengali Short Stories of 70's, ed. Partha Chatterjee.
Calcutta : Srijani, 1981.
[6] + 80p.; 20.4×13.2cm; Rs. 10
'Famine's Daughter'; *tr.* Partha Chatterjee
['আকাল কন্যা কুসুম', অকালবোধন-এর শেষ গল্প।]

2. Calcutta : The Living City, ed. Sukanta Choudhuri.
Oxford University Press, 1990.
[18] + 366; 28×22 cm.; Rs. 750
'The Inheritors : Slum and Pavement Life in Calcutta' (pp. 78-87)
'Calcutta's Markets' (p. 117-122)
'Calcutta's River' (p. 190-195)
[সংকলনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয়েছিল। অনুবাদ, সম্ভবত, গ্রন্থ-সম্পাদকের]

3. Memory's Gold : Writings on Calcutta, ed. Amit Choudhuri.
New Delhi : Penguin/Viking, 2008
[12]XIII-XX + 540p.; 22.2 × 14.5cm; Rs. 600
'From *Journal Shottor* (Seventies' Journal)', *tr.* Chitralekha Basu
pp. 436-450.
[লেখকের 'জার্নাল সত্তর' গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ অনূদিত।]

এই পঞ্জি প্রস্তুত করেছেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। — প্রকাশক, *অফবিট*।